M/S T. G. ENTERPRISES

ERECTORS & REPAIRER OF POWER PLANTS

129/C MONOHOR PUKHUR ROAD

CALCUTTA-700026

PHONE— 46-2843

পরিচয়-কে অভিনন্দন

একজন শুভার্থী

পরিচয়

৫৬ বর্ষ ৬ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮৭ মাঘ ১৩৯৩

প্রবন্ধ

তানসেন—সম্প্রদায় প্রবর্তক অমিয়নাথ সান্যাল ১

সাবিত্রী রায়—রচনায় ও জীবনচর্যায় অরুণা হালদার ২৪

বিজ্ঞান ও শিল্পের মিলন নীহার ভট্টাচার্য্য ৩৫

নৈতিক মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য গোলাম কুদ্দুস ৫৮

সোমেন চন্দ : এক শিল্পীর জীবন ও সংগ্রাম কৃষ্ণ ধর ৬৯

গল্প

ঢোঁড়া উপাখ্যান স্বপ্নময় চক্রবর্তী ৭৯

কবিতাগুচ্ছ

জয়দেব বসু ৪০

মণীন্দ্র রায় অমিতাভ দাশগুপ্ত ৪৮—৪৯

গ্যুনট্যার গ্রাস্ (অনুবাদ : সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী) ৭৭

অনুবাদ গল্প

দস্তয়েভস্কির শেষ ভালোবাসা সের্গেই বেলভ

(অনুবাদ : সত্য গুহ) ১৫

আলোচনা

বিনয়কুমার সরকারের একটি প্রামাণ্য জীবনী হিমাচল চক্রবর্তী ৪২

প্রমথনাথ মিত্রের "যোগী" নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ৫০

চিত্র প্রদর্শনী

দুজন শিল্পী : আত্মপরিচয়ের দুই ভিন্ন নিরিখ মৃণাল ঘোষ ৯৯

পাঠকগোষ্ঠি

প্রসঙ্গ : চিনেবাদাম ১০৫

প্রচ্ছদ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

চিন্মোহন সেহানবীশ

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ১৭ থেকে প্রকাশিত

তানসেন— সম্প্রদায়-প্রবর্তক

অমিয়নাথ সান্যাল

[বাংলা সংস্কৃতির জগতে অমিয়নাথ সান্যালের নাম একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দাবি করে। মনন অভিজ্ঞতার এমন অনুভূতিময় মেলবন্ধন আমাদের শিল্পের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। দিকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, পাশাপাশি শিল্পী তথা 'গন্ধর্ব'-দের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ—এই দুইয়ের মিলনেই আমরা পেয়েছি 'স্মৃতির অতলে' অথবা agas and Raginis'-এর মতো কয়েকটি চিরায়ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সঙ্গীত এবং ানের প্রবহমান স্রোত অনায়াসেই মিশে যায় তাঁর লেখার অপূর্ব মাধুর্যে। তাঁর অপ্রকাশিত ় লেখাটি আমরা পেয়েছি তাঁর মেয়ে ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞা রেবা মুহুরীর স্বাভাবিক .সৌজন্যে। পাঠকদের কাছে আমাদের এই উপহার যেন, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ-সূত্রকে মেনেই। সম্পাদক, পরিচয়]

তানসেন যে সময়ে মিয়া তানসেন নামে খ্যাত হয়েছিলেন, সে সময়ে অপরাপর বহু ধ্রুবপদ গায়ক ও তন্ত্রকার আলাপ সঙ্গীত অনুশীলন করতেন। সকলেই তানসেনের মত বা শৈলী স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এমন অনুমান করা যায় না। তানসেন স্বয়ং গওরহার বাণীকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তাহলেও, অপরাপর ধ্রুবপদ গায়ক ডাগুরবাণী বা খাণ্ডারবাণী বা নওহার বাণীতে ধ্রুপদ গান করতেন, এমন কথা ইতিবৃত্তকারেরা স্বীকার করেছেন।

ইতিবৃত্তকারেরা বলেন, তানসেন এক নিঃশ্বাসে সমগ্র স্থায়ীপদ, অর্থাৎ ধ্রুবপদ গানের সর্বপ্রথম পদ গান করতেন, যা অন্য কোনও ধ্রুবপদ গায়ক পারতেন না। তানসেনের ফুসফুস ও বক্ষপেশীগুলির অসাধারণ সামর্থ্য ছিল

অনুমান করা গেল। কিন্তু—পরবর্তীকালে পুত্রবংশীয় গায়কদের সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত রয়েছে, যথা—এঁরা ক্রমশ এই বিষয়ে অশক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং এঁদের মধ্যে বিলম্বিত লয়ের ধ্রুবপদ গান অচল হয়ে পড়েছিল। বাধ্য হয়ে এঁরা ছোট ছোট পদ, অথবা মধ্য-দ্রুত লয়ের উপযুক্ত মাত্রায় গান করতেন। দৌহিত্র বংশের দিকে একটি খবর পাওয়া যায়, যথা—হায়দরবক্‌শজীর পুত্র অজ্জু খাঁ বিলম্বিতলয়ের ধ্রুবপদ এক নিঃশ্বাসে গান করার অভ্যাস করতে গিয়ে মুখে রক্ত উঠে মৃত্যুদশা পেয়েছিলেন!

গল্পকারদের কেউ কেউ বলেন—মিয়া তানসেন এক নিঃশ্বাসে স্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি চারটি তুকই গান করতে পারতেন। এরকম গল্পের সার্থকতা নেই, যতক্ষণ না বুঝতে পারি,—ধ্রুপদ গানটি পরিমাণে কতখানি ছিল, এবং লয়-মানই বা কিরকম ছিল। গল্পকারেরা অবশ্যই এ সম্বন্ধে খবর রাখা প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। তাঁদের মতো সংবাদদাতা আজও আছেন। তাঁদের অবগতির জন্য বলতে পারি আটচল্লিশ মাত্রার বিলম্বিত ধ্রুবপদকে চৌদুনি-লয়ে বেঁধে মাত্র বার-মাত্রার সময়ের মধ্যেও এক নিঃশ্বাসে গাওয়া যায়। এরকম কার্য পাকা ধ্রুবপদ-গায়ক সকলেই করে থাকে। এবং ওস্তাদ স্বর্গীয় বিশ্বনাথজী চৌদুনি থেকেও দ্রুত-লয়ে, সুরে, তালেও স্পষ্ট উচ্চারণ করে এক নিঃশ্বাসে আগা-গোড়া ধ্রুবপদ গান করতে পারতেন; যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম!

কণ্ঠ ও যন্ত্রে আলাপের বিশেষজ্ঞরা ও ইতিবৃত্তকারেরা তানসেনের পুত্র-বংশের ধারায় সুরক্ষিত আলাপ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে অনুমান হয়,—তানসেন গান ও রাগালাপ করার সময়ে স্থায়ী ও অন্তরা পর্যায়কে "স্থায়ী" রূপেই প্রকাশ করতেন এবং ভোগ ও আভোগ নামে দুই পর্যায়কে একসঙ্গে সঞ্চারীরূপেই প্রকাশ করতেন। স্বরচিত একটি পদে তানসেন এই মতটি উল্লেখও করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে প্রামাণ্য একেবারেই নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত।

অবশ্যই আমাদের মনে সমীচীন প্রশ্ন হতে পারে—তানসেন মূলে ঐ ধারণা কোথা থেকে পেয়েছিলেন? কারণ,—স্থায়ী ও সঞ্চারী শব্দ দুটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ; পারসিক ভাষায় বা পরিভাষায় এমন কোনও শব্দ পাওয়া যায় না, যা দিয়ে স্থায়ী-সঞ্চারী শব্দের ভাব প্রতিপন্ন হতে পারে। এবং তানসেনেরও পূর্বকাল থেকে উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে,—ভারত-পারসিক রাগ-রূপের বিশেষ রকম সমন্বয় ঘটেছিল ও পরিভাষাও প্রস্তুত হয়েছিল, এ কথা অস্বীকার

করার উপায় নেই। কিন্তু তার মধ্যেও স্থায়ী-সঞ্চারী পরিকল্পনার ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন আবিষ্কার করা যায় না। তাহ'লে, তানসেন স্থায়ী-সঞ্চারী ধারণা কোথা থেকে পেলেন, কেনই বা স্বীকার করলেন ?

আমাদের প্রশ্নগুলি আকাডেমিক বা ঔপপত্তিক হলেও তানসেনীয় ইতিবৃত্তের সঙ্গে জড়িত। মাত্র এই কারণেই প্রশ্নগুলি আলোচ্য মনে করি।

আমার গুরুদেব স্বর্গীয় শ্যামলাল ক্ষেত্রী মাঝে মাঝে সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থের কিছু কিছু পাঠ উদ্ধার করে বুঝিয়ে দিতেন। রত্নাকরে বর্ণিত ধাতু-বিভাগ বুঝতে গিয়ে মনে হয়েছিল—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ পরিকল্পনা খুবই ন্যায়সঙ্গত ও উত্তম। কিন্তু মাত্র নিবদ্ধ গান সম্বন্ধেই এদের প্রয়োগ; আলাপের সম্বন্ধে নয়। তানসেনীয় যুগের ধ্রুবপদ ও আলাপের ধারা-পরিভাষা রত্নাকরের কাছে ঋণী নয়।

রত্নাকরে বর্ণিত আলাপ-আলপ্তি প্রকরণ বুঝতে গিয়ে মনে হয়েছিল, মুখচাল, স্থায়, প্রথম স্বস্থানে, দ্বিতীয় স্বস্থান, তৃতীয় স্বস্থান ও চতুর্থ স্বস্থান ধারণা-কল্পনাগুলি ও ব্যবহারিক পরিভাষার দিক দিয়ে উত্তম। কিন্তু—তানসেনীয় যুগের আলাপ-পরিভাষা ব্যবহারিক পদ্ধতির সঙ্গে এর যোগসূত্র ছিল না। রত্নাকর-প্রণেতা স্বনামধন্য কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক শার্ঙ্গদেব মূলে দাক্ষিণাত্য নিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে কণ্ঠ ও বীণাদিতে আলাপ প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই আলাপের ঐতিহ্যও প্রবর্তমান রয়েছে। এখনও পর্যন্ত তার মধ্যে স্থায়ী অন্তরা বা সঞ্চারী-ভোগ-আভোগের পর্যায় স্বীকৃত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় বীণার কারু-শিল্পে এখনও উত্তর ভারতীয় 'জওয়ারিসাফ্' নামে সূক্ষ্ম কারুকর্মের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

অতএব—তানসেনীয় যুগের স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ-ভোগ, অথবা স্থায়ী-সঞ্চারী পরিভাষাগুলি কোনও ক্রমেই তদানীন্তন প্রচলিত সঙ্গীত-শাস্ত্রের নিকট ঋণী ছিল না।

তানসেনীয় যুগ ও রত্নাকরের যুগের মধ্যবর্তী কোনও কালে অন্তত, তোগ্‌লক বাদশাহের আমলে ধ্রুবপদ গানের পর্যায় পরিভাষা ছিল—আস্থায়ী, মিলানক্, অন্তরা, ভোগ ও আভোগ। 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' নামে সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীরাধামোহন সেন (খৃ. ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালের ব্যক্তি) তানসেনীয় ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই এই ব্যবহার-বিষয়ক সমাচার উদ্ধৃত করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোনও সঙ্গীত গ্রন্থে বা শাস্ত্রে এই কল নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করতে পারি, তোগলক্ বাদশাহী যুগেই ধ্রুবপদ ও আলাপ সঙ্গীতের ভিত্তিগত কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির বশে। এবং এ বিষয়ে উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীরা উভয়েই মিলে একমত হয়ে ধ্রুবপদ গান ও বীণা প্রভৃতি যন্ত্রে আলাপের ইমারত তৈরি করতে চেষ্টিত ও সক্ষম হয়েছিলেন।

তানসেনের বুদ্ধি-বিবেচনায় মনে হয়েছিল—আস্থায়ী বা স্থায়ী পর্যায়ের মধ্যেই মিলাতুক ও অন্তরা রয়েছে, সুতরাং স্থায়ীকে পর্যায় বা ভাগ স্বীকার করাই যথেষ্ট; তথা ভোগ ও আভোগ দু'টিকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সঞ্চারী মনে করতে কোনও দোষ নেই, বরং ন্যায়সঙ্গত লাঘবই হয়। অর্থাৎ—গতানুগতিক বাহুল্যকে সংক্ষেপ করার বুদ্ধি তানসেনের ছিল।

কিন্তু 'সঞ্চারী' শব্দটি তানসেন কোথা হতে সংগ্রহ করলেন? এ পর্যন্ত যা বিবরণ পাওয়া গেল, 'স্থায়' ও 'স্থায়ী' বা 'আস্থায়ী' শব্দ আছে, 'অন্তরা' শব্দও আছে। কিন্তু সঞ্চারী শব্দ নেই। তানসেন কি নিজবুদ্ধিতে ঐ শব্দটি তৈরি করেছিলেন? তানসেন কি সংস্কৃত ভাষা জানতেন? অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথালাপ করে কিছু প্রভাব আহরণ করেছিলেন?

ইতিবৃত্তকারেরা এরকম প্রশ্ন সম্বন্ধে একেবারেই নীরব, নিরুত্তর। আমরাও প্রশ্নকে স্তব্ধ করে দিয়ে শান্তিতে থাকতে পারি। তানসেনীয় ইতিবৃত্তকারদের মধ্যে আমার সাক্ষাৎ জানিত সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলতে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন পণ্ডিত স্বর্গীয় শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রী। কাশীধামে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ করার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। তাঁকে এরকম প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন—তানসেন যে অজ্ঞ, নিরক্ষর ছিলেন তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ লোকের সঙ্গ করেন নি, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের বা বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গলাভ করেছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল বলেই সম্প্রদায়-প্রবর্তক হ'তে পেরেছিলেন। সম্প্রদায়-প্রবর্তন করা যে সে লোকের কর্ম নয়। অনুভব, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়শক্তি আর কর্মে মহান হলে তবে ভাগ্যযোগে কেউ কেউ সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। তানসেনের এ সমস্ত গুণ-ভাগ্য ছিল নিশ্চয়ই। তা ছাড়া তানসেন ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন, এ কথা ত ইতিবৃত্তকার ও গল্পকারেরাও বলেন।

ভক্তি প্রসঙ্গেই সুদর্শন শাস্ত্রীজি শ্রীহরিদাস স্বামীজিও তানসেনের কথা বললেন। তানসেন সাধক চূড়ামণি শ্রীহরিদাস স্বামীজির শিষ্য ছিলেন না। কিন্তু—গোয়ালিয়র-দিল্লীর রাস্তায় তানসেন আলবৎ স্বামীজির আশ্রমে

যেতেন, সঙ্গলাভ করতেন, তাঁর মুখে ভজনাদি পদ গান শুনতেন, স্বামীজির আশীর্বাদও লাভ করতেন। না হ'লে—শ্রীহরিদাস স্বামীজি ও তানসেনকে নিয়ে একাধিক গল্পই বা প্রচারিত হ'ল কেন! অবশ্যই শ্রীহরিদাস স্বামীজির আশ্রমেই সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রসঙ্গ হত!

শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রীর কথার সারবত্তা বুঝতে পারলাম। এবং এরকম ব্যাপারে তর্ক করাই বৃথা। তাঁর মতের ধার ও ভার স্বীকার করে নিলাম। যে মিয়া তানসেন—"শ্যামসো ঘনশ্যাম উমড ঘুমড আয়ো, মন্দ মন্দ মুরলীতান গগন ঘোর ঘহরাই" গানে,—এবং—"বন্‌শি ধুন সো বজায়ে বাজত শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্ম ঘুমড রহো সঘন গরজত বাদর বিমান" গানে এমন সুন্দর মালোপমা রচনা করতে পেরেছিলেন, শ্রীমতী রাধিকার দিব্যোন্মাদ দশার ছবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, 'আকাশ' অর্থে 'বিমান' শব্দ প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন—সেই তানসেন মুসলমান হন বা মিয়াই হন, তিনি এমন লোকের সঙ্গ নিশ্চয় করে থাকবেন যিনি ভারতীয় রস-শাস্ত্র, কাব্য ও বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র বিষয়ে কৃতবিদ্য ছিলেন। একমাত্র বৃন্দাবনের সাধকাগ্রগণ্য শ্রীহরিদাস স্বামীজিই যখন এ সমস্ত গুণের আধার এবং—অবশ্যই যখন স্বামীজির সঙ্গে তানসেনের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল, তখন, অন্য দ্বিতীয় হরিদাস বা রায় প্রবীণের সঙ্গ কল্পনা করার প্রয়োজনই নেই। বিশেষ এই যে—স্থায়ী ও সঞ্চারী শব্দ দুটি রস-শাস্ত্রের স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অনিবার্যভাবে।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রীর কথা শিরোধার্য করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এ থেকে অনেক বৎসর পরে (খৃঃ ১৯৩৭ সালে) কলিকাতায় ওস্তাদ দবীরুদ্দিন খাঁ সাহেব ধ্রুবপদ গায়ক ও বীণাবাদক শ্রদ্ধেয় পুরুষ একজন—তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। একদিন কথায় কথায়—তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনাদের অর্থাৎ মিয়া তানসেনের ঘরানায় যে সঙ্গীত বিদ্যা ছিল, সেই বিদ্যা কোন্ মত বা কোন্ শাস্ত্র অনুযায়ী ছিল?—বলাই বাহুল্য দবীরুদ্দিন খাঁ সাহেব প্রখ্যাতনামা ওস্তাদ মৃত্যুঁউজীর খাঁ সাহেবের পৌত্র; অর্থাৎ তানসেনের দৌহিত্র বংশের ব্যক্তি।

দবীর খাঁ সাহেব, যথার্থত দু সেকেণ্ডের মধ্যে উত্তর দিলেন—"ভরত-মত।" আমি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম। তা হলেও জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্ ভরত? তিনি বললেন—কেন? ভরত কি দুজন আছে? ভরত ত ভরত-মুনি, যিনি নারদের শিষ্য ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি

ভরত মুনির শাস্ত্র পড়েছেন? তিনি বললেন—পড়া ত দূরের কথা, আমি ভরত মুনির শাস্ত্র চোখেও দেখিনি! আর, দেখেই বা কি হবে; আমি ত সংস্কৃত পড়তেই জানি না!

খাঁ সাহেবের স্পষ্টোক্তির জন্য মনে মনে প্রশংসা করলাম; অবশ্য এরকম আরও তুচারজন গুণী দেখেছি। তবুও, নাছোড়বান্দা হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—মিয়া তানসেন যে ভরত-মতের বিদ্যা মানতেন, এর কোনও প্রমাণ দিতে পারেন?

খাঁ সাহেব অবিচলিতভাবে বললেন—কোনও প্রমাণ নেই—মিয়া তানসেনের বংশের বাপ-বেটাদের মুখের কথা ছাড়া। আমি মাত্র মুখস্থ করা খবরই দিলাম।

এরকম কথার উপর কথাই নেই। সাম্প্রদায়িক কথার ঐতিহ্য কালের স্রোতে ভেসে চলে কথার বাহনে, শ্রুতি-স্মৃতির রূপে: যতদিন পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত সত্য বস্তুটি অবিকল থাকে। শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যে সত্যের প্রতি অবহেলা ঘটলে দেখা দেয় গল্প।

ওস্তাদ দবীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের মুখের খবর অমান্য করা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসার সাধ তখনও মেটেনি। জিজ্ঞাসা করলাম—খাঁ সাহেব, কিছু মনে করবেন না। মিয়া তানসেন কি বিদ্বান লোক ছিলেন? সংস্কৃত লেখা-পড়া জানতেন? এ বিষয়ে কিছু কথা-কাহিনী আপনাদের মধ্যে চলিত আছে?

খাঁ সাহেব বললেন—না, সেরকম কথা-কাহিনী কিছু নেই। তবে, মিয়া তানসেনের মাথার উপর একজন নয়, তু-তুজন বুজুর্গ্ (সিদ্ধপুরুষ) আদমির আশীর্বাদ জমা হয়েছিল। এর পরে, আর মখ্তব্-সবখে্র (পাঠশালা-অধ্যয়নের) হিসাব আর কথার দরকার কি!

আমার জিজ্ঞাসার সাধ মিটে গেল; ক্ষান্ত হলাম। কিন্তু রেহাই পেলাম না। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—এতক্ষণ অরানি সওয়াল করলেন। এখন আমিও কিছু সওয়াল করি আপনাকে!

আমি প্রস্তুত আছি; জানালাম। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—মিয়া তানসেন বিদ্বান ছিলেন কি না, সংস্কৃত জানতেন কিনা, এরকম প্রশ্ন আপনার মনে কেন দেখা দিল, বলুন ত! কই, আমাদের মনে ত এরকম প্রশ্ন দেখা দেয় না।

তখন আমি খাঁ সাহেবকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। ধ্রুবপদ ও আলাপের অঙ্গ-বিভাগের কথা ঐতিহ্য, পণ্ডিত সুদর্শন শাস্ত্রীজির রায়, আর—

তানসেনী ধ্রুবপদের "স্থায়ী-সঞ্চারী"র কথা, এবং আমার নিজস্ব চিন্তার কথা।

খাঁ সাহেব নির্বাক হয়ে বক্তব্যটি শুনলেন; বিশেষ করে পণ্ডিত সুদর্শন শাস্ত্রীজির লিখিত ও কথিত মন্তব্য শুনে তিনি খুব চমৎকৃত হলেন। আমার বক্তব্য সব কিছু বলা হয়ে গেলে তিনি খুব প্রীত হয়ে তাঁর মনের কথা বললেন। তার মধ্যে অবান্তর কথাও অনেক ছিল, তাঁর বা তাঁদের কুলের মার্মিক দুঃখের কথাও ছিল। সমস্ত বাদ দিয়ে, সার কথাটি দাঁড়াল—তাঁরা সংস্কৃত ভাষা চর্চা করার সুবিধা পাননি, তবে মহান্ত গুণগ্রাহক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর সাহেব ও তাঁর যোগ্য পুত্র কুমারসাহেব শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরজীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন। কারণ—এঁরা যেমন একদিন গ্রন্থশাস্ত্র চর্চা করেন, অন্যদিকে তানসেন ঘরের ধ্রুবপদ আর বীণা, আর রবাব আর সুরশৃঙ্গারে আলাপও একাগ্র হয়ে চর্চা করেন। যতদূর বুঝতে পারা যাচ্ছে, এরাই তানসেনীয় রাগসঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষা করবেন। এইটেই আনন্দের কথা। ইত্যাদি।

মিয়া তানসেনের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। পণ্ডিত সুদর্শন শাস্ত্রী বলেছিলেন—তানসেন ছিলেন সম্প্রদায়-প্রবর্তক অনন্যসাধারণ পুরুষ। সম্প্রদায় অর্থ—হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি আধুনিক কথিত ধর্মসম্প্রদায় নয়। সম্প্রদায় অর্থ—অধিকারী-চালিত কোনও সাঙ্গীতিক যাত্রার দল নয়; যা আজকাল খবরের কাগজে বহুল প্রচারিত হচ্ছে। সম্প্রদায় অর্থ—সুমার্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্পবিদ্যার বা কলাবিদ্যার ধারাগত সমষ্টিগত তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত ও ব্যবহার পদ্ধতি।

পণ্ডিত সুদর্শন শাস্ত্রীজির কথা আমি সর্বদা স্বীকার করে নিয়েছি; ভক্তি বিশ্বাসের নয়, যুক্তি-তর্কের দিক দিয়ে।

॥ ২ ॥

বিগত পাঁচ শতাব্দী কালের উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির ইতিবৃত্তগত ধারা আলোচনা করলে একটি ধারণা সবচেয়ে বড় উজ্জ্বল হয়ে আমাদের মনকে অভিভূত করে। সেই ধারণা যথা—তানসেন অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী গায়ক ছিলেন, যদিও তুলনা করার মাপ-কাঠি নেই আমাদের হাতে। কিন্তু মিয়া তানসেন অদ্ভুত ভাগ্যশালী ব্যক্তিও ছিলেন; না হলে,—গত পাঁচশ বৎসরের কম-পক্ষে পাঁচ-শ কৃতকৃত্য গায়কবর্গের সম্মিলিত সুনামের চাপে

তানসেনের নাম ডুবে যেত, সন্দেহ নেই। তানসেনের নাম অন্ধকারে ডুবে যায়নি। তানসেনের যশোভাগ্য ছিল।

কিন্তু-মাত্র যশ ও ভাগ্যের এমন কোনও গুণ বা শক্তি নেই যা দিয়ে সঙ্গীত জগতে নাম অক্ষুণ্ণ থাকে। যশ ও ভাগ্য সাময়িক মোহের সৃষ্টি করে। সাধারণ শ্রোতাকে বিমোহিত, বা বিমূঢ় করে দেয়। আবুল ফজল যখন বলছেন তানসেনের মতো গায়ক হয়নি, হবে না, তখন তিনি সাধারণ শ্রোতার বিমূঢ়ধ্বনি প্রতিধ্বনি করলেন। ওরকম কথা সমালোচকের কথা নয়, ইতিবৃত্ত-কারের কথা নয়।

কীর্তি হল যশ ও ভাগ্য থেকেও বড়। তানসেনের নাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আজও,—কীর্তিস্তম্ভের রূপে। তানসেনের নামের মূলভিত্তি হল কর্ম ও কীর্তি। তাঁর ভাগ্য বা যশের মূল্য দিতে পারলাম না, কারণ এর মানদণ্ড নেই। কিন্তু কর্ম ও কীর্তির মানদণ্ড আছে।একে বিচার করা যায়, সমালোচনা করা যায়, এর সাংস্কৃতিক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। তানসেনের সমসাময়িক সমালোচক ও ইতিবৃত্তকারেরা বিচার করে মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালের সমালোচকবর্গ একটি নির্ভরযোগ্য বিচারসহ মানদণ্ড ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তানসেন আজও জীবিত আছেন কীর্তির মধ্যে।

গোয়ালিয়রের তানসেন অথবা রেবা-দিল্লীর তানসেন, যেরকমেই তাঁর জীবন-রেখা অগ্রসর হ'তে থাক,—তানসেন কয়েকটি অভিনব রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। যথা-মিয়া কি কানড়া বা দরবারী কানড়া, মিয়াকি টোড়ি, মিয়াকি মল্লার, মিয়াকি সারঙ্গ, মিয়াকি জয়জয়ন্তী। নূতন রকমের স্বরবিন্যাস করে নূতন রাগ তৈরী করা মোটেই কঠিন নয়। তানসেনের বহুপূর্বকাল থেকেই নূতন নূতন রাগ সৃষ্ট হয়েছিল; তানসেনের পরে আজ পর্যন্ত কালে, খেয়াল গানের গুণীরা ও বীণাদি তন্ত্রবাদকেরা বহু রাগ সৃষ্টি করেছেন ও করছেন। তবুও মাত্র পাঁচ-ছয়টি রাগ সৃষ্টি করে তানসেনের কীর্তি প্রবাহিত হয়ে চলেছে; অথচ-অপর সৃষ্টিকর্তাদের নাম কদাচিৎ স্মরণে আসে। হরিদাসী-মল্লার, জাজ্-মল্লার, ধোঁধিকি-মল্লার, রামদাসী মল্লার ও ছজ্জুকি মল্লার, সুরদাসী মল্লার নামে আছে; রূপে প্রায় অবলুপ্ত হ'তে চলেছে। মীরাবাইকি মল্লার মাত্র একখানি ধ্রুবপদ গানে প্রাণপণে বেঁচে আছে। এরই বা কারণ কি? রামপুর-নিবাসী সরোদ যন্ত্রী ওস্তাদ মৃত ফিদা হুসেন খাঁ সাহেবের হাতে যে মিয়া কি জয়জয়ন্তী রাগের আলাপ শুনেছিলাম; সেই জয়জয়ন্তীও এখন

লুপ্তপ্রায়। ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের মুখে মিয়াকি সারঙ্গ, হরিদাসী সারঙ্গ এবং রামদাসী মল্লার, সুরদাসী মল্লার প্রভৃতি যেসব রাগ-গান শুনেছিলাম, তাও এখন বিস্মৃতির তলে চলে গিয়েছে। এক কথায়—রামদাস, হরিদাস, সুরদাস, জাজ, ধোঁধি, মীরাবাই, ছজ্জু ও মিয়া তানসেনের রচিত মল্লার-মালাগুলি শুধু য়ে গিয়েছে। রামদাস, হরিদাস প্রভৃতি ব্যক্তিরা কে কিরকম ছিলেন এখন কিছুই জানার উপায় নেই। কিন্তু-তানসেন স্বতন্ত্র হয়ে স্বনামধন্য হয়ে চিরজীবী রয়েছেন, ইতিহাসে, ইতিবৃত্তে ও গল্পে। এরই বা কারণ কি ?

এর একমাত্র কারণ এই যে—রামদাস, হরিদাস, ছজ্জু (সরজু ?), ধোঁধির মতো তানসেনও অভিনব রাগ সৃষ্টি করেছিলেন; অধিকন্তু মিয়া তানসেন সম্প্রদায় সৃষ্টি ও প্রবর্তনা করেছিলেন, যা অন্যেরা পারেন নি। সুপ্রাচীনকালের উত্তর ভারতে নারদ, নন্দিকেশ্বর ও ভরত সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন বলেই সহস্র সহস্র বৎসরের পরেও তাঁদের নাম ও কীর্তি বজায় আছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত শত শত সঙ্গীতশাস্ত্রকার পুঁথি-পাটি তৈরী করে গিয়েছিলেন। কিন্তু-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করতে পারেন নি বলেই এদের নাম-যশ-কীর্তি সমস্তই লুপ্ত। শাস্ত্রগ্রন্থ লিখতে পারলেই সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় না। রামদাস, হরিদাস প্রভৃতির মতো তানসেনও শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু তানসেন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেছিলেন। ফলে, নারদ, নন্দিকেশ্বর, ভরতের মতোই তানসেনের নাম অক্ষয় হয়েছে নারদ-নন্দিকেশ্বরের সাম্প্রদায়িক কীর্তিকে সাক্ষাৎ করি মহামুনি ভরতের উপদিষ্ট "নাট্য-শাস্ত্র" থেকে মতঙ্গ-প্রণীত "বৃহদ্দেশী সংগ্রহ" থেকে ও শার্ঙ্গদেব-প্রণীত "সঙ্গীত-রত্নাকর" গ্রন্থের বিবরণ-প্রকরণের মধ্যে। তানসেনের স্বরচিত কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তানসেনের পুত্র-দৌহিত্র বংশের গুণীবিশেষজ্ঞদের মধ্যে সুরক্ষিত সাম্প্রদায়িক বিজ্ঞান-পদ্ধতির নির্গলিত সার পাওয়া যাচ্ছে—পাণ্ডুলিপির আকারে এবং উপদেশ-সংগ্রহের আকারে। অধিকন্তু—তানসেন-বংশের অতিরিক্ত অথচ তানসেন-বংশের ধুরন্ধর শিষ্যরাও তানসেন-সম্প্রদায়ের উপদেশাবলী স্মরণ-ধারণ করে এসেছেন, আজ পর্যন্ত। শেষ কথা—এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষিত অন্তত দুজন গ্রন্থকার আমরা সাক্ষাৎ করেছি যাঁরা তানসেন বংশাবলীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করার ব্যপদেশে তানসেন-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যথা—কাশীধামের স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রী এবং বাংলাদেশের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর আচার্য মহাশয়। পণ্ডিত সুদর্শন শাস্ত্রী তানসেনের পুত্রবংশের

বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর তানসেনের দৌহিত্রবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ফল কথা—তানসেন-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের বা কীর্তির যাবতীয় সংগ্রহ-বিবরণ তানসেন-বংশের ও বংশাতিরিক্ত শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বিজ্ঞান-পদ্ধতির রূপধারণ করেছে, গত পাঁচশ বৎসর কালে,—তার তুলনা নেই। এই একমাত্র কারণে তানসেনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে। ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে অপর কোনও সম্প্রদায় প্রবর্তক আমরা পাইনে, যিনি ধ্রুবপদ গান ও রাগালাপ বিষয়ে সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তুলনা নেই বলার হেতু বললাম।

চিরজীবী, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার হেতু বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। আগেই বলে রাখি ভাব-গদগদ ভক্তি বা প্রাচীনদের প্রতি কারণ-অকারণে অন্ধ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হেতু নয়।

ইং ১৯১৪-১৬ সালের মধ্যে কলিকাতায় আমার সঙ্গীতগুরু শ্যাম লালজীর বৈঠকে অনেকবার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ নৃত্যকলা নিপুণ মহিলা-শিল্পী শ্রীযুক্তা চৌধুরাণ বাইজীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রসঙ্গ ঘটেছিল। ইনি কথক-নৃত্যের ও নৃত্তের শীর্ষতম শিল্পী ছিলেন। স্বর্গীয় কালিকা-প্রসাদ ও বিন্দাদীন সম্প্রদায়ের ধারা ও পদ্ধতি দিয়ে আবাল্য-লালিত-পালিত দীক্ষিত-শিক্ষিত ছিলেন ইনি। একথা সাধারণে বিদিত ছিল। একদিন প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এঁকে—আপনি কোন্ শাস্ত্রের মতে নৃত্য করেন? উত্তরে ইনি বললেন—ভরত-মতে আমার গুরুসম্প্রদায় নৃত্য করে এসেছেন মাত্র এই কথাই জানি। শাস্ত্র-গ্রন্থ আমি কিছুই পড়িনি। তখনকার তখন ঐ কথা শুনে আমি বিশেষ কিছু মনে করিনি, কারণ-ভরতের নৃত্ত-নৃত্য পদ্ধতির খবর রাখতাম না, নাট্যশাস্ত্রও পড়িনি। পুনর্বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কতরকমের মুদ্রা দিয়ে কাজ-কর্তবা হাঁসিল করেন? চৌধুরাণ বাইজী বললেন—মুদ্রা ত আমরা শিখিনি। আমরা যা শিখেছি, তার খানা-পুরি হ'ল বত্রিশ অঙ্গহার আর একশ-আট করণ।

কয়েক বৎসর পরে, যখন ভরত-নাট্যশাস্ত্র পড়েছিলাম, তখন দেখি—সেই বত্রিশ অঙ্গহার ও একশ-আট করণের ব্যবহার-প্রয়োগ হ'ল ভরত-সম্প্রদায়ের মূল উপদেশ! ভরত মুনি ঘুণাক্ষরেও 'মুদ্রা' শব্দ ব্যবহার করেননি।

মহামুনি ভরত নাট্য-নৃত্ত-নৃত্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। ঐ ত্রিধারার মধ্যে দু'টি ধারা কালিকাপ্রসাদের মধ্যে ও শেষে মুসলমান ধর্মাবলম্বী

চৌধুরাণের মধ্যে এসে বর্তেছে। মূল সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়-প্রবর্তক এরকম করেই চিরজীবী নাম ও খ্যাতি লাভ করেন। শিল্পীসঙ্ঘ যদি শাস্ত্রসম্বন্ধ-বর্জিত হয়, তাহ'লেও—ব্যবহারিক বিদ্যা-পদ্ধতি ও কর্মের মাধ্যমে মূল সম্প্রদায়-প্রবর্তকের নাম চিরস্মরণীয়ভাবে থেকে যায়।

প্রসঙ্গত, নৃত্ত-নৃত্য বিষয়ে ইতিবৃত্তকারেরা বলেন—বহু বহু কাল আগে উত্তর ভারতের নৃত্যবিদ্যা-পদ্ধতির সঙ্গে পারসিক নৃত্য-পদ্ধতির মিলন ঘটেছিল। এই সময়ে নৃত্যবিদ্যার পরিভাষা গড়ে উঠেছিল প্রচলিত ভাষায়। পরে—কালিকা-বিন্দা আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রতিভাস্নাত হয়ে। এঁরাই আধুনিক কত্থক-পরিভাষা ও নৃত্য-পরিপাটির প্রবর্তক। মূলে—ভরত মুনি থাকলেন সম্প্রদায় প্রবর্তক হয়ে। এবং শাখা-সম্প্রদায়ের অনন্য সাধারণ প্রবর্তক ও কর্মীরূপে নাম চলে এসেছে কালিকা ও বিন্দার। ভরত ও কালিকা-বিন্দা এই তিনটি নাম কখনই মুছে যাবে না নৃত্যকারদের সঙ্ঘ ও স্মরণ থেকে। শত-সহস্র শিল্পী কত্থক-ধারার নৃত্য করে আবির্ভূত হয়েছেন, নৃত্ত-নৃত্য করে খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেছেন, শিষ্য তৈরী করেছেন পদ্ধতির সাহায্যে। মাত্র কৃতজ্ঞতার বশে এঁরা ভরত ও কালিকা-বিন্দার নাম করবেন, এ কথা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। এই কৃতকর্মী সঙ্ঘে জাতি-ভেদ নেই, ধর্ম-ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্র ভেদ নেই।

ঠিক একই কারণে—ধ্রুবপদ বিদ্যা ও আলাপ বিদ্যার জগতে তানসেন কালজয়ী হয়ে বেঁচে আছেন; মিয়া তানসেন ছিলেন সম্প্রদায়-প্রবর্তক এবং দূর ভবিষ্যতেও তাঁর নাম ও কীর্তি প্রসারিত হতে বাধ্য। অবশ্য, তানসেনের পরে, তানসেন বংশে অন্ততঃ তিনজন কর্মী মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এরা সম্প্রদায় রক্ষা করার উপায় দেখিয়ে গিয়েছেন, এবং নিজেরা যুগোপযোগী প্রগতির ধারায় শাখা-সম্প্রদায় ও পরিভাষা-পদ্ধতির উন্নতি করে গিয়েছেন।

সম্প্রদায় শব্দটি অনেকবার ব্যবহার করেছি। এর ফলিত অর্থ, অন্তত সঙ্গীত-শিল্পের পক্ষে পরিষ্কৃত করা উচিত মনে করি। সম্প্রদায় অর্থ—এমন কিছু বিদ্যা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমষ্টি যে বিদ্যা ও ব্যবহার গুরু তাঁর শিষ্যকে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিতে পারেন, অনায়াসে; যে জ্ঞান-বিদ্যার সমষ্টি তার বাস্তব ফলিত গুণের কারণে শিল্পকে সুরক্ষিত করে, এবং শিল্পোন্নতি-প্রগতির পথও মুক্ত ও সুগম রাখে।

সঙ্গীত-শিল্পের মূল কথা হ'ল—অনুকরণ। অনুকরণ কার্য জ্ঞান-বিদ্যার

অপেক্ষা রাখে না; সুতরাং অনুকরণ-শক্তি বা অনুকরণের কার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়।

কিন্তু মাত্র অনুকরণ দিয়ে অপরকে শিক্ষা দেওয়ার বিদ্যা আয়ত্ত হয় না। অপরকে শিক্ষণ-বিদ্যা দান করতে হ'লে শিল্পের পরিভাষা পদ্ধতি এবং চরমে পদ্ধতি-বিজ্ঞান অর্থাৎ 'মেথডলজি' শিক্ষাও দিতে হয়। এই সমগ্র বিদ্যার অর্থাৎ পরিভাষা, পদ্ধতি ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানরূপ শিক্ষণ-বিদ্যাই সম্প্রদায়।

একজন শিষ্য হয়ত অবিকল ও শুদ্ধ অনুকরণ করতে সমর্থ নন; কিন্তু তাঁর মাথা অন্যান্য সতীর্থদের চেয়েও সতেজ ও পরিষ্কার। এই শিষ্য হয়ত তার জীবনে উত্তম গায়ক, বাদক বা নর্তক হতে পারলেন না। কিন্তু ইনি সম্প্রদায়-রহস্য জ্ঞাত হয়ে অন্য অনেক সতীর্থ ও শিষ্যকে সাহায্য এমন কি প্রস্তুতও করতে পারেন। ইনি রাগ-গান রচনা করতে পারেন, যা অন্য সুকণ্ঠ ও দক্ষ শিল্পনবিশ অনুকরণ করে উত্তম গায়ক বা বাদক বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

যিনি সম্প্রদায়-বিজ্ঞান অবগত, তিনি শিক্ষণ-বিদ্যা দান করতে পারেন; অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের শিক্ষক তিনি। অন্য পক্ষে, যে গুরু মাত্র শিষ্যের অনুকরণ-বৃত্তি জাগিয়ে দিয়ে শিষ্যকে গান-বাজনা নাচ শিক্ষা দেন, অথচ সম্প্রদায়-বিদ্যা নিজে আয়ত্ত করেন নি, তিনি ও তাঁর শিক্ষার ধারা একেবারেই অনুকরণ-বৃত্তির নির্ভর হতে বাধ্য। মাত্র অনুকরণ দিয়ে শিল্পের শৈলী রক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু উন্নতি অসম্ভব। শেষ কথা, সম্প্রদায়-বিদ্যার অভাবে, গুরুই বা কি শিষ্যই বা কি, অভিনব, সুষ্ঠু, সুন্দর আদর্শ নির্মাণ করা যায় না। সম্প্রদায় বিদ্যা আয়ত্ত নেই এমন গুরুর উত্তম শিষ্য হয়ত নিজ বুদ্ধিতে অভিনব কিছু রচনা বা নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন। এ রকম চেষ্টা প্রায়ই পণ্ডশ্রম হয়; কদাচিৎ ভাগ্যের বশে দু-একটি চেষ্টা শত-শত পরীক্ষা কার্যের মধ্যে হয়ত সফল হয়। এ রকম অজ্ঞানকৃত সফলতাকেই অশিক্ষিত-পটুত্ব বলা যায়। ভবিষ্য শিষ্যদের পক্ষে এই অশিক্ষিত-পটুত্বের রাস্তা বিপজ্জনক ও দিগ্-ভ্রান্তিকর। বিপজ্জনক যথা—নূতন-কিছু-করতেই হবে মনোভাবের বশে, একজন মনে করলেন—খাম্বাজ-রাগে শুদ্ধ ঋষভ বাদ দিয়ে কোমল ঋষভ লাগালে ক্ষতি কি! বাহাত্তর ঠাটের মধ্যে ত পড়বেই! তিনি জানেন না যে ঐ কোমল ঋষভের কোনও সংবাদ-সঙ্গতি নেই। খাম্বাজের স্বর-বিন্যাসের মধ্যে অবশ্যই ঐ কোমল ঋষভকে জোর করে বসান যায়। কিন্তু ব্যাপারটা হয়,—পায়স রান্না করে পেয়াজের প্রক্ষেপ দেওয়ার মতো। পেয়াজ দিয়েও পায়েস

হয়, কিন্তু বিদ্যাটা জানা থাকলে তবে পায়স হয়। বিদ্যা জানলেও শিক্ষিত পটুত্বই হয়ে গেল।

এরকমে,—ধ্রুবপদ, ধামার তেওরা, ঝাপতাল, সুরফাক তাল প্রভৃতির যোগ্য আদর্শে পদ রচনা করাও অসম্ভব বা বৃথা,—যদি চৌতাল প্রভৃতির অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট ছন্দগুলির সম্বন্ধে বিদ্যা বা সম্প্রদায় না জানা থাকে। তখন ধ্রুবপদ গান হয়ে যায় ঢিমা একতালা, ধামার হয়ে যায় তেওরা, তেওরা হয়ে যায় ধামার, ঝাপতাল হয়ে যায় সুরফাক্‌, সুরফাক্‌ হয়ে যায় ঝাপতাল!

এবং—কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগালাপের সম্প্রদায়-বিদ্যা জানা না থাকলে,—বিলম্ব্‌-পদ আরম্ভ করতে না করতে মধ্‌ অর্থাৎ মধ্যলয়ের বোল এসে যায়, মধ-জোড় করতে দ্রুত বোল এসে পড়ে। লয়, বা টেমেলা, বিগড়ে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়—যেমন—ঘোড়া ঠমক-লয়ে চলতে চলতে হঠাৎ ছুট্‌ ধরার মতো; সওয়ার যদি ঘোড়াকে কায়দা মাফি্ক চালাতে না পারেন, তাহ'লে—ঘোড়ার সাজ-সজ্জাই বা কি, আর সওয়ারীর সাধ-আহ্লাদই বা কি!

এরকম কতো কী দুর্যোগ ঘটে, শিল্পে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার নাম দিয়ে! দুর্যোগের শেষ নেই।

একমাত্র সম্প্রদায়-বিদ্যাই চারুশিল্পকে দুর্যোগ হতে রক্ষা করে, এবং—প্রতিভার সম্যক স্ফুরণকে সুযোগ দেয়।

এসব কথা ভেবে দেখলে বুঝতে পারি—প্রতিভা খুবই বিস্ময়কর, খুবই ভাল;—কিন্তু—তা থেকেও বিস্ময়কর ও ভাল হ'ল সম্প্রদায় ও সাধনা। মাত্র সঙ্গীত নয়, জগতের সমস্ত চারুবিদ্যা, স্থপতি-বিদ্যা, পাক-বিদ্যা গড়ে উঠেছে সম্প্রদায়ের রূপে, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। প্রতিভার স্থান হল সম্প্রদায়ের রচিত সৌধের সর্বোচ্চ শিখরে। কিন্তু—সৌধ নির্মাণ করার মাহাত্ম্য হল সম্প্রদায়-প্রবর্তকের, প্রতিভার প্রাপ্য এটা নয়।

আরও মনে হয়—প্রতিভা তার আলো দিয়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, হত-বুদ্ধি করে দেয়। তার ফলে—কিছুকালের জন্য আমরা কিছু কম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পরচনার সৌন্দর্য অনুভব করতে পারিনে, তার মধ্যেও যে মাধুর্য ও শ্রী আছে তার বিচার করতে পারিনে।

এক কথায়—প্রতিভা সমালোচন-বুদ্ধি ও সহৃদয়তা নিরোধ করে। মনকে অতিশয়োক্তির প্রবণ করে; কিন্তু-প্রবীণতার সাহায্য করে না।

সম্প্রদায়-বিদ্যা দৃষ্টিকে শান্ত করে, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা বাড়িয়ে দেয়, বিচারবুদ্ধিকে সংযত করে, প্রত্যেক শিল্পরচনার সত্য মূল্য নির্ধারণ করতে শিক্ষা দেয়, প্রতি

রচনার কোনটি সুন্দর কোনটি অসুন্দর বুঝিয়ে দেয়, হৃদয়কে উদার করে, সহৃদয়তা নামে গুণের উন্মেষ করে।

শিল্প-দৃষ্টি বা শিল্প-দর্শনের দিক দিয়ে সম্প্রদায়-বিদ্যার চেয়ে শ্রেয় আর কিছুই নেই ; আমার এই মত।

অভ্যুদয়-কেশরী মিয়াঁ তানসেন তাঁর প্রতিভার খ্যাতি ও যশ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু খ্যাতি বা যশ দিয়ে সম্প্রদায়-বিদ্যা তৈরী করা যায় না ; গানের প্রতিভা দেখা দিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধি আছে এমনও মনে করা যায় না। মিয়াঁ তানসেন জ্ঞান-বুদ্ধির বলেই ধ্রুবপদ ও আলাপের সম্প্রদায়-বিদ্যা সৃষ্টি করেছিলেন, পরিমার্জিত করেছিলেন, এবং সেই বিদ্যা তাঁর সন্তানদের দান করেছিলেন। কখন কখন সন্তানই শিষ্য হয়, কখনও বা, শিষ্যই সন্তানের স্থান গ্রহণ করে। তানসেন জগৎকে বিদ্যা দান না করে, সন্তানকে বিদ্যা দান করেছিলেন, এমন কথা বললে তানসেনের অপবাদ হয় না। তানসেন সম্প্রদায়-বিদ্যা সৃষ্টি করেছিলেন, প্রবর্তন করেছিলেন, এবং দানও করে গিয়েছিলেন।

দস্তয়েভস্কির শেষ ভালোবাসা

সের্গেই বেলভ

(পূর্বানুস্মৃতি)

কেবল পুষা ও এমিলিয়া ফিয়োদোরভ না—যাদের জন্যে দস্তয়েভস্কি-র নিজের জীবনকে মনে হত একটা জট পাকানো ব্যর্থতার শেকল। জেল খাটা, রোগগ্রস্ততা, নির্বাসন দণ্ডভোগ, ব্যর্থ বিবাহ এ সবই তাঁর কপালের লিখন। তবু আন্না জানতেন যে, ডস্টয়েভস্কির মধ্যে সৃজনী ক্ষমতা একটি দিনের—একটি ঘণ্টার—একটি মিনিটের জন্যও কখনও থেমে থাকে নি। যে সব দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি গেছেন, তা দিয়েই তিনি কিছু না কিছু শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর অর্থ, তিনি তাঁর শৈল্পিক প্রতিভাকে মানুষের প্রতি দায় হিসাবেই মনে করতেন, এবং মনে করতেন, তাঁর প্রতিদিনের অস্তিত্বই সেই দায় পরিপূরণের জন্যে। যখন আন্না চেয়েছিলেন মাত্র ছাব্বিশ দিনের মাথাতেই তিনি 'জুয়ারী' রচনা করতে পারলেন। তখন আন্না বুঝতে পেরেছিলেন, কি দারুণ উৎপাদনী ক্ষমতাই না তিনি ধরেন। যার অনেকটাই তখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

তার পোষ্য আত্মীয়দের চড়তি খাঁই যেমন, হতাশাও তেমনি ছিল আতঙ্কের। প্রধানতঃ এবং বিশেষত তা দস্তয়েভস্কির লেখক হিসাবে যে স্রষ্টার জীবন তা খর্ব করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সেই সময়—১৮৬৬-র ৮ নভেম্বর আন্না তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁকে ভালবাসেন এবং সারা জীবনই তাঁকে ভালবেসেযাবেন—আর ইতিমধ্যে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন তিনি একজন মহান লেখকের স্ত্রী হতে যাচ্ছেন।

এ কথার সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যায় বাগদান পর্বের অল্প কিছুদিন পরে নভেম্বরের এক হিম সন্ধ্যায় তাঁর হবু বধূটির বাড়ীতে যাবার ঘটনায়। একটা হালকা শরৎকালীন ওভার কোট গায়ে দস্তয়েভস্কি এলেন আন্নার বাড়ী। হাড়-অব্দি শীত কামড়ে বসেছে। তিনি থর থর করে কাঁপছিলেন। কয়েক গ্লাস গরম চা আর পাত্র, কয়েক উঁচু জাতের শেরি গিলে তবে তিনি কিছুটা গরম হতে পারলেন। পুষা এবং এমিলিয়া ফিদেরোভনার জরুরী টাকার

প্রয়োজনীয়তাই তাঁকে ঘর থেকে ঠেলে বার করেছে। ওভারকোটটি বন্ধক দিয়ে টাকা তাঁকে জোগাড় করতে হবে।

সহসা তাঁর প্রিয়তমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকলেন, এ হলে তো তাঁকে সর্দিতে আক্রান্ত হয়েই মারা পড়তে হবে। দস্তয়েভস্কি এর ফলে এত বিস্ময়-বিমূঢ় হলেন যে বলে ফেললেন, "এবার আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত যে তুমি আমাকে ভালোবাস। যদি তা না হত, তুমি এভাবে কাঁদতেই পারতে না।"

সেদিন থেকেই আন্না জেনে নিয়েছিলেন যে তাঁকে দস্তয়েভস্কির হয়ে লড়তে হবে, আর সে লড়াই হবে এক শক্ত লড়াই। ফলে, তিনি ঠিক করে ফেললেন যে তাঁদের বিয়ের ব্যাপারটা যত দ্রুত সম্ভব চুকিয়ে ফেলতে হবে। যখন পুষা ও এমিলিয়া দস্তয়েভস্কির নতুন পরিবারের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের খাঁই হয়তো খানিকটা মার্জিত হবে। কিন্তু বার বারই বিয়েটা স্থগিত হতে থাকল, আর তা অর্থাভাবের জন্যেই। দস্তয়েভস্কি ঠিক করলেন তিনি মস্কো যাবেন এবং রুশকি ভেসৎনিকের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁর আগামী উপন্যাস 'নির্বোধ' প্রকাশের জন্যে কিছু আগাম টাকা চাইবেন।

মস্কো থেকে তাঁর প্রিয়তমার কাছে লেখা দুটি চিঠির মধ্যে তাঁর অনন্ত বিশ্বাস আর তাঁদের ভাবী সুখের প্রত্যাশা থর থর করে।"……আমি ভাবি তোমার জন্যে—প্রতি মুহূর্তে তোমার ছবি আঁকি। হ্যাঁ, আন্না, আমি তোমাকে কত না ভালবাসি……অসংখ্য চুম্বন নিও। শুভ নববর্ষ এল আর হল নতুন সুখ-শান্তির নান্দীপাত। হে দেবতা-দূতী, আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো। আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে কাজ করব……সমস্তটাই তোমার—তোমার সততা, বিশ্বাস আর অপরিবর্তনীয় নিষ্ঠার। তুমিই আমার আস্থা—আমার তাবৎ ভবিষ্যতের জন্যে তোমার উপরই যা কিছু ভরসা। দূরে থেকে, তুমিতো জানো, কোনো সুখের মূল্য কতটা, কি……অমূল্য এবং চিরন্তনী বান্ধবী আন্না… আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, আমাদের টাকা জোগাড় হয়েছে এবং যত দ্রুত সম্ভব আমরা বিয়ে করব। তোমাকে কতই না কত ভালবাসি—কত না অন্তহীন ভালবাসা আমার তোমার জন্যে……আমাকে এ-ভাবনা কী সুখই না দেয়…এমন যার বৌ, সেকি সুখী না হয়ে পারে…আমাকে ভালোবাসো, আন্না, আমি তোমাকে সমাপ্তিহীন ভালোবাসায় ভালোবাসব।"

আন্নার সঙ্গে তাঁর বিয়েটাকে দস্তয়েভস্কি তাঁর জীবনের সূত্রপাত বলে মনে করেছেন। ত্রে-ইৎস্কো-ইজমাইলোভ গীর্জায় ১৮৬৭-র ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের

বিয়ের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করাটার মধ্যে বস্তুতই একটা তাৎপর্য নিহিত আছে। এই তারিখটাকে তিনি চিরকাল স্মরণে রেখেছেন, কেননা এই সেই ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪তে এই দিনই তিনি ওম্‌স্ক জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। "মুক্তি, একটা নতুন জীবন—মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান···কী এক গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত! আন্না গ্রিগোরিয়েভনা—এটা একটা নতুন জীবন, এটা একটা গোটা ভবিষ্যৎ—আশা—সুখ—প্রশান্তি।"

বিয়ের সময় আন্না তাঁকে প্রথম পদক্ষেপটি করতে দিয়েছিলেন কার্পেটে। কেননা, রাশিয়ার লোকপ্রথানুযায়ী, যে আগে পদক্ষেপ করবে, সেই হবে পরিবারের সর্বেসর্বা। তিনিই যখন আন্নার জীবনের সমগ্র অর্থ, তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য, তিনি তাঁর অনুগতা না হয়েই বা পারবেন কেন?

দস্তয়েভস্কি খুবই ঝক্‌ঝকে ছিলেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব ও বরযাত্রীদের সঙ্গে আন্নার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, "দেখো কী মনোরমা নারীই না এ! এক আশ্চর্যতমা রমণী এই নারী, এ এক স্বর্ণদীপ্ত হৃদয়ের অধিকারিণী।"

সাহিত্যিকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা ইসায়েভার দশ বছর আগে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই একইরকম অভিজ্ঞতার জ্বালা বিয়ের পর আন্নাকেও পোহাতে হল। উত্তেজনা আর হাজারো ঝঞ্ঝাটের জ্বালায় দস্তয়েভস্কি একই দিনে দুবার মৃগী রোগে আক্রান্ত হলেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আন্না জানান, "আমার বিস্ময়, সে মুহূর্তে আমি এক ফোঁটা ঘাবড়ে যাইনি, যদিও এটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম দেখা মৃগী রোগের আক্রমণ। আমি ফিয়েদোর মিখাইলোভিচের কাঁধ দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলাম একটা সোফার কাছে। কিন্তু যখন দেখলাম, আমার স্বামীর দেহটা বাঁকতে বাঁকতে সোফা থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে, শক্তি সামর্থে দীনা এই আমি কিছুতেই তা ঠেকাতে পারছি না, তখন একধরনের বিভীষিকা অনুভব করলাম।···ফিয়েদোর মিখাইলোভিচকে আমি মেঝের ওপরই শুইয়ে দিতে বাধ্য হলাম। তারপর আমি হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম। যতক্ষণ রোগের আক্রমণ চলছিল, তাঁর মাথাটা আমার কোলের উপরই ছিল ······ধীরে ধীরে আক্রমণের তীব্রতা পড়ে এল, আর ফিয়েদোর মিখাইলোভিচ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন···কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, একঘণ্টা যেতে না যেতে আবার এমন প্রচণ্ডভাবে রোগের আক্রমণ ঘটল যে দু ঘণ্টা বাদে ফিয়োদোর মিখাইলোভিচ তাঁর জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন এবং যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছিলেন।

কী ভয়াবহ রাতই না আমাকে কাটাতে হয়েছে সেদিন। এই প্রথম আমি দেখলাম, কি সাংঘাতিক রোগেই না তিনি ভুগছিলেন। বিরতিহীন এক নাগাড়ে চলেছিল তাঁর কাতরানি। গোঙানি শুনতে শুনতে, তাঁর যন্ত্রণাদীর্ণ, চেনার অসাধ্য বিকৃত মুখাবয়ব ও উন্মাদ বিস্ফারিত চোখের চাউনি দেখতে দেখতে এবং তাঁর দুর্বোধ্য অসংলগ্ন কথা শুনে শুনে আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এলাম যে, আমার প্রিয়—আমার প্রিয়তম স্বামী প্যাগল হয়ে যাচ্ছেন। একটা ভয়াল আতঙ্কই আমার এই চিন্তাকে উস্কে তুলেছিল।"

কিন্তু এই মৃগী রোগের আক্রমণ মারিয়া দিমিত্রিয়েভনাকে বিদ্রোহিনী করেছিল, সম্ভবতঃ তাঁদের বিবাহিত জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার অন্যতম প্রধান কারণ্ হয়ে উঠেছিল। আন্নার বেলাতে কিন্তু অন্যতর প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হল—তিনি এজন্যেই তাঁর প্রিয়তমের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। অর্ধশতক পার করে তিনি সাহিত্যকার এ. ইৎমাইলভের কাছে বলেছেন, "আমাদের দুজনের সেই দিনগুলোর কথা আমার মনে আছে। তা ছিল বিশিষ্ট এবং আমার সে সুখ পাবার যেন যোগ্যতাই ছিল না। তবে কখনো এমন সুখের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্য দিয়ে। ফিয়েদোর মিখাইলোভিচের ভয়াবহ অসুস্থতা আমাদের সে সৌভাগ্যকে প্রতিদিন যে কোন সময় গুঁড়িয়ে দেবার আতঙ্ক ছড়াত······তুমি তো জানো এ রোগ নিরাময়ের কোন উপায় ছিল না। আমি যা করতে পারতাম, তা শুধু তাঁর জামার কলারটা একটু আলগা করে দিতে আর তাঁর মাথাটা দুহাতে ধরে রাখতে। কিন্তু ভাবো তো, একজন, তার প্রিয়তমের মুখ নীল হয়ে যেতে দেখছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঁকড়ে যেতে দেখছে, রক্তনালীগুলোকে ফুলে উঠতে দেখছে এবং জানছে কী উদ্বেগ ও যন্ত্রণা চলছে তাঁর মধ্যে অথচ তাঁর কিছুই করার নেই, সে কী ভয়ঙ্কর কষ্ট! আমার তাঁর নিকটতর প্রিয়তর হতে পারার সুখটুকুর জন্যে এই কষ্টভোগই দক্ষিণা দিতে হয়েছে।"

কিন্তু এই মৃগী রোগ আন্নাকে উদ্বিগ্ন করেনি। তাঁর সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ ছিল দস্তয়েভস্কির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়দের সম্পর্কের ব্যাপারটা। তারা কখনই আন্নার শত্রু ছিল না, তারা বন্ধু হয়েই খুব ভোর থেকে গভীর রাত অব্দি তাঁর চারদিকে ঘিরে থাকত। একটা তিক্ত আক্ষেপে আন্না লক্ষ করলেন তাঁর ও দস্তয়েভস্কির মধ্যে 'জুয়ারী' রচনার সময় যে অমোঘ আত্মিক ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছিল, তা যেন ধীরে ধীরে বাষ্প হয়েই উবে যাচ্ছে।

আন্না বুঝলেন, চরম মুহূর্তটি এসে গেছে যখন দস্তয়েভস্কির সঙ্গে তাঁর বিয়ে,

যা কিনা তাঁর পক্ষে মহতী লেখকের প্রতি মূলত আত্মনিবেদন, এবং তাঁর বেলায় অন্তঃস্বরের নির্দেশ মান্য করা, যা বলেছে, এই সেই নারী যে তাঁর জন্যে সুখতৃপ্তি এনে দেবে, অনুকূল আবহাওয়ায় তা হয়ে উঠবে এক মহত্তম আবেগময় ভালোবাসা অথবা তা প্রতিকূল পরিবেশের চাপে বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে ইতি টানবে।

অবাঞ্ছিতকে এড়ানো গেল, ধন্যবাদ আন্নার শক্তি আর দৃঢ়তাকে। এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর, কেননা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এখনো তিনি নানা বিষয়েই একেবারে শিশুটিই আছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলানোর জন্যে তাঁর পক্ষে যা যা করা সম্ভব তিনি তার সব কিছুই করেছিলেন, যতদূর সম্ভব পারিবারিক ঝুটঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকতে—তাঁদের ক্লান্তিকর এবং সব ব্যাপার নাকগলানেওয়ালা আত্মীয়-স্বজনদের থেকে তফাৎ থাকতে দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা—সবই তিনি করেছিলেন। পিটার্সবার্গের গোলমেলে জীবন থেকে এবং তাঁদের পাওনাদার ও অন্যান্য যারা তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যে সচেষ্ট ছিল—তাদের সবার থেকে একটু দূরে গিয়ে সামান্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার জন্যেই ছিল তাঁর এই দেশভ্রমণের আয়োজন।

নবদম্পতি কিছু নতুন আগাম পাবার জন্যে মস্কোতে কাৎকভের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রুশকি ভেসৎনিকের সম্পাদকমণ্ডলী আরো এক হাজার রুবল দিতে রাজী হলেন নবদম্পতিকে এবং তাঁরা পিটার্সবার্গে ফিরে এলেন। আন্না এতই খুশি হয়েছিলেন যে, মস্কো-এ তিনি তাঁর বোন ভি. এস. ইভানোভার বাড়ীতে এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ এবং সজীব উষ্ণতায় খোশ গল্প করেছিলেন। এতে যে দস্তয়েভস্কি যে কি ভয়ঙ্কর ঈর্ষাতুর ও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তা সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এমন কোন দৃশ্যের অবতারণা হবে না।

দস্তয়েভস্কি কিন্তু তা ভুলে যেতে পারেন নি। তাঁর কাছে এ ঘটনা একটা নবতম অভিজ্ঞতা। অবশ্য কুজনেৎস্ক-এর এক স্কুল মাষ্টার ভারগুনোভের প্রতি একটু আদিখ্যেতা এবং সুসলোভার এক চৌখশ দেখতে স্প্যানিশ ছাত্র সালভাদোর (এবং তার কারণও ছিল) প্রতি ইসায়েভা-র অতি মনোযোগের জন্যে দস্তয়েভস্কি ঈর্ষাতুর হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনই সেই ঈর্ষা প্রকাশ পেতে দেন নি। তবে, আন্নার বেলায়, যদিও তিনি জানতেন, আন্না

সম্পূর্ণভাবেই তাঁর প্রতি নিবেদিতা, তবু তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাঁর ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ছিলেন। লেখক তাঁর অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন, বুঝতে চেয়েছেন সেই কাণ্ডমাণ্ড ঘটানোর কারণ কি? প্রথম দৃষ্টিতে তা একটা আপাত-বিরোধী সত্য বলে মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। পরে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, আন্না হচ্ছেন সেই প্রথম নারী যাঁর সংস্পর্শে তিনি নিজেকে জীবন্ত মানুষ বলে ভাবতে পেরেছেন। এবং সেই সজীব জীবনকেই তিনি অন্য সব মানুষের চেয়ে মূল্যবান বলে মনে করতেন।

কিন্তু ইসায়েভা এবং সুসলোভার বেলায় তিনি কেবল আশ্চর্য হয়েছিলেন, যখন অন্য লোকজনের প্রতি তারা তাদের ভালবাসা থাকার কথা অকপটেই স্বীকার করেছিল। তিনি কোনরকম ঈর্ষাকাতর তো হনইনি বরং তাদের সুযোগ স্বাচ্ছন্দই দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি বস্তুতই বিস্মিত হলেন যখন দেখলেন, তাঁর অবিচার ক্রোধ এবং দাগা দেয়া অভিযোগের উত্তরে আন্না শুধু চোখের জলই ফেলেছিলেন। তিনি তৎক্ষনাৎ বুঝেছিলেন কি হাস্যকরই না তাঁর সন্দিগ্ধতা! যখন দেখলেন আন্না তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এবং ফিরে ফিরে দৃঢ় আশ্বাসে আশ্বস্ত করবার জন্যে নির্ঘুম শয্যায় রাত ভোর করে ফেললেন, তখন তিনি অনুশোচনায়, অনুতাপে জর্জরিত হয়ে গেলেন। এর আগে তাঁরই ছিল সান্ত্বনাদাতার ভূমিকা। কিন্তু শেষঅব্দি আন্নাই তাঁকে যে সান্ত্বনা দিয়ে যেতে লাগলেন এ তাঁকে বিস্মিত করল।

এ ঘটনা কিন্তু আন্নার সুন্দর মেজাজের উপর কালো ছায়া ফেলতে পারে নি। মোদ্দা বিষয়টি হল, কুশকি ভেসৎনিস্কের কাছ থেকে টাকা পাওয়া গেছে, আর তাঁরা তাই নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে পারবেন। মস্কোতে থেকে তিনি আবার গভীরভাবে বুঝলেন, আত্মীয়বর্জিতভাবে দুই কি তিন মাসের জন্য হলেও তাঁদের দুজনের একা থাকাটা দরকার। সেন্ট পিটার্সবার্গ যে বিচ্ছিন্নতা ঘনিয়ে তুলেছিল, তা সম্পূর্ণই মুছে গেল এবং মস্কোর হোটেল ডুসসোতেই ঘটল তাঁদের প্রকৃত মধুযামিনী যাপন। আন্না পরে যখন সেই দুর্ঘটনাকে স্মরণে আনতেন, ভাবতেন, দস্তয়েভস্কি তাঁকে কতখানি ভালবাসেন, সেটাই হয়েছিল তার চূড়ান্ত প্রমাণ।

যা হোক, তাঁদের এই বিদেশ ভ্রমণে পিটার্সবার্গের আত্মীয়রা মরীয়া বাধার সৃষ্টি করল। তাদের কথা, যদি তাঁদের এই রকম যাওয়া ঠিকই হয় (যা হওয়া উচিৎই নয়) তবে বেশ কয়েক মাস তাদের খাওয়া-পরার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে রাহা খরচ দিয়ে যেতে হবে। একথার অর্থ, এর সঙ্গে ইপোখা (যুগান্তর)

পত্রিকার পাওনাদারদেরও ধরতে হবে। এর ফলে পর্যটনের ব্যাপারে নবদম্পতির ৪০০ রুবলের মত ঘাটতি হয়ে যায়।

বিদেশ যাত্রার এই সংকটজনক মুহূর্তে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং দূর পরিচিতদের চমক লাগানো প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে আন্না যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রায় সকলকেই এমনকি তাঁর স্বামীকেও বিস্ময়-বিহ্বল করে তুলেছিল। তিনি কখনো কল্পনায়ও আনতে পারেন নি যে তাঁর আন্না এমন দৃঢ় সংকল্পে অটল পদক্ষেপ নেবার অধিকারিণী। আন্না ঠিক করলেন, তাঁর কৌতুকের যাবতীয় আসবাব পত্র, রুপা, পোশাক-আশাক বন্ধক দেবেন এবং তাই নিয়ে ১৮৬৭-র ১৪ই এপ্রিল বিদেশে পাড়ি জমাবেন এবং আন্না সেটাই করেছিলেন।

"আমি চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু চলে গিয়েছিলাম মরমে মরে গিয়েই। বিদেশ ভ্রমণে আমার যেন মেজাজ ছিল না।" পরে একসময় দস্তয়েভস্কি তাঁর ভারাক্রান্ত অনুভাবনা প্রকাশ করেছিলেন এ্যাপোলেন মাইকভের কাছে, "একা···এক যৌবনবতী জীবের সঙ্গে, যে কিনা সাদাসিধে নাচগান মত্ততায় আমার যাত্রা সঙ্গী—ভ্রমণ-সুখের সঙ্গী; কিন্তু আমি দেখছি এই সরল যুবতীর অনভিজ্ঞতা এবং প্রাথমিক উদ্দীপনা আমাকে করে তুলেছে খুবই উদ্বিগ্ন আর নিদারুণ পীড়িত।···আমি একজন বিষণ্ণ মানুষ। আমাকে হয়তো দেখতে হবে যে, আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে সেও নিঃশেষে হারিয়ে ফেলবে তার দীপ্তি।"

বিদেশে থাকতে আন্না সঙ্গে একটা ডায়েরি রেখেছিলেন, যাতে তিনি টুকে রেখেছিলেন তাঁর ইউরোপবাসকালীন অভিজ্ঞতা-মালা, প্রতিদিনকার ধারাবাহিক ছোট-বড়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার বিবরণ। এসব দেখে যে কেউ অনুভব করতে পারেন, স্বামী স্ত্রী কেমন ক'রে ধীরে ধীরে নিকট থেকে নিকটতর হয়েছেন এবং ভঙ্গুর মেধাগত সংযুক্তি কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে আন্তরিক এবং নিগূঢ় ভালবাসায়। (আন্না তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভালবাসার স্বাদই পেয়েছেন। মহত্তম সাহিত্যিকের জীবনের এই সব নগন্য ঘটনাধারার বিবৃতি থেকে প্রমাণিত হয়, দৈনন্দিন তুচ্ছ অতি সহজলভ্য গুরুত্বহীন সাংসারিকতা—নিত্য দিনের উপার্জনকে তিনি কিভাবে শিল্প সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

আন্না আর একবার বুঝলেন দস্তয়েভস্কির বৌ কেবল আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেবার জন্যই নন, তিনি তাঁর মহতী প্রতিভার চিন্তা-দুশ্চিন্তার অন্তরঙ্গ

অবিচ্ছেদ্য অংশীদারও। দস্তয়েভস্কির প্রতিভার দৃশ্যময় কাঁচের তলাতেই ছিল সেসব প্রাত্যহিক জীবনযাপনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ, মৌলিক এবং সুপ্রচুর উপাদানের সুষম সংগঠন, যা তাঁকে দস্তয়েভস্কি করে তুলেছিল। সেই জন্যেই, যদি বা নিষ্ঠুর বাস্তবের ছিটেফোঁটা ছোঁয়া কোথাও লাগত, তা তাঁর অবক্ষয়িত রক্তে ঝনঝন করে বেজে না উঠে পারত না।

দস্তয়েভস্কির সঙ্গে দিনকেদিন তাল মেলাতে গিয়ে সত্যিকারের বীরাঙ্গনাই হতে হয়েছে আন্নাকে। যদিও সমস্ত রকম ঝগড়াঝাটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি সাধ্যমত যতটা যা করার করতেন তবু সব সময় পেরে উঠতেন না। কিন্তু এজন্যে তিনি কখনো কোনো অভিযোগ তোলেননি। তিনি জানতেন, দস্তয়েভস্কি একান্ত ভাবেই তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তাঁকে ভালবাসেন আন্তরিক ভাবেই। তাই ঝড়ঝাপটা সহজেই কেটে যেত, এবং দস্তয়েভস্কি হয়ে উঠতেন আরো স্নেহশীল এবং মনোযোগী, যা তিনি কখনোই ছিলেন না ইসায়েভা কি সুসলোভা-র বেলায়।

আন্নার ডায়েরি থেকে জানতে পারা যায়, "ফ্রিয়েদোর আমার উপর এমন সাংঘাতিক চটে গেলেন···যে আমি রাগে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকলাম।" অথবা আন্না জানান, "তিনি রেগে গেলেন আর আমার উপর গর্জন করতে শুরু করলেন।" আবার এও আছে তাঁর ডায়েরিতে, "তিনি সহসা গরগর করে উঠলেন – আমার খেয়ালিপনায় তাঁর জীবনটাকেই আমি মাটি করে দিচ্ছি।" কিন্তু এসব মুহূর্তে আন্নার যখন ধৈর্য্যের বাঁধ ছুটে যেত, তিনি বড় জোর লিখেছেন : তাঁর স্বামী 'বড় স্পর্শকাতর' কিম্বা 'বড়ই অধীর।' প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি লিখেছেন, "আমার নিজের ওপরই রাগ হয়, আমিইতো এই অযথা ঝগড়াঝাটির কারণ তৈরি করেছি। আমার এমন অনবদ্য স্বামী এবং যিনি আমাকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসেন, আমি কিনা তাঁকেই সারাক্ষণ চটিয়ে মটিয়ে দিচ্ছি।"

দস্তয়েভস্কির মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখার জন্যে আন্না তাঁর আত্মসম্মান এবং দুঃখ-বেদনার কথা মনেই রাখতেন না। "কী যে সুখী আমি, কী আশ্চর্য করুণাঘনই না আমার স্বামী, আর আমি তাঁকে কতইনা ভালবাসি।" ১৮৬৭-র ডায়েরীতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর এই কথাগুলো—এ লেখা তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতা থেকেই যে উৎসারিত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেননা দস্তয়েভস্কি সবসময়ই তাঁর কর্মবিধি মেনে থেকে গেছেন। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে, তাঁর এই আকছাড় চটে ওঠা, এমনকি তাঁর মৃগী রোগও

আমাকে খুব একটা ভয় পাইয়ে দিতে পারেনি। তিনি বুঝেই নিয়েছিলেন তাঁর প্রতিভার জন্য এগুলো সহ্য করতেই হবে—এ ত্যাগ স্বীকার তাঁকে করতে হবেই), তাঁকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল দস্তয়েভস্কির জুয়ো খেলার (রাউলেট) প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ।

দারিদ্র্যের ধাক্কা সামলাতে দস্তয়েভস্কি জুয়া খেলাটাকে ভাগ্য জয়ের উপায় হিসাবে তাক করেছিলেন। সারা জীবনই তাঁকে অবশ্য অর্থ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এমন কোন চিঠিপত্রই সম্ভবতঃ তাঁর পাওয়া যাবে না, যে চিঠিতে তিনি কাউকে না কাউকে টাকাকড়ির কথা লিখেছেন। টাকা জোটানোর জন্যে হয় তিনি ধার চেয়েছেন, না হয় ধার শোধ করার জন্যে টাকার দরকারের কথা বলেছেন। ঠিক একই কারণে তিনি আজগুবি, প্রায় সব ক্ষেত্রেই অসম্ভব অবাস্তব সব পরিকল্পনা ফাঁদছেন। এরকম পরিকল্পনাও তাঁর অজস্র। এসবের তাৎপর্য একটাই, দস্তয়েভস্কির সবসময়ই অজুহাত ছিল যে তিনি যদি 'খুব দুরবস্থায়' না থাকতেন, তবে তাঁকে জুয়ো খেলতেই হত না।

পাওনাদারদের দাবি মেটাতে বছর কয়েক অভাব অনটনের জ্বালা যন্ত্রণা না পুইয়ে টিঁকে থাকতে কিম্বা তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটলে ছেলেপুলেরা যাতে না মরে যায় তার জন্য কিম্বা চূড়ান্ত কথা, তিনি যাতে স্বস্থমত লেখা লেখির কাজ চালিয়ে যেতে পারেন—এবং তাঁকে শুনতে না হয় দেনার দায়ে হাজতে পাঠানোর শাসানি, ক্রোক হয়ে না যায় তাঁর বিষয়সম্পত্তি, সেজন্যে সব সময় দস্তয়েভস্কির মনে প্রচুর টাকা কড়ি পাবার একটা দুশ্চিন্তা শিকড় গেড়ে বসেছিল।

দস্তয়েভস্কি তাঁর জুয়োর নেশা সম্পর্কে বলেছেন, এটা তাঁর একটা প্রকৃতিগত চাহিদা'। খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি এই নেশা ধীরে ধীরে পড়ে এসেছিল—ইতি-ও টেনেছিল। টাকাকড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নেহাতই একটা ছুতো বিশেষে এবং গৌণ বিষয়। জুয়োর জ্বর, যা ছিল তাঁর মিঠে উত্তেজনা পোহানোর জন্যই—এ তাঁর প্রকৃতিরই অংশ বিশেষ—এ সেই লেখকেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যিনি জীবনের অতল স্পর্শ গভীরতাতেই তল্লাস চালাতে ভালবাসেন।

(ক্রমশঃ)

সত্য গুহ

সাবিত্রী রায়—রচনায় ও জীবনচর্যায়

অরুণা হালদার

সাবিত্রী রায়ের সাহিত্য-তপস্যা একদিকে তার নির্জনতার প্রসূন আর অপরদিকে তা সুপরিণত ফলও। পথ চলতি ঘাসের ফুল তাকে বলা চলবে না। একদিকে এ নীরব অনুভূতি ফুলের মত ফুটে উঠেছে, অন্তরের সূর্যালোক আর অপরদিকে সেই সূর্যালোকে প্রাণদীপিত হয়েছে বহু মানুষের, বহু বনস্পতির, বহু তৃণের বহু অরণ্যের। এত সব চরিত্র-চিত্রণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি নিজেকে এতজনের মধ্যে দেখতে পান আবার এতগুলি চরিত্র তাঁর চরিত্র থেকে প্রাণ আহরণ করে তবে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ তপশ্চর্য্যার মধ্যে ক্রমশ: একটা আত্মোত্তরণ বা অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করি—তার রচনা ক্রমশঃই পরিণত থেকে সুপরিণত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের একটি প্রথা আছে যে আমরা সততই মৃতকে দেবতা বানাই ও জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। এই নঞর্থক ভাবনা ও চেষ্টা আমাদের ব্যক্তি জীবনের সংস্কার ও জাতীয় জীবনের নিয়তি। ইয়োরোপীয় জীবনবাদের সঙ্গে এইখানেই তার বিরোধ। ত্যাগ-তপস্যার নামে এক প্রকার রুচিহীন যে দুঃখদায়ক পরিস্থিতি আমরা জীবনে ডেকে আনি তাকে সত্য শিব সুন্দর এসব নাম দেওয়া যায় না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের সাহিত্যেও এবমপ্রকার অশিব অসুন্দর অসত্যের করাল ছায়াপাতন অবশ্যম্ভাবী। মাত্র একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেটি রবীন্দ্রনাথ। আর এই মহাসূর্যের আশেপাশে অমন দুই চারিটি যে তারকা লক্ষিত হয় তা সহসা আমাদের চোখেও পড়ে না। চোখে না পড়া সেই অবহেলিত তারা কয়েকটির মধ্যে আমরা সাবিত্রী রায়ের রচনাকে ফেলতে পারি। তাঁর রচনা নিশ্চয়ই বেশী লোকে পড়েননি বা তাঁর জীবিত কালের প্রাপ্য সম্মান তাঁকে দেননি। আমার আশা চিরাচরিত প্রথামত হয়ত এখন তাঁর লেখা পুনর্পঠিত হবে এবার এতদিনে। অবশ্য এও সত্য সাবিত্রী রায় বেশী লেখেননি। তাঁর অন্বিষ্ট ছিল সততা। সেই মূলধনে যে বাণিজ্যিক সফলতার হাত পৌছয়নি এটা আমাদেরই সৌভাগ্য। প্রথম থেকে শেষ অবধি সেই বিশিষ্ট মূলধন তাঁর অটুট থেকে গিয়েছে।

সাবিত্রী রায়ের প্রথম দিকে কয়েকটি ছোট গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও তদুত্তর সময়ে বার হয়ে থাকবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস সৃজনের সুষ্ঠু সমালোচনা তৎকালীন আরও একজন সৎসাহিত্যিক ও সাহিত্যিক-সুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় করেছিলেন। ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কঠিন পরিস্থিতি এবং মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ যন্ত্রণা ও জীবননাশের চিত্র তাঁকে কলম ধরায়। মানুষ শান্তিতে বাঁচতে চায়, তার স্বল্পদিনের জীবনে সে পরিশ্রম করে অন্ন অর্জন করে প্রিয়জনের সঙ্গে তা ভোগ করে তুষ্ট হতে চায়। মানুষের এই চাওয়ার পথে বাধা প্রবল আর সেই বাধাও লুব্ধ মানুষের সৃষ্টি। এও সৃষ্টি—নাকি সৃষ্টির বীভৎসা কিন্তু অতি কঠিন সত্য। এক কথায় তাঁর রচনা ধীরে ধীরে সময়ের দলিল হয়ে ওঠে। তবু কিন্তু তা সাহিত্যই। এই চেতনার দুঃস্বপ্নও যাঁদের লেখার প্রেরণা দেয় তাঁদের মহৎ সাহিত্যিকের শ্রেণীতে ফেলতেই হয়। অনুরূপ সময়ের দলিল রয়েছে গোপাল হালদারের রচনা 'ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ' ও ঊনপঞ্চাশী-উপন্যাসগুলির মধ্যে। যুদ্ধ, যুদ্ধের মুনাফা ও যুদ্ধের মধ্যে দেশপ্রেমিক বিদেশী যুবকের বেদনাময় আত্মদানের বেদনা করুণ নির্মম চিত্র সেখানে মিলবে। প্রসঙ্গতঃ জানাই, এসব গ্রন্থও বহুপঠিত নয়। সকলের তৃষ্ণা একজাতীয় নয়—পাঠকেরও শ্রেণীভেদ আছে। তাঁদেরও তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার জল ভিন্ন। অথবা "গাঙ্গং বারি মনোহারী" সতত হয় না একথার তাৎপর্যও বোঝা দরকার। আমরা কজন মণীষী রঁম্যা রঁল্যার রচনা সত্যই উপভোগ করি একথা বিচার্য। সাহিত্যেও তাই শ্রেণী-ভেদের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারভেদও মানতে হয়। সেই 'শ্রেণী' চেতনা নিয়েই সাবিত্রী রায়ের রচনা বিশিষ্টতা এবং বস্তুতঃ তা পাঠের ক্ষেত্রেও অধিকারী ভেদ স্বীকার করতে হবে।

সাবিত্রী রায় আকৈশোর-যৌবন কোনও না কোনও রাজনীতি আন্দোলনের সঙ্গে অন্ততঃ মননের দিক থেকে জড়িত। যাঁদের স্বামীরা সক্রিয় রাজনীতি করেন সেসকল মানুষদের স্ত্রীরাও কোনও না কোনও ভাবে রাজনীতির কবলে এসে পড়েনই। কেউ হয়ত সক্রিয় আন্দোলন করেন। কেউ হয়ত সক্রিয় চিন্তায় ব্যক্তিগত সমস্যা-ভাবনার পাশাপাশি আরও সমজাতীয় মানুষের ব্যথা বেদনা সংগ্রামকে উপলব্ধি করেন। সাবিত্রী রায় এই দ্বিতীয় জাতে চেতনাময়ী। ঐ চেতনা তাঁকে সৃজনশীলা করেছে—সমৃদ্ধ করেছে। যে পটভূমি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু তা অতি কঠিন বিষয়। তাঁকে বিবাহোত্তর জীবনে ঘরে-বাইরে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তবেই

কলম ধরতে হয়েছে। তাঁর কলমধরা আবশ্যিক ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এও তিনি উপলব্ধি করেন যে এই সৃজনের পথই তাঁর পথ। এরপর থেকে তাঁর জীবন ও রচনা ভিন্ন খাতে হয়নি—রচনা ও জীবন রচনা একত্রিত অনুরাগে প্রসারিত হয়ে চলেছে সদর্থক শুভবোধ দিয়ে। এই কারণেই সাবিত্রী রায়ের রচনা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা। তাতে আছে তৎকালীন সময়—অতীতের হিল্লোলিত দোলা এবং তৎসহ ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় স্বপ্ন। অথচ লক্ষ্য করার মত যে এ রচনা সত্যই রসোত্তীর্ণতায় সাহিত্য হয়ে উঠেছে। রাজনীতির কঠোরতা তার গতিকে কোথাও ভারাক্রান্ত করেনি। সময়ের অনুরূপ চেতনা গতিময়ী। সে গতি উপলব্যাথিত গতি। সেই বাধাও সত্য এবং গতিও সত্য। সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে এসে দাঁড়ায় মানুষ—অসংখ্য মানুষ ও অসংখ্য চেনামানুষ। পথচলা মানুষের মত তিনিও তাদের সঙ্গে পথ চলেন—চলতে চলতেই সম্পর্ক গড়েন, চলতে চলতেই তা কেটে যায়। চলার পথেই কেউ স্নিগ্ধ আতিথ্যে তাঁকে তৃপ্ত করেন। তিনি তা গ্রহণ করেন। কোথাও অনাবৃত আঘাত তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে। চলতে চলতেই তিনি আত্মরক্ষা করেন। শুধু জীবধর্ম নয় জীবনধর্ম তাঁকে চালনা করে। বলতে গেলে অতি সম্বেদনশীল ও স্নিগ্ধমধুর প্রকৃতির মানুষ সাবিত্রী রায় ক্ষণে ক্ষণেই বাস্তবের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হন। এ তাঁর প্রকৃতি—এ তাঁর নিয়তি। কিন্তু তাঁর রচনা অতিরঞ্জন নয়; মানুষের আত্যন্তিক শুভবোধের প্রতি বিশ্বাস তিনি হারাননি—না তাঁর জীবনে না তাঁর রচনায়। পূর্বেই বলেছি তাঁর রচনা ও তাঁর জীবন এক অবিচ্ছেদ্য সামগ্রিক সূত্রে বাঁধা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে (১৯৩৮?) তাঁর বিবাহ হয়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তিনি কঠিন রোগে পড়েন। তখনকার দিনে সে রোগ সেরে যাওয়া ও সে রোগের চিকিৎসা কঠিন ছিল। বস্তুতঃ যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগে শরীরসহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত মনও আক্রান্ত হয়। দীর্ঘস্থায়ী রোগে মনন ও চেতনা হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়। তখন রোগীকে একটা দুঃসাধ্য চেষ্টায় সতত ব্যাপৃত থাকতে হয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা স্বীকৃত সত্যও। মানুষের যখন শরীর চলে না অথচ মৃত্যু হয় না বলে তাকে চালাতে হয়—তখন মনই আমাদের সেই সঞ্চালকের কাজ করে। মনই তখন সংগ্রামের সহায়ক ও ভরসা। এই সত্যটা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের জানার কথা নয়। সেই

প্রাণপণ জীবনসংগ্রামই রোগীকে আরোগ্য দেয়। ঔষধ ও সেবা সহায়তা করে মাত্র। প্রসঙ্গতঃ ব্যক্তিগত কথা হলেও এখানে জানাই এক চিকিৎসকের মত। কঠিন কঠিন অস্ত্রোপচারের সময় যেসব রোগী বা রোগিণী দুর্বল চিত্ত হন, কান্নাকাটি করেন, স্নায়বিক অবসাদে বিষণ্ণ হন, তাঁদের সারতে দেরী হয়। যে রোগী যত প্রসন্ন চিত্তে সহজ ভাবে রোগকে ও চিকিৎসাকে গ্রহণ করেন তিনি তত শীঘ্রই সেরে ওঠেন। সহজ ভাষায় একেই মনের জোর বলা হয়—বলতে দ্বিধা নেই 'ত্রিস্রোতা'-য় রোগিণীর মনের জোর ছিল। সে রোগিণী অবলীলা ক্রমে নিজের রোগের কথা বলেন এক পরিচিত সুহৃদকে। সে সুহৃদ হৃদয়কে তিনি জীবনে স্বীকৃতি দেন। সে স্বীকৃতি মালিন্যহীন সত্য অথচ শুভ। মানুষের মন পাথর নয়, একটি স্থানে তা ধ্রুবপদের প্রেমে বাঁধা থাকলেও সৌহার্দ্য ও বিশ্বস্ত অনুভূতির আকস্মিকতা অনস্বীকার্য্য সত্য। কারণ জীবন সেইরকমই। কিন্তু জীবনের সামগ্রিক আয়োজন, করুণ কঠিন সংযমবন্ধন, মানুষের সমাজ ও আত্মস্থগিত সমাজবোধ ও শুভাশুভের বোধও কিন্তু তেমনই সত্য। এই মাত্রাবোধই সুষমা ও সৌন্দর্য্যের জনক। 'ত্রিস্রোতা'-র নাম; নায়িকা, নায়ক-উপনায়ক, তাদের ব্রত, শান্ততিতিক্ষা বৌদ্ধশাস্ত্রের মৈত্রী ও করুণার কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। আরও আছে 'মুদিতা' বা প্রসন্নতা এবং উপেক্ষা বা স্থানবিশেষে প্রয়োজন উদাসীনতা তথা দূরত্বও। জীবনের অতীব গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে নবজীবনে লেখিকা উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর রোগ মুক্তি ঘটেছে চিকিৎসায়—কন্যার মমতাবন্ধনে, পতির সন্নিকট পরিচর্য্যায় এবং সুহৃদ সৌখ্যের সৌহার্দ্যেও। 'ত্রিস্রোতা'-র এইই হল মূলসুর। এই স্থায়ী সুরের আশে পাশে এসেছে অনেক মালিন্য। মধ্যবিত্ত মনোভাবের ফলে যে বিত্তশালী সংসারেও ঈর্ষা-দ্বেষ, ক্ষমতার লড়াই, অসহায়কে নির্যাতন, বধূপীড়ন, নীরন্ধ্র বিভীষিকা, নীচতার উদ্ভব হয় 'ত্রিস্রোতা', 'মালশ্রী', 'মেঘনা পদ্মা' ও 'পাকা ধানের গান' সব কটি উপন্যাসেই তা বর্তমান। কিন্তু, যেমন আছে এগুলির তীব্রতা ও তিক্ততা, তেমনই আছে সেগুলির সঙ্গে আপ্রাণ লড়াই চালানোর একটা আপোষহীন সংগ্রাম-প্রস্তুতি। এই চিত্র দেখানো অতীব কঠিন।

কিন্তু সাবিত্রী রায়ের লেখায় নৈরাজ্যবাদও নেই নৈরাশ্যবাদও নয়। এই অসংখ্য দৈন্য ও তুচ্ছতা তাঁর চোখ এড়ায় না। গৃহবধূর অসম্মান-লাঞ্ছনা তিনি অনাবৃত নারীদেহে দেখতে পান। বুঝিবা বৌদ্ধিক ও আত্মিক চেতনায় তা তাঁর শরীরে ও মনের ক্লেশে ফুটে ওঠে। কিন্তু তিনি জানেন যে জীবন

অজেয় অপরিমেয়। সেই অজেয় অপরিমেয় জীবন সূক্ষ্ম বোধি ও আত্মিক উপলব্ধির বরাভয়ে তাঁর সৃষ্ট নায়িকারা সব বাধা পার হয়ে যায়. রচনা করে নবনীড় নবজীবনের সিম্ফনি সঙ্গীত। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি শ্রদ্ধেয়া আশাপূর্ণা দেবীর কথা। কিম্বা 'নবাঙ্কুর'-এর লেখিকা সুলেখা সান্যালের। আশাপূর্ণা দেবীর ফসল সুপরিণত হয়ে ডালা উপচিয়ে পড়ছে। তাঁর রচনার অনবদ্য তীক্ষ্ণতায় নারী ও নারীর সংসার-সমাজকে বাস্তবের ক্ষুরধারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত করে তুলেছে। সেও অমেয় অজেয় ক্ষমতা নিশ্চয়ই। তবুও মনে হয় বর্তমান সমাজজীবনে নারীর দৈন্য বা তজ্জাতীয় অনুভূতি যেন একটু বেশী স্পষ্ট। তাতো অসত্যও নয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি, 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' এই তিনটি সাগাজাতীয় উপন্যাসেও সেই স্থায়ী সুর কানে ও প্রাণে বাজে। মনে হয়, সে তীক্ষ্ণতা মাঝে মাঝে মাত্রা ছাপিয়ে বাজে। লেখা বুঝি লেখা নয় চিত্র বা ফোটোচিত্র। অবশ্যই আমার এ মত খণ্ডনযোগ্য ও বিবাদাস্পদ। কিন্তু, সাবিত্রী রায়ের লেখার মধ্যে থাকে একটা দুরধিগম্য মাত্রা। এটাই তাঁর রচনাকে ক্লাশিক সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। এই মাত্রা বাঁচায় তাঁকে, তাঁর রচনাকে ও তাঁর পাঠককে। কাছাকাছি ভিন্ন জাতের আরও এক আধুনিক লেখিকাকে কেমন যেন সমগোত্রীয় মনে হয়। তিনি কবিতা সিংহ। তাঁর উপন্যাসেও মানবীয় জীবনালেখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেতনায় দ্বন্দ্বঘাতে সমকীর্ণ এবং আশ্চর্য বেদনা করুণ অশ্রুজলে রসামৃত রিক্ত। (দ্রষ্টব্য সদৃশ—সারস্বত শারদীয় ১৯৮৫)। তবে কবিতা সিংহের রচনায় সাহিত্যের বাস্তবভূমি অতি কঠিন ও অস্খলিত। সাবিত্রী রায়ের রচনায় একটা অতি অসম্ভব স্বপ্নাভিসারীর অভিযানের অসম্ভব দিশা পাওয়া যায়। এটাকেই vision বলে। প্রকৃতপক্ষে vision ছাড়া কোনও mission গ্রহণ করা যায় কিনা সন্দেহ। এই পরাদৃষ্টি বলতে আমি কোনও অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক বীক্ষণের কথা বলিনি। যাঁরাই 'জাঁ ক্রিস্তোফ' কিম্বা 'গ্রেট হাঙ্গার' পড়েছেন তাঁরা আমার একথার সারবত্তা উপলব্ধি করবেন। রঁম্যা রঁল্যা মনীষী শুধু নন—তাঁর ধ্যানদৃষ্টিও ছিল—এই ধ্যানদৃষ্টি ছিল যোহান বয়ারের। তাঁর 'গ্রেট হাঙ্গার' কিম্বা রঁল্যার 'জাঁ ক্রিস্তোফ' এখন কতজন পড়েন তা জানিনা। আমাদের অনতিক্রান্ত কৈশোর যৌবনে, ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমরা এই ধ্যানদৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারিনি। তাকে রোমান্টিকতা বা মিষ্টিকতা বলা ভুল হবে। কিন্তু সেই উপলব্ধির আস্বাদ দেহমনকে অন্য কোনও রাজ্যে নিয়ে যেত। সেখান থেকে ফিরে এসে বাস্তবতাকে সহ্য করা শুধু নয় পুনর্নির্মাণ করার একটা সফল-অসফল প্রেরণাও

জাগত। সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' এবং 'মেঘনা পদ্মা'য় এই ধ্যানদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন ও প্রকট উভয়ভাবেই পরিপ্লাবিত। প্রকৃতি প্রেম-গৃহ-পরিবারের দাম্পত্য প্রেম, শিশুর কলহাস্য, বিপ্রলব্ধা নারীর সকরুণতা, ছিন্ন জীবন গেঁথে তোলা, দুরূহ উপচর্যার মধ্য দিয়ে আসা একঝলক আলো, প্রেমের বিস্তার বিশ্বপ্রেম, সৌন্দর্যশিলা ছড়িয়ে থাকা গৃহজীবনের প্রতি কর্মে ও প্রতি উপাচার এর প্রত্যেকটিই আমাদের মনে করিয়ে দেয়—

"প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমারি অসীম অমৃত পড়িছে ঝরিয়া"

সাবিত্রী রায় নিপুণ শিল্পী। তাঁর হাতে এই অমৃত নিস্যন্দী সুর ঝরেছিল এটা আমাদের কাছে বিস্ময় ও গৌরবের বিষয়। হলাহল পরিণত হয়েছিল জীবনানন্দের অমৃতে। তবু মনে না হয়ে পারে না যে এই নেপথ্যচারিণী শান্ত, সহিষ্ণু নারী, নিতান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে, গৃহকার্যের ফাঁকে ফাঁকে এই আশ্চর্য অমৃতমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বাহিরের বক্তৃতা, পতাকা-ফেষ্টুনের সমারোহ, অবরোধ-প্রতিরোধ-বিরোধ এসবই হয়ত স্ব স্ব মূল্যে মূল্যবান। কিন্তু আন্তপ্রকৃতিসহ বহিপ্রকৃতির একটি সুসামঞ্জস সুষমা যে মানুষ গড়ার কাজে বেশী লাগে। আজকের কলকোলাহলেও যিনি এ বাণী দুঃসাহসের সঙ্গে লালন করে যান তিনি সত্যই নমস্য।

অনেকে উপন্যাস হিসাবে 'মালশ্রী'র প্রশংসা করেন—কেউবা বলেন 'মেঘনা পদ্মা' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'মেঘনা পদ্মা' ও 'পাকা ধানের গান'-এর মধ্যে একই চরিত্রের কিছু কিছু আনাগোনা আগে। সে হিসাবে এই ট্রিয়োলজি 'মেঘনা পদ্মা' শুদ্ধ একটি বড় মাপের গ্রন্থ। অথচ প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'মালশ্রী' উপন্যাস সুগঠিত ছোট পরিধির। পূর্ববর্তী 'ত্রিস্রোতা' উপন্যাসে যা প্রকট হয়নি সেই অসম্পূর্ণ ট্রাজেডি 'মালশ্রী'তে স্পষ্ট। বস্তুতঃ এমন কঠিন কোমল হাতে এমন নির্মম অথচ পরিচ্ছন্ন অস্ত্রোপচারের মত করে অন্য কেহ এরূপ ট্রাজেডি নিয়ে কাজ ইতোপূর্বে করেন নি। লেখিকা অসমসাহসিকা। সাম্য তো একা একা নয়—স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ করে কারাবাসের পর দলে দলে মুক্তিসংগ্রামীরা তখন কমিউনিস্ট হয়েছেন। ১৯৪৭-৪৮ এ সে পার্টি নিষিদ্ধ হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইতোপূর্বে কারাগারে, দ্বীপান্তরে লাল রাশিয়ার 'মুক্তিসংগ্রাম সংক্রান্ত' প্রচুর বই সরবরাহ করেছেন তাঁদের।

শাসকের ধারণা ছিল, এই নবসংগ্রামীরা তা পড়ে অবসর বিনোদন করবেন কিন্তু নবীন সংগঠনের স্বপ্ন দেখবেন না। তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণ হল যুদ্ধারম্ভে নয়—যুদ্ধশেষে। এই সময়কার টালমাটালে বহু কমিউনিস্ট কর্মী তখন কারাবরুদ্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকের ঘর ভাঙে। ফিরে এসে তাঁরা দাম্পত্য জীবনে চোট খেয়েছেন। এই সমস্যা চিরন্তন। একে তো আর প্রলিটারিয়েট সমস্যা বলে পাশ কাটানো চলে না। অনেকের সন্তানসন্ততিও ছিল। যাঁদের দাম্পত্য নীড় ঝড়ে ভেঙে যায়নি তাঁদের নানা সমস্যা সামনে এল। অর্থাৎ আদর্শবাদকে বাস্তবে রূপ দেবার সমস্যা। এ সময় বহু নারী কর্মক্ষেত্রে সুযোগ্য সহধর্মিনীর পরিচয় নিয়ে সামনে এসেছেন ; আবার অনেক না হলেও কিছু সংখ্যক পিছু হটেছেন। দাম্পত্য জীবনের দুর্গে দু একটি শিশুমুখের হাসির ফুল দরকার। বহু নারী নিজেদের এই দিকটা নিজ হাতে স্বামীর আদর্শের জন্য খণ্ডিত করেছেন। বহুজনকেই শিশুর আগমন সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনাশ করতে হয়েছে।

সুলেখা সান্যালের রচনায় কিছু কিছু এ সত্যের চিত্র মিলবে। কারণটা আর্থিক ও পারমার্থিক দুইই। সেদিনের সেই নিরুদ্ধ ক্রন্দনের স্পন্দন মুছে যাওয়ার পর আজকের দিনের আইনসঙ্গত গর্ভপাতের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক শুচিতার মাত্রা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে দেখলে দুঃখ জাগে। সেদিনের কথা আলাদা ছিল। এইরূপ অগ্নিগর্ভ একপ্রকার পরিস্থিতির মধ্যেও 'মালশ্রী'র রাখী সুস্থির। সে প্রেমিকা, জননী। প্রতি নারীই মা হয়ে স্বামীর কাছে একটি মর্যাদা স্বাভাবিকভাবে পায়। রাখী তা পায় নি। তার সমস্যা সঙ্কুল স্বামীর কাছে এই সন্তান অবাঞ্ছিত। পত্নীর প্রতি সে বিরক্ত। আমার মনে হয় যে কোনও ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীর কাছে এই একটি ঘটনাই সংসার ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বাভিমান এক নয়। রাখীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব সাম্যের প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমানের খর্বতাকে মমতায় প্রেমে ক্ষমা করতে পারে। নরনারীর জীবনের এই ভয়ঙ্কর সত্যকে 'মালশ্রী'-তে আমরা সম্মুখীন দেখতে পাই। কিন্তু জীবন বহমান সে এগিয়ে যায় সব কিছু নিয়ে। নদীপ্রবাহের স্বচ্ছতায় ধূলিজঞ্জাল থিতিয়ে যায়। রাজনীতি ও জীবনবোধ এক মহাঅস্তিত্বে সংশ্লেষিত হয়ে ওঠে।

'পাকা ধানের গান' পাকাহাতের কাজও। তিনখণ্ডের এই উপন্যাসের বিস্তৃতি বিশাল। তার সঙ্গে 'মেঘনা পদ্মা' যুক্ত করলে একেবারে প্রথমদিকের ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিপ্লবী দল থেকে শেষে ক্রমোত্তীর্ণ কমিউনিস্ট

কর্মী নরনারীর সাক্ষাৎ মিলবে। কিন্তু জীবনের সুষম ছন্দ সেখানেও থাকে। অজস্র চরিত্র জাল। পার্থ, ভদ্রা, পার্থর মা, দেবকী ও তার দুশ্চরিত্র নিষ্ঠুর অত্যাচারী স্বামী রাজেন, দেবকীর বিধবা বড় জা আন্নাকে প্রাণ দিতে হয়। সে স্নান করার কালে জলে ডুবে একটু তৃষ্ণায় জল খেয়েছিল বলে। গ্রাম্য জীবনের কুৎসিত আঘাত তাকে বাধ্য করে গলায় দড়ি দিতে। গ্রামীন পরিবেশে সেও রসাল ব্যাপার। দেবকীকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তার দরিদ্র পিতার জন্য এবং মুলতঃ যন্ত্রণা দেবার জন্যই শিশুপুত্রটি কেড়ে নিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়। লতা-সুলক্ষণের জীবন অবশেষে তেভাগা আন্দোলন ও হাজং বিদ্রোহের মধ্যে আত্মগোপন পর্ব শেষে গড়ে ওঠে। মুসলমান তরুণকে ভালবাসার অপরাধে বিধবা তরুণী মেঘীকে গ্রামছাড়া হতে হয়। অবশেষে মেঘী তার প্রেমিকাসহ মিলিত হয়ে ঘর পায়। দেবকী তার ভবিষ্যৎ গঠন করতে কলকাতা আসে—অবশেষে সেও ত্রাণ পায় তার চিরাচরিত সংস্কার থেকে এবং সাংবাদিক কুরুপের সঙ্গে তার একটি মমতার বন্ধন গড়ে ওঠে। পার্থ, তার হাজং সাথী সারথী অকুস্থলে লড়াই করে। পার্থ আহত হয় ও মারা যায়। পার্থ একেবারে কৃষক সমাজ থেকে সমাগত—সে নিজেকে কমিউনিস্ট কর্মী জীবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করেছে। তার মধ্যে ফাঁকি নেই। তার সরল প্রেমের মধ্যে বিধবা ভদ্রা আশ্রয় খুঁজে পায়। উভয়েই যেন উভয়ের প্রতিপূরক হয়ে ওঠে। এসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে কাছাকাছি আসে আরও বহু পার্শ্বচরিত্র, তারা কিছুটা সাহায্যকারী প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট না হলেও। ভদ্রাও সে ভাবেই কাছে এসে পরে কর্মী হল। ভদ্রার জীবন আশ্চর্য সততাসহ চিত্রিত হলেও এক আধটুকু অসুবিধায় পড়তে হয়। সে পূর্বজীবনে জমিদার ঘরের মেয়ে বা বধূও। পতিবিরহিত জীবনে সে ছিল বৃদ্ধ শ্বশুরের আশ্রয়স্থল। পার্থর সাহচর্যে এসে তার পরিবর্তন হল; শ্বশুর কী ভাবে নিলেন—বা সেইবা শ্বশুরকে কি বলল, এগুলি নেপথ্যে থেকে যায়। একপ্রকার হয়ত তা ভালই। কিন্তু সংসারে সমাজে এভাবে তাই কি ঘটে ?

ঘটনার জাল হাজং ও গারো সীমান্তে বিস্তৃত। কলকাতায় তার সম্বাদ ছড়ায়। ওদিকে বর্মামুলুকে বিদেশী সৈন্যদের নিয়ে প্লেন যাচ্ছে—ভোরের তারার মত দেখা যায় প্লেনের আলোটি। ভদ্রা সেই অতিথি বিদেশীর কথা স্মরণ করে। সে বাঁচতে চেয়েছিল মায়ের জন্য প্রিয়ার জন্য। এ চরিত্রটি একটি সত্য চরিত্র। যুদ্ধের কালে আগন্তুক লিবারেল মনের বহু ইংরাজ

যুবকের আনাগোনা ঘটত তৎকালে কমিউনিস্টপন্থী পরিবারগুলিতে। তাঁদের কারো কারো নাম অধ্যাপক সুশোভন সরকারের রচনায় পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের লেখা "পরিচয়ের আড্ডা"-তে এবং গোপাল হালদার মহাশয়ের রচনাতেও। এঁদের অনেকেই সেসময় সুশোভন সরকার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হালদার গৃহে আসা যাওয়া করেছেন। এঁরা অবাস্তব চরিত্র নন। ভারত সংস্কৃতি বিশেষ করে ভারতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাইরের ও ভিতরের তাঁদের আকৃষ্ট করত। গত ত্রিশ বৎসরে যে শ্রীহীনতা ও শূন্যতা আমরা আহরণ করেছি তা তখন অবিদ্যমান। অবশ্যই ঔপন্যাসিক কখনও ফটো তুলে রাখেন না। তাঁদের কাহিনী সত্যাশ্রিত হলেও কল্পিত। অন্ততঃ চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতি সংযোগ আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে কল্পিত। ভিন্ন মুণ্ড ও ধড় ভিন্ন ধড় ও মুণ্ডে আরোপিত করার একটা শিল্প সঙ্গতি আছে। সে শিল্পসঙ্গতি যে সাবিত্রী রায়ের রচনায় নেই তাও নয়। কোথাও বিশেষভাবে কারোকে ধরা বা আক্রমণ করা শিল্পীর লক্ষ্য নয় বা লক্ষ্য হতে পারে না। সেদিক দিয়ে সাবিত্রীর প্রয়াস সত্যাশ্রিত এবং তাঁর কল্পনা দুঃসাহসিক।

কমিউনিস্ট পরিবারগুলিতে তো আর সকলে একসঙ্গে কমিউনিস্ট হয় না। কিম্বা কংগ্রেসী আদর্শবাদ গান্ধীযুগেও সপরিবার কদাচিত কেহ গ্রহণ করতেন। সেক্ষেত্রে পরিবারের লোকগুলির মধ্যে আশাভঙ্গের বেদনা তো ছিলই। তারও উপর ছিল অনেকসময় স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের হয়ত খোঁজও পেতেন না। সুখ দুঃখ বিনিময়ের অবস্থাও হত না। সেসব ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যে যেমন একত্রাবস্থানে অসুবিধা দেখা যায় তেমনও এসব স্থানে দেখা যেত। বিশ্বপ্রেম তথা বিশ্বনাগরিকত্ব হয়ত কোনও কমিউনিস্ট স্বামী বা স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিত। তাঁরা কবি পেলেও উদাসীন থাকতেন পার্টি ডিসিপ্লিনের দোহাই পেড়ে। এমনটি যে হতই তা বলছি না, তবে হতে পারত। সাবিত্রীর রচনায় সেরূপ ইঙ্গিত আছে কথাবার্তায়। তৎকালে তাঁর রচনার কঠিন সমালোচনাও হয়েছিল একথাও আজকের দিনের বহু সদস্যের জানবার কথা।

'মেঘনা পদ্মা' আরম্ভ হয় দুরন্ত নদীস্রোতে নৌকা ভাসানর সঙ্গে। পদ্মা বিশাল—মেঘনা ভয়াল। ঘটনাপুঞ্জ প্রায় সবই ঘটে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে। মুক্তি সাধক বিপ্লবী নায়ক নায়িকাদের মধ্যে এক নায়িকা বা কোনও নায়ক ইচ্ছাঅনিচ্ছায় মানুষী দুর্বলতার শিকার হন। একটি মেয়ের গোপনে সন্তান হয় ও সন্তানটিকে গোপন করা হয়। সমস্ত জিনিষটা খুব গোপনে সেরে

ফেলা হয়। পরবর্তীকালে সেই সুন্দরী কন্যাটি তার শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে এক প্রগতিশীল জমিদার পুত্রের পত্নী হয়। মেঘজিৎ কমিউনিস্ট না হলেও সেরূপ মতাবলম্বী উদার প্রকৃতির যুবক। তার পত্নী কলকাতা বাসকালে একবার সেই অতীতের বিস্মৃত দিনগুলিতে ফেলে আসা তার সন্তানটিকে চিনতে পারে। সে সন্তানটি তখন কিশোর। সে ভালোভাবেই মানুষ হচ্ছিল এক অকৃতদার আদর্শনিষ্ঠ সদস্যের পালিত পুত্র হিসাবে। মাতা ও পুত্রের দেহসাদৃশ্য মাতাকেও বিচলিত করে। সে দ্বিধান্বিত হয়ে যখন ভাবছিল কী করা উচিত, পথে দাঁড়ানো সে কিশোরটিও তখন কোনও অজ্ঞাত আকর্ষণে বাতায়নে তাকিয়ে দেখছিল অপরূপা ঐ মহিলাকে। সেইসময় সকল বিপদের নিষ্পত্তি ঘটে ছেলেটির গাড়ীচাপা প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাওয়াতে। বুঝি সংসারে এমন নাটকীয় পরিসমাপ্তি সহসা ঘটে না। কিন্তু, এও তো সত্য যে জীবনে এমন ঘটনাও ঘটে যা কল্পনাতেও স্পর্শ করা যায় না। লেখিকা সেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণই করেছেন বলা যায়।

'পাকা ধানের গান' এবং 'মেঘনা পদ্মা'র প্রসারতা গারো পাহাড় থেকে কলকাতার জনাকীর্ণ পথ পর্যন্ত আসা-যাওয়া করে। লেখার মুন্সিয়ানা ও বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। সুকঠোর বাস্তবতা, পার্টির ইশতাহার গোপন করা, লুকিয়ে আত্মগোপন করার ফাঁকে ফাঁকে অম্লান পথের ফুলগুলিও ফুটে থাকে। গ্রামীণ জীবনের আশ্চর্য সুন্দর চর্যাগুলি হল সে ফুল। বিবাহের সামগ্রিক গান, গাজনের সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ভোজন, আগন্তুক অতিথির আপ্যায়ণ, গাঁয়ের মেলার অনুষ্ঠান এবং কখনও কখনও অনুষ্ঠিত সভায় বৌঝিদের যোগদান, ছোট ছেলের মাছ ধরে আনা, দাদার জন্য মোয়া মুড়কি তৈরি করা প্রভৃতি গৃহস্থ ঘরের অজস্র সাধ স্বপ্ন সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সমগ্র বইয়ের মধ্যে ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। সত্যকার ফুলের পাতার বৈচিত্র্যও কম নয়। লেখিকা স্বভাবতঃ প্রকৃতিপ্রেমী। পথ চলতে ঘাসের ফুল তাঁর চোখ মোটেও এড়ায় না। অন্ধকার আকাশের তারার দিকে চেয়ে তার কোনও স্ত্রীচরিত্র খুঁজে বেড়ায় স্বপ্নে তার সঙ্গী দয়িতকে যে রাজনৈতিক কর্মজালে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নিরুপকরণ অন্নের সঙ্গে খাবার কিছু না থাকলে শিউলি পাতার তিক্ত বড়াই আহার্য হয়। শিশুকে মা আশ্বাস দেয়—'রাক্ষুসী মা আর তার ছেলেটা খাবে।' বলতে গেলে এই ছোটখাটো ঘরোয়া সুখ-দুঃখ আর বহিপ্রকৃতির রোমান্টিক স্পর্শ এই দুইটির মাধুর্য-মেদুর সাবিত্রী রায়ের রচনা আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুটিকেই জাগ্রত করে। রোমান্টিক লিরিক

ধর্মী রচনা অতি দ্রুত সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলে। থামবার সময় নেই তাঁর—থামবার সময় নেই পাঠকেরও। থেমে থাকে হাজং কৃষক বিদ্রোহে মৃত পার্থের মায়ের দুটি করুণ চোখ—সে চোখ ভদ্রার মধ্যে কি খোঁজে তা সে নিজেও জানে না।

এবার শেষ পর্যায়ে আসি। এ পর্য্যায়ে সাবিত্রীর লেখার ধরণ বদলে যায় ও লেখার সংখ্যা কমে যায়। কন্যা-জামাতাসহ সে বিদেশে গেছিল। সে নতুন দেশ তাকে মোহাবিষ্ট করেনি ভাল লাগলেও। যাকে আমরা mooring বলি সেটি সে পেয়েছিল তার পূর্ববঙ্গের বনচ্ছায়াঘন গ্রামে এবং পরিশেষে হয়ত তার কলকাতার উপকণ্ঠস্থ গৃহে। শেষের দিকে তার সঙ্গী ছিল কন্যাটি আর কন্যার বিবাহের পর নূতন করে সে সঙ্গ পেয়েছিল দৌহিত্র মিঠির। এই পৃথিবীতে তার স্বগৃহে তার মমতাময় প্রতীক্ষা নিশ্চয়ই থাকত তার জীবনসঙ্গীর জন্য। অসুস্থ শরীর তাকে বারেবারে ক্লিষ্ট করত। বেঁচে উঠত সে মনের জোরেই। তার কাজকর্ম ঘর-সংসারের ফাঁকে জেগে থাকত বাতায়নে নিঃসঙ্গ আকাশ এবং তার মনের আকাশও। এই পরিবেশে সে রচনা করে 'নীল চিঠির ঝাঁপি', উৎসর্গ করে দৌহিত্রকে। বস্তুতঃ ছোট ছোট লেখাগুলি কখনও রূপ নিয়েছে চিঠির, কখনও ছবির বা স্কেচের এবং কিছু অসামান্য কবিতায়। এ লেখা পড়ে (যথারীতি সে আমাকে বই দিয়েছিল ও আমিও তার সমালোচনা করি তান্যার প্রযত্নে তা পরিচয়-এ ছাপা হয়) আমার মনে হয়েছিল স্মৃতিচিত্রের কিছু টুকরো। তাতে নষ্টালজিয়া ছিল—তার রূপ ছিল প্রচ্ছন্ন বিষাদের, যে সুর বিষণ্ণ হলেও প্রসন্ন। এ সুর ছিল সাবিত্রীর নিজস্ব সম্পদ। সে অবিচার অত্যাচার সহ্য করেছিল। সাহিত্যিক জগতে সে খুব সমাদর পায়নি। প্রতি মানুষের মত তারও নিঃসঙ্গ জগতে সে নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে একা থাকত, কারোকে দোষারোপ করত না বা জগৎ সংসার সম্বন্ধে তার অনুযোগ যে ছিল না তা বোঝা গেল 'নীল চিঠির ঝাঁপি' পড়ে। কিন্তু সেই বিষণ্ণ করুণ সুর কেমন মেলডি হয়ে গেছিল। পূর্বেকার উপন্যাস লেখিকার জমজমাট সিমফনি সেখানে অনুপস্থিত। পড়ে আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। স্মৃতির কারুণ্য স্মরণ করিয়েছিল ওয়াশিংটন আরভিংকে, রুশ লেখক পাউস্তভস্কিকে। এও তার সংবেদনশীল অন্তরের চিরন্তন প্রকাশ রীতি। তার সকল সুখদুঃখ প্রকাশিত হত মেঘে ঢাকা তারার মতন নয়ত জ্যোৎস্নাঢাকা মৃদু আঁলোমাখা আকাশের মত। তার আন্তরিক সততাই তার শক্তি ছিল এবং সেই আন্তরিকতাই তার লেখার প্রেরণা যোগাত। রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের কবিতা দেখলে বোঝা যায় প্রথম দিনের সূর্য এবং শেষ বেলার সূর্য দুটিই সত্য এবং কোথাও তিনি যে উত্তর পাননি সেইই তৃতীয় সত্য। সাবিত্রীরও হয়ত তৃতীয় নয়ন তৃতীয় ভুবনকে তার কাছে এনে দিয়েছিল—'নীল চিঠির ঝাঁপি' কবিতাগুলি তার সাক্ষী থাকল।

বিজ্ঞান ও শিল্পের মিলন

নীহার ভট্টাচার্য্য

[মিখাইল মিখাইলোভিচ গেরাসিমভ। জন্ম ২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ পিটার্সবুর্গ-এ। মৃত্যু ২১ জুলাই, ১৯৭০ মস্কোতে। সোভিয়েত নৃতত্ত্ববিদ ভাস্কর। ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে ডক্টরেট (১৯৫৬) এবং Ethnology of the Academy of Sciences (USSR) এর প্রধান (১৯৫০-১৯৭০)। সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৫০-এ]

বছর ষাটেক আগের কথা। মস্কো শহর থেকে বেশ কিছু দূরের এক পরিত্যক্ত এলাকায় একটা করোটি পাওয়া যায়। তারও বেশ কিছুকাল আগে সেই এলাকার কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে একজন মহিলা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল, ঐ করোটিটি সেই নিখোঁজ মহিলার। সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ হতে অপরাধবিশারদরা এলেন গেরাসিমভ্-এর কাছে। মিখাইল গেরাসিমভ্ একজন নৃবিজ্ঞানী। ইনি ইতিমধ্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন, মাথার খুলি পেলে প্রাণীর আকৃতির রূপ দেওয়া সম্ভব। তাঁর এই মত তিনি যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা সেটা মেনে নিয়েছেন। গেরাসিমভ্ দেখিয়ে দিয়েছেন, করোটির ওপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক প্রথায় যে আকৃতি দেওয়া সম্ভব, সেটি ডেথ্ মাস্ক-এর চেয়েও নিখুঁত হয়। মৃত্যুর পর যখন কোনো ব্যক্তির মুখের ছাপ নেওয়া হয়, সেই ছাপ হুবহু হওয়া সম্ভব হয় না। কারণ মৃত্যুর ফলে মাংসপেশীতে শৈথিল্য আসে এবং মুখাবয়ব সামান্য বিকৃত হয়।

যাই হোক, গেরাসিমভ্ করোটিটি নিয়ে তাঁর কাজ শুরু করলেন। মুখের আকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট ইনি বের করেন হাড়ের গঠনের ওপর নির্ভর করে। হাড় আর নরম টিস্যুগুলির পরস্পর নির্ভরতা বেশ জটিল। এজন্য গেরাসিমভ্‌কে এক্স-রে ফটোগ্রাফির সাহায্য নিতে হয়। সংগ্রহ করতে পারেন প্রচুর তথ্য, বের করেন নরম টিস্যুগুলোর আকৃতি এবং প্রকৃতি। নাক এবং কানের আকার বের করাই সবচেয়ে কঠিন। কঠিন হলেও সম্ভব এবং গেরাসিমভ্ তা করেন অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে। তাছাড়াও মুখমণ্ডলের কাটা দাগ, আঘাতের ফলে যদি কোন ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেসবের আকৃতির

প্রমাণও করোটির ওপর থেকে যায়। সেই তুলনায় চোখের আকৃতি বের করা বুঝি অনেক সহজ। চোখের আকার এবং স্বাভাবিক অভিব্যক্তির অনেকটাই নির্ভর করে নরম টিসুগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতির ওপর, তাছাড়া কোটরের হাড় তো আছেই।

গেরাসিমভ্ এবার যে খুলিটি পেলেন, সেটি নিয়ে কাজ করা সহজ নয়। এটির বাঁদিকটা সাধারণ, কিন্তু ডানদিকের সঙ্গে বেশ পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত এমনটি হবার কথা নয়। কিন্তু গেরাসিমভ্ সমস্যা পছন্দ করেন, অর্থাৎ সমস্যা সমাধানে তাঁর আগ্রহ এবং আনন্দ। তিনি বুঝলেন, জীবিত অবস্থায় এই ব্যক্তির মুখমণ্ডলের ডানদিকের স্নায়ুতন্ত্রে গোলোযোগ ছিল, ফলে মাংসপেশীগুলি সর্বদা সচল থাকতে পারেনি। মুণ্ডটির অনেক দাঁতও আবার ছিল না। কাজ আরো জটিল হল, কারণ দাঁত না থাকলে নিচের চোয়ালের প্রকৃত অবস্থা বের করা কঠিন হয়। ধীর স্থিরভাবে এগোলেন গেরাসিমভ্। হাড়গুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলেন, এই করোটিটি তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ বয়সের কোনো ব্যক্তির। তারপর প্রমাণ পেলেন, মৃত ব্যক্তি মহিলা ছিলেন। চোয়ালের হাড়ে দাঁতের যেসব গর্ত ছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে জানা গেল, জীবনের বেশীর ভাগ সময়েই মহিলাটির দাঁত বেশ সবল ছিল। সুতরাং চোয়ালের প্রকৃত অবস্থা বোঝা গেল। এই সমস্ত খুঁটিনাটি এক করে গেরাসিমভ্ এক মূর্তি তৈরী করলেন। কাজ শেষ হলে দেখা গেল, ওটি সেই নিখোঁজ মহিলার মূর্তি। মহিলাটির আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকেই সেটি সনাক্ত করেন। নিখোঁজ হওয়ার সময় মহিলাটির বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ।

শিলার-এর করোটি

একশো ষাট বছরেরও বেশী কাল ধরে হ্বাইমার-এ শিলার-এর কবর দর্শন করে আসছেন কবির ভক্তরা। স্থানীয় যাদুঘরে কবির ডেথ্-মাস্ক রাখা আছে। আর আছে তাঁর করোটির অবিকল প্রতিমূর্তি। তবে সেদিন অবধি ঐতিহাসিকরা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারেননি, এটি শিলারেরই করোটির অবিকল প্রতিমূর্তি। কবির মৃত্যুর একুশ বছর পর শ্‌হ্বাবে নামের এক ব্যক্তি কবরখানা খুঁড়ে করোটিটি বের করে এনে সেটির হুবহু প্রতিমূর্তি তৈরী করান। শ্‌হ্বাবে ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সেই সময়ে শহরের মেয়র। সেই কবর খোঁজার সময়ে কবির সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব, গোয়েটে এবং কবির ব্যক্তিগত ভৃত্যও

সাহায্য করেছিলেন। সঠিক কবরটি, বলা উচিত সঠিক কফিনটি খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন কাজ ছিল। কারণ কফিনের ওপর এমন কোনো চিহ্ন ছিল না, যাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তবে প্রথম তিপ্পান্ন বছর এ ব্যাপারে কোনো কথা ওঠেনি।

তিপ্পান্ন বছর পর, শিলার এবং গ্যোয়েটের দেহাবশেষ তখন পাশাপাশি রাখা, হেলক্‌কার নামের এক শারীরস্থানবিদ (anatomist) সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে যাদুঘরে রাখা কবির ডেথ্ মাস্ক এবং করোটির মধ্যে সামঞ্জস্য নেই।

আবার সন্ধান শুরু হলো ১৯১১ সালে। আবার কবর খোঁড়া হল এবং আরেকটি কঙ্কাল দেখিয়ে বলা হল, এটিই প্রকৃতপক্ষে কবির দেহাবশেষ। এই কাজটি করে ফ্রোরেপ নামের আরেক শারীরস্থানবিদ। সমস্যার সৃষ্টি হল। একদিকে শিলার-এর দেহাবশেষ রয়েছে গ্যোয়েটে শিলার সমাধি সৌধে। আবার আরেকটি করোটিকে বলা হচ্ছে শিলার-এর করোটি।

এমনি অবস্থায় আরো পঞ্চাশ বছর কাটল এবার ডাক পড়ল গেরাসিমভ্-এর। তাঁর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল সমস্যা সমাধানের। গেরাসিমভ্ যেটুকু তথ্য পেলেন তা হচ্ছে, শিলার-এর মৃত্যু হয়েছে ১৮০৫ সালে। সে সময়ে কবির বয়স ছিল ছেচল্লিশ। কবি ছিলেন সুপুরুষ এবং সেসময়ে সেই শহরের সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তি। গোয়েটে-শিলার সমাধি সৌধে সত্যিই পাওয়া গেল এক দীর্ঘ সুপুরুষের কঙ্কাল। উন্নত ললাট, স্পষ্ট নাকের অস্থি, বেশ বড় বড় চোখের কোটর এবং চমৎকার সাজানো দাঁত। প্রথম দৃষ্টিতেই নজর কেড়ে নেয়। ওদিকে ফ্রোরেপ যে কঙ্কালকে শিলার-এর বলে চালাতে চেয়েছিল, সেটি দেখা গেল বিভিন্ন ব্যক্তির হাড় একখানে করে তৈরী। বিশেষ করে করোটিটি সন্দেহাতীতভাবে একজন মহিলার এবং সেই মহিলার বয়স মৃত্যুকালে ছিল বড়জোর কুড়ি বছর। এবার গেরাসিমভ্-এর দায়িত্ব হল শহ্বাবে যে দেহাবশেষ শিলার-এর মনে করেছিলেন, সেটি প্রকৃতপক্ষে শিলার-এর কিনা তা প্রমাণ করা। উপায় একটিই। এই করোটি থেকে মুখাবয়ব সৃষ্টি করতে হবে। গেরাসিমভ্ দরজা বন্ধ করে কাজে বসলেন। সঙ্গী তাঁরই ছাত্র উলরিখ। এঁদের কাছে শিলার-এর কোনো ছবি ছিল না, তাঁরা শিলার-এর ডেথ্-মাস্কও দেখেননি। এই কথা বলতে হল, যারা গেরাসিমভ্‌কে জানে না, তাদের সন্দেহ করার অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে।

এই ব্যাপারে গেরাসিমভ্ বলেন, "মুখমণ্ডলের অঙ্গসংস্থান-সংক্রান্ত (morphological) খুঁটিনাটির ওপর নির্ভর করে আমাকে কাজ করতে হয়।"

যাই হোক, তাঁদের কাজ শেষ হল। এবার এই নতুন প্রতিমূর্তির সঙ্গে কবির ডেথ মাস্ক-এর তুলনা করা হল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ এবং যাদুঘরের কর্মীদের সামনে এই কাজ করা হয়। উপস্থিত সকলে তৎক্ষণাৎ কবির এই প্রতিকৃতি মেনে নেয়। তারপরও আবার অনেক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের রায় বহাল রাখেন। শিলার-এর এই মূর্তিটি বরং আরো জীবন্ত মনে হয়। ডেথ মাস্ক-এ কবির মুখাবয়ব মাত্র বোঝা যায়। সেখানে প্রাণের ছোঁয়া নেই। "না থাকাই স্বাভাবিক" বলেন গেরাসিমভ্। "মৃতের মুখের ছাপ নেবার সময় চুলগুলো কাপড় দিয়ে চেপে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে চুলগুলো নষ্ট না হয়। ফলে চামড়ায় টান প'ড়ে মুখমণ্ডল সামান্য বিকৃত হয়। তারপর ছাপ থেকে কাপড়ের অংশ কেটে বের করবার সময় একটু আধটু বেশী প্লাস্টার বেরিয়ে যেতে পারে।"

গেরাসিমভ্-এর তৈরী মূর্তিটিই এখন হ্বাইমার-এর শিলার মিউজিয়ামে রাখা আছে।

অষ্টম শতাব্দীর কবির প্রতিকৃতি

কবির নাম রুদাকি। প্রায় বারোশ বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সমরখন্দ, বুখারা, এমনকি আফগানিস্থান-এর গ্রামাঞ্চলেও তিনি পরিচিত। সকলেই তাঁকে জাতীয় কবি বলে মনে করে। তাঁর কাব্য সুপরিচিত। কিন্তু তাঁকে যারা দেখেছিল, তারা কেউ কবির কোনো ছবিও এঁকে রাখেনি, বা অন্য কোনো কারণে সেই কবির চেহারার কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। রয়ে গেছে তাঁর কাব্য। তিনি লিখেছিলেন ফার্সী ভাষায়।

কবি রুদাকির ১১৩০-তম জন্মদিন এগিয়ে আসছে অথচ তাঁর কোনো প্রতিকৃতি নেই। সুতরাং ডাক পড়ল গেরাসিমভ্-এর। গেরাসিমভ্কে প্রথমে কবির সমাধি খুঁজে বের করতে হবে, সেটি পেলে, কবর খুঁড়ে তাঁর করোটি বের করে তৈরী করতে হবে রুদাকির প্রতিকৃতি। শেষ কাজটুকু বলা বাহুল্য কোনো সমস্যাই নয়—অন্তত গেরাসিমভ্-এর কাছে। প্রথম কাজ কবির দেহাবশেষ পাওয়া এবং তা নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা।

আয়োজন শুরু হল। জানা গেল তাজিক-এর পঞ্জরুদ্ গ্রামে কবিকে

সমাধিস্থ করা হয়েছিল। তাতে কাজ সামান্য এগুলো, কিন্তু সঠিক দেহাবশেষ সনাক্ত করতে আরো অনেক তথ্য জানা প্রয়োজন। গেরাসিমভ্ শুরু করলেন রুদাকির কাব্যে আক্ষরিক অনুবাদ নিয়ে গবেষণা। একটা খবর আরো পাওয়া গেল ইতিমধ্যে, রুদাকি অন্ধ ছিলেন। কিন্তু, তিনি বাল্যকাল থেকেই অন্ধ ছিলেন, না পরিণত বয়সে অন্ধ হয়েছিলেন, তা কেউ ঠিক জানে না। জনশ্রুতি —ধর্ম-রাজনীতির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার অপরাধে রুদাকিকে অন্ধ করে দেওয়া হয়।

রুদাকির কাব্যের মধ্যে পাওয়া গেল সূত্র। প্রথম জীবনে কবি প্রকৃতি, সুরা এবং রমণীর বিবরণ দিতে রঙের উল্লেখ করেছিলেন। তারপর হঠাৎই একটা সময় থেকে রুদাকির কাব্যে পৃথিবীর সব রঙ মুছে যায়। এককালে যে কবি রমণীর সৌন্দর্যকে লাল গোলাপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই সৌন্দর্যকে গোলাপের সুগন্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রমাণ হলো রুদাকি পরিণত বয়সে অন্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে গেরাসিমভ্ আরো একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র পেলেন, যার ফলে দেহাবশেষ পাওয়া গেলে সেটিকে নিশ্চিন্তভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। সেটি হল, রুদাকির শেষ বয়সে তৃতীয়বার দাঁত গজিয়েছিল। কখনো কখনো এমনটি ঘটে, শারীরস্থানবিদ্যায় এমন নজির আছে।

গেরাসিমভ্ এবার রওনা হলেন পঞ্চরুদ্ গ্রামের উদ্দেশে। সেখানেও অত প্রাচীন সমাধির খবর পাওয়া তেমন সহজ নয়। সেখানকার কিছু বৃদ্ধ লোক-পরম্পরায় কিছু জানত ঠিকই, কিন্তু কবর খোঁড়া হবে শুনে তারা প্রথমে কেউ সাহায্য করতে রাজী হয়নি। তাদের বহু কষ্টে বোঝানো সম্ভব হল যে, সমাধি খুঁড়লেও দেহাবশেষ আবার যথাস্থানে রাখা হবে। তাছাড়া তাদের গ্রামের কবিকে সম্মানিত করা হবে। তখন তারা রাজী হল। গ্রামের কবরস্থানের একটা সমাধির ধ্বংসস্তুপ দেখিয়ে দিল। সেটাই খোঁড়া হল। গেরসিমভ্ পেলেন করোটি। চোখের কোটরের অংশবিশেষ সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ। হাড় প্রায় নষ্ট হতে চলেছে।

গেরাসিমভ্ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। জানতে পারলেন, করোটির মালিককে তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে অন্ধ করে দেওয়া হয়। নিচের চোয়াল দেখে বোঝা গেল করোটির মালিক দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং তৃতীয়বার দাঁত গজিয়েছিল। এবার গেরাসিমভ্ নিশ্চিত হলেন, এটি রুদাকির করোটি। শুরু করলেন তাঁর প্রকৃত কাজ।

রুদাকির প্রথম প্রতিকৃতি তৈরী হল। তাঁর দেহাবশেষ আবার যথাস্থানে রাখা হল, তারপর সেই সমাধির ওপর তৈরী হলো চমৎকার এক সৌধ। অজিক-এর লোকেরা এখন তাদের প্রাচীনতম কবির আবক্ষ মূর্তির অধিকারী। তারা গর্বিত।

জয়দেব বসুর কবিতাগুচ্ছ

পেপারওয়েট

রূপোর বুদ্বুদ, নাকি জল? আহা
কার চোখ থেকে ঝরে পড়বার কথা ছিল……

বিপ্লব

হাঁটা শুরু করবার আগে তারা দেখেছিল রাস্তার শেষে আলো আছে। তাদের পায়ের পাতা সঞ্চালিত হচ্ছিল দ্রুত। একদিন রেলিং-এর সীমা থেকে সবাইকে লুফে নিল পঁয়ত্রিশ ফিটের শূন্যতা। তারপর মাঠময় অন্ধ ও আতুরের ছড়ানো কফিন থেকে যেইকটি তর্জনী ফিরে পেল হৃদ্‌স্পন্দন, তাদের অবাক করে মহাশূন্যে হেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ।

বিচ্ছেদ

পয়লা ঘন্টি বেজে উঠল, উৎকর্ণ হয়ে উঠল চতুর্থ দেয়াল। হৃদয় উপড়ে রাখো হাতের পাতায়। বন্ধ করো মুঠো। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজে, চাপ দাও, আরো আরো জোরে চাপ দাও। তৃতীয় ঘণ্টার শব্দে—এই ছাখো,
আঙুলের
ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে পড়ছে গরম কফির মত আঠা আঠা রক্তের স্রোত।

গ্রীষ্মের লেখা

বসন্ত নিভে গেল। এইবার এসো। চামড়ার শিহরণ, চোখের জ্বলন, কবিদের জন্মদিনগুলি। পতাকার স্মৃতিমেদুরতা, তোমাকে ভুলিনি। অ্যাসফল্টে নেচে ওঠো শিখা। ভয়ঙ্কর পূজানৃত্যে আমাদের মুখ
পুড়ে যাক।

মার

চোখের কোটর থেকে জ্বালো টর্চ, শুখা জলপাই রং প্রভা পাক। তবে এই পীচের শহরে মুখশ্রী মানাবে। একটু একটু করে তীব্র হাড়গুলি ঘন চেতনায় ঢেকে যাক। জাগো, জাগো হে শাস্তা, পায়সান্নে আজো পিছুটান।

বুদ্ধিজীবী

তোমাদের হাত থেকে টাকা নিই, বোধ নিই, বিবেকখচিত এক
পিকদানি নিই। গলা শিরদাঁড়া তাতে ধরে রাখি। আর শোনো,
বিষন্নতা ছুঁয়ে থাকি রোজ। শুধু যে কদিন জ্বর হয়, মাধুকরী
অসমাপ্ত থাকে, পেটের ভিতরে কেউ কথা বলে। প্রাথমিক কষ্টটুকু
সহ্য হয়ে গেলে ভেদবুদ্ধি মাথাচাড়া দেয়। বোঝা যায়, আরো বহুদিন
তোমাদের উপদংশে চুমু খেতে হবে।

লেনিন

প্রত্যূষের সাথে সাথে তোমার চোখের থেকে আলো মুছে যায়।
বেলা বাড়ে, আর তুমি হয়ে ওঠো মিনারসদৃশ। হতপ্রাণ, চকচকে,
উঁচু। দ্বিপ্রহরে যে কুকুর তোমার পায়ের কাছে হিসি করে, তাকে
তুমি খাবারের সন্ধান দিয়েছিলে। প্রিয় ল্যাম্পপোস্ট, এখন সবাই
শুধু ভুলে যাবে, একদিন তোমার আলোয় সারাপথ হেঁটে গেছে
খঞ্জ জনতা। মাঝরাতে তোমাকে জাপ্টে ধরে আকুল কেঁদেছে যত
কবি ও নাবিক।

ওল্ড হোমের কবিতা

ভালোবাসার কথা বলছ? আমাদের কি সেসব শোনার আর বয়েস
আছে হে? এখন, এই ছাখো, মাটি অন্ধকার হয়ে এল। সূর্যাস্ত
দেখা সেরে এইবার সকলেই ঘরে যাবো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
বুঝে নেবো ক'টা ভাঁজ জমা হোলো মুখে। তারপর, শুয়ে পড়ব
একা একা।

তেইশতম জন্মদিন

তোর থেকে কিছু চাই না। শুধু তুই আয়, আমি আরো একবার
তোর মুখোমুখি বসি। এই ধুলো আমার দেশের। এই ঝরা পাতা,
এই সন্ধ্যা, দিগন্ত অবধি এই শাঁখের আওয়াজ—এইসবই আমার
জীবন। তুই আয়, আমি তোর হাতে তুলে দিই দারিদ্র্যমুখর এই দেশ।

বিনয়কুমার সরকারের রাজনৈতিক চিন্তা

হিমাচল চক্রবর্তী

কয়েক দশক আগেও অধ্যাপক বিনয় সরকারের নাম শুধু বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলেই নয় সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছেও সুপরিচিত ছিল ; বহু বাড়িতেই খুঁজলে ইংরেজী না-হলেও বিনয় সরকারের লেখা এক আধটা বাংলা বই, বিশেষ করে ভ্রমন কাহিনী—প্যারিসে দশমাস, ইতালীতে বারকয়েক কিংবা ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইউরোপ—পাওয়া যেত। মাত্র তিন-চার দশকের ব্যবধানে এই একদা অগ্রণী বুদ্ধিজীবী প্রায়-বিস্মৃত, এবং ইংরেজী বাংলায় লিখিত তাঁর বিশালসংখ্যক বই আর প্রবন্ধের প্রায় সবই এখন অপ্রাপ্য ; পুরনো বই-এর দোকানে কচিৎ-কখনো দু একটি চোখে পড়ে।

অধ্যাপক সরকারের ব্যক্তিত্ব, 'সরকারবাদ' নামে পরিচিত তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনাত্মক ভঙ্গী, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধনবিজ্ঞান-পরিষদ, সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি সেসময় বেশ কিছু তরুণ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীকে যে আলোড়িত করেছিল, তার প্রমাণ তাঁর জীবদ্দশাতে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কে আট-নয়টি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখা বই ও কয়েকটি প্রবন্ধ। এর বেশ কয়টি অবশ্য জীবনী ; এবং প্রমথ পাল-এর 'মনীষী বিনয়কুমার'-এর মতই, সর্বদা সুলিখিত নয়। অন্যগুলি নৃতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, ইতিহাস বা সমাজবিদ্যা-বিষয়ে অধ্যাপক সরকারের বক্তব্যের আলোচনা। কোনো-কোনো প্রাবন্ধিক তাঁর বৌদ্ধিক অবদান-এর সামগ্রিক মূল্যায়ণও করতে চেয়েছেন ; চিন্তার ইতিহাসের প্রচলিত তাত্ত্বিক কাঠামোতে বিনয়কুমারের অবস্থান নির্ণয়ই যার মূল লক্ষ্য। আলোচ্য বইটি এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন। এটি লেখকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রদত্ত পি, এইচ, ডি, থিসিসের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিষয়ে বিনয় সরকারের মতামত বিশ্লেষণই লেখকের মূল উদ্দেশ্য, যদিও তিনি প্রসঙ্গত, প্রয়োজনেই, অধ্যাপক সরকারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করেছেন এবং যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে এটি গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন।

বিনয় সরকারের রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর মূলমন্ত্র

ছিল দুটি—তথ্যনিষ্ঠতা ও 'বহুত্ব-নিষ্ঠা'। দুটোই তিনি পেয়েছিলেন কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবস্থায় ডন সোসাইটির সতীশ মণ্ডল মুখোপাধ্যায়—(অধ্যাপক সরকার তাঁর 'চণ্ডালী' ভাষায় বলতেন সমীর মণ্ডল) এর সাহচর্যে। এই সময়েই—১৯০৫ সাল ও তার পরের কয়েক-বছর—স্বদেশী আন্দোলন ও তৎপ্রসূত গণজাগরণ; অধ্যাপক সরকার সময়টিকে চিহ্নিত করেছিসেন "গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ" বলে। মেট্রো-পলিটান স্কুলের কাছে ডন সোসাইটির আলোচনা সভা বসত ; সতীশচন্দ্র ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি তখন তরুণ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের প্রধান আকর্ষণ। বন্ধু রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের সঙ্গে ডন সোসাইটির শুরু থেকেই (১৯০২ সালে) বিনয়কুমার এইসব সভায় উপস্থিত হতেন। স্বদেশী আন্দোলনের যে ধারাটি রাজনীতি বর্জন করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার উপর বিশেষ জোর দিত, সতীশচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই ধারার (সুমিত সরকার নাম দিয়েছেন "কনস্ট্রাকটিভ স্বদেশী" বা গঠনমূলক স্বদেশী) অন্যতম প্রধান পুরুষ। তিনি ও তাঁর সোসাইটির অনুগামীরা 'স্বদেশী শিক্ষা' ও "স্বদেশী শিল্প" ("ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্বদেশী")-র মন্ত্র প্রচার করছিলেন। বিনয়কুমারের স্বাদেশিকতায় দীক্ষা এখানেই ; সারা জীবন এই মন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অটুট। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ পাশ করার পর প্রথমবার বিদেশ যাওয়ার আগে পর্যন্ত, ছয়-সাত বছর নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছিলেন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে। ১৯০৭ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা "বঙ্গে নবযুগে নতুন শিক্ষা" ; পরে, ১৯১০-১২ সালে, প্রকাশিত হয় শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা, প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা, ভাষা-শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা, শিক্ষা সমালোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-সমন্বিত 'শিক্ষাবিজ্ঞান সিরিজ'। পরবর্তীকালের সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখাতেও দেখা যায় একই স্বাদেশিকতার মন্ত্র ; প্রায় সব লেখা ও গবেষণার পিছনে কাজ করেছে স্বদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথানুসন্ধানের তাগিদ। 'কনস্ট্রাকটিভ স্বদেশী'র। বিনয় সরকার বিংশ শতাব্দীতে 'রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য" বা বৃহত্তর ভারতের কথা বলতেন, তার অর্থ 'ভাবসাম্রাজ্য', বিশেষ কোনো ধর্মমতের নয়, ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির 'দিগ্বিজয়'। প্রথম জীবনে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের মাহাত্ম্য কল্পনায় অভিভূত হলেও, পরবর্তীকালে তার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন ; তাঁর বিখ্যাত "পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোসিওলজি" ('শুক্রনীতি'র অনুবাদ) ভূমিকায় দেখিয়েছেন, প্রাচীন ভারতীয়

সভ্যতা সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিক ছিল এই ধারণা কত অসার। স্বদেশের, নিতান্তই পার্থিব, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির বিষয়ই ছিল তাঁর আলোচ্য; এবং সেজন্য তাঁর অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক লেখায় শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা স্বদেশের সমৃদ্ধির সম্ভাব্যতার বিশ্লেষণ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

'গঠনমূলক' স্বাদেশিকতায় সঙ্গে যোগ হয়েছিল "বহুত্ব-নিষ্ঠা"। বিভিন্ন অর্থে। একদিকে বিনয় সরকার এই শতাব্দীর প্রথম দিকের বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর ভার্সেটাইলিটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি কোনো শাস্ত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেন নি, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যায়, আধিপত্য ছিল অনায়াস; চল্লিশ বছরের উপর যে অজস্র লিখেছেন তার অনেক রচনাই এমনকি ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিক্ষা ও ভাষা-বিষয়ক। অন্যদিকে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি একলেকটিক: প্রাচীন শুক্রনীতি থেকে শুরু করে হার্ডার, হেগেল, মার্কস, সবার থেকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এর ফলে, একই সঙ্গে মার্কসপন্থী ও কোঁৎ-পন্থী (পজিটিভিস্ট) বলে পরিচিত হয়েছেন। এঙ্গেলস-এর বিখ্যাত "অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপারটি এণ্ড দ্য স্টেট"—বইটি মূল জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন (১৯২৬ সালে, 'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' নামে—সম্ভবত ভারতীয় ভাষায় এই বই-এর প্রথম অনুবাদ), একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় ইতিহাসের "অর্থনৈতিক" ব্যাখ্যার সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, এবং মার্কস-জামাতা লাফার্গ-এর লেখা "দ্য এভোলিউশন অব প্রপার্টি"র অনুবাদ করেছেন ("ধন-দৌলতের রূপান্তর", ১৯২৪ সালে প্রকাশিত—বাংলায় একমাত্র অনুবাদ)। অন্যদিকে, হার্ডারের দর্শনতত্ত্ব নিয়ে সমর্থনসূচক আলোচনা করেছেন, কাণ্ট প্রভৃতির দর্শনের প্রশস্তি গেয়েছেন, বের্গসঁর এলান ভাইটাল-এর ধারণায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন। তৃতীয় আর একটি অর্থে, বিনয় সরকার "বহুত্বনিষ্ঠ" ছিলেন। যে-অর্থে তিনি মার্কস-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অর্থনৈতিক অদ্বৈত-নিষ্ঠার অভিব্যক্তি বলে ধরে নিয়ে নিজেকে তার "কট্টর-বিরোধী" বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তিনি বহুত্ববাদী, কোনো 'একটি শক্তির প্রাবল্য স্বীকার করতে রাজী নন। স্বাদেশিকতার মত এই বহুত্ব-নিষ্ঠাও বিনয়কুমারের উপর "বঙ্গবিপ্লবের" প্রভাবের ফল। সমকালীন প্রায়-সব বুদ্ধিজীবীরই "বহুত্ব-নিষ্ঠা" লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। বিনয়কুমারকে একসময় ঠাট্টা করে বলা হত "১৯০৫-সরকার"—ঠাট্টা হলেও কথাটা মিথ্যে নয়।

অর্থনীতির মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও অধ্যাপক সরকার কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব

উপস্থিত করেন নি। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক বক্তব্যকে একটা সংহত রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন; বইটি তাঁর পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করে। পাঁচটি পরিচ্ছেদের প্রথম দুটিতে লেখক ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে বিনয় সরকারের ধারণা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও তার উৎস ও পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেছেন; পরবর্তী দুই পরিচ্ছেদে লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ বিনয়কুমার-এর কাছে প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্যাটিগরী-গুলি কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে এবং ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তিনি কীভাবে সেগুলি প্রয়োগ করেছেন, তার উপর। শেষ পরিচ্ছেদে লেখক বিনয়কুমারের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মূল্যায়ন চেষ্টা করেছেন, এবং দেখিয়েছেন স্বাদেশিকতা ও 'বহুত্ব নিষ্ঠা' এই দুই মূলমন্ত্র কীভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তাকে রঞ্জিত করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণার পিছনে সমাজ ইতিহাসে প্রগতির বোধ কাজ করেছিল। সমাজ-প্রগতির মেকানিকস্ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি "সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা" (ক্রিয়েটিভ ডিস্ইকুলিব্রিয়াম)-এর প্রত্যয় (কনসেপ্ট) গঠন করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক আলোচনায় এটি গুরুত্বপূর্ণ। এই ডিস্ইক্যুইলিব্রিয়াম সরকারের মতে, ব্যক্তি ও সমাজের অভ্যন্তর দ্বন্দ্বের ফল। তাঁর ভাষায়, প্রগতি মানে নিরন্তর অস্থিরতা; যা আছে আর যা নেই এই দুই-এর অনন্ত দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব ছাড়া প্রগতি হয় না। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হলেও, এই দ্বন্দ্বের ধারণা মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারী নয়, বরং এর উপর প্যারেটোর প্রভাব লক্ষণীয়। সরকারের 'ইমেজ অব ম্যান' প্যারেটোর ছায়াবলম্বী, যার মূল কথা হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ভালো-মন্দ নিয়ে গড়া; সম্প্রসারিত হয়ে, সামাজিক ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের এই দ্বন্দ্ব সমাজ-প্রগতির উৎস, এবং শুধু উৎসই নয়, সরকারের কাছে প্রগতি মানেই নিরন্তর একটি থেকে আর একটি ভারসাম্যহীনতায় উত্তরণ। প্রগতি-র এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সরকার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তার একটি দিক হল অভিজ্ঞতাবাদ—অর্থাৎ সাধারণ ও সার্বজনিক সত্য বলে কিছু নেই, সত্য পৃথক পৃথক বস্তু-সত্ত্বায় নিহিতঃ অন্যদিকে "বিশ্বশক্তির" ধারণা, যার একটি অর্থ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বহু শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কই নির্ধারক শক্তি; অন্য একটি অর্থ, কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈচিত্র্য ও মূল ঐক্য এবং পারস্পরিক নির্ভরতাও প্রনিধানযোগ্য। 'বিশ্ব-শক্তি'র প্রসঙ্গে

সরকার তিনটি সূত্র উপস্থিত করেছেন—প্রথমত, রাজনীতি বা সাহিত্য কোনো আন্দোলন কিংবা জাতীয় জীবনের কোনো দিকই নির্দিষ্ট জাতির উপর নির্ভরশীল নয়, সবই বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের ফল ; দ্বিতীয়ত, এই আন্তর্জাতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জাতীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয় ; এবং তৃতীয়ত, বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের রূপ এবং সত্তায় পরিবর্তন দেখা যায়, এবং যতদিন মানুষের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে ততদিন প্রগতি সুনিশ্চিত।

পদ্ধতিগতভাবে 'বিশ্ব-শক্তি'-র ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়, এবং একলেকটিসিজম-এর চূড়ান্ত পরিচায়ক ; কিন্তু রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির বিষয়কে বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে কতটা সহায়ক, সে প্রশ্ন করা যেতে পারে। ন্যেশন, রাষ্ট্র, সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং গণ-স্বৈরতন্ত্র (সরকার উদ্ভাবিত) প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ক্যাটিগরী সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে (এই সব বক্তব্য লেখক তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপস্থিত করেছেন) এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। লেখক সরকার-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, তিনি একদিকে যেমন রাজনীতিতে বাস্তব পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর আলোচনায় সৃজনশীল ব্যক্তির ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে (পৃঃ ৪০)। কিন্তু সরকার যাকে বাস্তব পরিস্থিতি বলছেন, তা যেমন বিভিন্ন বাস্তব শক্তির দিশেহারা মিশ্রণ, তাঁর 'ব্যক্তি'ও তেমনি 'অসৎ', 'তামস', 'মৃত্যু' ও 'অবিদ্যা'র সঙ্গে সংগ্রামরত, 'সৎ', 'জ্যোতি' 'অমৃত' ও 'বিদ্যা' সন্ধানী শ্রেণীহীন বিমূর্ত প্রত্যয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গীগত সমস্যার ফলেই বিনয় সরকার একসময় সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমর্থন এবং লেনিনকে 'ঋষি' বলে সুখ্যাতি করেও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব অস্বীকার করেছেন, এবং পরবর্তীকালে সোবিয়েত ব্যবস্থায় 'টিরাণী'র অনুসন্ধান করে 'ভারসাম্যহীনতা'র কথা বলেছেন। এর ফলেই, তিনি 'শ্রেণী সমন্বয়ে'র বক্তব্য উপস্থিত করে ভারতবর্ষে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বার্থ-রক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ, প্রয়োগবাদ এবং বহুত্ববাদ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে এমন একটা অবস্থানে, যাকে সঠিকভাবেই বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থন প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করা যায়। "আর্থিক জগৎ"-এর প্রবন্ধাবলী বা "ডোমিনিয়ান ইণ্ডিয়া"র লেখা এই ধারণাকে

প্রতিষ্ঠিত করে। নিঃসন্দেহে বিনয় সরকার-এর রাজনৈতিক চিন্তায় ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও বস্তুতন্ত্রতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু এর উৎস কৌটিল্য ও ম্যাকিয়াভেলি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ নয়। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "একজন ঋষিই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনীতিকের ভূমিকা বুঝেছিলেন, তিনি প্রাচীন হিন্দু কৌটিল্য।......ইউরোপে ম্যাকিয়াভেলির মধ্যে কৌটিল্য পুনর্জন্ম লাভ করেছেন......"। তাঁর বস্তুতন্ত্রতা বা ক্ষমতার রাজনীতির ধারণা ম্যাকিয়াভেলির কাছ থেকে পাওয়া; জাতিতত্ত্বেরও ভিত্তি রাজনীতির মূল বিষয় সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির তত্ত্ব।

আলোচ্য বই-এ লেখক দেখিয়েছেন, যে গণতন্ত্রের উপর অধ্যাপক সরকারের পূর্ণ আস্থা ছিল তা মূলত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক (এই শতাব্দীর) ভাষ্য—যা উনবিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের এবং বর্তমান শতাব্দীর যৌথবাদের সমন্বিত রূপ। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ, এর বৈশিষ্ট্য। লেখক এও দেখিয়েছেন যে গিয়ের্কে, মেইটল্যাণ্ড, ল্যাস্কি প্রমুখের গোষ্ঠীর বহুত্ববাদের সঙ্গে বিনয় সরকারের চিন্তার সাযুজ্য আছে; তবে সরকার রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা মানেন নি। বিনয় সরকারের বহুত্ববাদকে লেখক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের প্রয়োজনের (নীড্) ধারণার সাহায্যে; লেখকের বক্তব্য "এই বহুত্ববাদের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে পরিবর্তমান সমাজের দাবীর বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়ায়"। এবং, তাঁর মতে, 'বন্ধুত্ব-নিষ্ঠা'-র উপর অতিরিক্ত ঝোঁকের ফলেই বিনয় সরকার আজ প্রায় বিস্মৃত।

অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায় "বিনয়কুমার সরকারঃ ভারতীয় পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি" নামে একটি ছোট প্রবন্ধে (দ্য বেঙ্গলী ইনটেলেক-চুয়াল ট্র্যাডিশন বই-এ) বিনয় সরকারকে "ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশের দার্শনিক" বলে চিহ্নিত করেছিলেন; আলোচ্য বইটিতে বিনয় সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্লেষণ সেই ইঙ্গিতকে অনেকটা স্পষ্ট করে। লেখকের বিশ্লেষণের প্রতি ছত্রের সঙ্গে কেউ একমত না-ও হতে পারেন, কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে তাঁর বক্তব্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি বিনয় সরকারকে বুঝতে সাহায্য করে বলে তাঁর কাছে আমরা ঋণী। যথেষ্ট পরিশ্রম করে তিনি সরকারের লেখা এবং সরকার সম্পর্কে লেখা যাবতীয় বাংলা ও ইংরেজী বই ও প্রবন্ধের যে তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন, সেটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে মূল্যবান হবে। বিনয় সরকারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয় যোগ করে দিতে পারলে পাঠক আরও উপকৃত হতেন।

দ্য পোলিটিক্যাল আইডিয়াজ অব বিনয়কুমার সরকার। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কে, পি, বাগচী এণ্ড কোম্পানী। কলকাতা। ৮০ টাকা

ভাঙো এসে শব্দের আখরোট

মণীন্দ্র রায়

আমার সেদিন নেই, ফিরে শিখব শিশুর হরফ ;
মৃত শব্দ বয়ে ন্যুব্জ সামনে দেখি পুরনো ক্যালভারী।
তবু মেরু-জাহাজের চক্রনেমি কোথায় বরফ
ভাঙে, তারই খোঁজে থাকি ; প্রেতলোকে করি না দলভারী।
কই সে যুবন্ দিন ? যে-নতুন স্নায়ু খরস্রোতা
জেনেছে তেনজিং নোরগে মৃত্যুশৃঙ্গে মানুষী পা রেখে ?
(এদিকে মুকুট-চূড়া, অন্যদিকে যার গলগোথা—
অগাধ পতনে যার কঙ্কালের হাত যায় ডেকে !)

এখন নতুন চাই। ছত্রিশ হরফ শূন্যে ছুঁড়ে
শব্দকে নাচায় যারা, দাঁতে পেষে, আনন্দে কাঁদায় ;
হন্তারক দস্যু যার সম্মোহনে অস্ত্র রাখে মুড়ে ;
মরুও পাতাল-জলে দ্রাক্ষালতা বক্ষে ফিরে পায়।
কোথায় সে দুরাকাঙ্ক্ষী ! ভাঙো এসে শব্দের আখরোট।
ফিরে শাঁস, মজ্জা, ওজসের স্তোত্রময় ঠোঁট ॥

আত্মঘাতক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ফিটফাট সেজে সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম তোমাদের বাড়ি।
পথে একজোড়া চড়ুই দেখেছি, রাস্তায় চোখ এমনই প্রখর,
দেখেছি একটি কানি বুড়ি পথ পেরোচ্ছে চেপে নড়বড়ে লাঠি,
তার-ছেঁড়া ট্রাম, স্যাচেল্ বাক্সে জব্দ কিশোরী, অক্সিলিয়াম—
এক লহমায় উজিয়ে এলাম কলকাতা থেকে চম্পাকেয়ারি।

সবুজ দরজা সংকেতে ঠাসা। বেল নেই। দিতে তিনবার টোকা
আলট্রামেরুন কার্ডিগানের বিন্যাসে তুমি সামনে দাঁড়িয়ে,
চোখে লেগে ঘুম, ভারী ব্রীড়াময় হাই তুলে আহা ভাঙলে শরীর,
কষ্টে-সৃষ্টে মুখে হাসি এনে বললে, 'অমিত, আরে এসো এসো'—
নিচু চৌকাঠ পেরোতেই দেখি, সামনে ভাসকো পোপা-র কবিতা।

কে যেন সাবেক গ্র্যাণ্ড পিয়ানোয় বাজাচ্ছে শোপাঁ হাড়সার হাতে,
ঘষা ট্রাউজার্স, ঢলঢলে কোট, জামার বোতাম সবকটি খোলা,
'সি' শার্পে তাঁর কাঁপছে আঙুল ঝড় তুলে এত সাত-সকালেই,
তাকে দেখে এক আত্মঘাতক বন্ধুর মুখ মনে পড়ে গেল।

ছুটে এল হাওয়া হেরোইনে ঠাসা গুমোট সবুজ পাগল গন্ধ,
ইলেকট্রোপ্লেটে ছেটানো পারদ, রাগে ফাটো ফাটো ফুটবল জিলি,
এল ম্যাসকটে তুষার-অশ্ব, নৃত্যমাতাল ব্রবডিংনাগ,
বাদকের স্ট্রোকে বিষের বড়িতে গোলা ঘন নীল জলের চর্কি—
ভিতরে ঢুকেই দুচোখ আমার একাগ্রতায় আকাট-অন্ধ।

ডুবে যেতে যেতে প্রাণপণে ডাকি 'অরুণা অরুণা অরুণা রুণা'
ঘর-বারান্দা দরজা-জানালা এমনকি তুমি সুনীলে উধাও,
সব চলে গেলে ঘূর্ণিমাতাল জোয়ারের গ্রীবা চেপে ধরতেই
ক্ষমাহীন বেগে ভেসে এল শুধু আত্মঘাতক বন্ধুর মুখ।

প্রমথনাথ মিত্রের 'যোগী'

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০ খৃঃ) (পি. এন. মিত্র নামে বেশি পরিচিত) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পেশাদার সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫ খৃঃ) 'দি বেঙ্গলি' পত্রিকায় তাঁর অনেক ইংরেজি রচনা প্রকাশিত হয়। সেসব রচনা মূলত সংবাদ, সংবাদ-পর্যালোচনা বা রাজনৈতিক মন্তব্য। তিনি আইন ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়েও অনেক লিখেছেন। উপন্যাস লেখায় তিনি যে হাত দিয়েছিলেন তা আজ প্রায় বিস্মৃত। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'যোগী' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক "শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং / পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা / ৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট" কলকাতা। যতদূর জানা গেছে. তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা এক। উপন্যাস ছাড়া বাঙলা ভাষায় তিনি অন্যধরণের বইও লিখেছিলেন। বাঙলা ভাষা চর্চা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে তিনি আগ্রহী ছিলেন। "১৮৮৬ সালে রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময়ে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের পড়ানোর অনর্থ নজরে আসে। দেখেন, বেশির ভাগ ছাত্রেরই ইংরেজিতে পড়ানো বোঝার বা ইংরেজি বই অনুসরণের মতো ভাষাজ্ঞান নেই। তাঁর মনে হয়, এই ধরনের শিক্ষায় দেশের মানুষ বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে এবং ফলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিনাশ ঘটবে।" (সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রমথনাথ মিত্র বর্ধাপন ১৯৮০', নৈহাটি ; পৃথ্বিরাজ মিত্রের লেখা A brief sketch of the life of Pramatha Nath Mitter (a Calcutta barrister) the founder of the Anusilan Samities of Bengal নামে জীবনী থেকে গৃহীত)।

প্রমথনাথের মাতৃভাষার প্রতি টান, জাতীয়তা বোধ, হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থানের প্রত্যাশা, অনুশীলন তত্ত্ব প্রভৃতিকে একটি সাধারণ সূত্রে গ্রথিত করা যায়। তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারায় বার বার হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং অনুশীলনতত্ত্বের প্রতিফলন হয়েছে। এমন কি একমাত্র উপন্যাস, 'যোগী'তেও তাঁর মানসিক গঠনের বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। কোন

পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী প্রমথনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তা প্রথমে দেখা দরকার।

১৩৭৭ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "প্রমথনাথ স্মরণে" শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। তা থেকে জানা যায়: প্রমথনাথ মিত্র নৈহাটির যে মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের এক পূর্বপুরুষ মুঘলযুগে রাজপুরুষ অর্থাৎ হুগলির ফৌজদার ছিলেন। দীর্ঘকাল পরেও প্রমথনাথের মধ্যে সামরিক বিভাগ ও সংগঠনের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা গেছে। তিনি ছিলেন অসম্ভব জেদি। যাই হোক, প্রথম:জীবনে একবার তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে যান, কিন্তু 'বাঙালি সামরিক জাতির লোক নয়' এই অজুহাতে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফরাসি ঔপনিবেশিক বাহিনীতে যোগ দিতে গেলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বিদেশি বলে। সারা জীবন তাঁর মধ্যে যোদ্ধাভাব বর্তমান ছিল। বিশেষ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্বাধীনতা আনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তা ছাড়া জীবনের প্রতি পদক্ষেপই তাঁকে সংগ্রাম করে এগোতে হয়েছে।

প্রমথনাথ মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে পড়াশুনা করতে যান। এজন্য নৈহাটির কিছু বাসিন্দা তাঁর বাবা বিপ্রদাস মিত্রকে সমাজচ্যুত করে। নৈহাটির হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। প্রমথনাথ ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এলে খৃস্টধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হন। হিন্দু সমাজের বিধান অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করতেও রাজি হন নি। ফলে এই পরিবারটির ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। নিরুপায় হয়ে তাঁরা কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। প্রমথনাথ কখনোই হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

ছেলেবেলা থেকেই প্রমথনাথের সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমবয়সীদের নিয়ে তিনি লাঠি খেলার দল তৈরি করেছিলেন। লাঠি খেলায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতিতে যে লাঠিখেলার প্রবর্তন হয় তার মূলেও প্রমথনাথ। শরীর চর্চার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সজাগ। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪ খৃঃ) রচনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"বৃত্তি চতুর্বিধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব—কেননা, উহাই সর্ব্বাগ্রে স্ফূরিত হইতে থাকে। এ সকলের স্ফূরিত ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও

বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্মের পক্ষে এ সকলের কোনো সম্বন্ধ আছে, একথা কেহ বিশ্বাস করে না।…”

“যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম বল; যদি দয়া, দাক্ষিণ্য পরোপকারকে ধর্ম বল; না হয় খৃস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম বল, সকল ধর্মের জন্যেই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এদেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।” (“ধর্মতত্ত্ব’ ‘বঙ্কিম-রচনাবলী’, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭৬ ব. পৃ. ৬০৬-০৭)। এদেশে শারীরিকী অনুশীলন কোন্ ধর্মের স্বার্থে প্রয়োজন সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব-শিষ্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁর চরিত্র এবং সারা জীবনের কাজকর্মে এই তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানোই ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেমের মূল উদ্দেশ্য। সারাজীবন এই-ই ছিল তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র। ফলে তাঁর রচিত সাহিত্যে এরই যে প্রচ্ছায়া পড়বে তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

‘যোগী’ উপন্যাসটি ৫২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬০। কাহিনী তৎকালীন যুগের বহু উপন্যাসের মতোই গতানুগতিক। কাহিনীর সূত্রপাত বাঙলা দেশে, কিন্তু টেনে নিয়ে গেছেন রাজস্থানে। শেষও করেছেন রাজস্থানের মাটিতে। মুঘলদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, তাদের বিরোধিতা এবং বীরত্বপ্রকাশ, অনুশীলন তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা—এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯ খৃঃ) ‘মাধবীকঙ্কণ’ (১৮৭৭ খৃঃ) উপন্যাসের সঙ্গে অনেকটা মিল লক্ষ্যণীয়।

কাহিনীর শুরু ভাগীরথীর তীরে কোনো এক ঘোষ গ্রামে। মাত্র পনের বৎসর বয়স্ক নায়ক চন্দ্রশেখর ঘোষাল তের বৎসর বয়স্ক রূপলাবণ্যময়ী নায়িকা কামিনীর জন্য নদী তীরে অপেক্ষমান। জমিদারের লোক কামিনীদের যথা সর্বস্ব নিয়ে গেছে, কারণ তাদের খাজনা বাকি পড়েছে। ইতিমধ্যে খবর

এল, চন্দ্রশেখরের বাবা রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের অবস্থা খারাপ। মৃত্যুশয্যায় চন্দ্রশেখরকে তার বাবা গ্রামের জমিদার রঘুবর ঘোষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করান। রাজকৃষ্ণ বলেন: "ঐ পাপিষ্ঠ নরাধম রঘুবর ঘোষের দুঃসময়ে আমি উহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার সাহায্যে উহার এত উন্নতি হইয়াছে। এই মৃতপ্রায়, রুগ্ন দরিদ্র. ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত, টোডরমলের আদেশ অনুসারে ঐ যুদ্ধবীর দুরন্ত জমীদারের জল্লাদ হস্তে প্রাণ যাইত। এই অক্ষম রুগ্নের কৌশল ব্যতীত মানসিংহের হস্ত হইতে উহাকে বাঁচিতে হইত না। আমার পরামর্শে আজি উহার সিংহদ্বারে কমলা আবদ্ধা রহিয়াছেন। তাহার প্রতিদান স্বরূপ, তিন বৎসরের মধ্যে রঘুবর ঘোষ আমাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে; আমার পৈতৃক প্রজা সকলকে আমার সমক্ষে বধ করিয়াছে, আমার পৈতৃক বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে, পৈতৃক বিগ্রহ সকল কাড়িয়া লইয়াছে। আমি ইহার প্রতিদান করিয়া পারিলাম না। তুমি করিও।" রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর ছ'মাস পরে এক রাতে রঘুবর আক্রান্ত হন। প্রবল লড়াইয়ের পর চন্দ্রশেখরের হাতে রঘুবর নিহত হন।

প্রতিশোধ নেওয়ার পর চন্দ্রশেখর বাঙলাদেশ ছেড়ে সারা ভারতের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি যোগী হন। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেন। বিশাল যোগীদল গঠন করেন। এই যোগীদল ছিল একটি সুশিক্ষিত এবং সুসংহত যোদ্ধা দল। তিনি রাজস্থানের মুঘল বিরোধী রাজাদের সাহায্য করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। সেখানে তিনি সম্মানিত হন। হিন্দু রাজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। মুঘল সম্রাট একবার তাঁকে বন্দী করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে বন্দী করে রাখা সম্ভব হয় নি।

গোটা উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, ঈর্ষা-দ্বেষ, মানবিক চৈতন্যের বিকাশ, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উত্থান-পতন, বিরহ-মিলন, হাসি-কান্নার সমাবেশ হয়েছে। উপন্যাসটি সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের ছকে বাধা লিখনের ঢঙ একই রকমের।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অধিকাংশই সময়কাল হিশেবে মুঘল যুগের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান শাসনের বিরোধিতা, হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, বা মুসলমান সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দিক যেগুলি

সম্পর্কে তথাকথিত হিন্দুদের স্বাভাবিক অনীহা প্রকাশ পায় সেগুলি উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: সমাজে এমন একজন যোগী বা সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হচ্ছে যিনি তাঁর দলসহ জাতীয়তাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেশমাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি মোচন করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। দেশের জন্য তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম'; রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কন' প্রভৃতি উপন্যাসে পাওয়া যাবে। সেকালের অনেক বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেম ও ধর্মকে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। তাঁদের কাছে দেশ, দেশমাতৃকা, ধর্ম, ঈশ্বর সমস্তই এক। অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটেছে, ফলে ক্রমশ তাঁরা এলিয়েনেটেড হয়ে পড়েছেন এবং বিচ্ছিন্ন সমাজ গড়তে সাহায্য করেছেন। সেই সমাজ গোটা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে না। হিন্দুর বুদ্ধি ও বাহুবল যে কতখানি তা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাবলীতে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভাবশিষ্য প্রমথনাথও একই পথের পথিক। তিনিও 'যোগী' উপন্যাসে সেই ধারাকেই বহমান রাখতে সচেষ্ট। 'রাজসিংহ'তে রাজপুত বীরের অসীম সাহসিকতা, চারিত্রিক বল, ধর্ম নিষ্ঠা যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি 'যোগী'তে তা অনুপস্থিত নয়।

'যোগী' দুর্বল উপন্যাস। মূল ঘটনায় প্রবেশ করার জন্য লেখক প্রথম থেকেই ভীষণ ব্যস্ত। ফলে প্রথম পরিচ্ছেদের ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী পরিচ্ছেদ-গুলির কোনো সম্পর্কই নেই। চন্দ্রশেখর ঘোষাল অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ জমিদারকে হত্যা করেন। খুবই বিপ্লবী কাজ হয়ত! কিন্তু উপন্যাসে জমিদারের অত্যাচারী রূপটি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তা ছাড়া চন্দ্রশেখর 'যোগী' হলেন কেন? জমিদার রঘুবর ঘোষকে হত্যা করে আত্মগোপন করার জন্য? অপরাধবোধ তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল? কিংবা দেশমাতৃকাকে মুক্ত করে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি কী? মোট কথা, এই উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের 'যোগী' হওয়ার প্রেক্ষাপট রচিত হয় নি। অথচ তা খুবই জরুরি ছিল।

হঠাৎ রাজস্থানে বিজয়সেনীর মন্দিরে এক যোগীর সাক্ষাৎ পাই, সঙ্গে একটি যুবতী। এমন কি কয়েকজন অনুচরসহ একজন রাজপুরুষ উপস্থিত। কারো পরিচয়ই তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। পরে এই যোগীই রাজস্থানের কোনো কোনো শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে মুঘলদের বিরুদ্ধে এক ধরনের জাতীয়তাবাদ জাগাতে চেষ্টা করেন। যোগী বলেন: "আমার মত ব্যক্ত করিবার পূর্বে

মেবারের পূর্ব ইতিহাস একবার তোমাদিগের স্মৃতিপথে আনিয়া দিতে চাই।… সমস্ত হিন্দু রাজারা যখন ক্ষত্রধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া একে একে দিল্লীর তাতার বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন তখন কেবল মেবারই স্বাধীন ছিল— বাপ্পা রাবলের পুত্র তরস্কের পদরেণু মস্তকে ধারণ করে নাই।…দিল্লীর তাতার রাজ এই পুরাতন হিন্দু রাজ্যকে বিলুপ্ত করিতে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।…প্রতাপের যশোরাশি এখনও রহিয়াছে। কে বলে হিন্দুর ইতিহাস নাই? কে বলে হিন্দুর গৌরব করিবার কিছু নাই? হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর বীরপণা, হিন্দুর মাহাত্ম্য পর্বতে পর্বতে—প্রকৃতির বিশালতম স্তম্ভে অঙ্কিত রহিয়াছে। বিশ্বপূজিত আর্য্যজাতির পুনরাবির্ভাব সময়ে জগৎ তাহা বুঝিতে পারিবে। কারণ এই ক্ষণে আমাদের পুনর্জন্মের সময় উপস্থিত।" রাজস্থানে যারা মুঘল-বিরোধী তাদের অন্তরে হিন্দুত্ব জাগিয়ে তুলতে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এমন-কি হিন্দু মুঘল-সামন্তদের মুঘল-বিরোধী করার জন্য সংগঠন গড়ে তুললেন। বিভিন্ন টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে সাফল্য যে না এসেছে তাও নয়। যোগী তো শুধু যোগী নয়। তিনি যোদ্ধা। যোদ্ধা যোগী দলের সেনাপতি। 'মন্ত্রণা' শিরোনামের দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে যোগী বলছেন: "…আমি ভিক্ষাজীবী উদাসীন। বীরধর্ম, বীরের কর্ম, আপনাদের ধর্ম, আপনাদের কর্ম। আমি চিরব্রহ্মচারী, সংসারত্যাগী বনবাসী ভিক্ষুক;…যখন দেখিলাম বিধর্মী রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে যোগীদিগের যোগভঙ্গ হইতেছে; যখন দেখিলাম আর্য্যের সনাতন ধর্ম আর্য্যকুললক্ষীর-আর্য্যের সরস্বতীর সঙ্গে আর্য্যভূমি ত্যাগ করিতেছেন; যখন দেখিলাম ক্ষত্রিয়ের বংশধর আপনি মহারাজ মানসিংহ, আপনি রাঠোর কুলকেশরী কুমার পৃথ্বীসিংহ—যখন দেখিলাম আপনাদের প্রাণপণে বিধর্মীয় কার্য্য করার প্রতিফল নওরোজার বাজার তখন আর অরণ্য মধ্যে স্থির থাকিতে পারিলাম না। তখন সংসারে ঔদাস্য ত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্মের উদ্ধারের জন্য বাহির হইলাম।"

যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, সাফল্য-অসাফল্য, ক্ষমতার উত্থান-পতনের পাশাপাশি রাজপরিবারের প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণে প্রমথনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। ভাব ও ভাবনা, স্বর ও সুরের দিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী। প্রমথনাথের নিজস্বতা বলতে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না এই উপন্যাসে।

রাজপরিবারের প্রেম-প্রীতি ভালোবাসায় "চিরব্রহ্মচারী, সংসারত্যাগী" যোগীর মেয়ে প্রসন্নও দেশভক্তিতে অটল। বাবার সঙ্গে ছায়ার মতো নিত্যসহচরী। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী। শ্যামসিংহের সঙ্গে তার প্রণয় হয়। এক সময়ে সে বলে: "আমার কপালে সুখ হইবে কেন? পিতামহ মহামহোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ, পাষণ্ড জমীদারের হাতে সর্বস্বান্ত হইয়া হতাশাহেতু অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা, বীরপ্রবর, পণ্ডিত চূড়ামণি, পিতৃহন্তা পাষণ্ডের রক্তে স্নান করিয়া প্রতিহিংসা একরকম পরিতৃপ্ত করিলেন বটে, কিন্তু সেই কর্মের জন্য নবীন বয়সে মাতাকে লইয়া স্বদেশ বঙ্গভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, এবং সেই পর্যন্ত দেশত্যাগী হইয়া বিদেশে বিদেশে বেড়াইতেছেন। তোমাদের মেবারে আসিয়া নিজ বাহুবলে আজি তিনি তোমাদের একজন প্রধান। মাতা আমার দুই মাস বয়সের সময় আমাদিগকে ফেলিয়া পরলোক-গামিনী হইলেন।" ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে প্রসন্নের এই উক্তির মধ্য দিয়ে যোগীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি সংসারত্যাগী, কিন্তু চির ব্রহ্মচারী নন। তিনিই সেই প্রথম পরিচ্ছেদের চন্দ্রশেখর ঘোষাল। যাই হোক, মুসলমান শাসকদের হাত থেকে মেবার রক্ষার জন্য, হিন্দুত্বের দাবীতে, সনাতন ধর্ম রক্ষার্থে যোগী ও তাঁর মেয়ে প্রসন্ন প্রাণ বিসর্জন দেন। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি এখানেই।

উপন্যাসের ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় অনেকেই রাজস্থান বেছে নিয়েছেন। 'যোগী'র লেখকও তাই করেছেন। বাঙলার মাটিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন নি। মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটানোর উপযুক্ত ক্ষেত্র রাজস্থানই বিবেচিত হয়েছে। সূত্র হচ্ছে টডের রাজস্থান কাহিনী এবং ভাটচারণদের গাথা সংগ্রহ। সেকালে রাজস্থান সম্পর্কে জানার উপায় হচ্ছে এগুলি, যার ঐতিহাসিক ভিত্তি দুর্বল। একটি বই প্রমথনাথ ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয়, কারণ সেই বই থেকে পরিচ্ছেদের শুরুতে একাধিকবার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বইটি হচ্ছে চাঁদ বরদাই-এর 'পৃথ্বীরাজ রাণা'। এটি সম্ভবত ১২০০ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। (১৮৮৬ খৃস্টাব্দের জর্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পৃথ্বীরাজ রাণা ও চাঁদ বরদাই সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।) 'যোগী' ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপন্যাসে রাজস্থান ব্যবহৃত হয়েছে হিন্দুত্বের লীলাভূমি হিশেবে। রাজস্থান ছাড়া আরেকটি প্রদেশ জাতীয়তাবাদীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে—সেটি হল মহারাষ্ট্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'র পটভূমি রাজস্থান। রমেশচন্দ্র দত্তের

দুটি উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮ খৃঃ) এবং 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯ খৃঃ) যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের পটভূমিতে রচিত। রাজপুত রাজাদের এবং শিবাজির বীরত্বে মুগ্ধ বুদ্ধিজীবী সমাজ হিন্দু জাতীয়তাবাদ বোঝাতে গিয়ে এদের পুজো শুরু করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত অনুশীলনতত্ত্বের পথে প্রমথনাথ বিচরণ করেছেন। তার প্রমাণ দেখতে পাই 'যোগী' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। কখনো কখনো মনে হবে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতেই যেন উপন্যাসটির অবতারণা। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও আসলে অনুশীলনতত্ত্বের প্রয়োগ হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক তেমনি বঙ্কিমী ঢঙে প্রমথনাথ মিত্র 'যোগী' উপন্যাসে যোগী এবং যোগীদলকে ব্যবহার করেছেন অনুশীলনতত্ত্বের প্রয়োগের দিকটি দেখাবার জন্য। উপন্যাসের শৈল্পিক দিকটি অবহেলিত। লেখকের মূল লক্ষ্য রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার। ঔপন্যাসিক হিশেবে নয়, প্রমথনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ বুঝতে 'যোগী' বিশেষভাবে সাহায্য করবে বলে আমাদের মনে হয়।
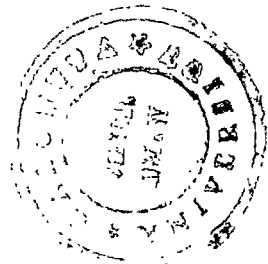
নৈতিক মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য

গোলাম কুদ্দুস

অনেক বক্তার মুখেই আজকাল নৈতিক মূল্যবোধের খই ফোটে। আবার খবরের কাগজ খুললেও নিত্য নানা মূল্যের খবর চোখে পড়ে—আলুর মূল্য, তুলোর মূল্য, পাটের মূল্য, আখের মূল্য, চিনির মূল্য, ধান-চালের মূল্য, বাড়ির মূল্য, জমির মূল্য—কিসের মূল্য নয়? মূল্যবৃদ্ধি, দুর্মূল্য, দুর্মূল্য-ভাতা, পরিপোষক মূল্য, টাকার মূল্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা-আলোড়ন-আন্দোলন লেগেই আছে। মূল্যের এই তরঙ্গসঙ্কুল আবর্ত লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভারতভূমিতে ধনতন্ত্র রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে, কেননা মূল্যই ধনতন্ত্রের নিয়ামক শক্তি। আর জন-জীবনেও মূল্যের সর্বাবিধ প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এর সঙ্গে শিক্ষার মূল্য, এমনকি জীবনের মূল্য পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে। অথচ ধনতন্ত্রের যেটা প্রাণবস্তু, যার নাম উদ্বৃত্ত মূল্য, তা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনার কথা শোনা যায় না, বা তার সঙ্গে অন্যান্য মূল্যের যে কী গভীর নাড়ির যোগ, সে-বিষয়ও বিশেষ কোনো বক্তব্য চোখে পড়ে না। যাই হোক, এখানে সমুদয় মূল্য-সম্পর্ক নির্ধারণের অবকাশ নেই. আমরা শুধু নৈতিক মূল্যবোধ এবং সেই প্রসঙ্গে নৈতিক মূল্যের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

২

অতি সংক্ষেপে বলা যায়, প্রগতিশীল মহলের নৈতিক মূল্যবোধের ধ্যান-ধারণা মোটামুটি নিম্নরূপ :

"সমাজে মানুষের আচরণ-বিধি বা মানদণ্ডের মোট সমষ্টিই তার মূল্যবোধ, যারমধ্যে প্রতিফলিত হয় তার ন্যায়-অন্যায়,ভালো-মন্দ, সম্মান-অসম্মানপ্রভৃতির চেতনা। এইখানেই আইনসংক্রান্ত বিধি-বিধানের সঙ্গে এর পার্থক্য। আইনের আকারে কোথাও নৈতিক-বিধি বা তার মানদণ্ড লিখিত থাকে না। জনমত, সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিশ্বাসের জোরেই এর প্রাণ। এ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, জাতির সঙ্গে জাতির, পরিবারে একের সঙ্গে অন্যের

এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। মানব-সমাজের উৎপত্তিকাল থেকেই মূল্যবোধের আবির্ভাব। সব সময়ই ব্যক্তির কাছে সমাজের কতকগুলি দাবি থাকে, আর সে-দাবির ভিত্তি প্রচলিত মূল্যবোধ। কিন্তু মূল্যবোধের মানদণ্ড অব্যয়, অক্ষয়, চিরন্তন নয়। কালে কালে এর বদল ঘটে। বদল ঘটে সমাজ-বিকাশের তালে তালে, উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রভাবে এবং সর্বোপরি উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। আদিম সমাজে সবার মূল্যবোধ সমান ছিল। কিন্তু সমাজ যখন থেকে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন থেকে মূল্যবোধও বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মূল্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করল। পরস্পরের প্রতি বৈরীমনোভাবাপন্ন শ্রেণী-সমাজে শোষকের মূল্যবোধের পাশাপাশি শোষিতের মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটল। কিন্তু এ দুই মূল্যবোধ তুল্যমূল্য রইল না। সমাজে শোষক বা শাসকশ্রেণীর মূল্যবোধই প্রাধান্য লাভ করল। যথা, দাস-সমাজে দাস-প্রভুদের মূল্যবোধই আধিপত্য লাভ করল, আর বুর্জোয়া-সমাজে বুর্জোয়া মূল্যবোধেরই প্রাধান্য। এ-সবের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন যুগে দেখা দিয়েছে যথাক্রমে দাস, কৃষক এবং শ্রমিক-শ্রেণীর মূল্যবোধ।" (উদ্ধৃতি)

প্রগতিশীলদের উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধের অনেক প্রবক্তাই দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা যে সবাই প্রগতিবিরোধী তা নয়, অনেকেই হয়ত অতি সদাশয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁরা কায়ার সঙ্গে সবসময় ছায়ার সম্পর্ক দেখতে চান না বা পান না, তাঁরা বস্তুজগৎ ও সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক জগতের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত নন, মূল্যবোধের হেরফেরের কথা তাঁরা চিন্তা করেন না, নৈতিক মূল্যবোধ তাঁদের কাছে চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। তাঁরা মনে করেন, নৈতিক মূল্যবোধ জিনিসটা যেহেতু মানসিক ব্যাপার, সেহেতু মানসজগতের মধ্যেই এর কারণ খুঁজতে হবে। মূল্যবোধের বিকাশমূলক ব্যাখ্যার অচল ওটা নিতান্তই স্থূল জড়বাদী চিন্তা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা বলেন, বর্তমান যুগে নৈতিক মূল্যবোধের সংকটের জন্য সমাজব্যবস্থা তত দায়ী নয়, দায়ী প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতি এবং সেই তুলনায় নৈতিক মূল্যবোধের স্তিমিত ধারা ও ক্ষীণ কার্যকারিতা। নৈতিক মূল্যবোধ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। এটাই যত গণ্ডগোলের গোড়া। কী সমাধান? নৈতিক পুনর্জাগরণ! এবং সে জন্য নৈতিক মূল্যবোধের আন্দোলন!

এর জবাবে বিজ্ঞানীদের সচেতন অংশ বলছেন, বুর্জোয়ারা সমগ্র বিজ্ঞানের

গোটাটা গ্রহণ করলে এই সংকট হত না, বুর্জোয়ারা নিজেদের মুনাফা অর্জনের জন্য গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানের শুধু একটা অংশকে, শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে, যথা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, ইত্যাদিকে। বিজ্ঞানের অপর অর্ধাংশ অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের ধারে-কাছেও তারা যায় না। যেতে ভয় পায়। কেননা সমাজবিজ্ঞান তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের এরূপ অবস্থানই নৈতিক মূল্যবোধের সংকটকে এমন তীব্র করেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই যেদিন সমাজবিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, সেদিন মূল্যবোধের এই সংকট কেটে যাবে, কেননা সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবের মানুষ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং সেই সমাজ-বিজ্ঞানের আলোকে সচেতন হয়ে বিশ্বের বাকী দুই তৃতীয়াংশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটবে, তখন নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ-বিপত্তি অবসানের পথ সুপ্রশস্ত হবে। সেই কারণেই বুর্জোয়ারা সমাজ-বিজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ উভয়কে এত যমের মত ভয় করে। অথচ ও-দুটোরই বুর্জোয়া-সংস্করণ ব্যতিরেকে বুর্জোয়াদের পক্ষে শোষণ ও শাসন চালানো দুষ্কর! এমতাবস্থায় বুর্জোয়ারা একদিকে তাদের স্বার্থানুযায়ী 'সমাজবিদ্যা' ও 'সোসিওলজি'র প্রসারে প্রচুর উৎসাহ ও অর্থপ্রদানে অগ্রসর হয়েছে। বর্তমানে এরূপ 'সমাজবিদ্যা'র বহুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা গড়িয়েছে, যার প্রত্যেকটিরই মূল কথা হল, বর্তমান সমাজ-কাঠামোর মধ্যেই সব কিছুর বিচার-বিশ্লেষণ।

শুধু যে সমাজ-বিজ্ঞানের প্রভাবে বিপ্লব ঘটে না, বিপ্লব যে নানা জটিল প্রক্রিয়ার যোগফল, সে আলোচনা এখানে আমরা করতে চাই না, আমরা শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে বুর্জোয়াদের বৈষম্যমূলক আচরণে প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের একাংশের প্রতিক্রিয়ার কথাই উল্লেখ করলাম। তবে দুঃখের বিষয়, বুর্জোয়ারা যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সবটা খোলা মনে গ্রহণ করেছে, তাও নয়। তারা শুধু স্বীকার করেছে সেইটুকুকেই যার দ্বারা মুনাফা লাভ করা যায়, বিশেষ করে যা দিয়ে কায়িক শ্রম-শোষণাপেক্ষা মাথার শ্রম-শোষণে অধিকতর মুনাফা অর্জিত হয়। 'ব্রেন-ড্রেন' বা বিদেশী মস্তক ক্রয় ব্যবসার মূলে আছে অধিকতর মুনাফা অর্জন। শুধু কী তাই? প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা এরা করে থাকে। আগের মত প্রাকৃতিক সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ দিতে এরা রাজী নয়। অনেক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনাকেই গোপন রাখা হচ্ছে। জাতীয় ও সামরিক স্বার্থের নামে বৈজ্ঞানিকদের কাজের উপর পুলিশী তদারকী পর্যন্ত চলছে!

কোথায় গেল বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন নৈতিক মূল্যবোধ ? গোপনীয়তার নামে বৈজ্ঞানিকদের বরখাস্ত করা, এমনকি বন্দী-রাখারও ব্যবস্থা আছে। মার্কিন মুলুকে বৈজ্ঞানিকদের অনেককে বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণে বাধ্য করা হয়। একজন বৈজ্ঞানিক তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বলেছেন, আমরাও গ্রীক ও রোমান দাসদের আধুনিক সংস্করণ। দুঃখের বিষয়, এর ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকেও কিছু পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

নৈতিক মূল্যবোধের বুর্জোয়া-সংস্করণ কম রোমাঞ্চকর নয়। তস্কর যেমন নিজের আড়াল খোঁজে 'চোর' 'চোর' শব্দের সাহায্যে, তেমনি বুর্জোয়ারাও নিজেদের শোষণ গোপনের জন্য একদল লোককে নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে হৈ-হল্লা করতে লাগিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য হল, লোকের মনে এই প্রত্যয় বদ্ধমূল করা যে, মূল্যবোধহানির জন্য শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা নয়, সাধারণ মানুষ নিজেরাই দায়ী। তাদের এই অপচেষ্টা কেন যে অনেকখানি সফল হচ্ছে, সে-বিষয়ে পরে আমাদের একটু বিশদ আলোচনা করতে হবে, নইলে আসামী পার পেয়ে যাবে, ফরিয়াদী আসামীতে পরিণত হবে।

বিচক্ষণ বহু বুদ্ধিজীবীও যে এদের ফাঁদে পা দিয়েছেন সেটাও এদের কম সাফল্যের পরিচায়ক নয়। বুঝে-না-বুঝে তাঁরা আসরে নেমে পড়েছেন এবং সর্বত্র মূল্যবোধ নিয়ে 'ভাষণ' দিচ্ছেন এবং 'আহ্বান' জানাচ্ছেন। যখন যে মহাপুরুষের জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালিত হচ্ছে, সেখানে গিয়ে এঁরা নির্বিচারে সেই মহাপুরুষের 'আদর্শ' আহ্বান জানাচ্ছেন। তাতে স্থান-কাল-পাত্র এবং যুগোপযোগিতা বিচারের কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে ব্যাপারটা এমন লঘু হয়ে উঠেছে যে, সব 'আহ্বান'ই মানুষের এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এতসব ভালো-ভালো কথায় জনসাধারণের এমন নির্বিকার ঔদাসীন্যের কারণ কী ? চিরকাল তো এমনটা ছিল না। জাতীয় আন্দোলনের কোনো কোনো স্বর্ণ মুহূর্তে তো নেতাদের আহ্বানে মানুষ সাড়া দিয়েছিল। দেশে এমন এমন একটা মূল্যবোধ তো জেগেছিল যখন বীরের দল বৃহৎ আত্মোৎসর্গে পিছপা হয় নি। তা হলে পাপের উৎস কোথায় ? স্বাধীনতার পূর্বে এ-দেশে ধনতন্ত্র বাধাগ্রস্থ ছিল, স্বাধীনতার পরে বিগত চার দশকে একটানা অবাধ গতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। তাতে সমাজে এমন ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে, সমাজ-সংসার-পরিবারে এমন অনৈক্য এসেছে, মুনাফার লালসা এমন নগ্নভাবে প্রকটিত হয়েছে, মানুষের স্বপ্ন-সাধ এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে যে, এখন

সর্বত্র সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন—এর জন্যেই কি আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলাম? কিন্তু যা হচ্ছে, সেই রকম হওয়াটাই কি স্বাভাবিক ছিল না? ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ধনতন্ত্রের পথে পা বাড়ালে অন্য কী হতে পারত? মোহভঙ্গ বেদনাদায়ক, কিন্তু মোহভঙ্গও একপ্রকার অগ্রগতি যাদের ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে চোখ খোলা ছিল, তাঁরা বর্তমান অবস্থা দেখে বিচলিত হলেও মোটেই আশ্চর্য হচ্ছেন না। 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারে'র কথা স্মরণ করুন:

"বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই···মানুষের সঙ্গে মানুষের নগ্ন স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার নগদ 'দেনা-পাওনা'র সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে নি। আত্মসর্বস্ব হিসাবের ঠাণ্ডা জলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ এবং কূপমণ্ডুক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তিমূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থলে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা—অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ।

"মানুষের যে-সব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইন-বিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী—সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরি ভোগী শ্রমজীবী রূপে।

"বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবার-প্রথা থেকে তার ভাবালু আচরণকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে নামিয়ে এনেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।"

এ-সব কি দেড়শ বছর আগের লেখা বলে মনে হয়? মার্কস-এঙ্গেলস জীবিত থাকলে ভারতের অবস্থা দেখে গতরাত্রে কোলকাতায় বসেও এ-লেখা লিখতে পারতেন! বেশ বোঝা যাচ্ছে, মার্কসবাদ পুরনো হয়ে যায় নি, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' এখনো ভবিষ্যের দিশারী। 'ম্যানিফেস্টো'-বর্ণিত প্রথমাংশে যদি আজকের ভারতের নৈতিক মূল্যবোধের অবনতির বাস্তব-সত্য উদ্‌ঘাটিত করে থাকে, তাহলে তার দ্বিতীয়াংশের ভবিষ্যৎ বাণীও ভারতের পক্ষে ব্যর্থ হবে না—ধনতান্ত্রিক বিকাশ থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখানে ঘটবে। মূল্যবোধের অবনতিতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

বুর্জোয়ারাও সেটা বোঝে এবং সেইজন্যই তারা ধোঁকাবাজির শেষ অস্ত্র ব্যবহার করছে—ধনতন্ত্রের গায়ে সমাজতন্ত্রের নামাবলি জড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের কথা ও কাজের গরমিল গগনচুম্বী হয়ে উঠছে। বস্তুত, দুনিয়ায় যত রকম দুর্নীতি আছে, তার মধ্যে কথা ও কাজের গরমিলই সর্বাপেক্ষা বড় দুর্নীতি। এ হচ্ছে সব দুর্নীতির উৎস এবং সব অধঃপতনের মূল, সব মূল্যবোধের শ্মশানভূমি।

লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে, প্রগতিশীলদের কথা ও কাজের গরমিল তাদের পক্ষে একটা মস্ত বড় বিচ্যুতি, কিন্তু বুর্জোয়াদের গরমিলটা একেবারে তাদের মজ্জাগত, প্রকৃতিগত এবং স্বভাবধর্ম। বুর্জোয়া স্বার্থের সঙ্গে এই ছলনা, প্রতারণা এবং ভণ্ডামী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কথা ও কাজের গরমিল ছাড়া বুর্জোয়া-স্বার্থ রক্ষা করা যায় না। আর তাদের প্রবক্তাদেরও তাই বুর্জোয়া-স্বার্থের নগ্নতা ঢেকে রাখার জন্য মিথ্যা ও অর্ধ-সত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই হাতিয়ার যে যত নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারবে, সে তত বড় রাজনৈতিক নেতা হবে। লেনিনের ভাষায় এটা চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে :

"আমাদের কালে নির্বাচন ব্যতিরেকে কিছুই করা চলে না, জনতাকে বাদ দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। আর মুদ্রাযন্ত্র এবং সংসদীয়তন্ত্রের এই যুগে চাটুকারিতা, মিথ্যাকথন, প্রতারণা, জনপ্রিয় বুলি-আওড়ানো এবং শ্রমিকদের ঢালাওভাবে সংস্কারসাধন ও সুবিধাদির প্রতিশ্রুতিদানের ব্যাপক জটিল জাল বিস্তার এবং প্রণালীবদ্ধভাবে পরিচালিত সুসজ্জিত ব্যবস্থা ছাড়া জন-সমর্থন লাভ করা অসম্ভব।"

লেনিন বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন, শুধু সংসদীয়তন্ত্রের জন্য নয়, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদের জয়ের জন্যও হিটলার-মুসোলিনীকে জন-সমর্থনলাভের চেষ্টা করতে হয়েছিল, জাতীয় সমাজতন্ত্রের বাগাড়ম্বরের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোয়েবল্‌স বুর্জোয়া-মিথ্যার প্রতিভূ মাত্র। তবে বুর্জোয়া নেতারা এক হিসাবে নিরুপায় ও অসহায়ও বটে! আগেই বলেছি, তাদের ভূমিকা হল বুর্জোয়া শোষণ-শাসনের ভয়ঙ্কর বাস্তবতা ঢেকে রাখা, সেই কাজে যিনি যত সুদক্ষ তিনি তত বুর্জোয়াদের কাছে আদরণীয়, নচেৎ তিনি বুর্জোয়াদেরদ্বারা নির্ঘাৎ পরিত্যক্ত হবেন। কাজটা বড় সহজ নয়—একই সঙ্গে জনপ্রিয় থাকা এবং জনগণের প্রতি বেইমানী করা কম প্রতিভার পরিচায়ক নয়। জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে ও রাজী থাকলেও সবার পক্ষে তাই জনপ্রিয় বড়

বুর্জোয়া নেতা হওয়া সম্ভব নয়। বড় দুষ্কার্যের জন্যও বড় প্রতিভার প্রয়োজন! সর্বক্ষেত্রে বুর্জোয়া-প্রতিযোগিতার মত এ-ক্ষেত্রে নেতায়-নেতায় তীব্র প্রতিযোগিতা চলে।

সমস্যাটির আরো গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, প্রগতিশীলদের বিচ্যুতি বা বিকৃতির মূলেও কাজ করে বুর্জোয়া প্রভাব। বুর্জোয়া সমাজে মাধ্যাকর্ষণের মতই বুর্জোয়া প্রভাব সর্বত্র সক্রিয়। তাকে অতিক্রম করা অতি দৃঢ় চরিত্রের অপেক্ষা রাখে। যেখানে সচেতনায় ঢিলে পড়ে, সেখানে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। আর জনসাধারণের পক্ষে এরূপ সচেতনতা অর্জন এবং বুর্জোয়া মতাদর্শের স্বরূপদর্শন ও পূর্ণ উপলব্ধি আরো কঠিন। আলো হাওয়ার মতই যে-প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তা আলো হাওয়ার মতই অনেকের কাছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

যত দোষ নন্দ ঘোষ? সাধারণ মানুষ মাত্রই কি নির্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, চরিত্রবান? ধনতন্ত্রের অধীনে জন-সাধারণ যদি এত পবিত্র ও নির্মল থাকতে পারত, তাহলে ধনতন্ত্র এমন কি খারাপ? বড় জোর শোষণ করে, এই তো? কিন্তু মানুষকে যে নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে দেয়, সে কি তার কম কৃতিত্ব? বাস্তবে ধনতন্ত্র শুধু শোষণই করে না, মানুষের নৈতিক শক্তিও হরণ করে। সর্বজনবিদিত বিচ্ছিন্নতাবাদই যে এই নৈতিক শক্তি-সংহারের কারণ সে-কথা আজ আর গোপন নেই। যে-মুহূর্ত থেকে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক তার শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেই ক্ষণ থেকেই সমাজ-দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচ্ছিন্নতাবাদের অনুপ্রবেশ। শ্রম ও শ্রম-ফল দুটোর কোনোটাই শ্রমিকের নয়, সবটাই মালিকের। এইভাবে সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা বিচ্ছিন্ন হয়, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্রষ্টার দল পরস্পরের মুখ দেখতে পায় না, পরস্পরকে জানে না, পরস্পরের মধ্যে তাদের সম্পর্ক থাকে না। যা-সম্পর্ক তা টাকার মারফত। একে অপরের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের নিজের শ্রমকে আর নিজের বলে বোধ হয় না। শ্রম-কালটা তার কাছে দুর্বিসহ, কাজের পরবর্তী সময়টাই শুধু তার নিজের; সেখানেই তার নিজস্ব জীবন, তার আহার-বিশ্রাম, সুখ-দুঃখ, চিত্ত-বিনোদন। কঠিন কর্ম অন্তে যখন সে শুষ্ক ছিবড়ের মত বেরিয়ে আসে, তখন সে কিন্তু তার সজীব জীবনের অনেকখানি রেখে আসে পিছনে। যে কোনো উগ্র আনন্দ, নেশা বা চিত্তজ্বালা নিরসন দ্বারা সে এই ক্ষতিটা পূরণের প্রয়াস পায়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কেননা শ্রম শুধু মানব-জীবনের গৌরব নয়, মনুষ্য-স্বভাবের

মূল উপাদান। তা জীবনধারার পক্ষে পরহস্তের নির্যাতন হয়ে উঠলে, আর কোনো কিছু দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করা যায় না। সমাজতত্ত্ববিদ মাত্রই জানেন, শ্রমই মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে উন্নীত করেছে। তার ভাষা, সমাজ, সভ্যতা সব কিছুর মূলেই শ্রম। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গোড়া থেকেই শ্রম ও শ্রমজীবীর যে মহিমা-হানির সূত্রপাত, পুঁজিবাদী সমাজে তা এমন জায়গায় পৌঁছেচে যেখানে শ্রমই বৃহত্তর শোষণ ও বৈষম্যের ভিত্তি ও কারণ হয়ে উঠেছে। ভিতর থেকে একদিকে মানুষ তার শ্রম-গৌরব হারিয়ে অন্তঃসারশূন্য দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে বাইরের জগতে সে প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক শত্রুতার সম্মুখীন, যার চূড়ান্ত প্রকাশ হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। সম্পত্তি ও স্বার্থরক্ষার তাগিদে সব ন্যায়নীতি বিসর্জনের ফলে মানুষ যতই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, ততই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসার ঘটে। সমাজ ও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ নিঃসঙ্গ স্বার্থপর। অতি ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ জীবনে সে সর্বপ্রকার সামাজিকবোধ-বিবর্জিত। যদিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে, তবু তা বুর্জোয়া সমাজের বিশেষ কাঠামোর কল্যাণে ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে। এইভাবে মানুষ শোষণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আবর্তে স্বীয়-সত্তা ও সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে নৈতিক বল হারায়, যে-কোনো প্রলোভনে আগের চেয়ে অনেক সহজে ধরা দেয়, রসাতলের দিকে নেমে যায়, নেমে যে যাচ্ছে সে হুঁশও তার থাকে না।

আর পুঁজিবাদী দেশগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা শ্রমের সুযোগ পর্যন্ত পেল না, যারা বেকার? মৃত্যু ছাড়া তাদের সামনে দ্বিতীয় কী পথ খোলা আছে? কিন্তু মানুষ তো সহজে মরে না, তাই বিরাট বেকার বাহিনীর মধ্যে আবির্ভূত হয় অনেক অপমৃত্যু। অথচ উপরোক্ত যাবতীয় অধঃপতনের জন্য সাধারণ মানুষ সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করে না, দায়ী করে নিজেদেরকেই! এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে কী করে?

এর প্রধান কারণ মুখোস-আঁটা বুর্জোয়া-সত্যই, যা সরাসরি প্রকাশ পায় না। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে বাস্তবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কঠিন হয়ে পড়ে। কোন্ মুখোসটার কথা আগে বলব? বুর্জোয়া গণতন্ত্র? তাতে তো বুর্জোয়ার সামগ্রিক আধিপত্য, অথচ মনে হবে জনগণের সম-অধিকারও তাতে বিধৃত! বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র? তার কর্মই হল সুকৌশলে বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষা, অথচ মনে হবে সে বস্তুটা খুবই সমদর্শী, তার ভূমিকা যথার্থই নিরপেক্ষ। মার্কেট ইকোনমি? এ তো স্বাধীন শিল্প-বাণিজ্যের জন্য সৃষ্ট, অথচ মুষ্টিমেয়

একচেটিয়াপতিদের শোষণের কল-চালনার ওটাই মাধ্যম। বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার সব কিছুই এভাবে চাপা ঢাকা থাকে। তাদের কর-ফাঁকির সত্যিকার পরিমাণ কেউ জানে? তাদের 'তুনম্বরী' খাতায় কী লেখা থাকে? কালো টাকার নিমজ্জিত তুষারস্তূপের অগ্রভাগের কতটুকু দৃষ্টিগোচর? বহুজাতিক সংস্থাগুলির কুকীর্তির কতটুকু প্রকাশ পায়? বুর্জোয়া কূটনীতির মূলমন্ত্রই গোপন অভিসন্ধি। আর তাদের প্রচার মাধ্যম? সে তো সত্য-প্রচারের নামে সত্য-গোপনের মহা উদ্ভাবনা। জনগণের পক্ষে এম্ববিধ বহু বহু কারণে বুর্জোয়া বাস্তবতার গোড়ায় পৌঁছানো একপ্রকার অসম্ভব। বরং তারা অহরহ নিজেদের অস্তিত্বের নেতিবাচক দিকগুলি প্রত্যক্ষ করছে। তারা বেশিক্ষণ পেটে কথা চেপে রাখতে পারে না। তারা ঝগড়াঝাটি, বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ-কোন্দল বেশ সশব্দেই করে থাকে। তাদের হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, মারামারি, গালাগালি, ধ্বস্তাধ্বস্তি, চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা সাক্ষ্য, জালিয়াতি, পরচর্চা-পরনিন্দা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য বিষয়ে দুর্নীতি ও ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তি, অকারণ নিষ্ঠুরতা, নারী নির্যাতন, এমন কি চরিত্রহীনতা এবং ঘুষ দেওয়া-নেওয়াটা এত নগ্নভাবে প্রকাশ পায়, যে, ঐ সব বিষয় নিয়েই সর্বত্র আলোচনা শোনা যায়। গোপন করার কোনোই চেষ্টা যে নেই তা নয়, কিন্তু ছিন্নবস্ত্র দ্বারা যেমন দরিদ্র রমণী স্বাভাবিকভাবে লজ্জা নিবারণ করতে পারে না, তেমনি সাধারণ মানুষের পক্ষে মিথ্যার আবরণ সৃষ্টি আপেক্ষিকভাবে অনেক শক্ত। সরকারী সমীক্ষকদল বড়লোকের বাড়িতে ঢুকে তাদের ঘরের খবর বের করতে সাহস পায়? কিন্তু গরীবের সবকিছু জানার জন্য তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার। সাধারণ মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হীনমন্যতা এবং পারিবারিক কলঙ্ক-চিত্র অনেক সময় এত স্থূল যে, তা আড়াল করার যে কোনো অবকাশই থাকে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তারা নিজেদের অধঃপতন লক্ষ্য করে। স্বমূর্তি ঢাকার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। নিজেদের ত্রুটি তাদের কাছে এতই প্রত্যক্ষগোচর যে, তারা অনায়াসে প্রায়শ বলে থাকে—সরকারের কী দোষ, আমরাই খারাপ হয়ে গেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, অনেক তথাকথিত বাস্তববাদী শিল্পী-সাহিত্যিক নিজেদের যে 'অভিজ্ঞতা'র গর্ব করেন, তাও এই পর্যায়ের। এর চেয়ে বিশেষ উন্নত মানের নয়। হয় ত লেখনিতে তাঁরা আরো একটু রং চড়ান এবং খণ্ড খণ্ড দৈনন্দিন গ্লানি ও তুচ্ছতাকে অখণ্ড সমাজ-বাস্তব বলে চালান ক'রে দেন। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় এ-সব রচনা গ্রহণীয়, যেহেতু এ বুর্জোয়া-স্বার্থকে আঘাত

করে না. সমাজে বুর্জোয়ার নির্মম শাসন ও শোষণের চিত্র তুলে ধরে না। এতে বুর্জোয়া-বাস্তবতার প্রতিফলন প্রায় অনুপস্থিত। এতে শিল্পী-সাহিত্যিকের আর্থিক আনুকুল্যের যেমন অভাব হয় না, তেমনি বুর্জোয়াদের শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম এ-সব শিল্প-কর্মকে স্বচ্ছন্দ্যে ঘরে ঘরে পৌছে দেয়। অনেক সময় তা চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হয় এবং নৈতিক মূল্যহানির প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। কিন্তু জনসাধারণের বড় অংশ এ-সব 'সৃষ্টি'কে গ্রহণ করে কেন? সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, এটা শুধু বিকল্প সুস্থ শিল্পকর্মের অভাবে নয়, বা শুধু রুচি বিকৃতির ফলেই নয়, যে-বাস্তবতার তারা শিকার, সেই বাস্তবতার সঙ্গে এসব রচনার কিছুটা মেলে বলেই স্বল্প-সচেতন বা অচেতন সাধারণ মানুষ একে সহজে বর্জন করতে পারে না. সামগ্রিকভাবে মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দিতে পারে না। আর অনভিজ্ঞ অল্পবয়সীরা তো এই সব শিল্প-কর্মকে 'অভিজ্ঞতা' অর্জনের উপায় বলে মনে করে। লেখক, পাঠক এবং সমাজ এ-তিনের ভূমিকার যোগফল এমন একটা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে যাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। সেটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে এর বিপরীত পক্ষকে লক্ষ করলে। যেমন, অনেকে এ-সব শিল্পকর্মের সমালোচনা করেন, কিন্তু যে সামাজিক ভিত্তিভূমি থেকে এর উৎপত্তি, তা পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন না বা উঠতে পারেন না। ফলে কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও এ-সব 'সৃষ্টি' উত্তরোত্তর সর্বগ্রাসী হয়ে নৈতিক মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করে। পশ্চিমের ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি একই সাক্ষ্য বহন করে। এত সব কথা বলার অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে, কেউ কাউকে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে (আসলে যেটা বুর্জোয়া-সংস্কৃতি) সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে বলছে। যে কোনো সুস্থ সমালোচনা সমাজ-ভিত্তি বদলের একটা উপাদান তো বটেই।

যা বলছিলাম, সঠিক পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে অনেক সময় বাস্তব অভিজ্ঞতাও মানুষকে ভুল সিদ্ধান্তে পৌছে দেয়। এখানেই সমাজ-বিজ্ঞানের সার্থকতা। সাধারণ মানুষ নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি চাক্ষুষ করতে পারে, কিন্তু তার কার্যকারণ জানে না বা খুঁজে পায় না, এ-সবের জন্য সমাজ-ব্যবস্থা কতটা দায়ী তা তারা বোঝে না। তারা বৃহৎ ও মাঝারি বুর্জোয়াদের ডেরা থেকে শত যোজন দূরে বসবাস করে। বুর্জোয়া সংস্থাদি বা কলাকৌশলের সাক্ষাৎ পরিচয় তাদের নেই। তাদের চোখে নিজেদের দুর্বলতাই পর্বতপ্রমাণ হয়ে দেখা দেয়।

এমতাবস্থা বুর্জোয়াদের স্বর্ণ সুযোগ এনে দেয়। অতি সহজেই তারা

সোমেন চন্দ ঃ এক শিল্পীর জীবন ও সংগ্রাম

কৃষ্ণ ধর

[সোমেন চন্দ-র ৬৫তম জন্মবার্ষিকী এ বছর। রচনাটি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ঃ সম্পাদক]

সোমেন চন্দ মাত্র বাইশ বছর বেঁচেছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ঘাতকদের হাতে তিনি ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় প্রাণ দেন। সোমেন চন্দ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। ঢাকার রেলকর্মীদের মধ্যে ইউনিয়ন সংগঠন করেন তিনি এবং রেলশ্রমিকরা এই নম্র স্বভাবের তরুণকে ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত করেন। সোমেন চন্দর আসল পরিচয় যে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতায় তা বোধ হয় তার রেলকর্মী কমরেডরা তখনো জানতে পারেননি। কারণ সোমেন চন্দ নিজের লেখা বিষয়ে কাউকে কিছু বলতেন না। লেখা প্রকাশিত হলেও তা নিয়ে নিজের থেকে কারো সঙ্গে আলোচনা করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। এমন একটি তরুণ যিনি ছিলেন সকলের প্রিয়, তাঁকে এমন ভাবে প্রাণ দিতে হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেদিনকার রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কমিউনিস্ট লেখক হিসেবে সোমেন চন্দর ভূমিকা কী ছিল তার বিশ্লেষণে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। নাৎসী জার্মানি এবং তার দোসর ফাসিস্ত ইতালির আগ্রাসনে ইউরোপে গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। হিটলারের নাৎসি বাহিনী অনাক্রমণ চুক্তি অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর যুদ্ধের গুণগত পরিবর্তন হয়ে গেল। পাশ্চাত্য মিত্রশক্তি এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন একযোগে মানবসভ্যতাকে আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সপক্ষে রুখে দাঁড়াল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবিরোধী এই যুদ্ধকে পিপলস্ ওয়ার বা জনযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে সারা দেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা বিস্তারে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। স্বভাবতই এ কারণে দেশের ভিতরে জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলি কমিউনিস্ট পার্টিকে নানা দিক দিয়ে এবং নানাভাবে আক্রমণ করতে উঠে পড়ে লাগে। ফ্যাসিস্তপন্থীরাও তাতে যোগ দেয়। সে সময়ে আদর্শের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কর্মী ও

অনুরাগীরাও সমস্ত লাঞ্ছনা, অপমান এবং আক্রমণ সহ্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখান নি। কারণ ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা ছাড়া সে সময়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শ এবং পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলির আত্মরক্ষার কোনো বিকল্প পথ ছিল না। সোমেন চন্দ সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস বুকে নিয়ে সেদিন লাল পতাকা হাতে ঢাকার রেলশ্রমিকদের মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ঢাকায় সেদিনই (৮ মার্চ ১৯৪২) সূত্রাপুরায় সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের বিরাট আয়োজন। সোমেন ছিলেন তার অন্যতম প্রধান সংগঠক। শ্রমিক কমরেড নিয়ে তিনি আসছিলেন সম্মেলন প্রাঙ্গণের দিকে। পথে কমিউনিস্টবিরোধী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেই মিছিল আক্রমণ করে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সোমেন চন্দ তখনও দাঁড়িয়ে। মুখে তাঁর ফ্যাসিবিরোধী ধ্বনি। আদর্শের জন্য ভারতবর্ষে একজন কমিউনিস্ট লেখক এই প্রথম শহীদ হলেন।

একই সময়ে দেশের নানা জায়গায় একই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট কর্মীদের ওপর মারাত্মক আক্রমণ চলে। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে প্রায় সে সময়েই দুজন কমিউনিস্ট তরুণ ফ্যাসিবাদীদের হাতে প্রাণ হারান।

সোমেন চন্দর মৃত্যু আজ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। সারা দুনিয়ার ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে যত আদর্শবাদী মানুষ আত্মদান করেছেন সোমেন চন্দর নাম তাঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থানলাভের যোগ্য। প্রাসঙ্গিক-ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তার কয়েকবছর আগে স্পেনে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোবাহিনীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির যুদ্ধের কথা। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল আসলে ফ্যাসিস্তদের শক্তির মহড়া। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পিছনে এসে দাঁড়ায় নাৎসি জার্মানী ও ফ্যাসিস্ত ইতালি। 'যাক শত্রু পরে পরে' এই নীতিবাক্য স্মরণ করে ইউরোপের ধনবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলি মজা দেখছিল। কারণ তাদের ধারণা ছিল, ফ্রাঙ্কোবাহিনী স্পেনকে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের হাত থেকে রক্ষা করবে। স্পেনের সেনাবাহিনীর জেনারেলরা ছিল বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক। রিপাবলিকান সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি ও শ্রমিক কৃষকদের ন্যায্য দাবি সমর্থনে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই যুদ্ধে স্পেনের জনগণের পক্ষে তাদের অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য দেশবিদেশের গণতন্ত্রবাদী এবং মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তোলেন ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড। সেই যুদ্ধে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী লেখক রালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল। জন কর্ণফোর্ড রণাঙ্গণে মৃত্যুবরণ করেন। স্পেনের

বিখ্যাত ফ্যাসিবিরোধী কবি ও নাট্যকার গার্থিয়া লোরকাকে ফ্যাসিস্তরা যুদ্ধের গোড়াতেই বার্সিলেনোয় হত্যা করে।

আমরা অনুমান করতে পারি যে, সোমেন চন্দ-র লেখক জীবনের শুরুতে রালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল ও লোরকার জীবন, রচনা ও আদর্শ বিশেষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই সমস্ত মহৎ শিল্পী ও আদর্শবাদীদের রচনা তাঁকে যেমন অনুপ্রাণিত করে, তাঁদের আত্মদানও তাঁকে তেমনি উদ্বুদ্ধ করে। বলতে গেলে তিনি তাঁর অনুভব, অধ্যয়ন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনাদর্শ আবিষ্কার করেন এবং সেই আবিষ্কারের পথ ধরেই সেদিনকার বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। তার আগেই তাঁর লেখক সত্তার উন্মেষ ঘটেছে। লেখক হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের অন্বিষ্ট। জীবনকে দেখা ও তাকে বিচার করার বৈজ্ঞানিক ও মানবিক অমোঘ সত্যনিষ্ঠ পথ হিসেবেই তিনি মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতা কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হওয়ার পিছনেও ছিল তাঁর সেই লেখকসত্তার অবিরল আগ্রহ। কীভাবে প্রকৃত জীবনবাদী লেখক হওয়া যায়, কীভাবে সমাজবাস্তবতাকে প্রকৃত সত্যের আলোকে যথাযথভাবে শিল্পরূপ দেওয়া যায়, এটাই ছিল তাঁর একমাত্র অন্বেষণ।

সোমেন চন্দ-র জীবনের সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র সুকান্তর জীবন। সোমেন বয়সে কিছু বড় ছিলেন। একইভাবে তাঁরা দুজনেই মার্ক্সবাদকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে গ্রহণ করে পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের উভয়ের আদত শিকড় ছিল সৃজনধর্মী শিল্পে। তাঁরা প্রকৃত মার্ক্সবাদী লেখক হবার জন্যই পার্টির কাজে এমনভাবে লিপ্ত হয়েছিলেন। কেন না তাঁদের কাছে সাহিত্য কখনই শৌখিন মজদুরি ছিল না। জীবনের রক্তাক্ত প্রচ্ছদে মোড়া সেই সাহিত্যকর্মের সত্যনিষ্ঠ উপস্থাপনাই ছিল সোমেন ও সুকান্তর একমাত্র লক্ষ্য।

২

আজ আমরা ভেবে আশ্চর্য হই, এত অল্প বয়সে সোমেন কীভাবে তাঁর শিল্পীসত্তার উত্তরণ ঘটাতে পেরেছিলেন। বাংলার প্রগতিবাদী শিল্পী-লেখকরা তখন সবে সংগঠিত হচ্ছেন। শিল্পী তুমি কার সঙ্গে ?—এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন প্রত্যেক সৎ লেখক। ইয়োরোপের বিবেকের কণ্ঠস্বর রোমাঁ রলাঁ লিখলেন 'আই উইল নট রেস্ট', স্পেনের যুদ্ধে নিহত তরুণ কবি জন কর্ণফোর্থের

সংকলিত গ্রন্থের নামকরণ হল 'কমিউনিজম ওয়াজ মাই ওয়েকিং টাইম', পাবলো নেরুদা লিখলেন আগুন-ঝলসানো কবিতা 'স্পেনের হৃদয়ে ক্ষত', মুন্সি প্রেমচাঁদ এই রুগ্ন ধনবাদী সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে লেখেন 'মহাজনী সভ্যতা' এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম ভাষণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সভ্যতার সংকটের দিকে। মার্ক্সবাদী কবিদের অগ্রণী বিষ্ণু দের কলমে ঝলসে ওঠে সেই অমোঘ প্রত্যাশার প্রশ্ন : জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার, হৃদয়ে আমার চড়া, / চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না এই দীপ্ত অশ্বারোহী কীসের প্রতীক। এই সময়ে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান এবং মানবসভ্যতা ধ্বংস করার জন্য তার আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মার্ক্সবাদী লেখকের সামনে একটাই পথ খোলা। সে পথ হল, সর্বশক্তি দিয়ে এই সভ্যতাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। সোমেন চন্দ-র কোনো শিক্ষক ছিলেন কিনা জানি না। জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর পাঠগ্রহণ। মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তিনি তাঁর লেখক চরিত্রের উত্তরণ ঘটান। কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্ব তাঁর কাছে শুধু তত্ত্বকথা হিসেবেই প্রতিভাত হয়নি। এই তরুণ এই তত্ত্ব থেকে পেয়েছিলেন বিশ্ববীক্ষার প্রেরণা। সে কারণেই সোমেন শুধুমাত্র তাত্ত্বিক হয়েই তাঁর শিল্পীর কর্তব্য শেষ করতে চাননি। অরণ্য দেখতে গিয়ে বৃক্ষকে উপেক্ষা করেননি। যে-তত্ত্ব গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় না—কাজ করতে শেখায়, প্রেরণা দেয়, শিল্পী সোমেনের কাছে সে-তত্ত্বই জীবনসত্যের নির্দেশক এবং চালিকাশক্তি হয়ে দেখা দিল।

সোমেন চন্দর স্বল্পায়ু জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই তরুণ প্রথম থেকে শিল্পসৃষ্টিকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিল্প জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র নয়, তার সত্য আবিষ্কার। জীবনের সারাৎসারই শিল্পনির্মিতির উপকরণ। সোমেন চন্দ শিল্পের এই সত্য স্পর্শ করতে পেরেছিলেন অল্পবয়সেই। তাঁর যে-সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো আলোচনা করলে কোনো সন্দেহ থাকে না যে সোমেন একজন সত্যিকারের জীবনশিল্পী হবার সম্ভাবনা নিয়েই কলম ধরেছিলেন। তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশের আগেই তাঁকে নির্মমভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল ফ্যাসিস্ত ঘাতক। এ তাঁর প্রাপ্য ছিল না। একমাত্র অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষবশতই ফ্যাসিস্তরা একটি সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করল। চল্লিশের দশকে ভারতের রাজনীতির মূলস্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার আদর্শ ও

আন্তর্জাতিকতাবাদের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য সেদিন যে-দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছিল সোমেন চন্দ ছিলেন তারই প্রতিভূ। ইতিহাস প্রমাণ করেছে সেই নীতির অভ্রান্ততা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লালফৌজের হাতে নাৎসি জার্মানি পরাভূত হয়। হিটলার দম্ভভরে বলেছিলেন যে মস্কোতেই ১৯৪১-এর বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করবে নাৎসিরা। মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে সোভিয়েট বাহিনী ১৯৪৫ সালে রাইখস্ট্যাগের ওপর লালপতাকা উড়িয়ে তার জবাব দেয়। স্তালিন্‌গ্রাদের যুদ্ধের পর চরম কমিউনিস্ট বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী উইনস্টন চার্চিলকে বলতে হয়, ইট ইজ দা রেড আর্মি হুইচ টোর দা গাট্ অভ দি নাৎসিজ। ইতিহাসের সত্য পর্যালোচনার এই শক্তি সোমেন পেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য এবং এই আদর্শই তাঁকে দিনে দিনে কাজের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট লেখক তৈরি করে তুলছিল।

৩

শিল্পের জন্য সোমেন প্রভূত পরিশ্রম যে করেছেন তাঁর ছোটগল্পগুলিতে তার চিহ্ন রয়েছে। একমাত্র প্রগতিশীল চেতনা থাকলেই সার্থক শিল্পী হওয়া যায় না। শিল্পের সত্য সম্পর্কে আত্মিক বোধ না জাগলে কোনো সৃষ্টির যথার্থ মূল্য অর্জন করতে পারে না। পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি এবং তার শিল্পরূপায়ণে নিপুণতা যে কোনো শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য। সোমেনের কাছ থেকে আমরা এই সব গুণেরই পরিচয় পেয়েছি।

সোমেন ছিলেন মূলত কথাশিল্পী। ছোট গল্প ও উপন্যাসই ছিল তাঁর শিল্পপ্রকরণ। কিছু কবিতাও অবশ্য তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু গদ্যই ছিল তাঁর প্রতিভার উপযোগী মাধ্যম। তিনি জীবনের দ্বন্দ্বের উৎস খুঁজতে চেয়েছেন। সোমেনের রচনার মধ্যে একটা সরল সৌন্দর্য আছে। তাঁর ভাষা ব্যবহার স্নিগ্ধ কিন্তু ভাবালুতার স্পর্শরহিত। প্রথম দিককার গল্পগুলিতে সোমেন যেন বিকাশের পথ খুঁজছিলেন। 'শিশুতরুণ' গল্পের উপসংহারে সোমেনের ভাষা আমাদের আপ্লুত করে যেখানে বালিকা বাসন্তীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দৃশ্যটি চিত্রিত :

"অচলায়তন ও নির্জনতার মাঝে একটা প্রাণের বিসর্জন, কতটুকু তাহার মূল্য জানি না। জানি পৃথিবী টলিবে না এই ঘটনায়। পৃথিবীর বুকে ইহা নূতন নয়, জানি মানবজীবন কেমন দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, তেমনই চলিবে,

কিন্তু অকালে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়িল তাহারই কাহিনী লিখিতে কেন আমার এত আগ্রহ! চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়াই আসে যদি তবু কলম কেন থামে না কেমনে বলিব, ইহা যে আজও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

[শিশু তরুণ]

সোমেনের সংবেদনশীলতা এবং ভাষা ব্যবহারে তাঁর সংযত নৈপুণ্য এই গল্পটিতে আমরা পাই। সোমেন সম্ভবত তখন কুড়ির কোঠাও স্পর্শ করেননি।

সোমেন যদি শুধু রোমান্টিক গল্পই লিখতেন তাহলেও একদিন তিনি বাংলা সাহিত্যে আসন করে নিতে পারতেন। কেন না 'ভালো-না-লাগার-শেষ'-এর মতো মধুর প্রেমের গল্প তিনি লিখেছেন। তাঁর অল্প আলোচিত গল্পগুলির মধ্যেও বিষয় নির্বাচনে এবং ভাষা ব্যবহারের সংযমে সোমেন সার্থক শিল্পীর সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য। 'অকল্পিত' গল্পের ইঙ্গিতময়তায় সোমেনের জীবনদৃষ্টির অসাধারণ পরিচয় যেন অকস্মাৎ পাঠকের সামনে উন্মোচিত। শিল্পপ্রদর্শনীতে শিল্পী জীবানন্দর আঁকা Mass ছবিটির তাৎপর্য এইভাবে সরল স্বল্প কথায় ব্যাখ্যাত হতে দেখি:

"নির্মল বলিল, দেখেছেন কমরেড ঘোষ, ম্যাস-এর কী চমৎকার রূপ ফুটে উঠেছে এই একখানা ছবিতে! এরা পথ চলতে পারে না, এদের দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই, এদের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, অথচ এরা জীবনের জীবন, মহাপ্রাণের মূল উৎস, মুষ্টিমেয় মানুষের অসম্ভব বিলাসের উপকরণ জোগায় এরাই।"

[অকল্পিত]

তাঁর গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনস্পতি, সংকেত, দাদা এবং ইঁদুর। বনস্পতি একটি প্রতীকী গল্প। ইতিহাসের উত্থানপতনের সাক্ষী এই বনস্পতির একদিন ঝড়ে মৃত্যু হয়। কিন্তু ইতিহাস সেখানে শেষ হয়ে যায় না। সোমেন আমাদের জানান, "সেই বীজ হইতে একদিন অঙ্কুর দেখা দিবে, তারপর অনেক নূতন বৃক্ষ জন্ম লইবে, ইহাও আশা করা যায়।" এই ছিল সোমেনের শিল্পের সত্য, উপলব্ধির সত্য। তিনি কখনো কলরোলের ভাষা ব্যবহার করেননি। জীবন প্রবাহের মতো তা অবিরল আপনগতিতে বহমান কিন্তু লক্ষ্য তার স্থির মোহানার দিকে। শিল্পের রস কীভাবে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করতে হয় এই তরুণ লেখক কত অল্পবয়সে তা আয়ত্ত করেছিলেন তা ভাবলে আমরা বিস্মিত হই। প্রগতিসাহিত্যের প্রকরণগত এবং উপকরণগত সামঞ্জস্যের উল্লেখ্য উদাহরণ সোমেন চন্দর গল্প।

'সংকেত' গল্পের দালাল চরিত্র নিখুঁতভাবে সোমেন এঁকেছেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্য সোচ্চা মৌলভী কাজের লোভ দেখিয়ে গ্রামের চাষীর ঘরের মানুষদের ভুলিয়ে ভালিয়ে স্টিমারে চাপিয়ে নিয়ে গেল। জীবিকাসন্ধানী গ্রামের গরিব মানুষের সামনে প্রত্যাশার ঝিলিক খেলে যায়। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। রহমানের মতো গরিব সরল চাষী যুবকের কাছেও তখন সত্য প্রতিভাত হয়। তার মনে পড়ে যায় ধর্মঘটি নেতাটির কথা : "বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে রাখবেন, আজ আমাদের যারা শুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না।" না, রহমানের মতো মানুষ ধর্মঘটি শ্রমিকভাইদের বুক মাড়িয়ে কাপড়ের মিলে প্রবেশ করে। সংকেত সে ঠিকই টের পায়।

সোমেনের 'দাঙ্গা' গল্পটি অসাধারণ। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা শহরে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হত। সেই পরিবেশে দাঁড়িয়ে একজন তরুণ লেখক লিখলেন এমন একটি গল্প যা আজও সমান তাৎপর্যময় আমাদের এই সাম্প্রদায়িক বিষ-জর্জরিত সমাজে। অশোক তার সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ভাই অজয়কে উত্তপ্ত স্বরে বলে, 'স্টুপিড জানিস দাঙ্গা কেন হয়? জানিস প্যালেস্টাইনের কথা? জানিস আয়ারল্যাণ্ডের কথা, মূর্খ!' শুধু বক্তব্যেই যে এই গল্পটি অসাধারণ তা নয়, লেখকের শিল্পীজনোচিত সংযম পরিণত জীবনবোধের স্বাক্ষর বহন করে।

তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি বহু আলোচিত। সোমেন যে কত বড় শিল্পী তরে প্রমাণ এই গল্পের প্রকরনশৈলী। একটা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিদিনের তুচ্ছতা, দীনতা, আশা-নিরাশাকে ঘিরে এই গল্প। সোমেনের শিল্পীর কলম বর্ণনা করছে মায়ের সর্বংসহা রূপটি এইভাবে—'মা ঘরের ভিতর ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করলো।' কী অসাধারণ ব্যঞ্জনায় এই চিত্রকল্পে লেখক আমাদের ভাবান। অন্যত্র এই গল্পেই সুকু তার পিতামাতার বিবর্ণ প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষণিকের দাম্পত্য মিলনের কথা ভেবে বলছে, 'মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম'।

'ইঁদুর' গল্পের শিল্পবিচারে সোমেনের এই সব শব্দ ব্যবহার যে কোনো পরিণত শিল্পীর পক্ষেই ঈর্ষণীয়।

এই অল্পবয়সেই সোমেন বিস্তর অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিলেন বিচিত্র। তাঁর

প্রকৃতি ছিল ভাবুকের, সংকল্প ছিল একজন আদর্শবাদী বিপ্লবীর। তাঁর 'বিপ্লব' গল্পে মণ্টু বলে, এ যুগের সবচেয়ে বড়ো দান সাম্য—মানুষের জীবনের এক নূতন অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। এই বিশ্বাস সোমেনকে শিল্পী করেছিল, তাঁকে দিয়েছিল বিপ্লবী হবার প্রেরণা। তাঁর লেখায় মানুষের জীবনের পরিবর্তনের কথা আছে, ভালবাসার কথা আছে। বেঁচে থাকলে এক বনস্পতির সম্ভাবনা নিশ্চয় পূর্ণ করতেন সোমেন।

স্পেনে ফ্যাসিস্তরা যখন লোরকাকে হত্যা করল তখন আরেক বিপ্লবী কবি লোরকার বন্ধু পাবলো নেরুদা আক্ষেপ করে উঠেছিলেন, হায় হায় এমন একজন কবিকে হত্যা করে ফ্যাসিস্তদের কী লাভ হল?" কেন ওরা তাঁকে মারল?

সোমেন চন্দ-র ঘাতকের উদ্দেশ্যেও মহাকালের একই জিজ্ঞাসা ওঁকে হত্যা করে কী লাভ হল ফ্যাসিস্তদের? কেন ওরা তাঁকে মানুষের শিল্পী হিসেবে তাঁকে বাঁচতে দিল না?

গ্যুনটার গ্রাস্‌-এর কবিতা

মূল জর্মন থেকে অনুবাদ : সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী

[গ্যুনটার গ্রাস্‌-এর বহুমুখী প্রতিভার পরিচিতির প্রয়োজন নেই। তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর গদ্যে। কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অন্য এক গ্রাস্‌-এর পরিচয় পাই, যিনি যুদ্ধোত্তর জর্মন সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যূনতম শব্দ বা বাক্য ব্যবহারে পাঠককে কত বেশী ভাবিয়ে তোলা সম্ভব, অর্থাৎ কত বেশী কথা বলা যায়। আরো দু-একটা কথা মনে রাখা দরকার। গ্রাস্‌ মনে প্রাণে সোশ্যালিস্ট এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল দ্বিখণ্ডিত জার্মানী তাঁকে পীড়া দেয়।
এখন প্রশ্ন আসতে পারে, ঠিক এই কটি কবিতা কেন অনুবাদ করা হল। সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী সাহিত্যে অনুরক্ত। জর্মন ভাষা যথেষ্ট শেখার ফলে জর্মন সাহিত্য নিয়ে কাজ করে আসছেন। এই তিনটি কবিতা সবচেয়ে ভাল উৎরেছে এবং এগুলো কোনো দেশ বা কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়।]

যা শুনছি

আমি নিজের কানে আজ
চারবার দমকলের ঘণ্টা শুনেছি।
আমি টেবিলে বসেছিলাম আমার কান সমেত
আর বলেছিলাম :
আবার দমকল।

আমি বলতেও পারতাম :
কাগজের ব্যাগের খরচা বেড়েছে।
কিম্বা :
জুতোজোড়া মুচির কাছে দিতে হবে।
কিম্বা :
আগামীকাল শনিবার।
আমি কিন্তু বলেছিলাম :
আবার দমকল ;

তা সত্ত্বেও আমাকে যে ঠিক বুঝেছে,
জানে,
আমি কাগজের ব্যাগ,
জুতোজোড়া মুচি অবধি পৌঁছুনো,
শনিবার বলতে,
সপ্তাহের শেষ বলতে চেয়েছি।

মূল জর্মন রচনা: VOM HOERENSAGEN

তিন সপ্তাহ পরে

বেড়ানো শেষে ফিরে
আমার ফ্ল্যাটের তালা খুলে
দেখলাম টেবিলের উপর সেই এ্যাসট্রেটা রয়েছে,
যেটা আমি তখন পরিষ্কার করতে ভুলে গেছি।

এমন কাজ কখনও সেরে ওঠা যায় না।

মূল জর্মন রচনা: DREI WOCHEN SPAETER

আনন্দ

একটা ফাঁকা বাস
হুড়মুড়িয়ে ছুটছে তারাছেটানো রাতে।
চালক হয়ত গান গাইছে
আর তাতেই তার আনন্দ।

মূল জর্মন রচনা: GLUECK

ঢোঁড়া উপাখ্যান

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

দুপাশের সবুজকে ছিঁড়ে রমারম চলে গেছে লাল রাস্তা। রু-রু-রু বাতাস। বংকা দাঁড়ায়।

—একটা বিড়ি খাবার মন করে।

—ধুস্। বিড়ি খাব কিরে, চল পা চালিয়ে, স্যারের এখনো চ্যান খাওয়া হয়নি। নস্করীবাবু বলে। নস্করীবাবুর হাতের আঙুলে সিগারেট।

—না বাবু, এট্টু বিড়ি না ছাড়া চইলবে নি। এট্টু রোসো।

—'এক পয়সার মুরগী তো চার পয়সার পুদ্‌গানী'— নস্করীবাবু নিজে নিজে হাওয়া আর ধানগাছের কাছে বলে। আড়চোখে অফিসারের দিকে একবার তাকায়। অফিসার তখন আকাশের মেঘে কুড়িমুড়ি দিয়ে বসা বোতল-দৈত্যটাকে দেখছিল।

বংকার মাথা থেকে নস্করীবাবু বেডিংটা নামায়, কালো ট্রাংটা নামায়। কালো ট্রাংকের গায়ে সাদা রং-এ লেখা অমিতাভ মুখার্জী, ল্যাণ্ড রেভিনিউ অফিসার।

—এখানে বসুন স্যার, এই ট্রাংটার উপর। একটু রেষ্ট নিয়ে নিন, নস্করীবাবু বলল। নস্করীবাবু হল 'ভাসাদেউলে' ক্যাম্পের আমিন।

—আপনার দুটো চিঠিই পেয়েছিলাম স্যার, আপনার লাষ্ট চিঠিটায়, ডেটেড টোয়েনটি ফিফ্‌দ আগষ্ট, লিখেছিলেন ফোর নুনে জয়েন করবেন। বেলা এগারটা থেকে বসে আচি স্যার।

—দুঘণ্টা তো বসে রইলাম গুস্‌করায়, কাসেম-নগরের বাস নেই। পলসী থেকে তো ষ্টার্ট করেছিলাম সকাল সাড়ে সাতটায়।

—তাইতো স্যার, ঝক্কি কি কম? তা গুস্করায় একটু জলটল খেয়ে নিয়েছিলেন তো স্যার, বাস ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গেই হালদারের দোকান ছিল?

আবার চলতে শুরু করে ওরা। আর কদ্দুর নস্করীবাবু

—তা ধরুন আরও তিন কিলোমিটার টাক।

—হু।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—ওর যেখানে থাকতে হবে, সেখান থেকে নিয়ারেষ্ট

বাসরাস্তা ৮।৯ কিলোমিটার দূর। কি আজব যায়গায় ট্রান্সফার। অমিতাভ ভাবে।

—অফিসে কাজ-কম্মো হচ্ছে কিছু? অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

—রাজা নেই তো রাজ্য চালাবেক কে? অফিসার কৈ?

—অফিসঘরটা কেমন?

—গেলেই দেকবেন।

—থাকব কোথায়?

—আমরা তো অফিসেই থাকি। আপনি অফিসার মানুষ, দেখুন…

—আচ্ছা আনন্দ কোঙারের নাম শুনেছেন? গলসীর আনন্দ কোঙার!

—মানে হাঁদুবাবু তো? কেন বলুন দেকি!

—না, এমনি। এখানেও ওঁনাকে চেনে?

—আমার ভেয়ের একটা চাকরী করে দিয়েছিলেন তো, একটা এমেলের চিঠি এনে দিইছিল আমার সোম্বন্ধী। সেই চিঠি নিয়ে ওঁনার কাছে গেলাম, ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাঁদুবাবু লোক খুব ভাল……।

অমিতাভ অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলে না। নস্করীবাবুও ঠিক বোঝেনা সাহেব হঠাৎ চুপ্ মেরে গেল কেন।

অমিতাভ এবার বংকার কাছে যায়।

—তোমার নাম বংকা?

—আজ্ঞা।

—বংকা কী?

—দাস।

গলার তুলসীমালার কণ্ঠি দেখে জিজ্ঞাসা করল, বৈষ্ণব?

—আমরা বলরামী।

—সেটা আবার কী?

—সেটা হল বলরামী।

—থাকা হয় কোথায়?

—থেকেও আছি গো, থেকেও নেই,
যেমন তুমি আর আমি রে ভাই—
চক্ষু মেলিলে সকল পাই
চক্ষু মুদিলে কিছু নাই।

নস্করীবাবু অমিতাভর হাতধরে মৃদু টান দিল।

—ওকে বকাবেন না স্যার, ও একটা খ্যাপা। নিজেকে ভাবে রামচন্দ্র। আসলে ও জাতে হাড়ি।

—নামতো বল্ল বংকা দাস।

—আরে দাসতো সবাই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও দাস কালিদাস ও দাস আবার বংকা দাস ও দাস। ও হল নিরাপদ চ্যাটার্জীর মাহিন্দার।

বংকা এবার রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। অমিতাভর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে নস্করীবাবু বলে—অনেক শর্টকার্ট স্যার আবার, রাস্তাতেই উঠব ফের।

ভাঙ্গা জমি। পতিত। পাথুরে। কাঁটাঝোপ, তাতে হলুদ ফুল, মাঠের মাঝখান দিয়ে টায়ারের গভীর কারুকাজ।

—এটা কিসের দাগ নস্করীবাবু?

—মাটির তলায় তেল আছে ভেবে অনেক লোকজন আর বড়বড় এয়েছেল স্যাল। মাস তিনেক তোলপাড় করে চলে গেল।

মাঝে মাঝে গর্ত। মাটি ফুঁড়ে চাগিয়ে আছে পাথর। বংকা অনেকটা এগিয়ে গেছে। অমিতাভ হুচোট খায়। নস্করীবাবু চেঁচিয়ে ওঠে। লাগেনিতো স্যার? অ্যাই বংকা, কায়দা দেকচ্ছিস! ফোঁপড়ী করে কে তোকে মাঠ ঠেঙে যেতে বলে ছিল? রাস্তা দিয়ে গেলেই তো হোত।

বংকা দাঁড়িয়ে যায়। বলে, আগে হাঁটনী, পাঁঠা কাটনী মাটি নিরোয়, পোয়াতীর টাই, এসব কম্মের যশ নাই।

নস্করীবাবু অমিতাভর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে কিছুটা ঘাড় বেঁকাল। যার মানেটা দাঁড়াল—দেখলেন তো, যা বলেছিলাম……

হলুদ টিনের পাতে কালো কালিতে লেখা—'সেট্‌লমেণ্ট হলকা অফিস। ভাসা দেউলে'। পাকা বাড়ী। দেয়ালে সদ্যমারা পোষ্টার—কাসেমনগর ফুটবল মাঠে যাত্রাপালা—সিঁথির সিঁদুর। পরবর্তী আকর্ষণ ফুলনদেবী। টানা বারান্দা, তিনটে ঘর।

—'এইযে স্যার অপিস ঘর। পাশের এই ঘরে আমরা কোনরকমে থাকি, আর এই ঘরে রান্না।

—বাথরুম নেই?

—ওটা স্যার বাইরে যেতে হয়।

অমিতাভর কুঞ্চিত কপালে বিরক্তি চিহ্ন নস্করীবাবুর নজর এড়ায় না।

—আমিন আর নেই?

—আর একজন আছে স্যার, নারায়ণ গড়াই। দেশে গেচে।

—পেশকার ?

—দেশে।

—পিওন ?

—আসবে স্যার। এখন দেশে।

সকালবেলা উঠতে একটু দেরী হয়ে যায় অমিতাভর। বেশ ঝলমল করছে রদ্দুর। বারান্দা জুড়ে গোটা দশবারো বাচ্চাকাচ্চা। নস্করীবাবুর খালি গা। অমিতাভর বসার চেয়ারটা বার করে বসে পড়াচ্ছে—স্বরে অ খিয় অক্ষ। দ খিয় দক্ষ……।

সকালবেলাটায় সামান্য টিউশনি স্যার।…নস্করীবাবু বলে।

অমিতাভর তোয়ালে জড়ানো, হাতে টুথব্রাস, বাইরে বেরুচ্ছে, এমনসময় ধুতি ও হাফ পাঞ্জাবী পরা ফর্সামত একজন, পাকাচুল, পুরো বডিটাই হাসছেন, হাতজোড় করে বল্লেন—আপনি বুঝি নতুন সেটলমেণ্ট অফিসার ? নমস্কার। আমি নিরাপদ চ্যাটার্জী। অমিতাভ একহাতের টুথব্রাস অন্যহাতের সিগারেটের সঙ্গে লাগিয়ে মাথা নীচু করে।

নিরাপদবাবু বল্লেন—বাহ্য ফিরতে যাচ্ছেন বুঝি ? যান। আমি বসচি।

—কিছু দরকার ?

—সবসময় কি দরকার-অদরকার বিচের চলে ? আমি আসি। খোঁজ-খপর করি।

—ও। ভাল কথা। আনন্দ কোঙার কে চেনেন ? গলসীর ?

—হাঁহ্ কোঁয়ার ? খুব করিতকর্মা লোক। কেন, কী হয়েচে ?

—না, এমনি।

অমিতাভ বাইরে আসে। পর পর দশবারোটা কাঁচা ঘরের পরই আকাশের নীল মাঠের সবুজে মিশেছে। মাঠ দাপানো হাওয়া। ওর আর কিছু না। একটু আড়াল চাই।

গলসীতে বেশ তো ছিল অমিতাভ। জি. টি. রোডের উপরই অফিস। উল্টোদিকের বিডিও অফিসের ষ্টাফ কোয়ার্টার। এক ব্যাচেলর এক্সটেনশন অফিসারের কোয়ার্টারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল। স্যানিটারী ল্যাট্রিন

ছিল, ট্যাপ ওয়াটার ছিল। সন্ধ্যের পর পাশের কোয়ার্টারে গিয়ে বৌদি চা খাবো···।

গলসীর সেটেলমেণ্ট অফিসে এক দুপুরবেলা এসেছিল আনন্দ কোঙার।
'এই একটু আলাপ করতে এলাম নিন, সিগ্রেট খান।
একেবারে কচি বয়েস আপনার। ফাষ্ট পোষ্টিং?'

কিছুদিন পরই তদন্তের কাজ শুরু হ'ল। মাঠে গেল অমিতাভ।

ডি ভি সি-র খাল মাঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে চেলে গেছে। সেচের জলে বছরে তিনবার চাষ।

—৬৭ নম্বর দাগ?

—শালি। দং আনন্দ কোয়ার। পিং দীনবন্ধু। ৮০ শতক

—৬৯ নম্বর?

—শালি। দং বিভাবতী দেবী। স্বামী আনন্দ কোঙার ৫৫ শতক

—৭০ নম্বর?

—নিস্তারিণী দেবী। স্বামী ৺রাধামাধব ঘশ। সাং বারাণসী। ৬৯ শতক। লিখুন বর্গা দখল আনন্দ কোঙার।

—সে কী কথা আনন্দবাবু, কী বলছেন? আপনি বর্গাচাষী? আনন্দবাবু হওয়াই শার্টের তিন নম্বর আর চার নম্বর বোতামের ফাঁকা দিয়ে ভুড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বিধবা মামীমার জমি ভাগে চষি।

—আপনি নিজে চষেন?

—অতশত নিকেস নিচ্ছেন কেন বলুনতো? গভরমেণ্ট বলছে বর্গা রেকর্ড করতে, আপনি রেকর্ড করুন। যত রেকর্ড করতে পারবেন আপনার প্রমোশনের ভাল হবে।

—আমার প্রমোশোন আপনাকে ভাবতে কে বলেছে?

—আচ্ছা, ঠিক আছে মশাই, বর্গা লিখতে হবে না। নিস্তারিণী দেবীর নামটাই লিখে রাখুন।

—আপনার মামীমা কোথায়?

—বল্লুম তো, কাশীবাসী। চাষ করে আমি ওনাকে টাকা পাঠাই।

—ওনার কত জমি আছে?

—তা বিঘে চল্লিশ হবে।

—টাকা পাঠিয়েছেন এমন মানিঅর্ডার রসিদ আছে?

—সে সব কি যত্ন করে রাখা করেছি?

—আপনার মামীমা ফসলের টাকা পেয়েছে, এমন চিঠিপত্র আছে কিছু?

—জামার ভিতর থেকে হাত বের করে আনে আনন্দ কোঙার। সিগ্রেট ধরায়। বলে মামীর নামের দলিল রয়েছে—তাতে কি হয়েছে? আদৌ আপনার মামীমা আছেন, এমন প্রমাণ দেখান।

—তাহলে কাগজের জোরে করবেন না?

অমিতাভ ভিতরে ভিতরে বেশ থ্রিল্ড হচ্ছিল। সিলিং ফাঁকি দেয়া নীট ১৪ একর জমি বার করে ফেলেছে ও। অমিতাভ সিওর যে নিস্তারিণী দেবী সম্পূর্ণ ফল্‌স্।

সন্ধ্যাবেলা আনন্দবাবু হাজির। হাতে এক বাকশো মিষ্টি।

—একা একা বসে আছেন, আরে বে-থা করুন ভাই। কেউ ঘরে এলে চা করে দেবারও কেউ নেই।

—ঘরেই এসে গেছেন? তা আপনার মামীমার চিঠিপত্র খুঁজে পেলেন?

—চিঠিপত্র খুঁজে পাওয়া কি খুব শক্ত ব্যাপার নাকি? দরকার হলে কাশী থেকে একডজন চিঠি লিখিয়ে আনতে পারি।

আনন্দবাবুর হাতটা ওর বুকপকেটের কাছে যায়। বলে, অতসব ফ্যাচাং-এর দরকার নেই। এটা ধরুণ। দু হাজার আছে।

অমিতাভ উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছিল—এক্ষুনি বেরিয়ে যান, টাকা দেখাতে এসেছেন!

আনন্দবাবু হঠাৎ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। তারপর দাঁতমাজার আঙুলটা নাড়িয়ে বল্লেন—আমার নাম হাদু কোঁয়ার। আগুরির বাচ্চা বটি। আমিও দেখে নেব। কাজটা ভাল করলেন না।

পরে জেনেছিল হাদুবাবু একজন বিখ্যাত লোক। চারটে বাস লাইনে খাটে। বর্ধমান বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। কোল্ডস্টোরেজ আছে একটা। এখানকার গলসীর স্কুলের জন্য দান করেছিলেন উনিই, বর্ধমান শহরে থাকেন, ওখানে বাড়ী আছে, এখানে মাঝে মাঝে আসেন।

মাসখানেক পরে অমিতাভ খাকি খামে অশোক স্তম্ভ লাগানো রেজিষ্ট্রি চিঠিতে জেনেছিল—গভর্ণর ইজ প্লীজড টু ট্রান্‌সফার শ্রীঅমিতাভ মুখার্জী, কে.জি.ও. গ্রেড ওয়ান টু ভাসা-দেউলে হলকা অফিস ইন দি ইণ্টারেষ্ট অফ পাবলিক।

একটু আড়াল খুঁজছিল অমিতাভ। অবশেষে একটা ছোটমত কালভার্ট পায়। আপে জল বইছে। এখানেই একটা পার্মানেণ্ট ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? ওর অফিসে কিছু ইঁট পড়ে থাকতে দেখেছিল, ওখান থেকে দুটো ইঁট দুই হাতে নিয়ে গেজেটেড অফিসার হাঁটছে কালভার্টের দিকে, তখন বংকার সঙ্গে দেখা…

—কি ছ্যার, আপনার হাতে ইঁট? দেন-দেন, আমার হাতে দেন. কোথায় নে যাব?

অমিতাভর বলতে লজ্জা করে কোথায় নিতে হবে। বলে তোমার দরকার নেই। তোমার নিজের কাজে যাও। বংকা যাবার সময় বিড়বিড় করে—আমি যাই তিনি তাই, যা তিনি তাই তুমি, বোবা কালায় কয় কথা ইন্দুরে খায় বিড়ালের মাথা।

ক্ষ্যাপা না কী? অমিতাভ ভাবে।

ইঁট দুটো নিয়ে কালভার্টের তলায় চলে গেল অমিতাভ। ইঁট দুটো পেতে নেয়। তলায় জল। নিরিবিলি। কাশফুল দুলছে।

কদিন পরে ঐ কালভার্টের ওখানে যাবার সময় দেখে, একটি ১২।১৪ বছরের ছেলে ইঁট দুটো নিয়ে আছে। অমিতাভ ঘাবড়ে যায়।

—আরে আরে এগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—শান হবে। পা ধুবার শান।

—মানে?

—পা ধুয়া হবে, পায়ে কাদা মোট্টে লাগবে না।

নিরাপদবাবু রোজই প্রাতঃভ্রমণে বের হন। পঁচাত্তরেও সুন্দর স্বাস্থ্য। গোয়ালটা, মড়াইটা, দিঘীটা, একটু তদারকী করে অফিসটায় আসেন। আসলে এটা তাঁরই তো বাড়ী। বড় ছেলেটা এখানে ডাক্তারী করবে ভেবে রাস্তার ধারে এই বাড়ীটা বানিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে বর্ধমান টাউনেই ডাক্তারী করে। ওখানেই একটা ছোট করে নার্সিংহোম বানিয়েছে।

নিরাপদবাবু জিজ্ঞাসা করে—কী সাহেব, আপনি নাকি দুটো ইট দু হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন? ব্যায়াম করছিলেন নাকি?

অমিতাভ একটু হেসে নিয়ে ব্যাপারটা বলে। আর বলে—সব কিছু পারি নিরাপদবাবু, মাঠে বসে ঐটে পারি না।

নিরাপদবাবু বল্লেন—ছ্যাঃ। আমারই তো আগে তত্ত্বতালাশ নেয়া

উচিত ছিল। আপনি সিধে আমার বাড়ী চলে যাবেন। কোন সংকোচ করবেন না।

—হুঃ, তা কি হয় নাকি? আপনার বাড়ী যাব ঐটে করার জন্য?

—শুধু ঐটি করার জন্য যেতে কে বলেছে? সবসময় যাবেন। আমার ছোট ছেলেটি তো আপনারই বয়সী। বিকাশের সাথে আলাপ হয়েছে?

একদিন নিরাপদবাবুর সঙ্গে ও বাড়ী গেল অমিতাভ। পাঁচিল ঘেরা একতলা বাড়ী, উঠানে বিশাল মরাই, উঠানের কোনায় পায়খানাটাকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালেন নিরাপদবাবু। ভালই হল বাড়ী থেকে বেশ দূরেই আছে। বারান্দায় শস্যের ভ্রাণ ও ইঁদুরমারার কল। নিরাপদবাবুর স্ত্রী দুধ মেরে ঘরে তৈরী করে ক্ষীরের নাড়ু ও বেশি মিষ্টি দেয়া চা দিলেন। বিকাশের স্ত্রীর চুড়ির শব্দ ও গলার স্বর শুনল। গোলগাল চেহারার বিকাশ বি কম পরীক্ষা দিয়েছিল, হয়নি। একটা ট্রাক্টরের জন্য ব্যাংক লোন চেয়েছিল, মায়ের দয়ায় হয়ে গেছে। গলায় ঝোলান সোনার হারের লকেটে মিনে করা মা কালী স্পর্শ করে হাত কপালে ছোঁয়াল। শিগগিরী ট্রেনিং-এ যেতে হবে হরিয়ানা। বিকাশ বাগানে নিয়ে গেল। সিগারেট বের করল। নিন স্যার। ধরান একটা। বিকাশের পরনে কর্ডের প্যান্ট এবং পলিয়েষ্টার গেঞ্জী। আঙুলে প্রবাল।

জানেন স্যার, বাবার খুব আপত্তি, বলছে বামুনের ছেলে চাষ করতে নেই। ট্রাক্টর তো কি হয়েছে, ওটাও তো লাঙল, কলের লাঙল। আমি ওসব মানি না। যত সব কুসংস্কার, আপনার কি ওপিনিয়ন স্যার?

অমিতাভ বল্ল—পাঞ্জাব-হরিয়ানায় উঁচু জাতের এডুকেটেড ছেলেরাই তো চাষ করছে·····

বিভিন্ন সাহেব ঠিক এই কথাই বল্লেন আমাকে। উনি আমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসেন। ট্রাক্টর ছাড়া আর উপায় নেই স্যার, মুনিষ মজুররা পলিটিকস করতে শিখে গেছে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও···আর পড়তা পোষায় না। আমার স্যার একটু সুবিধা আছে, জমিগুলো সব একলপ্তে। দু একটা এক্সচেঞ্জ করতে হবে। একটু দেখবেন স্যার······

চিঠি পাঠিয়ে দেশে পালানো ষ্টাফদের অফিসে নেয় অমিতাভ। কুমুর নদীর পাড়ে মাপজোক শুরু করবে। বড় আঁকাবাঁকা নদী। বেহুলা নাকি

এই নদী বেয়েই লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভেসেছিল। মনসার অভিশাপে নদীটা এরকম এঁকেবেঁকে গেছে।

কাজ থেকে ফিরে এসে একটু রিলাক্স করার যো নেই। একটা ঘরে এক গাদা ষ্টাফ। ওরা কাগজে মোড়ানো বই পড়ে, টুয়েন্টি নাইন খেলে, অমিতাভর বইপত্র ওলোপালট হয়। বিদিশার চিঠিও সম্ভবত খুলে পড়েছে···।

—আপনি অফিসার মানুষ, এসব আমিন-পিওনদের সঙ্গে থাকেন কি করে বলুন তো? নিরাপদবাবু একদিন একা পেয়ে বলে।

—কি করা যাবে, সরকারের তো কোন ব্যবস্থাই নেই।

—তব্বেই বলুন সরকার কি করে এই অফিসারদের কাছে ভাল কাজ আশা করবে?

অমিতাভ কিছু বলে না।

এক কাজ করুন মুখার্জীবাবু। আমার বাড়ীতে একটা বাইরের ঘর এমনি এমনি পড়ে আছে। এটা বাবার আমলে গদীঘর ছিল। নিজের মত থাকবেন। কেউ ডিসটার্ব করবে না, চলুন দেখবেন ঘরটা।

অমিতাভ দেখল, ধুলো ভর্তি তক্তাপোষ আছে, টেবিল আছে, দক্ষিণের জানালা আছে। জানালার ধারেই বক ফুল গাছের পাতার ঝির ঝির। খুব পছন্দ হল ঘরটা। প্রাইভেটে এম. এ পরীক্ষাটা সামনের বছরই দিয়ে দিতে হবে। অমিতাভ বলল—আপনার ভাড়া নিতে হবে কিন্তু।

—সে দ্যাখা যাবে খন।

আবার বংকার মাথায় চাপল বেডিং আর কালো ট্রাংক।

অমিতাভ নস্করীবাবুদের কাছেই খেতে আসে। খাওয়া খরচ খুব কম পড়ে। নস্করীবাবুর বুদ্ধি অসাধারণ। শব্জীর মাঠে চেন পিওন নিয়ে যায় নস্করীবাবু, বলে মাপ হবে।

ভরা ক্ষেতে লোহার চেন চললে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে না?—

—তা কি আর করা যাবে, সরকারের কাজ। অবশেষে ফয়সালা হয়। চেন পিওন কুমড়োটা মুলোটা নিয়ে ফিরে আসে।

—এসব কি ঠিক হচ্ছে? এভাবে মিথ্যে কথা বলে···

নস্করীবাবু বলে—আমরা হচ্ছি স্যার আমিন। আপদের আ, মিথ্যেবাদীর মি আর নিমকহারামের ন মিলে হচ্ছে গে আমিন। আমাদের ছেলেপুলের সংসার। দেশে টাকা পাঠাতে হয়। আমাদের এভাবেই ম্যানেজ করতে হয়।

বিকাশ একদিন একটা কেরোসিন ষ্টোভ দিয়ে গেল। "চা-টা খাবেন স্যার, যখন ইচ্ছে হবে। একটু চা-চিনি রাখবেন, আমি আধসেরটাক করে দুধ দিয়ে যাব।"

—দুধ-টুধ দরকার নেই, আমার ত চাই বেশী ভাল লাগে। অমিতাভ তাড়াতাড়ি বলে।

বিদিশাকে চিঠিতে জানায়—আগের অসহ্য অবস্থায় আর নেই একটু বেটার আছি। নিজে রান্না করে খেলে কেমন হয়? সহজ রেসিপি পাঠিয়ে দিও। অভ্যেস হয়ে যাওয়া ভাল, পরে অনেক স্ত্রী-স্বাধীনতা হবে।

বিকাশ ট্রেনিং যাবে। দেউলেগড়ে পুজো দেয়া হল। দেউলেগড় মানে একটা ছোটখাটো ঢিপি। এখানে নাকি একটা দেউল ছিল। কুনুরের বানে সেই মন্দির ভেসে গেছে। তাই এই গ্রামের নাম ভাসা দেউলে। বিকাশের কপালে চন্দন তিলক। ওর মা যাবার সময় কেড়ে আঙুল কামড়ে দিল। মাথায় আলতো থুথু দিল। বিকাশের স্ত্রী কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। সে বিকাশকে পা ছুঁয়ে নমস্কার করল। বংকার মাথায় বেডিং। গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে উঠানে। অমিতাভর ঘরে এল বিকাশ। "আমার বাবা রইল। বাবাকে দেখবেন স্যার। আর আপনার টুকটাক কাজকর্ম বংকাকে বলবেন, করে দেবে।" 'এ্যাই বংকা সাহেবের জলটল এনে দিবি।'

গরুর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয় অমিতাভ। বিকাশ আস্তে আস্তে বলে—এই বংকাকে নিয়ে খুব ঝামেলা, কাজকম্ম কিছু করে না. খালি খ্যাপামী। পুরোন লোক, তাড়াতেও খারাপ লাগে—। গরুর গাড়িতে বিকাশের মা বাস ষ্টাণ্ড পর্যন্ত যাবে বোধ হয়। আরও দুজন মাহিন্দার, ওরা বর্ধমান পর্যন্ত যাবে বোধ হয়। আর বিকাশের মামাতো ভাই. হাওড়া পর্যন্ত যাবে বোধ হয়। বিকাশের চোখে গগল্‌স। পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা।

কুনুর নদীর পাড় থেকে মাপজোক সরে আসছে গ্রামের দিকে। নিরাপদ বাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা অমিতাভর ঘরে ঢুকলেন। হাতে সামান্য কচলানি ভাব। কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো মুখার্জীবাবু। তার পরে বললেন—আমার জমিতে কোন গণ্ডগোল পাবেন না মুখার্জীবাবু। কোন বর্গা চাষ নেই, যা ছিল উঠিয়ে দিয়েছি। মুনিষ-মাহিন্দার দিয়ে চাষ করাই। ছেলেটা তো নিজেই চাষ করবে বলছে। কাজটা কি ভাল হচ্ছে!

তা—খারাপ কি? অনেকেই তো করচে।

আপনারা পাঁচ জনে বলচেন বটে, কিন্তু মন সায় দেয় না। পরে লোক পাওয়া যাবে, কি বলুন, ট্রাক্টর চালাতে জানে এমন লোক মাইনে দিয়ে রাখলেই আর নিজেকে চালাতে হবে না কি বলুন। এরপর নিরাপদবাবু বলেন—একটা আমবাগান ছিল আমার, পৈত্রিক, তা বিঘা বিশেক ছিল। আম মোটে হয় না, কেবল জঙ্গল, তাই ওটা কেটে সাফ করে চাষের জমি বানিয়ে ফেলেচি। আগেকার রেকর্ডে ওটা আমবাগান দেখানো ছিল। এখন নতুন রেকর্ডে স্যার ওটাকে আমবাগানই রেখে দেবেন। জমি দ্যাখাবেন না…

ব্যাপারটা বুঝল অমিতাভ। পরিবার পিছু ৫২ বিঘে হল জমির সিলিং। এর বেশি হলে সরকার নিয়ে নেবে। কিন্তু বাগান থাকলে সে জমি রাখা চলে।

নিরাপদবাবু ছেলেদের নামে আলাদা আলাদা জমি সিলিং পর্যন্ত রেখেছেন। এখন আমবাগানটা যদি জমি দ্যাখানো হয়, সেই জমি সরকারের ঘরে চলে যাবার কথা।

কপাল কুঞ্চিত হয় অমিতাভর। বলে—তা কি করে সম্ভব! ওটাকে চাষের জমিই দেখাতে হবে।

অমিতাভর হাত চেপে ধরেন নিরাপদবাবু। বাইরে বকফুল গাছের ঝির ঝির। ঘরের সদ্য চুনকাম হওয়া দেয়াল থেকে উঠে আসা গন্ধের মধ্যে নিরাপদবাবু বল্লেন,—আপনি আমার ছেলের মত, এটা করে দিতেই হবে…।

বিদিশাকে চিঠি লেখার জন্য ডাইরীর কাগজ ছিঁড়ে অমিতাভ। বেশ কিছু দিন আগেকার লেখা একটা ছড়া পায়।

> ইঁদুবাবু ইঁদুবাবু কোথায় তুমি থাকো ?
> সর্বত্রই থাকি আমি খবরটাকি রাখো ?
> ইঁদুবাবু ইঁদুবাবু করছ তুমি কি
> এই দেখনা পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছি !
> হেরে গেলে হেরে গেলে কানুনগো মশাই,
> দুয়ো তোমায়, দুয়ো তোমায়, দুয়ো দিয়ে যাই।
> আরো যদি ইঁদুবাবু আসে শত শত
> করব না আর করব না আর আবার মাথা নত।

ধুস যত্তসব চাইল্‌ডিশ্ ব্যাপার। পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে অমিতাভ। এবার চিঠিতে লেখে…ব্যাড্‌লাক। কলকাতা গিয়ে এবার তোমার সঙ্গে

ব্যাথা হল না। পুরী কেমন কাটালে জানিও। জানো তো এখন নিজেই রান্না করছি। খাঁটি সরষের তেল পাচ্ছি। ঘানিতে ভাঙা, কলকাতায় ভাবাই যায় না। তরকারী ভাতে দিয়ে দিই, দুচার ফোঁটা সরষের তেল দিয়ে দিই, ব্যাস। বংকা নামে এক আজব লোক আমায় জলটল এনে দেয়। সর্বক্ষণ বিড় বিড় করে। চ্যাটার্জীবাবুদের গোয়াল ঘরের পাশে থাকে। খড় বিচালীতেই শোয়। বলে ও নাকি বলরামী। অথচ গলায় তুলসী মালা। ব্যাপারটা বুঝি না। চাকরীটা ভাল লাগছে না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন নজরে রেখো। টুকটাক পড়াশুনো করছি। এম. এ.-টা হয়ে গেলে একটা স্কুলে অন্তত হয়ে যাবে। বলো ?

বিকাশ ফিরেছে। গালের দুপাশে লাল লাল ছোপ। চোখের তলায় কালি। আর একটু ফুলেছে।

একদিন বিকাশ বলে—সে কী, আপনি নিজে বাসন ধুচ্ছেন, আমার কিন্তু চোখ টানছে। খুব খারাপ লাগছে দেখতে। আমি একটা লোকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাসন-টাসন মেজে দেবে।

—হারিকেনের চিমনিটা পরিষ্কার করা মহা ঝামেলার···

—ওটাও করে দেবে। সব করে দেবে, যা চাইবেন, বিকাশের চোখ দুটো একটু ছোট ছোট হয়, ঠোঁটে আঁকাবাঁকা হাসি।

একটা মেয়েকে নিয়ে এল বিকাশ। নাম কুসুম। বংকারই মেয়ে। ছোট বাচ্চা আছে একটা। বাচ্চাটা হবার আগেই লিভার-পচা রোগে মরেছে ওর স্বামী।

ভোর। সারারাত শিশিরের সোহাগ পেয়েছে মাঠ। মাঠের মাটিতে তাই সদ্য আসা ট্রাক্টর টায়ারের আলপনা। ট্রাক্টর এসেছে গ্রামে। উঁচু সিটে বসে ঘটঘট চালাচ্ছে বিকাশ। লাল ট্রাক্টর চলছে কেঁপে কেঁপে। চাষ নয়, এমনিই চালাচ্ছে হয়তো, খুশীর চালানো হয়তো, গায়ে ছাপ ছাপ গেঞ্জী। মুখে সিগারেট। জানালায় চোখ রেখে তক্তাপোষে শুয়ে আছে অমিতাভ।

কুসুম বাসন মেজে এনে রাখল। অমিতাভর দিকে তাকালো। ভাসা ভাসা চোখের তলায় কালি। চোখ কিছু বলতে চায়।

—কিছু বলবে ?

—না।

—তবে ?

—কিছু না বলে কুসুম চলে যায়। শাড়ীর আঁশটে গন্ধ বাতাসে লেগে থাকে।

নিরাপদবাবুর বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ে এবার জোর করে বিকাশের সঙ্গে অমিতাভকেও ভাইফোঁটা দিয়ে, দিয়েছে। নেমন্তন্নও ছিল। মুরগী-টুরগী হল। বিকাশ ওর ঘরে নিয়ে গেল অমিতাভকে। এই প্রথম। বিছানায় সত্য কাহিনী, তদন্ত কাহিনী এইসব। চুলের কাঁটা, ফিতে। মা কালীর বিশাল ছবি ঘরের দেয়ালে।

—একটা জরুরী কথা ছিল অমিতাভ দা।

আর স্যার নয়, অমিতাভ মার্ক করে।

—আমাদের জমিতে অনেক সিডুলকাষ্ট অনেকদিন ধরে আছে, কিছু বলি না আমরা। কোথায় যাবে ওরা। গাঁয়ে মাপ এলে ওদের কে···

উঠে দাঁড়ায় অমিতাভ। প্লীজ বিকাশবাবু, এ ব্যাপারে লিখে দেব। কিচ্ছু করার নেই। অমিতাভ পা বাড়ায়।

—আরে তাতো দেবেনই, সে কথা হচ্ছে না, বসুন না, উইল্‌সএর প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে বিকাশ। বলে—পুকুরপাড়ের ঝুপড়ী-টুপড়ীগুলোকে আপনি আপনার আইনে যা খুশী করুন, আমি কিছু বলব না। আমার রিকোয়েষ্ট হ'ল কুসুমের প্লটটা নিয়ে। কুসুমের শ্বশুর যখন ওখানে থাকতো, তখন রাস্তাটা ছিল না। পরে রাস্তাটা হয়েছে। ফলে ওর প্লটটা হয়ে গেছে রাস্তার ধারে। আমি ট্রাকটারটা উঠোনে নিতে পারি না, স্পেস্ কই ? ত্রিপল দিয়ে রাস্তায় ঢেকে রাখি। কুসুমের প্লটটা পেলে ওখানে একটা শেড করে ট্রাকটরটা রাখব। আমার বাড়ীর কাছাকাছিও হবে। ওটা আমার পেতেই হবে অমিতাভ দা।

—আর কুসুম ? কুসুম কোথায় যাবে ?

—কুসুম ? ওর কথা কি আমি ভাবব না ভেবেছেন ? ওকে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেব।

—ব্যবস্থাটা কি করবেন ঠিক করুন, তাতে কুসুম রাজী হোক, পঞ্চায়েতকে বলুন, তারপর দেখা যাবে।

অমিতাভ ওঠে। বিকাশ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ফিরে আসবার সময় বিকাশের স্বগতোক্তি শোনে।

মাগীটার জন্য খুব দরদ হয়েছে দেখছি। ওকে আমিইতো ফিট্ করে দিয়েছিলাম।

মাঠে যাবার পথে নস্করীবাবু অমিতাভর কানের কাছে মখ নিয়ে বলেছিল—একটা কথা বলছি স্যার, মনে কিছু করবেন না। আপনার ঘরে যে মেয়েছেলেটা কাজ করে, তার একটু উনকুট্টি আছে। মাটির তলার তেল খোঁজার পার্টি এয়েছিল না গ্রামে, তাদের চঞ্চলবাবু নামে একজনের সঙ্গে খুব লটঘট করেছিল। বিয়ের পরইতো ওর স্বামী লিভার পচা রোগে শয্যাশায়ী, অথচো বাচ্চাও একটা হল। লোকে বলে···কিছু ব্যাড মাইণ্ড করলেন নাতো স্যার, অনেকে আপনাকেও নিন্দেমন্দ করে, আপনাকে ভালবাসি, তাই বল্লাম।

অমিতাভ কুসুমকে তাড়িয়ে দেয়।

কুসুম চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাত কচলায়। ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি অমিতাভর দিকে।

—কিছু বলবে ?

কুসুম মাথা নাড়ায়।

অমিতাভ টাকাপয়সা হিসেব করে দিয়ে দেয়। দু'টাকা বেশী।

কুসুম তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

—কিছু বলবে ?

কুসুম মাথা নাড়ায়।

—তবে যাও।

কুসুম চলে যায়। শাড়ীর আঁশটে গন্ধ থাকে।

পরের দিন সকালেই দেখা গেল কুসুম ওর ঘরে মরে পড়ে আছে। মুখ থেকে গাজলা উঠছে।

অমিতাভ ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। কুসুমকে ছাড়িয়ে দেবার কথা কাউকে বলতে পারে না, নস্করীবাবুকেও নয়। মানুষের চোখ দেখলেই ভয় পায় অমিতাভ। দু-একজন বেশ কড়া মেজাজেই অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করেছে—কুসুমের কি হয়েছিল বলুন। অমিতাভ বলেছিল বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না। কুসুমের বাবা অমিতাভকে কিচ্ছু বলেনি। বংকা যেমন বিড়বিড় করে, তেমনি করত, মাঝে মাঝে বলত—মরণ—নেকা ছিল। বলাই জানে,

বেগুনপোড়ায় মরণ লেখা ছিল, কুসুম করবে কি? তেলের ভিতর মরণ লুইকে থাকলে কুসুম করবে কি?

পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট এল। কুসুমের পাকস্থলিতে পোকা মারার বিষ পাওয়া গিয়েছিল।

পুলিশ এনকোয়ারীতে এসেছিল—নিরাপদবাবুদের বাড়ীতে। দুধ মারা ক্ষীরের নাড়ু ও চা যথারীতি ছিল। অমিতাভর ডাক পড়ল। অমিতাভ ঢকঢক করে জল খেয়ে ও বাড়ীতে গেল। ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে থাকলেই হত। ও ঘরে ঢুকবার আগেই গলা শুকিয়ে গেল আবার।

—আপনার ঘরে কাজ করত?

—হ্যাঁ।

—কিছু হয়েছিল নাকি?

—না।

—ফ্র্যাংলি বলুন মিঃ মুখার্জী, ধরুন না গসিপিং হচ্ছে। মেয়েটার শুনেছি ক্যারেকটার ভাল ছিল না। এরকম কোন ঘটনা হয়েছিল—যে ও আপনাকে এ্যপ্রোচ করেছিল আপনি রিফিউজ করেছেন।

—না।

—লাষ্ট আপনার সাথে কি কথা হয়েছিল?

বিকাশ তাকাল অমিতাভর দিকে। একটা চোখ টিপল। বিকাশ পুলিশকে বল্ল—কুসুম মুখার্জীবাবুকে নাকি চঞ্চলবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিল—কলকাতায় চঞ্চলবাবু নামে কাউকে চেনে কি না।

—চঞ্চলবাবুটি কে?

—ঐ চঞ্চলবাবুর সঙ্গেই কুসুমের গণ্ডগোল ছিল। ঐ যে ও. এন. জি. সির তেল খোঁজার পার্টি এসেছিল, ওদের চঞ্চলবাবু নামে একজনের সঙ্গে খুব লটঘট হয়েছিল। বাচ্চাটা নিয়েও কোশ্চেন আছে।

বিকাশ পুনরায় অমিতাভর দিকে তাকায়।

ন্যাচারালি, মুখার্জীবাবু বলেছিল—ও নামে কাউকে চেনে না।

—কেস্টা বেশ ঘ্যানপোঁচা আছে। কমপ্লিকেটেড। আসুন না থানায় আজ কালের মধ্যে। ডোণ্ট ওরি।

বিকাশ অমিতাভকে পরে বলেছিল—চিন্তা করবেন না স্যার, সব ম্যানেজ হয়ে গেছে।

কুসুমের ননদ থাকে পাশের গাঁয়ে। কুসুমের বাচ্চাটাকে সে নিল।

পঞ্চায়েতের মিটিংএ ঠিক হ'ল—বিকাশবাবু মানবতার খাতিরে পাঁচশো টাকা কুসুমের ননদকে বাচ্চাটা মানুষ করার জন্য দেবে। বিধবা কুসুম যে জমিটায় থাকত ওটার মালিক তো আসলে চ্যাটার্জীরাই, ওদের থাকতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কুসুমের মৃত্যুর পর ঐ জমির মালিক চ্যাটার্জীরাই। আইন অনুযায়ী এটাই ব্যবস্থা।

একজন চোয়াড় গোছের পাঞ্চায়েতের লোক বলেছিল—কুসুম বিষ তো খেইচে, কিন্তু ঐ কীটপোকা মারার বিষ সে পেল কোন থে ?

বিকাশ বলে – হ্যাঁ। আমাদের বাড়ীও ঝাঁড়পোঁছ করত কুসুম। অন্য বাড়ীও কাজ করত। কোত্থেকে বিষ চুরি করেছে কে জানবে, আর চুরি করে খেলে আমরাই বা কি করব ?

কুসুমকে ছাড়াই সেবারের নবান্ন হয়ে গেল। ধনে গাছ, সাদা ফুল, সরষে গাছ হলুদ ফুল। কৃষ্ণচূড়া শিরিষ আর আমড়া গাছের পাতা ঝরল, আবার নতুন পাতা এল, বসন্তের হাওয়া এল, দু-চারটে কোকিল এল।

ও. এন. জি. সির তেল খোঁজা গাড়ীর চাকার দাগ মুছে গিয়ে এখানে ওখানে এখন ট্রাক্টরের চাকার দাগ। কুসুমের ভিটেয় এখন উঁচু এ্যাসবেসটাসের শেডের তলায় বিকাশের লাল ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ অমাবস্যা। সকাল থেকেই মাইক বাজছে। বিকাশ আজ কালিপুজো দিচ্ছে। ট্রাক্টরটাকে জবাফুলের মালায় সাজিয়েছে। ঐ শেডের তলায় কালীমূর্তি। থানার ও. সি, পাঞ্চায়েতের লোকজন সবার নিমন্ত্রণ। অমিতাভদেরও অফিস শুদ্ধু নিমন্ত্রণ। রাত্রে জেনারেটর চালিয়ে ভি. ডি. ও শো হবে। মুনিষ মজুরেরা, যাঁরা ট্রাক্টরের কারণে অনেকেই কাজ পাবে না, সবাই আজ রাতে ভি ডি ও দেখবে। অমিতাভ আজ কলকাতা যাচ্ছে, দিন পনেরর ছুটিতে।

ঘর বন্ধ করে চাবিটা দিতে গিয়েছিল নিরাপদবাবুর কাছে। নিরাপদবাবু অসুস্থ। নিরাপদবাবু বল্লেন—বিকাশটা কি শুরু করেছে দেখেছেন ? ট্রাক্টর ট্রাক্টর করে একেবারে পাগলপারা হয়ে গেল। কি করে কিছু ঠিক নেই। ওতো আপনার ভাইয়ের মত, একটু বোঝান না।

কি বোঝাবে অমিতাভ ? অমিতাভ কিছু না বলে চলে আসে।

একটু বসুন মুখার্জীবাবু। আপনার বাড়ীর জন্য একটু সরষের তেল নিয়ে যান। নতুন সরষে উঠেছে, সবে ভাঙ্গা করিয়েছি।

অমিতাভ বলে—না-না, ওসব নেয়া যাবে না।

—কেনে ?

—এতটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

—সে আমি লোক দিয়ে দেব।

—না-না-না, তা হয় না। লোকে কি ভাবছে, না-না, আমি এইসব নিতে পারব না।

নিরাপদ বল্লেন—তবে আর একটু বসুন, এক্ষুণি আসচি। একটা খাম নিয়ে এলেন। বল্লেন—সামান্য কিছু আছে, আপিত্য করবেন না। এটা মনে করুন আমার আশীর্বাদ। আপনি আমার ছেলের মত··আমবাগানের কেসটা আপনি করে দিলেন। কিছু না দিলে অন্যায় হবে।

অমিতাভ চারিপাশে তাকায়। শুধু একটা টিকটিকি আছে দেয়ালে আর মাইকে 'জিলে লে—জিলে লে——···'অমিতাভ খামটা পকেটে পুরে নেয়।

রাস্তার মুখটাতে বিকাশ। কপালে তেল-সিঁদুরের লাল তিলক। খালি গা। বলল—আজ রাত্রে থেকে যেতে পারতেন অমিতাভ দা। ভি ডি ও আনছি। টারজন, শোলে, প্রেমনগর ··

অমিতাভ হাঁটছে। কোকিল ডাকল। মাইকের গান। একটা সাপের খোলস পড়ে আছে।

বুকের ভিতরটা খচখচ করে ওঠে অমিতাভর। পকেটের ভিতর থেকে বার করে। গোনে না। চারিদিকের হা—হা—শূন্যতার মাঝে এ্যাটাচী বাক্সোটা খোলে। খামটা ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়, সামনের একাকী তালগাছটা ঠিক কুসুমের মত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কি বলতে চায়, কী ?

জলতেষ্টা পায় অমিতাভর। এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে।

আরো তিনটে গ্রাম পেরুলে বাস রাস্তা।

কি বলতে চেয়েছিল কুসুম ? বলতে গিয়ে বলেনি ?

রাস্তাটা যেখানে বাঁক গিয়েছে, সেখানে বংকা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা ছিপি আঁটা পলিথিনের পাত্র। বংকা বল্ল—আপনার জন্য দাঁড়া হয়ে রইছি। মুনিব পাঠাইলেন। মুনিবের হুকুম—বাসে উঠে দিতে হবে। আর এই চিঠি।

'ঘানিতে ভাঙা সরষের তেল পাঠাইলাম। আপনার বাবাকে নমস্কার জানাবেন।' বংকা বাসে উঠাইয়া দিবে। আপনার চিন্তা নাই।'

বংকা বল্ল—আপনি আগে রওনা হয়েছেন, আর আমি মাঠ ঠেঙে দৌড়ে কত আগে এসে গেছি দ্যাখো।

অমিতাভ ভাবে ওকে ফিরিয়ে দেবে। তারপরই মনে হয় থাক না, এই পাগলটা ছাড়া পৃথিবীতে কেইবা জানছে আর, খাঁটি তেল, দিদির বাচ্চা হবে, খুবই কাজে লাগবে। মাও খুব খুশী হবে। বাবা তেল মুড়ি খেতে ভালবাসে। বিদিশাকেও এক শিশি দেবে। সেবার ডায়মণ্ডহারবারের হোটেলে গরম ভাত পেয়ে একটু হলুদবাটা আর সরষের তেল চেয়ে দিয়েছিল বিদিশা। খুব ভালবাসে।

অমিতাভ বংকাকে বলে—আমি এসব একদম পছন্দ করি না, বুঝলে, পাঠিয়ে দিয়েছে কি আর করা যাবে, চল।

বংকা চলে। চলতে চলতে বলে—বলাইয়ের কেমন চাতুরী, বাবু আনলেন ধরি। যে রাঁধেনা তাকেও দেয় আবার রাধুনী নেই তো রান্না হয়। খাও বাবু, ভাল তেল তোমার তেলে দোষ নাই। তোমার কুসুম পানা গতি নাই। ভাঁগর নিক্কে আনি নিজ্জে ঢেলেছি।

—এ সব কী বলছ বংকা?

—বলছি বাবু বলায়ের দহায়। আপনার তেলে বিষ নাই। কুসুম পানা গতি নাই।

—কুসুমের কি হয়েছিল জানো?

—মরণ হইছিল। মরণ। বলাই ডেকেছিল। গরীবের ঢ্যামনামী হইছিল। বেগুন পোড়া তেল দে মেখে খাবার শখ হইছিল। গরীবের ঐ শখ হয় কেন?

—তারপর?

—আর জানিনা। গুরুর মানা। না জেনে বলতে নাই। তবে এট্টু তেল চেয়েছিল, বেগুনপোড়া মেখে খাবে বলে আমাদের ছোটবাবুর কাছে, এট্টু তেল চেয়েছিল সেটা আমি নিজে শুনেছি গ—শুনেছি।

—তা তুমি একথা আগে বলোনি কেন?

—কতই তো বল্লাম। বোবায় বল্ল—কালায় শুনল। বাঁজা নারীর ছেল্যা হল। তোমরা আমায় পাগলা বল, ছাগলা বল, আমার কথার দাম কি?

বংকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে ভিটেটা ছাড়তে কুসুম, পিরথিমীর ভিটেটই ছাড়লি……

—তা তুমি এ কথা বলোনি কেন?

—তা বোবায় বলবে কালায় শুনবে, বাঁজা নারীর ছেল্যা হবে। আমায় বলে পাগলা ছাগলা, আমার কথার দাম কি ?

সামনের গ্রামটা নিকটবর্তী হয়। বংকা বলে—আমার নাতিটার জন্য এট্টু তেল দেবে বাবু ?

—তোমার নাতি ?

—হ। আমার নাতি, মানে কুসুমের ছা, এই গাঁয়ে ওর পিসিমার কাছে আছে।

অমিতাভ বলে—নিশ্চয়ই দেব, যতটা খুশী নাও, কিসে নেবে ? এই সব শুদ্ধু নিয়ে নাও।

বংকা বলে—এট্টু গাঁয়ে চলুন বাবু, এই তো সামনে।

কি আর করা যাবে। বংকার পিছু পিছু চলল অমিতাভ। রাস্তায় শুকনো বিষ্ঠার মধ্যে মরে থাকা কৃমি। সামনে গ্রাম।

এই যে, এই ঘর। ঘরে লতুন খড় দেছি দ্যাকো, আলকাতরা দেছি। পাঁচশো ট্যাকার খেলা। কুসুম মরেছে, এঁনাদের ঘরে ট্যাকা এসেছে, পাঁচশো ট্যাকাগো বাবু।

বংকা হাঁক দেয়। লাতিটারে একবার দ্যাকা দিনি, চোকের দ্যাকা দেখি এট্টু। এক মহিলা শিশুকে নিয়ে এল। রোগা গায়ে ছটফটায় বংকার নাতি।

—শিশি দে দেকি একটা, বংকা বলে। ঘর থেকে শিশি আসে। থ্রি এক্স রামের। বংকা বলে—মাটির তলার তেল খোঁজার বাবুদের বুঝি ?

বাবুর থে তেল চেয়ে নিচ্ছি এট্টু। রসুন দে ফুটে লিবি। খুব দলাই-মালাই করবি, বুইজলি। বংকা তেল ঢালে শিশিতে।

আর একটু নাও/না, ভর্তি করে নাও, অমিতাভ বলে।

বংকা হাতের চেটোয় একটু তেল নিয়ে ছেলেটাকে মাখায়। দলমলে হবি ব্যাটা, ভীম হবি, ভীম, দুর্যোধন শালাকে দিব্বি—এক্কেবারে পটকে, হেঁ-হেঁ-হেঁ ··আজকে হল হাপুস হুপুস কালকে হবে ভোজ, কার জিনিষ কে লিয়ে পালায় খোঁজরে ব্যাটা খোঁজ···দলমলে হবি ব্যাটা দলমলে হবি···

বংকা আগে আগে চলে। দুটো ফড়িং-এর ভোঁ ভোঁ আর প্লাষ্টিক পাত্রে হালকা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আর মাইলটাক পথ। রাস্তায় একটা সাপ।

চীৎকার করে ওঠে অমিতাভ। বংকা খুব শান্ত গলায় বলে—ঢোঁড়া। অমিতাভ বলে—এত সাপ কেন বলতো, কত খোলস দেখলাম। বংকা বলে—শীত ঘুমের পর এখন সাপেরা সব জাগতিছে। কিন্তু এটা ঢোঁড়া। সামনে গিয়ে জোরে লাথি মারে বংকা, সাপটা মাঠে গিয়ে পড়ে।

ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই, তাই না বংকা ?—অমিতাভ বলে।

—না ঢোঁড়ার বিষ নাই। আগে ছিল। সব সাপের চেয়ে ঢোঁড়ার বিষ ছিল বেশী।

—তারপর ?

—মা মনসা তো ঢোঁড়াটাকে পাঠাইলেন লোহার বাসরে। ঢোঁড়া সাপ নদী পার হচ্ছে—শুনুন তবে গল্পটা—

আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢোঁড়া গাং পার হয় গংগা দেবী সে সময় কৌশল করায় সিরজিলেন মায়া মৎস্য ঢোঁড়ার সম্মুখে মাছের ঝাঁক দেখ্যে ঢোঁড়ার নোলা আসে মুখে। ক্যানোনা, গংগা দেবী জানতেন, ঢোঁড়ার বিষ আছে বটে কিন্তু লোভটাও আছে বড় লোভ তখন কল্লে কি—

বিষ দন্ত খুলে ঢোঁড়া পদ্মপাত্রে রাখে তারপর ছুট্যে গেল মাছের সম্মুখে। ঢোঁড়া তখন সব ভুলে গেল বাবু। মা মনসা যে কাজের ভার দেছিলেন সব ভুলে গিয়ে মাছের পিছনে ছুটল ঢোঁড়া।

অমিতাভ বংকার মুখের দিকে তাকায়। বংকা নির্লিপ্ত। দূরের মাঠের দিকে চেয়ে ভাবলেশহীন বংকা বলে যায়—

বহু দূরে চলে গেল ঢোঁড়া। তারপর হল কি মায়া মৎস্য অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর ফিরে এল ঢোঁড়া। যে পদ্মপাতে বিষদাঁত রেখেছিল, সেখানে গিয়ে দ্যাখে—বোলতা ভীমরুল চেলা এবং পিঁপড়ি মৌমাছি কাঁকড়া বিছা নিচে লুট করি সেই বিষদাঁত আর সে পায় না। তারপর কেঁদে পেদে ও মনসার কাছে ফিরে গেল।

মা মনসা বলল—ছি—ছি—ছি, এত লোভ তোর ? মাছের লোভে কাজ ভুললি ?

অমিতাভ বংকাকে ফেলে এগিয়ে যায়। শুকনো ধানগাছের গোড়া ওর পায়ে খোঁচা দেয়। শূন্য মাঠের হা—হা উত্তপ্ত হাওয়ায় ওর কপালের ঘাম শুকোয়। মাথার মধ্যে হাজাক বাতির শোঁ—শোঁ।

বংকা চেঁচিয়ে বলে—সেই থেকে ঢোঁড়ার আর বিষ নেই গ বাবু। যে মানুষ ঢোঁড়াকে দেখলে ভয়ে পালাত, সে মানুষ এখন ঢোঁড়াকে পায়ে মারে, পিষে মারে।

অমিতাভ মাঠের মধ্যে কিলবিল করে।

দুজন শিল্পী ঃ আত্মপরিচয়ের দুই ভিন্ন নিরিখ

মৃণাল ঘোষ

এরকম তো অনেকেই বলেন, দেশী ও বিদেশী অনেক বিদগ্ধ মানুষ, যে, তেমন কোনো আত্মপরিচয় এখনও গড়ে ওঠে নি ভারতীয় আধুনিক শিল্পকলার। যেমন বলেছিলেন প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক গুণ্টার গ্রাস কিছুদিন আগে কলকাতার কোনো এক ইংরেজি দৈনিকের সাক্ষাৎকারে ঃ ভারতীয় ছবিতে পাশ্চাত্য প্রভাব তো রয়েছেই, কিন্তু সেই প্রভাব কেবল ছবির রঙ বা আঙ্গিকেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার থেকেও ভারতীয় শিল্পীকে অনেক সময়ই অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি প্রভাবিত করে পাশ্চাত্য বাস্তবতা। গুণ্টার গ্রাসের উক্তির মধ্যে হয়ত আংশিক সত্য আছে। কিন্তু আজকের ভারতীয় শিল্পকলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রূপবোধ ও বাস্তবতার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তার আত্মপরিচয় আবিষ্কারের ক্ষেত্রটি এতই নিবিড় ও জটিল যে উপর থেকে ভাসা ভাসা হাল্কা দেখায় তার সম্পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করা দুরূহ।

এই সমন্বয়ের নিরিখ থেকে কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দুটি প্রদর্শনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুজন শিল্পীই অপেক্ষাকৃত তরুণ। দুজনেরই কলকাতায় এই প্রথম একক প্রদর্শনী। দুজন ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের মানুষ। তাঁদের কাজের মধ্যে সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বেশ কিছুটা প্রভাব আছে। একজন চিত্রকর, একজন ভাস্কর। প্রথমজন রাজস্থানের উদয়পুরের রামেশ্বর সিং, দ্বিতীয়জন কেরালার সোমন।

চিত্রকূট গ্যালারিতে ৪ থেকে ১৯ ডিসেম্বর '৮৬ অনুষ্ঠিত হয় রামেশ্বর সিং-এর ছবির প্রদর্শনীটি। রামেশ্বর সিং-এর জন্ম ১৯৪৮-এ উদয়পুর জেলার দেওগড়-এ। চিত্রকলায় স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি নেন তিনি উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আর তারপর ১৯৭৭ থেকে এ পর্যন্ত দিল্লী, বম্বেসহ বিভিন্ন বড় শহরে

১২টিরও বেশি একক প্রদর্শনী, ১৯৮৪তে ললিতকলা অ্যাকাডেমীর জাতীয় পুরস্কারসহ বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১৪টি পুরস্কার ইতিমধ্যেই তাঁকে শিল্পী হিশেবে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আর এবারের কলকাতার প্রদর্শনীতে আমরা দেখলাম সেই প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে তাঁর একান্ত নিজস্ব এক চিত্ররীতি, প্রথাগত ও লোকায়ত আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক রূপবন্ধের সমন্বয়ের এক স্বতন্ত্র পদ্ধতি।

রাজস্থানী প্রথাগত ও লোকায়ত শিল্পের জীবনময়তা ও কাব্যময়তাকে রামেশ্বর সিং কেবলমাত্র একটি বিশেষ আঙ্গিক হিশেবে ব্যবহার করেন। সেই রূপবন্ধকে তিনি মেলান একেবারে বিপরীতধর্মী লোকায়ত সরলতা ও ধ্রুপদী প্রশান্তি বিরোধী বিশেষ রীতির এক পাশ্চাত্য আঙ্গিক প্রস্থানের সঙ্গে। এই প্রদর্শনীর অন্তর্গত ৩০টি ছবির প্রায় সবগুলিই ক্যানভাসের উপর তেলরঙে করা। সেই ক্যানভাসকে তিনি প্রায় বিমূর্ত চিত্র রীতিতে রঙের বিভিন্ন বিষম ক্ষেত্রে বিভাজিত করে নেন। তার উপর কোলাজের পদ্ধতিতে যোগ করেন পোড়া ও কালো হয়ে যাওয়া কাপড় বা ক্যানভাসের টুকরো। এ পর্যন্ত ছবিটি হয়ে উঠতে চায় প্রথাবিরোধী পাশ্চাত্য রীতির একটি বিমূর্ত কাজ, যাতে অন্ধকার ঘেঁষা রঙে, ক্যানভাসের পোড়া ও ছেঁড়া অংশের সংযোজনে, ক্ষেত্রে বিভাজনের বিষমতায় গড়ে ওঠে এক নবিভিডিটির পরিবেশ। তাতে সাহিত্য নির্ভরতা নেই কোনো, কাব্যময়তা নেই কোথাও। এক বিমূর্ত রূপবন্ধে তা প্রকাশ করতে পারে এই সময় ও বাস্তবতারই অন্তর্গত নঞর্থকতার দিক। কিন্তু তাঁর ছবির মূল ঐশ্বর্য এটুকু নয়। এই পাশ্চাত্য রূপবন্ধে তিনি যোগ করেন রাজস্থানী লৌকিক ভাস্কর্য ও অনুচিত্রের জগৎ থেকে তুলে আনা মানবমানবীর প্রতিমাকল্প। সেই প্রতিমাকল্পগুলি ক্যানভাসে স্থাপিত হয় কখনো আয়তক্ষেত্রাকার, কখনো বা বৃত্তাকার রচনা বিন্যাসে। এর সঙ্গে আসে, রাজস্থানের মধ্যযুগীয় ধর্মগ্রন্থ ও কাব্য থেকে তুলে আনা ক্যালিগ্রাফির নানা বিন্যাস। নরনারীর প্রতিমাকল্পগুলি অধিকাংশতই আসে বর্তনাগুণসহ, দ্বিমাত্রিকভাবে নয়। তাঁদের চক্ষু আয়ত, শরীর অলঙ্কৃত। লোকায়তিক সরলতার থেকে ধ্রুপদী সদর্থকতারই বেশি প্রাধান্য সেখানে। এদের রূপায়ণে রৈখিকতার প্রাধান্য, মধ্যবর্তী অংশ রঙ দিয়ে ভরা। সেই রঙে প্রথাগত ভূমিজ ও উদ্ভিজ্জ রঙেরই চরিত্র, যদিও সম্ভবত আধুনিক রাসায়নিক রঙই ব্যবহৃত হয়েছে। এই যে প্রথাগত শিল্প থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলো, বিভিন্ন প্যানেলের মতো যাদের চিত্রক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়েছে, চিত্রের সামগ্রিকতায় তাঁরা কোনো

কাহিনীর সম্পূর্ণতায় সাহায্য করছে না। অন্যনিরপেক্ষভাবে সেই মূর্তিগুলি কোনো প্রতীকেরও দ্যোতনা আনছে না। আমরা একদিকে দেখছি মধ্যযুগীয় রাজস্থানের সামন্ত শ্রেণীর রাজন্যবর্গের শৌর্য ও বীরত্বের নানা প্রকাশ, প্রেমাবিষ্ট নায়ক নায়িকার শরীরের নানা ছন্দিত ভঙ্গি, ধর্মের ও পুরাণের নানা দেবদেবীর অবস্থান, অন্যদিকে এর পাশাপাশি অবস্থান করছে একেবারে বিপ্রতীপ চরিত্রের ক্যানভাসের বিমূর্তায়িত টেক্সচার, পোড়া ও ছিন্ন অংশের নেতিবাচক মর্বিডিটি। এই দুই বিপ্রতীপ চরিত্রের রূপবন্ধের পাশাপাশি অবস্থানের মধ্যে সমন্বয়ের কোনো আরোপিত প্রয়াস নেই। কিন্তু একদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য রূপবন্ধের নঞর্থকতা, আঙ্গিকগতভাবে এই দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত হয়ে যায় ছবির বিষয় বা ভাবের ক্ষেত্রেও। দুটি বিপরীত সংস্কৃতি, দুই বিচ্ছিন্ন সভ্যতার বিপ্রতীপ মূল্যবোধ, জীবনযাপনের দুই দর্শনগতভাবে বিচ্ছিন্ন প্রবাহ, আপাতভাবে যাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় সম্ভব নয়, যাদের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান, এখানে তারা যেন ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য নিয়মে মিলতে বাধ্য হচ্ছে। আপাতভাবে সমন্বয়ের কোনো সাধারণ ভিত্তিভূমি নেই তাঁদের। নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের সাধারণ কোনো ভাষাও নেই। কিন্তু সময় ও বাস্তবতা তাঁদের আজ এক ঐক্যের মধ্যে বেঁধেছে, যাকে অস্বীকার করার কোনো পথও তাঁদের সামনে নেই। আজকের ভারতীয় বাস্তবতার এই মূলগত দ্বন্দ্বের বোধ শিল্পীকে ছবির এই বিশেষ গঠনের দিকে প্রাণিত করেছে কিনা, আমরা জানি না। হয়ত এরকম কোনো বক্তব্য নির্ভর ধারণা তাঁর আদৌ ছিল না। কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে এই অতুলনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাবগত এরকম এক দ্বান্দ্বিকতার চেতনার দিকে নিয়ে যায় আমাদেরও।

কোনো প্রতীকায়নের মধ্যে না গিয়ে, কোনো রকম সাহিত্যধর্মিতাকে আদৌ প্রশ্রয় না দিয়ে, দুই ভিন্ন মূল্যবোধের পরস্পর বিপরীতধর্মী প্রতিমাকল্প ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারে চিত্রনন্দনের বিশুদ্ধতার মধ্যেই শিল্পী যেভাবে এনেছেন ছবির ভাবগত বা বক্তব্যগত এক আধুনিকতা, যেভাবে দুই বিচ্ছিন্ন ধারার সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর একান্ত নিজস্ব বিশিষ্ট এক শিল্পভাষা, আমাদের সমকালীন ছবিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে তা এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হয়ে উঠতে পেরেছে। রামেশ্বর সিং-এর ছবি সমন্বয়ের জটিল সমস্যায় এক নতুনতর সমাধানের ইঙ্গিত আনে।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি টেরাকাটা ভাস্কর্যের। শিল্পী

সোমন। তাঁর নিজেরই প্রচেষ্টায় প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়েছিল বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি। টেরাকোটা ভাস্কর্যের এত বলিষ্ঠ, এত বহুমাত্রিক, এত ভিন্ন ধর্মী প্রদর্শনী সম্প্রতি খুব কমই দেখেছি। অথচ বিস্মিত হতে হয় যে কলকাতার কোনো পত্রপত্রিকায় এই প্রদর্শনীর কোনো আলোচনা চোখে পড়ল না। প্রদর্শনীর ৮টি কাজের সবগুলোই শিল্পী কলকাতার কেয়াতলা লেনের ললিত কলা কেন্দ্রে বসে করেছেন। তাই হয়ত কলকাতার বাস্তবতার কিছু ছাপ এতে থেকেছে, সেই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে সমকালীন ভারতীয় বাস্তবতার তীক্ষ্ণ তীব্র প্রতিক্রিয়া।

সোমনের জন্ম কেরালায়। তাঁর চিত্রকলার প্রাথমিক শিক্ষা এম. ভি. ডেবন-এর অধীনে। বরোদার এম. এস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ভাস্কর্যে স্নাতক হন ১৯৮২-তে। ১৯৮৩-তে 'ললিতকলা রিসার্চ গ্র্যাণ্ড স্কলারশিপ' পান। ১৯৮৪ ও ৮৬-তে জাতীয় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন। সক্রিয় শিল্পী হিশেবে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিজস্ব একটি ধারার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কলকাতায় তাঁর এই প্রথম প্রদর্শনীতে সেই নিজস্বতা উপলব্ধি করা গেল।

আধুনিক ভাস্কর্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য রূপবন্ধের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসে, প্রকৃতির অনুকৃতি বা সমরূপা নয়, প্রকৃতির সমান্তরাল বা একেবারেই প্রকৃতি-নিরপেক্ষ ভাবে স্বতন্ত্র এক রূপের বিন্যাস। সেই বিন্যাসে কখনও জোর দেওয়া হয় প্রকৃতির জীবন্ময়তার উপর, কখনও বা তার অন্তর্নিহিত গাঠনিক জ্যামিতির উপর। আমাদের সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্যও মূলত এই দুটি ধারার মধ্যে বিকশিত হচ্ছে। আকারের স্বরাটত্বের উপর আধুনিক ভাস্কর্য একটু বেশি জোর দেয় বলে, সাহিত্যধর্মিতা বা কোনো দার্শনিক বোধের রূপায়ণকে অনেক সময়ই পরিহার করে চলে। আমরা অনেক সময়ই দেখি কোনো মাঝারি মানের শিল্পীর হাতে এরকম কোনো প্রতীকায়নের প্রয়াস সহজ ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়। একমাত্র মীরা মুখার্জীর মতো ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ভাস্করের হাতেই, আমরা দেখি, আকারের স্বরাটত্বকে অমলিন রেখেও গভীরতর দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনকে মূর্তিবদ্ধ করার সফল প্রয়াস। সম্প্রতিকালে কোনো কোনো তরুণ শিল্পীর মধ্যেও আকারের স্বরাটত্বের তত্ত্বকে কিছুটা প্রসারিত করে ভাস্কর্যের মধ্যে চিত্রের রচনাবিন্যাস ও বক্তব্যের বহুমাত্রিকতার বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

সোমন তাঁর টেরাকোটায় ভাস্কর্যের প্রচলিত সমস্ত নিয়মের সীমাবদ্ধতা

ভেঙ্গে তাকে প্রসারিত করেছেন চিত্রকলা, কবিতা ও সমাজদর্পনের সারাৎসারকে আত্মীকৃত করে বৃহত্তর সমাজচেতনার রূপায়ণের দিকে। তাঁর ভাস্কর্য একটি মূর্তির সম্পূর্ণতায় আবদ্ধ ত্রৈমাত্রিক কোনো বিশেষ আকার নয়। বরং সেরকম অনেক মূর্তি ও প্রায়-বিমূর্ত আকারের সমাহারে গড়ে ওঠা এক একটি প্যানেলের মতো, যা আবার নতোন্নত পদ্ধতিতে কোনো স্থাপত্যের অংশ নয়, যেমন আছে আমাদের মন্দির ভাস্কর্যে, প্রত্যেকটি কাজই ত্রিমাত্রিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, যেন কোনো ম্যুরালের ভাস্কর রূপ। কিন্তু আলাদা করে প্রত্যেকটি মূর্তিই আবার হতে পারে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক একটি ভাস্কর্য। আমাদের মন্দির-ভাস্কর্যে জীবনের যে বহুমুখী রূপ মহাকাব্যিক বৈভবে রূপায়িত থাকে, সেই বহুমুখীনতার এপিক গুণকে শিল্পী ব্যবহার করেন আধুনিক জীবন ভাবনার রূপায়ণে।

টেরাকোটা তরুণ ভাস্করদের' বিশেষত, যে এবটি প্রিয় মাধ্যম, তার কারণ এটি অল্প খরচে সহজলভ্য মাধ্যম, এছাড়াও আমাদের লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরতর সংযোগ গড়ে তোলা যায় এই মাধ্যমে। সোমন তাঁর টেরাকোটায় শুধু লোকায়তকেই ব্যবহার করেন নি, তার চেয়েও বেশি, আধুনিক অভিব্যক্তিবাদী শিল্পধারার প্রতিবাদী আবহকে গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর কাজে বাস্তববাদী মূর্ততা, পরাবাস্তববাদী মূর্তির ভাঙন এবং প্রায়-বিমূর্ততা পাশাপাশি এসে গেছে। সব মিলে একাধিক কাব্যিক চিত্রকল্প, যার আপাতসঙ্গতি হয়ত তত সরল নয়, ত্রিমাত্রিক রূপকল্পে রূপান্তরিত হয়ে পরপর গ্রথিত হয়ে গেছে। গ্রথিত হয়ে এক বৃহত্তর বোধের মূর্তিরূপ হয়ে উঠেছে।

কবিতার চিত্রকল্পের সঙ্গে এদের সংযোগ অতি ঘনিষ্ট। তাই এক একটি ভাস্কর্যকে এক একটি কবিতারই রূপান্তর হিশেবে গড়ে তুলেছেন শিল্পী। কবিতাকে ভাস্কর্যের পাশাপাশি রেখেছেন। এতে ভাস্কর্যের গভীরে প্রবেশ করতে, মূর্তিগুলির যৌক্তিকতা নির্ধারণে অনেকটা সহায়তা হয় দর্শকের। কিন্তু তাঁর কবিতায় যেমন, সবসময় তত সরল যুক্তিধৃত নয় এরকম রূপকল্প পরপর গ্রথিত হয়ে গভীরতর বোধের দ্যোতনা আনে, তার ভাস্কর্যেও তেমনি। কিন্তু তাঁর ভাস্কর্য কখনোই সেই কবিতার সরল অনুবাদ নয়।

আমরা একটি কবিতা ও ভাস্কর্যের চিত্রকল্পগুলিকে পাশাপাশি রেখে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি, তাঁর প্রকাশের স্বরূপ। তাঁর কবিতাগুলো ইংরেজি ভাষায়। অনুবাদের চেষ্টা না করে একটি কবিতার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত

করা গেল : "Mother, you are beautiful with your caustic teeth. / Blood Sucking lanes criss cross each other / faces of Carcass sink into the walls / she was forced to swallow her tongue/she guards the central gate of the city / the mad woman ! / The half naked woman's 'anchal' wag like the national flag. / She stands on the hunch of Sealdah. / She is aware / a violent force bursts out her forehead."

এর সঙ্গের ভাস্কর্যটিতে আমরা দেখছি পরপর পরস্পর সংযুক্ত কতগুলো প্যানেল। একেবারে সামনে একটি স্তম্ভের উপর একটি ঘোরসওয়ার সৈনিকের মূর্তি, কিন্তু ঘোড়াটি কাঠের খেলনা ঘোড়ার মতো। সেই স্তম্ভটিকে দুপাশ থেকে ধরে আছে কোনো নারীর দুটি হাত। বাঁ হাতের পেছনের অংশ রূপান্তরিত হয়েছে একটি নারীর অবয়বে। ডান হাতের বাহুমূল থেকে উঠে গেছে একটি অট্টালিকার আভাস। সেই বাড়ির ঊর্ধ্বাংশ আবার রূপান্তরিত হয়েছে বড় আয়তনের এক নারীমুখাবয়বে। পেছন দিকে তাঁর চুল যেন আঁচলের মতো উড়ছে। আর তাঁর কপালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি পা লাথি মারতে উদ্যত হয়েছে সামনের ঘোরসওয়ারের মূর্তিকে। এই ভাবে পরপর সংবদ্ধ হয়েছে আরও অনেক প্রতিমাকল্প। সব মিলে বাস্তবতার অন্তর্নিহিত নঞর্থকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের রূপক হয়ে উঠছে।

এভাবে সমাজ বাস্তবতার গভীরতর বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে গেছেন শিল্পী তাঁর এক একটি ভাস্কর্যকে। তাঁর ভাস্কর্যের জগৎ এক ভেঙে পড়া বিশ্বের ক্ষয়ে যাওয়া বিশ্বাসের জগৎ। সেখানে পিতা পুত্রকে হত্যা করে, পুত্র পিতাকে। নারী ধারালো ছুরি দিয়ে নিজ হাতে কেটে ফেলে তাঁর স্তন। সেখানে মৃতদেহ ভরা আধারের উপর বসে নিশ্চিন্তে বিড়ি টানে কোনো গ্রামীন মানুষ। এরকমভাবে অনেকটা ডস্টয়েভস্কির গল্প বা উপন্যাসের নৈরাজ্যের ও আর্তির জগতের দিকে যেন নিয়ে যান শিল্পী।

শিল্পের আধুনিকতার ও ভারতীয়তার দুই ভিন্ন নিবিখের দিকে নিয়ে যান ভারতের দুই প্রান্তের এই দুই শিল্পী। দেখান, আমাদের শিল্পের সবটাই ইউরোপীয় বাস্তবতার অনুকরণ নয়। আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা বোধের যে সমন্বয় শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে, সেই সমন্বয়ই কেমন করে বিবর্তিত হচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তারই দুই প্রান্তের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে এই দুই শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজগুলি।

প্রসঙ্গ ঃ 'চিনেবাদাম'

সম্পাদক
পরিচয়

প্রিয় মহাশয়,

সুস্থ ও প্রগতিশীল ভাবধারা ও সাহিত্যের পরিবেশনার জন্য 'পরিচয়' এক মহৎ ঐতিহ্যের অধিকারী। আজকের যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রবল হয়ে উঠে পাঠকসমাজকে বিভ্রান্ত করছে তখন পরিচয় এর ভূমিকার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে এবং তার কাছে পাঠকসমাজের প্রত্যাশাও অনেক বেশী। তাই পরিচয় এর ক্ষেত্রে কোনওভাবে সেই প্রত্যাশাপূরনে ব্যর্থতা দেখা গেলে বিষয়টা খুব দুঃখজনক ঠেকে বৈকি!

আমার প্রশ্ন নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত মানিক চক্রবর্তীর গল্প 'চিনেবাদাম' প্রসঙ্গে। গল্পটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত রুচিবিগর্হিত। মেয়ে-হোষ্টেলের যৌনবিকার-গ্রস্ত চারটি মেয়ে একই ঘরে যৌথভাবে এক চিনেবাদামবিক্রেতা কিশোরকে নিয়ে তাদের বিকৃত যৌনলালসা চরিতার্থ করছে দিনের পর দিন—এমন একটা বিষয় কি করে সুস্থ রুচিশীল সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হ'ল ভেবে পাই না। বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলোর কল্যাণে যৌন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার জন্য লেখক তৈরীর চাষ তো এ-দেশে কম হচ্ছে না, তাঁদের সঙ্গে পরিচয়-এর সামিল হওয়া কি খুব প্রয়োজন? একটু ভেবে দেখতে সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ জানাই।

অসীমা ধর
১/৩, এ. পি. পার্ক
কোলকাতা-৮৬

প্রাপ্তি স্বীকার

১। **জাগরী চরিত্রে ও চেতনায়**—শংকর ঘোষ। হার্দ্য বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র—১৮/এম টেমার লেন, কলকাতা-৯। মূল্য—১২.৫০ টাকা। প্রচ্ছদ—রমাপ্রসাদ দত্ত।

—গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের বই।

২। **বাংলা সাহিত্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্কট**—সম্পাদনা সত্য মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক—র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন—৪৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। মূল্য—আট টাকা।

—সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের বই।

৩। **মুহূর্তের মানচিত্র**—সোফিওর রহমান। বিশ্বজ্ঞান—৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। মূল্য—সাত টাকা। প্রচ্ছদ—শুভাপ্রসন্ন।

—কবিতার বই।

৪। **মেঘের মিছিল**—অরুণ ঘোষ। কবিপত্র প্রকাশ ভবন—২২ বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬। মূল্য—সাত টাকা। প্রচ্ছদ—মানব পাল।

—কবিতার বই।

৫। **প্লাবিত নিসর্গে নিষাদ**—পূর্ণেন্দু মৈত্র। টাইমস ডিস্টিবিউটারস্, কলকাতা-৯। মূল্য ২.৫০ টাকা। প্রচ্ছদ—বাসুদেব দাস।

—কবিতার বই।

৬। **সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে**—প্রভাতকুমার গোস্বামী। কথাকলি—হাওড়া, পিন ৭১১৩১৩। মূল্য—৭.৫০। প্রচ্ছদ—গৌতম দে।

—কবিতার বই।

৭। **এই আকাশের জন্যে**—নারায়ণ সাহা। ক্রান্তিক প্রকাশনী, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, স্টল—৩১, ব্লক—৫, কলকাতা-৭৩। মূল্য—৬.০০ টাকা। প্রচ্ছদ—অনির্বাণ দত্ত।

—কবিতার বই।

৮। **পাথার অগ্নি**—শিবশক্তি চক্রবর্তী। উত্তরপল্লী স্ট্রীট, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—১৩। মূল্য—৮.৭০ টাকা। প্রচ্ছদ—পূর্ণেন্দু পত্রী।

—কবিতার বই।

৯। **তবু স্পন্দমান পথ**—সমরেন্দ্র বিশ্বাস। পরিবেশক—দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। মূল্য—৬·০০ টাকা। প্রচ্ছদ—পান্নালাল মালিক।

—কবিতার বই।

১০। **জীবনটাই কবিতা**—সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। ঈগল প্রকাশনী, ২৮ কিষণলাল বর্মণ রোড, হাওড়া-৬। মূল্য—২·০০ টাকা।

—কবিতার বই।

১১। **দধি মঙ্গল**—সুভাষ দে। বিশ্বজ্ঞান ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। মূল্য—১২·০০ টাকা। প্রচ্ছদ—রাম কিঙ্কর বেজ

—উপন্যাস।

১২। **এবেলা যাই, ওবেলা আসি**—অজয় সেন। নবাহ—কলকাতা-২০। মূল্য—৬·০০ টাকা। প্রচ্ছদ—গণেশ বসু।

—কবিতার বই।

পরিচয়

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

সম্পাদকীয়

পরিচয়-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের স্বভাবতই মনে পড়ে যায় একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের কথা। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে 'পরিচয়' বিভিন্ন সংখ্যায় বারবার একাত্মতা ঘোষণা করেছে। 'মায়ের মুখের পুণ্য' ওপার-এপার বাংলার একই ভাষা—বাংলা ভাষা। সেই ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির কাজে আমরা যদি আমাদের ভূমিকাকে উপযুক্ত ভাবে পালন করতে পারি, তবেই একুশে ফেব্রুয়ারি নিছক একটি ঐতিহাসিক দিন না থেকে প্রকৃত অর্থমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের এক প্রবীণ পুরুষ শ্রীগোপাল হালদার ১১ ফেব্রুয়ারি পঁচাশি পেরিয়ে গেলেন। তিনি শুধু পরিচয়-এরই অভিভাবক নন, আমাদের সংস্কৃতির যা কিছু শুভ, ইতিবাচক ও মহৎ, তারও এক অনন্য পথিকৃৎ। এই প্রাজ্ঞ জ্ঞানতপস্বীকে আমাদের প্রণাম জানাই।

এ-বছর মে দিবসের শতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমরা বিশ্ববন্দিত ফরাশি নাট্যকার ও চিন্তাবিদ জঁ জেনে-র 'মে দিবসের ভাষণ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করছি। ভারতীয় কোনো ভাষায় এই রচনাটি পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। মে দিবসের রক্তমাখা শপথের সম্মানে জঁ জেনে-র ভাষণটি ক্রোড়পত্রের আকারে পরিবেশিত হল।

এ-সংখ্যায় ক্রোড়পত্রটির ৬০ পৃষ্ঠার সপ্তম পংক্তিতে একটি গুরুতর মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটে গেছে। ছাপা হয়েছে '...চালচলনে আমি ভালই'। এটি হবে 'চালচলনে আমি তা নই'। প্রতি পৃষ্ঠায় শিরোনামটি আছে 'মে দিবসের ডাক'। এটি হবে 'মে দিবসের ভাষণ'।

৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটির নাম 'মাইকেল' নয়, 'মাইকেল' হবে। ৫০ পৃষ্ঠাতেও ঐ কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম পংক্তিতে একই শুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

পরিচয়

৫৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ফাল্গুন ১৩৯৩

প্রবন্ধ

তীর্থের সঞ্চয় অমরেশ দাশ ১
নৈতিক মূল্য ও উদ্‌বৃত্ত মূল্য গোলাম কুদ্দুস ১১
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উৎস প্রসঙ্গে নীহার ভট্টাচার্য্য ৩৮

ক্রোড়পত্র

সে দিবসের ভাষণ জ্যঁ জেনে
(ভাষান্তর : দেবাশিস সেন) ৫৭

গল্প

সাত কাহন উদয় ভাদুড়ী ২০
জয়যাত্রায় যাও গো শতক্রু মজুমদার ৩০

স্মৃতিকথা

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক সৌরি ঘটক ৭১

কবিতাগুচ্ছ

সিদ্ধেশ্বর সেন অমিতাভ গুপ্ত নিশীথ ভড় শোভন রায় তরুণ সেন ব্রত চক্রবর্তী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাসু মুখোপাধ্যায় সন্তোষ মুখোপাধ্যায় অনীক রুদ্র সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় অজিত বসু সুশান্ত আচার্য প্রবালকুমার বসু রামলাল সিং রেণুকা পাত্র ৪২—৫৬

আলোচনা

পাবলো নেরুদা ও স্পেনের অন্যান্য কবিতা প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৭৮
গোপাল হালদার পঁচাশি পেরোলেন দেবীপদ ভট্টাচার্য ৮৪

অনুবাদ

দস্তয়েভস্কির শেষ ভালোবাসা সের্গেই বেলভ
(অনুবাদ : সত্য গুহ) ৮৭
আমার প্রথম লেখা ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি
(অনুবাদ : জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়) ৯৪

পুস্তক পরিচয়

প্রবীণ নাট্যকারের একাঙ্ক নাটক নীরেন্দু হাজরা ১০১

দায়বদ্ধ কবি ও কবিতা রাম বসু ১০৪

সংস্কৃতি সংবাদ

কলকাতায় পুশকিন স্মরণ অপূর্ব কর ১১০

অমলেন্দু চক্রবর্তী পুরস্কৃত মলয় দাশগুপ্ত ১১৪

কবিপত্র-র বিষ্ণু দের সংখ্যা অরুণ চৌধুরী ১১৫

কবিতা উৎসব প্রদীপ পাল ১১৬

বিয়োগপঞ্জি

অগ্নিকন্যা বীণা দাস (ভৌমিক) কমলা মুখোপাধ্যায় ১১৯

পাঠকগোষ্ঠী

মণীন্দ্র রায় ১২৪

প্রচ্ছদ

পুণ্যব্রত পত্রী

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপন দপ্তর, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

তীর্থের সঞ্চয়

অমরেশ দাশ

১

"...রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এজন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"[১]—এই কথাগুলি যাঁর, আমরা জানি, তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না; এমনকি, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল বিদ্বেষ কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলেও নির্মূল হয়ে গিয়েছিল কিনা সন্দেহ।[২] তিনি তো কত দেশে গিয়েছেন, কোথাও কোথাও একাধিকবার। কই, এমন কথা তো দ্বিতীয় কোনো দেশ সম্বন্ধে বলেন নি! শুধু কি তাই? নানা দেশের কথা তিনি লিখেছেন নানা ভঙ্গিতে, কিন্তু 'রাশিয়ার চিঠি'র কি কোনো তুলনা আছে? এ-এক আশ্চর্য বই; এতে রাশিয়ার কথা আছে, আছে ভারতের কথা, তার থেকে কম নেই লেখকের নিজের কথা। আর যে আবেগ, মর্মবেদনা ও ভাবনা আছে তা এক কথায় অপ্রত্যাশিত। এই বই পড়তে পড়তে অব্যবহিতভাবেই আমরা বুঝি, উদ্ধৃত মন্তব্য নেহাত কথার কথা নয়। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি দেখলেন যাতে তাঁর ঐ দেশকে মনে হল 'এজন্মের তীর্থ', এবং তাঁর দেখা ও সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা—এবিষয়ে সমর্পিত নয় এই প্রবন্ধ। এখানে আমরা স্মরণ করতে চাই: তীর্থে গিয়ে তিনি কী পেলেন এবং যা পেলেন তা তাঁর স্থায়ী সঞ্চয় হল কিনা।

২

সোভিয়েত রাশিয়া দেখার আগে সাম্যের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে কখনো-সখনো জেগে থাকলেও সাম্য তাঁর সাধ্য ছিল না। সম্পদ ও সম্ভোগের সাম্য, আর্থিক ও সামাজিক সাম্য যে সম্ভব—এ-প্রত্যয়ও তাঁর ছিল না। তবু অসাম্যের বেদনায় তিনি অভিভূত ও ভাবিত হয়েছেন সকল মানবতাবাদীর মতোই; অধিকন্তু ঐ প্রেরণায় শিল্পের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছেন লোকহিতকর নানা কর্মে। এ-বিষয়ে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি আছে 'রাশিয়ার চিঠি'র প্রথম পত্রে। সমাজের যারা 'পিলসুজ' তাদের আবহমান দুর্দশার অনবদ্য বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

"আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই।"[৩]

উপায় একটা পেলেন সোভিয়েত রাশিয়ায়। সেটা শ্রেয় কিনা এবং তাঁর প্রেয় কিনা, এ-প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রাথমিক নয়। কিন্তু যা পেলেন তাতে তিনি 'আশ্চর্য' হলেন; এবং এযাবৎ নিরুপায় কবিচিত্ত বেদনা ও নৈরাশ্য থেকে সহসা মুক্তি পেয়ে নূতন আশায় উদ্বুদ্ধ হল। সেই উদ্বোধন ও উপলব্ধির আলোতে তিনি জানলেন সাম্যের সম্ভবপরতা। তীর্থে গিয়ে এই হল তাঁর প্রথম ও প্রধান সংগ্রহ। 'ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব' দেখে, 'নির্ধনের শক্তিসাধনা' দেখে তিনি লিখেছেন, "উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না? যেহেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে; সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো। মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং। কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

য়ুরোপে অন্য-সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠেছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক

দলই পাচ্ছে, অধিকাংশই পাচ্ছে না—এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য; বলেছিল মানব-প্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে, এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে, মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য; ভাগটাই মায়া—সম্যক্ চিন্তা সম্যক্ চেষ্টা দ্বারা সেটাকে যে মুহূর্তে মানব না, সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলছে। সব কিছু এই চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল।"[৪]

অন্তর দিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্তঃসারকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বুঝে নিতে চেয়েছেন। বুঝে নিতে গিয়ে এবং বোঝাতে গিয়ে নিতান্ত অশাস্ত্রীয়ভাবে শাস্ত্রবিশেষের যে সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন তা অদ্ভুত লাগতে পারে, মনে হতে পারে সন্দেহযোগ্য; কিন্তু তাঁর বুঝে নেবার আগ্রহে, সহমর্মিতায়, নিজের মতো ক'রে বুঝে নেওয়ায় সন্দেহ জাগা উচিত নয়। সেদিন যে-সত্য তিনি লাভ করেছিলেন তার দ্বারা তাঁর চিত্ত এতই অধিকৃত হয়েছিল যে, তাকে স্বদেশের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাই 'রাশিয়ার চিঠি'তে আবেগ অত্যন্ত, এবং চিঠির পর চিঠিতে একই বক্তব্য পুনরাবৃত্ত।

"দেহে দেহে পৃথক বলেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি করে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দাঁড়তে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলবার প্রস্তাব বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জার'এর মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।"[৫]

এই মন্তব্যও তো আছে একই বইতে! অতএব একে বর্জন ক'রে আগেরটিকে চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করায় আপত্তি অসম্ভব নয়। উপরের প্রতিবাদী কথাগুলি আছে 'উপসংহার' অংশে। ঐ অংশটি 'সোভিয়েট নীতি' নামে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রূপে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ অর্থাৎ ১৯৩১ সালের এপ্রিল-মে সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাশিয়া থেকে কবি জার্মানী হয়ে আমেরিকায় যান; তারপর দেশে ফিরে এসে এটি লেখেন। সতর্ক পাঠকের চোখে প'ড়ে থাকবে সে, 'উপসংহার'-এ সোভিয়েতের বিরূপ সমা-

লোচনা তুলনামূলকভাবে তীব্র এবং লেখক যেন মূল চিঠিগুলির জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রকৃত ঘটনা তাই। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠি থেকে ঐ পত্রাকার প্রবন্ধ রচনার উপলক্ষটি জানা যায়। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "প্রবাসীতে যে চিঠিটা বেরিয়েছে বিশেষ কারণে তার জরুরিত্ব আছে। আমার আমেরিকান ও জার্মান বন্ধুরা আমার বলশেভিক পক্ষপাত নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচে। আমার ঠিক মনের ভাবটিকে তাদের অবিলম্বে বোঝানো দরকার। এই চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত।"[৬] ক্ষুব্ধ বন্ধুদের সন্তুষ্ট করার জন্য যা লেখা তাতে তাঁর 'ঠিক মনের ভাবটি'ই শুধু প্রকাশ পায় নি, সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বিব্রত (হয়তো উৎকণ্ঠিত) লেখকের স্ববিরোধিতা। না হলে সামাজিক বৈষম্য হয়ে যেত না 'বিধাতার বিধি', আর আগে যাকে বলেছেন 'অসম্ভব সাহস' এবং যা দেখে শ্রদ্ধা বোধ করেছেন—তাকে বলতেন না 'মূঢ়তা'।

রাশিয়ায় সাম্যের আদর্শকে রূপায়িত হতে দেখে সত্যই তিনি অভিভূত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। সাম্য যে তাঁরও প্রেয় সেকথা ঘোষণা করে মস্কোর ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে আয়োজিত ২৪শে সেপ্টেম্বরের সভায় বলেছিলেন, "…একথা জেনে খুবই আনন্দ পেলুম, যে-জনগণ সমাজজীবনের ভিত্তি, সে-জনগণ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়, সোসিয়ালিস্ট সমাজের সব সুখ-সুবিধারই তাঁরা সমান অংশীদার।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহু দিনের স্বপ্ন, যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানস মুক্তির বাস্তবরূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"[৭]

'যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তি' সম্ভব করেছে সমাজতন্ত্র। ঐ মুক্তি তাঁর অনেক কালের স্বপ্ন। ধনমোহ ও ধনের অত্যাচার থেকে মানুষের মুক্তির কথা তিনি বলে এসেছেন এই শতাব্দীর সূচনা থেকে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বলেছেন পাশবিক, বলেছেন নরমাংসভোজী; চেয়েছেন তার কবল থেকে মানুষের উদ্ধার। উদ্ধারের উপায় তিনি ভেবেছেন একরকম। তাঁর উপায় অহিংস, বাধ্যতা নয় স্বেচ্ছামূলক। কখনো সমবায়, কখনো মহাত্মার আত্মোৎসর্গের কথা তিনি বলেছেন। কখনো আবার বিপ্লবের প্রান্তে গিয়েও পৌঁছেছে তাঁর ভাবনা। যেমন—'রথের রশি' (আদি রূপ 'রথযাত্রা, ১৯২৩),

'রক্তকরবী' (১৯২৬)। কিন্তু বিপ্লব, যেমন বিপ্লব ঘটেছে রাশিয়ায়, তার কথা তিনি বলেন নি। তাঁর মতো উদারতান্ত্রিক ও ভাববাদী সেকথা বলেন কি করে? সোভিয়েত দেশে মুক্তি এসেছে ভিন্ন পথে। পথ ভিন্ন হলেও মুক্তিতে তাঁর সন্দেহ হয়নি। তিনি তাতে খুশী না হয়ে পারেন নি। সে-খুশি প্রবল বেগে উৎসারিত হয়েছে চিঠির পর চিঠিতে। মানুষের মুক্তি ও পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠা দেখে তাঁর অন্তরাত্মা এত উল্লসিত হয়েছিল যে, তাঁর আবেগ সংযম ও সংস্কারের কোনো বাধাই মানে নি।—"শোনা যায়, য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈব কৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে; এখানে তাই হল। দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববল।"[৮]

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার মূলে আছে যে বিপ্লব তাকে রবীন্দ্রনাথ শ্রেয় বলে মানতে পারেন নি? কিন্তু তবু তাঁর মনে হয়েছে অবধারিত। মানুষের ইতিহাসের রথ চলেছে সেই পথে সে-পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন সোভিয়েত রাশিয়া—একথা তাঁর মনে হয়েছিল রাশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে, কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই। রবীন্দ্রনাথ মস্কোয় পৌঁছান ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। যাবার পথে পোল্যাণ্ডের বারুস থেকে একটি অসম্পূর্ণ অপ্রকাশিত পত্রে (শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত) তিনি লিখেছিলেন, "মস্কৌয়ের পথে চলেচি। আমার মনে হয় মানুষের ভাবী ইতিহাসেরও রথ চলেছে এই পথে। কেন মনে হয় সেই কথাটা লিখে রাখি।"

রাশিয়ায় পৌঁছে তাঁর এই বোধ আরো গভীর হয়েছে। সমাজতন্ত্রের নির্মাণকে তাঁর মনে হয়েছে পৃথিবীর 'সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান'। রুশবিপ্লবের বিশ্ব ভূমিকা, সর্বহারার শক্তি, সংহতি ও সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কথায়—

ক. "একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক

স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিকবে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"[৯]

খ. "দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।"[১০]

গ. "—আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তা হলে মানুষের পরিত্রাণ নেই।"[১১]

এই সম্বোধি একই সঙ্গে তাঁকে এক অনিবার্য আত্মবিরোধের দিকেও ঠেলে দিয়েছিল। এক দিকে তাঁর উদারতান্ত্রিক বিশ্বাস ও শ্রেয়বোধ, অন্য দিকে মানবেতিহাসের অমোঘ গতি ও বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা—এই দোটানাও তীর্থের দান। তাঁর মনের দোলাচল চৌদ্দটি চিঠিতে যতটা না প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে বেশি প্রকাশ পেয়েছে 'উপসংহার'-এ। যিনি বিপ্লবকে বলেছেন 'যুগান্তরের পথ', বলেছেন 'তপস্যা', বিপ্লবীরা যাঁর দৃষ্টিতে 'সাধক', তিনিই 'উপসংহার'-এ লিখেছেন, "অসম্ভব নয়, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন সে দিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভদিন।"[১২] শ্রেয় ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার এই দ্বন্দ্বের অবসান রবীন্দ্রমানসে ঘটে নি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জীবনের শেষ প্রহরে দ্বিতীয়ের টান যে তুলনামূলকভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে।[১৩]

৩

একটি চিঠি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই থেকে জানতে পারি, তাঁর চেতনার কোন্ গভীরে গৃহীত হয়েছিল তীর্থের দান এবং কেমন পরমায়ু পেয়েছিল তা। চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ৭ই মার্চ ১৯৩৫। দীর্ঘ সেই চিঠিতে অন্তরঙ্গ

অমিয়চন্দ্রকে তিনি লিখেছিলেন, "মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান সে সভ্যতা মানুষখাদক। তার একদল victim চাই-ই যারা তার খাদ্য, যারা তার বাহন। তার ঐশ্বর্য, তার আরাম, এমন কি তার কাল্চার উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে আজ শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে।···যতক্ষণ লোভ রিপু এই বর্তমান সভ্যতার ও স্বাজাত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে কাজ করে ততক্ষণ এর থেকে বলহীনের নিষ্কৃতি নেই; কেননা, যে দুর্বল এই সভ্যতা তারই প্যারাসাইট।···

এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে?···

যখন সামনে এতবড়ো দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখনি বুঝতে পারি যে এই দুর্বলের প্রতি নির্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুক্‌রো নিয়ে আমরা বাঁচব না।···

সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান।···কিন্তু সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্যরাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে সেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুকালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।"[১৪]

এর ব্যাখ্যা বাহুল্য শুধু নয়, বিরক্তিকরও লাগতে পারে। কবি রেখে-ঢেকে কিছুই বলেন নি; যা বলবার তা এমন জোরের সঙ্গে বলেছেন, এমন

অনিরুদ্ধ আবেগে বলেছেন, এমন অবিচল বিশ্বাসে ও উদ্দীপনাময় ভাষায় বলেছেন যে-বিপ্লব প্রসঙ্গে তাঁর অনতিক্রান্ত দ্বিধাও যেন সেই মুহূর্তে অশক্তের মতো আত্মগোপন করেছে। মৃত্যুর মাস তিনেক আগে এই কবিই যখন বলেন 'সত্য যে কঠিন, / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, / সে কখনো করে না বঞ্চনা'—তখন বোধ হয় তাঁর দোলাচলচিত্ততার একটা ব্যাখ্যা পেয়ে যাই, সেই সঙ্গে পাই মহাসত্ত্ব মানুষটির মর্মবাণী।

উল্লেখিত চিঠিটির কয়েক মাস পরে ৩রা জুলাই ১৯৩৬, 'অমৃত' নামে একটি কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটি আছে 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে। তাৎপর্যের দিক থেকে সে অনন্যা। একটা গল্প আছে তাতে। গল্পের নায়িকা ধনীকন্যা অমিয়া প্রথমে ভালোবাসে যাকে সে দরিদ্র। দারিদ্র্যের অসম্মানের মধ্যে প্রেয়সীকে আনতে চায় না বলে নায়ক ধনগরিমার সাধনায়। তারপর অমিয়ার জীবনে এল নতুন নায়ক—কমিউনিস্ট মহীভূষণ।—

"লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।"

মহী ভালোবাসে অমিয়াকে, কিন্তু অমিয়ার পাণিপীড়নের জন্য সে উৎসুক নয়; সে বলে, "অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।" অনেক দিন পরে লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য হয়ে প্রথম নায়ক যখন ফিরে এল তখন অমিয়ার জন্মান্তর ঘটে গেছে। সে বিয়ে করেছে মহীকে, সুখ-সম্পদের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছে গ্রামে, সেখানকার বিদ্যালয়ের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছে;—মহী তখন জেলে। বিফল মনোরথ প্রেমিক বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় অমিয়ার শেষ কথা—

"এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"

কবিতার শুরুতে আছে উপনিষদের মৈত্রেয়ীর পরম প্রার্থনার কথা। কবিতার শেষে একালের মৈত্রেয়ী অমিয়ার পরম প্রাপ্তির এই উপলব্ধি। আশ্চর্য, এ কেমন অমৃতের সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ?

আমরা জানি এই কবিই ১৯৪০ সালের মে মাসে, যার এক কবিতায় নিদারুণ মর্মবেদনায় বলেছেন, "ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে"। ঘটনাটাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'অপঘাত' নামে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, ফিন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন তাঁর তীর্থের সঞ্চয়ও কি চূর্ণ হয়ে যায় নি? না। "মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ

দেখি নি।"—সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর এই অভিমত তার পরেও কি সত্য ছিল? তার পরেও কি তিনি সোভিয়েতের সাফল্য প্রার্থনা করেছেন? আশা করেছেন সমাজতন্ত্রের কল্যাণে 'ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ অসংখ্য বন্দীর মুক্তি'? অবশ্যই। ফিন্‌ল্যাণ্ডের ঘটনায় সোভিয়েতের উপর ন্যস্ত তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে চূর্ণ হয়ে যায় নি তার প্রমাণ আছে 'সভ্যতার সংকট'-এ, যার রচনাকাল ১৯৪১ সালের মে মাস। তা ছাড়া ভুলে গেলে চলবে না যে, ঐ ঘটনাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সোভিয়েতের পক্ষে যে যুক্তিই থাক কবির কাছে ঐ আক্রমণ আক্রমণ বলেই নিন্দনীয় ও মর্মান্তিক। একথা কি ভাবা যায়, সরকারী আমন্ত্রণে ও আতিথ্যে তীর্থদর্শন করেছিলেন বলে তীর্থের পাণ্ডার কাছে রবীন্দ্রনাথ আত্মবিক্রয় করেছিলেন? সেদিন যেমন, তেমনি পরেও তিনি স্বধর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। একদা যে বলেছিলেন 'এজন্মের তীর্থ' রাশিয়া, সে-ও তাঁর নিজের বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন। ফিন্‌ল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েতের আক্রমণ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাতে তাঁর দুঃখবোধ স্বাভাবিক এবং সে-দুঃখ আন্তরিক—গভীরও। কিন্তু তাতে যদি তীর্থের সঞ্চয় মিথ্যা হয়ে যেত তবে কবিতাটি অমন আকস্মিকভাবে শেষ হত কি? ঘটনার সংবাদ যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই উত্থাপিত হয়েছে কবিতায়। শেষ দুটি পঙক্তিতে আছে ঐ সংবাদ; তার আগে আটাশটি পঙক্তিতে বর্ণিত হয়েছে জীবনের ভরা আনন্দ। দুই অংশের সুস্পষ্ট অসংলগ্নতায়, ও ভাগবত বিচ্ছিন্নতায় যা একান্তভাবে প্রতীয়মান তা হল, ঘটনাটির আকস্মিক অভিঘাত এবং সহজ জীবনের আনন্দের 'অপঘাত'। এতদতিরিক্ত কোনো বাণী এ কবিতায় আছে মনে হয় না।

ঐ 'অপঘাত'-এর বেদনা তীর্থের পুণ্য সংগ্রহকে যদি কোনোভাবে আচ্ছন্নও করত তবে কয়েক মাসের ব্যবধানে নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর জয়ের সংবাদে কবি উৎফুল্ল হতেন না, মহাপ্রস্থানের আগে ব্যক্ত করতেন না তাঁর অন্তর্গত আশা ও আস্থা। কবির সেই সময়ের মানসিক অবস্থা ও আকাঙ্খার বর্ণনা দিয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন, "…রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যেও বারেবারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, সব চেয়ে খুশী হই রাশিয়া যদি জেতে। সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর

একটু খারাপ—মখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা: 'রাশিয়ার খবর বলো।' বললুম, 'একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।'[১৫]

তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য যে, তাঁর মুখের জ্যোতিতে আমি দেখেছি বিশ্বমানুষের বন্দনা।"

এটা হল কবির শেষ সাক্ষ্য, শেষ ইচ্ছা, শেষ কথা। আলোচ্য প্রসঙ্গেও এই হল শেষ কথা।

উল্লেখপঞ্জী

১. রচনাবলী (১০), শতবার্ষিক সংস্করণ। পৃ. ৬৭৯

২. পত্র সংখ্যা ৫, চিঠিপত্র (৪)। পত্রের তারিখ ৩১শে জুলাই ১৯৩১। নীতীন্দ্রনাথকে লেখা এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাশিস্ত ও বল্‌শেভিকদের 'মানুষখেগো দল' বলেছেন।

৩. রচনাবলী, পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৭৬

৪. ঐ। পৃ. ৬৯৯

৫. ঐ। পৃ. ৭৩০

৬. চিঠিপত্র (৫)। পৃ. ৮২

৭. 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর। সংকলন ও সম্পাদনা: শৈলেন চৌধুরী। পৃ. ৮৭

৮. রচনাবলী, পূর্বোক্ত। পৃ. ৭০৪

৯. ঐ। পৃ. ৬৭৯

১০. ঐ। পৃ. ৬৮০

১১. ঐ। পৃ. ৬৮১

১২. ঐ। পৃ. ৭৩২

১৩. চিঠিপত্র (১১)। পত্র সংখ্যা ৭৪, ৮৯, ৯৬, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ১২৯

১৪. ঐ। পৃ. ১৪০-১৪৬

১৫. 'কবি-কথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

নৈতিক মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য

গোলাম কুদ্দুস

(পূর্বানুস্মৃতি)

॥ ৩ ॥

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটি অতীব সহজবোধ্য, যদিও অর্থনীতির একটি ক্ষেত্রে এটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মার্কসকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং মর্মান্তিক পারিবারিক শোক সহ্য করতে হয়েছিল। এক সময় ছিল যখন মার্কসের তত্ত্বটিকে বুর্জোয়ারা নীরবতার হিমঘরে আবদ্ধ রাখতে পেরেছিল, কিন্তু আজকের দিনে এটি এতই সুপরিচিত ও সুপরিজ্ঞাত যে, দু'চার কথায় এর আলোচনা সেরে নিলে ক্ষতি নেই।

বিনিময়ের অর্থই হল, সম পরিমাণ শ্রম বা শ্রমজাত মূল্যের বিনিময়। বেচা-কেনা, লেন-দেন সবই সমানে-সমানে কারবার। এ-কারবারে কেউ যদি অন্যকে ঠকিয়ে মুনাফা লাভের চেষ্টা করে, সে-ও আবার অন্যক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়ে মুনাফার কড়ি হারাতে পারে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের লাভ-ক্ষতি কাটাকাটি হয়ে গেলে কারবার থেকে মুনাফা আসতে পারে না। অথচ টাকা খাটালে সাধারণত টাকা বৃদ্ধি পায়। সমাজে তা'হলে নিশ্চয় এমন কোনো বস্তু আছে, যাকে যে-মূল্যে ক্রয় করা যায়, তাকে ব্যবহারের দ্বারা নিঃশেষ করে ফেললেও, তা থেকে ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশি মূল্য পাওয়া যায়। নইলে বাড়তি টাকা বা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হতে পারত না। সমাজে এরূপ পদার্থ একটিই মাত্র রয়েছে— জীবন্ত মানুষের শ্রমশক্তি। এই শ্রম-শক্তিকে যতটুকু সময় ধরে খাটালে তার ক্রয়-মূল্য উসুল হয়ে আসে, তদপেক্ষা অধিক সময় তাকে খাটানো হয় বলেই শ্রমশক্তির যিনি ক্রেতা, তাঁর হাতে আসে উদ্বৃত্ত শ্রম বা উদ্বৃত্ত মূল্য। অথচ শ্রমিককে বলা হয়ে থাকে, সম শ্রমশক্তির জন্য তাকে সম পরিমাণে মাইনেই দেওয়া হচ্ছে। অচেতন শ্রমিক এরূপ ধোকাবাজি বিশ্বাসও করে। এই হচ্ছে মুনাফার রহস্য। এই হচ্ছে যাবতীয় বুর্জোয়া মিথ্যার স্থায়ী বনিয়াদ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শিল্পের ক্ষেত্রে এ-কথা খাটতে পারে, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে? সেখানে তো প্রত্যক্ষ কোনো শোষণ নেই, উদ্বৃত্ত মূল্য সেখানে সৃষ্টি হবে কী করে? মার্কস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিয়েছেন যে, বাণিজ্যিক পুঁজির মুনাফাও শিল্প-পুঁজির মুনাফারই একটা অংশ মাত্র। অর্থাৎ শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে না যদি তার উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যিক পুঁজির সাহায্যে বাজারে বিক্রি হয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হিসাবে আবার তার হাতে ফিরে না আসে। নইলে পুনর্নোৎপাদন হবে কী দিয়ে? তাই শিল্পপতি লভ্যাংশ দেয় ব্যবসায়ীকে। আসলে শ্রমিকশোষণ-জাত উদ্বৃত্ত মূল্যের ভগ্নাংশগুলিই হচ্ছে ব্যাঙ্কের সুদ, শিল্পের বাড়িওয়ালা বা জমিওয়ালার ভাড়া বা খাজনা এবং বাণিজ্যিক পুঁজির মুনাফা। কৃষিতে যখন পুঁজিবাদের প্রসার ঘটে, তখন কৃষি-মজুর বা ক্ষেতমজুরের উদ্বৃত্ত শ্রম বা মূল্য একইভাবে বণ্টিত হয় বিভিন্ন শোষকশ্রেণীর মধ্যে।

উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনে মানবিক ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধের বালাই থাকতে পারে না। এখানে আগাগোড়া শোষক-শোষিত, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। এখানে সব সময় টাগ-অফ-ওয়ার, যার অন্য নাম শ্রেণীসংগ্রাম। উদ্বৃত্ত মূল্য রক্ষার জন্য হেন কুকর্ম নেই যা বুর্জোয়াশ্রেণী করতে পরাঙ্মুখ। উদ্বৃত্ত মূল্য রক্ষার্থে তারা গোটা রাষ্ট্র-যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে, পুঁজির একচেটিয়া স্তরে রাষ্ট্র একচেটিয়াত্ব গড়ে তুলতে পারে, শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে পারে, শ্রমিক নেতাদের সাধ্যমত ক্রয় করতে পারে, শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতি-বাদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখার অপচেষ্টা চালাতে পারে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার করতে পারে, ঘোর প্রতিক্রিয়া এবং ধর্মোন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে পারে, উপনিবেশ ও বাজার দখলের জন্য রক্তপাত ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে পারে এবং গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। বস্তুত, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং সংখ্যাতীত স্থানীয় যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষকে বলি দেওয়ার মূলে আছে উদ্বৃত্ত মূল্য রক্ষা ও বৃদ্ধির উৎকট লোভ। একই কারণে আজ তাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন। এমন কি উদ্বৃত্ত মূল্যের বনিয়াদ রক্ষার্থে এরা উদ্বৃত্ত মূল্যের ভগ্নাংশ খরচ করে উদ্বৃত্ত মূল্য-সৃষ্টিকামী শ্রমিকদের একাংশকে ক্রয় পর্যন্ত করতে পারে! এবং তদ্দ্বারা শ্রমিকদের বাকী অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকালে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতীতের দিকে চোখ ফেরালে দেখতে পাই, এইভাবেই ইংলণ্ডের বুর্জোয়া

সেখানে শ্রমিক-বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করতে পেরেছিল। মার্কস আশা করেছিলেন, তদানিন্তন দুনিয়ার বুর্জোয়া চূড়ামণি ইংলণ্ডের শোষণের শিকার যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, তারাই হয়ত বিশ্বে প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব ঘটাবে। "শিল্প-বিপ্লবের প্রথম সন্তানেরা নিশ্চয়ই বিপ্লব সংগঠিত করার শেষ অধ্যায়ের লোক হবে না।" কিন্তু ধূর্ত বুর্জোয়া শ্রেণী উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশ দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে একটা অভিজাত অংশ গড়ে তুলে সে-স্বপ্ন বানচাল করে দিতে পেরেছিল এবং আজো পারছে। বিশ্বজোড়া বাজার এবং উপনিবেশলব্ধ মুনাফা তাদের সহায়ক হয়েছিল। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মার্কসীয় সংগ্রামের কলাকৌশল উপরোক্ত বাস্তবতার ভিত্তিতেই রচিত। বড় দুঃখেই সেদিন মার্কসকে বলতে হয়েছিল, "উপনিবেশ সম্বন্ধে বৃটিশ বুর্জোয়া ও বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন!" "সর্বাগ্রগণ্য বুর্জোয়াজাতির শ্রমিকেরাও বুর্জোয়া-শ্রমিক।" মাছের তেলে মাছ ভাজার মতই বৃটিশ বুর্জোয়ারা উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশের বিনিময়ে শ্রমিকদের বশে আনতে পেরেছিল। কথায় বলে, তোমারই শিল তোমারই নোড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

অতীতের দিকে তাকালে আমরা আরো দেখতে পাই, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভাঙ্গনের মূলেও আছে একই রহস্য। বিভিন্ন পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোয়াদের হাতে এসেছিল অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের অস্ত্র। ইংলণ্ডের বুর্জোয়াদের কায়দায় তারাও উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশ দ্বারা শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে একটা অভিজাত অংশ তৈরী করতে পেরেছিল এবং তাদের সাহায্যে শ্রমিক শ্রেণীর বৃহদাংশকে জাতীয়তাবাদী শিবিরে টেনে আনতে পেরেছিল, ফলে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকেরা যুদ্ধকালে স্ব স্ব বুর্জোয়া শাসকদের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল, যুদ্ধরত দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী আপাতত পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। কোথায় রইল শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতা? শ্রমিকশ্রেণীর মান রেখেছিল সেদিন রুশীয় বলশেভিকেরা এবং বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু আন্তর্জাতিকতাবাদীরা। যে-কারণে সোভিয়েত বিপ্লব ঘটল, তার পিছনে উপরোক্ত গভীর আন্তর্জাতিক নৈতিক মূল্যবোধ সক্রিয় ছিল।

বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও একই চিত্রের সাক্ষাৎ পাই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশ ব্যয় করেই মার্কিন শ্রমিকশ্রেণী মধ্যে সংস্কারবাদ দৃঢ় করতে পেরেছে। নইলে এত বড় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদের মুখে বিপুলাকায় মার্কিন শ্রমিকশ্রেণী প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারত না। তাদের মধ্যে আলোড়ন যে জাগছে না তা নয়, কিন্তু

সুবিধাবাদের বাঁধ ভেঙে প্লাবন আসছে না, অন্তত এখনো। এককালের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতই আজ মাকিন পুঁজিবাদীরা বিশ্ববাজারের সেরা উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগী। তারা নয়া উপনিবেশবাদী। বস্তুত, অর্থনৈতিক হিসাবে দেখা গেছে, এই নয়া উপনিবেশবাদীরা প্রধানত লগ্নি-পুঁজির সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে লুণ্ঠন করেই নিজেদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির স্বার্থেই একদা মার্কস ও এঙ্গেলস আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামক ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের খবরে উল্লসিত হয়ে প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন। আজ তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়ত ব্যঙ্গ ভরে বলতেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সস্তা শ্রম থেকে যদি অধিকতর উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জিত না হত, তা' হলে বুর্জোয়ারা রাতারাতি তাদের বর্ণ-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করত।

৪.

মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা নৈতিক মূল্যবোধের একটা স্থায়ী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এর আগে পর্যন্ত নানামতের অসংখ্য মানব-হিতৈষী ও সমাজ-সংস্কারক শত শত শতাব্দী ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অশেষ ক্লেশ বরণ করেছেন, বিচিত্র পন্থার আশ্রয় নিতে সচেষ্ট হয়েছেন, বহু বিচিত্র পরিকল্পনা রচনা করেছেন, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের কত না কাঠামো তৈরি করেছেন। সবই নিষ্ফল হয়েছে। কারণ তাঁদের সংগ্রাম কোনো নির্দিষ্ট বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে নি, কোনো নির্দিষ্ট শত্রুর সন্ধান পায় নি, কোনো নির্দিষ্ট অস্ত্রের খোঁজ জানত না। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর সবই সুনির্দিষ্ট রূপ নিল, যাবতীয় অস্পষ্ট ধারণা দূর হল। নৈতিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠারূপে দেখা দিল—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, যার ভিত্তি হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দেখিয়ে দিক, কোনো মনগড়া পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই, উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার বজ্রমুষ্টি থেকে নিষ্কৃতির উপায়। সেই উপায় শ্রেণী সংগ্রাম, যা উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই উত্থিত, বাইরে থেকে আমদানি করা কোনো বস্তু নয়। যতক্ষণ উদ্বৃত্ত মূল্য থাকবে, ততক্ষণ থাকবে শ্রেণী-সংগ্রাম। ঠিক কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত। এ ছায়া একদিন কায়াকে পরাস্ত করবে! তারপর অবশ্য মিলিয়ে যাবে। তার আগে শ্রেণী-সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াবে সব নৈতিক মূল্য-বোধের

কেন্দ্রবিন্দু। তার সাহায্যেই একদিন শিকার হয়ে দাঁড়াবে শিকারী, পদানত উঠে দাঁড়াবে শাসকরূপে। উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের জাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান, ইতিহাসের নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিধান। এই বোধ থেকেই উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ড রচনার শেষে মার্কস এঙ্গেলসকে এক পত্রে লিখেছিলেন, এ হচ্ছে বুর্জোয়ার মস্তক লক্ষ্য ক'রে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র। নৈতিক মূল্যের সংগ্রামে এই স্পষ্টতাই বুর্জোয়ার পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক। এখন থেকে সুস্পষ্টতার গুণেই বুর্জোয়াবিরোধী সংগ্রামের সাফল্য অনিবার্য। বৈজ্ঞানিক ভাবে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে, বিপ্লবী আন্দোলনই নৈতিক মূল্যবোধের কর্মশালা।

নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে আর কোনো বাগাড়ম্বর নয়, কেবল কথার কচকচি নয়, নীতিবোধমূলক পাঠ্যপুস্তক রচনা নয়। জ্ঞানীবৃন্দের গুরুগম্ভীর আলোচনা নয়, এবার শুরু হল বাস্তব কার্যক্রম, বাস্তব গণ-আন্দোলন, বিপ্লবী অভ্যুত্থান বা রূপান্তরের প্রস্তুতি, কথা ও কাজের সমন্বয়। এবার আর শুধু দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পত্রের বিরুদ্ধে অসংলগ্ন সংগ্রাম নয়, এবার নীতিহীনতার মহীরুহ বা বিষবৃক্ষ উদ্বৃত্ত মূল্যের বিরুদ্ধে লড়াই। বিষবৃক্ষকে আমূল উৎপাটনের লড়াই। আর সে-লড়াইয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়ে গেছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে। অবিশ্বাসীরাও গিয়ে দেখে আসতে পারেন সেখানে উদ্বৃত্তমূল্যের পাপের অবসানে মানবতার কী মহিমাময় উত্থান ঘটেছে, ন্যায়-সত্য এবং ভ্রাতৃত্বের কী নির্মল আলো ফুটেছে, এতকালের জঞ্জালের অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে কী দৃঢ় সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং নতুন সভ্যতা ও মূল্যবোধের অগ্রগতি কত দ্রুতবেগ ও ব্যাপকতা লাভ করেছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্ধানে মানুষ যেন এতদিন পর নিজের প্রকৃত সমাজ-সত্তা ফিরে পাচ্ছে, যেন নিজের কাছে নিজে প্রত্যাবর্তন করছে। কেননা এতদিন মানবিক সত্তার অংশগুলি যেন শকুনের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল রাষ্ট্র, পরিবার এবং ধর্ম। খণ্ডিত মানুষ তাই হারিয়ে গিয়েছিল নিজের কাছেও। দেখা গেছে, বিশ্ববরেণ্য মানুষও নিঃসঙ্গ বোধ করলে 'কে আমি?' এ-প্রশ্নের জবাব পান না, কিন্তু যখন-ই তিনি সমাজ-সত্তায় ফিরে আসেন, তখন-ই তাঁর সমুজ্জ্বল স্বরূপ চিনে নিতে কারো বিলম্ব হয় না। তখন যে তিনি 'আমি তোমাদেরই লোক।'

সম্পত্তির গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষকে আত্মরক্ষার তাগিদে অপরিসীম শক্তি ক্ষয় করতে হয়। সামাজিক সত্তায় সমাসীন মানুষকে সে দুর্গতি ভোগ করতে

হয় না। তিনি সবার সহযোগীতায় নিজের গুণাবলি বিকাশের স্বর্ণ সুযোগ ও প্রেরণা পান। নিজের অন্তর্লীন অফুরন্ত সম্পদের তিনি সন্ধান পান। সেই সঙ্গে তিনি বিশ্বমানব সৃষ্ট যাবতীয় সম্পদকে তিনি নিজের বলে ভাবতে পারেন। উভয় সম্পদের সমাবেশে তিনি অবিশ্বাস্যরূপে ঐশ্বর্যবান হন। তখন 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি' 'ছোট আমি' 'বড় আমি'র তিনি উর্ধ্বে। সামাজিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ব'লে তাঁর কাছে তখন 'আমি' ও 'আমরা'র ভেদ-রেখাই বিলিয়মান। এতকাল নিঃসঙ্গ 'আমি' নিজেকের অতি-মানবে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিল এবং ব্যর্থতাবরণ করেছিল, এবার বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের একজন হয়ে সব মানুষই প্রায় অতি-মানব হওয়ার ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত! আসলে সে নতুন মানুষ হতে চলেছে।

৫

আমরা যে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের আওতায় বাস করছি, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের আলোকে তারও যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি এবং লক্ষ্য করতে পারি কেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যভাবের ক্রমাবনতি ঘটছে।

একদা পুঁজিবাদী উদ্বৃত্ত মূল্যের উষালগ্নে বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিল। তখন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের গণতান্ত্রিক জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতালাভের প্রয়োজন ছিল। তাদের মুখ থেকে তখন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ফুলঝুরি ঝরেছে। তখন থেকেই পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের উদ্ভব। বাইরে যতই গণতন্ত্রের মুখোস থাক, ভিতরে ভিতরে পুঁজির শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে। বুর্জোয়ারা সংষদীয় গণতন্ত্র ব্যবহার করতে থাকে শ্রেণী-সংঘাত হ্রাসের উদ্দেশ্যে। এতদ্‌সত্ত্বেও আত্মসন্তুষ্ট উদারপন্থী বুর্জোয়ারা এই স্থির বিশ্বাস পোষণ করত যে, ব্যক্তি-মানুষ স্ব স্ব শিল্পোদ্যোগ ও অন্যান্য উদ্যোগের সহায়তায় তার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের অফুরন্ত সুযোগ পাবে, ব্যক্তি মানুষ তার অন্তর্নিহিত গুণাবলি অনুশীলনের দ্বারা সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এরূপ কল্পনা বিলাসই ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মূলে। কিন্তু বুর্জোয়া-বিকাশের ধারানুযায়ী একচেটিয়া পুঁজির উত্থান এবং ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজের উপর তার সর্বময় কর্তৃত্ব, এইসব কল্পনার ফানুসকে ফাটিয়ে দিল। সেই থেকেই বুর্জোয়া শাসনে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বপ্নসাধ ধূলিসাৎ। সেই থেকেই বুর্জোয়া

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতার পালা। সংসদীয় গণতন্ত্রের যবনিকার আড়ালে রাষ্ট্রীয় যা কিছু ব্যবস্থাপনা, সবই হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে। ধনতান্ত্রিক সংকটে স্ফীতকায় উদ্বৃত্ত মূল্য রক্ষার স্বার্থে বুর্জোয়া তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মুখোসটাও পরে থাকতে পারছে না।

মার্কস ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে চার দশক ধরে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর ডায়েলেকটিস প্রয়োগ করে দেখান যে, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র যতই সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ততই তার বিরুদ্ধে ধ্বংসের শক্তিও পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। এরূপ সমবেত ধ্বংসের শক্তির প্রথম জয়—প্যারীকমিউন। সোভিয়েত বিপ্লব এবং তার উচ্চতর গণতন্ত্র প্যারী-কমিউনেরই বংশোদ্ভূত। এতে নৈতিক মূল্যবোধ উদ্বৃত্ত মূল্যের অবসানে নতুন প্রাণ পেয়েছে।

কিন্তু যেখানে এখনো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ যেখানে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অংশের দ্বারা আক্রান্ত? সেখানে কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে? সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াকে প্রতিরোধ করে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করলে কি বুর্জোয়াকেই সাহায্য করা হবে, অথবা তাতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি ঘটবে? সমাজতান্ত্রিক শক্তির বাস্তবতাবোধ ও কর্মকৌশল তাকে সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তিই তাতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সেই সঙ্গে এও বলতে হবে যে, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যদি বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র ভিতর বাইরের বিপুল প্রগতিশীল শক্তির সাহায্যে নিজেকে রূপান্তরিত করতে না পারে এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে না পারে, তা হলে শুধু বাইরের চাক-চিক্যের দিকে লক্ষ্য করে নিজেকে ও রাষ্ট্র-যন্ত্রকে 'সুসম্পূর্ণ' করে তুলতে থাকলে তার বিরুদ্ধে মার্কসবর্ণিত 'ধ্বংসের শক্তি' পুঞ্জিভূত হবেই। কোনো সামরিক বিকল্পের দ্বারাও বুর্জোয়ারা তাদের চরম সংকটের যুগে বেশিদিন উচ্চতর গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করতে পারবে না।

ইতিমধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুবিধাবাদ প্রসারলাভ করছে। অন্যদিকে ক্ষীয়মাণ হলেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক মূল্যেবোধ-রক্ষার প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ-দুয়ের মধ্যে সীমারেখা টানতে না পারলে, অর্থাৎ একাধারে সংসদীয় সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংসদীয় গণতন্ত্র-রক্ষার সংগ্রাম করতে না পারলে নৈতিক মূল্যবোধের সংকট তীব্রতর হতে বাধ্য। অবস্থাটা অত্যন্ত

সন্দীন, অথচ সম্ভাবনাময়। শ্রেণী সংগ্রামে বিন্দুমাত্র ঢিলে দিলে, উদ্বৃত্ত মূল্যকে নিরন্তর সংগঠিতভাবে আঘাত দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারলে সব মূল্যবোধের শিরোচ্ছেদ ঘটাবে একচেটিয়া পুঁজি।

৬.

একটা প্রশ্ন থেকে যায়—মানুষ যুগ-যুগান্ত ধরে যে-সব মূল্যবোধ লালন করে এসেছে সেগুলি কি বাতিল হয়ে গেল? সেগুলি কি এখন অকেজো হয়ে গেল? মানুষের বিপুল নৈতিক ঐতিহ্য তার অমূল্য সম্পদ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য তার প্রয়োজন আছে। মানুষ সুদূর অতীতকাল থেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে। তা থেকে অর্জন করেছে উজ্জ্বল নৈতিক মূল্যবোধ। সেটা চির অম্লান থাকবে। সাহস, সংযম, সত্যবাদিতা, কর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, লোক-হিতৈষণা, আত্ম-নির্ভরতা, ক্ষমা, তিতিক্ষা প্রভৃতি বহু মূল্যবোধেই মানুষের চলার পথের চিরসঙ্গী। কিন্তু অনেক মূল্যবোধই বাস্তবায়িত হয়নি। কেন হয়নি? এ-যুগেই বা হচ্ছে না কেন? মূল্যবোধের এত সংকট কেন? এই সবই আমাদের বিবেচ্য। আমরা সেই বিবেচনা থেকেই নির্দিষ্ট শত্রু ও নির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ সেটাই যেটা যুগ-যুগান্তের মূল্য-বোধগুলিকে নিস্ফলতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আমরা বর্তমান যুগে সেই মূল মূল্যবোধেরই সন্ধান করেছি।

শ্রেণী-সমাজে আমাদের চতুর্দিকে যে-সব গর্হিত কর্ম চলেছে, সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের এতকালের মূল্যবোধগুলি সহায়ক শক্তি, এমন কি শ্রেণীহীন সমাজেও অনেকদিন ধরে এগুলির উপযোগিতা অক্ষুন্ন থাকবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও রাতারাতি সব কিছু ভোজবাজির মত নিষ্কলঙ্ক হয়ে ওঠে না, দীর্ঘদিন অতীতের জের চলতে থাকে। নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় নিত্য নতুন ভুলভ্রান্তি এবং ত্রুটি বিচ্যুতিও অবশ্যম্ভাবী। নৈতিক আদর্শের মূল্যবান ঐতিহ্য নতুন সমাজ সৃষ্টিতেও অবদান জোগাতে পারে; জোগাচ্ছে এবং জোগাবে। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় যেমন কতকগুলি মূল্যবোধ নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দেয়, যথা, যৌথ-শ্রম, যৌথ-জীবন, শ্রম-শৃঙ্খলা, শান্তি-কামনা, দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা সহযোগিতা ইত্যাদি, তেমনি জীবন্ত ঐতিহ্যের প্রতিও তারা শ্রদ্ধাশীল। এটাও তাদের এক ধরণের

মূল্যবোধ। লেনিন বিপ্লবের পর বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মানুষের সমুদয় জ্ঞান-ভাণ্ডার ও মূল্যবান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হ'তে না পারলে এবং সবকিছু আত্মস্থ করতে না পারলে নতুন সভ্যতা গড়া যায় না।

কিন্তু একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেই হবে। অতীতের সব কিছুই মূল্যবান নয়। আর অতীতমুখিনতা তো এক সর্বনাশা প্রবণতা। ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এক বস্তু, অতীতের দিকে মুখ ফেরানো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। অথচ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, অতীতের মূল্যবান ঐতিহ্যের নামে রিভাইভালিজম বা অতীতের পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া-সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়ারা বিলক্ষণ জানে যে, তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ভবিষ্যতকে তারা ভয় পায়, অতীতকে যতক্ষণ আঁকড়ে থাকা যায় ততক্ষণই মঙ্গল ও শান্তি। আর শ্রমজীবী মানুষের একটা বড় অংশকে অতীতাশ্রয়ী করা বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অবশ্য নানা কারণে নিপীড়িত মানুষের একটা বড় অংশও বর্তমানের দ্বন্দ্ব, সমস্যা, অশান্তি থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেতে চায় অতীতাশ্রয়ী হয়ে ধর্মোন্মাদনায় মেতে। এইভাবে, শোষক ও শোষিত উভয়শ্রেণীই ভিন্ন ভিন্ন কারণে এক অভিন্ন অতীত প্রীতিতে মিলিত হয়! নইলে দেশে অতীতের এত জোয়ার বয়ে যেত না। এর একটা বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে:

"পুঁজি হচ্ছে মৃত-শ্রম, যা জীবন্ত-শ্রমকে চুষে চুষে খায়।"

কী ভয়ঙ্কর চিত্র! জীবন্তকে মৃত ভক্ষণ করছে। দান্তের নরক-বর্ণনাও এর কাছে ম্লান হয়ে যায়। বুর্জোয়া-বাস্তবতা নরককেও হার মানায়। জীবন্ত-শ্রম দ্বারা রাহুগ্রস্ত, সেখানে মৃত অতীত উঠে আসবে না? মৃত ভাব, মৃত ভাষা, মৃত আদর্শ সেখানে আদরণীয় হয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্যের কী আছে?

অন্যত্র মার্কস আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

"বুর্জোয়া সমাজে জীবন্ত শ্রম কেবল সঞ্চিত শ্রমকে (অর্থাৎ মৃত-শ্রমকে) বাড়িয়ে তোলার উপায় মাত্র। কমিউনিস্ট সমাজে কিন্তু পূর্ব-সঞ্চিত শ্রম শ্রমিকদের অস্তিত্বকে উদারতর, সমৃদ্ধতর, উন্নততর করে তোলার উপায়। সুতরাং বুর্জোয়া-সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া সমাজে মূলধন হল স্বাধীন এবং তার স্বতন্ত্র সত্তা আছে; কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন এবং তার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই।"

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও মুক্ত-শ্রমের জন্য তাই উদ্বৃত্ত মূল্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। আর উদ্বৃত্ত মূল্যের পূর্ণ অবলুপ্তি দ্বারা সমাজতন্ত্রে উত্তরণেই নৈতিক মূল্যবোধের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা।

সাতকাহন

উদয় ভাদুড়ী

এক : বিশ্বব্যাংকের ঝটিকা সফর

শ্রীযুত ডব্লু ডব্লু রিচার্ডসন যে বাংলাদেশ থেকে ইসলামাবাদ যাবার পথে কলকাতা বিমান বন্দরে নামবেন এবং দুদিনের ঝটিকা সফর শেষ করে অল্পক্ষণের জন্য দিল্লি ছুঁয়ে—তারপর ইসলামাবাদ রওনা হবেন, একথা দিল্লির তো জানা ছিলই না ; কলকাতা কর্তৃপক্ষও ঘূণাক্ষরে ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেনি। তবু শেষ মুহূর্তে প্রোটোকলের সব নিয়মকানুন রক্ষা করে বিশ্ব-ব্যাংকের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দলটিকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা জানানো গেছে বলে দিল্লি ও কলকাতা উভয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

এখন সেই সমীক্ষক দলটিই ধাপা, ট্যাংরা, বিধাননগর পরিক্রমা শেষ করে দ্বিপ্রাহরিক বড়বাজারী ব্যস্ততার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, হাওড়া ব্রীজ এ্যাপ্রোচ, ব্রাবোর্ণ রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড নিয়ে এই বিশাল সাতমাথা বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষার বস্তু ছিল গত তিনদশক। শিয়ালদহর উড়াল পুল তাঁরা দেখেছেন—এখন হাওড়ারটি দেখবেন বলে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দিল্লি ও কলকাতার দুই প্রতিনিধি যথাক্রমে টি. এম. এস. রামানুজম এবং অমিয়কান্তি খাসনবীশ যথাবিহিত লেপটে রয়েছেন। এঁরা দুজনেই এঁদের গাইড এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের লিয়াজঁ অফিসার—সংযোগরক্ষক।

এই দলটির সঙ্গে আরও যে চারজন সদস্য আছেন, তাঁদের পরিচিতি না দিলে দলটির গুরুত্ব বোঝা যাবে না।

প্রথমেই বলতে হয় ইতালি থেকে আগত বিশ্বখ্যাত বাংকার শ্রীযুক্ত পাসকোলির কথা। ইনি উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাস্তসমস্যা নিয়েই পড়ে আছেন, গত বিশ বছর। আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ কিছু নগরের পরিকল্পনাও এঁর হাতে তৈরী—ইনি উন্নয়নশীল দেশের স্যাটেলাইট টাউনশিপের একজন মুখ্য প্রবক্তা। তিনি কলকাতার পরিপার্শ্ব দেখে তিলোত্তমাসম্ভব এই শহর সম্বন্ধে ফতোয়া দেবেন বলে এখানে এসেছেন।

তারপরই আসে সুইডেনের জনস্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ ডাঃ গান্-এর কথা।

ইনি উন্নয়নশীল দেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে একজন অথরিটি—সম্প্রতি পরিবার কল্যাণের বিশেষ বিশ্বব্যাংক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছেন। ভারতে পরিবার কল্যাণের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বেশ আশাবাদী। শোনা যায়, এঁর সুপারিশেই একবিংশ শতকে নিরাপদে ল্যাণ্ড করা ইস্তক বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ও আরো স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশ ভারতের পরিবারকল্যাণ কর্মসূচীকে যৎপরোনাস্তি মদত দিয়ে যাবে।

দলটিতে মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ এরিকসন্ কিংবা পরিসংখ্যানবিদ কানাডার হিউবার্টের ভূমিকাও কিন্তু গৌণ নয়। প্রকল্পের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানের ম্যাজিক সম্পূর্ণ এঁদের মুখাপেক্ষী।

আজকের কর্মসূচীর শেষভাগে এই গোটা দলটি শ্রীযুত ডব্লু. ডব্লু. রিচার্ডসনের নেতৃত্বে এখন ঠিক উড়াল পুলের পশ্চিমদিকে, স্ট্রাণ্ড রোড ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে। গলায় ঝোলানো দূরবীনটাকে চোখে সাঁটতে সাঁটতে রিচার্ডসন সাহেব একটু পেছিয়ে গেলেন। তাঁর গায়ে গায়ে লেপ্টে লিয়াঁজ অফিসার রামানুজমও। আর ঠিক সেই সময়েই ঘটনাটি ঘটল।

দুই: একটি দুর্ঘটনা

ঘটনাটি ঘটল। ঘটবে এমন একটা আশংকা কলকাতা পুলিশের তিন সার্জেন্ট, যাঁরা আরো জনা বারো কনস্টেবল-সহ এই ভি. আই. পি. দলটিকে কর্ডন করে রেখেছিলেন, তাঁরাও কল্পনা করতে পারেন নি।

এই বিশেষ দলটির জন্য রাজভবন বা মহাকরণের রাস্তাটি পাইলট কার হুটার্ বাজিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকটা ফাঁকা করে ফেলেছিল। কিন্তু বাকি ছয় মাথায় একটা দম আটকানো ট্র্যাফিক জ্যাম কোনো ভাবে ছাড়ানো, অন্ততঃ এই পুলিশ দলটির পক্ষে সম্ভবও ছিল না। সম্ভবত ওপর থেকে সেরকম কোনো নির্দেশও ছিল না।

আর এই সামান্য ত্রুটির সুযোগে কোথা থেকে চকিতে একটি চিটেগুড়বাহী ঠেলা হুড়মুড় করে এসে পড়ল—ঠিক যেখানে শ্রীযুত রিচার্ডসন দূরবীন দিয়ে এই সাতমাথা নিরীক্ষারত এবং লিয়াঁজ রামানুজম পুরোপুরি তথাগত। "সামাল, সামাল" রব দিয়ে ঠেলাটি সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর খেলনা-ঢেঁকির একপ্রান্তে দোল খাওয়ার ভঙ্গিতে এক শীর্ণ ঠেলাবাহক ঠেলাটির একপ্রান্তে দিব্যি ঝুলে পড়ল। তার সংক্ষিপ্ত কাপড় কোমর থেকে খুলে শূন্যে পর্দার মত এক লহমা ভাসে। আর এসময় সম্ভবত তাঁর-

গুহ্যপ্রদেশ প্রকাশ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল বলেই, পাশে অপেক্ষারত কনষ্টেবল অমোঘ লক্ষ্যে দুটি অনিবার্য রুলের গুঁতো কষায়। দোদুল্যমান লোকটি ধুপ করে রাস্তার ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

এটিকে একটা জবর রসিকতা বলে উপেক্ষা করলেও, ঠেলার সামনের দিকে, অর্থাৎ ঢেঁকির যেদিক মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে, সেইদিকে নজর না দিয়ে কলকাতা পুলিশের ঝানু সার্জেণ্টদের উপায়ান্তর ছিল না।

ঠেলাটির সামনের দিক থেকে গোটা তিনেক চিটেগুড়ের টিন ছিটকে রাস্তায় পড়েছিল। দুটির মুখ ভেঙে গিয়ে ঘন সিরাপের মত লাল চিটেগুড় রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তার স্বাভাবিক ঢাল খানাখন্দ অনুযায়ী প্রাথিত বিস্তার লাভ করছিল। ঠেলার সামনের জোয়ালটি যে বৃষস্কন্ধ লোকটির কোমরে চাপানো ছিল—তার নিম্নাঙ্গ তখনো সেই জোয়ালের নিচে। ঠেলাটিকে প্রাণপন চাগাড় দিয়ে তার থুবড়ে পড়া প্রান্তটিকে তুলে ধরার প্রয়াস সে চালিয়ে যাচ্ছিল।

স্বভাবতঃই চিটেগুড়-বোঝাই ঠেলার ওজনের সঙ্গে এই মানুষটির বৃষস্কন্ধ হলেও, ওজনের তুলনা চলে না। তার প্রশস্ত বুকে যতটা শ্বাস ধরে তা টেনে নিয়ে—"তেরী মাকি…" বলে সে একটা শেষ হেঁচকা দেয় এবং তাতেই—প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছে, তার নাক মুখ কান দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত পড়ে।

এটি দুর্ঘটনা এবং কলকাতা পুলিশ তাদের স্বাভাবিক তৎপরতায় এটি রোধ করার চেষ্টা করে—জনা চারেক কনষ্টেবল অচিরেই সেই ঠেলাচালককে তারপর যা যা করণীয় সবই করে। আর এই কর্তব্যকালে চিটেগুড়ের আরো দুটি টিন কক্ষচ্যুত হয়—রাস্তায় পড়ে, ভাঙে। চিটেগুড় গড়ায়—গড়িয়ে চলে—এসব রাস্তার খানাখন্দ এবং স্বাভাবিক ঢাল অনুযায়ী চিটেগুড় খোয়া মাটিতে লেপটালেপটি হতে হতে বিস্তার লাভ করে।

বলাই বাহুল্য, এই দৃশ্য বা দৃশ্যাবলী বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষক দলটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শ্রীযুত রিচার্ডসন দৃশ্যাবলীর কয়েকটি শট্ নেন। দূরবীনের বদলে এসময়ে তাঁর গলায় একটি মূল্যবান এস. এল. আর ক্যামেরা শোভা পাচ্ছিল। আর এই ক্যামেরা নিয়েই গোল বাধল।

তিন: এস্. এল. ক্যামেরা ও জনগণ

ক্যামেরা নিয়েই গোল বাধল।

কলকাতা পুলিশের তিনজন সার্জেন্ট এবং জনা বারো কনষ্টেবল, যারা জায়গাটিকে কর্ডন করে রেখেছিল—তাঁরা আদপেই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি।

আসলে প্রোটোকলের নিয়মানুযায়ী গোটা দলের নেতৃত্ব দেবার জন্য পুলিশের একজন ডি. সি. এ. সি অথবা ইন্‌স্‌পেকটরের অভাব খুবই অনুভূত হচ্ছিল। তাঁরা হয়ত ছিলেনও—কিন্তু কি ভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল এই দশমিনিটে তাঁরা সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন—সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুদূরে দাঁড়ানো একটি ওয়্যারলেস্ ভ্যান থেকে সংকেতবার্তা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। কারণ, পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। কী করা উচিত ভাবতে যতটা সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক দ্রুততার সঙ্গে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

চিটেগুড়বাহী ঠেলাটির দুর্ঘটনার গন্ধে ইতিমধ্যে রাস্তার সবদিকেই একটা জনতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ঠেলার চাপে বিধ্বস্ত সেই বৃষস্কন্ধ লোকটি সহ পুলিসের ছবি এবং তারপরই চারপাশ থেকে ভন্‌ভন্ করে মাছির মত এসে পড়া জনাপঞ্চাশ কচি-কাঁচা, ছোঁড়া-ছুঁড়ি, বুড়োবুড়ির ছবি; রিচার্ডসনের এই দুটি শটই জনতাকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মার্কিন সোস্যাল এ্যানথ্রোপলজিষ্ট এরিকসন পরে একটি সাময়িকপত্রে সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন—আসলে এই দৃশ্যে এমন এক কনট্রাক্ট ছিল, যা কিনা গোটা সভ্যতার ইন্‌হেরেন্ট কনট্রাক্ট। বিধ্বস্ত ঠেলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল ইণ্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভেলাপমেণ্টের দুটি বিশাল শাদা শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি। চারজন হোয়াইটের পাশে, ব্যাদার পাদদেশে প্রবহমান চিটেগুড়ের স্রোতে নিগ্রয়েড্ শ্রেণীভুক্ত তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি—এরা সকলেই উড়াল পুলের নিচে ঝোপড়িজাত এক অন্য সমাজ ব্যবস্থার শরিক। আর কলকাতা সেসময়ে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে গলছে, জ্বলছে। ওই গরমে মাথা গরম কিছু ছেলে ছিল জনতার মধ্যে। তাদেরই প্রতিভূ হবে হয়ত, তিনটি ছেলে পুলিশের দুর্বল বেষ্টনী ভেদ করে রিচার্ডসনের এস. এল. আর ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। কোনো শ্লোগান ছিল না—কোনো প্রস্তুতি ছিল না—শুধু একজন প্রাকৃত ভাষায় বলেছিল- "শালা মাজাকির আর জায়গা পাওনি—ফটো মারাতে এয়েচো।"

অবস্থা সামাল দিতে শাসনবীশ বলেছিল, "বিদেশী অতিথি ভাই, দে আর ট্যুরিষ্ট ....." তার অসমাপ্ত কথার মধ্যেই তাতে পেটে একটি ঘুষি পড়ে

এবং একই সুরে আরেকজন বলে ওঠে "চামচেগিরির জায়গা পাওনি শা—পুরো ভরে দেব।"

এরপর পুলিশের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। বার্তা পেয়ে বা না পেয়ে সাতমাথার একটি মাত্র খোলা মাথার দিক থেকে দ্রুত দুটি কালো গাড়ির আবির্ভাব ঘটে। চতুর্দিকে কর্ডন, সার সার লাঠি ঢাল ইট, বোতল ভাঙা—দুমাথায় দমবন্ধ ট্র্যাফিকে আটকে পড়া হরেক যানবাহনের পরিত্রাহি আর্তনাদ, কাঁচ ভাঙার শব্দ—চিটেগুড়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়া বেসামাল কিছু মানুষ—এক কুরুক্ষেত্র, প্যানডিমোনিয়াম।

এরই ফাঁকে রামানুজম্ এবং খাসনবীশ কোনোমতে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষক দলটিকে গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে, সোজা পাইলট কারের পিছু ধরে।

হুটারের তীব্র আর্তনাদে ওই দৃশ্যে দ্রুত যবনিকা নামলেও, দুটি মাথায় ট্র্যাফিক জ্যাম ছাড়াতে তারপরেও সাড়ে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে।

স্বস্তির শুধু এইটুকু যে সমীক্ষক দলটির সকলেই সুস্থ ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রিচার্ডসনের এস এল. আর. ক্যামেরাটিও খোয়া যায় নি, শুধু ক্যামেরার স্ট্র্যাপটি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

চার : বিলম্বিত মধ্যাহ্নভোজ ও কিছু টেবল্ টক্

ক্যামেরার স্ট্র্যাপটি ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে, রিচার্ডসনের খুব একটা খেদ ছিল না। কারণ ক্যামেরাটি এবং সর্বোপরি লিভিং অর্থাৎ কিনা জীবন্ত শটগুলি বেঁচে গিয়েছিল।

পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্ট এবং সমাজতাত্ত্বিক এরিকসন্-ও একমত ছিলেন যে পরবর্তীকালে প্রোজেক্টরের সাহায্যে ছবিগুলিকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করার একটা অবকাশ আছে।

পাঁচতারা-আতিথ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বিশ্বব্যাংক দলটি দ্রুত তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পায়। কিছু আগে চিলড্ বিয়র তাদের বিলম্বিত মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী ক্ষুধা তৈরী করেছিল। কর্তৃপক্ষ সবিনয়ে তাঁদের কিছু ইণ্ডিয়ান ডেলিকেসি পরিবেশন করেছিলেন এবং এই প্রতিনিধি দলটি থেকে থেকেই 'সাধু, সাধু' ধ্বনি দিয়েছিলেন।

পাসকোলি কিছু টিনড্ ফুড্‌কে শাশ্বত ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক বলে মন্তব্য করেছিলেন। কানাডার হিউবার্ট জানালেন, ভারতীয় 'কারি', কানাডা ও ইউ কে-র খাবারের বাজার, রেস্তোঁরা কিভাবে জয় করেছে।

কে. সি. দাসের রসগোল্লা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন খাসনবীশ। এবং ইনডিয়ান সুইট্‌সের প্রচারকল্পে টাগোরের অবদানের কথা বললেন পাঁচতারা হোটেলের ম্যানেজার। রামানুজম দক্ষিণ ভারতীয় দহিবড়া, ইড্‌লি, দোসার সর্বভারতীয় বাজার এবং রপ্তানি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন। জানাতে ভুললেন না, ভারতের বিভিন্ন মেট্রোপলিশে এখন চার চাকার ঠেলাগাড়িতে দাক্ষিণাত্যের ওই 'ডেলিকেসি' খাদ্যরসিক মহলে কী পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সুইডেনের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এই চমৎকার পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের খাদ্যাভ্যাস এবং তৃতীয় বিশ্বের ক্যালোরি ইনটেক্ সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব দিলেন। আর এই প্রসঙ্গে দুর্ঘটনায় আহত সেই বৃষস্কন্ধ লোকটির প্রসঙ্গ এসে গেল। লোকটির তাগদ প্রশংসনীয়. এবিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন। লোকটির চেহারায় আন্তর্জাতিক ভারোত্তলকদের কিছু কিছু সম্ভাবনাও ছিল। ভারত এথ্‌লেটিক্‌সের ময়দানে এত পিছনে পড়ে আছে বলে রিচার্ডসন একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু খাসনবীশ যখন জানালেন বৃষস্কন্ধ লোকটির দৈনিক খাদ্য তালিকায় গোটা ছয়েক আটার রুটি, পঞ্চাশ গ্রাম-ডাল এবং একশো গ্রাম ছাতু ছাড়া অন্য কিছু থাকার সম্ভাবনা নেই, তখন পরিসংখ্যানবিদ্ হিউবার্ট রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কারণ ক্যালোরি মূল্যে ঠেলাচালকটির ইন্‌টেক জীবন ধারণের উপযোগী কাম্য ক্যালোরি মূল্যের এক পঞ্চমাংশও নয়।

শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন্ বললেন এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ উন্নত দুনিয়ার হিতার্থে বুভুক্ষু মানুষের এই ব্যাক্‌লগকে একবিংশ শতাব্দীর আগে মুছে না ফেলতে পারলে গোটা সভ্যতার ভবিষ্যৎই বিপন্ন হতে পারে।

মধ্যাহ্নভোজনের আসরে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে একমত হলেন যে, সভ্যতার ভবিষ্যৎ এক 'ভিসাস্ সার্কেল্' বা পাপচক্রে পাক খেয়ে মরছে।

সুইডেনের স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ এই উপলক্ষে অনিয়ন্ত্রিত জন্মহারের সমস্যার প্রসঙ্গটিও এনে ফেললেন এবং চীন তার প্রোডাকৃশন ব্রিগেড থেকে শুরু করে প্রোডাকৃশন টিম পর্যন্ত সর্বব্যাপী জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্যাম্পেন চালিয়ে কীভাবে একদিকে কৃষির প্রাথমিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়ে চলেছে, অন্যদিকে মার্কিণ সহায়তায় শিল্পায়নের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত

চিত্র তুলে ধরলেন। বলাই বাহুল্য, পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্টের সাহায্য না পেলে তাঁর বক্তব্য সকলের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে উঠত না।

সমাজতাত্ত্বিক এরিকসন যখন "এশিয়ান মোড অফ্ প্রোডাকসন" প্রসঙ্গে এসে পড়লেন, তখনই শেষ রাউণ্ড স্কচ্ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল।

মোরাদাবাদী কাজ করা গামলার স্ফটিক স্বচ্ছ বরফে স্নিগ্ধ হতে হতে টেবিলে স্কচ হুইস্কির দুটি জাম্বো বোতল এনে হাজির হল। সোল্লাসে সকলেই শেষবার চিয়ার্স এবং উইশ করলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক নির্ধারিত ছিল। যদিও বিশ্বব্যাংকের এই ছোট কনটিনজেন্ট সব ব্যাপারে কথা বলার অধিকারী নয়, তবুও এঁদের মতামত বা সুপারিশ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে শুরু করে সর্বত্রই যে একটা বিশেষ গুরুত্ব পাবে, এমন একটা ধারণা সরকারী মহলে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল। ফলতঃ দলটি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে জনসংযোগ বিভাগের তৎপরতায় আধঘণ্টার জন্য এই সাংবাদিক বৈঠক, রিচার্ডসনের অনুমতি নিয়েই নির্ধারিত ছিল। বিকেল ছটা বিয়াল্লিশ মিনিটে একটি বিশেষ প্লেন বিশ্বব্যাংকের এই দলটিকে নিয়ে দিল্লীর পথে উড়ে যাবে।

পাঁচ: সাংবাদিক বৈঠক

"বিকেল ছটা বিয়াল্লিশ মিনিটে একটি বিশেষ প্লেন বিশ্বব্যাংকের এই দলটিকে নিয়ে দিল্লীর পথে উড়ে যাবে"—প্রেস্ সেক্রেটারি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বললেন; "সেজন্য আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা কেবল সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ প্রশ্নের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবেন।"

সাংবাদিকরা অভ্যাসবশেই একটু হৈ হৈ করলেন—একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষক দলের সঙ্গে মাত্র আধঘণ্টার এই বৈঠকে যে সাংবাদিকরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেন না, সেকথাও বললেন।

পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলটি কানায় কানায় পূর্ণ—বৈঠকে কাজুবাদাম ও কফি বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিক গোলযোগের পর প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হল।

প্রশ্ন: আপনাদের এই সমীক্ষক দলটির কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: দলনেতা হিসেবে আমি বলতে পারি, এটি নির্ধারিত সফরসূচীতে না থাকলেও আমরা এই সফরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি।

প্রশ্ন: দেড়দিনের এই সফরসূচীতে আপনারা কি দেখলেন?

উত্তর : আমরা ধাপা, ট্যাংরা, বিধাননগর, শিয়ালদহ ও হাওড়ার পুল দেখেছি।

প্রশ্ন : এই জায়গাকটি দেখে আপনাদের কি ধারণা ?

উত্তর : দলনেতা হিসেবে, দলের সকলের হয়ে আমি বলতে পারি কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।

প্রশ্ন : কী দেখে আপনাদের এই ধারণা হল—যদি দয়া করে বলেন—

উত্তর : ধাপার বিস্তৃত এলাকাকে নগর উন্নয়নের আওতায় আনা হয়েছে। বস্তি উচ্ছেদ অভিযান চলছে। অগ্রগতি ভালোই—তবে আমরা জেনেছি এ নিয়ে একটা পলিটিক্যাল গেম চলছে। বাট উই নো, দে আর অল পার্ট অফ আ ডেমোক্রেটিক প্রসেস। জবরদখল বস্তী ভাঙবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে—আবার জবরদখলকারী আসবে ; আবার···এ্যাণ্ড দিস্ ইজ্ এ প্রসেস।

প্রশ্ন : এই জবরদখলকারী কারা ?

উত্তর : ওয়েল, দলনেতা হিসেবে, আমি পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্টকে অনুরোধ করব, এ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক পরিসংখ্যান দিতে।

হিউবার্ট জানালেন—তাঁর পরিসংখ্যান প্রভিশনাল। ১৯৮১ সালের আদমসুমারি সম্পর্কে তিনি ততটা নিশ্চিত নন। তবু যেটুকু পাওয়া গেছে—কমপিউটারে প্রাপ্ত সেই ফলটুকু তিনি সাংবাদিকদের জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। হিউবার্ট বললেন, "কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে আগত চোদ্দ লক্ষ লোক বাস করে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকে আগত লোকের সংখ্যা ষোলো লক্ষ। এবং ভারতের বাইরে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আগত লোকের সংখ্যা ষোলো লক্ষ—হিসেবটি গত তিন দশকের।" সাংবাদিকরা ভারতের বাইরের লোক প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করতে শুরু করলে দলনেতা রিচার্ডসন তাঁদের জানালেন, এটি ভারতীয় উপমহাদেশের ইন্‌হেরেণ্ট সমস্যা, এবং এ সম্পর্কে মন্তব্য করার অধিকার তাঁর দলের নেই।

এরপর আবার সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ প্রশ্নের পালা শুরু হয়।

প্রশ্ন : ট্যাংরায় আপনারা কি দেখলেন ?

উত্তর : শিল্পের বিকাশ, বস্তী উন্নয়ন, উন্নততর পয়ঃ প্রণালী, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছু। এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের

সবকটি দপ্তর আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিছু বিলম্ব ঘটছে, ইউ নো, এটাও থার্ড ওয়ার্লডের একটা ইনহেরেন্ট সমস্যা।

প্রশ্ন: আর বিধাননগরে?

রিচার্ডসন এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য স্থপতি পাসকোলিকে ডাকলেন। পাসকোলি জানালেন, বিধাননগর দেখে তিনি মুগ্ধ। টুইন সিটি হবার সমস্ত সম্ভাবনাই যে বিধাননগরে আছে, তা তিনি সংক্ষিপ্তভাবে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করলেন। ধাপা, ট্যাংরা, কেষ্টপুরের বিস্তৃত হিনটারল্যাণ্ডের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতেও তিনি ভুললেন না। বিধাননগরের পানীয় জলে অতিরিক্ত আয়রণ সম্পর্কিত সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে রিচার্ডসন জানালেন, "একমাত্র আয়রণ উইল অচিরে এই আয়রণ এলিমিনেট করতে পারে।"

বলাই বাহুলা, এই সুসমাচার সমবেত হাততালিতে অভিনন্দিত হল।

এরপর শিয়ালদহ এবং হাওড়ায় উড়াল পুল, যানবাহন, ফুটপাত সমস্যার কেন্দ্রে আবার ঝোপড়ি সমস্যা এসে গেল। প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ দিক নিল।

প্রশ্ন: এই ঝোপড়ি বা জবরদখল সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক কি ভাবছে?

উত্তর: দলনেতা হিসেবে আমি আপনাদের একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে বলব। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্র এদেশে বিশ্বব্যাংকই সৃষ্টি করেছিল। ভারত সরকারের সহযোগিতায় আমরা বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থাকে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ এবং উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে টেনে আনতে পেরেছিলাম। অস্বীকার করার নয়, এর ফলে ভারত খাদ্যে ক্রমশঃ স্বয়ংভর হয়ে উঠেছে। মার্কিণ অনুদানে পি. এল. ৪৮০-র আমদানি কমেছে।

প্রশ্ন। ওই দশকেই শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খেতে পেত না।

উত্তর। একদিকে যখন বৃদ্ধি অন্যদিকে পভার্টি লাইনের নিচে লোক বেড়ে যাওয়া, এটা উন্নয়নশীল দেশের ইনহেরেনট কনট্রাডিকসন। সমাধানের জন্য সরকার সাতের দশকের গোড়া থেকেই যা যা ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা আপনারা জানেন—'গরিবী হটাও' এবং 'বিশ দফা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। "আই মীন ইট,—বিলম্ব হলেও অসম্ভব নয়।"

শ্রীযুক্ত রিচার্ডসন এবার পরিসংখ্যানবিদ হিউবার্টের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও

প্রান্তিক চাষী সম্বন্ধে বিশদ তথ্য দিয়ে গ্রামীন ভারতের যে চিত্র তুলে ধরলেন—তাতে প্রায় নিশ্চিন্ত করে বলা গেল, ১৯৯৫ সাল নাগাদ শতকরা দশ জনের বেশি গরীব থাকবে না। নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ পাসকোলি বললেন কলকাতার রাস্তায় দুচাকার ঠেলা ও রিক্সার প্রয়োজনে ফলত একবিংশ শতকেও শতকরা দশ বা পাঁচ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচের মানুষের উপযোগ থাকবে। এবং এভাবে ঠেলা ও রিক্সার সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে ভারত এবং কলকাতা একবিংশ শতকে পৌঁছবেই। সমীক্ষক দলের সকলেই বললেন, "উন্মুক্ত আমদানি নীতিতে আপনাদের প্রযুক্তিতে যে বিপ্লব ঘটছে, নগর ও গ্রামের রূপায়ণে সেই বিপ্লবেরই প্রতিফলন ঘটবে।"

সাংবাদিক সম্মেলনের হর্ষোৎফুল্ল করতালিময় সমাপ্তির মুখে দুঃসংবাদটি এল।

ছয়: একটি শোক প্রস্তাব

দুঃসংবাদটি এল এবং সেটি বহন করে নিয়ে এলেন সাতমাথার সংযোগ স্থলের সেই কর্তব্যরত সার্জেনট, সঙ্গে লিয়াজঁ অফিসার খাসনবীশ।

চিটেগুড়বাহী ঠেলাটির সেই বৃষস্কন্ধ বাহক মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির হাসপাতালে কুড়ি মিনিট আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

শ্রীযুক্ত রিচার্ডসনের নেতৃত্বে সমগ্র দলটি এক মিনিট নীরব থাকে এবং তারপর দলনেতা হিসেবে রিচার্ডসন্ সেই সার্জেনট-মারফৎ মৃত বৃষস্কন্ধের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাংবাদিকদের বিরাট দলটি নতুন সংবাদের লোভে সার্জেনট ও খাসনবীশকে চেপে ধরে।

সাত: একটি নিরাপদ টেক অফ

কলকাতার অভ্যস্ত ট্রাফিক এড়িয়ে শ্রীযুত রিচার্ডসন যথাসময়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছান এবং ঠিক ছটা বিয়াল্লিশ মিনিটে দিল্লীগামী বিশেষ বিমানটি আকাশে ওড়ে। আকাশে ছিটে ফোঁটা মেঘ থাকলেও আবহাওয়া ভালই ছিল।

জয়যাত্রায় যাও গো

শতদ্রু মজুমদার

কেঠোপোল পেরিয়ে মাইল তিনেক হাঁটলে হাটগাছা। সেখান থেকে আরো ঘন্টাখানেক-তো বটেই। তারপর চড়কডাঙার মাঠ। আলের পথ ধরেও রাস্তা কম নয়। ততোক্ষণে সূর্য ডুবে যাবে নির্ঘাত। তার মানে মাকড়চণ্ডিতলায় যেতে যেতে সন্ধে পার। কিন্তু কেটোপোলের কাছাকাছি আসতেই মলিনা টের পেল, পা টাটানি শুরু হয়ে গেছে। একটু বসা দরকার।

হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে মলিনা ধপাস করে বসে পড়ল সিঁড়িতে। তাল বুঝে বাচ্চাটাও ব্লাউজের ভেতর হাত গলাতে লাগল। বছর দুয়েকের হবে। এখনো সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পেটে খাদ্য গেলেই পায়খানা হয়ে বেরিয়ে আসে। মলিনার বুক শুকিয়ে কাঠ। এতেই সামাল দিতে হয়। ম্যানাপোষের মতন চোষে যা হোক।

ঠক্-ঠকাস্ শব্দ করতে করতে মেয়েটার হাত ধরে অনেকটা এগিয়ে গেছে বদ্যিনাথ। ঘুরে, দাঁড়িয়ে বলল, 'কী হলো পা টাট্যে গেল নাকি ?'

'না—না, এই যে ছেলে বায়না ধরলো—'

মিথ্যে কথা বলতে হল মলিনাকে। মুখ ঝামটা খেতে হবে না হলে। বদ্যিনাথ আসতে চায় নি। মলিনাই একরকম জবরদস্তিতে নিয়ে এসেছে, কাজকর্ম কামাই করিয়ে।

মাকড় চণ্ডিতলায় দণ্ডিবাবা এসেছে। সাক্ষাৎ দেবতা। সব বলে দিচ্ছে গড়গড় করে।

জ্ঞাতিশত্রু পেছনে লেগেছে ফেউ লাগার মতন। কাঁচকলের ফুরণের কাজটা হঠাৎ করে চলে গেল বদ্যিনাথের।

বেশ সুস্থ-সবল চলছিল, ফিরছিল। দিনকেদিন শরীর যেন কেমন হয়ে গেল। আজ দাঁতের ব্যথা তো কাল পেটের ব্যামো।

মলিনার পেটে দু দুটো বাচ্চা মরল। একটা কেমন ডাগর ডোগর হচ্ছিল। হঠাৎ বাহ্যি বমিতে কাহিল। বাপ্ বলার সময় পেল না।

মলিনা জানে, সব জ্ঞাতিশত্তুর বিশ্বনাথের কারসাজি। ভায়ে ভায়ে এমন লাঠালাঠি বলবার নয়। আসলে সে কী করছে, তাকে করাচ্ছে।

নষ্টের গোড়া, বড়-জা। ডাইনি শয়তানীটা যদ্দিন থাকবে, এই চলবে। দিনভোর পঞ্চাননতলায়। কাশিপতি একেবারে আঁচলে বাঁধা। তুক-তাক আর বাণ। এই সবে জান নিকেল করে ছেড়ে দিল।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। আলতো করে তুলে ঘাড়ে মাথা ফেলে দিল মলিনা।

পোলের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে বদ্যিনাথ।

পাশেই গেঁড়ি। জলের দিকে ঠায় তাকিয়ে।

'নাও চলো—', পাশে এসে মলিনা বলল।

পোড়া বিড়ি জলে ফেলে দিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে তাকাল বদ্যিনাথ।

'ঐ জন্যেই আসতে বারণ করেছিলুম—'

পাল্টা থমকে উঠল মলিনা, 'থামো তো তুমি। কোঁদল করার আর সময় পেল ন, হুঁ—'

বদ্যিনাথ চুপ।

অনেকদিন ধরেই মলিনা বলছে বটে, সে খুব একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি। কে না জানে, এসব বুজরুকি। পয়সা লোটার ধান্দা! তক্কে কিনা পাঁচ জনের কথা তো আর ফেলে দেবার নয়—খবর যতদূর : দণ্ডিবাবা নাকি একটা পয়সাও নেবে না। কবচ-মাদুলি দিলেও না। অথচ মানুষের ভালো বই খারাপ করছে না। বদ্যিনাথ তাই বলেছিল, ঠিকাছে একদিন সময় করে বরঞ্চ থেকে নয় চলে যাবো খন—'

শুধু মাগ-ভাতারের ব্যাপার নয়। ছেলেমেয়ে দুটোকে তো আর ঘরে একলা ফেলে যাওয়া চলে না! তাহলে মোদ্দা কথা গোটা পরিবারকেই নিয়ে যেতে হচ্ছে। আর দিনতিনেকের মতন থাকবে দণ্ডিবাবা। সুযোগ হাতছাড়া হলে পস্তাতে হবে। চার টাকা বারো আনা রোজ। একদিনের রোজগার হাতছাড়া করতে হল। অবিশ্যি বদ্যিনাথ ভেবে দেখেছে, দণ্ডিবাবা যদি একটা হিল্লে করে দিতে পারে, তার দাম চার টাকা বারো আনার থেকে ঢের বেশি।

সেই কোন ভোরে মলিনা আজ কাজে বেরিয়েছে। এক নাগাড়ে চারটে ঘর সেরে ফিরল বেলা বারোটায়। তারপর রান্নাবান্না করে নাকে-চাট্টি গুঁজেই রওনা দিল।

লটর-পটর হাওয়াই চপ্পল ব্যাগড়া দিচ্ছে সেই থেকে। অব্যেস না

থাকলে যা হয়। চটিটা খুলে হাতে নিল মলিনা। গেঁড়ি এখন বাপের কাঁধে।

কথা দিয়েছে, একটুসখানি। তারপর হাঁটবে ফের। হাটগাছা এখনো পেরোয় নি। তার আগেই অবস্থা এই।

বদ্যিনাথ ভাবছে অন্যকথা, শেষমেষ চণ্ডিতলায় পৌছলে হয়।

বলা নেই কওয়া নেই মলিনা দাঁড়িয়ে পড়ল আবার।

'তুমি চা খাবে?'

বদ্যিনাথ জবাব দিল, 'না—'

'খাবে না?' মলিনার দুঃখী দুঃখী ভাব। এটা হল খানিক জিরনোর ফিকিরও।

বদ্যিনাথ বলল, 'তুমি খাবে?'

'না—এই তুমি খেলে—'

রাস্তার গায়ে হোগলার ছাউনিতে চায়ের দোকান। সামনে চার খুঁটির বাখারির মাচা। মাচায় দুচারজন বুড়ো মানুষ। মাচায় বসল ওরা। দোকানের ভেতর থেকে একটা মেয়েলোক খ্যানখেনে গলা ছাড়ল, 'কী দেবো আপনাদের?'

বদ্যিনাথ বলল, 'চা হবে দুটো।'

গেঁড়ি ঝপাং করে বলে দিল, 'আম্মোও খাবো।'

মলিনা চোখ রাঙায়, 'না—খবরদার বলছি না।'

তারপর যা হয়। লোকজনের মাঝখানেই গেঁড়ি সুর তুলল।

'আঃ থাম—থাম। তুই বিস্কুট খা একটা।'

বদ্যিনাথ থামিয়ে দিল মেয়েটাকে। কিন্তু মলিনা গজগজ করতে লাগল, 'হাড় জ্বালানি, তুই মর—মর—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে একেবারে—'

এসব হচ্ছে নিত্য ব্যাপার। মা-মেয়ের চুলোচুলি।

গেঁড়ি এগারোয় পা দিল। শরীরে বাড় নেই। হাড়ের ওপর চামড়া লেপ্টানো গড়ন। চোখে পিচুটি। দুকান ভরতি পুঁজ। কান শুনতে ধান শোনে। এনতার। মায়ের ফাই-ফরমাশ খাটে টুকটাক। বেশির ভাগ সময়েই জুবুথুবু বসে থাকে। কেউ কেউ বলে শত্তুর মন্দ করেছে। মনসাতলা থেকে মাদুলি করিয়ে আনল। কিচ্ছু হল না।

একটা বিস্কুট শেষ করে গেঁড়ি বাপের কানে কানে আর একটার কথা বলে দিয়েছে ঠিক সময়েই। বিস্কুট দিয়ে ঝটপট উঠে পড়ে বদ্যিনাথ।

মলিনা বলল, হ্যাঁ গো এখান থেকে অনেকটা ?'

বদ্যিনাথ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, 'অয় ঐ জন্যেই বলেছিলুম তোমার গে কাজ নেই। শুনলে না কথা এখন ঠেলা সামলাও—'

শান্ত গলায় মলিনা বলে, 'আরি না না—কী বলচি শোনো আগুতে—'

'বলবে আর কী ?'

মলিনা চুপ।

মলিনার ঠিকে ঝি-এর কাজ। একই পাড়ায় চারটে বাড়ি। একটার গায়ে আর একটা। তিনবার সবকটা বাড়িতে যাওয়া-আসা করলেও মাইল খানেক পথ হাঁটা হয় কিনা সন্দেহ। বাড়ির চৌসীমানার বাইরে সে বড় একটা যায় না। বড়জোর বছরে একটা কী দুটো ঠাকুর দেবতার বই দেখতে সিনেমায় যায়। তাও রাজার মাঠ পার হলেই সিনেমা হল। এই ভাবেই চলে আসছে। বেশি হাঁটার অব্যেস হবে কী করে! তাও যদি শরীরে বল থাকত। কিন্তু উপায় কী। এসব ভেবে ঘরে বসে থাকা চলে না। দণ্ডিবাবা তো আর তার ঘরের সামনে চলে আসবে না! মাথা যার ফাটবে তাকেই চুন খুঁজতে হবে বইকি!

রাস্তার ধারে একটা ভ্যান রিকশা দেখে বদ্যিনাথ থামল। গাড়িতে চুপচাপ বসে বিড়ি টানছিল মাঝবয়সী একজন। বোঝা যায়, কাজকর্ম নেই হয়ত। কানের কাছে মুখ নিয়ে বদ্যিনাথ বলল, 'ভাড়া যাবে নাকি ?'

লোকটা যেন শুনেও শোনে নি। দুবার একই কথা বলতে মুখ ফেরাল।

'কী মাল আছে ?'

পরিবার দেখিয়ে বদ্যিনাথ বলল, 'মাল নয়, মানুষ।'

'কোথায় যাবে ?'

'চণ্ডিতলায়।'

'মাকড়দহের ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

নড়েচড়ে বসে ভ্যানওলা বলল, 'সে তো বহুত দূর—ভাড়া লাগবে অনেক।

বদ্যিনাথ জানতে চাইল, 'কত ?'

'তিন টাকা।'

মলিনা লোকটার মুখের সামনে হাত নেড়ে বলল, 'সে তো বাপু তাহলে

আমরা রিকশাতেই যেতে পারি। কষ্ট করে মালের গাড়িতে ওঠার কী দরকার?'

'তাই যান না,' বিশ্রী মুখ করে তাকাল লোকটা।

'আঃ তুমি কেন কথা বলছো আবার', ধমকে উঠে বউকে থামিয়ে ভ্যানওলার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে চাইল বদ্যিনাথ।

রাজী হল শেষমেষ। দু টাকা চার আনায় রফা হল। এখনো ঢের পথ বাকি। হাঁটতে গেলে টেংরি খুলে যাবে বউয়ের। আর পাঁচটাকার এক পয়সা কমে যে রিকশা যাবে না, বদ্যিনাথ তা ভালমতই জানে।

তিনজনে উঠল ভ্যানে। মাঝখানে গেঁড়ি। বদ্যিনাথ পা ঝুলিয়ে বসল।

লাইনের ধার বরাবর ঘেঁসের লম্বা পথ। পাছা তুলে প্যাডেল মারছে ভ্যানওলা। ধিকিধিকি গাড়ি চলছে। চাকা যেন আর ঘুরতেই চায় না। সূর্য আকাশে কাত্। ফিকে রোদ্দুর গাছপালার লম্বা ছায়া ফেলেছে এখানে-সেখানে।

বদ্যিনাথ বলল, 'একটু জোরে টানো ভাই—'

কপালের ঘাম ঝেড়ে লোকটা জবাব দিল, 'এর চেয়ে জোরে যাবে না। ঘেসের রাস্তা।'

বদ্যিনাথ কী বলতে যাচ্ছিল, মলিনা তার মুখে হাত চেপে থামিয়ে দিল। অবস্থাগতিক সুবিধার নয়। তার শরীরের ভেতর নানান বেগরবাই। চলে চলে যেতে হচ্ছে না, এই ঢের। ঢালু পথে নামতে নামতে লোকটা জিগ্যেস করল, 'সেখানে কী কুটুমবাড়ি?'

বউয়ের চোখে চোখ রেখে বদ্যিনাথ বলল, 'না। দণ্ডিবাবার কাছে যাবো। কেন?'

'না, এমনি।' খানিক থেমে লোকটা আবার বলল, 'লোক হয়েচে ম্যালায়—'

মলিনা বলল, 'আমরা কী বাবার দ্যাখা পাবো?'

'তা বলা মুশকিল। সবাই তো যাচ্চে—'

লোকটার কথা বিজ্ঞের মত শোনাল।

বদ্যিনাথের কাঁধে হাত রাখে মলিনা। হতাশ গলায় বলে, 'হ্যাঁ গো ফিরে আসতে হবেনি তো?

হাই তুলে টোকা দিল বদ্যিনাথ, 'কী করে বলবো? চলোই না দ্যাখা যাক।'

বাপের কোলে মাথা ফেলে দিয়েছে গেঁড়ি। দু চোখের পাতা এক। এখন সে আর এই জগতে নেই। মলিনা ঠেলে দিল, 'এই গেঁড়ি ঘুমোলি নাকি? দ্যাখো মেয়ের রকম—'

বদ্যিনাথ বলল, 'থাক থাক। এখনো ঢের ম্যালায় পথ—'

একটা জুবুথুবু বুড়ি বসেছিল রাস্তার ধারে। টিংটিঙে কাঠির মতন হাত নেড়ে নাকি সুর ছাড়ল, 'অ বাবা মানিক আমার দাঁড়াও এটুট—দাঁড়াও—' কে, কার কথা শোনে! অনেকটা এগিয়ে গেছে ভ্যান। মলিনা বলল, 'দাঁড়াও না বাপু একটু, কী বলচে শোনাই যাক না—'

পুঁটুলি বগলে বুড়ি সময় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। শরীর বেঁকে-বুকে।

ভ্যানওলা তাড়া দিল, 'আরে একটু পা চালিয়ে আসবে তো, না কি—'

তাতেও সুবিধার হল না। বুড়িটা এক-পা, দু-পা আসছে তো আসছেই। তখন বদ্যিনাথের কথায় গাড়ির চাকা পেছন দিকে ঘোরাতে হল।

বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ বাবা আমায় এটটু নে যাবে? আর যে পা চলে না—'

ভ্যানওলা প্যাডেল মারতে যাচ্ছিল। বদ্যিনাথের দয়ার শরীর। সে বলল, 'নাও, নাও—একজন তো—'

সে হাত নেড়ে ওঠাল বুড়িকে। গেঁড়িকে তুলে বসিয়ে জায়গা করে দিল। তারপর জানতে চাইল, 'কদ্দুর যাবে, বুড়িমা?'

'ঠাকুর তলায়।'

'দণ্ডিবাবার কাছে?' ঘাড় বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল মলিনা।

ভাঙাচোরা দাঁত দেখিয়ে বুড়িমা বলল, 'হ্যাঁ মা। ডাগর ছেলেটার কী যে হলো—'

ভ্যানওলা মুখ ঘুরিয়ে দেখে একবার।

'কী হয়েছে?' মলিনার গপ্পো জমাবার মতলব।

বদ্যিনাথ ইশারায় বউকে থামিয়ে দেয়। এসব ধানাই-পানাই এখন ভাললাগার কথা নয়। খিদেয় পেটের ভেতর সেই থেকে ওলোট-পালোট। এদিকে আকাশে তারা ফুটল বলে। বাড়ি ফিরবে কখন তার ঠিক নেই।

একতরফাই বকতে বকতে একসময় থামে বুড়ি মা। বাচ্চাটা থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। এ আর বায়না নয়। আসল খিদে পেয়েছে। বার বার মুখে শুকনো স্তন ধরিয়ে মলিনা নাজেহাল। থামে আর না।

এরই ভেতর আর একজন উঠে পড়েছে। ভ্যানওলা কিছুতেই নেবে না। একে তো জায়গা নেই তার ওপর অতজনকে টানা চাট্টিখানি কথা নয়।

বুড়িমা নাছোড়, 'নাও না মানিক আমার—আমি নয় আরো আটআনা দেবো—

মলিনা বা বদ্যিনাথ কেউই আপত্তি করেনি। কারণ লোকটা খোঁড়া।

খানিক সকলেই চুপচাপ। খোঁড়া লোকটাই প্রথম মুখ খুলল, 'সকলের কি একই জায়গায় যাওয়া হচ্ছে?'

বদ্যিনাথ মুণ্ডু নেড়ে জানান দিল। আড়চোখে তাকাল মলিনা। বদ্যিনাথ দেশলাই জ্বালল খস্‌খস্‌। লোকটা যেন তৈরী হয়েছিল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'একটা বিড়ি হবে নাকি, দাদা?'

ইচ্ছে ছিল না। দিতে হল। একই জায়গায় যখন যাবে! বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে খোঁড়া লোকটা বলল, 'বাবার দ্যাখা কি পাবো?'

'তা তো জানি না', বদ্যিনাথ শূন্যে ধোঁয়া ওড়াল।

'কত লোক যাচ্ছে—'

কেউ পাত্তা দিল না কথায়। নিজের মনেই খানিক বকে বকে থেমে গেল খোঁড়া লোকটা।

গাড়ির পেছন পেছন আসছিল একটা বউ। আলু-থালু বেশ। ট্যাঁকে বাচ্চা। মলিনাকে ঠেলা মেরে বলল, 'অ মা বাচ্চাটারে একটু নেবেন? আমি হেঁটে হেঁটেই যাবো—'

'মরণ!' মলিনা বিড়বিড় করে উঠল, 'কার না কার বাচ্চা, আমি নিতে যাবো কেন?'

বুড়িমার কানে গেছে। নাকি সুর তুলল, 'আহা, নাওই না মা—বলচে যখন—'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মলিনা কোলে বসাল বাচ্চাটা। নিজেরটা দিল বদ্যিনাথের কোলে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে এর ফাঁকে। দূরে দূরে ঘরবাড়ি। মাঝেমাঝে টিমটিমে আলো। শাঁখের আওয়াজ শুনে মলিনা জোড়হাত কপালে ঠেকাল। হঠাৎ হাত তুলে বদ্যিনাথ বলে উঠল, 'ঐ যে চড়ক ডাঙার মাঠ—'

মলিনা উৎসুখ হয়, 'আর কতটা গো?'

ভ্যানওলা জবাব দিল, 'এখনো ঢের পথ—'

এই সময় পরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল মলিনার কোলে। পেছনে বাচ্চার মা। গাড়িতে হাত রেখে চলছিল। গাড়ি একটু থামিয়ে ঠেলে-ঠুলে বসে পড়ল কোনো গতিকে।

কেউ কিছু বলল না আর।

মানুষজনে ঠাসাঠাসি ভ্যান রিকশাটা। এবড়ো-খেবড়ো মাটির পথ। চাকা বসে যাচ্ছে কখনো কখনো। মাঝে মাঝে সিট থেকে নেমে পড়ছে ভ্যানওলা। খানিক টানার পর আবার উঠছে। আবার নামছে।

বদ্যিনাথ দেখল, এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের ভাল। গাড়ি যা যাচ্ছে, তাতে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে। মলিনার কানে কানে একবার বলল। হেঁটে যাবার কথাটা। সে নারাজ। সবাই যখন গাড়িতে, তারাই বা হাঁটতে যাবে কেন? এই নিয়ে তুমুল তর্ক। মলিনা ভুলে গেল এটা বাড়ি নয়।

চেঁচামেচিতে খোঁড়া লোকটা বলে উঠল, 'ঠিকাছে ঠিকাছে আমি নেমে যাচ্চি—'

মলিনা বলল, 'না না আপনাকে কেউ নামতে বলে নি—'

বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল নতুন বউটা। বলল, 'কী দরকার ঝামেলায়? আমিই নয় নেমে যাই—এ্যাততটা পথ তো হেঁটে হেঁটেই আইলাম—'

অস্পষ্ট জড়ানো গলায় বুড়িমা বলল, 'না না বাচ্চা নিয়ে ডাগর মেয়েমানুষের একা যাওয়াটা ন্যায্য হবে না। যা দিনকাল পড়েছে…'

এসবের মাঝখানে ভ্যানওলা চিৎকার করে উঠল, 'আঃ কী হচ্চে কী? কাউকেই নামতে হবে না। সব্বাইকে আমি ঠিক নিয়ে যাবো—অন্ধকারে পথ চিনতে পারবে না।'

এটা ঠিক। যারা চণ্ডিতলায় যাচ্ছে, কেউই ঠিকমত পথ-ঘাট চেনে না। সবাই চুপ থাকল তাই।

সামনেই চড়কডাঙার মাঠ। অন্ধকারে ডুবে আছে। তখন সেই জমাট অন্ধকার ফুঁড়ে-ফাঁড়ে ভ্যান রিকশাটা ঢুকে গেল মাঠের মধ্যে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উৎস প্রসঙ্গে

নীহার ভট্টাচার্য্য

কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর কল্যাণে আজকাল আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তবে আবহাওয়াবিদরা এর চেয়ে অনেক বড় কৃতিত্বের দিকে পা বাড়িয়েছেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছেন। চব্বিশ ঘণ্টা—আটচল্লিশ ঘণ্টা বা বাহাত্তর ঘণ্টা আগে ঝড়-বৃষ্টি-আনুমানিক তাপমাত্রা জানিয়েই তাঁরা আর আত্মতৃপ্ত থাকতে চান না। তাঁরা এখন চান অনেক বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর তার সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সময় থাকতে জানতে এবং জানাতে, যাতে মানুষ সাবধান হতে পারে এবং ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কম রাখতে পারে। ১৯৮২-'৮৩তে পেরুর বন্যায় কত প্রাণহানি হয়েছিল, এখন আর তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অন্তত তিনমাস আগেই এরকম বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বিজ্ঞানীরা এখন দিতে পারেন।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন এত উন্নত যে ভারতের আগামী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রকৃতি, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা বা ব্রাজিল-এর আমাজন এলাকার খরার সম্ভাবনা, কিম্বা পেরু বা ইকুয়াডর-এর বন্যার আশঙ্কার খবর এখন জানা যাবে অনেক, অর্থাৎ যথেষ্ট সময় থাকতে। একমাত্র সাহারার আশপাশের এলাকা এখনো বিজ্ঞানীদের আওতার বাইরে। কারণ, তথ্যের অভাব। ভরসার কথা, প্রযুক্তিবিদরা দায়িত্ব নিয়েছেন প্রয়োজনীয় সেইসব তথ্য সংগ্রহ করবার। আশা করা যায়, বিজ্ঞানীদের গবেষণা সাহারা এলাকাকেও আয়ত্বে এনে ফেলতে পারবে।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো প্রত্যক্ষ করে আসছে এবং সেগুলোকে কোনো অতিমানবিক সত্তার অভিশাপ বলে মেনে নিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ—জ্ঞান এবং চেতনার অভাব। তারা এক এক

ধরণের বিপর্যয়কে শুধু এক একটা করে নাম দিয়ে রেখেছে। তেমনি একটা নাম এল্ নিনো (El Niño)। পেরুর অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল। বহুকাল আগে একদল জেলে লক্ষ্য করে, মাছের আকাল পড়েছে। সেইসঙ্গে তারা এটাও লক্ষ্য করে, সমুদ্রপৃষ্ঠের জল অপ্রত্যাশিত রকম উষ্ণ। এই দুই পর্যবেক্ষণ থেকে তারা এটুকু শুধু বুঝতে পারে, জলের ঐ উষ্ণতাই মাছের আকালের কারণ। তারা তখন এটিকে প্রকৃতির অভিশাপ বলে ধরে নেয় এবং নাম দেয় এল্ নিনো (EN)। ১৯৭২ সাল অবধি EN প্রকৃতির অভিশাপ হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎই বিজ্ঞানীদের নজর এই ঘটনার দিকে পড়ে। কারণ, প্রায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছিল। সুতরাং শুরু হল এর কারণ অনুসন্ধান। প্রথমে ধারণা করা গেছিল EN একটি স্থানীয় ঘটনা। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, EN পৃথিবীর অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ। বিজ্ঞানীরা এখন EN-এর প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে জানেন। এই দুর্যোগ একবার শুরু হলে তা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং আঠোরো মাস মত চলে তার প্রকোপ। পর্যায়ক্রমে দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব জুড়ে।

শুরু হয় ইন্দোনেশিয়া এলাকায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দোনেশিয়া আর নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। এই বর্ষণ পূর্বদিকে সরে গেলে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের সাগরপৃষ্ঠ উষ্ণ হয়ে ওঠে। ফলে নিরক্ষরেখার দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়ার অঞ্চলগুলিতে খরা দেখা দেয় জুন থেকে অক্টোবর অবধি। অক্টোবর থেকে পরের এপ্রিল অবধি সেই খরা গ্রাস করে দক্ষিণ ফিলিপাইনসকে, আর মেলা-নেশিয়াতে খরা চলে এক বছর ধরে। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ওপর তার প্রভাব পড়ে, বৃষ্টিপাত কম হয়। ব্রাজিল-এর আমাজন অঞ্চলে, গায়না অঞ্চলে আর ব্রাজিল-এরই উত্তর-পূর্ব এলাকার উত্তরাঞ্চলে খরা চলে নভেম্বর থেকে এপ্রিল অবধি। তাছাড়া এর প্রভাব পড়ে পূর্ব আফ্রিকায়, কেনিয়ার দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ষার ওপর। EN দেখা দেয় প্রায় নিয়মিতভাবে—দুই থেকে সাত বছর অন্তর, কিছু তারতম্য অবশ্য থাকে এর প্রকোপের।

উত্তর গোলার্ধে EN-এর প্রকোপ দেখা দিতে পারে বসন্তকালে। স্বাভাবিক অবস্থায় নিউগিনির কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিশাল এলাকা জুড়ে বৃষ্টির জল সাগর-পৃষ্ঠকে বেশ উত্তপ্ত করে তোলে (২৮—৩০° সে)। এই উষ্ণ

স্রোত ছয়মাস অন্তর নিরক্ষ রেখা পার হয়ে যে গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল সেইদিকে বয়ে যায়। কিন্তু EN-এর প্রভাবে এই উষ্ণ প্রবাহ পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে। প্রকোপ বেশী হলে তা দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অবধি পৌছায়, যেমন হয়েছিল ১৯৮২-৮৩ তে। দক্ষিণ আমেরিকার সাগরপৃষ্ঠ বেশ ঠাণ্ডা (১৮° সে), তার কারণ সমুদ্রের গভীরের ঠাণ্ডা জল ওপরে উঠে আসে। এই ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে উঠে আসে মাছের খাদ্য। মাছেরাও যেন এই ঠাণ্ডা জলের অপেক্ষাতেই থাকে। কিন্তু EN-এর প্রভাবে উষ্ণ জল সরে আসে সমুদ্রের তটের দিকে। সেখানে উষ্ণ জলের গভীরতা বেড়ে ওঠে। এখানেও অপেক্ষাকৃত গভীর এলাকা থেকে জল অবশ্যই উঠে আসে, তবে সেই জলও উষ্ণ। এমনি করে সাগরপৃষ্ঠ উষ্ণ হয়ে ওঠে ২৫°সে পর্যন্ত। মাছের খাদ্যের অভাব দেখা দেয়, ফলে মাছেরা সেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে উঠলে তার প্রভাব পড়ে East Wind-এর ওপর। এই হাওয়া পুব থেকে পশ্চিম দিকে বয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই হাওয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এই হাওয়াকে সাহায্য করে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরকার জলের তাপমাত্রার বিশাল পার্থক্য। বাতাসের গতিবেগের ওপর তার প্রভাব পড়ে এবং এক বিশাল তারতম্য দেখা দেয়। এই তারতম্যের সঙ্গে আবার প্রায় একই সঙ্গে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের বায়ুর চাপ কমে যেতে পারে, আবার পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বায়ুর চাপ বেড়ে যেতে পারে। এই ঘটনাকে বলা হয় Southern Oscillation (SO)। আয়ন বায়ুর (Trade wind) গতিবেগ কমে গেলে সাগরপৃষ্ঠে উষ্ণতার তারতম্য আরো বেড়ে যায়। এইসব ঘটনা সমুদ্র এবং আবহাওয়ার মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ফল। গণিতশাস্ত্রবিদরা প্রমাণ করেছেন, বায়ুর গতিবেগ পরিবর্তনের ফলে ঘটে এই মিথষ্ক্রিয়া।

তাহলে দেখা যাচ্ছে EN আর SO যেন একই সঙ্গে এই বিশ্বপ্রকৃতির ওপর বিপর্যয় ডেকে আনে। এদের এই যুগ্ম প্রভাবের নাম তাই দেওয়া হয়েছে-এদুটোকে এক করে—ENSO ঘটনা। এর ফলে পূর্ব মহাসাগর উত্তপ্ত হলে আয়ন বায়ুর গতিবেগ মন্থর হয়, আর তার ফলে সাগরপৃষ্ঠের উষ্ণ জল ছড়িয়ে পড়ে। এক ENSO-ঘটনার পর অন্তত দুবছর পার হলে আরেক ENSO শুরু হতে পারে, প্রয়োজন শুধু আবহাওয়ার অপেক্ষাকৃত সামান্য পরিবর্তন। তবে এই ধারণা এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ। বসন্ত বা হেমন্তকালে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ এলাকার জল নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার সময় পূর্বদিকে চলে

যেতে পারে এবং তাহলেই EN শুরু হবে। তবে এই পূর্বদিকে সরে যাওয়ার কারণ এখনো জানা যায়নি, তাই অধিকাংশ বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতে চান না, EN-এর সঠিক পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। তবে শুরুটা একবার ধরা পড়লে তার ফলের পূর্বাভাস জানা সম্ভব। অন্ততপক্ষে তিনমাস আগে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একবছর আগেও আসন্ন বিপর্যয়ের কথা জানা যাবে। এই বিপর্যয় খরা, অতিবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতার রূপে আসতে পারে। কোথায় কি রূপ নেবে সেটাও বলে দেওয়া যাবে।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, ENSO-র শুরুতেই তাকে ধরা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন কিছু তথ্যের, সেসব তথ্য একযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সেইসব তথ্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করলে ENSO-কে ভ্রূণ অবস্থায় চিনতে পারা সম্ভব। সেইজন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করবার। বায়ুর চাপ এবং সাগরপৃষ্ঠের উষ্ণতাই প্রধান লক্ষণ, তাই সেগুলি মাপবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে ডারউইন-এ বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপবার এবং চাপের পরিমাণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহিতিতেও বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল এলাকায় সাগরপৃষ্ঠের উষ্ণতা বাড়ছে কিনা, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়েছে।

ENSO-র বেলায় এইসব ঘটনা জানুয়ারীতে ঘটতে শুরু করে। এপ্রিল-মে নাগাদ সেটিকে সন্দেহাতীতভাবে চেনা যায়। এর ফলে প্রায় দুমাস আগেই ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রকৃতির কথা জানা যাবে, ফলে অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানা যাবে। তবে এই ধরণের পূর্বাভাস নিখুঁত করতে হলে গত ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের বৃষ্টিপাতের তথ্যও জানা থাকতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের তথ্য জানা থাকলে তবেই পূর্বাভাস নির্ভরযোগ্য হবে। এর জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ এবং যথেষ্ট শিক্ষিত আবহাওয়াবিদদের উৎসাহ এবং উদ্যম।

ভারত এবং আমেরিকা, এই দুটিমাত্র দেশের বিজ্ঞানীরা এব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন, উৎসাহী এবং সক্ষম। অন্যান্য দেশগুলিকে এব্যাপারে উৎসাহিত করার চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে, একমাত্র তাহলেই পৃথিবীর যেকোনো দেশকে যথেষ্ট সময় থাকতে আসন্ন বিপর্যয় সম্বন্ধে অভিহিত করা যাবে, সম্ভব হবে সময় থাকতে সাবধান হওয়া।

[বিশ্ব ব্যাংক-এর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপদেষ্টা Charles Weiss-এর একটি প্রবন্ধকে ভিত্তি করে এটি রচনা করা হয়েছে।]

যেমন প্রকৃতি

সিদ্ধেশ্বর সেন

তবু তো এখনও আছে
গ্রামে বা শহরে, ধারে-কাছে,
দুরন্ত মর্যাদা

যতটাই খোয়া গেছে
আরও ততটাই,
নিদেন কম বা বেশি, দুর্গত এ-আশা ?

সেটুকু উশুল পাবে, যদি
মনে পড়ে
নবকলেবর—

মনে ঋতুরঙ্গশালা,
পুনর্ভবা—
যেমন প্রকৃতি

বাঙলা রুবাই

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

১

দূরে চলে যাচ্ছে কল্পনা···
পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে জীবন
গুনগুন করে চলেছে নবনির্মাণের নদী

দুদিকে তার
হরিৎ পৃথিবীতে
খেলা করে বেড়াচ্ছে
আমাদের গাঢ় গভীর
ভালোবাসার
শস্যসন্তানেরা।

২

যখন
ঝড় এসেছে
ঢেউ উঠেছে
তখন তোমার নৌকো
কি আর তটে বাঁধা থাকবে!
অজান্তেই, তুমি
আমার দিকে
পাল-ছেঁড়া উড়ন্ত বাতাসে
ভেসে আসবে
মধ্যসাগরের মিলনে।

৩

আজ একা চলতে চলতে···
কাল সকলকে রাস্তা দেখাবে।
চলতে চলতে রাস্তা আরো দূরে ছড়াও,
দেখবে—এ যাত্রায় সামিল
সমস্ত পৃথিবীর মানুষ,
দেখবে—তোমার পেছনেই
অথৈ, এগিয়ে আসছে
মিছিলের পর মিছিল।

৪

আমার তেষ্টা লেগেছে।
যদি বৃষ্টি হয়, হয়ে থাক্…
খুব তেষ্টা লেগেছে আমার, আরো তেষ্টা—
আমার তেষ্টা বৃষ্টিতে কিছু কমে না।

যদি বৃষ্টি হয়, হয়ে যাক্
তেষ্টা মেটে না…
আমি চাই সমুদ্রের
লোনা অবগাহন।

কিংবা তোমাকে,
আর তোমার
ঠাণ্ডা ঝর্ণার
পাথর-নাচানো জলের
মিষ্টি নির্জন।

তিনটি মন্তব্য

অমিতাভ গুপ্ত

১.

বলো সেইসব বিচ্যুতির কথা, খড়ের গল্প
মহাপদ্মনন্দের অস্থিরতা ছড়িয়ে আছে যেসব ধুলোয়

২.

অপ্রস্তুত, কিন্তু এইসব চিহ্ন ছুঁয়েই
পাথর প্রবহমান, জীবনও গতিময়
উদ্দেশ্য এবং ছায়াবলোকনের সমস্ত জটিলতা
নিয়েই আমাদের নির্মাণ, ভেঙে যাওয়া,

শীতের কুয়াশা পেরিয়ে একটি দূরগামী ধ্বনি
চলে গেল, একজন অচেনা যুবক
একটি সঙ্গহীন ধ্বনি। কে জানে কোথায় ওরা যাবে

৩.

রক্তে নিকোনো উঠোনে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, শান্তি
শান্তি ?

আকাশ, আলোর ধ্বনি। কে আমার ব্যক্তিগত
জবা ছুঁয়ে যাবে

দৃশ্যের আশ্চর্য কুয়াশায়
নিশীথ ভড়

খিদে পেলে খেতে পাওয়া যাবে
এরকম স্বাভাবিক কবে
হবে আর আমার আকাশ।

সারাদিন বসে শুয়ে থেকে
হাত-পা ছড়িয়ে ছুঁড়ে যদি
পাওয়া যেত শূন্যতার কিছু—

ফুলদানি অথবা মহিলা
তাহলে কি হতে না সহজে
শিল্পের যাদুতে মুগ্ধ ফের!

কিংবা খুব ছুটোছুটি করে
মাইকের সামনে গলাবাজি
দৃশ্যের আশ্চর্য কুয়াশায়

বিপ্লব শব্দটি সুমধুর
লাগত আহা ভরা পেটে ভালো
সবই হয় যৌবন পেরোয়

এখন ছেলের জন্য স্কুল
বৌ-এর অতিথি ডাক্তার—
আমার নিজের জন্য খোলা
অফিসের লেজার : শ্মশান।

জমি

শোভন রায়

এবার থেকে রোদের জাতপাত মেনে চলতে হবে
বউ বিধবা বলে আমি মৃত হয়ে গেছি
সাত একরের চাষি বলতে আমি একা চৌপরদিন
গোটা মাঠ চষে ফেলছি ;

আমি তখন রোদের জাতপাত মানতাম না
বউ সংগোপনে জানিয়ে দিত এবছরও বেজন্মা নয়

মোল্লাখালি থেকে সোনারপুর যাবার পথে বউ
আমার হাঁ-করা লাশ দেখে শাঁখা ভেঙেছে
কেন জানি না সিঁদুর তোলার কথা একবারও
মনে আসে নি,

সাত একর না পাও, সাতছেলের মা তো তুমি
তোমাকে নাতির মুখ দেখাবে সোনারপুরের মাটি
শবযাত্রায় মণ্ডলবাড়ির বিধবা বউ বীজধান পুড়িয়ে ফেলেছে
আত্মীয়ের রোষে, দখল হারাচ্ছে প্রেম
নাতিরা প্রেমের গল্প শুনলে দাদুকে মোল্লাখালিতে
খুঁজতে যাবে
দাদুর জন্যে সাত একর জমির মাটি চষে বেড়াবে,

বউ-এর এখন গোপন কথা চেঁচিয়ে বলার বয়েস।

এই দেয়াল ঐ জল

তরুণ সেন

এই দেয়াল

এই দেয়ালে দুঃখ আছে, এ যে দেয়াল দারুণ শাদা
অশ্রু সাদা, কাগজ সাদা শব্দ সাদা পাতার মতন

আঁচড় চেয়ে তাকিয়ে আছে, মধ্যিখানে মস্ত বাধা
দাড়িয়ে দেয়াল ভুবন জুড়ে, দরজা জানলা হায়রে কপাল !

ঠেস দিওনা তবেই পাবে মুক্তি ছাখো কোন ট্রিগারে
কে রাখে হাত—ঠিক নিশানা বুঝেই ছাখো থাকবে কিনা
দেয়াল আড়াল করবে নাকি নামবে সটান ও রাজপথে
যেখান থেকে মানুষ আসে, মানুষ হাটে সওদা করে

ঐ জল

ঐ জলে অশ্রু আছে, ঐ জল আগুন খেয়েছে
ঐ জলে ধুয়ে গেছে গুটিকয় শতাব্দীর মেধা
ঐ জলে কন্যা এসে ভাসিয়েছে ভেলা ও পিদিম
ঐ জল ছুঁতে চাও, ছুঁতে পারো, নিও না কখনো

ঐ জলে মুখ ছাখো, যখন কান্নায় ভেজা বাকী
হৃৎ, চিত্ত, বিষয়গুলো লোহার পাল্লার মত ভারী
ঐ জল চুঁয়ে নাও, যখন পিঁপড়ে এসে গ্রাস করে আপাদমস্তক
ঐ জল 'স্মৃতি, সত্তা ভবিষ্যত' মিলিয়ে যেটুকু—তুলে রাখি

পাঁচলা ১৯৮৬

ব্রত চক্রবর্ত্তী

হাঁটু পর্যন্ত জল।
মুখ দেখা যাবে না,
কেননা, কাদা আর পাঁকের ষড়যন্ত্রে
ঘোলাটে হয়ে আছে।
তবু তারই ভেতরে কিছু-মিছু পাবার লোভে
কোমরের ঘুণসি খুলে বছর ছয়ের ছেলেটা
নেমেছে, সঙ্গে দিদি, যার এগার বছর
ছেঁড়া ফ্রকের লজ্জা ঢাকতে বারেবারেই
হাত ছুটোকে বুকের ওপর তুলে আনছে।

দেখার মতো দৃশ্য নয়।
তবু কাদা আর পাঁকের ভারী চাদর সরিয়ে
নীচ থেকে সরেস একটা শরপুঁটি তুলে
দিদির হাতে দিতে দিতে ছেলেটা
আনন্দে যখন দিশেহারা হয়ে পড়ল,
ছোট্ট একটা বাঁক ঘুরে
দৃশ্যটা অ-সাধারণ হয়ে গেল।

ইচ্ছে হল, ক্যামেরা তাক্ ক'রে
একটা ছবি তুলি
এই অ-সাধারণ দৃশ্যটার।
যারা কোথাও কিছু খুঁজছে
অথচ পাচ্ছে না,
তাদের জন্য॥

শীতের শেষ বর্ণমালা

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দ্বিধা পেরিয়ে এতদিনে আমার গায়ে হাত রেখেছ।
বহুকাল পর এই ঘনশ্যাম অন্ধকারে একটানা স্নিগ্ধতা।
যে ট্রেন এ স্টেশনে আসার কথা ছিল না, সে ট্রেন
থামলো। বেশ হৈচৈ হ'লো, আবার আমার চোখে তোমাকে
খোঁজার ব্যাকুলতা। শুকনো ডালপালাগুলোয় নতুন পাতা আসতে
খলখল ক'রে হেসে ওঠে বাতাস। তবু পড়ে থাকে কিছু
বরফের কঠিন চাঙড়, লোকালয়ের বাইরে, অনেক উঁচুতে—
এ নিয়ে আর দুঃখ করবো না কোনোদিন।

অবিবেচক

বাসু মুখোপাধ্যায়

নিষেধে নিন্দে ছিল না কোথাও অথচ
আমি ক্রোধে নামলাম কোমরের কথা না ভেবেই

ভাসতে গিয়ে পড়লাম দস্যি হাওয়ার সংগমে
এখন ভাবছি তেলেবেগুনে মাথা চুবানো কিছু না ভেবেই
বয়েসকে বড় হেয় করা

দিব্যির ঘাড় মটকে যে আবার ফিরব
কোন উপায়ই ঘরে নেই যে ডাকব 'আয়' নেব সঙ্গ
অথচ
নিষেধে নিন্দে ছিল না
ছিল না বলেই ছিল নিন্দে এই পারাপারে এই সময়
আহা আমি তো নই সময়ছাড়া

কণ্ঠের ফাঁসে চোখ মিটমিট করে হাসে
শকুনের পেটে যেন বদ্ধভূমি
আহা আমি তো নই সময়ছাড়া

শরীরের স্বয়ম্ভর সভায় ত্যাগে এবং গ্রহণে হয় স্বাভাবিকতা
বীর্য কি সেখানেও ভীড় ঠেলে পথ করে না
নীরবে সেরে নেয় ঢাকঢোল হেলায় ঠেলে মহৎকর্মটুকু
শকুনের দোষটাই বড়
অথচ
নিষেধে নিন্দে ছিল না
আমি ক্রোধে নামলাম কোমরের কথা না ভেবেই

মাইকেল

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

সময়ের গা বেয়ে খসে পড়ে
এক একটি পাতা
ফুলের ভেতর থেকে বীজ
বীজের ভেতর স্বপ্ন

স্বপ্নের ভেতর দরজা
দরজার ভেতর অন্য আর
এক স্বপ্নের জগত
কেউ তুলে রাখে সোনার কৌটোয়
কেউ মাড়িয়ে যায়
বীজ একদিন মহীরুহ হয়।

তখন নিচে মাইকেল বসে
গান শুনে অনেকে নজরাণা দেয়
মালা পরায়
অবহেলায় মাড়িয়ে দিল যে
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে
অদ্ভুত সময়।

সালংকারা

অনীক রুদ্র

এতো রূপ তোমার আর ঐ ঔজ্জ্বল্যে দণ্ডায় মানা নারী
সালংকারা
শীতের পোশাক ছিল প্রাণমতী, তার আধিক্যে
তুমি তাকালে
আমি ছড়িয়ে দিলাম সেই নিগড় দৃষ্টি
তার সঙ্গে উদ্বাহু যতো কথা
কতো সহজেই তুমি চিরায়ত স্বরে
তার উত্তর দিলে
আমি কী বলতে চাই অতিরিক্ত
কী গল্প করতে চাই
কিম্বা শুতে চাই কিনা
আমাদের ধোঁয়াশাপ্লুত কুটিল শহরে

তুমি একা এবং তোমরা
ঠিক করেছ যেন আমাদের পরিধেয় যা কিছু
কেড়ে নেবে
আমাদের গর্বিত পকেট উজাড় করে হাসবে
রিক্ত, প্রশান্ত ও স্বপ্নময় হাসি
হয়তো এ তোমার খাদ্যবিষয়ক
নামমাত্র রমণ সুখের নয়
ক্লীব চতুষ্পদের মতো পানাসক্ত আমার লোল ঠোঁট
অই হাঁ হয়ে আছে
কোন্ ব্যাধি আমরা পালন করে চলেছি,
কোন্ অহংকার বলে না
সেই সুন্দর, তোরা দু-হাতে ছিঁড়িস রে মর্ষকামী
অর্বাচীন মূঢ়
তোর জননী, গূঢ় বন্ধন
যে গর্ভাশয় ও জরায়ু যুগপৎ ধরেছে
তারই ডাকনাম

কি অসহ তোমার রূপ সালংকারা
জানি তুমি পাতাল-দুহিতা
উত্তর দাও গোধূলির
যতো অপমান জমা রাখো
যদি প্রয়োজন ছিল পাতালের
প্রবেশের
তবে ঘৃণা দাও পর্বত প্রমাণ, বমন।
আজ অঞ্জলি পেতেছি
প্রিয় মানবী

জল নারী অমরতা

সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়

যে গেছে নারীর কাছে
সে পেয়েছে সমুদ্রের স্বাদ
কিছু নোনা অনেকটা গভীর।

গভীরতা আমরাই মাপি
বলেছিল শব্দের ঝাঁক।
শব্দ নাকি জাদুকর ওরা
স্বপ্নে সুগন্ধ দেয়। স্নানহীন রুক্ষ মাথায়
দেয়, তেল নয়, সহমর্মিতা।
যে গেছে বীজের কাছে
সে পায় প্রচুর অমরতা।

একটু তফাৎ রেখে হাঁটে সে তখন
জল মাপে
নশ্বরতা মাপে
নির্লোভ শরীর তার ঘিরে থাকে অলৌকিক আলো।

আঁধার ছোঁয়না আর তাকে।

তাক

অজিত বসু

বললে, জ্বালুন।
জ্বাললাম।
—কোথায়, কি নাম?
—আছে…
—এই এক হয়েছে, যত্তোসব।
যাকগে, শুনুন,
ওয়াচ রাখুন।

হঠাৎ রাতে, বললে, উঠুন…
—এঁ্যা! কে?
—আছে শ্রীচরণ দাস
—হঁ্যা, বলুন বলুন, চলুন…
ঠাসঠাস দেব দুই চড়;
—আছে খবর…
—কি?
—খবরটা এই…
বাড়ছে তো বাড়ছেই দলে,
কালকের জের ফের উঠেছে…
এগিয়ে আসছে পলে পলে,
আপনাকেই খুঁজছে সকলে!

জলাভাব

সুশান্ত আচার্য

অ-শীত বালক এক 'জল দাও' চিৎকারে ফেটে পড়ে রোজ,
অবিরল জলপ্রপাতের শব্দে ভেজে স্বপ্ন ও জীবন,
প্রিয় নীল উপগ্রহ থেকে স্নেহভাগ কমে গেছে বুঝি,
মানুষ রুক্ষ থেকে রুক্ষতম হবে,
কালোদের রক্ত কি যথেষ্ট লাল নয়।
আফ্রিকার আকাশ থেকে শুকনো মেঘেরা উড়ে আসে কেন—
দরিদ্র সীমার নীচে শুয়ে থাকে জ্যোৎস্নার রোদ
চাঁদও কাঁদে 'জল দাও' বলে—রুটি ও একটু সবুজ,
ঘামের শরীরে নুন, প্রয়োজনে রক্তপাত আরো, আরো,

আমাদের চতুর্দিক অ-শীত বালক কাঁদে রোজ!

আমার তো কেউ নয়

প্রবালকুমার বসু

সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে জাগে
কে যায়, কে যায় আগে আগে
আমার সে কেউ নয়

সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে জাগে ভয়

আমি কেন তারই পিছনে
ঐভাবে, এমনইভাবে এক অত্যাগসহনে
যাব, সে আমার তো কেউ নয়

সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে ভয়

কালি জমে গেছে

রামলাল সিং

এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জের কার্ডটায়
জায়গা নেই।
রিনিউলের মনভোলানো
ছোট্ট তারিখটা বসাবার।

বয়সও কখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে
মনে নেই।
আবেদন নিবেদন করতে করতে
হাজার রিম্ কাগজ শেষ করেছি
এবার টিটাগড়কে
স্পেশাল মেসেজ পাঠাবো।

লিখতে লিখতে হাত অবশ হয়ে গেছে।
ডট্ কলমটার রিফিলটায়
আর লেখা পড়তে
চায় না।

কালি একেবারে জমে গেছে ॥

তট রেখা

রেণুকা পাত্র

তোমাকে ছুঁয়ে যাব বলে
অনেক শব্দের সিঁড়ি আমি ভেঙেছি
খুশির দেওয়াল গড়ে তুলে
তুমি সুর বেঁধে ফেললে সীমায়,
আয়তনের যন্ত্রনায় মোচড় খেতে খেতে
নৈরাশ্যের কাছে নতজানু হয়ে বসেছি।
পাহাড় ধ্বসে ধ্বসে ভাবনাগুলো
ঝরনার স্রোতে ভেসে গেছে,
আলিঙ্গন সেরে তুমি সরে গেছ
শরবনের ঝোপে,
যোজন যোজন দূরে পালাতে পারোনি—
আমার সত্ত্বায় তোমার অধিষ্ঠাত্রীকে
প্রতিষ্ঠিত করবে বলে।
বসন্তের বাতাসে ঝরিয়ে দিলে,
অনতিদূরের সবুজ-শপথ।
এক খণ্ড মেঘ হয়ে আজও তবু ভেসে চলেছি,
তোমার বিস্তীর্ণ বুকে—
এক বিশাল মহাদেশের গল্প শুনব বলে।

শব্দের আকাশে প্রতিধ্বনিত হয়—

একা যে ছিলো রাজা, তার ছিল একরাণী

দিদিমনির চোখের এক ফালি চাঁদ আর—

কয়েকটুকরো শব্দের সুখকে

গল্প হয়ে উঠতে দিলো না

দু'একটি প্রচলিত অক্ষর।

মে দিবসের ভাষণ

জঁ জেনে

[১৯৭০। মে দিবস। আমেরিকার ইয়েল অ্যাকাডেমির ক্লাশরুম ছেড়ে, আশে-পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করে ৩০ হাজার ধর্মঘটি তরুণ-তরুণী জড়ো হয়েছিলেন খোলা ময়দানে। আকাশের নিচে মে দিবসের জনসভায় তাঁদের সামিল হয়েছিলেন বেশ কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, পাদরি, ভবঘুরে, বেকার ও অধ্যাপক। সেখানে তাঁদের সামনে এক নড়বড়ে কাঠের পাটাতনের ওপর এসে দাঁড়াল বিশ্ববন্দিত নাট্যকার, কবি ও পীড়িত মানবাত্মার কথাকার জঁ জেনে, যাঁকে জঁ। পল সার্ত্র আখ্যা দিয়েছেন 'সন্ত জেনে' নামে।

তা ক্যানাডার সীমান্ত দিয়ে বেআইনি ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়েছিলেন জেনে। সত্তরের দশকের আমেরিকা তখন জঙ্গী ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির মিলিট্যান্টদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, প্রশাসন, পুলিশ শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষীদের সঙ্গে একজোট হয়ে কালো মানুষের মুক্তিকামী ব্ল্যাক পান্থারদের ওপর দাঁত-নখ উন্মুক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁদের নেতা ববি সিল তখন কারাকক্ষে তাঁর কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে মৃত্যুর দিন গুনছেন। দুনিয়ার মহান গণতন্ত্রের ধারক ও বাহকেরা চিরাচরিত রীতিতে ব্ল্যাক প্যান্থারদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও কৃষ্ণসন্ত্রাসের অপবাদ প্রচার করে যাচ্ছে।

এমনই পটভূমিতে মার্কিন মুলুকে জঁ জেনে-র অগ্নিভ আবির্ভাব। সে দেশে গিয়ে তিনি নিজের চোখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরতান্ত্রিকতা ও বর্বরতা যাচাই করতে থাকেন, দেশের এক তল্লাট থেকে আর এক তল্লাট পর্যন্ত ঝড়ের দ্রুততায় ঐ স্বৈরশক্তির বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান চালাতে শুরু করেন। এ-ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহযোগী হয়েছিলেন ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমেরিকার অনন্য কবিকণ্ঠ অ্যালেন গীনসবার্গ।

অ্যালেন-ই ইয়েল-এ অনুষ্ঠিত মে দিনের সভায় জঁ জেনে-র বক্তৃতাদানের আয়োজন করেন। জেনে ফরাশি ভাষায় বক্তৃতা দেন, সঙ্গে সঙ্গে সভায় তার ইংরিজি অনুবাদ করা হয়। সেই অনূদিত বক্তৃতাটি অ্যালেন-এর নিজস্ব প্রকাশন-সংস্থা সিটি লাইটস্ থেকে পুস্তিকা হিশেবে ছাপা হয়। অ্যালেন-এর একটি ভূমিকাও এই সঙ্গে ছিল, স্থানাভাবে আমরা সেটি প্রকাশ করতে পারলাম না।

মে দিবসের এবার শতবার্ষিকী চলেছে। ফলে বর্তমান ক্রোড়পত্রটি আলাদা ধরনের তাৎপর্য পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক, পরিচয়]

গোড়াতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার উপস্থিতির ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

এখানকার প্রশাসনের ভেতর যে সব বিদঘুটে কাণ্ড-কারখানা কাজ করে, তা প্রথম থেকে আমার নজরে পড়েছে। প্রচলিত নিয়মকানুনের বেড়া ডিঙিয়ে মাসদুয়েক হল এদেশে ঢুকেছি, অবাধে দেশের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো ঘুরে বেড়িয়েছি। যেখানেই থাকি না কেন, যাকে ঠিক বিপ্লবী বলে, চালচলনে আমি ভালই, বরং আমার চলা-ফেরাকে ভবঘুরের জীবনই বলা যেতে পারে। আমার স্বভাবের সঙ্গে আটপৌরে চিন্তা-ভাবনা খাপ খায় না। কিন্তু ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টি সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমাকে সতর্ক হতে হবে। কারণ এটি কোনো উটকো দল নয়। আইনের আওতায় থেকেই এই পার্টি প্রকৃত হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে বেফস্‌কা এমন কিছু বলতে চাই না যা ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর কিংবা যে-ববি সিল পাথর, ইস্পাত ও কংক্রীটের কঠিন কারাগারে বন্দী, তাঁর নিরাপত্তাকে বিচলিত করে। বাক-স্বাধীনতার অর্থ এটা হতে পারে না যে যা খুশি বলে প্যান্থারদের সমর্থন করার নামে তাদের ক্ষতি করে ফেলব।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্যটি প্রথমটি থেকে আলাদা নয়; তা হল—বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকার সমাজ-জীবনে হু হু ক'রে ছড়িয়ে পড়ছে। এ-ব্যাপারটা আমি এখানে আসা-তক্ লক্ষ্য করছি। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই এমন ব্যতিক্রমও দেখেছি, যেখানে বর্ণান্ধতার কোনো জায়গা নেই।

নিউ হেভেন বিচারশালায় ঘটনাগুলো এর পর ঘটতে শুরু করল। দেখলাম জাতি-বিদ্বেষের আর এক রূপ—হিংস্র উন্মত্ত কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ।

ঘটনা এই ধরনের। বিচারকক্ষে আমি আমার ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির বন্ধুদের সঙ্গে এসে বসলাম। একজন পুলিশ কিছু জিজ্ঞাসা

না করেই আমাকে সামনের সারির একটি আসনে বসতে বলল। আসলে ঐ সারিটা শুধু শাদা চামড়ার মানুষদের জন্য সংরক্ষিত। কারও কাছে এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু এই নকল ভদ্রতা এদের ব্যবস্থাকে বোঝবার একটি চাবিকাঠি বলে মনে হয়েছিল আমার।

এরপর হিলিয়ার্ড, এমোরি ও আমি তিনটি আলাদা আলাদা লিখিত বক্তব্য আদালতে পেশ করি। একই অপরাধে প্রথম দুজনকে আদালত অবমাননার দায়ে গ্রেপ্তার করা হল। অথচ মার্কিন বিচার-ব্যবস্থার এমনই মহিমা যে আমাকে স্রেফ বিচার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশটুকুই দেওয়া হল।

আরও একটি ঘটনা। দিন দুয়েক পর। আমি আমার এক কৃষ্ণাঙ্গ ও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বন্ধু সবাই মিলে যাচ্ছিলাম টি. ডব্লু. এ বিমান ধরব বলে। ঢোকার মুখে প্যাসেজে একজন পুলিশ আমার সেই কালো বন্ধুকে তার স্যুটকেশ খুলে দেখাতে বলল। সে স্যুটকেশ খুলে দেখাল। তার মধ্যে ছিল গোটা তিনেক শার্ট আর তিনজোড়া প্যাণ্ট।

পুলিশটি প্রথমে তাকে বিমানে ওঠার অনুমতি দিল। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে পরক্ষণেই আরও জনা পাঁচেক পুলিশ নিয়ে আমার সেই বন্ধুটিকে নেমে যেতে বাধ্য করল। কিন্তু আমি ও আমার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে এমন বর্বর ব্যবহার করা হয় নি। ভাগ্যিশ টি. ডব্লু. এ ছাড়াও অন্য বিমান ছিল।

গায়ের রং শাদা বলেই মার্কিনি সমাজ আমার দিক থেকে বিপন্মুক্ত। আর কালো চমড়া মানেই কালো বা অনিষ্টকর মানুষ, অপরাধী। এরই ফলে স্থিতাবস্থার সমর্থক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সামনে ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টি এখন এক ভয়াবহ বিপদ সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার কাছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে তা হল আমেরিকার বামপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে ব্ল্যাক প্যান্থার

পার্টির সম্পর্কের গুণগত দিকটি। তাছাড়া, এখানে আসার পর আমার মধ্যে এ-রকমের অনুভূতি হয়েছে যে আমেরিকার শাদা মানুষদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় একটা নতুন মাত্রা যোগ করা জরুরি—যা হল, উন্নত হৃদয়বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। আশা করি, আপনারা বুঝতে পারছেন যে বিষয়টি স্রেফ ভাবপ্রবণতার ব্যাপার নয়, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কের সেতুবন্ধন। কাগজে-কলমে যেসব অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো কালো মানুষদের নাগালের বাইরে। এখানে এখন সুকৌশলে বিভেদের বেড়াজাল তুলে মানুষে মানুষে ফারাক করে রাখা হয়েছে। একটু চোখ মেলে তাকালেই এটা নজরে আসে। ইউনিয়নগুলির মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এহেন ছুৎমার্গের উদাহরণ চোখে পড়বেই। ঠিক এই কারণেই এদেশের শ্বেতাঙ্গ সংস্কারপন্থীদের এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত, যাতে শাদারা যে-সব অবাঞ্ছিত সুযোগ-সুবিধে ভোগ করছে, সেগুলো লোপ পাবে। সংস্কার-পন্থীরা ছাড়া যে-সব উগ্র বর্ণবিদ্বেষীরা রয়েছে, তাদেরও বুঝতে হবে যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া বর্ণান্ধ অহমিকাকে আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারে না। কারণ, এই মুহূর্তে যে-কোনো জীবিত শ্বেতাঙ্গর চেয়ে অন্ধ বর্ণবিদ্বেষী ঐ শ্বেতাঙ্গটি, যে কফিনে শুয়ে আছে।

বলা হয়, ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির কর্মীদের মধ্যে এমন এক ধরণের আত্মাভিমান ঘোষিত হয়, যাকে ঔদ্ধত্যই বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রসঙ্গটি যখন উঠলই, তখন না বলে উপায় নেই যে শাদা চামড়ার মানুষদের ঔদ্ধত্য শুধু কালোদের প্রতিই নয়, সারা দুনিয়ার মানুষের বিরুদ্ধে। এ-সম্পর্কে আপনারা কি বলেন?

প্যান্থারদের এই আত্মাভিমানের উৎস হল নতুন ধরণের রাজ-নৈতিক সচেতনতা। কখনো কখনো অধিকার রক্ষার প্রশ্নে তাঁরা প্রয়োজনের চাইতে বেশি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। এই ঝোঁক খুবই স্বাভাবিক, কারণ শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তাঁরা কখনোই আস্থাবান হতে পারেন না। তাঁরা জানেন, এরা সবসময়ই কালো মানুষদের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে চায়।

এইসব কারণেই শ্বেতাঙ্গ সংস্কারপন্থীদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরও খোলামেলা হওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে শাদা-কালোর সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে উদার হৃদয়ানুভূতির। আজও, অতি তুচ্ছ কোনো কারণে, একজন কৃষ্ণাঙ্গকে যখন জেল খাটতে হয় একজন শাদা মানুষ আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। এই সুযোগ শ্বেতাঙ্গেরা অজান্তেই পেয়ে যায়, যা কৃষ্ণাঙ্গেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এই খোলাখুলি বৈষম্যকে যারা অস্বীকার করে, তারা হয় গোঁয়ার বা জড় মানসিকতার শিকার, না হয় নিছকই গবেট।

এটা ঠিক যে শাদা-কালোর মধ্যেকার এই বিচ্ছিন্নতা চারশো বছরের পুরোনো। শ্বেতাঙ্গরা কেবল চামড়ার রঙের জন্যই তথাকথিত উচ্চাসনে আসীন। কিন্তু তারা কখনো সন্দেহ করে নি যে আরও একদল মানুষ নিঃশব্দে এগোতে এগোতে খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যবধানে তাদের অনুসরণ করছে। এখন কিন্তু কালো মানুষেরা তাদের দীর্ঘ নীরব অনুসরণের পর এটা চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করছে যে কেবল আলাপ-আলোচনাই এই দূরত্ব দূর করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সুতরাং কালো মানুষদের অবস্থাটা বুঝবার দায়িত্ব শ্বেতাঙ্গদের ওপরই এসে পড়ে। এর জন্য দরকার, আত্মিক উত্তরণ। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ উভয়ের কাছেই আজ গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ণীত হওয়া দরকার।

কৃষ্ণাঙ্গরা একটি মাত্র জিনিষ চাইছেন। তা হল—সম্পর্কের সমতা। শ্বেতাঙ্গরা যেসব সামাজিক সুযোগসুবিধে একচেটিয়া ভাবে ভোগ করে, তা চলতে থাকলে এটা সম্ভব নয়। শ্বেতাঙ্গরা যদি সত্যিই সম্পর্কের সমতা চায়, তবে তাদের আচরণের পরিবর্তন করা একান্ত জরুরি. প্রয়োজন তাচ্ছিল্যের জায়গায় মনযোগ। সতর্ক থাকতে হবে সেইসব বিষয়গুলি সম্পর্কে যা কৃষ্ণাঙ্গদের এখনো আঘাত করছে—এই দীর্ঘ চারশো বছর পরও।

শুধু প্রতীকী আচরণের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়তে হবে। আমি কিন্তু 'এমব্লেম'-এর কথা বলছি যা, যা খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার

নয়। বলছি সেই আনুষ্ঠানিকতার ভড়ং, যা প্রকৃত বিপ্লবী কর্মসূচির বিকল্প হতে পারে না।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সংজ্ঞা কী? বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হচ্ছে সেগুলিই যা বুর্জোয়া ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে পাবে।

আমেরিকায় যারা বামপন্থী এবং তাদের মধ্যে যারা নিজেদের র‍্যাডিকাল বলে মনে করে, তারাই পাবে এই অন্তঃসারশূন্য আচরণের ভণ্ডামি ছেড়ে প্রকৃত বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ করতে। আর এরকম একটি কার্যক্রম গ্রহণ করার বাস্তব অবস্থাও তো রয়েছে। বর্তমানে যেমন কার্যক্রম হতে পারে ববি সিল এবং ব্ল্যাক-প্যান্থার পার্টির অন্য সহযোগীদের মুক্ত করার বিষয়টি।

যা হয়ে গেছে, কেবল তারই গুণগান গাওয়া, অথচ যা আগামী দিনে ঘটা সম্ভব, সে-সম্পর্কে, বিশেষত কোনো বৈপ্লবিক সম্ভাবনা-সম্পর্কে নীরব থেকে যাওয়া কোনো কাজের কথা হতে পারে না। প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে নিহিত থাকে গোড়া থেকে শুরু করার একটা টাটকা আমেজ আর তার জঠরে লুকিয়ে আছে আর একটি নতুন পৃথিবী।

কোনো জিনিসকে মার্কা মেরে দেওয়া বা তাকে কোনো প্রচলিত সংজ্ঞায় চিহ্নিত করার মধ্যে যতই আদর্শবাদ থাক, সেই প্রয়াস কিন্তু ঐ সংজ্ঞানুসারী মানুষদের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। আমি বলতে চাই এহেন প্রতীকী মনোভাব একইসঙ্গে উদারনৈতিকদের বিবেকমুক্তি এবং বিপ্লবের জন্য সব কিছুই করা হয়ে গেছে—এ জাতীয় ধারণার সৃষ্টি করে। নাটুকে ও অর্থহীন আড়ম্বর দেখানোর চাইতে অনেক ভালো কাজ হল প্রকৃত কাজ করা, তা যতই ছোট সীমার মধ্যে হোক। একথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টি সশস্ত্র হতে চায় এবং প্রকৃত আয়ুধ নিয়েই তা হতে চায়।

এই দলের সদস্যদের কাছে শান্তি ও অহিংসার বুলি কপচানো

ক্ষমাহীন অপরাধ। কারণ এটা হবে তার কাছে এক দৈবী ঔদার্যের কথা বলার সামিল, যে উদারতা কোনো শ্বেতাঙ্গ-র মধ্যে নেই এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাতেও এমন কোনো কিছুর সন্ধান পায়নি।

আমি বলতে চাই যে মার্কিনী বামপন্থীরা যদি সত্যিই বিপ্লবী হতে চায়, তাহলে ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির সঙ্গে ববি সিল বিষয়ে তাদের এক কদমে চলতে হবে। আর এ-ব্যাপারে যদি তারা অসম্মত হয়, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একধরণের ড্রেফুস-ঘটনাবলীর উদ্ভব হবে। ফ্রান্স ইয়োরোপ ড্রেফুস-ঘটনাবলি যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, এ হবে তার চাইতেও ক্ষতিকর। এখনই ঠিকঠাক জানার সময় হয়েছে যে, যেহেতু ববি সিল অপরাধী হিসেবে আইনের চোখে চিহ্নিত অথবা যেহেতু তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ও ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির সভাপতি —সেই কারণে, এবং যেহেতু পার্টিকে সহায়তা বা উৎসাহ দিতে বিপদ হবে, অ্যাগন্যু-র এই হুঁশিয়ারির ভয়ে বুদ্ধিজীবীরা কাঁটা হয়ে আছে কি না। এখন চারপাশের সবকিছুর ভেতর দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়ে চলেছে, যেহেতু ববি সিল কৃষ্ণাঙ্গ তাই আমরা পিছু হটছি, ঠিক যেভাবে ড্রেফুসকে অপরাধী বানানো হয়েছিল তাঁর ইহুদি-রক্তের জন্য।

ফ্রান্সে একসময়ে ইহুদী বলতে অপরাধী বোঝাত। এখানে, এমন এক সময় ছিল এবং এখনও আছে যে একজন নিগ্রো অপরাধী বলে চিহ্নিত।

এটা ঠিক যে প্রতিটি ক্ষেত্রে অংক মিলিয়ে ড্রেফুস-ঘটনাবলির সঙ্গে মিল খোঁজা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এখন পর্যন্ত আমেরিকায় বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনো ক্লেমেঁসু, জুরেস বা জোলা-র আবির্ভাব ঘটেনি, যার কলম জন্ম দেবে "জে' অ্যাকুস।" একটি "জে' অ্যাকুস"—যা দাঁড়াতে পারে এ-দেশের বিচার কক্ষগুলির পরস্পরের বিরুদ্ধে। দাঁড়াতে পারে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা বর্ণবিদ্বেষী—তাদের বিপক্ষে।

আমরা যখন ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির প্রসঙ্গ তুলি, তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বছর দেড়েকের মধ্যে এদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের হার বেড়ে হয়েছে ১ঃ৭ অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে নিপীড়নের মাত্রা সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর একটা বিষয় যা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তা হল ফ্যাসিবাদ—প্রায়ই ব্ল্যাক প্যান্থারদের মুখ থেকে ফ্যাসিবাদের কথা শোনা যায় এবং শ্বেতাঙ্গরা এই শব্দটিকে সহজে বরদাস্ত করতে পারে না। তার কারণ হল, কৃষ্ণাঙ্গরা কতখানি নিপীড়ক ও ফ্যাসিস্ত প্রশাসকের আওতায় বাস করে, তা অনুধাবন করতে গেলে একজন শ্বেতাঙ্গ-র পক্ষে রীতিমত কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। কালো মানুষের কাছে ফ্যাসিবাদ শুধু মার্কিন সরকারের কার্যকারণই নয়, তা হল প্রকৃত অর্থে সুবিধাভোগী গোটা শ্বেতাঙ্গ সমাজের নির্যাতনের দায়ভাগ।

মার্কিন মুলুকে শ্বেতাঙ্গদের ওপর সরাসরি দমননীতি প্রয়োগ করা হয় না। তা হয় কালোদের ওপর—মানসিকভাবে এবং রহস্যময় শারীরিক অর্থেও।

এই নিপীড়নের জন্য কালোরা সামগ্রিকভাবেই শাদাদের দায়ী করতে পারে এবং ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে উক্তি করতে পারে।

আমরা শ্বেতাঙ্গরা হয়তো এই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বাসিন্দা, কিন্তু কালো মানুষেরা চাক বা না-চাক বেঁচে আছে এক পিতৃতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ছায়ায়। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসার বোধ সঞ্চারিত হওয়া জরুরি। কিন্তু তারা স্বাধীনতাকে ভয় পায়। এটা তাদের পক্ষে বড্ড ঝাঁঝালো পানীয়। তাছাড়া তাদের মধ্যে আর একধরণের ভয় ক্রমশ ডাঁটো হয়ে উঠছে। তা হল—তারা কালো মানুষদের বোধবুদ্ধিকে প্রতিদিন আবিষ্কার করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমি কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর বিশ্বাস রাখি। বিশ্বাস রাখি ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির গৃহীত বিপ্লবী কর্মসূচিতে। প্রথম কথা, তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত মানুষই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, শ্বেতাঙ্গ মানুষজন, এমনকি মার্কিনিরা, এমনকি জনগণ বা তার পরেও যারাই আসুক, তারা কেবল নিজেদের বাইরের রূপেরই পরিবর্তন ঘটাতে পারে, ভেতরের নয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মানুষের স্বভাবের ওপর আস্থা রাখি, সে-মানুষ যদি খুবই সীমিত-সংখ্যক হয়, তবুও। ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির উদ্যোগ বাড়ছে, সাধারণ মানুষ ক্রমশই বেশি সংখ্যায় তাদের বুঝতে পারছে এবং শ্বেতাঙ্গ বুদ্ধিজীবীরা হয়তো তাদের সমর্থনও জানাতে পারে—এই কারণেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

ববি সিল প্রসঙ্গে আমি আবার বলছি, ড্রেফুস-জাতীয় আর একটি ভয়াবহ ঘটনা নতুন করে সংগঠিত হতে দেওয়া যায় না। সেই কারণেই আমি আপনাদের ওপর নির্ভর করে বলছি—দেশের বাইরেও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দিন, ববি সিল-এর বিষয়ে আলোচনা করুন, আপনাদের পরিবারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি আপনাদের ক্লাশরুমে। সব সময়ই প্রতিবাদ করবেন—তা সে পুলিশের মুখের ওপরই হোক বা অধ্যাপকের ওপরই হোক।

যেটা প্রয়োজন তা শুধু আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে নয়, প্রকৃত কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

আর ব্যাপারটা যদি এতদূর গড়ায় ধরুন, ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টি যদি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলে, গোটা দেশে ববি সিল-এর সপক্ষে ও বর্ণবিদ্বেষবাদের বিপক্ষে ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়, আপনাদের তাই-ই করতে হবে।

আপনাদের ডিপ্লোমা পরে—আগে ববি সিল-এর জীবন এবং ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। আপনাদের যে শারীরিক, মানসিক ও মেধাবী-সম্পদ আছে, তা নিয়ে এখনি আপনাদের সরাসরি জীবনের মুখোমুখি হতে হবে। সুখী অ্যাকুয়ারিয়াম-ঘেরা দুনিয়া ছেড়ে বেরিয়ে আসুন—অর্থাৎ বেরিয়ে আসুন সেই মার্কিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির চৌহদ্দি ছেড়ে, যেগুলি শুধু জলের ভেতর ফাঁকা

বুদবুদ তৈরি করতে সক্ষম এমন বাহারি সোনালি মাছেদেরই বংশ বাড়িয়ে চলে।

ববি সিল-এর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে আপনাদের ওপর, আর আপনাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নির্ভর করছে ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির ওপর।

('পরিশিষ্ট'—নিচের অংশটি নিউ হ্যাভেন-এ পড়া হয় নি, কিন্তু একই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে।)

যাকে মার্কিনি সভ্যতা বলে, তা মুছে যাবে। বস্তুত ইতিমধ্যেই এর মৃত্যু ঘটেছে, কারণ এই সভ্যতার ভিত্তিভূমি ঘৃণা। যেমন-বড়লোকের গরীবের ওপর, শাদাদের কালোদের ওপর ঘৃণা। অপমানের ওপর গড়ে ওঠা যে কোনো সভ্যতার ধ্বংস হবেই। নৈতিকতার প্রশ্নে নয়, আচরণবাদের প্রশ্নেই আমি 'ঘৃণা' শব্দটিকে ব্যবহার করছি। আমি বলতে চাইছি, ঘৃণা যদি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে চায় তবে তার মধ্যেই সে যে শুধু নিজের মৃত্যু নিয়ে আসে তা নয়, সে যা প্রসব করে তারও মৃত্যু ঘটে।

আপনারা বলতে পারেন আমি আমেরিকার ভেতরকার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। আমার তো মনে হয়, আমেরিকা যেমন সারা দুনিয়ার সব দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলায়, আমিও তেমনি আসলে ঐ প্রশাসনেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। আমেরিকা যেমন কোরিয়ার পর ভিয়েতনাম, তারপর লাওস আর এখন কাম্বোডিয়ার ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়েছে, আমিও আমেরিকার ব্যাপারে তাই করছি।

একটু অগোছালোভাবে হলেও আমি আমেরিকার নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির এবং সর্বোপরি সংবাদপত্রগুলির ভূমিকায় ধিক্কার জানাতে চাই। মার্কিনিদের কাছে যেভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয় তা পাক্কা বদমায়েসির নামান্তর। কারণ হয় এগুলিকে বিকৃত করে ছাপা হয়, নয়তো আসল খবরাখবর পুরোপুরি চেপে যাওয়া হয়। দি নিউ ইয়র্ক টাইমস লাগাতার মিথ্যে বলে চলেছে। ল্যুক ম্যাগাজিনটি খবর চেপে মিথ্যাচার করছে—ভীরুতায় ও সতর্কতায়। পঙ্গু মানসিকতা

নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনটিও। কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে তিনজন কালো মানুষ চারজন শাদা পুলিশকে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছিল, তার পটভূমি না জানিয়ে মিথ্যাচার করছে দূরদর্শন। তথ্যসংগ্রহের যাবতীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও যদি খবরের কাগজগুলি প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ করতে না চায় তবে আমেরিকার মানুষের ঘোর মূঢ়তার জন্য তাদেরই দায়ী করতে হবে।

এবার গির্জার প্রসঙ্গে আসি। এগুলির জন্ম এমন প্রাচ্যদেশীয় নীতিকাহিনীর ভিত্তিতে, পশ্চিমীরা যেগুলির মূল অর্থ বিকৃত করে দিয়েছে। গির্জা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিপীড়নের এক মাধ্যম। বিশেষত, এই প্রতিষ্ঠান কালোদের শেখাতে চেয়েছে তাদের প্রভু শ্বেতাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের খ্রিষ্টিয় বিনয়। ওল্ড টেস্টামেণ্ট সামনে রেখে এরা হুমকি দেয় বিদ্রোহীদের নরকের আগুনে ছুঁড়ে ফেলবার।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, রকফেলার ইনস্টিটিউট প্রভৃতি সর্বশক্তিমান কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে 'দাতব্য' প্রতিষ্ঠানগুলিকে। সাহায্য দানের মোড়কে নিহিত থাকে এদের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা।

ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। কারণ এগুলি আপনাদের শত্রু তো বটেই, তার চাইতেও যা বেদনার এগুলি হচ্ছে খোদ শ্রমিকদেরই শত্রু। কালোদের বিরুদ্ধে সংগঠিত আগ্রাসী বর্ণবিদ্বেষের যারা শিকার, তারাই জীবন ও জীবিকার প্রান্তসীমায় নিজেদের টিঁকিয়ে রাখার অদ্ভুত মূঢ়তায় উচ্ছিষ্ট ভোগের আনন্দে মশগুল।

আমি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ভুলে যাই নি। এরা আপনাদের মিথ্যে সংস্কৃতি শেখায়, একমাত্র সংখ্যাগত দিক দিয়েই মূল্যবোধকে বিচার করতে বলে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি গোটা মানুষকে রূপান্তরিত করে নিছক একটি সংখ্যায়, যেভাবে তারা জন্ম দেয়, ধরুন, ৫০,০০০ ইঞ্জিনিয়ারের। উপরন্তু এখানে শেখানো হয় নিরাপত্তা, তুষ্ণীভাব এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেইসব কর্তা ও রাজনীতিকদের

পদলেহন করতে, যাদের মোটা দাগের বুদ্ধিবৃত্তি আপনাদের অজানা নয়। এত বেশি মাত্রায় এসব তালিম দেওয়া হয় যার ফলে বিজ্ঞানী হতে গিয়ে আপনার সামনে থাকে একটি আরামকেদারা ও টেবিল—এবং টেবিলের অপর প্রান্তে—অবশ্যই একজন মাঝারি এলেমের রাজনীতিক। এতেই আপনি গর্বে ফেটে পড়েন।

এবার আমি অন্য এক প্রতিষ্ঠান—বাণিজ্যিক ও সংবাদপত্রের প্রচারসংস্থাগুলির সংগঠকদের প্রসঙ্গে আসতে চাই। নির্বোধ বিজ্ঞাপনে খবরের কাগজগুলি ঠাসা থাকে। দূরদর্শন চ্যানেলগুলিতেও তাই। ঐ সংগঠকরা পাছে খবরের কাগজ ও দূরদর্শন বয়কট করে, সেই ভয়ে সেগুলির পরিচালকেরা তটস্থ হয়ে যাবে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা সত্যি সত্যিই আপনাদের আন্দোলিত করে তা হল এক দানবিক কম্পন। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ভয় পায়। দুর্বলতমকে ভয় করে সবলতম। সবচেয়ে কম সচেতন লোক জড়বুদ্ধির মানুষের ভয়ে সন্ত্রস্থ। মার্কিনি প্রগতি বলে যাকে আখ্যা দেওয়া হয় তা আর কিছুই নয়, গোটা দেশ-কাঁপানো এক প্রবল আতঙ্কবোধ।

এই তালিকা শেষ করছি একটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গ তুলে—সেটি হল পুলিশবাহিনী। তারাও জনসাধারণকে ত্রস্ত করে থাকে। তারা ভয় দেখায় বটে, কিন্তু নিজেরাও ভীত থাকে। এরা নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব একটা নিশ্চিত নয়। দিন তিনেক আগে বৃদ্ধ জনসন তো বলেই বসলেন, কেনেডি-হত্যা মামলায় ওসওয়াল্ড-কে একমাত্র দোষী নির্ণয় করে ওয়ারেন কমিশন ঠিক কাজ করেনি। এখন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, পুলিশবাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা এই জনসন ব্যক্তিটি গোড়াতেই ওয়ারেন কমিশনকে এ-বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

এই যে বৈপরীত্য, এই উল্টোমুখো দৌড় এ হয়তো দম ফাটানো হাসির উদ্রেক করতে পারে। পিকিঙে হয়তো পেল্লায় হাসাহাসি চলছে-ও। কিন্তু শেষমেশ এখানকার যা পরিণতি অপেক্ষা করছে, তা একান্ত শোচনীয় এক পরিণাম।

ভাষান্তর : দেবাশিস সেন

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক

সৌরি ঘটক

(১)

স্বপ্ন দেখেছিলেম।

কবি যেমন বলেছিলেন "দুধের মত, মদের মত, পাগল করা রূপ, বেসেছিলেম ভাল"—তেমনি দুধের মত শুভ্র, মদের মত মাতাল করা, পাগল করা স্বপ্ন দেখেছিলেম।

স্বপ্ন দেখেছিলেম শুধু আমি নয়, পর পর কয়েকটি প্রজন্ম। শ্রাবনের মেঘমেদুর আকাশ ভেঙ্গে যেমন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে, তেমনি ঐ স্বপ্নের ডাকে আমরা হাজারে হাজারে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেম ঘর ছেড়ে। এসেছিলেম শ্রমিকের বস্তি থেকে, কৃষকের পর্ণকুটীর থেকে, নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘর থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে ছেড়ে, স্বচ্ছল সংসারের আরাম শয্যার মোহ ত্যাগ করে।

—'ঘরে ঘরে শূন্য হল
আরামের শয্যাতল
যাত্রা কর, যাত্রা কর
যাত্রী দল—'

সমস্ত বাধা, সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সংশয় ত্যাগ করে আমরা যাত্রা করেছিলেম!

স্বপ্নকে সমর্পন করেছিলেম জীবন।

কি রোমাঞ্চকর সে স্বপ্ন! আহো। চাঁদের কিরণের মত নির্মল, মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণের মত তপ্ত, সন্ধ্যার লাল দিগন্তের মত রক্তিম, সে স্বপ্নের মূল কথা হল দুশো বছরের পরাধীন ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন করব। প্রতিষ্ঠা করব শ্রমিক, কৃষকের রাজত্ব। শত সহস্র বছর ধরে যারা শূদ্র, যারা ব্রাত্য, যারা অচ্ছুত, যারা বঞ্চিত, শোষিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত তাদের প্রতিষ্ঠা করব মানুষের মহিমায়।

যে কোন শোষিত সমাজে দারিদ্র্য, অনশন, অপমান সাধারণ মানুষের জীবনে নিত্য ঘটনা। বাঘে বাঘ খায় না, বা ছাগলে ছাগল খায় না, কিন্তু

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শোষকরা শোষিতের রক্ত পান করে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটা হল সত্য, নির্মম সত্য।

শোষিত মানুষের শুধু একটাই ব্রত, তা হল তার শিকল ভাঙার সাধনা। খাঁচার পাখী যেমন মুক্তির আশায় সারাজীবন শুধু খাঁচার শিক কামড়ায়, তেমনি শোষিত মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুধু শোষণের বেড়িটা ভাঙার জন্য সংগ্রাম করে যায়।

শ্রেণী বিভক্ত সব দেশের সমাজে এই এক অবস্থা। আমাদের দেশে এর সঙ্গে যে উপরি পাওনা যোগ হয়েছে তা হল জাতিভেদ প্রথা। এখানে মানুষকে দেখলে পাপ, ছুঁলে পাপ, হাতে জল খাওয়া পাপ, এমনকি তার ছায়া স্পর্শ করাও পাপ। এদেশে গরু দেবতা আর মানুষ অচ্ছুত। এদেশে হনুমানের পূজা হয়, আর অচ্ছুতদের রক্তে লাল হয়ে যায় বেলচি, আড়োয়ালের মত শত শত জনপদ। এদেশের নুনের চেয়ে গরীবের খুন অনেক, অনেক বেশি সস্তা।

স্বপ্ন দেখেছিলেম এই অতল অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিনিয়ে আনব ফুটন্ত সকাল।'

সব মানুষের জীবনে একটা ব্রত থাকে, একটা লক্ষ্য থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে। শোষিত মানুষের মুক্তির এই ব্রত ছিল আমাদের প্রথম যৌবনের স্বপ্ন।

মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিরা প্রেমের গান গেয়েছিলেন :

ঘর কৈনু বাহির
বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন
আপন কৈনু পর—'

আমরাও সেদিন ঘরকে বাহির করেছিলেম, বাহিরকে করেছিলেম ঘর : পরকে আপন করেছিলেম, আপনকে করেছিলেম পর। আত্মীয় পরিজনভরা সংসার সেদিন হয়ে উঠেছিল অসহনীয়, সামাজিক বিধি বিধানগুলো হয়ে উঠেছিল শৃঙ্খল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমরা গড়ে তুলেছিলেম কমিউন।

কমিউনের জীবন। দারিদ্র্য আর বুভুক্ষা নিত্যসঙ্গী। রাষ্ট্রের আক্রমণের আশঙ্কায় সেই আস্তানার হাওয়া প্রতিনিয়ত কাঁপত থরথর করে। তবু সেই পরিবেশেও আমাদের অপরাজিত যৌবন অপরাজেয় সাহসে ফুটত টগবগ করে।

সেদিন আমরা সবাই ছিলাম কমরেড। আহো: কি ঝঙ্কার ঐ কথাটির। কি পবিত্রতা, কি মমতা, কি ভালোবাসা, কি আবেগ মাখা থাকত ঐ শব্দটির সঙ্গে। পথে, মিছিলে, ঘরে, বাইরে কেউ কমরেড বলে ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নীচে দুলে উঠত গোটা পৃথিবী, হাতে হাত চেপে ধরা মাত্র হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা সঞ্চারিত হয়ে যেত দুটি প্রাণে।

কমরেড। আমার কমরেড। পরিবার পরিজনের চেয়েও সে আমার অনেক-অনেক বেশি আপন। পরম নিশ্চিন্ততা আর চরম বিশ্বাসে দুটি হাতের সঙ্গে মিলে যেত দুটি প্রাণ।

সেদিন আমাদের শপথ ছিল শ্রেণীচ্যুত হওয়ার। মধ্যবিত্তের লোভ, আকাঙ্ক্ষা, শঠতা বিসর্জন দিয়ে যাপন করতে হবে শ্রমিকের সৎ জীবন।

তাই আমরা ঘর-ছেড়ে চলে গিয়েছিলেম শ্রমিক-কৃষকের ঘরে। তাদের সংগঠিত করার সাধনায়।

এই তপস্যায় নিঃশেষিত হয়ে গেল কত প্রাণ। সেই আত্মদানের বিনিময়ে তারা ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে নিয়ে এল কত নাম, কত গ্রাম, কত ঘটনা। গাড়োয়ান ধর্মঘট, চটকল ধর্মঘট, ট্রাম ধর্মঘট, ২৯শে জুলাই, তেভাগা, কাকদ্বীপ, সোনার অক্ষরে লেখা ইতিহাসের এক একটি পাতা।

কে চিনত কোথায় চন্দনপিঁড়ি কি বরাকমলাপুর? কে জানত অহল্যা আর সরোজিনীকে?

কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, অতল অন্ধকার থেকে উঠে এসে এই সব অবজ্ঞাত, অখ্যাত নরনারীরা হয়ে উঠবে ইতিহাসের নায়ক, এমন চ্যালেঞ্জ তারা ছুঁড়ে দেবে যাতে গোটা সমাজ থরথর করে কেঁপে উঠবে।

কেন তা সম্ভব হয়েছিল?

কারণ আমাদের স্বপ্নে আর কাজে কোন ফাঁকি ছিল না।

সেদিনের আদর্শে নিবেদিত দুটি প্রাণের কথা বলি।

দাশরথী চৌধুরী। বর্ধমান জেলার এক গণ্ডগ্রামে ছিল বাড়ী। কালো, একটু বেঁটে এই মানুষটিকে প্রৌঢ় জীবনে যখন দেখি তখনও সমান প্রাণচঞ্চল।

কমিউনে রান্নার হাঁড়ি মাজছেন, ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, ইস্তাহার লিখছেন, রেল শ্রমিক, গাড়োয়ান, ঝাঁকা মুটে, কৃষকদের মধ্যে অবিরাম সভা-সমিতি করে বেড়াচ্ছেন।

সেই ত্রিশের দশকে প্রথম যৌবনে যোগ দিয়েছিলেন গান্ধীজীর হরিজন-

আশ্রমে। হরিজন সেবা করতে গিয়ে মেথরদের সঙ্গে মাথায় করে পায়খানা ফেলতেন।

সেই জীবনের নানা মজার গল্প বলতেন তিনি। একবার পুরো হরিজন হওয়ার জন্য মেথর সর্দারকে বলে দিলেন সেদিন থেকে তিনি মেথর পাড়ায় থাকবেন আর তাদের ঘরে তাদের সঙ্গে খাবেন। সকাল থেকে ময়লা সাফ করে আসার পর খেতে গিয়ে দেখেন তাঁকে একলা খেতে দেওয়া হয়েছে। তিনি একটু অবাক হয়ে মেথর সর্দারকে ডেকে বললেন 'আমাকে একা খেতে দিলি কেন? তোরা খাবি না আমার সঙ্গে?'

মেথর সর্দার ঘাড় নেড়ে বলল—"না।"

—"কেন?"

মেথর সর্দার জবাব দিল—"দেখ্‌ বাবু, তুই ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে আমাদের সঙ্গে পায়খানা সাফ করছিস। তোর জাত নেই। কিন্তু আমাদের জাত আছে। আমরা মেথর। যার জাত নেই তার সঙ্গে আমরা খাব নাই।"

সেই দাশরথী চৌধুরী এলেন কমিউনিষ্ট পার্টিতে। উনিশশো আটচল্লিশের বে-আইনী যুগে আত্মগোপন অবস্থায় ট্রাম থেকে পড়ে হাত ভাঙল। ডাক্তার বলল, 'অপারেশন করতে, হাতটা বাদ দিতে, নইলে ক্যানসার হবে।"

তিনি হাত অপারেশন করালেন না। সোজা বলে দিলেন—'একটা হাত না থাকলে বিপ্লবের সময় বন্দুক ধরব কি করে? হাত আমি বাদ দেব না। তাতে যা হয় হোক।"

ক্যান্সারে মারা গেলেন তিনি। মরার দিন পর্যন্ত বুকে স্বপ্ন—'বন্দুক ধরব, বিপ্লব করব।"

একটি মধ্যবয়স্কা নারী। নাম যশোধা রাজোয়ার।

তখনও এদেশে পূর্ব বাঙলার হিন্দুরা এসে বসতি শুরু করে নি। বৃটিশের শাসন ও শোষণে দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বরে উজাড় হওয়া গঙ্গাঞ্চল হয়ে উঠেছিল এক অরণ্যবলয়। এই বনে তখন থাকত বাঘ, বনশুয়োর, বড় বড় ময়াল আর নানা ধরনের বিষাক্ত সাপ, শিয়াল, নেকড়ে আর ময়ূর থেকে আরম্ভ করে নানা ধরনের পাখী।

এলাকার বেশিরভাগটা ছিল অনাবাদী চর অঞ্চল। মাঝে দূরে দূরে চাষী আর গোয়ালা অধ্যুষিত গ্রাম, আর ছোট ছোট জমিদার। মাঝে মাঝে

বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান। জমিদারকে খাজনা দিয়ে এই চরগুলোতে গরু চরাত গোয়ালারা। চাষীরা চাষ করত কিছু কিছু জমি। প্রধান ফসল হত দুটো। এক ভাদ্র মাসে ভাদই ধান আর শীতের শেষে কলাই, ছোলা, মুশুরি প্রভৃতি রবিশস্য।

এখানে গঙ্গার ধারে ছোট ছোট পাড়ায়, যাকে ওরা বলত ধাওরা, বাস করত একদল মানুষ। স্থানীয় লোকেরা তাদের বলত বুনো। তারা ঠিক সাঁওতাল নয়, আবার বাঙালিও নয়। ভাষা ছিল অন্যধরনের। টান দেওয়া বাঙলা। মেয়েরা বাঙালিদের মত শাঁখা সিঁদুর পরত। প্রধান উৎসব ছিল শুয়োর শিকার।

এমনি এক বুনো ধাওয়ার মেয়ে যশোদা দিদি। পেশা—সকালে উঠে গঙ্গার চরে ঘাস কেটে, বিকেলে হাটে সেই ঘাস বিক্রি করে জীবন ধারণ করা।

আত্মগোপন অবস্থায় সেই যশোদা দিদির ঘরে মিলল আশ্রয়। বছর চল্লিশ বয়স, কালো পাথরে কোঁদা মূর্তির মত চেহারা, আদিবাসীদের মত অভিব্যক্তিহীন মুখ।

সকাল বেলা ঘরে আমার জন্যে এক বাটি পান্তা ভাত, একটা পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, জল আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য এককোণে একটা মাটির হাঁড়ি রেখে, একটা ঝুড়ি, একটা কাস্তে আর ঘাস বাঁধার জন্য একটা দড়ি নিয়ে বাইরে থেকে ঘরে তালা দিয়ে যশোদা দিদি বেরিয়ে চলে যেত ঘাস কাটতে।

সারাদিন আমি তালাবন্দী থাকতাম সেই ঘরে। পাড়ার লোকজন সেটা জানত। তবু আমাকে তালাবন্দী থাকতে হত কারণ দিনে বাইরের লোক আসত পাড়ায়। আসত জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। আসত গোয়ালাদের তরুণরা। মাঠে গরু চরাতে এসে তারা দুপুরে আস্তানা গাড়ত এই পাড়ায়। গাছের ফল, তরি-তরকারি থেকে তরুণী মেয়েদের যৌবন, অনেক কিছুর ওপরই ছিল তাদের লোভ।

পাড়ায় দু-একঘর ছোট চাষী, বাকিরা বেশির ভাগই নিঃস্ব ক্ষেতমজুর। বেশিরভাগ মেয়ে পুরুষ সকালে উঠে খাটতে বেরিয়ে যেত, ফিরত সন্ধ্যাবেলা। যশোদা দিদিও তাই করত। হাটে ঘাস বিক্রি করে গামছার কোণে বাঁধা চাট্টি চাল, একটা ছোট্ট শিশিতে দুপয়সার সরষের তেল, এক পয়সার নুন, জিরে হলুদ, আর ঝিঙে কি বেগুন জাতীয় কিছু আনাজ কিনে যশোদা দিদি যখন
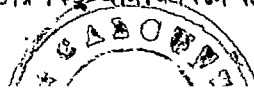
ঘরে ফিরে দরজার তালা খুলত তখন আদিগন্ত ঘন অন্ধকারে ছেয়ে নেমে আসত কালো রাত।

সকালে চাট্টি পান্তা খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া সারা দিনের শ্রমশ্রান্ত যশোদা দিদির মুখখানা তখন ঐ অন্ধকার রাতের মতই শুখনো, থমথমে।

ঘরে ঢুকে যশোদা দিদির প্রথম কাজ ছিল জিনিসপত্র রেখে আমার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া ময়লা হাঁড়ি বাইরে বের করে দেওয়া।

এটা সে কিছুতেই আমাকে করতে দিত না। তারপর গামছা নিয়ে চলে যেত গঙ্গার ঘাটে। ভিজে কাপড়েই রান্না ও খাওয়ার জন্য নিয়ে আসত দু তিন কলসি জল। তারপর কাপড় ছেড়ে, কাঠি-কঞ্চি জ্বেলে, উনোন ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে দিত। ঝিঙে সেদ্ধ কি বেগুন সেদ্ধ ভাত। তাতে যদি কোনদিন দু পয়সার কুচো চিংড়ি কি পুঁটি জুটতো তো সেদিন হয়ে যেত ভাইবোনের ভোজ।

ঘরের মেঝেয় বসে দেখতাম উননের গন্‌গনে আগুনের লাল আলো পড়েছে যশোদা দিদির সদ্যস্নাত মুখের ওপর, ভিজে চুল লুটিয়ে থাকতো পিঠে,- দেখে মনে হোত শিল্পী রামকিঙ্করের খোদাই করা একটি সাঁওতাল রমণীর মুখ।

যশোদা দিদি দ্রুত হাতে হয়তো শাক পাতা কুটছে, কি ভাতে জল দিচ্ছে। তারপর রান্না যখন শেষ হয়ে আসতো তখন পাড়ার অন্য কমরেডরা চারিধার দেখে-শুনে এসে নিশ্চিত নিরাপত্তার খবর দেওয়ার পর বেরিয়ে আসতাম ঘর থেকে। গঙ্গা থেকে আনা যশোদা দিদির কলসীর জলে স্নান করতাম, খেতাম। তারপর রাত নিশুতি হলে বেরিয়ে পড়তাম অন্য গ্রামে সভা, বৈঠক করতে।

এধার ওধার ঘুরে ফিরে এসে কত রাতই না কাটিয়েছি যশোদা দিদির ঘরে। কতদিন গভীর ঘুমে অচৈতন্য যশোদা দিদির পাথর কোঁদা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি নিষ্পলক চোখে।

বাইরে থমথম করতো নিশুতি রাত, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সুপ্ত পাড়াটি নিঃশব্দ, কদিচ কখনও অনেক দূরের গ্রাম থেকে ভেসে আসত একটা কুকুরের অস্পষ্ট ডাক, হয়তো কোন পেঁচা উড়ে যেত কর্কশ চিৎকার করে, উঠোনের পেয়ারা গাছে ঝটপট করতো বাদুড়, মাঠে শেয়াল ডাকতো, গঙ্গার বুকে জেলেদের মাছ ধরার নৌকার দাঁড় ফেলার ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠত, ঘরের ফুটো চাল দিয়ে এক চিলতে আলোর আভা পড়ত ঘুমন্ত যশোদা দিদির মুখের ওপর।

কোন লালসা বা কামনা নিয়ে নয়, যশোদা দিদির ঘুমন্ত মুখের দিকে

তাকিয়ে শুধু ভেবেছি, নিরক্ষর এই মেয়েটি রাজনীতি কি মার্কসবাদের অ, আ, ক, খ জানে না। কিন্তু কেন সে আমার বা অন্য কমরেডদের এত সেবা করে, কেন সে আমাদের এমন করে বুক দিয়ে আগলে রাখে।

পরে বুঝেছি, আমাদের কাছে একটা অন্য জীবনের স্বপ্নের খোঁজ পেয়েছিল 'যশোদাদিদির মন।' সেটা হল—'দিন আসবে। সুন্দর একটা দিন, যেদিন অবসান হবে এই অপমানিত জীবনের, অবসান হবে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের হামলা, আর ধর্ষিতা হতে হবে না তাদের হাতে। একটু সুখ, একটু শান্তির মুখ দেখবে জীবন—'

তারপর ?
কতদিন বয়ে গেল।
বয়ে গেল বছরের পর বছর।

আর এই দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরে এলোমেলো হয়ে গেল সব-কিছু। আজ শুধু বারবার মনের মধ্যে গুন গুন করে কবিতার সেই পংক্তি গুলো

"যে সংকল্প লেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে দিয়েছিল দেখা
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, যে আজি শতধা,
সে আজ সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয় সংকুল
সে আজি সংকট মগ্ন… !"

দাশরথি চৌধুরী কি যশোদা দিদির মত গ্রামে-গঞ্জে, কলে-কারখানায় শহরে-নগরে হাজার হাজার মানুষ যে আত্মদান করে গেলেন তাঁদের স্বপ্ন দেখায় কি ভুল ছিল ?

কিন্তু লেনিনও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি বলেছেন 'আমরা এই স্বপ্নই দেখবো।'

তারপর পিসারেভের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন 'মানুষ যদি স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে কোন প্রেরণা সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং বাস্তবে একটা ব্যাপক ও কঠিন কাজ হাতে নিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে তা আমি আদৌ কল্পনা করতে পারি না ;"

একটি সুন্দর জীবন মানেই তো একটি মহৎ স্বপ্ন।

তুলোর বীজ যেমন হাওয়ায় ভর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যায় দূরে বহুদূরে, সেখানে মাটিতে পড়ে অঙ্কুরিত হয় সে বীজ, তেমনি যে কোন মহৎ স্বপ্ন দেশ, কাল, সময়ের গণ্ডী অতিক্রম করে পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে।

সেই স্বপ্নের ডাকেই তো মানুষের ঘুম ভাঙে, তারা পথ চলে, রচনা করে নূতন থেকে নূতনতর ইতিহাস। (ক্রমশঃ)

পাবলো নেরুদা ও স্পেনের অন্যান্য কবিতা

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

"যে-কবি বাস্তবকে অস্বীকার করেন, তিনি মৃত—আবার যে-কবি শুধুমাত্র বাস্তবকেই স্বীকার করেন, তিনিও মৃত"। পাবলো নেরুদার এই উচ্চারণ আমাদের সামনে কবিতার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। কবিতা শিল্পের অন্তঃস্থ শক্তি, বাস্তবের মেদকে অস্বীকার করেই সে চালিত হয় মানুষের হৃদয়ে। যে বাস্তব আমাদের ঘিরে থাকে, কেবল তার অনুকরণ নয়। সেই বাস্তবকে জীবন্ত করে কবিতা, আমাদের চিন্তায়, অনুভবে। চিন্তার বর্ণাঢ্যতা যেন প্রকাশ পায় শিল্পভাষার ছন্দে। নেরুদার এই কথাগুলি যেন মনে করিয়ে দেয়ঃ শুধু বাস্তবের উদ্‌ঘাটন নয়, আমাদের রাত চাই, জোয়ারের সমুদ্রের ফুলে ফুলে ওঠা অস্থির অন্ধকার আবেগের রাত। আবার বাস্তব-বর্জিত কোন স্বপ্নপুরী নয়, আমাদের দিনও চাই, প্রখর সূর্যালোকে দীপ্ত পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির দিন।

আবার যিনি বাস্তব ও অবাস্তবতার মাঝখানে বেছে নিতে চান মধ্যবর্তী কোনো পথ, তার প্রতি আমাদের সতর্ক থাকতেই হয়; কারণ জীবনের সামান্যতম উপাদানের মধ্যেও তিনি আবিস্কার করতে পারেন চরম বিস্ফোরণ, ব্যক্তিগত ও অবাস্তব কিছু আবেগের মুহূর্তকেও তিনি বদলে পারেন বৃহত্তর কোন উপলব্ধিতে তথাকথিত অবাস্তব ঘটনাকে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে, অথবা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে অনুসম উপলব্ধিতে নিজের অন্তর্জগতে স্থাপন করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্পের প্রকৃত বোধ। এই চেতনাই নেরুদাকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মান; সাদরে বরণ করেছে সাম্প্রতিক পৃথিবীর অন্যতম গণকবি হিশেবে। অন্যদিকে, এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে কবিতাকে মানুষের যন্ত্রণার সঙ্গী করতে পেরেছিলেন তিনি; তাই শুধু স্পেনই নয়, পৃথিবীর তাবৎ ভাষায় অনূদিত হয়েছেন—বরং বলা

যায়, তাঁর কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে ধন্য হয়েছেন অন্যান্য ভাষার মানুষেরা। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যেই খ্যাত-অখ্যাত অনেক কবিই নেরুদাকে অনুবাদ করেছেন। তাঁদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, নিছক অনুবাদের জন্যই নয়, আদর্শগত একটা তাড়না থেকেই তাঁরা নেরুদার অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছেন। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেরুদার আজীবন সংগ্রাম, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে; তাই হয়তো সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় অথবা রাম বসুর মতো শ্রদ্ধেয় কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল নেরুদার কবিতার ভাষান্তরের কাজে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এর মাধ্যমে বাংলা কবিতাকে যতখানি সমৃদ্ধ করেছেন, ব্যক্তিগত চিন্তার জগতেও সমানভাবে সমৃদ্ধ হয়েছেন তাঁরা। এঁদের পাশাপাশি, সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে অশোক রাহার 'পাবলো নেরুদার কবিতা'। বিদেশী কবিতার প্রতি উৎসাহীদের কাছে এটি একটি বড়ো খবর নিঃসন্দেহে। কারণ, অনুবাদকের ভাষায়ঃ "যে-কোনো ভাষায় নেরুদার মতো বিশ্ববরেণ্য কবির কবিতাবলীর অনুবাদের সংখ্যা যত বাড়ে, সেই ভাষা সাহিত্য ততই সমৃদ্ধ হয়।"

প্রাথমিকভাবে, একজন অনুবাদকের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, অনূদিত কবির প্রতিনিধিমূলক কবিতাগুলিকে বেশি প্রাধান্য দেয়ার। সম্পূর্ণ অন্য ভাষায় কবিকে, তিনি যতই পরিচিত হন, তাঁকে পাঠকদের কাছে সামগ্রিক একটি চেহারায় তুলে ধরার কাজটিই প্রধান। অশোক রাহা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন এদিকে, ফলে আলোচ্য সংকলনে নেরুদার মোটামুটি একটা আদল পাওয়া যায়। দক্ষিণ চিলির সান্তিয়াগো তেমিউকো অঞ্চলে বসবাসকারী নেরুদা যখন এক নিঃসঙ্গ সাতাশ বছরের যুবক, তখন প্রকাশিত হয় 'বিশটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' কাব্যগ্রন্থটি। পরবর্তীকালে যে মহীরুহটি একাত্মবোধ করবে অগণিত মানুষের সঙ্গে, শ্রমজীবী মানুষের স্বেদসিক্ত যন্ত্রণাকে মুছিয়ে দেবে যাঁর কবিতা, ভবিষ্যতের সেই নেরুদার চেতনা-সংগঠনের কাজটি শুরু হয়েছিল সেই যৌবন থেকেই। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়ে যিনি উচ্চারণ করেন ঃ

'দক্ষিণের তারাদের কোলে কে লেখে তোমার নাম অস্পষ্ট অক্ষরে ?
দেখি আমি মনে পড়ে কিনা তোমাকে যেমন ছিলে অস্তিত্বের আগে।'

কবিতার মধ্যে যে অস্তিত্ব ছায়া হয়ে লুকিয়ে আছে, তাকে কি আমরা শরীরসর্বস্ব নারী বলে ভুল করব ? নারী হয়তো ভালবাসার আঁধার, কিন্তু নারীই তো সম্পূর্ণ ভালবাসা নয়। এক কল্পমূর্তির কাছে ভালোবাসাকে

আশ্রয় করে নেরুদা তখন অক্লান্তভাবে পৌঁছতে চাইছেন এই বিশ্বের কেন্দ্রে। যেখানে মহাবিশ্বের দ্যোতনায় বিরাজমান আবহমান মুক্ত মানবের ছবি, সামাজিক শোষণ ও মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন। ভালবাসার আরম্ভ হয়তো নারীসত্তার, কিন্তু সামগ্রিক এই অন্তরীক্ষের ভালবাসাকে ধারণের ক্ষমতা কি তার আছে? তাই হয়তো কয়েকদিন পরেই নেরুদাকে বলতে হয়:

'আমি ধ্যানমগ্ন হই ঋতুর বিস্তারের মধ্যে—নিঃসঙ্গ একাকী,
কেন্দ্রগত, শব্দহীন ভূগোল পরিবেষ্টিত
আকাশ থেকে নামে এক অসমাপ্ত তাপমাত্রা
আমাকে ঘিরে জড়ো হয় এলোমেলো ঐক্যের এক চূড়ান্ত সাম্রাজ্য।'

পরবর্তী সময় নেরুদার কেটেছে উত্তাল সামাজিক স্রোতে। লোরকার সঙ্গে বন্ধুত্ব. বামপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, স্পেনে ফাসিস্ত শক্তির রণহুংকার এইসব ঘটনা আমূল বদলে দিয়েছিল তাঁর জীবনকে। স্পেনে প্রতিবাদী কবিতার যে ঐতিহ্য, নেরুদা বুঝি অজান্তেই এগিয়ে গেলেন তার দিকে। এমনকী মুক্তিসৈনিকের ভূমিকা গ্রহণেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। এই তীব্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ-কবির ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হল 'সাধারণের গান' কাব্যগ্রন্থ। অত্যাচার ও অনাচারের মূর্ত প্রতিবাদে কবিগুলি অনায়াসেই হয়ে উঠল মুক্তিকামী মানুষের প্রতীক। যে ভালবাসা অঙ্কুরিত হওয়ার অপেক্ষায় ধারণ করেছিল কল্পমূর্তি, সেই আবেগই মুক্ত হল লক্ষ মানুষের আবেদনে: 'সঙ্গাহীন নই আমি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন রাতে আমি জনসাধারণ, অগণিত জনসাধারণ'। নেরুদা অবশেষে নিজেকে অভিন্ন করে তোলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। নিরসঙ্গতার যন্ত্রণা পেরিয়ে তখন তাঁর চারপাশে অগণিত মানুষ। অহং-এর আবরণ খসিয়ে সমষ্টির সঙ্গে একাত্মতার এই যাত্রাপথ মোটেই সমতল নয়। একই সঙ্গে দুটি ধারাকে নেরুদা মিশিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়, একদিকে স্পেনের আদিম ঐতিহ্য, অন্যদিকে তিনিই আবার জনগণের হৃদয়ের নিকটতম কবি। বর্তমানের বিশ্বে আমরা যখন জানি, এই দুই ধারার অহি নকুল সম্পর্ক, তখন অবাক হতেই হয়, যখন নেরুদা লেখেন: 'পৃথক করে কে তাকে চিনবে যদি সে বিলীন হয়ে থাকে এক সমগ্রতায় মৃত্তিকা, অঙ্গার, বা সমুদ্র, মানুষের বেশ ধরে?'

অনুবাদক হিশেবে অশোক রাহা নেরুদার বিভিন্ন সময়ের কবিতা ধরলেও, কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমায় তাঁকে চিহ্নিত করেননি। ফলে অনুবাদকর্মের পিছনে কোনো বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। এর বদলে, তিনি যদি নেরুদার

জীবনের কোনো বিশেষ সময়কে ধরে সংকলনটি সাজাতেন, তা হয়তো আরও অর্থপূর্ণ হত। আবার যেহেতু এর আগে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত কবি নেরুদার অনুবাদ করেছেন, ফলতঃ অনুবাদের মূল্যায়ণে একটি তুলনামূলক আলোচনা চলেই আসে। অশোকবাবুর অনুবাদ অনেকক্ষেত্রেই সাবলীল, কিন্তু কবিতাকে কবিতা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তিনি অসফল। অর্থাৎ মাঝে মাঝে ভাষাগত অস্বচ্ছতা প্রত্যক্ষ সংযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত কয়েকটি পংক্তি এই বক্তব্যের সমর্থনে রায় দেবে। কবিতার নাম : 'মাদ্রিদে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড'—

'সকালটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা
শীতের সেই মাসটা ছিল ভারি কষ্টের, কাদায় আর ধোঁয়ায় মলিন,
হাঁটু না থাকা একটি মাস, অবরোধ আর দুর্ভাগ্যে বিষন্ন একটি মাস'
[সুভাষ মুখোপাধ্যায়]

অশোক রাহার অনূদিত একই কবিতা :

'একটি হিমশীতল মাসের সকাল
যন্ত্রণাময় মাসের, কাদা ও ধোঁয়ায় মলিন
সে মাসের জানু অশক্ত-অক্ষম
অবরোধ আর দুর্ভাগ্যের এক বেদনাময় মাস।'

দুটি কবিতাকে পরপর পাঠ করলে একটি তফাৎ চোখে পড়ে। অশোকবাবুর গ্রন্থের খামতি এইটুকুই। তবু অনুবাদকের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি তিনি আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

যে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে নেরুদার কবিতার সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে; স্পেন দেশের কবিতার সেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে আমরা আধুনিক কবিতাকে বিশ্লেষণ বা অনুভব করতে পারি না। বাংলা সাহিত্যের তরুণ প্রজন্মের সামনে স্পেনের কবিতার বিশাল ভাণ্ডারের সামান্য অংশকে হাজির করেছেন শিবেন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর 'স্পেনের কবিতা' নামক অনুবাদ গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রায় সতেরশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সাম্প্রতিককালের নেরুদা পর্যন্ত বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিতা স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। এর মাধ্যমে স্পেনের কবিতার একটি ধারাবাহিক উত্তরণ, বিষয় ও আঙ্গিকে, লক্ষ্য করা যায়। কবিদের তালিকায় আছেন ম্যানুয়েল

হোর্হে ওথো, মিগুয়েল দ্য উনামুনো থেকে শুরু করে রাফায়েল আলবার্তি ও সালি সুমাচোরো প্রভৃতি আধুনিক কবিরা। মাঝে আছেন লোরকা, আল্রাদে অথবা পাবলো নেরুদার নাম।

গ্রন্থের শুরুতে অনুবাদক স্পেনের কবিতা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেখানে প্রাচীন যুগের থেকে আধুনিক কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত চেহারা পাওয়া যায়। স্পেনের কবিতার বৈশিষ্ট্য তিনি দেখেছেন এইভাবে ঃ 'কাব্যের মধ্যেই ফুটে ওঠে জাতীয় চরিত্র। স্পেনের কবিতার একদিকে দুরন্ত ভাবাবেগ, অন্যদিকে ঔদাসীন্য ও আদিমতার প্রকাশ'। এর মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছে নবজাগরণের বীজ। তবে যে কবির হাতে স্পেনের কাব্য-জগতের আধুনিকতার সূত্রপাত, সেই রুবেন দারিও-র কবিতার অনুপস্থিতি সংকলনটিকে কিছুটা কমজোরী করেছে।

শিবেন চট্টোপাধ্যায় নিজে কবি। সুতরাং তাঁর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হয়। কিন্তু অস্বীকার করতেই হবে, সংকলনটির পেছনে বিশেষ কোন চিন্তা-ভাবনা লক্ষ্য করা যায় না। এলোমেলো ভাবে কয়েকজন কবির কবিতাকে গ্রন্থভুক্ত করলেই তা নিশ্চয়ই সংকলনের মর্যাদা পায় না। বরং অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি অনেকাংশে সৎ থাকার চেষ্টা করেছেন। প্রধানত তিনি বেছে নিয়েছেন ছন্দপ্রধান কবিতাই ; এবং ভাষা ও পরম্পরাগত জটিলতা এড়িয়ে মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন ছন্দকেই। ফলে কবিতাগুলি বুদ্ধির বদলে আমাদের আবেগকেই বেশি আলোড়িত করে ঃ

> 'ওহো কি দীর্ঘ দুঃসহ ঐ পথ
> কী সাহস নিয়ে আমার অশ্ব ছোটে
> করডোবা কাছে পৌছানো আগে
> মৃত্যু দুহাতে তাকে
> নির্জন পথ
> করডোবা বহুদূরে।' [অশ্বারোহীর গান ঃ লোরকা]

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ বছর আগে। সাম্প্রতিক দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়েছে কবিদের পরিচিতি। আলোচনার শেষে তাঁর অনুবাদের একটি প্রবণতার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনূদিত কবিতায় অনুবাদক নিজস্ব ভাষার কোনো বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করবেন, না কি বিদেশী কবির কবিতাকে হুবহু তুলে ধরাই অনুবাদকের কাজ—এ নিয়ে আমাদের দেশে বিতর্ক হয়েছে বহু। বিতর্ককে এড়িয়ে গিয়েও বলা যায়,

আমরা বিদেশী কবিতার অনুবাদ পড়তেই বেশি উৎসাহী, অনুবাদকের বিদেশী অনুষঙ্গে লেখা কবিতা পড়তে নয়। শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের ঝোঁক কিন্তু অনুবাদের মধ্যে নিজের কবিসত্তাকে জাহির করার দিকে। এমন কী, বইয়ের শেষে তিনি উল্লেখ করেছেন: 'কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, বাংলা দেশেরই কোন কবির কবিতা পড়েছি'। তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে কবিদের নামগুলি বিদেশী কেন? কেন গ্রন্থের নাম স্পেনের কবিতা?

পাবলো নেরুদার কবিতা
অনুবাদ: অশোক রাহা
পরিবেশক: প্রাইমা পাবলিকেশনস্। কলকাতা। দশ টাকা

স্পেনের কবিতা
অনুবাদ: শিবেন চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশক: দে বুক স্টোর। কলকাতা। আট টাকা

গোপাল হালদার পঁচাশি পেরোলেন

দেবীপদ ভট্টাচার্য

১৯৮৭ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে গোপাল হালদার মহাশয়ের, আমাদের গোপালদার, পঁচাশি বছর পূর্ণ হল। তাঁর স্বরচিত আত্মস্মৃতি 'রূপনারাণের কূলে' বইটি থেকে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা আমাদের জানা হয়ে গেছে। তবু মনে হয় আমাদের অনেকের জানা নেই গোপালদার রচিত সনেটের কথা। যতদূর মনে পড়ে বৃটিশের জেল-ফেরত গোপালদা এই ১৯৪১-৪২ পর্বে তখনকার বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের নাম-করা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিলীপ সান্ন্যাল সম্পাদিত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্র সমসাময়িক পত্রিকায় কয়েকটি (মনে হচ্ছে তিনটি) সনেট প্রকাশ করেন। অনবদ্যাঙ্গী সনেটগুলির কোনো কোনো চরণ আজো আমাদের স্মৃতির জমিতে ছাপ রেখেছে। তারপর তাঁর লেখা কবিতা আমার চোখে পড়েনি। গোপালদার রচনাবলী প্রকাশ কালে এই সনেটগুলিকে যেন আমরা ভুলে না যাই।

তেমনি এখনকার অনেকেই জানেন না বিজন ভট্টাচার্যের রচিত ও অভিনীত 'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষ তাড়িত এক দরিদ্র বৃদ্ধ মুসলমান চাষীর ভূমিকায় গোপালদার অভিনয়। তিনি ঠিক নামেননি, তাঁকে নামানো হয়েছিল। ডোরাকাটা ছিন্ন লুঙ্গি আর জীর্ণ মলিন গেঞ্জি নিয়ে মহানগরে ক্ষুধার্ত নরনারীদের তিনি অনুনয়ের সুরে একটানা বলতে লাগলেন 'তোরা সব গাঁয়ে ফিরে যা'! তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে যেমন অবিভক্ত বঙ্গে পঞ্চাশ বছর মেয়ে-পুরুষ-ছেলে-বুড়ো মরেছিল ভাতের অভাবে, তেমনি সেবার প্রচুর ধান হয়েছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাই লিখেছিলেন—

মাঠের সম্রাট দেখে
মুগ্ধনেত্রে ধান আর ধান।

অনেকের জানা নেই আচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর শিষ্য ভক্ত গোপাল হালদারের ঐতিহাসিক বাক্‌যুদ্ধ। সুনীতি বাবু গোপালদাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন, পণ্ডিত হিশাবে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবিত 'বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি'র প্রস্তাব (যার সদর্প বিরোধিতা করেছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত) যখন কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সমর্থন প্রাপ্তির জন্য পেশ করা হয়, তখন সুনীতিবাবু ঐ প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করলে গোপাল হালদার সুনীতিবাবুর উত্থাপিত প্রত্যেকটি যুক্তি স্বীকৃত তথ্যের তীর ছুঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। বিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গে এখন লুপ্ত) তখন চেয়ারম্যান সুনীতিবাবু আর সদস্য ছিলেন গোপালদা। সেখানেও বাক্‌যুদ্ধ গুরু-শিষ্যে কম হয়নি। তবু তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেখিনি। এই ছিল সেদিনের মূল্যবোধ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিশাস্ত্রী পন্থী দল ছিল 'অনুশীলন সমিতি', তার থেকে হয় 'যুগান্তর'। এই 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ছিলেন কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা 'কিরণদা'। গোপালদা 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেকথা সকলেরই জানা। কিরণ দা 'সরস্বতী লাইব্রেরী'র ছদ্মবেশে রাজনীতিক সংগঠন চালাতেন। তিনি মার্কসের 'ক্যাপিটাল' বই বিক্রি করলেও ছিলেন ঘোর কমিউনিস্টবিরোধী, কিন্তু গোপাল হালদারের নিন্দা করলে লাঠি নিয়ে মারতে আসতেন। বলতেন 'গোপাল আমাদের ছেলে।' ১৯৪২ সালে 'জনযুদ্ধনীতি' ঘোষণার ও অগাষ্ট আন্দোলনের যুগে গোপালদাকে কংগ্রেসের ছেলেরা একদিন লাঞ্ছনা করায় 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর কংগ্রেসী নেতা অমরকৃষ্ণ ঘোষ (১১৬ বিবেকানন্দ রোড) তাঁর দলের ছেলেদের বাধ্য করেন গোপালদার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে। কিরণদাকে দেখেছি গোপালদাকে সস্নেহে 'লজেন্‌স' খাওয়াতে।

গোপালদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় কোনো সাহিত্যসভায় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নয়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার যশোহর জেলা কমিটির আয়োজিত এক প্রকাশ্য অধিবেশনে। যশোহর কৃষকসভার নেতা ছিলেন তখন সুশীলকুমার বসু (পাঁজিয়া গ্রাম, মনোজ বসুর বাড়ি)। উকিল কৃষ্ণবিনোদ রায়, জেলা বোর্ডের সহ সভাপতি ওয়ালিউর রহমান (তিনি সৈয়দ নওশের আলীর সহযোগী) প্রভৃতি ব্যক্তিরা জেলা কৃষকসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোপালদা গিয়েছিলেন বক্তা রূপে। সেই যে আলাপ চলে গত পঁয়তাল্লিশ বছর তা অটুট রয়ে গেছে। তারপর গোপালদা বিবাহ করলেন অরুণা সিংহকে। বউদি আমার চেয়ে উপরে পড়তেন, তখন প্রায় সন্ন্যাসিনী ছিলেন। একদিন ১৪৫ বি বিবেকানন্দ রোডের বাসায় গিয়ে দেখি, গোপালদা কোনো সভায় যাবেন, কিন্তু তোরঙ্গ খুলে দেখা গেল অবিচ্ছিন্ন কাপড়জামা এক প্রস্থও নেই। বউদি সূচ-সুতো নিয়ে তখনই বসে গেলেন ছেঁড়া-কাটা জায়গাগুলি দ্রুত সেলাই করতে। তারপর গোপালদা বেরুলেন। গোপালদা

যে তাঁর দৈহিক সুস্থতা ও বুদ্ধিগত তারুণ্য হারাননি তার জন্য বউদির কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি।

আমি নিজেকে সুখী বোধ করেছিলেম যেদিন আমাদের 'শরৎ সমিতি' থেকে তাঁকে 'শরৎ পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ঔপন্যাসিক হিসাবে। গোপালদার 'একদা' উপন্যাসের প্রথম যোগ্য সমালোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের কথা তুলেছিলাম, আমাকে জোরালো সমর্থন দান করেন অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। গোপালদা যে 'ঔপন্যাসিক' হিশাবে আমাদের কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী, 'শরৎসমিতি' প্রথম তার প্রতিষ্ঠা ঘটাল।

গোপালদা চিরদিন মনের তারুণ্য রক্ষা করেছেন, তাঁর স্বভাবের মতো তাঁর রচনাও কখনো উগ্রতা বা হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। অতিবাম বিচ্যুতি থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করেছেন নিন্দাবাদ সত্ত্বেও। তিনি কখনো কারো কাছে কিছু ভিক্ষা করেননি, কোনো 'সুযোগ' গ্রহণ করেননি তাঁর পার্টির কাছ থেকে। যদু-মধু 'সাহিত্য' 'সংস্কৃতি', 'শান্তি'র প্রতিনিধিদলে স্থান পেয়ে রাশিয়া ও পূর্ব-য়ুরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মাতব্বরি করেছেন, তখন সে-সব দলের সদস্যরূপে এই সৎ পণ্ডিত বিনয়ী ত্যাগী কর্মীর স্থান হয়নি। তাঁর গুরু ও বন্ধু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জেদে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী রূপে তিনি তাসখন্দে গিয়েছিলেন, সেদিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তাঁকে পাঠাননি। এ ক্ষোভ তাঁকে প্রকাশ করতে দেখিনি এমনি তাঁর চরিত্রের শক্তি। গোপালদা পঁচাশি বছর পূর্ণ করলেন সগৌরবে, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, চিন্তার গভীরতায় এখনো তিনি দীপ্যমান, বয়স তাঁর দেহে অনিবার্য ছাপ রাখলেও মনে তিনি রয়েছেন 'চিরযুবা, তুই যে চিরজীবী'।

দস্তয়েভস্কির শেষ ভালোবাসা

সের্গেই বেলভ

(পূর্বানুস্মৃতি)

দস্তয়েভস্কির জুয়ার নেশা তাঁর জীবনের বিষাদ-করুণ দিকের ভারসাম্য বজায় রাখারই একটা বিষয়। চল্লিশ বছরের জীবনের দশবছর তিনি কাটিয়েছেন জেল হাজতে, এবং নির্বাসনে। তিনি ফাঁসির মঞ্চের উপর টিকে থেকেছেন—অপেক্ষা করে গেছেন দণ্ডাদেশ কার্যকরী হবার জন্যে। তাঁর প্রথম বিয়েটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর নিজের কোন ছেলেপুলে ছিল না। নাক পর্যন্ত তিনি দেনায় ডুবেছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন গুরুতর ভাবে অসুস্থ।

তাঁর মেধা ছিল সব সময়ই সৃজনী ভাবনায় ভরা। যতক্ষণ না তিনি জুয়া খেলা শুরু করেছেন, 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসটি লেখাও শুরু হয় নি। অন্য কোন চমৎকার পরিকল্পনাকে এছাড়া তিনি কি সার্থকতার মুখ দেখাতে পারতেন ?

আন্না খুব দ্রুতই বুঝতে পারলেন, দস্তয়েভস্কির জুয়া খেলাটা তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাত্রা থেকে পলায়নের উপায়-বিশেষ নয়, এটা ছিল খুব গুরুতর ভাবেই তাঁর প্রেরণা লাভের একটা দিক। ডাহা হেরে এসে দস্তয়েভস্কি নিজেকে তাঁর কাজের মধ্যে সিঁধিয়ে দিতে পারতেন আর লিখে যেতে পারতেন তাঁর চমৎকার উপন্যাসের পাতার পর পাতা।

কুড়ি বছর বয়সেই আন্না তাঁর লেখক স্বামীর জুয়ার খেলার প্রতি এই আন্তরিক অনুরাগের 'গূঢ় গোপন' চাবিকাঠিটি চিনে ফেলেছিলেন (সম্ভবতঃ তিনি ও তাঁর মতই দূরদর্শিতা এবং সম্ভাব্য মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে ধারণা করার দৈবীদানে অধিকারিণী ছিলেন—অন্তত তাঁর কন্যা তাঁর 'দস্তয়েভস্কি এ্যাজ সিন বাই হিজ ডটার' গ্রন্থে একথাটা মাঝে মধ্যেই নির্দেশ করেছেন)। আন্না দেখেছেন তাঁর এই জুয়ার টানটাই ধারাবাহিক ভাবে তাঁর সংসারকে দারিদ্র্যের শেষ কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। তিনি এজন্যে কখনো তাঁকে গালমন্দ করেননি বা নিষেধও করেননি, বরং তিনি যখন তাঁর উপন্যাস 'নির্বোধ' লেখার সময় মাথার ঘায়ে পাগলা কুকুরের দশাগ্রস্ত, আন্না নিজেই

প্রস্তাব করেছেন, লেখক অবশ্যই জুয়া খেলতে যাবেন এবং কিছুটা খেলে আসবেন। অন্য মহিলা হলে এরকম ঝুঁকি নিতে বিভীষিকাই দেখত কিন্তু এ ব্যাপারে আন্না যথার্থই ছিলেন। তিনি জানতেন, জুয়া খেলায় হেরে এসে দস্তয়েভস্কি একনাগাড়ে তাঁর উপন্যাসের প্রায় একশো পাতা লিখে ফেলতে সক্ষম।

আন্না কোন রকম বিড়বিড় না করেই তাঁর জিনিসপত্র বন্ধক দিয়েছেন। এমনকি যখন তাঁর বিয়ের আংটি কি কানের দুল বন্ধক দেয়া হয়েছে, এবং আন্না জেনেছেন, সবটাই জুয়ার টেবিলে খেয়ে নেবে, তিনি কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। ব্যাপারটা দস্তয়েভস্কির কাছে এমন নতুন যে তিনি এমনটি আর কারোর কাছ থেকে পাননি। সুসলোভা কিন্তু তাঁর জুয়ার নেশাকে দেখেছিল টাকা বানানোর ধান্ধা হিসাবে বা নিছক দুর্বলতা হিসেবেই।

আন্না তাঁর সৃজনী প্রতিভার দিকে চেয়ে কখনই অনিচ্ছায় কিছু দেয় নি এবং সকল রকম আত্মত্যাগেই তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কেননা তিনি জানতেন—

"যে শ্রুতি স্বর্গীয় সুর সঙ্গতিতে টান টান বাঁধা
পবিত্র শব্দের ছোঁয়া ছিটেফোঁটা লাগল তো প্রজ্জ্বল
কবির নিগূঢ় সত্তা কি দ্রুত না শুরু করে সাধা
উদ্দীপনা, যেমন তা উড়ে ওঠে জাগরী ঈগল।

দস্তয়েভস্কির অপ্রতিরোধ্য সৃজনীতাগিদ সব রকম প্রলোভন কেউ জয় করতে পারত এবং তাঁর চেতনার পবিত্র শিখা তীব্রতর হয়ে জ্বলতে থাকত, গলিয়ে দিত এবং তাঁর অন্তর জগৎকে নতুন করে গড়ে তুলত।

এরকমটি, বস্তুত, ঘটত। কিন্তু তা হবার আগে আন্নাকে একটা নরক-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হত। তবুও তিনি কখনো তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা তোলেননি (মৃগী রোগের মত তাঁর জুয়া নেশাকেও তিনি মনে করতেন প্রতিভারই এক মূল্য হিসাবে)।

বিয়ের প্রথম বছরে আন্নাকে দস্তয়েভস্কির দুর্ভাগ্য আর জুয়া খেলার অতি নেশার জন্যে কি যে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। আন্নার ভরাট যৌবন ছাড়াও তাঁর প্রেমাপ্লুত অন্তরতলেই ছিল একটা প্রজ্ঞাশীলতা। তিনি কেবল দস্তয়েভস্কিকে রক্ষা বা সাহায্যই করেননি, তাঁর স্বামীর ধারাবাহিক ক্ষয়ক্ষতিতে সান্ত্বনা দেবার সবল সামর্থ্যেরও অধিকারিণী ছিলেন।

নিজের বিনয় আর নম্রতার প্রবর্তনায় সোনিয়া মারমেলাদোভা যেমন রাসকোলনিকভকে জয় করে নিয়েছিলেন, আন্নাও তেমনি দস্তয়েভস্কির জুয়ার প্রতি আত্মবিধ্বংশী ভালবাসাকে চিরদিনের জন্যে মুছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন, মূলত আন্নার জন্যেই তাঁর মুক্তি এসেছে। এ মুক্তি সম্ভব হয়েছে তাঁর আশ্চর্য ধৈর্যশীলতা, সমস্ত কিছুকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখা এবং তাঁর মহানুভবতার জন্যেই। "আমি সারা জীবন মনে রাখব, হে আমার দেবদূতী, আমি সব সময় তোমাকে আশীর্বাদ করে যাবো." দস্তয়েভস্কি অকুণ্ঠভাবে তাঁকে লিখেছেন, "না, আমি এখন তোমারই শরীর ও সর্বস্ব সহ তোমার—পরিপূর্ণ ভাবে তোমার। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঐ জঘন্য খামখেয়াল আমার অর্ধাংশ জুড়ে আছে।"

আন্না ঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন জুয়ার নেশা দস্তয়েভস্কির প্রতিভাকেই শক্তি জুগিয়ে থাকে। তিনি নিজেও দেখেছেন তাঁর সৃজনী শক্তি এবং তাঁর 'অভিশপ্ত খামখেয়াল'-এর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। একবার হেরে ভূত হয়ে যাবার পর স্ত্রীকে তাঁর ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে দস্তয়েভস্কি তাঁর দুর্ভাগ্যকে একটা কৌতুককর ভাবনা জানিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। "আগে আমার মধ্যে একটা বাজে ধারণাই ছিল, তবে এখনো আমি পুরোপুরি সেই আশ্চর্য ভাবনাটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন আমার কাছে সব পরিষ্কার। আমার কাছে তা এসেছে নটার সময়, কি কিছু সময় পরে—যখন বাজিতে হেরে বড় রাস্তায় (এভিনিউ) পায়চারি করতে গিয়েছিলাম। (এটা ঠিক উসবাডনের ঘটনার মতো। সে সময়েও হেরে গিয়ে কাৎকভের সঙ্গে গল্পচ্ছলে পেয়ে গিয়েছিলাম 'অপরাধ ও শাস্তি'-র চিন্তাটা। হয় এ ভাগ্য, নয়তো ভগবান!")

'নির্বোধ' উপন্যাসের ভাবনাটা এই ভাবেই এসেছিল। জুয়ার উন্মত্ততার সঙ্গে তাঁর সুবিপুল সৃজনী প্রতিভাকে দস্তয়েভস্কি এরকম সচেতন ভাবে মিলিয়ে নিয়েছেন, বলেছেন, 'ঝুঁকি নাও, যেমন আমি ঝুঁকি নিয়ে থাকি জুয়া খেলায়।'

জুয়া খেলায় ফতুর হবার অভিজ্ঞতাই আন্না ও দস্তয়েভস্কিকে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে উঠতে খানিকটা সাহায্য করেছিল। পরবর্তী ক'বছরের চিঠিপত্রে দস্তয়েভস্কি বার বার লিখেছেন যে তিনি অনুভব করেছেন তাঁর পরিবারের সঙ্গে কঠিন আঠায় আঁটা হয়ে গেছেন এবং সামান্যতম বিচ্ছেদ-বিরহও তাঁর কাছে অসহ্য। ১৮৬৮ মে মাসে জেনেভায় দস্তয়েভস্কির প্রথম সন্তান কন্যা সোনিয়া তিনমাস বয়সে সর্দি লেগে মারা যায়।

প্রথম সন্তানের জন্ম লেখকের চিন্তায় এবং অনুভূতিতে এক অভূতপূর্ব নতুন জগৎ খুলে দেয়। তাঁর স্বপ্ন শেষ অব্দি চরিতার্থ পেল—তিনি পিতা হলেন।

প্রথম দিন থেকে দস্তয়েভস্কি কন্যাটিকে হৃদয় মন দিয়ে ভালবেসেছেন, আগামী দিনের মানুষ জেনে—তিনি ভালবেসেছেন তাকে সমান একজন বয়স্ক মানুষ মনে করে। তিনি তাঁর স্পর্শকাতরতার মধ্যে বাড়াবাড়ির কথা ভেবে ভয় পান নি। কারণ, শেষ অব্দি তিনি যা করবেন, তার সব কিছুই তিনি তাঁর কন্যার জন্যে করবেন। এই ভাবনাই ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছেন এবং আশ্বস্ত হয়েছেন এই ভেবে যে, ইতিমধ্যেই বালিকা তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে এবং তিনি লক্ষ্য করেছেন তার একটা নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও আছে।

শিশুকন্যাটির মৃত্যু পিতামাতার মধ্যে হতাশা জাগিয়ে দিয়ে গেল। একটা জুয়া খেলায় হেরে যাওয়ার পর আন্না যেমন করে দস্তয়েভস্কিকে সান্ত্বনা দিতেন, এখানেও সেই ভূমিকাই নিলেন। কিন্তু দস্তয়েভস্কি কোন প্রবোধই মানেন না। না, পৃথিবীর কোন ঐকতান তাঁর এই ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না, কোন পার্থিব স্বর্গসুখই প্রথম সন্তান হারানো পিতৃ-হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করতে পারবে না। "ফিয়েদোর মিখাইলোভিচ পার্থিব যে কোন জিনিসের চেয়েই তাকে (কন্যাটিকে) বেশি ভালবাসতেন এবং বলতেন, সোনিয়াকে নিয়ে তিনি যেমন সুখী, এত সুখী তিনি কখনই আর হননি।" —একথা বলে আন্না আবার জানিয়েছেন, "বেচারা! তাঁর দুঃখ আমার ভাষায় যা আসে তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তবে তাঁর একটাই সান্ত্বনা ছিল যে আমরা আর একটা পাবই…।"

১৮৬৯-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁদের দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হল ড্রেসডেনে। তাঁরা তাকে 'লিউবভ' অর্থাৎ ভালবাসা বলে ডাকতেন। আবার সুখের দেখা পাওয়া গেল পরিবারে। ফিয়েদোর মিখাইলোভিচ্ এই কন্যাটির প্রতি অনন্য দরদী। তাকে দেখাশুনা করেন, স্নান করান, কোলে নিয়ে ঘুরে ফেরেন, দোলা দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়ান। তিনি এত সুখী হয়েছিলেন যে সমালোচক এন. এন স্ত্রাখোভকে লিখেছেন, "আহ্, কেন তুমি বিয়ে করছ না আর কেনই বা তুমি অধিকারী হচ্ছ না, আমার একান্ত সুহৃদ নিকোলাই নিখোলয়েভিচ্ এমন পরম সুখের। আমি হলপ করে বলতে পারি, জীবনের তিন চতুর্থাংশ সুখই নিহিত আছে এর মধ্যে, আর যা বাকী থাকে তা চার ভাগের একভাগ মাত্র।"

প্রবাসে থেকেই দস্তয়েভস্কি তাঁর 'নির্বোধ', 'সম্মোহিত', 'চিরন্তর স্বামী' ও 'বেলিনস্কির প্রতি' প্রবন্ধ ও নানা উপন্যাসের খসড়া রচনা করেছেন, যার মধ্যে ছিল 'এক মহান অপরাধী-সম্পর্কিত' উপন্যাসের রেখাচিত্রও। নাইসায়েভানা সুসলোভা না আর কারো কাছ থেকেই, কেবল আন্নার কাছে যেমন পেয়েছেন, দস্তয়েভস্কি তেমন আত্মিক এবং শৈল্পিক প্রেরণা কোথাও পাননি। তিনি বিটোভেনের সিমফনি শুনতে ভালবাসতেন, ড্রেসডেন গ্যালারিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন রাফায়েলের সিস্টিন ম্যাডোনা দেখে দেখে এবং বিস্ময়কর ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন গ্যালারির ফরাসী শিল্পী ক্লড লোরাইনের শিল্প কর্মের 'এ্যাকিজ এ্যাণ্ড গলাটি'-র প্রতি।

একাকী এই মহান শিল্পকর্মের সঙ্গে থাকতে কোনরকম বাধা দেন নি বলে দস্তয়েভস্কি আন্নার প্রতি কৃতজ্ঞ। আন্না জানতেন, যে ছবির উপরেই দস্তয়েভস্কি আন্তরিক টান বসাবেন, তাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হবে এবং দস্তয়েভস্কি তাঁর এই কৌশল এবং সুচেতনাকে বেশ তারিফ করেছেন। 'নির্বোধ'-এর জেনারেল ইপানসিনের তিন কন্যার চরিত্রেই আন্নার সুমধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যেরই অধিকারিণী আলেকজান্দ্রা, আভিলাইডা এবং আগলায়া। এই ত্রয়ীর নামের আদ্যাক্ষরই 'আ' তাই খুব তাৎপর্য বহন করে।

কিন্তু, দস্তয়েভস্কিকে ধন্যবাদ, আন্না নিজেই চিত্রকলার জগতের সমুকগ্রামে পৌছাতে পেরেছিলেন এবং নান্দনিক বোধ নিঃসন্দেহে বহু পরিমাণে পশ্চিমাসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ১৮৬৭-র ১৭ই মে এক চিঠিতে তিনি আন্নার কাছে স্বীকার করেছেন, ঈশ্বর আমার প্রতি তোমাকে বিশ্বস্ত করছেন না, তোমার সত্তার ভ্রূণ এবং সম্পদ যাতে বিনষ্ট হয়ে না যায়, তা দেখার জন্যে, বলা যায়, তোমার সমুন্নত প্রাচুর্যপূর্ণ বিকাশে বিকশিত হয়ে ওঠার জন্যে। তিনি তোমাকে আমার কাছে দিয়েছেন যাতে করে আমি আমার পাপ তোমার মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারি। তিনি আমায় তোমাকে দিয়েছেন যাতে করে আমি তোমাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বময়ী করে, জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতন করে সমস্ত রকম নীচতা এবং যা আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়, তার সমস্ত কিছু থেকে রক্ষা করার জন্যে···।"

দস্তয়েভস্কির মেয়ের সাক্ষ্য, যার যাথার্থ ব্যাপারে এই যে, তিনি যখন আন্নার বিষয়ে বলতেন, "তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর শৈলিকে

সমুন্নতির বিষয়েই। তিনি তাঁর পড়াশুনার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছেন··· মিউজিয়ামে তাঁর প্রদর্শন পরিচালকের ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁকে দেখিয়েছেন উন্নত মানের চিত্রকলা এবং বিখ্যাত সব ভাস্কর্য এবং যা কিছু মহান, খাঁটি এবং সম্ভ্রান্ত, তাঁর সব কিছুর প্রতিই ভালবাসা জাগাবার জন্যে তাঁর করুণ আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।"

দস্তয়েভস্কির বিশ্বাস জন্মেছিল যে আন্না এক আকর্ষণীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বময়ী এবং তিনি তাঁর 'সমুচ্চ' উপলব্ধি ক্ষমতা ও ক্রিয়াশীল প্রকৃতি, তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা, ভাষাজ্ঞান, পর্যটন প্রীতি এবং 'দেখার ও শেখার' ইচ্ছাকে দারুণ মূল্য দিতেন।"

চার বছর প্রবাস বাসকালে যৌবনমতী স্টেনোগ্রাফার আন্না কেবল তাঁর স্বামীর বল-ভরসাই মাত্র হননি, তিনি তাঁর প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে তারিফ করতে শিখেছিলেন। আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেননা দস্তয়েভস্কির মৃত্যুর পরেই তাঁর অবদান অকৃপণ ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

দস্তয়েভস্কি ক্রমশই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি আরো সচেতন হলেন তাঁর ভেতরকার সম্পদ এবং তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতা সম্পর্কে। অন্যদিকে তিনি তাঁর ডায়েরিতে তাঁর স্বামীর জুয়া খেলায় হেরে যাওয়ার পরে যে কথা লিখেছেন, তাঁর বিচারে আন্না জুয়া খেলাটাকে বুঝে নিয়েছেন, দস্তয়েভস্কির বৌ-হওয়ার সুখের জন্যে ঐটুকু মূল্যও তাঁকে দিতে হবে। আন্না লিখেছেন, "আমি যে তাঁকে বিয়ে করতে পেরেছি সে আমার অসীম ভাগ্য, আর এটা সম্ভবত তারই জন্যে দণ্ড। ফিয়োদোর আমায় বলেছেন তিনি আমাকে সীমাহীনভাবে ভালোবাসেন এবং তিনি আমার জন্যে ফাঁসি কাঠেও যেতে প্রস্তুত। তিনি ভয়ে কিন্তু পিছিয়ে যাননি—সত্যি সত্যি তিনি আমাকে এতই ভালবাসেন যে, এধরণের মুহূর্তে আমার যে মমতা সমবেদনা দেখা গেছে, তা কখনই ভুলতে পারবো না।"

জীবনভর আন্না স্বামীকে সাদামাটা, সরল এক প্রিয়জন বলেই ধরে নিয়েছেন, বুঝেছেন দস্তয়েভস্কিকে শিশুর মত দেখেই আন্নাকে সামলাতে হবে। জার্মানি থেকে আন্নার মাকে লিখতে গিয়ে দস্তয়েভস্কি যার মধ্যে দেখেছেন প্রকৃত ভালবাসার গোপন প্রবর্তনা, "আন্না আমাকে ভালবাসে এবং তাঁর সঙ্গে আমি যেমনটি সুখে আছি, এত সুখ সারা জীবনে আর পাইনি। সে নম্র, দয়াবতী এবং চালাক চতুর। সে আমাকে বিশ্বাস করে এবং সে এমন

নিবিড় ভালবাসায় তাঁর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নিয়েছে যে আমি যদি তাঁর কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হই তো মরে যাবো।"

ভয়াবহ বিষাদাক্রান্ত দিনগুলোতেও তিনি তাঁর হতাশাদষ্ট মনোভাব হেসে খেলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং দস্তয়েভস্কিও এ সত্য তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন যে, তিনি যে কি দুরবস্থায় দিন কাটান, তার চিহ্নটি পর্যন্ত তিনি কখনো স্পষ্ট হতে দেননি। এক গোছা ফুল কি তাঁর চায়ের জন্য একটুকরো কেক যদিবা তিনি কখনো আমার জন্য আনতেন, যা তিনি বার দুই এনেও ছিলেন, তিনি খুশিতে আটখানা হয়ে পড়তেন। এই সামান্য উপকরণেই তিনি মনে করতেন, তাঁর প্রতি দস্তয়েভস্কির কত না দৃষ্টি—তাঁর এটাকে মনে হত তিনি যেন তাঁর জন্যে তাবৎ বোটানিকাল গার্ডেনটা বা কেকের কারখানাটাই নিয়ে এসেছেন।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ ঃ সত্য গুহ

আমার প্রথম লেখা

ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি

মানুষের জীবনে আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটে।

কালেকশ্নিনে আমাদের[১] দেখা হতো, কিছু ভুল বোঝাবুঝিও ছিল, কিন্তু এমন একটা ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেছিল যা আমি কোনদিন ভুলব না— আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। কিছুদিন আগে[২] নেক্রোসভকে দেখতে গিয়েছিলাম এবং অসুস্থ, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত তিনি প্রথমেই বললেন, তাঁরও মনে আছে সেইসব দিনের কথা। তিরিশ বছর আগের কথা! তবে—এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল, তাজা সুন্দর এবং যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভরা, সে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যারা তাদের বুকে চিরকালই তা থেকে যায়। আমাদের বয়স তখন সবে বিশ পেরিয়েছে। আমি তখন থাকি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। এর এক বছর পরেই এঞ্জিনিয়ারিং কোর থেকে আমি পদত্যাগ করি—কেন তা না জেনেই, অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত এক উচ্চাকাঙ্খায়। এসব ১৯৮৫ সালের মে মাসের কথা।

শীতের শুরুতে আমার প্রথম গল্প 'গরীব মানুষ' লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, তার আগে কোনদিন কিছু লিখি নি আমি। গল্পটা শেষ করার পর সেটা নিয়ে যে কী করব, কার কাছে যাব, কিছুই জানি না, সাহিত্যজগতে ডি. ভি. গ্রিগোরোভিচ ছাড়া আর কাউকেই চিনি না। তিনি তখন পর্যন্ত একটা বর্ষপঞ্জির জন্যে 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ হার্ডিগার্ডি মেন' নামে একটি ছোট্ট নিবন্ধ ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি। আমার যদি খুব ভুল না হয়, তিনি তখন গ্রীষ্মের অবকাশে তাঁর খামার চলে যাওয়ার মুখে, যাওয়ার আগে নেক্রাসভের অ্যাপার্টমেণ্টে রয়েছেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তিনি বললেন,

'তোমার পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে এস (নিজে তিনি পড়েন নি তখন): আগামী বছরের জন্যে নেক্রাসভ একটা বর্ষপঞ্জি করতে চায়, তাকে ওটা দেখাব।'

গেলাম পাণ্ডুলিপি নিয়েই। ঠিক এক মুহূর্তের জন্যে নেক্রাসভের দেখা পেলাম; করমর্দন করলাম আমরা। নিজের লেখা নিয়ে এসেছি, এই কথা ভেবেই আমার সব কেমন গুলিয়ে গেল এবং খুব দ্রুত কেটে পড়লাম,

নেক্রাসভের সঙ্গে প্রায় কোনো কথা না বলেই। সাফল্যের কথা আমি ভাবি নি এবং তখনকার দিনে লোকে যাদের বলত 'ওটেকেস্টভেনিয়ে জাপিস্কি-র দল' তাদের রীতিমতো ভয়ই পেতাম। অনেক বছর ধরে বেলিনস্কি-র লেখা পড়ছি মুগ্ধ হয়ে তবু তাঁকে নিয়ে কেমন যেন ভয় আর আতংক। থেকে থেকেই নিজেকে বলছি,

'আমার 'গরীব মানুষ' নিয়ে উনি নির্ঘাৎ হাসিমস্করা করবেন'। তবে নেহাৎ মাঝেমাঝেই বলছি। গল্পটা আমি আবেগ দিয়ে লিখেছি, প্রায় অশ্রু দিয়ে। লিখতে গিয়ে কলম হাতে আমি যেসব মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে গেছি—সবই কি মিথ্যা? সবই মরীচিকা? ভুল আবেগ? তা-ও কি হতে পারে? তবে এটাও ঠিক যে এই ধরণের ভাবনা শুধু মাঝেমাঝেই আমার মনে আসছিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসছিল এ বিষয়ে সন্দেহ।

পাণ্ডুলিপিটি যেদিন জমা দিই সেদিনই সন্ধ্যায় আমি অনেক দূরে আমার এক প্রাক্তন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সারারাত ধরে আমরা 'ডেড সোলস' নিয়ে আলোচনা করি এবং বইটি পড়ি, কতোক্ষণ ধরে তা আমার মনে নেই। তখনকার দিনে তরুণরা এরকমই করত; দু'জন কি তিনজন একজায়গায় হলেই: 'ভদ্রমহোদয়গণ, গোগল পড়ব কি আমরা? সবাই বসে পড়বে এবং পড়া চলবে, কখনো কখনো সারা রাত ধরে। তখন যে পরিস্থিতি ছিল, তরুণদের মধ্যে অনেকেই একটা কোনকিছু নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকত, প্রতীক্ষায় থাকত একটা কোনকিছুর।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত চারটে, সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্বেত রাত্রি, দিনের মতোই স্পষ্ট আলো। অপূর্ব উষ্ণ হাওয়া। ঘরে ঢুকে আর বিছানায় গেলাম না, জানলা খুলে দিয়ে তার সামনে বসলাম। হঠাৎ শুনি দরজায় ঘণ্টা বাজছে। খুবই অবাক হোলাম। তারপরেই ছুটে এলেন গ্রিগোরোভিচ এবং নেক্রাসভ, এসেই আমাকে আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করলেন, একেবারে আত্মহারা হয়ে। তাঁদের দুজনেরই চোখ থেকে জল প্রায় বেরিয়ে আসে!

সন্ধ্যাবেলা তাঁরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলেন। ফিরে আমার পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন, নেহাৎই পরখ করে দেখার জন্যে। তাদের ভাবনাটা ছিল, 'প্রথম পাতাদশেক থেকেই বোঝা যাবে।' কিন্তু দশপাতা পড়ার পর তাঁরা ঠিক করেন, আর দশপাতা পড়া যাক এবং তারপর সারারাত তাঁরা বসে কাটান, ভোর পর্যন্ত একটানা পড়ে যান, জোরে জোরে, একজন

ক্লান্ত হয়ে পড়লে আর একজন, পালা করে করে। পরে গ্রিগোরোভিচ আমাকে বলেছিলেন, তখন শুধু দুজনই ছিলাম আমরা,

'ছাত্রটির মৃত্যুর জায়গাটা পড়ছিল ও, হঠাৎ দেখি, সেই যে যেখানে বাবা ছুটে যায় কফিনের পেছনে, নেক্রাসভের গলার স্বর ভেঙে যেতে আরম্ভ করেছে, একবার, তারপর আরও একবার এবং তারপর নিজের ওপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাতের তালু দিয়ে পাণ্ডুলিপিটার 'ওপর চাপড় মেরে বলে উঠল, "রাসক্যাল !'—তোমাকে বলল। এইভাবেই চলল সারারাত।'

পড়া শেষ হতেই (মোট ১১২ পাতা) তাঁরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন, তক্ষুনি আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

'ঘুমোচ্ছে তো কী হয়েছে! ঘুম থেকে ওকে টেনে তুলব। ঘুমের চেয়ে এটা অনেক বেশি জরুরী!'

পরে, নেক্রাসভের মেজাজ সম্পর্কে আরো ভালো করে জানার পর এই ঘটনাটা নিয়ে আমি প্রায়ই ভেবেছি : সংযত, প্রায় সন্দেহপ্রবণ, সতর্ক এবং চাপা স্বভাবের মানুষ তিনি। অন্ততঃ আমার বরাবর তা-ই মনে হয়েছে। কাজেই, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটা সত্যিই গভীরতম এক অনুভূতির প্রকাশ।

আমার কাছে ওঁরা ছিলেন আধঘণ্টার মতো। ওইটুকু সময়েই আমরা তাড়াহুড়ো করে, চেঁচামেচি করে কতো বিষয় নিয়ে যে আলোচনা করলাম তা ঈশ্বরই জানেন। প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর থেকেই আমরা পরস্পরকে বুঝে নিচ্ছিলাম। কবিতা নিয়ে কথা হল, সত্য এবং 'বর্তমান পরিস্থিতি' নিয়ে আলোচনা হল এবং, বলা বাহুল্য, কথা হল গোগোলকে নিয়ে, 'ইনেস্পকটর জেনারেল' এবং 'ডেড সোলস' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে, কিন্তু প্রধানত কথা হলো বেলিনস্কিকে নিয়ে।

'আজকেই আমি আপনার গল্পটা তাঁকে দেব এবং আপনি দেখবেন—কী মানুষ! কী একটা মানুষ! একটু পরিচয় হলেই দেখবেন কী হৃদয় তাঁর!' দু'হাতে আমার কাঁধদুটো ধরে আমাকে ঝাঁলাতে ঝাঁকাতে নেক্রাসভ সোৎসাহে বলতে লাগলেন।

'ঠিক আছে, এবার ঘুমোন, ঘুমোন! আমরা এখন চলি। কাল কিন্তু ঠিক চলে আসবেন আমাদের ওখানে।'

এর পর আমি ঘুমোই কী করে! কী আনন্দ! কী সাফল্য! সবচেয়ে জরুরী কথা, যে-আবেগ ওঁদের নাড়া দিয়েছে—যা স্পষ্ট হয়ে আছে আমার

মনে—তা আমার খুব প্রিয়। 'মানুষের জীবনে সাফল্য আসতে পারে, সে প্রশংসা পেতে পারে, তার সঙ্গে দেখা হলে লোকে তাকে অভিনন্দন জানাতে পারে, কিন্তু এঁরা ভোর চারটেয় ছুটে এসেছেন চোখে জল নিয়ে, আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলতে এসেছেন, যেহেতু ঘুমের চেয়ে এটা অনেক বেশি জরুরী…আহ্‌! কী অপূর্ব!'—এইসব কথাই মনে হচ্ছিল আমার। আমি ঘুমোই কেমন করে?

সেইদিনই নেক্রাসভ পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে বেলিনস্কির কাছে যান। বেলিনস্কিকে তিনি পুজো করতেন। এবং আমার ধারণা, তাঁকে যতো ভালবাসতেন, ততো ভালো তিনি জীবনে কাউকে বাসেন নি। তখন পর্যন্ত নেক্রাসভ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলি লেখেন নি, সেসব তিনি লেখেন এর অল্প কিছুদিন, বছরখানেক পরেই। আমি যতদূর জানি নেক্রাসভ পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন একেবারে একা, তখন তাঁর বয়স ষোল। প্রায় সেই বয়সেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। বেলিনস্কির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে আমি অল্পই জানি। তবে একেবারে শুরুতেই বেলিনস্কি তাঁকে আবিষ্কার করেন এবং, সম্ভবতঃ, তাঁর কবিতার মেজাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। সেইসব দিনগুলিতে তাঁদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল, নেক্রাসভের ছিল যৌবনের উচ্ছ্বাস। তবু তাঁদের জীবনে নিশ্চয়ই সেইসব মুহূর্ত এসেছিল, উচ্চারিত হয়েছিল সেইসব শব্দ যেসব শব্দ ও মুহূর্তের প্রভাব থেকে যায় চিরকাল এবং মানুষকে বেঁধে রাখে অমর বন্ধনে।

"নতুন একজন গোগোলের আবির্ভাব হয়েছে।'

গলা তুলে বলতে বলতে বেলিনস্কির অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকেন নেক্রাসভ, সঙ্গে আমার 'গরীব মানুষ'।

'তুমি তো দেখি প্রতি পদক্ষেপেই গোগোল আবিষ্কার করো।'

বেলিনস্কি বেশ কড়া গলায় মন্তব্য করেন, 'তবে পাণ্ডুলিপিটি রেখেও দেন।' সন্ধ্যাবেলা নেক্রাসভ তাঁর কাছে গিয়ে দেখেন বেলিনস্কি রীতিমতো উত্তেজিত: "ওকে নিয়ে এসো, যতো তাড়াতাড়ি পারো নিয়ে এসো।'

তারপর (সেটা তৃতীয় দিন) আমাকে বেলনস্কির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। আমার মনে আছে, তাঁর চেহারা, নাক কপাল প্রথমে আমাকে যেন কেমন ধাক্কা দিয়েছিল। কোনো কারণে তিনি—'আতংক জাগানো ভয়ংকর এই সমালোচকটি'—আমার কল্পনায় ছিলেন একেবারে অন্যরকম। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন সংযতভাবে, খুব গম্ভীর। আমি মনে মনে বললাম,

'তা এইরকমই তো হওয়া উচিত।'

যাই হোক, বোধহয় এক মিনিটও কাটল না, ছবিটা বদলে গেল আমূল। এ গাম্ভীর্য একজন ব্যক্তির নয়, বাইশ বছরের এক লেখক[৩] যার সবে হাতেখড়ি হচ্ছে তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বিশাল এক সমালোচকের গাম্ভীর্য নয়; বরং বলা যেতে পারে, কিছু অনুভূতি তিনি দ্রুত সম্ভব আমার মধ্যে চারিয়ে দিতে চাইছিলেন, সেই অনুভূতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধাই এই গাম্ভীর্যের উৎস। তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তাঁর কথার মধ্যে একটা তীব্রতা, চোখদুটো জ্বলছে,

'আপনি কি বোঝেন কী লিখেছেন আপনি?'

কথাটা তিনি অনেকবার বললেন, বেশ গলা চড়িয়ে। তাঁর অভ্যাসই ছিল এইরকম। খুব উত্তেজনা বোধ তিনি সপ্তমে গলা চড়িয়েই কথা বলতেন, সবসময়।

শিল্পী হিসাবে তাৎক্ষণিক প্রেরণায় হয়তো আপনি লিখেছেন কিন্তু ভয়ংকর যেসব সত্য আপনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তার সবই কি আপনি বুঝে-সুঝে, যুক্তি দিয়ে পুনর্গঠন করেছেন? আপনার এই বিশ বছর বয়সে আপনি এসব উপলব্ধি করতে পারবেন—এটা অসম্ভব। আপনার ওই হতভাগ্য কর্মচারীটির কথাই ধরুন, অদ্ভুত, কতোদিন ধরে এবং কী মরীয়া হয়ে সে তার কাজের জায়গায় ঘাম ঝরিয়েছে, নিজেকে সে এমন এক স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে যে নিজেকে এমন কি হতভাগ্য ভাবার সাহসটুকুও আর তার নেই—এমনই দীন তার অবস্থা—এবং তুচ্ছতম নালিশ জানানোও স্বাধীন চিন্তার কাজ বলে মনে হয় তার—তার ঝোঁকটা প্রায় সেইরকমই, এমনকি দুর্ভাগ্যের অধিকার দাবি করার সাহসও তার নেই—তার ওপর-ওয়ালা, উঁচুতলার সেই সরকারী কর্মচারীটি—মানুষটা দয়ালু—যখন তাকে একশ' রুবল দান করে, লোকটা চুরমার হয়ে যায়, স্তম্ভিত বিস্ময় তাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে; তার মতো একজনকে 'দেয়ার একসেলেন্সি' কি দয়া করতে পারেন। 'হিজ একসেলেন্সি' নয়, 'দেয়ার একসেলেন্সি'—আপনার উপন্যাসে সে তা-ই বলে। এবং সেই ছেঁড়া বোতামটা! যে মুহূর্তে সে 'হিজ একসেলেন্সি'র হস্তচুম্বন করে—না, ব্যাপারটা আর হতভাগ্য মানুষটির প্রতি সমবেদনা থাকে না, আতংক হয়ে ওঠে, আতংক! এই কৃতজ্ঞতার মধ্যেই তার আতংক। এই হলো ট্র্যাজেডি!…আপনি ব্যাপারটার একেবারে মূল ছুঁয়ে দিয়েছেন, কলমের একটি খোঁচায় আপনি আসল জিনিসটা দেখিয়ে

দিয়েছেন। আমরা, আইন বা রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা, সমালোচকরা, আমরা চেষ্টা করি কথা দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে, কিন্তু আপনি, একজন শিল্পী, একটি আঘাতে, তুলির একটি টানে একেবারে সারটুকু সামনে নিয়ে এসেছেন, একটি প্রতিমার মাধ্যমে, যাতে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, যাতে যুক্তিতর্কের ধার ধারে না এমন পাঠকও মুহূর্তে গোটা ব্যাপারটা ধরে ফেলতে পারে। এ-ই তো শিল্পের রহস্য! এই তো শিল্পের সত্য! সত্যের প্রতি শিল্পীর অবদান তো এ-ই! আপনি শিল্পী, সত্য আপনার কাছে উন্মোচিত, প্রতিভাত; সত্য আপনার কাছে এসেছে উপহার হয়ে। এ উপহারকে সম্পদ করে রাখুন, এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন, দেখবেন, আপনি একজন মহান সাহিত্যিক হবেন।'

এইসব কথাই সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন। পরে একই কথা তিনি আরো অনেককে বলেন, তাঁদের কেউ কেউ আজও বেঁচে আছেন, আমার কথা ঠিক কিনা তাঁরা বলতে পারবেন।

আমি তাঁর কাছ থেকে উঠে এলাম আশ্চর্য এক আনন্দ নিয়ে। তাঁর বাড়ির কোণে দাঁড়ালাম, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কি উজ্জ্বল দিন! চারপাশের মানুষজনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। এবং আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করলাম চরম গুরুত্বপূর্ণ একটা মুহূর্ত আমার জীবনে এসেছে, চূড়ান্ত মোড় নেওয়ার মুহূর্ত। একেবারে নতুন একটা কিছু ঘটতে আরম্ভ করেছে, এমন কিছু যা আমার সবচেয়ে আবেগে দেখা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি (এবং সেই দিনগুলিতে আমি সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখতাম!)।

'আমি কি সত্যিই অমন মহান?' অপ্রতিভ আনন্দে আমি ভীরুর মতো প্রশ্ন করি নিজেকে। আহা, হাসবেন না আপনারা। জীবনে আর কোনদিন নিজেকে আমি মহান ভাবি নি, কিন্তু সেদিন এটা ছিল একেবারেই অপ্রতিরোধ্য। 'ওহ,' আমি যে এই প্রশংসার যোগ্য তা প্রমাণ করব। এবং কীসব মানুষ! কীসব মানুষ! এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় মানুষ। এই প্রশংসা আমি যথার্থ করে তুলব। ওঁদের মতোই অসাধারণ হয়ে উঠতে চেষ্টা করব আমি। আমি 'বিশ্বস্ত' থাকব। কী বাজে আমি! বলিনস্কি যদি জানতেন কীসব নোংরা, লজ্জাকর ভাবনা আমার ভেতরে কাজ করে! অথচ এইসব গুণীজন সম্পর্কে লোকে কিনা বলে এঁরা উদ্ধত, এঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী! সত্যি, এঁদের মতো মানুষ শুধু রুশদেশেই পাওয়া যায়। এঁরা নিঃসঙ্গ, কিন্তু সত্য শুধু এঁদেরই আয়ত্তে এবং সত্য, নিষ্ঠা ও সততা চিরকাল পাপ ও অমঙ্গলকে

পরাজিত করে জয়ী হয়। আমরা জয়ী হব। ওহ্, এঁদের আমি চাই! এঁদের সঙ্গী হতে চাই আমি!

এইসব ভাবনা আমার মনে আসছিল। সেই মুহূর্তটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, কোনদিনই ভুলতে পারি নি। আমার সমগ্র জীবনে এই মুহূর্তটিই সবচেয়ে আনন্দের। সশ্রম কয়েদ খাটার দিনগুলিতে যখনই স্মরণ করতাম তখনই এই মুহূর্তটি আমাকে এক আত্মিক শক্তি জোগাত। এমন কি এখনও আমি অনিবার্য আনন্দের সঙ্গেই সেই মুহূর্তটির কথা মনে করি।

এবং তিরিশ বছর পরে, ক'দিন আগে, অসুস্থ নেক্রাসভের বিছানার পাশে বসে সেই মুহূর্তটির কথা মনে করলাম, তাঁর মধ্যে আবার বাঁচলাম। আমি তাঁকে বিস্তারিত কিছু মনে করিয়ে দিই নি, শুধু খেয়াল করিয়ে দিলাম ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল। এবং দেখতেই পেলাম, সবই মনে আছে তাঁরও। আমি জানতাম তাঁর মনে আছে। আমি সাইবেরিয়া থেকে ফেরার পর তাঁর খাতায় একটি কবিতা তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। 'সেই সময় তোমাকে নিয়ে লিখেছিলাম।' তবু আমরা আমাদের সমস্ত জীবন একা একা, আলাদাই কাটিয়েছি। রোগশয্যায় তিনি সেইসব বন্ধুদের কথা মনে করছিলেন যাঁরা আর আমাদের মধ্যে নেই।

ভবিষ্যতের কথা যারা বলে, তাদের থামানো গান,
ঘৃণা আর দেশদ্রোহের শিকার তারা,
যৌবন বুকে এঁকেছে তাদের ছবি—
আমার দুচোখে তাকায় তারা তো ক্ষয় ও ভৎর্সনায়॥

"ভৎর্সনায়"—বড় কষ্টের শব্দ। আমরা কি 'বিশ্বস্ত' থেকেছি? থেকেছি আমরা? প্রত্যেকে জবাব দিন নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে, বিবেক অনুসারে। শুধু যন্ত্রণার এই গানগুলি পড়ুন, নিজে পড়ুন এবং আমাদের ভালোবার কবির, আবেগের কবির পুনরুজ্জীবন হোক আপনাদের হৃদয়ে। যন্ত্রণায় আসক্ত এক কবি।

অনুবাদ: জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

---

১. নেক্রাসভ এবং সালটিকভ-শ্চেদ্রিন সম্পাদিত 'ওটেকেস্টভেনিয়ে জাপিস্কি'তে 'দ্য হব্‌ল্‌ভেহয়' প্রকাশ উপলক্ষ্যে (১৮৭৫ সালে) নেক্রাসভ ও দস্তয়েভস্কির মধ্যে আবার নতুন করে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২. 'গরীব মানুষ' পাঠ করার সময় নেক্রাসভ ও গ্রিগোরোভিচের প্রতিক্রিয়ার কথা গ্রিগোরোভিচ-ও স্মরণ করেছেন। লিখেছেন, 'আমি পড়ছিলাম। শেষ পাতায়, যেখানে দেভুশকিন ভ্যারেংকাকে ছেড়ে যায় আমি আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি। নেক্রাসভের দিকে তাকিয়ে দেখি তার দু'গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে।'

৩. নিজের বয়স দস্তয়েভস্কি ঠিক লেখেন নি। ঘটনাটি ১৮৪৫ সালের, তাঁর জন্ম ১৮২১ সালের ৩০ অক্টোবর (নতুন ক্যালেণ্ডার অনুসারে)।

প্রবীণ নাট্যকারের একাঙ্ক নাটক

একাঙ্ক নাটক। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কুড়ি টাকা। মনীষা। কলি-৯

বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের অন্যতম স্রষ্টা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চল্লিশের দশক থেকেই তাঁর নাটকগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন যে চল্লিশের গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা থেকেই দিগিন্দ্রচন্দ্র এর সঙ্গে অভিন্নসূত্রে জড়িত। তাঁর প্রথম নাটক—'দীপশিখা'। ১৯৪৩-এর মহাদুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্ভাসিত। এই সময়ের আরেকটি বহুল প্রচারিত নাটক বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। 'দীপশিখার' ঠিক একটি বছর পরে একই মহাদুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত। দিগিন্দ্রচন্দ্রের 'দীপশিখা' নাটকখানি দিল্লীতে অভিনীত হবার সময় পুলিশী হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ দিগিন্দ্রচন্দ্রের পরবর্তী নাটক—'অন্তরালে' (১৯৪৪)। তারপর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ১৯৪৭-এ তিনি লিখলেন 'বাস্তভিটা'। এতে উদ্ঘাটিত পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের ছন্নমূর্তি। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাক—এই শুভ বোধই নাটকের বিষয়বস্তু। এরপর তিনি লিখে চললেন সমকালের চালচিত্র—'তরঙ্গ', 'পূর্ণগ্রাস', 'মোকাবিলা', 'মশাল' প্রভৃতি। জীবন-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রশংসনীয় ভিন্নস্বাদের ফসল—'পূর্ণগ্রাস', 'অপচয়', 'এপিঠ-ওপিঠ' প্রভৃতি।

সম্প্রতি 'মনীষা' গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'একাঙ্ক বিচিত্রা'। বারোটি একাঙ্ক নাটকের জীবননিষ্ঠ সংকলন। সংকলনের নাটিকাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যাই শুধু দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকের বিষয়বস্তু নয়. তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার অভিনবত্বও ধরা পড়েছে একাঙ্ক গুলিতে। প্রায় প্রতিটি নাটিকার বিষয়বস্তু নাট্যকারের অনুভবে, অভিজ্ঞতায় ও কল্পনায় সমৃদ্ধ আর উপস্থাপনের গভীরতায় স্বচ্ছ। আধুনিক প্রবলেম, নিউড্ সোসাইটি, অশ্লীলতা, সমাজতন্ত্র, বিপ্লব, মধ্যবিত্ত জীবননাট্য, দলাদলি ও রাজনীতির কারসাজি, বঙ্গভঙ্গজনিত বাঙালী জীবনের

বৃত্তাকার সমস্যা, সাংবাদিকের প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি খুঁটিনাটি প্রাত্যহিক জীবনের চালচিত্র—নাট্যকারের কলমের ছোঁয়ায় স্পর্শনীয়। কিন্তু উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্যে সমস্ত নাটকের মধ্যে এমনই এক জীবনাদর্শ সুস্পষ্ট যা স্ফটিক স্তম্ভের মতো কাছে টানে।

নাট্যকার জানেন মানুষ মহৎ বলেই অমর। 'সীমান্তের ডাক' এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক। শিবনাথ, রাধারাণী ও সমীরের দেশজননীর প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে রসোত্তীর্ণ। এর পরেই সংকলনের 'গোলটেবিল' একাঙ্কটির কথা উল্লেখ করা যায়। এটি নাট্যকারের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবননাট্য যেন সত্য ও সাহসের আগুনের ফুল। কাগজের সাধারণ সংবাদ-দাতা, মুদ্রক ও সহধর্মীদের বঞ্চনার কাহিনী। 'গোলটেবিল' নাটিকায় নিউজ-এডিটর ও ডাইরেক্টরের কথাবার্তায় যে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে তা স্বতঃসিদ্ধ। নাট্যকারের 'বোধন' নাটকটি নান্দনিক সৌন্দর্যে শিল্পমণ্ডিত মনে হয়েছে। দুলাল, সোনাতন ও দুর্গা—মাত্র তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে এখানে সংগ্রামী চেতনার প্রতিচ্ছবি মহৎ মানবিক বেদনায় উৎসারিত। নাটক যে জীবনের অঙ্গীভূত তারই সার্থক রূপায়ণ 'বোধন'।

সংকলনের 'আগ্নেয়গিরি' নাটিকাটিতে আধুনিক যুগের এক সাংবাদিকের জীবনতৃষ্ণা, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, আবেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিল্পীর সচেতনতায় প্রতিফলিত। নাটিকার মধ্যে নাট্যকার যেন অনাবিল আনন্দের ও কৌতুক রসের একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। সামাজিক চাপে কীভাবে একজন সাংবাদিকের জীবনযাত্রা দুঃসহ হয়ে ওঠে এই নাটিকায় লভ্য তারই করুণচিত্র। এখানে পারিবারিক জীবন অবহেলিত। নাট্যকার বিনতা চরিত্রের মধ্যে মহত্ত্বের উত্তরণ দেখিয়েছেন। নাটিকাটিতে সুন্দরভাবে সমসাময়িক জীবনকে তিনি শিল্পের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। 'মেঘের আড়ালে সূর্য' নাটিকাটি অনবদ্য, এক কথায় নান্দনিক অভিব্যক্তিতে প্রাণবন্ত। নাটকের মধ্যেই জীবনের বিচিত্র ছবি কত সুচারুরূপে উপস্থাপিত করা যায় তারই দৃষ্টান্ত হল 'মেঘের আড়ালে সূর্য'। ভুল রাজনীতি মানুষকে যতটা সংগঠিত করে তার চেয়ে বেশি করে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে দূরে সরিয়ে দেয়, এটা লক্ষ্য করে শ্রেণীসংগ্রামের ব্যর্থ দিকটি তিনি 'মেঘের আড়ালে সূর্য' নাটিকাটিতে উপস্থাপিত করেছেন। মানুষ যে হারে না, তারই মন্ত্র খুঁজেছেন ভবেশ। বস্তুত নাটিকাটি প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক চিন্তার সোনার ফসল।

নাট্যকারের দৃষ্টিতে কৃষকনেতা, ভাগচাষী, জোতদার কেউ বাদ পড়েনি। মাটির কাছাকাছি এইসব মানুষেরা 'রক্তরাঙা সিঁথি' নাটিকায় ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্ময়। মধু জোতদারের চরিত্রটি স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রতীক হিসাবে জীবন্ত। সহজ সরল গরীব চাষী প্রতিনিধি পূর্ণেন্দু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে এক সাহসী ও জেদী কৃষকের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নারী চরিত্র অঙ্কনেও নাট্যকারের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। সংগ্রামের প্রতিমূর্তি দুর্গা সত্যিই অবিস্মরণীয়া।

নাট্যকার সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে অতিবিপ্লবীপনার ইতিহাস চিত্রিত করেছেন তাঁর 'মুখর রাত্রি' নাটিকায়। সমাজের আমূল পরিবর্তনের স্বপ্নে উৎসর্গীকৃত প্রাণ অনিমেষ। প্রেরণার মূর্ত প্রতিমা মা সুষমা। বাবা প্রভাকর পুলিশের লোক, ছেলে বিপ্লবী। বাবা ও ছেলের সঙ্গে তফাত এইখানে। এরা একে অপরের শ্রেণীশত্রু। অথচ শ্রেণীশত্রুদের খতম করেই বিপ্লব আনতে হয়। নাট্যকার বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শিল্পীসত্তাকে এই নাটিকায় নিংড়ে তুলে ধরেছেন।

'কাঁঠালের আমসত্ত্ব', 'কিন্তু এবং সুতরাং', 'দস্তুর মতো প্রহসন', প্রভৃতি নাটিকাগুলির মধ্যে কৌতুকজনক বিচিত্র সমকালীন ঘটনাবলীকে সৃষ্টিকৌশলে রসগর্ভ করে তুলেছেন। জাতীয় সংহতির নামে যে প্রহসন, সার্বভৌম ও বিশ্বভৌম নিয়ে যে সম্মেলন কিংবা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যে প্রতারণা কিংবা সমাজতন্ত্রের নাম করে কৃষক-শ্রমিকদের প্রতারণা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি তিনি আভাসে ইঙ্গিতে ফুটিয়েছেন। বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে একটি মূল্যবান দলিল 'সেই অগ্নিগর্ভ দিন'। নাটিকাটি সুচিন্তিত এবং সময়োপযোগী বলে নাট্যকার অভিনন্দনযোগ্য।

'বাঁধ ভেঙে দাও' নাটিকাখানি আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা ও ব্যর্থতার অর্থপূর্ণ প্রতিভাস। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তরুণ সমাজ যেভাবে জোতদার ও আড়তদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে তারই আভাস আলোচ্য নাটিকার উপজীব্য বিষয়।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের একাঙ্ক নাটকের নাট্যমূল্য যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি সাহিত্য-মূল্যও কম নয়। তাঁর রচিত সংলাপ চরিত্রানুযায়ী ও যথাযথ। কথ্যভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নাট্যকার সচেতন। একটা সহজাত বোধ দিগিন্দ্রচন্দ্রের সমস্ত নাটিকাগুলির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাট্যকারের পরিশীলিত জীবনবোধ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে অন্তর্মুখী করেছে। তত্ত্ব বা রূপক

তাঁর নাটককে জটিল করে তোলেনি। আসলে একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন তাঁর নাটককে শিল্পোচিত ভাবে ধরা পড়েছে, এইখানেই নাট্যকারের কৃতিত্ব।

প্রচ্ছদ সুন্দর। একজন বর্ষীয়ান নাট্যকারের নাটিকাগুলি একত্রে সংগ্রহ করে প্রকাশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মনীষা ধন্যবাদার্হ।

নীরেন্দু হাজরা

দায়বদ্ধ কবি ও কবিতা

পালাতে পারি না: ধনঞ্জয় দাশ। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬
দাম: পাঁচ টাকা

"আমি সূর্যের শরে রাত্রিকে বিদ্ধ করেছি
এসো, আজ প্রভাতকে বন্দনা করি।
এসো, গ্রাম-বাঙলার অজেয় ফেরারী সেনা
এখানে দাঁড়াও,
এসো, বারুদ-ঠাসা প্রাণে আজ আমরা সারি বাঁধি।

প্রভাত এসেছে, ঘুমন্ত ফসল-কন্যা হাসছে
হাওয়ায় উড়ছে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল
ডাকছে, ডাকছে তোমায় ঊর্ধ্বশিখা দুরন্ত যৌবন
সাড়া দাও, দখল জমাও, ফসল তোলো, ইজ্জত বাঁচাও!"

ধনঞ্জয় দাশ এই কথা বলে শেষ করছেন তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর আগে লেখা 'শর-সন্ধান' কবিতাটি।

আর পঁয়ত্রিশ বছর পরের 'অভিজ্ঞান' হল:

আমাদের স্বপ্নগুলো হীরের কৌটোয় তুলে রাখো
আমাদের ভালোবাসা নকশাকাটা শালে মুড়ে রাখো।
কেন না সমস্ত দিন ঘৃণার কাদায় যায় হেঁটে
কেন না সমস্ত রাত চলে যায় রক্ত-পুঁজ ঘেঁটে।

আমাদের প্রীতিগুলো ফুলের বাগানে পুঁতে রাখো।
আমাদের দুঃখ-সুখ গাছের কোটরে তুলে রাখো।
কেন না সমস্ত দেশ চষে আজ অন্ধ দুই ষাঁড়
কেন না ভারতবর্ষ মানে আজ কতিপয় ভাঁড়।

এই দৃশ্যান্তর কাল্পনিক নয়, একান্ত সত্য ও বাস্তব। ধনঞ্জয় দাশ কল্পিত-স্বর্গের আশ্রয় নেন নি। অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এসেছেন। অবশ্যই পট বদলে গেছে সম্পূর্ণভাবে। একদা যে আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার স্পর্ধা ছিল আজ তা অনুপস্থিত। একদিন ছিল বিশ্বাস। তার ভিত্তিভুমি ছিল সংশয়াতীত, প্রশ্নাতীত। এবং যৌবনও ছিল।

কি ছিল আর কি হল! সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাসে, কেন এমন হল? আবার মনে হয়—সকলেরই মন কি একই অনুভূতিতে দগ্ধ? খুঁজে দেখি। কাউকে পাই যার মুখের ভাঁজে ভাঁজে আর্তনাদ লুকিয়ে আছে। তাদের চোখের কোটর আছে, মণি নেই। মনে হয়, যেন অন্ধ শূন্য গহ্বর—মরা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। আর, সেই জ্বালামুখের এক প্রান্ত থেকে অন্য এক প্রান্ত মাকড়সা টান টান করে জাল বিছিয়েছে। জালে ধরা পড়ছে—রোদ, শিশির, শুকনো পাতা, খড়কুটো। আবার কাউকে দেখি সব ধুলো ঝেড়ে ফেলে জীবনের তালে তাল দিয়ে সৌভাগ্যের শিখরে উঠতে মরীয়া। কারো মুখটাই পালটে গিয়েছে। চেহারা আনকা। দৃষ্টিটা কেমন-কেমন।

পঁয়ত্রিশ বছর, কম কথা নয়! পৃথিবীর চেহারা কতই পালটে গিয়েছে! চেনা যায় না। কত ভাঙা-গড়া হয়ে গেল দেশে-বিদেশে। আর ধনঞ্জয় দাশের মতো কবি, যাঁদের কাছে কবিতা রচনা আর বিকৃত বিসদৃশ জীবনটা পালটে দেওয়া, ন্যায় ও নীতির জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল এক ও অবিভাজ্য এবং পুরুষার্থ, তাঁদের কাছে এই পঁয়ত্রিশ বছর শুধু মাত্র ৩৫ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ সেকেণ্ড নয়। আরো কোটি কোটি গুণ বেশি অন্য কিছু।

কিসে বেশি? কি বেশি? কেন বেশি? কি সেই অন্য কিছু?

বলা যাবে না। কারণ এটা বলা যায় না। বোঝানো যায় না। এ এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যা চেতনায় পুঞ্জিত। অথচ তার প্রতিধ্বনি নেই। সাম্যবাদী দুনিয়ার ছিন্নভিন্ন দশা—মস্কো-পিকিং-এর বিরোধ—কারো কারো কাছে ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র। আবার কারো কাছে শুধু ঘটনা নয়। ছিন্নভিন্ন হল তার সত্তা। পিকিং-এর সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধ কারো কারো কাছে একটা ঘটনা, যার পুনরাবৃত্তি ইতিহাসে বহু বার ঘটেছে। কারো কারো কাছে তা নয়, আরো কিছু। সে যেন নিজের হাতে নিজের শিশুর চিতায় আগুন ধরিয়ে অপলক তাকিয়ে আছে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ভাগাভাগি মারামারি, রেষারেষি শুধু ঘটনা নয়। আরো কিছু, আরো গভীরতম কিছু। কারো কারো কাছে এই হল তার গাঢ়তম পরাজয়, তার অস্তিত্বের বিকৃতি, তার

বাঁচার ব্যাখ্যা আর প্রচেষ্টার অর্থহীনতা। তাদের কাছে শুদ্ধ উচ্চারণ হল আর্তনাদ।

কিন্তু তারও ওপারে আরো আর একটা কিছু থাকে। তার খবর আমরা রাখি না। রাখার চেষ্টা করলেও বুঝতে পারি না। কারণ সে বড় গোপনচারী, অন্তঃশীলা। অথচ আমরা তার মধ্যেই আছি। আমরা তার মধ্যে শ্বাস নিচ্ছি। সে হল আমাদের সংস্কৃতি, যাকে আমরা কালচার বলে থাকি। প্রাগৈতিহাসিক আচারনিষ্ঠ, সংস্কারবাদী জীবনযাত্রার সঙ্গে আণবিক যুগের সাম্প্রতিকতম সফিসটিকেশনের সহাবস্থানের ফলে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং সেই মানসিক জগতের ও অন্তর্লোকের চেহারা কি—তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই এবং আমরা বিচলিতও নই। আমরা অনেকেই স্বীকার করতে নারাজ যে একালেই নিহিত আছে আমাদের সংস্কৃতির গভীরতম সংকটের বীজ। আমরা স্বীকার করতে নারাজ যে আমরা স্বভাব ভ্রষ্ট, আমরা পরের জামা গায় দিয়ে আছি।

কিন্তু এ সব কথা এখন থাক। কারণ এর জটিলতা গভীর ও বিচিত্র। সঠিকভাবে সমস্যাকে তুলে ধরার ক্ষমতা আমার নেই। বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে এইটুকু প্রয়োজনীয় যে এই পঁয়ত্রিশ বছরে শুধুমাত্র কংগ্রেসের পতন আর জনতার উত্থান হয়নি। এই পঁয়ত্রিশ বছরে সামন্ততান্ত্রিক এবং সংস্কারবাদী প্রাগৈতিহাসিক সামাজিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটা চতুর বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, টেকনিকাল নো হাউতে আমরা বিশ্বের সঙ্গে টেক্কা মারার মতো অবস্থায় এসেছি। একটা ধূর্ত এলিট গোষ্ঠি ও সরব মধ্যবিত্ত শ্রেণী এসেছে, যারা বামপন্থী আন্দোলনের মেরুদণ্ড। এসব বাইরের ঘটনা। এগুলো ঘটেছে। অনস্বীকার্য কারণ ঐতিহাসিক।

এ ছাড়া আরও তাৎপর্যময় ও বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্তন আমাদের অন্তর্লোকে আমাদের মূল্যবোধে। অথবা মূল্যবোধের অবমূল্যায়নে বা আত্মিক শূন্যতায়। তার সঠিক চরিত্র, আমার প্রাচীনতম দেশের সুবিপুল ও শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রেক্ষাপটে এখনো আমাদের কাছে অস্পষ্ট।

বুদ্ধির কাছে অস্পষ্ট হলেও বোধের কাছে অনুভবের কাছে ঝাপসাভাবে অন্য কোন ছায়া এসে পড়ে। চমকে উঠতে হয়। ধনঞ্জয় দাশ দায়বদ্ধ সংগঠনের কাছে; এবং সেই সূত্রে, সম্ভবত ধনঞ্জয় দাশের বিশ্বাস, তিনি জীবনের কাছেও দায়বদ্ধ। তাই তিনি পালাতে পারেন না।

দায়বদ্ধ শব্দটা 'কমিটমেণ্ট'-এর বাংলা হিসেবে ব্যবহৃত। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন—ব্যাপক অর্থে মার্কসবাদে, কিন্তু কার্যত ও প্রকৃত অর্থে সাংগঠনিক তত্ত্ব ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রতি আনুগত্য হল কমিটমেণ্ট। অস্তিত্ববাদীর কমিটমেণ্টের গূঢ় ব্যঞ্জনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই সার্ত্র-এর কমিটমেণ্ট আর মার্কসবাদীদের কমিটমেণ্ট ব্যবহারিক দিক থেকে পরস্পরের কিছুটা ঘনিষ্ঠ বলে মনে হলেও মূলত ভিন্ন। কিন্তু ধনঞ্জয় দাশ অস্তিত্ববাদী নন, তিনি মার্কসবাদী। মার্কসবাদের প্রতি আনুগত্য রেখে মানবসমাজের সামগ্রিক প্রগতিতে নিষ্ঠাবান হওয়াকে তিনি কমিটমেণ্ট বলে মনে করেন। সুতরাং দৃশ্যত পরাজয় ও পতনের মাঝখানে তাঁকে নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে নিতে হয়। এ হল ইতিহাসের নির্দেশ, ফলত জীবনের। তিনি বলেন 'পালাতে পারি না'। তাই মনে হয়, নিজের কাছ থেকে, নিজের বোধ ও বুদ্ধি-চৈতন্য থেকে, নিজের সত্তা থেকে, পালাবার কথা তিনি বলছেন না; যেমন বলেছেন অনেক বিদেশী আধুনিক কবি। তিনি 'বৃক্ষ' প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৃক্ষ এমন অর্থ ও ব্যঞ্জনা পেয়ে এসেছে যে, তার সুগভীর তাৎপর্য আধুনিক আমাদের কাছে যথাযথ ও স্পষ্ট নয়। 'পালাতে পারি না' কবিতায় ধনঞ্জয় দাশের আশ্রয় 'বৃক্ষ'। ভল্গা-গঙ্গা পার হয়ে শত শত শতাব্দী অতিক্রম করেছে যে বৃক্ষের শিকড় সেই বৃক্ষ নিশ্চয়ই প্রবহমান জীবন। তার পরে মনে হল তিনি এই বৃক্ষ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন হয়তো আমাদের দেশকে। 'জ্বরে-বিকারে, আচ্ছন্ন চেতনায়' নামক কবিতায় যে-বৃক্ষ এল তা মুখ্যত স্বদেশ। 'আদিম বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়, শুকনো ডাল ভেঙে পড়ে।' কিন্তু 'পালাতে পারি না'-র বৃক্ষ কি? কেন তিনি পালাতে পারেন না? তিনি বলেন :

> "সব জানি, তবু ঐ শাখার আশ্রয় ছেড়ে
> চলে যেতে বড় মায়া লাগে
> বৃন্তচ্যুত হতে খুব ভয়
> তাই আমি পালাতে পারি না।"

তা হলে পালাতে না-পারার কারণ—ভয় আর মায়া, কিন্তু কার কাছ থেকে পালাতে চান তিনি? ধনঞ্জয় দাশ মেটাফিজিক্যাল কবি নন। মৃত্যু, সত্তা ইত্যাদি তাঁর কাছে প্রশ্ন নয়। ধনঞ্জয় দাশের মার্কসবাদের বিশ্বাস নিঃশর্ত। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, তিনি স্বদেশ বা প্রবহমান জীবন থেকে পালাতে অসমর্থ। কিন্তু দেশ আর প্রাণের কাছ থেকে না পালাবার কারণ কি তবে

শুধু ভয় আর মায়া? অবিশ্বাস্য। তবে কি তাঁর সংগঠন? সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন, আসতে পারে একাকীত্ব, শূন্যতা। সেই জন্যে থাকা? তাই কি? বহু দিন আছেন বলে কি মায়া?

কিন্তু এই কুহেলি-মেদুর সেনটিমেনট্যাল আত্মজিজ্ঞাসার গণ্ডি পার হতে না হতেই ধনঞ্জয় স্বাভাবিক, ফলত সুন্দর। ক্রোধ-অভিমান ও দীপ্তি নিয়ে প্রখর। স্মৃতি মনে ভিড় করে। সেই স্মৃতি স্নিগ্ধ নয়। সেই স্মৃতি রক্তাক্ত বিষাক্ত। এই স্মৃতি তাঁর সত্তা। ধনঞ্জয় দাশের মনে পড়ে সেই সব বহ্নিমান বীরের কথা, যাঁরা 'বন্দেমাতরম্' বলে হাসি মুখে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েছে। সেই আগ্নেয় যৌবনের দিনগুলি। মনে পড়ে 'ইনকিলাব' 'জিন্দাবাদ' বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে গুলিবিদ্ধ কত মহান ও অবিস্মরণীয় বিপ্লবী। সেই অন্ধ ও উন্মাদ ঝড়ের ঈগল! তারা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। আমরা তাঁকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। পারি না। কোথায় তারা?

"এদের ঠিকানা কেউ দিতে পারো,
এরা সব এখন কোথায়?
আমি কি লেনিন সরণী যাবো
না, ওই চ্যুতস্বর্গ খালাসি টোলায়?"

[ছিন্ন স্মৃতি, হারানো ঠিকানা]

এই যে নিরন্ধ্র ও সার্বিক ও পতন, এই যে সর্বনাশ—এর গভীরতা ধনঞ্জয় দাশকে স্পর্শ করেছে। প্রসঙ্গত বলা ভালো, 'খালাসিটোলা' শব্দটার অর্থ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে কবি ও তাঁর অনুভবের ওপর অবিচার করা হবে। শুধু তা নয়, যে-সর্বনাশ আমাদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ঘটে গেল, তার সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্বকে ছোট করে দেখানো হবে। এর রাজনৈতিক তাৎপর্যকে তুচ্ছ করার ফলে বিশ্বজোড়া অশুভ শক্তির সহায়ক আমরা হবো। আমরা বুঝতে অসমর্থ হবো অশুভ শক্তির প্রচ্ছন্ন ও অব্যর্থ চাতুর্য। ঠিক এই চাতুর্যে ওরা বিপথগামী করেছিল ইন্দোনেশিয়ার যুবককুলকে, বিপথ চালিত করেছে আর্জেনটিনাকে। মনে রাখা ভাল, খালাসীটোলা বলতে বোঝানো হচ্ছে কয়েকটি উজ্জ্বল মূল্যবোধের পতনকে, কোন স্থান আর সেই স্থানের সঙ্গে যুক্ত কাজকর্মকে নয়। এই প্রশ্নকে, এই পতনকে, তার কার্যকারণকে এখনো আমাদের দেশে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করা হয় নি। এবং যতটুকু হয়েছে তার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও ব্যক্তিগতভাবে আমি আশঙ্কা পোষণ করি। কিন্তু সে প্রশ্নও এখানে বিচার্য নয়। এখানে বিচার্য

স্থূল সামাজিক বাস্তবতা। আর দায়বদ্ধ কবি হিসাবে তাঁর প্রখর প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের যোগ্য।

এই দায়বদ্ধতার কারণেই সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষুব্ধ ও আহত। তিনি যখন বলেন :

"দোহাই আপনার, ডান-বাঁ যে দিকে ইচ্ছে
দয়া করে এখন একটু নড়ুন-চড়ুন।" [দয়া করে নড়ুন-চড়ুন]

তখন অ্যান্টি-পোয়েট্রির ধাঁচে লেখা এই সংক্ষিপ্ত কবিতায় ধনঞ্জয় দাশ বলতে চান, সাম্প্রতিক অবস্থা মোটেই সুখকর নয়। মৃত্যুর সূচনা। তবু, চলার জন্যে চলা! এই তত্ত্বে প্রৌঢ় বয়সে সায় দিতে আর ইচ্ছে করে না—এই যা! ডান-বাঁ, বাঁ-ডান, খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়,—এই করে তো চল্লিশ বছর কাটালাম। আর এই চল্লিশ বছরে ভিয়েতনাম স্বাধীন হল। সে কাম্পুচিয়ার মুক্তির জন্যে আজ বুক ফুলিয়ে সাহায্য করছে। আর আমরা সেই খাড়া-বড়ি-খোড়, খোড়-বড়ি-খাড়া করছি। আমি জানি এই কথা কটি পড়ার সঙ্গে অনেকেই বই বন্ধ করে আমাকে ধিক্কার দিচ্ছেন। কিন্তু আমি নাচার। অপচয়েরও একটা সীমা আছে। কেন আমরা পারছি না, আর কেন আমাদেরই সমবয়সী হয়ে ভিয়েতনাম পারল, তার কোন গভীর বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যদি পেতাম তবু তৃপ্তি থাকতো। প্রৌঢ় বয়সে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখা কঠিন।

অথচ এই ভিয়েতনাম আমাদের দোলায়। অনেক কবির মতই ধনঞ্জয় দাশও দোল খান। খুব কম কবি আছেন যিনি ভিয়েতনামকে মনে করে নিজের দেশের মাটির দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ হন, আত্মসচেতন হন, প্রশ্ন তোলেন। স্বকপোলকল্পিত স্বর্গের দিকে বোমা ছুঁড়ে মারেন। ধনঞ্জয় দাশও মারেন নি। তিনি বলেন,

"আর, রক্তের ডালে
দোল খায় দেখি
একটি নাম, ভিয়েতনাম।" [ভিয়েতনাম]

এবং এই ভাবে নিজেকে, নিজের অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দেন : স্বপ্নে-আত্মীকরণ করেন মুক্তির দিগন্ত—ভিয়েতনাম।

নিজেকে এই ভাবে বিছিয়ে দেন—কখনো ক্ষোভ আর ক্রোধ আর অভিমানের ভস্মশয্যায়, কখনো মুক্তির মেঘময় স্বপ্নে। তিনি বলেন : 'কেবল মাত্র যুগ-ধর্মে আবদ্ধ থেকে যেমন কবি মনের সিদ্ধি নেই, তেমনি যুগ চেতনাকে অস্বীকার করেও যুগোত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এই বিশ্বাসেই আমি কবিতার হাত ধরে চলতে শিখেছি এবং চলতে থাকবো।'—প্রায়-সমবয়সী আমিও এই প্রত্যাশা নিয়েই তাঁর পাঠক থাকবো। অনেকগুলি দৃঢ়, অস্বস্তিকর এবং চমৎকার কবিতার জন্যে বহু পাঠকের সঙ্গে আমিও আলোচ্য কবিকে অভিনন্দন জানাই।

রাম বসু

কলকাতায় পুশকিন-স্মরণ

কোন রঙ-চটা বা বিবর্ণ ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে নিথর, গম্ভীর স্মৃতি-চারণা নয়, গত দশই ফেব্রুয়ারি গোর্কি সদনের সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত পুশকিন-স্মরণের নাতিবিজ্ঞাপিত অনুষ্ঠান-সন্ধ্যাটি ছিল ভরপুর সজীবতায় টানটানি। মহান লেখক-ব্যক্তিত্ব আলেকজাণ্ডার পুশকিনের ১৫০ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সার্ধ-শতবর্ষে পা রাখা তাই ঐ স্মরণীয় দিনের আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যা আক্ষরিকভাবেই হয়ে পড়েছিল পুশকিনের উদ্দেশ্যে কলকাতাবাসীর বিনম্র প্রণাম নিবেদনের এক মহতী প্রয়াস অবকাশ।

অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় বাঞ্ছিত-বিন্দুতে পৌঁছোনোর সুচারু প্রয়াস ছিল। বলা বাহুল্য সে অভিযোজনার গুণে অনুষ্ঠান সংগঠনের উদ্দেশ্য অচিরেই উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর বুকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল রক্তে-মাংসে-স্পন্দনের সে মূর্তি, যাঁর নাম আলেকজাণ্ডার পুশকিন; ১১৯৯ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত তাঁর দেশ, কাল, অনন্য অভিযাত্রী পরিচয়ে তাঁর জীবন রূপের সঞ্চালন এবং সর্বোপরি ছিলা-ছেঁড়া স্বভাব পরিচয়ে যেখানে পুশকিনের কালজয়ী রচনা একেক পরতে বিস্ময় জাগানো পরমঘন অনুভূতির দিগন্ত, সবশেষে দামাল বিস্ফোরণ নিয়ে ফেটে পড়া দীপ্র এক মুগ্ধবোধ, তা অনুষ্ঠানের একটু বয়স বাড়ার মহূর্ত থেকেই অনুভূত হচ্ছিল।

একটি বাক্যে অনুষ্ঠান শুরুর হার্দ্য ঘোষণা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পর্দা উঠতে মঞ্চে রাখা পুশকিনের একটি প্রতিকৃতিতে ক্লোজ শটে আলো পড়ল, অন্ধকারের পটে উদ্ভাসিত শুধু একটি প্রোফাইল। সে আলোকে ধূসরতায় মুহূর্তে মিলিয়ে পেছনের বিরাট পর্দায় ফুটে ওঠা পুশকিন সম্পর্কীয় প্রামাণ্য চলচ্চিত্র; মুহূর্তে আবিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ রক্ত-মাংসের পুশকিনকে ছুঁয়ে ফেলেছে, তাঁর প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শ গায়ে এসে লাগছে। এ চলচ্চিত্রের

মাধ্যমে পুশকিনের লেখক হয়ে ওঠার প্রাক ও প্রবাহিত পট পর্বটি আমরা বেশ ভালো ভাবেই জেনে নিতে পারি, রচনার পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি রূপান্তরিত হয় অনুপম চিত্র-সৃষ্টিতে, চিত্রী পুশকিনের এ পরিচয়-ও তাক লাগিয়ে হৃদয়ে ধরা দেয়।

চলচ্চিত্রের পর পুশকিনের সাহিত্য কৃতির পরিচয় দান ও তাঁর প্রতিভার মূল্যায়নের অনুষ্ঠানটি উপযুক্ত প্রাসঙ্গিকতায় উপস্থাপিত হল। সমকালের পরম শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তিত্ব অরুণ মিত্র তুলে ধরলেন পুশকিনের লেখা, লেখনশৈলী, তাঁর লেখক-সত্বার পরিচয়। সংক্ষিপ্ত কথকতা অথচ কি নিগূঢ় অর্থবহ।

'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত নিবিড় ও আন্তরপরিচয়ে তুলে আনলেন জগৎবরেণ্য এ যুগান্তকারী প্রতিভাকে আমাদের মানসলোকে, অনুরণিত হৃদয়তন্ত্রীতে। তিনি সোভিয়েত সাহিত্য জগতে পুশকিনের অক্ষয় ও অবিস্মরণীয় অবদানের রূপটিকে তুলে ধরে 'জাতীয় কবি' হওয়ার অনন্য গৌরব তিনি অর্জন করেছিলেন কি যাদু তুল্য অলৌকিকতায়, তার রহস্যোন্মোচন করলেন। সম্মোহিত সমাবেশ অন্য এক উপহার পেল সদ্য করা পুশকিনের দুটি কবিতার সড়গড় অনুবাদ স্বয়ং অনুবাদক অমিতাভ দাশগুপ্তের অননুকরণীয় কণ্ঠের আবৃত্তিতে।

ফিরে আসা যাক আলোচ্যমান অনুষ্ঠানের কথায়। কবি অরুণ মিত্র এবং কবি অমিতাভ দাশগুপ্তর আলোচনার পর পুশকিনের লেখার ও কবিতার বিভিন্ন অংশ পাঠ প্রকৃতই জীবন্তভাবে গেঁথে দিল অনন্য পুশকিনকে। বিশেষ করে কৃষ্ণা পাল যখন পুশকিনের মূল লেখা পাঠ করছিলেন রুশ ভাষায় এবং পরে পরেই তার ইংরাজী তর্জমা, গভীরতর এক মাত্রা যোগ হল গোটা অনুষ্ঠানে। আই পি সি এর শিল্পীবৃন্দ অতিক্রম দাশ, সুজিত ঘোষ, চিন্ময় আদক পরিবেশন করলেন মর্মগ্রাহী করে আলেকজাণ্ডার পুশকিন-এর কবিতায় সুরারোপিত গান ও তাঁর সম্পর্কিত গান।

অনুষ্ঠানের শেষে চল্লিশ মিনিটের একটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয়। নাটক 'ঝড়ের পাখি'। রচনা—চন্দন সেন। নির্দেশনা এবং আবহ সঙ্গীত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে—ললিত মুখার্জী। প্রযোজনায় ভারতীয় গণ সংস্কৃতি পরিষদ (আই পি সি এ)।

পুশকিনের মৃত্যুর দিন (১০ ফেব্রুয়ারি—১৮৩৭) এবং ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি এই তিন দিনের অন্তিক জীবনপর্ব নিয়ে এ নাটকের ঘটনা সংস্থাপন। নাটকের

ঘটনা প্রবাহে কুশীলব, পুশকিন নিজে, তাঁর স্ত্রী নাতালিয়া গঞ্চারোভা, পুশকিনের এক বালক-ভৃত্য নিকিতা, পুশকিনের দুই বন্ধু জিকোস্কি, কবি ও সুহৃদ কনস্ট্যানটিন ডাঞ্জেস এবং ব্যারন গেক্কার্ণ।

৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭-এ (পুরোনো বর্ষলিপি অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারি) আলেকজাণ্ডার পুশকিন পিটার্সবুর্গের কাছে চেরনায়ারেককায় ওলন্দাজবাসী ব্যারন গেক্কার্ণ-পুত্র জর্জেশ দান্তেশ-এর সঙ্গে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। গুরুতরভাবে আহত পুশকিন তার একদিন বাদে ১০ ফেব্রুয়ারি (২৯ জানুয়ারি) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মঞ্চে পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু আলোয় ভেসে ওঠে মুশকিল তাঁর লেখার টেবিলে লেখায় ডুবে আছেন। তাঁর জীবনের বড় কঠিন সংক্ষুব্ধ এ সময়কাল। নিজের সঙ্গে তিনি দারুন যুদ্ধরত। ১৮৩১ য়ে নাতালিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ। স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়া, ডিসেম্বরী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে জার-রোষে কিশনেভ, ওডেশা (ক্রিমিয়া), মিখালোভস্কয় তে নির্বাসন জীবন কাটিয়ে অবশেষে মস্কো হয়ে পিটার্সবুর্গে। স্ত্রী নাতালিয়া চায় এ ঝড়ের পাখি এবার শান্ত হোক; নাতালিয়াকে তুলে ধরেছেন এ নাটকে নাট্যকার, নাতালিয়া চান কবি পুশকিনকে কোন দামাল পরিচয়ে নয়, জারশাসিত রাশিয়ায় কোন ভোরের পাখি হিসেবে নয়, তিনি চান পুশকিন শান্ত, সমাহিত, অভিজাত জীবনাচরণের এক কবি, রাজঅনুরক্ত, আর দশজন-পাঁচজন মানুষের মতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অন্বেষী, তাতেই পরিতৃপ্ত প্রশংসিত এক নিবিষ্ট মানুষ। নাটকের দ্বন্দ্ব অভিযান এখান থেকে।

এ দ্বন্দ্বরাজ নাট্যকার নিপুণ মুন্সিয়ানায় তুলে এনেছেন নাটকে, পুশকিনের জীবনে এক অন্তর্দার্ণ অনুভূতির কাল-বেলা থেকে—স্ত্রীর প্ররোচনায় (তার প্রতি উজাড় ভালোবাসার হৃদয় নিঙরানো আকর্ষণ থেকেই) পুশকিন মাঝে কিছুদিন জার ও রাণী ক্যাথারিণের প্রতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বেষের উদ্যত ফণাকে নিস্তেজ রেখেছিলেন, এমনকী জারের প্রশস্তিসূচক কিছু কবিতা-মালাও রচনা করেছিলেন। নাতালিয়া এতে দারুণ উৎসাহিত হয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, মেলাচ্ছিলেন পুশকিনকে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন পূরণের অন্য হিসেব। এ হিসেবই একদিন নাতালিয়াকে পুশকিনের কাছ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অন্যখানে। জারের বিশেষ সুনজরে পড়া নাতালিয়ার রূপ সৌন্দর্য, নানাবিধ সরকারী সুযোগ-সুবিধার দিগন্ত তার জন্য খুলে যাওয়া,

আপন ভগিনীর সঙ্গে ব্যারণ গেক্কার্ণের পুত্র (অভিজাতরক্তধারী, লম্পট, অসচ্চরিত্র হওয়া সত্বেও) দান্তেশের বিবাহ প্রস্তাব,—নাতালিয়া হয়ে গিয়েছিলেন অন্য ভুবনের নায়িকা—তিনি দেখছিলেন তাঁর আকাঙ্খিত জগতের হাতছানি, সোপানে ওঠায় শুধু একমাত্র বাধা—জার এখনো পুশকিনকে সন্দেহ করেন, নাতালিয়া সেই পুশকিনের স্ত্রী, হয় পুশকিনকে হতে হবে জারের অনুগত, দাঁড়ের পাখি, নয় ঝড়ের পাখি.—যে পুশকিনকে মেনে নেওয়া নাতালিয়ার পক্ষে অসম্ভব। তাঁর প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চারণে স্বপ্ন-নায়িকা-হৃদয় চায় পুশকিনের উজ্জ্বলাস্ত পরিচয়ের মৃত্যু।

পুশকিনের হৃদয় জুড়ে তখন ঝড় চলেছে। চরিত্রহীন রাজশক্তি কোথায় তার থাবা তুলেছে তিনি তা দেখে স্তম্ভিত, বিমূঢ়। কি গভীর চক্রান্ত। তিনি তোলপাড়। মরিয়া হয়ে একসময় তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করেন ঐ জর্জেশ দান্তেশের সঙ্গে। আসলে এর পেছনে ছিল খুব আঁটঘাট পাতা এক চক্রান্ত জাল। পুশকিন ট্রাজেডির মহান, ধীরোদাত্ত নায়ক হয়ে সে চক্রান্তে বড় অসহায় শিকার। নাট্যকার চন্দন সেন বিন্দুতে সিন্ধু এনে পুশকিনের সে জীবন—দুর্মরতা আশ্চর্য ফ্রেমে বেঁধেছেন।

অভিনয় সম্বন্ধে এককথায় অনবদ্য অভিনয় সাফল্যের উল্লেখ করে সবিশেষ প্রশংসা করব প্রবীর দত্ত (পুশকিন), অমিতাভ ঘোষ (ব্যারণ গেক্কার্ণ) এবং নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পুশকিনের বালক অনুচর)। তাদের পাশে নাতালিয়াকে কিছুটা নিষ্প্রভ ঠেকেছে তবে পুশকিনের কাছে আবেগঘন প্রার্থনার চরম মুহূর্তটিতে তার অভিনয় সত্যি ঐ একটিবার জ্বলে ওঠার স্মরণীয় মুহূর্ত। মধুসূদন ত্রিবেদী এবং পরিচয় বসু যথাক্রমে জিওকোম্বি এবং কনস্ট্যানটিন ডান্জেস চরিত্র দুটিকে এবং প্রাসঙ্গিক নাটকীয় পরিস্থিতিকে সুপরিস্ফুট করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবে মনে হয়েছে নাটকের এ অংশের গ্রন্থনা কিছুটা শিথিল হয়েছে।' আরো উজ্জীবিত অভিনয়ে তাকে উতরানোর অবকাশ আছে।

দুটি জিনিষ নাট্যকারকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, পুশকিনের হাতে কনস্ট্যানটিনের আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়ার ব্যাপারটি বোঝা গেল না নাটকে অঙ্গীভূত হয়েছে কিভাবে? (বরং আগ্নেয়াস্ত্রটিকে না নেওয়া বা নিয়ে কোন সময়ে তার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলে তা কি আরো অর্থবহ হত না!) দান্তেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বের অমোঘ অপরিহার্যতা, এমন কি তার পেছনে পুশকিনের উদগ্রতার প্রামাণ্য কার্য-কারণও ততদূর স্পষ্ট নয়। কবি

পুশকিনের তীব্র ভাবাবেগের মূর্তিটিই তা না হলে চরম সত্য হয়ে ওঠে। শেষ দৃশ্যে কনস্ট্যানটিনের কবিতাটির অনুবাদ মনে হয় আরো প্রখর ও টানটান হলে নিশ্চিতভাবে তা আর হৃদয়গ্রাহী হত, (অনুবাদ স্বয়ং নাট্যকারের, কবিতাটি ছন্দের মন্থরতায় বা প্লুতহীনতায় আড়ষ্ট থেকেছে, যার ফলে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো ব্যাপারটি পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিপ্রেত হলেও অলভ্যই থেকেছে)।

নির্দেশক ললিত মুখার্জীর সুপরিচালনা, অনিন্দ্য আবহ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই বড় মাপের প্রশংসার দাবি রাখে। একটি ছোট্ট কথা এ সূত্রে বলতে চাই, পুশকিনের খোলা তরবারি হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য শেষ নিষ্ক্রমণের দৃশ্যটিতে একটু বাঞ্ছিত গিমিক আনা যেত না কি? মনে হয় তা আরো ব্যঞ্জনাবাহী উত্তরণের সহায়ক হত। নিষ্ক্রমনটি নাটকীয় উত্তেজনায় যেহেতু বড় নিরুত্তাপ বলেই চোখে লেগেছে। শেষ দৃশ্যে পুশকিনের পাঠকক্ষেই কফিন আনার দৃশ্যটির মঞ্চসজ্জা নিয়ে আরো সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। কাপড়ে এমব্রয়ডারি তোলা পুশকিনের দুটি কবিতার পঙতি (নাতালিয়ার উপহারটি) কফিনের উপর নিকিতা যেভাবে সংস্থাপন করেন তাকে আরো দৃশ্যগোচর করে, আলোয় উদ্ভাসিত করার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। পার্থ কুণ্ডুর আলোক নিয়ন্ত্রণ যথার্থ তারিফ পাবার যোগ্যতা রাখে।

অপূর্ব কর

অমলেন্দু চক্রবর্তী পুরস্কৃত

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবছর নরসিংহ দাস পুরস্কার দিয়েছে কথাশিল্পী অমলেন্দু চক্রবর্তীকে। তাঁর উপন্যাস যাবজ্জীবনের জন্য এই পুরস্কার। যথার্থ সাহিত্য পাঠকরা এ সংবাদে আনন্দিত হবেন, সন্দেহ নেই। পরিচয়ের পাঠকদের আনন্দ একটু বেশী হওয়ার কারণ অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রকৃত অর্থেই পরিচয়ের লেখক। পরিচয় ও অন্যান্য সহযোগী পত্রপত্রিকাতেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে গল্প-উপন্যাস লিখে আসছেন।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির নাম বিপন্ন সময়, গোষ্ঠ-বিহারীর জীবন-যাপন, আকালের সন্ধানে, যাবজ্জীবন, প্রকাশিত গল্পের বই অবিরত চেনামুখ। তাঁর গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে সার্থক চলচ্চিত্র নির্মিত

হয়েছে। সাহিত্যের যে ধারা আমাদের উজ্জীবনের পথ দেখায় অমলেন্দু সেই প্রগতিশীল ক্ষুরধার-পন্থার পথিক। আমরা তাঁর স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে প্রকৃতই আনন্দিত।

মলয় দাশগুপ্ত

কবিপত্র-র বিষ্ণু দে-র সংখ্যা

একটা পত্রিকার পক্ষে আঠাশ বছর সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকাটা নিঃসন্দেহে শ্লাঘার বিষয়; বিশেষত কবিতা বিষয়ক কোনো লিটিল ম্যাগাজিনের পক্ষে। এই সূত্রে যে'কটি পত্রিকার কথা আমাদের মনে আসে, 'কবিপত্র' তাঁর মধ্যে প্রথম সারির। ইতিমধ্যেই 'কবিপত্র'-এর পাতায় আমরা পেয়ে গেছি নীরদ মজুমদারের বাল্যস্মৃতি, শিল্প বিষয়ক সংখ্যায় প্রকাশ কর্মকারের মননশীল নিবন্ধ, পিকাসোর একাঙ্ক নাটক অথবা গত তিন দশক ধরে বাংলা কবিতার ধারাবাহিক পালাবদল ও উত্তরণ। পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটি বিষ্ণু দে-র কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান আলোচনা এবং মূল্যায়ণে সমৃদ্ধ। পাঠকের নিশ্চয় স্মরণে আছে, বিষ্ণু দে-র জীবৎকালেই 'পরিচয়' তাঁর সম্মানে একটি মহার্ঘ সংখ্যা প্রকাশ করে।

হয়তো এই পরিকল্পনার মাধ্যমেই বোঝা যাবে পত্রিকাটির ধ্যানধারণা অথবা চিন্তার গতিপথ। কবিপত্নী প্রণতি দে থেকে সুরু করে এখানে লিখেছেন অনেক তরুণতম লেখকও। নবীন এবং প্রবীনদের এই শ্রদ্ধা ও মূল্যায়ণ থেকেই বিষ্ণু দে-র কবিতা সামগ্রিক চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কবিপত্র'-এর এই ধরনের শিকড়-সন্ধানী প্রকল্পটি আধুনিক প্রজন্মের কাছে প্রেরণার হয়ে উঠতে পারে, যদি দেখা যায়, বিষ্ণু দে-র কাব্যভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা খুঁজে নিতে পারি জীবনযাপনের কবিতাকে।

অরুণ চৌধুরী

কবিতা উৎসব

শুধু কবিতার জন্য সাতদিন ধরে একটি উৎসব তাও 'এই নগরমনস্ক ব্যস্ত শহরে এবং কবিতা-ব্যতিক্রমী মানুষদেরও সেই উৎসবে সামিল হওয়া বোধহয় এই নগরেই সম্ভব। নগরটি যে মৃত নয় বরং সাংস্কৃতিক প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর তা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে পড়ে নন্দনে অনুষ্ঠিত কবিতা উৎসবে। কবিতা উৎসবের আয়োজক আবৃত্তিলোকের সঙ্গে এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহিত্য একাডেমি ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ১৪, ১৫, ১৮, ১৯ জানুয়ারি উৎসব কেন্দ্র ছিল নন্দন। রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধায় ১৬, ১৭ অনুষ্ঠান হয়েছে শান্তিনিকেতনে, শ্যামলীর সামনে উত্তরায়ণ প্রাঙ্গনে। ২০ জানুয়ারি সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় জাতীয় গ্রন্থাগারে। সারা ভারতের ভিন্নভাষী কবিদের সঙ্গে এ বঙ্গের প্রবীণ ও নবীন কবিরা 'স্রেফ হৃদয়ের প্রসারতার ওপর ভিত্তি করে এ হেন অনুষ্ঠান যে করা যায়, করা সম্ভব' —তার একটা দৃষ্টান্ত রাখলেন, বিভিন্ন দিনের আলোচনায়, কবিতা পাঠে অংশ নিয়ে।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন দিন অর্থাৎ ১৪ জানুযারি উদ্যোক্তারা সম্বর্ধনা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। তিনিও প্রত্যুত্তরে যথার্থ বলেছেন, এই অনুষ্ঠান তাঁকে 'আরো দশটি কবিতা লেখার প্রেরণা' যোগাবে। এ দিনই ছিল আরো একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান, বিষ্ণু দে-র 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত' অবলম্বনে গান ও পাঠ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরে কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গান ও ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ ঘোষের পাঠ অনুষ্ঠানটিকে মনোজ্ঞ করেছে। উৎসবের উদ্বোধক ছিলেন ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সাহিত্য একাডেমির ডিরেক্টর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, উৎসব সভাপতি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র মিত্র প্রমুখ উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

অন্য দিনের অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্বে ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনার বিষয়গুলিও সুনির্বাচিত এবং কবিতাকেন্দ্রিক। 'আধুনিক কবিতা ও বর্তমান পাঠক সমাজ'; 'সাম্প্রতিক কাব্যের জগত : তার সমস্যা এবং সম্ভাবনা'; 'ভারতীয় কবিতায় ভারতীয়ত্ব'। অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অশীন দাশগুপ্ত, ডঃ ভবতোষ দত্ত, মালিনী ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা), নীলমণি ফুকন (অসমীয়া). প্রবজ্যোত কাউর (পাঞ্জাবী), কেদারনাথ সিং (হিন্দী), চন্দ্রকান্ত শেঠ (গুজরাতি),

দাশরথী (তেলেগু), বসন্ত আবাজি ডাহাকে (মারাঠি) প্রমুখ কবি ও অধ্যাপকদের আলোচনায় অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০ তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগারে 'শতবর্ষে সুকুমার রায়' অনুষ্ঠানটিও তাৎপর্যময় হতে পেরেছে লীলা রায়, নলিনী দাসের আলোচনা ও রণজিৎ রায়ের সুকুমার রায়ের ছড়ার গানে। এ ছাড়াও 'সংবর্ত' সংস্থা নন্দনে দুদিন দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন—রাইনার মারিয়া রিলকের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে নাট্যময় কোলাজ 'অতন্দ্র গোলাপ', অপরটি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদ ও নাট্যভাষ্যের 'হোল্ডারলিনকে নিয়ে নাট্য রূপক'। অধিকন্তু প্রাপ্য ছিল ১৬ তারিখে শান্তিনিকেতনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসুর কবিতা বিষয়ক আলোচনা ও প্রবীণ শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে 'কবিতা ও সুরে'র দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।

গত দু বছরের কবিতা উৎসবে মূলতঃ দুই বাংলার কবিরা অংশগ্রহণ করে জাতীয় সংহতির ভিন্ন রূপটি প্রকাশ করলেন। দেশে যেভাবে ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে 'জাতীয় কবিতা উৎসব' আখ্যায়িত এ উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। বিভিন্ন দিনের কবি সম্মেলনে এপার বাংলার কবি অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ ও শতাধিক নবীন কবির সঙ্গে ভিন্নভাষী নীলমণি ফুকন, সীতাকান্ত মহাপাত্র, কেদারনাথ সিং, প্রবজ্যোত কাউর, চন্দ্রকান্ত শেঠ, বসন্ত আবাজি ডাহাকে, দাশরথী, নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন (ওড়িয়া), রাজ বর্মা (ইংরেজী) প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুব্রত রুদ্র, রাণা চট্টোপাধ্যায়, তাপস বসু বিভিন্ন দিনের কবি সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, তরুণ পাল, অমিতাভ বাগচি, রঙ্গলাল লাহিড়ী, নূপুর বসু, তারাপদ ঘোষ প্রমুখেরা রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি করেন।

'সাম্প্রতিক ভারতীয় কবিতার ধারা'র ওপর এবারের প্রদর্শনীটিও ছিল আকর্ষক। কবি শঙ্খ ঘোষের পরিকল্পনায় ও শিল্পী পৃথ্বিশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্গসজ্জায় এ প্রদর্শনীটি প্রকৃতই কবিতার একটি ইতিহাস অ্যালবাম ছিল যেন বা।

প্রদীপ পাল

অগ্নিকন্যা বীণা দাস (ভৌমিক)

বীণা দাসের সাম্প্রতিক মৃত্যুতে সকলেই বিচলিত। পরিণত বয়সেই তিনি গেছেন, কিন্তু তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মত তিনিও তো আরও কিছুদিন বাঁচতে পারতেন। মনে হয় জীবনের আর কোনও কাজই তাঁর ছিল না বলেই এই স্বেচ্ছামৃত্যু তিনি বরণ করে নিলেন। তাঁর প্রাণের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছিনা—কিন্তু তিনি যদি আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের স্নেহের কোলে মারা যেতেন তাহলে হয়তো আমাদের বেশী ভাল লাগত। তাঁর স্বামী জ্যোতিশ ভৌমিকের মৃত্যুর দেড় মাসের মধ্যে তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

শৈশব তাঁর কেটেছে এক সুন্দর স্নেহশীল পরিবেশে ও আদর্শময় পরিবারে। পিতা বেণীমাধব দাসের নাম এমনিতেই খুব সুপরিচিত—আদর্শ শিক্ষক হিসাবে, যাঁর কথা সুভাষচন্দ্র বসু অনেকবার উল্লেখ করে গেছেন। তাদের ভাইবোনদের মধ্যে বীণাদি ও কল্যাণীদি তখনকার অগ্নিগর্ভ আবহাওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন এবং সেই স্বদেশীযুগে—তৎকালীন দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণও করেন। আদর্শ পিতার শিক্ষা এই দেশপ্রেম জাগাবার পক্ষে অতি সহায়ক ছিল। তাঁর অগ্রজা কল্যাণী দাস ছিলেন ছাত্রী সংঘের নেত্রী ও সংগঠিকা। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর ও তাঁদের বন্ধুদের নিবিড় যোগ। ফলে ১৯২৮ সাল থেকেই সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ও পরবর্তীকালে আইন অমান্য ও লবণ আইন ভঙ্গের যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে বেথুনের ছাত্রীরাও জড়িয়ে পড়েন যার অন্যতম নেত্রী ছিলেন কল্যাণী দাস। এর বেশ কিছু পরিচয় আছে কমলা দাসগুপ্তের লেখা মেয়েদের জীবনীগুলিতে।

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সচেতন মানুষদের চুপ করে বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। বীণাদিদের পরিবার উত্তর কলকাতায় যে বাড়ীতে বসবাস করতেন তার তিনতলায় থাকতেন বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার

ও অনুজা সেন প্রভৃতি। বিখ্যাত ডালহৌসী বোমার মামলায় টেগার্ট হত্যার প্রচেষ্টায় অনুজা সেন নিহত হন ও দীনেশ মজুমদার ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ অনুজা সেন কোনও কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে বীণাদিদের কলেজের আন্দোলন সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। এদের একজনের মৃত্যু এবং অন্যজনকে গ্রেপ্তারের পর, ডিসেম্বর মাসে শান্তি-সুনীতির দ্বারা কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার ঘটনা ঘটে। এরপর রাইটার্স বিল্ডিংএ লোম্যান নিহত হয় বিনয়-বাদল-দীনেশগুপ্তদের হাতে। এইসব নানাবিধ বিপ্লবী কাজের ফলে ব্রিটিশ সরকার অতি উগ্রমূর্তি ধারণ করেও প্রচণ্ড দমননীতি চালাতে থাকে। সেই সময়ে সমস্ত তরুণ ও যুবকদের সন্দেহ করা হোত। বিশেষ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে ছাত্র সত্যাগ্রহীদের উপর নিদারুণ অত্যাচার ও পীড়ন করা হয়—যার ফলে বহু ছাত্র অজ্ঞান বা অসুস্থ হয়ে পড়েন যদিও তাঁদের মনোবল অটুট থাকে। এতে বীণা দাস বিশেষ বিচলিত হন ও অত্যাচারী শাসনের প্রতীক বাংলার লাট সাহেব ষ্টানলি জ্যাকসনকে ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী যদিও সে গুলিতে গভর্ণর নিহত হননি কনভোকেশন হলে হত্যার জন্য গুলি করেন। অনেক আলোচনা ও ভাবনা চিন্তার পর এ কাজে তিনি নেমেছিলেন। একথা তিনি জানতেন যে তাঁর পিতামাতা স্বদেশী ভাবাপন্ন হলেও এধরণের কাজে খুবই আঘাত পাবেন, কিন্তু তারুণ্যের আবেগ প্রবণ মন কোন বাধাই মানেনি। তিনি এটাও জানতেন যে, তাঁর ফাঁসী বা দ্বীপান্তর হতে পারে—তবুও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এমন কাহিনী প্রচলিত আছে যে, এই ঘটনার পর তাঁর পিতার একরাত্রির মধ্যে সমস্ত চুল পেকে গিয়েছিল। এই ঘটনা বীণাদিকে খুব আঘাত দেয়। বীণাদির বিচার অতি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয় এবং তিনি নয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আদালতে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যদিও তখন সরকার সেটা প্রকাশ করতে দেয়নি। তাতে তিনি বলেছিলেন, কোনও বিশেষ মানুষের প্রতি বিদ্বেষবশত তিনি এ কাজ করেননি—অন্যায়ের ও অত্যাচারের প্রতীক শাসককে গুলি করে তিনি অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন মাত্র।

এর আগে কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার সঙ্গে দুজন কিশোরী জড়িত থাকলেও বীণা দাসের এই দুঃসাহসিক কাজ সমগ্র দেশে আলোড়ন জাগায়। তৎকালীন তরুণ সমাজ এতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। কারণ এটি সাধারণ হত্যাকাণ্ড ছিল না, এর সঙ্গে জড়িত ছিল গভীর দেশপ্রেম। এ যেন

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে প্রবল দেশ। সেই জাগাবার কাজে এই প্রতীকী চেষ্টা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিপ্লবীরা তো জানতেন তাঁদের সীমাবদ্ধতা কিন্তু তখনকার কালে সীমাবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামও যুবকদের মনে ব্যাপকভাবে সাহস ও স্বদেশপ্রেম জাগাতে সাহায্য করেছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের কথা আজকের প্রজন্মের যুবক বা ছাত্রছাত্রীরা কজনই বা বীণাদির নাম জানে? অথচ ব্যক্তিগত জীবনে বীণাদি ছিলেন ধীর নম্র এবং মধুর স্বভাবের মানুষ। এর জন্য সকলের প্রীতি ভালবাসা তিনি অর্জন করেছিলেন। তার ভগিনী কল্যাণী ভট্টাচার্যের 'জীবন অধ্যয়ণ' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কনভোকেশনের আগের রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারেননি—তাঁর এক সহপাঠিনীকে সারারাত ধরে গান করতে বলেছিলেন। পুলিশের অনেক জেরার পরও কে তাঁকে অস্ত্র জুগিয়েছিল সেকথাও কিছুতেই বলেননি তিনি।

তাঁর স্বভাবের বিনয় নম্রতার সঙ্গে বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞার মিশ্রণ ছিল। তিনি সমস্ত বরণের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন সাহসের সঙ্গে। মেদিনীপুর জেলে থাকাকালীন জেলার সাহেব কারণে অকারণে মেয়েদের সেলে ঢুকতেন। অনেক আপত্তি জানানো সত্ত্বেও ফল হয়নি। অবশেষে তারা অনশন করেন—কিন্তু জেলার নির্বিকার থাকেন। তাঁর পিতা দেখা করতে যাওয়ার সময় অনেক খাদ্যসামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু জেলকর্তৃপক্ষ তাঁরা যে অনশনে আছেন তখনও তা বলেনি। তাঁরা ষ্টেশনে ফিরে যাবার পথে একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী এই অনশনের খবর জানায়। পরে ঐ ঘটনার প্রতিকার হয়। শেষ পর্যন্ত জেলার বদলী হন, অবশ্য প্রমোশন পেয়ে। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর ক্ষেত্রেও ডিভিসনের পার্থক্য। সুনীতি যতদিন জেলে ছিলেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন এবং অন্যরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী। সুনীতির মনোবল ও তেজ এর ফলে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি সারা জেল জীবন।

গান্ধিজীর চেষ্টায় শাস্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা ১৯৩৯-এ ছাড়া পান মুক্তজীবনে বীণাদি কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে বিভিন্ন কাজকর্মে লিপ্ত হন এবং 'মন্দিরা' পত্রিকা সঙ্গেও যুক্ত থাকেন ১৯৪২-এর আগষ্ট আবার তিনি কারাগারে যান। ১৯৪৫ এ ছাড়া পান ও যুগান্তর কর্মী ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক জ্যোতিষ ভৌমিকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তাঁর লেখার হাত ছিল চমৎকার কিন্তু 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' ও ছোটখাট কিছু লেখা ছাড়া তেমন কিছু লিখে যাননি

যেটুকু লিখেছেন তাতেই বোঝা যায় তাঁর কতখানি সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল। তাঁর জেল সঙ্গিনীদের খাতায় বা বইএ তার লিখিত কবিতার খবর পাওয়া যায়। তেজস্বিণী এই বিপ্লবীর সাহস ছিল অদম্য ভয় কাকে বলে জানতেন না, পরবর্তী জীবনে কোনও বাধা বিঘ্ন না মেনে যেটা করা প্রয়োজন মনে করেছেন, ভয়ে বা সমালোচনায় পিছপাও হননি কখনও। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ যখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ান, বীণাদি তখন তাঁর স্কুল আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিকাকে নিয়ে যশোর সীমান্তে চলে গেলেন সেখানকার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যার্থে তাঁর পক্ষে সীমান্ত পার হওয়া সেদিন কোনও কঠিন কাজ ছিলনা—। সেখানে তাঁরা যতদিন পারেন স্থানীয় যুবকর্মীদের যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। তারপরও একবছর ধরে অন্যান্যদের সাহায্যে তিনি নিরলস ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে কাজ করে গেলেন আমি তখন অন্য কাজ করি তবু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে কী আনন্দিত না তিনি হয়েছিলেন! তেজস্বিতা ও আদর্শবাদিতা ছিল এই নারীর অন্যতম পরিচয়। কোনও কারণেই তিনি কখনও আপোস করেন নি। অনেকবার আমরা অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিছুতেই স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বরাদ্দ পেনসন গ্রহণ করেন নি। তিনি বলতেন, রিটায়ার করার পর অনেক Tution করছি তার থেকেই কিছু জমিয়ে রাখছি ওতেই আমাদের চলে যাবে। এ বিষয়ে তিনি ও তাঁর স্বামী বিপ্লবী জ্যোতিষ ভৌমিক ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আদর্শবাদ এবং একটা প্রগতিশীল নীতি নিয়ে তিনি চলেছিলেন সারা জীবন ভর, এর প্রমাণ দেখতে পাই—তিনি যখন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন সেই সময়। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মীদের ধর্মঘটের সময় কর্তৃপক্ষের নীতিহীন আচরণ দেখে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা তার আত্মজীবনী 'শৃঙ্খল ঝঙ্কারে'-এ ভালভাবেই বিবৃত করেছেন। মনে পড়ে, সম্ভবত ১৯৪১ সালের শেষের দিকে বীণাদি যখন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে নানা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি অফিস পোড়াবার জন্যও কেউ কেউ চেষ্টা করেছিল কিন্তু বীণাদির দৃঢ়তার কাছে তারা হার মানে। তিনি দৃপ্ত ভাবে ঘোষণা করেন, কোনও রাজনৈতিক পার্টির অফিস পোড়ানর মত কাজ আমাদের নীতি হতে পারেনা। আবার দেখি, মারীচ ঝাঁপিতে দণ্ডকারণ্যের কিছু উদ্বাস্তু এসে যখন থাকবার চেষ্টা করছিলেন

এ রাজ্যের সরকার তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ পাঠিয়ে অমানুষিক ভাবে নৌকা ডুবিয়ে তাঁদের প্রতি অতি নির্দয় আচরণ করেন। বীণাদি তার সাথীদের নিয়ে সেই এলাকায় গিয়ে সেসব অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন—যা শাসকবৃন্দের চোখে তাঁকে অপ্রিয় করে তুলেছিল। সেজন্য তাঁর অভিযোগ ছিল।

সর্বভারতীয় বিপ্লবীও আন্দামান বন্দীদের কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার ও স্নেহের পাত্রী। আন্দামানবন্দী ভাই পরমানন্দ (ঝাঁসী) তো কলকাতা এলে তাঁকে সর্বদাই দেখতে আসতেন। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী শেষবার যখন ভারতে এলেন তখন বীণাদিকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর স্নেহ জানিয়েছিলেন।

হিজলী জেলে বেশ কিছুদিন, তার পর আবার দিনাজপুর জেলে বোধহয় ১৯৩৬-বা ১৯৩৭ সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার আগে পর্যন্ত আমরা রাজবন্দীরা—বীণাদি, কল্পনা, শান্তি ও আমি একত্র ছিলাম। এই সব কারণে আমার পক্ষে তাকে বেশ কাছ থেকে দেখা ও জানা সম্ভব হয়। তিনি গান করতে পারতেন না বলে একটু দুঃখ ছিল কিন্তু চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতেন। সেই উদাত্ত গলার আবৃত্তি শুনে সকলেই মুগ্ধ হত। সেকালে আমরা বিপ্লবীরা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলাম তাঁর গান, কবিতা সবই ছিল আমাদের জীবনের সম্বল যদিও তার ঘরে-বাইরে ও চার অধ্যায় নাটকের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত ছিলাম। যাহোক, জেল থেকে ছাড়া পাবার পর রবীন্দ্রনাথ বীণাদিদের শান্তিনিকেতনে দেখা করতে আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক অল্পবয়সী বন্দিনীদের আন্দামানে পাঠান বন্ধ হয়।

মোটকথা, বীণাদির মধ্যে এত কিছু সম্পদ ছিল যা তিনি আমাদের সাহিত্যের মাধ্যমে দিয়ে যেতে পারতেন—কিন্তু কেন তা করেননি জানিনা। তাঁর আদর্শবাদী মন ছিল খুব স্পর্শকাতর। এখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে তিনি ছিলেন বেমানান, জানিনা সেই অভিমানেই তিনি চলে গেলেন কিনা।

কমলা মুখোপাধ্যায়

পরিচয়-এর প্রতি

এই সংখ্যায় আমার একটি কবিতা (সনেট) ছেপেছেন দেখে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐ কবিতার শেষ পংক্তিতে দ্বিতীয় শব্দটি বাদ পড়েছে। পুরো পংক্তিটি হবে—ফিরে দাও শাঁস, মজ্জা, ওজসের স্তোত্রময় ঠোঁট।

সংশোধনটি পরিচয়ে ছাপলে 'বাহাত্তুরে' দুর্নাম থেকে রেহাই পাব।

আপনার সম্পাদনায় পরিচয় আশ্চর্যজনক ভাবে বদলে গেছে এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। শারদ পরিচয়ে রাধারমণদার আত্মকথা আপনার প্রায় আপামর অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। চলতি সংখ্যায় অমিয়নাথ সান্যালের লেখাটি খুবই, ইংরেজিতে যাকে বলে, 'রিভিলিং', কবিবন্ধু কুদ্দুস অত্যন্ত এক প্রয়োজনীয় বিষয়ে যেমন প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা শুরু করেছেন তা একজন যোগ্য অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। পরিশেষে অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা পড়ে আমি বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছি, কবির উপমা উৎপেক্ষার নতুনত্বের জন্যে।

মণীন্দ্র রায়
কলকাতা-১৯

আসন্ন নির্বাচনে প্রগতিশীল প্রার্থীদের
সমর্থন করুন

পড়ুন

পড়ান

গ্রাহক হোন

চিন্মোহন সেহানবীশ

পরিচয়-এর এই সংখ্যার কাজ যখন সম্পূর্ণ শেষ, ১৯ মে-র রাতে খবর এল, চিন্মোহন সেহানবীশ, আমাদের চিনুদা আর নেই। বাংলা তথা ভারতের পাঁচদশকব্যাপী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ তাঁর তিয়াত্তর বছরের পথপরিক্রমা শেষ করলেন।

আই পি টি এ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-প্রসঙ্গ উঠলেই অমোঘভাবে উচ্চারিত হয় চিনুদার নাম। আর 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর তো রক্তের সম্পর্ক। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। পরিচয় দপ্তরে আসতে পারতেন না। ফলে, গত বছর থেকে মাঝে মাঝেই সম্পাদক-মণ্ডলীর সভা বসত চিনুদা-র বাড়িতে। তাঁর অভিজ্ঞতা, বৈদগ্ধ, সাংগঠনিক বক্তব্য, আপামর যোগাযোগ ও মানবতাবোধ আমাদের সবসময় দীপিত করেছে। তাঁকে আমরা বরাবর অভিধান ও জীবন্ত গ্রন্থশালার মতো ব্যবহার করেছি। তাঁর অকৃপণ দান বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার মুহূর্তে আমাদের উঠে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়েছে।

এই অনন্য কমিউনিস্ট, স্বাধীনতা সংগ্রামী, গবেষক, প্রাবন্ধিক, সংগঠক, ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি রাবীন্দ্রিক মানবতাবাদ ও মার্কসীয় সাংস্কৃতিক নন্দনের সমাহারে গড়ে ওঠা মানুষটির দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আমাদের ভালোবাসার রক্তে মাখা নিশান অর্ধনমিত করছি।

আগামী সংখ্যায় চিনুদা-র শেষ রচনা ও তাঁর ওপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে। তাঁর বিস্তৃত ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে একাধিক রচনা থাকবে পরবর্তী শারদীয় সংখ্যায়। এছাড়াও পরিচয়-এর একটি বিশেষ সংখ্যা চিন্মোহন সেহানবীশ-স্মরণ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করার একটি পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি।

আমাদের কর্মে ও সাধনায় চিনুদা চিরায়ত হয়ে থাকুন।

সম্পাদক, পরিচয়

পরিচয়

সমালোচনা সংখ্যা

৫৬ বর্ষ ৯-১০ সংখ্যা এপ্রিল-মে ১৯৮৭ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

ধূর্জটিপ্রসাদের কথাসাহিত্য : বুদ্ধিজীবীর নির্মোহ আত্মবিশ্লেষণ
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ১

তারাশঙ্কর : মাটি ও মানুষ অব্যয়কুমার দাশগুপ্ত ১২

সাহিত্য যখন জীবনের দলিল হয়ে ওঠে সৌরি ঘটক ১৮

সংস্কৃতির বিশ্বরূপ হিমাচল চক্রবর্তী ২৫

সংস্কৃতি : ইতিহাস ও প্রশ্ন চিত্তরঞ্জন ঘোষ ৩৪

কম্পিউটার সাহিত্যের দৃষ্টান্ত জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ৩৮

বাংলায় থিসরাস চর্চা সুভাষ ভট্টাচার্য ৪৯

নিহিত স্বপ্নের খোঁজে আফসার আমেদ ৬০

শিল্পীর স্মৃতিকথায় শিল্পকলা মৃণাল ঘোষ ৬৯

সময়ের মর্মস্থল ছুঁয়ে কেশব দাশ ৮৩

সত্যেন্দ্রনাথ : জীবন ও সৃষ্টি দেবদাস জোয়ারদার ৮৭

অমিয়ভূষণ : বন্দীত্বের স্বরূপ সন্ধানে প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৯৮

বীরভূমের অর্থনৈতিক জীবন নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ১০৬

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা : সামাজিক অভিজ্ঞতার দলিল
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু ১১৬

রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদনে নতুন পথ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত ১২৭

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫

বিহার : বহ্নিমান কৃষিক্ষেত্র মিলন দত্ত ১৪২

কবিকে চেনার নানা ধরন শুভ বসু ১৪৮

দেখা হবে মুক্ত স্বদেশে অশোক মুখোপাধ্যায় ১৬৪

'শুভ্র ফুলের জন্য' অমিতাভ গুপ্ত ১৬৯

আর্কিটাইপ-এর আদিমাতা অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৭৩

রূপান্তরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০

দুর্মরগানের উজ্জ্বল নিশান অপূর্ব কর ১৮৫

লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে পথিকৃৎ গ্রন্থ বেলা দত্তগুপ্ত ১৯২

পরিণত কবির আত্মানুসন্ধানের কবিতা পবিত্র মুখোপাধ্যায় ১৯৮

ক্ষুণ্ণ জীবন থেকে কিছু কথা দেবেশ রায় ২০৪

তিন স্তম্ভ ও বাংলার শিল্পের স্থাপত্য পূর্ণেন্দু পত্রী ২১৫
জন্মশতবর্ষে যামিনী রায় অরুণ সেন ২৩৫
মেধা ও স্বপ্নের বিষ ছেঁকে সিদ্ধেশ্বর সেন ২৪৩

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপন দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

ধূর্জটিপ্রসাদের কথাসাহিত্য ঃ বুদ্ধিজীবীর নির্মোহ আত্মবিশ্লেষণ

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেকে বীরবলের 'অযোগ্য শিষ্য' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। 'শিষ্য' এই কারণে যে বীরবলের মতোই তিনিও বুদ্ধিবাদের উপাসক এবং তীক্ষ্ণ অথচ সরস মন্তব্যে আগ্রহী। 'অযোগ্য' শব্দটা নিছকই বিনয়, তবে নিশ্চয় বৈষ্ণব বিনয় নয়। কেননা যাঁর উপন্যাসে বা ছোটগল্পে কোন ভাবগত প্রেরণা নেই, আছে মূলত বুদ্ধিবাদের সীমারেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় বুদ্ধিবাদীর ট্রাজেডির বর্ণনা, তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব সুলভ দীনতার বা 'সুনীচ' হবার আগ্রহের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তবে বীরবলের তিনি যে সুযোগ্য শিষ্য তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর 'মনোবিকার' গল্পের নায়ক চরিত্র যখন শাণিত ব্যঙ্গবাণে বীরবলী ভাষাকেই বিদ্ধ করে বসে; যেমন বিদ্যাসাগরী ভাষায় লেখাও যায় না, কথা কওয়াও যায় না, তেমনই বীরবলী ভাষায় লেখা তো যায়ই না, কথা কওয়াও যায় না। আসলে ধূর্জটিপ্রসাদ এই ধরণের গুরুমারা বিদ্যে গুরুর কাছ থেকেই শিখেছিলেন। বীরবলী ভাষা যে সমস্ত ক্ষেত্রেই বর্জনীয় একথা তিনিও বিশ্বাস করতেন না। তবে 'অন্তঃশীলা' রচনাকালে তাঁর মনে হয়েছিল বটে যে 'বীরবলী ভাষা এতই সচেতন যে তার সাহায্যে খগেনবাবুর মনের নিম্ন-চেতন অংশের খবর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।' (অন্তঃশীলার ভূমিকা)

কিন্তু বীরবলী ভাষা একেবারে বাদ দেওয়াও কি শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল ? তা মনে হয় না। কারণ তাঁর রচনায় রয়েছে 'প্রমথ চৌধুরীর মতোই ঋজু নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টির সাধনা।' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)। এই 'ঋজু, নির্মোহ, নিরাসক্তিকে' যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে গেলে বীরবলী প্রকরণকে বাদ দেওয়া চলে না। ধূর্জটিপ্রসাদের জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে তাঁর রচনায় বীরবলী 'এপিগ্রাম' কিভাবে ঢুকে পড়েছে 'অন্তঃশীলা' থেকে এলোমেলোভাবে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলেই তা বোঝা যাবে।

ক. মেয়েমানুষ হিংসায় সব করতে পারে, কিন্তু ছেলের মা হতে পারে না।

খ. মনে কেউ যমজ হয় না, দেহেই হয়।

গ. মেয়েরা সব কষ্ট সহ্য করতে পারে···কিন্তু ভাববার কষ্ট সহ্য করতে পারে না।

ঘ. স্বামীকে খুব ভালো না বাসলে স্ত্রী আত্মহত্যা করে না।

ঙ. ভিড় আর স্ত্রীলোক একই বস্তু, দুটোই স্বাতন্ত্র্যবিরোধী।

চ. কাশীধামে সব কিছু রটে, কোনো কিছুই ঘটে না। (মোহানা)

বলে না দিলে বোঝবার উপায় নেই যে উপরের পংক্তিগুলি প্রমথ চৌধুরীর লেখা নয়। সুতরাং বীরবলী ভাষা ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস অথবা ছোটগল্পে সহজলভ্য এটা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু একথাও ঠিক যে এই ধরণের 'এপিগ্রাম' ব্যবহারেই লেখকের সমস্ত প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে নি। যখন তিনি মানুষের মনের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন তখন থেকেই 'তাঁর ভাষাভঙ্গমার বীরবলী প্রকরণ প্রথম থেকেই কেমন আস্তে আস্তে একটা সহৃদয় অন্তরঙ্গতায় স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছিল।' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ অন্তঃশীলার ভূমিকা)

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের (অন্তঃশীলা, আবর্ত এবং মোহানা) বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাতে এদের ভাষাকে "সহৃদয় অন্তরঙ্গতায় স্বয়ম্ভর" হয়ে উঠতেই হয়। গতানুগতিক অর্থে উপন্যাসের চিরচেনা বিষয়ের সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে না। তিনটি উপন্যাসেরই নায়ক একজন, খগেনবাবু। লেখক খগেনবাবুকে একজন ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আখ্যা দিয়ে তাঁর উপন্যাস তিনটি রচনার মূল উদ্দেশ্যটিকে তুলে ধরেছেন। 'একজন তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য

ছিল। বাস্তবজগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞাতে খগেনবাবুর রমলাদেবীর প্রতি আকর্ষণ হল অন্তঃশীলার বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এখানেই শেষ হয় নি। আবর্ত ও মোহানায় সেই ধারা চলেছে।'

উপন্যাস তিনটির বিষয়বস্তুর মধ্যে যে নূতনত্ব আছে লেখক ভূমিকায় সেকথা না বললেও তা মেনে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধে ছিল না। এখানে কোনো গল্পাংশই নেই। আছে নায়কের চিন্তাস্রোতের ধারাবাহিক বিবরণ। লেখক কোনো অবস্থাতেই তাঁর রচনাকে আত্মজৈবনিক বলতে রাজি হন নি, তাঁর নিজের জীবনের কোনো প্রতিচ্ছায়া তাঁর উপন্যাসগুলিতে পড়েছে বলে তিনি মনেও করেন না। তবে "মন যখন প্রধানত লেখকের তখন লেখকের মনোভঙ্গী ও ভাষা কিছু পরিমাণে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে মিল খাবে। আমার মন খগেনবাবুকে ধার দিয়েছি মাত্র।" নায়ককে যখন লেখক মন ধার দেন তখন নায়কের বক্তব্যও লেখকের বক্তব্য হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই। সুতরাং উপন্যাস সম্পর্কে, মানব জীবনের চিন্তাস্রোত সম্পর্কে খগেনবাবুর মতামতগুলিকে গুরুত্বসহকারে বিচার না করে উপায়ও থাকে না—'সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না। কীটসের negative capability থাকবে, তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে। একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙে যায়, ঘটনাটা তেমনি বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাঁটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণি, কোথাও বা আবর্ত, এই ত জীবন। মোহানা কোথায়? ···কিন্তু প্রধান কথা স্রোত চলছে—কুলকুল তার ধ্বনি, কুলকুল করে কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে?' (অন্তঃশীলা, ১ম খণ্ড, রচনাবলী, পৃঃ ৯২)

এই একটিমাত্র উদ্ধৃতিতেই লেখকের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপন্যাস তিনটির নামকরণের কারণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রধান কথাটাই হল এই যে মানবের জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়েই চলেছে। এই স্রোতের টানে অনেক মহীরুহের পতন হয়, অনেক আদর্শবাদী ব্যক্তির পদস্খলন ঘটে, অনেক সত্যই মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের চলার স্রোতটি অব্যাহতই থাকে। তিনখণ্ডব্যাপী উপন্যাসে তাই খগেনবাবুর চিন্তাস্রোতেরই প্রাধান্য। আর এর মধ্যে তাঁর

জীবনে কত ঘটনাই যা ঘটে যায়। অতঃশীলার প্রথম পাতাতেই খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে। করোনার সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠে রায়দান, 'সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী, ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন', আর উপন্যাসেরও সুরু হয়ে যাওয়া। এর পরে মর্গ থেকে সাবিত্রীর মৃতদেহ বের করা, তার সৎকারের ব্যবস্থা চলে একদিকে, অপরদিকে খগেনবাবুর মনে চিন্তাস্রোত এবং আত্মবিশ্লেষণের ধারাটির সূত্রপাত হয়। 'সাবিত্রীর স্বভাবই ছিল তাই, সন্দেহ আর সন্দেহ।' এই সন্দেহবাতিকতাই শেষ পর্যন্ত রমলার সঙ্গে তার স্বামী খগেনবাবুর অবৈধ সম্পর্কটির চিন্তায় তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, আর তারই অনিবার্য ফল বোধ হয় আত্মহত্যা। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজে শেষও হয়ে যায় না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একলা হয়ে গেলেন খগেনবাবু, 'তার একাকিত্ববোধ আবার জেগে উঠল সংসারের কাঁটার খোঁচায়। তার একাকী, নিরালম্ব হওয়ার সাধনাই বইখানির একটি বিষয়।'

এই একাকিত্ববোধের ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে সজারুর উপমা ব্যবহার করা হয়েছে, 'মানুষ হল একলা, সজারুর মত সে থাকে গর্তের মধ্যে; গর্তের মুখে কত পাতা কত কুটো দিয়ে সে নানা রকমের বাধা সৃষ্টি করছে, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে। গর্তের মধ্যে সজারু থাকে শঙ্কিত চিত্তে, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করল, ভেতরে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল, ঐ বুঝি এল। এক নিঝুম গোধূলিতে সে বেরিয়ে পড়ল খাদ্যের অনুসন্ধানে, বাইরে এসে তার পা আর চলে না, গর্তের মুখের কাছে এসে আর এগোতে চায় না, ছুটোছুটি করে; কোথা থেকে ঝমর্ ঝমর্ শব্দ আসছে। আবার ভিতরে ছুটে যাওয়া, আবার—আবার ভয়ে বাইরে আসা, ক্ষুধার তাড়নায়।' নিজের মনের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, আবার কখনো জৈব ক্ষুধা মেটানোর প্রয়োজনে একবার বাইরে বেরিয়ে আসা—এই প্রকৃতির নিয়ম, এই হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবন। খগেনবাবু তাঁর সারাজীবন ধরে এই একই কাজ করে গেছেন। তিনি একাকী হতে চান, কিন্তু তাঁর মতো লোকের পক্ষে যে একাকী থাকা সম্ভব নয় সেকি তিনি বুঝতে পারেন না। তাই একবার তিনি নিজের গর্তের বাইরে মুখ বাড়িয়েছেন, পরমুহূর্তেই আবার সেই আদিম অন্ধকারে আত্মগোপন করেছেন। তার স্রষ্টাই স্বয়ং খগেনবাবু সম্পর্কে অনিবার্য কারণে এই মন্তব্য করেছিলেন, 'এই অক্ষমতাই হলো লোকটির ট্রাজেডি। কিন্তু সজারুর এই উপমা শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে

তেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় নি, সজারুর উপমাটা ভালো বুঝলুম না। হয়ত মানব বা জান্তব সজারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়াভাবাৎ। পুরুষ মানুষের অত ভয়ই বা কিসের?' ধূর্জটিপ্রসাদ এই অভিযোগের পুরো জবাব দেন নি, শুধু পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'উপমার সার্থকতা খগেনের উত্তেজিত মেজাজে।' কিন্তু কেবলমাত্র খগেনের 'উত্তেজিত মেজাজই কি তার সজারু-ধর্ম পালনের একমাত্র কারণ? অথবা সেই যে গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের মনে হয়েছিল, 'খগেনবাবু চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ও সেই জন্যেই তাঁর নিষ্ক্রমণ—escape। এ নিষ্ক্রমণ শুধু সমাজ বা রমলার মিলনলাভের সম্ভাবনা থেকে নয়, এ নিষ্ক্রমণ বুদ্ধি ও বিচারের কারাগার থেকে—এই কথাটিই সত্য বলে মেনে নিতে হবে? বর্তমান আলোচক অবশ্য স্বয়ং লেখকের ব্যাখ্যা অপেক্ষা শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি মেনে নিতেই বেশি আগ্রহী। তাহলে সজারুর শর্তকে বুদ্ধি ও বিচারের কারাগার বলে গ্রহণ করতেও কোনো অসুবিধে হয় না।

আধুনিক বুদ্ধিজীবীর জীবনকে স্বাভাবিক করতে হলে বুদ্ধির বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে। খগেনবাবুর বিভিন্ন মন্তব্যে অথবা প্রতিক্রিয়ায় বার বার এই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। আরও লক্ষণীয় এই যে ধূর্জটিপ্রসাদের নায়ক শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাংখ্য-বেদান্ত কোনো কিছুর মধ্যেই মুক্তির সন্ধান পান নি। বরং অচলায়তনের পঙ্ককে যত বিদ্যা আর বুদ্ধির প্রাচীরে তিনি নিস্ফল মাথা ঠুকেই গেছেন। এর ফলে তাঁর বেদনাবোধই তীব্রতর হয়েছে, আর কিছু নয়। বেদনাবোধের এই তীব্রতার জন্যই 'অন্তঃশীলায় মূলপ্রসঙ্গ প্রেম নয়, অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির ভারই যে আধুনিক জগতের মহা ট্র্যাজেডি, এই অন্তঃশীলার মূলগত প্রসঙ্গ।' (গিরিজাপতি ভট্টাচার্য) শুধু অন্তঃশীলাই নয়, পরবর্তী 'আবর্ত' এবং 'মোহানা'তেও আধুনিক মানুষের এই চিরন্তন ট্রাজিক হাহাকারেরই প্রতিধ্বনি। এই কারণেই উপন্যাসে ক্রমশ খগেনবাবু এবং রমলার প্রেমকাহিনী গৌণ হয়ে পড়েছে। সাবিত্রীর আত্মহত্যা ঈর্ষাসঞ্জাত, এটা মেনে নিলেও এই 'ত্রয়ী' উপন্যাস কিন্তু ত্রিমুখী প্রেমের উপন্যাস হিসেবে গণ্য হয় না। খগেনবাবুকে কেন্দ্র করে যদি দৃশ্য রমলা এবং অদৃশ্য সাবিত্রীর টানাপোড়েন সমগ্র উপন্যাস জুড়ে লক্ষ্য করা যেত তাহলে এটিকে প্রেমের উপাখ্যান হিসেবে গ্রহণ করা যেত। কিন্তু গোড়াতেই তো গোলমাল। সাবিত্রীর জীবিতকালেই তার প্রতি নায়কের আকর্ষণ শিথিল হতে থাকে। আর লেখক নিজেই তার কারণটিও জানিয়ে দেন, 'এ ধরনের মেয়েদের Parasitical বলা চলে। Parasites

alone are most well-adjusted to their environment. সাবিত্রী ঐ ধরনের, রমলা নয়। সেইজন্য খগেনের রমলাকে বেশি ভালো লাগে।' আবার 'প্রেমে যে বিরোধের অবসান সে অবসান আমার নয়'—এই স্বীকারোক্তিই রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর স্বভাবের পার্থক্যকে পরিস্ফুট করেছে। আসলে খগেনবাবুর মতো চরিত্র কোনো বন্ধনেই জড়িত হতে রাজি নন।

'অন্তঃশীলা'র পর 'আবর্ত' পর্বে দেখা যায় যে খগেনবাবু রমলার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ক্রমশই রমলা সংযম এবং স্বাধীনতার আবরণটি ছিন্ন করে কামনার নগ্ন রূপটিকে প্রকাশ করতে থাকে। তার লাস্যে ও চাপল্যে সুজনের মনেও কামনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। খগেনবাবু কখনো কখনো সেই কামনার আহ্বানে সাড়া দেন, কিন্তু ক্রমশ তাঁর মোহভঙ্গ হতে থাকে, হাতকাটা ব্লাউজের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা রমলার নগ্নবাহুকে 'হগ সাহেবের বাজারে ঝোলানো মাংস' বলেই মনে হয়, 'পাউডার ঘামে জড় হয়ে চর্বির মত দেখাচ্ছে।' আসলে যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণই ব্যাকুলতা, কিন্তু পাওয়ার পর খগেনবাবুর মতো বুদ্ধিজীবীর মনে কোনো তৃপ্তি থাকে না, বরং তাঁর গ্লানিবোধই বাড়ে। তাই 'খগেনবাবুর চিত্তে কোনো শান্তি নেই। আত্মশুদ্ধির অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় আত্মম্ভরি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নৈরাত্মবোধের সঙ্কল্পে চিত্তকে বহির্মুখী করাই তার একমাত্র প্রতিকার। অন্তঃশীল প্রবাহকে বহির্মুখী না করলেই মজে যায়, অথবা আবর্তের সৃষ্টি হয়। একি হল। এতদিন সংস্কারের মূলধন ভাঙিয়ে চলল, আজ একটি কানাকড়িও নিজের হাতে নাই, যা বাকি ছিল সব গচ্ছিত রাখলেন, বাঁধা পড়ল রমলার হাতে। এখন সব তারই। তারই শক্তিতে চালিত হবেন ভাবতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।'

বুদ্ধিজীবীর চালিয়াতিটুকু বাদ দিলে থাকে কেবল আত্মসম্মানবোধ। সেটুকুও হারালে তার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। তাই এই উপলব্ধিটুকু মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই খগেনবাবুর অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। 'আবর্ত'র পরবর্তী স্তর 'মোহানা'তে দেখা যাবে যে মাসীমার মৃত্যুর পর একদিকে যেমন খগেনবাবু ও রমলার একত্রে বসবাসে বাধা থাকে না, তেমনি আবার কানপুরে এসে নায়ক তাঁর আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিচর্চার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসেন। কানপুরের শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং নানা দাবিদাওয়া নিয়ে তাদের আন্দোলনই খগেনবাবুকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখায়। অপরদিকে যে রমলা ছিল নায়কের 'সমধর্মী' সে ক্রমশ হাল্‌কা প্রেমের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।

অন্তঃশীলার ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ যে বলেছিলেন, 'একজন তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই' তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে তা সত্য হয়ে ওঠে। বাস্তবজগৎ বা ভাবের আকর্ষণ কোনোটি থেকেই তাঁর পলায়ন শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি। এতেই প্রমাণিত হয় যে ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে বুদ্ধিবাদ এবং নৈরাশ্যবাদ সমার্থক নয়। তাই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগী পাঠক সুধীন্দ্রনাথের মনে ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস পাঠে এই ভরসাটুকু জাগে, 'অন্ততঃপক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন, এবং মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনই বুদ্ধিও দ্বিমুখী—একদিকে বিকলনে ব্যস্ত, অন্যদিকে সঙ্কলনে নিরত। ধূর্জটিপ্রসাদের বুদ্ধি এই শেষ ধর্মাবলম্বী।'

নিরলস বুদ্ধির চর্চা উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের অনেক সময়ই নিরক্ত করে ফেলে। বিশেষ করে যেখানে জীবনস্রোত অন্তর্মুখী সেখানে বহিরঙ্গে যদি কোন আলোড়ন ওঠেও তা সহজে চোখে ধরা পড়ে না। এরকম ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি যখন তীব্র জীবন যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাও পাঠকের অজানা থেকে যাওয়ারই সম্ভাবনা। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে অত্যধিক মননচর্চা চরিত্রগুলির পূর্ণরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পেরেছে কিনা স্বাভাবিকভাবেই তাই সেই প্রশ্নও উঠে পড়ে। আর এ সম্পর্কিত মতামতে সুধীজনের মধ্যেও অনৈক্য দেখা যায়। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মতো রসজ্ঞ পাঠিকার মনে হয়, 'খগেন, সাবিত্রী, রমলা কারোরই চেহারা তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সময়ে সময়ে খুঁটিনাটি বর্ণনায় ধরি-ধরি মনে করি; কিন্তু এদের পরিচ্ছন্ন রূপ মনশ্চক্ষের সামনে ভেসে ওঠে না। 'ভাবৈকরূপং'-এ পাঠকের বিশেষত পাঠিকার মন সন্তুষ্ট হয় না।' কিন্তু প্রথিতযশা অ্যাকাডেমিক সমালোচকের মতামত এর সম্পূর্ণ বিপরীত, 'মননক্রিয়ার আধিক্য ও বিস্তার সত্ত্বেও চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়াছে। চিন্তার নানামুখী তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও খগেনবাবুর সত্তার কেন্দ্রবিন্দু স্থির আছে। রমলা, সাবিত্রী ও সুজনেরও দুর্বিষহ জীবনসমস্যা তাহাদের জীবন্ত হৃদয় স্পন্দনকে চাপা দেয় নাই।' (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

তিনটি উপন্যাস জুড়েই খগেনবাবুর সত্তার কেন্দ্রবিন্দুকে স্থির করে রাখাটাই ছিল লেখকের কঠিন দায়িত্ব। নিজের চিন্তা এবং বিস্ময়ের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে খগেনবাবুকে আত্মানুসন্ধান করতে হয়েছে কিন্তু 'চিত্ত বিনোদনের মালমশলা' লেখক যদি ইচ্ছে করে দিয়ে নাও থাকেন, বিনোদন করতে

পারাটা নিশ্চয় অক্ষমতা বলে গণ্য হবে না। গতানুগতিক পদ্ধতিতে না হলেও তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি যে সবসময় পাঠকহৃদয়কে আলোড়িত করতে পারে না এই সত্যটি স্বয়ং লেখকের চোখেও ধরা পড়েছিল। তাই প্রুফ দেখার সময় তিনখণ্ড উপন্যাস পড়ে তাঁর মনে হল, 'যাকে চিত্ত বিনোদন বলা যায়, তার মালমশলা খুব কমই পেলাম। যার সন্ধান মিলল, সেটা একটানা গোটা কয়েক চরিত্রের অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি ঠিক জীবনস্রোত নয় দেখলাম।' জীবনস্রোত না থাকলে চরিত্রগুলি কি খুব রক্তমাংসের মানুষ হয়? ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে তো এ ব্যাপারে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর অভিযোগই মেনে নিয়েছিলেন, 'খগেন চরিত্র হিসেবে কেবল impossible নয়, futile', এযুগের তথাকথিত intellectual-রা সকলেই 'এই জাতীয়' বলে লেখক দায় এড়িয়েছেন। যেহেতু তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা করতে বসেছেন, তাই কোন চরিত্রেরই সামগ্রিক জীবনচর্যা বিশ্লেষণে তিনি অনাগ্রহী। তাই মহৎ উপন্যাসের ট্রাজিক হাহাকার তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয় না। চরিত্রগুলির আলোচনার বিষয় পাঠকের কাছে প্রাধান্য পায়, তার স্বতন্ত্র সত্তা গুরুত্ব পায় না। যে চরিত্র দীর্ঘসময় ধরে বুদ্ধিবাদের জগতে আবদ্ধ থেকেও কেবল বুদ্ধির অন্তঃসারশূন্যতারই সন্ধান করে বেড়ায় সে নিজে যে ক্লান্ত হয়ে পড়বে একথা স্বাভাবিক, কিন্তু পাঠকদেরও যেন এক ধরনের ক্লান্তিতে সে আচ্ছন্ন করে ফেলে, 'প্রবল প্রেম বা প্রচণ্ড ঘৃণা কিছুই তাঁর উপন্যাসের মানুষেরা তাঁর কাছে যেন পায় না। তিনি যেন মনে হয় প্রায়ই ক্লান্ত, বিমুখ। এবং লেখক তাঁর জগৎ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা বা bored হবার আভাস দিলে, সে জগতের বাসিন্দারাও প্রায় শুধু bored নয়, bore হবার সম্ভাবনাও এসে পড়ে।' (বিষ্ণু দে)

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ অধিকতর ব্যঙ্গপ্রবণ বলেই মনে হয়। তাঁর পাঁচটি গল্পের সংকলন 'রিয়ালিস্ট' তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ। এই পাঁচটি গল্পই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত—একদা তুমি প্রিয়ে, প্রেমপত্র, রিয়ালিস্ট, মনোবিজ্ঞান, ভূতের গল্প। তাঁর গল্পগ্রন্থটি যে উপন্যাস-ত্রয়ীর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল এ তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যেতে পারে তাঁর গল্পগুলি যেন উপন্যাস রচনার পটভূমিকা প্রস্তুত করছিল। গল্প পাঁচটিতে ধূর্জটিপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনাভঙ্গি উভয়েরই একটি বিশিষ্ট প্যাটার্ন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। পূর্বনির্দিষ্ট কোনো প্লটের উপর নির্ভরশীল নন তিনি। চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্য দিয়েই কাহিনী অগ্রসর হয়ে চলে এবং এই ভাবেই একটি প্লটের কাঠামোও যেন গড়ে ওঠে। এই ধরনের রচনার যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা কারো কারো

কাছে ত্রুটি বলেও মনে হতে পারে, তা হল বাগ্‌বিস্তারের বাহুল্য। এখানে কথার পরিমাণ বড় বেশি, অবান্তর প্রসঙ্গের ভিড়ও রয়েছে। মনে হয়, উপন্যাস অপেক্ষা এই ছোটগল্পেই ধূর্জটিপ্রসাদের ওপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বেশি। 'তাঁহার গল্পরচনার রীতি ঠিক একই রূপ, গল্পের Convention-এর প্রতি বিদ্রূপ ও তাহার ভিতরকার কলকব্জার রহস্যোদ্‌ঘাটন।' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

সমসাময়িককালের বুদ্ধিজীবীদের রিয়ালিজ্‌ম এবং psycho-analysis-এর তত্ত্ব নিয়ে যথেচ্ছ মাতামাতি আলোচ্য ছোটগল্পগুলিতে লেখকের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। এখানেও যেন বুদ্ধিবাদী লেখকের বুদ্ধিবাদ-নির্ভর মানসিকতার প্রতি তীব্র আক্রমণ। 'রিয়ালিস্ট' গল্পের নায়ক ক-বাবু বাস্তববাদকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের কাছে নিজেই হাস্যকর হয়ে উঠেছেন, এর ফলে মূল জীবনসত্য থেকেই তিনি বিচ্যুত। জীবনকে তিনি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেন, তাই ক-বাবুর মনে কোন আবেগ বা মোহবন্ধন নেই। বিধবা মনোরমাকে লাভ করবার জন্য যক্ষা রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু স্ত্রীর ঘরের জানলা খুলে রেখে অথবা তাকে সময়মত ওষুধ না দিয়ে তিনি তার মৃত্যু নিকটতর করেন। আবার মনোরমার চোখে তাঁর নিষ্ঠুরতা এবং প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে যাবার পর তিনি ভাবতে বসেন—'তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে মনোরমাই রিয়ালিস্ট ও আমিই আইডিয়ালিস্ট।' এই তথাকথিত নির্মোহ এবং নিরাসক্ত বাস্তববাদী চরিত্রটিকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করবার মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর এই বক্তব্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, 'পৃথিবীতে রিয়ালিস্ট বলে কোন মানুষ নেই, হতে পারে না, শুধু হতে চেষ্টা করে।' আর 'মনোবিজ্ঞানে' শাণিতভাষায় আক্রান্ত হয়েছেন, freud flugel এবং ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষকেরা। ফ্রয়েড বলেছিলেন যে আদিম প্রবৃত্তির হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই, মানুষের অবচেতন মনে তা গোপনে কাজ করে চলে, তারপর একদিন আকস্মিক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তার কুৎসিত চেহারাটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আর ধূর্জটিপ্রসাদ গল্পের সূচনাতেই এ সম্পর্কে তাঁর মতামত একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন, 'যার নিজের মন পাঁকে ভর্তি সে-ই সুন্দরকে কুৎসিত করে দেখে।' রিয়ালিজ্‌ম্ সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের কটাক্ষ রবীন্দ্রনাথের পছন্দসই হয়েছিল। তাই তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি লিখেছিলেন, 'তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ 'রিয়ালিস্‌ট' তার মধ্যে বিদ্রূপের অট্টহাস্য রয়েছে। নিছক রিয়ালিজ্‌ম যে কত অদ্ভুত ও অসঙ্গত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছ। মানুষ দুর্বৃত্ত হতে পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্ট

হবার জন্যে কোমর বাঁধলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই।' বলার বিষয় এবং বলার ভঙ্গি দুইই ধারালো, কিন্তু যারা সন্ধ্যাবেলা বা অবসরের মুহূর্তগুলো কাটানোর জন্য একটি নিটোল গল্প খুঁজে বেড়ান এই জাতীয় রচনায় তাদের আগ্রহ কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একবার যদি প্রথাগত অভ্যাস ত্যাগ করে গল্পগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় তাহলে বুদ্ধি ও সংকীর্ণ আদর্শবাদ কিংবা তথাকথিত বাস্তবতাবাদের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত আধুনিক মানুষের চেহারাটি আমরা খুঁজে পাব, তার সঙ্গে উপরিপাওনা হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদের অসামান্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য উপভোগ করতে আমাদের অসুবিধে হবে না।

ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাবলী প্রকাশের সংকল্পের মধ্য দিয়ে একাধারে প্রকাশকের দুঃসাহস এবং প্রবল রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা এমন একজন লেখকের রচনা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত যিনি চিত্ত-বিনোদনের জন্য কলম ধরতে অনাগ্রহী ছিলেন। কেবল বাস্তববাদ বা রোমান্টিক ভাবালুতাকে নিয়ে মাতামাতি করা যাঁর স্বভাববিরুদ্ধ এবং যিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত realist নয়, concrete হওয়া। concrete হওয়ার অর্থই হোলো নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া।··· এইখানেই বুদ্ধির খেলা। প্রকৃতিতে বিশ্বাস অচল। বুদ্ধি দিয়েই concrete হতে হবে। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা—তাদের প্রধান কাজ, stream of consciousness ততটা নয় যতটা romantic প্রভাব থেকে concrete-এ আসা।' আবেগবিহীন 'নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিকতার' প্রতি শুধু বাঙালি পাঠকই নয়, সমস্ত ভাষার পাঠকই সাধারণভাবে বিরূপ। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজে যে তেমন সহৃদয়-পাঠকের সাক্ষাৎ পানই নি তা তাঁর এই আক্ষেপের মধ্যেই ধরা পড়ে, "আশ্চর্য! তিন-চারজন ছাড়া কেউ ঠিক বোঝেন নি, বুঝলে সুবিধা হোতো। দেশের পাঠক, শিক্ষিত পাঠক realism চায়।' আর তাঁর রচনার পাঠকসংখ্যা যে বেশি হবে না তা 'অন্তঃশীলা' পড়বার পরই রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—'তোমার দলে লোক বেশি নেই একথা মনে রেখো —ভাবতে বললে মানুষ চটে ওঠে, অথচ এই বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তুমি লোককে ঠেলা মেরে বলেচ, ভেবে দেখো। এর ফল তুমি পাবে আমার চেয়েও সকাল সকাল, এ আমি তোমাকে বলে রাখচি।'

জেনে শুনে এই জাতীয় লেখকের রচনা প্রকাশের জন্য যে প্রকাশক ঝুঁকি নেন তাঁর সাহিত্যরুচির প্রশংসা করতেই হয়। তবে দিনকাল অনেক পাল্টেছে এই আশা করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। এমন পাঠকের সংখ্যা

নিঃসন্দেহে এখন অনেক বেশি যাদের ভাবতে বললে তাঁরা চটবেন না, বরং খুশীই হবেন। ভূমিকায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তেও আপত্তির কোনো কারণ নেই, 'আজকের বাঙালী পাঠকও অনেক বেশি আত্মসচেতন পাঠক—শুধু চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি নভেল পড়েন না।' চারপাশে কিছু কিছু আশাপ্রদ উদাহরণও রয়েছে। মনে হয় সুখপাঠ্য রচনাপাঠের অভ্যাস একেবারে ত্যাগ না করলেও বাঙালি পাঠক এই ধরনের সূক্ষ্মপাঠ্য রচনার প্রতি ক্রমশই অধিকতর আকর্ষণ বোধ করবেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী : ভূমিকা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩। দাম পঁচাত্তর টাকা।

তারাশঙ্কর ঃ মাটি ও মানুষ

অব্যয়কুমার দাশগুপ্ত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রামের চিঠি' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে বিগত জুলাই, ১৯৮৬। এই চিঠিগুলি (সংখ্যায় একশ'টি) পূর্বেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল স্বনামে প্রতি সপ্তাহে দৈনিক 'যুগান্তর'-এ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়, প্রায় দুবছর ধরে। রচনাকাল ১৯৬৩ সাল ২৭শে জুলাই থেকে ১৯৬৫ সাল ২১শে আগস্ট পর্যন্ত। বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত চিঠিগুলির সম্পাদিত সংকলন। সম্পাদকের প্রতিবেদন অনুযায়ী মূল চিঠিগুলির কিছু অংশ বর্জন করে প্রায় ৫৫-৬০ ভাগের মত অংশ মুদ্রিত হয়েছে। চিঠিগুলি লেখা হয়েছে, যখন তারাশঙ্করের বয়স ৬৫ অতিক্রান্ত।

গ্রন্থকারের এই চিঠিগুলি বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান ও অভিনব সংযোজন। সংবাদপত্রের জন্য পরিকল্পিত রিপোর্টারধর্মী লেখা হলেও সাংবাদিকের নিরপেক্ষদৃষ্টির আবরণ কোথাও নেই, বরং চিঠিগুলি 'সম্পাদকের নিকট প্রেরিত পত্রে'র (Letters to the Editor) রূপই নিয়েছে, যেখানে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে লেখাগুলি হয়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ যা উত্তরকালে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর সম্পর্কে গবেষণাকে প্রভূত সাহায্য করবে। তবুও এই চিঠিগুলি তাঁর রীতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যার

অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। অবশ্য প্রারম্ভিক চিঠিগুলিতে লক্ষ্য করা যায় এমন একটি হালকা ও কৌতুকপূর্ণ মেজাজ যা একমাত্র 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সঙ্গেই তুলনীয়। যদিও কমলাকান্তের অনুরূপ আফিঙ্‌খোর ছকু চাটুজ্যের জবানীতে সাধুভাষায় লেখা শুরু করা হয়েছে তথাপি পরবর্তীকালে সাধুভাষার পরিবর্তনে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর গম্ভীর প্রকাশে সেই সাদৃশ্য বিলুপ্ত হয়েছে। কার্যত বলা যায়, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের বহুমুখী সৃষ্টির পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছিল, আগামীদিনে এই চিঠিগুলি তার উৎস সন্ধানে সাহায্য করবে। আবার এইগুলি বাস্তবধর্মী সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান হিসাবে কাজ যেমন করবে, তেমনি তারাশঙ্করও এই উপাদান, উৎস থেকেই কথাশিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তা প্রমাণিত হয়ে ভবিষ্যতের লেখকদের দিকনির্দেশে সাহায্য করবে।

ইতিহাস ও সমাজসচেতন তারাশঙ্কর প্রাক্-স্বাধীনতার যুগ থেকে স্বাধীনতা-উত্তরকালের দিনগুলিতে সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনী প্রয়োগ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস-গুলি কল্পনাকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে বাস্তবধর্মী। বর্তমান গ্রন্থটি তারাশঙ্করের সেই বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টির আর একটি নিদর্শন। আপাতদৃষ্টিতে চিঠি-গুলির মূল উদ্দেশ্য সমস্যাজর্জরিত গ্রামীন বাংলার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, কিন্তু এখানে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলার লাভপুর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। বেশির ভাগ চিঠিতে তাই রয়েছে—ঐ গ্রামের চাষবাসের বর্ণনা, জাতিভেদের ইতিহাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের সংবাদ, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির কথা এবং গ্রামের লোকউৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিখুঁত চালচিত্র। আবার অনেকগুলি চিঠিতে লেখক গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন এবং নিজস্ব মতামত দ্বিধাহীনচিত্তে নির্মম ভাষায় ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই ধরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে সমকালীন সব সমস্যাই আছে, যথা—চীন-ভারত সংঘর্ষ, ভারতে পাকিস্তানী হানা, চীন-পাকিস্তানের মিতালি, কাশ্মীর সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণ, রাষ্ট্রভাষা, বিশ্বশান্তিতে রাশিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা, রুশ-ভারত মৈত্রী ইত্যাদি। সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্ত হয়েছে লেখকের স্বাধীন মতামত—এমনকি স্বাধীনতার ১৫ বছর পর কংগ্রেসশাসনের ব্যর্থতা ও তজ্জনিত তাঁর মোহভঙ্গ অকপটে স্বীকৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর বক্তব্যে ভলতেয়ারের শ্লেষাত্মক

ভঙ্গি—'কয়েকজন স্বার্থপর ভোটকর্মী প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি বাইরে শক্তির অপব্যবহার করেছেন—কিন্তু ভিতরে ভিতরে নবযুগ তৈরি হচ্ছে।' (পৃ ৫৫), কোথাও বা স্থির বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবিচল তাঁর কণ্ঠস্বর—'কালটা সোস্যালিজমের। ভারতবর্ষেও যে সোস্যালিজমের তপস্যা চলছে—এটা ত' ডিসাইডেড ফ্যাক্ট।' (পৃ. ৫৬)। সময়ে সময়ে হতাশায় আচ্ছন্ন, ক্ষোভে বিদীর্ণ হয়ে বলেন—'একজন বিবেকানন্দ নেই। মানুষ গড়বে কে? নেতারা দল বাঁধেন, ভোট চান, কৌশল শেখান। প্রভাবশালী বিষয়ী চরিত্রহীন হলেও তাকে স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের নামে সমাজ ভেঙে দিলেন। মানুষ গড়বে কে?' (পৃ. ৪৭)) আবার কখনও বা অস্তিবাদী দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত হয়ে তিনি লেখেন—'মানুষের সমাজ কোনদিনই নীরন্ধ্র অন্ধকার আচ্ছন্ন হয় না, আলো সেখানে আছেই। জ্বলবেই।' (পৃ ৫৩)। জীবনের গোধুলিলগ্নে লেখা এই চিঠিগুলি সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের রচনার মতই মানুষের সপক্ষে অন্তিম ঘোষণার রূপ নিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সংযোজন অথবা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টির বিশ্লেষণে মূল্যবান উপাদান বলেই এই চিঠিগুলির যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। আগামীদিনের বাংলা তথা ভারতের সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাস রচনায় সমসাময়িক প্রামাণ্য তথ্য হিসাবেও এই চিঠিগুলি কাজ করবে। এমনকি ভারতের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি রূপায়ণেও দিকনির্দেশ করবে। ইংরেজ শাসনকালে এবং স্বাধীনতার ১৫ বছর পরেও কংগ্রেস শাসনে ভূমিসংস্কারের ব্যর্থতা এমন বলিষ্ঠভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই লেখায় তা কয়েকটা উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যায়—'বাংলাদেশে ধানের চাষ হয় ১ কোটি ১৪ লক্ষ একর বা ৩ কোটি ৪২ লক্ষ বিঘা জমিতে। এর ৭৫ ভাগ জমি সম্পন্ন-লোকের হস্তগত। কিন্তু এঁরা সংখ্যার অনুপাতে নগণ্য।' (পৃ. ২২০)। এরই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন চাষবাসের পদ্ধতি যা এতই অকিঞ্চিৎকর যে—'সচরাচর একটি চাষীশ্রমিক মাসে দশদিন থেকে এক-বিশ পর্যন্ত ধান, ঋণ নিত মনিবের কাছে।' আবার গরীব চাষীদের চক্রবৃদ্ধিহারে ধনী চাষীদের কাছ থেকে ধানের ঋণ নেবার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধর্মগোলা অথবা ধান্যব্যাঙ্কের প্রস্তাব করেছেন। গরীব চাষী ও কৃষিশ্রমিকদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—'কৃষির সময় বাজারদর বাড়ে... গদিওয়ালা মহাজন এই পথেই সুদীর্ঘকাল ধরে গরীব চাষীকে এবং গরীব চাষী অর্থাৎ কম জমির মালিকেরা কৃষিশ্রমিকদের রক্তপায়ী বাদুড়ের মতো রক্ত-

শোষণ করে তাদের বিবর্ণ করে তুলছে।' (পৃ ২২৫)। এই করুণ চিত্রের সাথে আবার অন্যদিকে সেচব্যবস্থার অগ্রগতির কথাও বলা হয়েছে। তাঁর মতে গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইত্যাদি গাঙ্গেয় পলিমাটির দেশে সফল হলেও পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম অংশ মেদিনীপুর-পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূম-বর্ধমান-আসানসোল ইত্যাদি জায়গায় কার্যকরী হওয়া সম্ভব না তাও বলা হয়েছে। (পৃ ২১৭)। নদী-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জায়গাগুলি ছাড়া পুকুরব্যবস্থাই সেচের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা একথা ভবিষ্যৎবাণী হিসাবে প্রকাশ করেছেন।

সমকালীন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসাবেই এই গ্রন্থটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকপাত করবে। সর্বক্ষেত্রে মতামতগুলি সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। চিঠিগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যা বিষয়ে এমন কতকগুলি আলোচনা আছে যার প্রাসঙ্গিকতা আজও ফুরায় নি, ভবিষ্যতে ফুরাবে কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান সাম্প্রদায়িকতা দেশবিভাগের এতদিন পরও সামাজিক জীবনকে যে ভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করছে—সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন—'তবুও এই দুই সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হয়ে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে, অবিশ্বাস করছে।...আজ তখন ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ -হিন্দুমুসলমানের সংশয়-মোচন, প্রীতি সংস্থাপন। তা শুধু বিরাট শক্তিরই সৃষ্টি করবে না—এক প্রাণময় জ্ঞানময় ধ্যানময় উদারতর সংস্কৃতিরও সৃষ্টি করবে।' (পৃ ২০৯)।

ভাষাসমস্যা যা আজও ভারতের সংহতির অন্তরায়, যার ফলে আজও ইংরাজী ভাষা জাতীয় ভাষার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে—সেই বিষয়েও তারাশঙ্কর তাঁর চিন্তাভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন। ইংরাজী ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণকে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। আবার, হিন্দীর মত একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে তার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আবার ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে হিন্দীর বিকল্প হিসাবে ইংরাজীকেও একই সঙ্গে জাতীয় ভাষা হিসাবে রক্ষা করার মানসিকতাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—'হিন্দী এবং ইংরেজী দুটি ভাষাকে গ্রহণ করলে নেহেরুর যুক্তি অনুসারেই ওই শ্রেণীবৈষম্য থেকে যাবে। একদিকে হিন্দী elite + ইংরাজী elite, অপরদিকে হিন্দী ও ইংরিজী না-জানা জনসাধারণ।' (পৃ ২০২)।

চীন বা রাশিয়ার সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ না থাকলেও, বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিবাচক ভূমিকাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সেই ৬০-এর দশকে যখন আমাদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীকে সাদর আহ্বান জানিয়ে লিখছেন—'সোভিয়েয়ট-ভারত বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন হোক, দিন দিন দৃঢ় হোক। তাঁরা ভারতকে সহ্য করুক - ভারত তাঁদের সহ্য করে, করবে চিরদিন। দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবের পথ।' (পৃ ২০৬)।

'গ্রামের চিঠি' বইটি মূলত গ্রাম বাংলা ও গ্রাম্য জীবনের চালচিত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অংশবিশেষে নিছক চালচিত্রের ধর্মকে অতিক্রম করে গ্রাম সম্পর্কে একটি indepth study-র বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে শিল্প শ্রমিক, বিশেষত কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতি তাঁর গভীর অনুভূতিও ব্যক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে খনিশ্রমিকদের নিরন্তর শোষণের করুণ কাহিনী। 'ধোরী' কয়লাখনির আকস্মিক বিস্ফোরণ এবং তজ্জনিত বহু শ্রমিকের মৃত্যু লেখককে বিচলিত করেছিল কারণ নিরাপত্তা আইনকানুন অবহেলা করে খনিজ পদার্থ উত্তোলনই এইসব দুর্ঘটনার মূল। এই প্রসঙ্গে লিখছেন—'সেই অভাবের বশেই ধনীর ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায়—লোভ প্রচণ্ড হয়ে উঠে দেশের শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে, অল্পদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে চোরাকারবারের কারবারীরা প্রেতনৃত্য করে, খনির নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপেক্ষা করে বিস্ফোরক শক্তিকে পুঞ্জীভূত হতে দেয় এবং তার বিস্ফোরণ ঘটে এমনিভাবেই।' (পৃ. ২১২)। এইসব অবহেলার ফলে আজও সেই একই দুর্ঘটনা এবং খনি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধ্বসে যাওয়া।

মহান ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের জীবনের সায়াহ্নে লেখা এই গ্রন্থের এক'শ'টি চিঠি অনুভূতির গভীরতায় এবং সত্যানুসন্ধানের তাগিদে লেখকের স্বাধীন চিন্তার এক অসামান্য দলিলে পরিণত হয়েছে। যে সব উপাদানের প্রক্রিয়ায় সামাজিক পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে ওঠে—তার বিশ্লেষণ মানবিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ফলে সফল হয়েছে। কিন্তু সামাজিক বিকাশের পিছনে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সূত্রগুলি কাজ করে সে সম্পর্কে কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি না থাকায় তাঁর সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্তগুলি তত্ত্বনিষ্ঠ না হয়ে কেবল তথ্যবহুল হয়ে উঠেছে। গ্রামকে নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্বয়ম্ভর করার পরিকল্পনা এই ধরণেরই একটি উদাহরণ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর, কংগ্রেস ক্ষমতায় আসাতে যে কোন গুণগত পরিবর্তন হয়নি সেকথা বলতে

গিয়ে লিখছেন—'আমরা দেখতে পাচ্ছি—এরা সেই ইংরেজ আমলের পুরাতন অভিনেতার দল। পোষাক পাল্টে মেক-আপ বদল করে আবির্ভূত হয়েছেন।' (পৃ. ২২৭)। কিন্তু এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বলছেন—'একটি মানুষ, সর্বত্যাগী মানুষ, সত্যধর্মে বিশ্বাসী, অর্ধগৃহী, অর্ধসন্ন্যাসী, মৃত্যুভয়ে যে ভীত নয়...অথচ সে নিজে থাকবে সকলের পুরোভাগে তিনি ডাক দিলেই এরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে।' (পৃ. ২২৯)। এখানেও সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব। এই ধরণের আবেগময় স্বাধীন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর লেখার মধ্যে স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে যার ফলে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন অথবা গ্রামদর্শন সমালোচনা সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ঐ একই কারণে জীবনে তাঁকে অনেক সময় অনুভূতি ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এগিয়ে গিয়েও পিছিয়ে আসতে হয়েছে। তাই ২৮শে মার্চ ১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ গঠিত হবার পর তারাশঙ্কর এই সংঘের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েও আবার যুদ্ধশেষে সংগঠন ত্যাগ করে চলে এসেছেন। তথাপি চিঠিগুলির মধ্যদিয়ে তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাশঙ্করের মানবিক দরদ ও সহমর্মিতা, বাঙালী জীবনের প্রতি গভীর বেদনা ও সহানুভূতি এবং সর্বোপরি সমাজজীবনের আশু পরিবর্তনের জন্য আকুল কামনা। এখানেই গ্রন্থের সার্থকতা।

গ্রামের চিঠি। তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী। ২৮ টাকা।

সাহিত্য যখন জীবনের দলিল হয়ে ওঠে

সৌরি ঘটক

অমরেন্দ্র ঘোষের 'চর কাশেম' উপন্যাসটি অনেকদিন পরে আবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে এটা একটা আনন্দের সংবাদ।

সব লেখকই কাজ করেন তাঁর জীবন সীমার নির্দিষ্ট গণ্ডির সময়কালের মধ্যে। কিন্তু সীমাবদ্ধ কালের সেই লেখাই কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে যখন তা সেই সময়কালের বাস্তবকে যথাযথ এবং অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত করে। অনেক সময় ইতিহাস যখন মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ঐতিহাসিকের পক্ষপাতদুষ্টতা সত্যকে বিকৃত করে, তখন সাহিত্যই জীবনের অবিকৃত দলিল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। যেমন সোনার বাংলা কবে ছিল, অথবা আদৌ ছিল কিনা এ নিয়ে গবেষকরা তর্ক-বিতর্ক যাই করুন আমরা যখন সেই চর্যাপদে কি মধ্যযুগের সাহিত্যে মানুষের প্রার্থনা শুনি 'কচি কলার পাতায় দুটো গরম ভাত, একটু ঘি আর দুটো মৌরলা মাছ ভাজা', কিংবা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এই চাওয়াটাই অর্থাৎ পেটভরে খেতে পাওয়াই তার ছিল চরম চাওয়া, এটা বুঝতে পারি। সাহিত্যে সত্যের এই নিরাভরণ প্রকাশকেই বলা হয় জীবনের দলিল।

অমরেন্দ্র ঘোষের প্রথম যৌবনে কল্লোল যুগের আওতায় কিছু কিছু গল্প-কবিতা ছাপা হলেও তা তেমনভাবে সাহিত্য রসিকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে

পারে নি। এরপর সাহিত্য রচনায় ছেদ টেনে তিনি পুলিশ বিভাগে কাজ নিয়ে চলে যান পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে)। এই চাকরি জীবনে ছেদ ঘটার পর তিনি যখন কলকাতা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সাহিত্য-সাধনাকে মুখ্য উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন কল্লোল যুগের প্রভাব নিঃশেষিত। সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ইতিবাচক ধারাটি হল ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের পরবর্তী পর্যায়ের প্রগতি লেখক ও গণনাট্য আন্দোলন।

অমরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ তাঁর ফেলে যাওয়া বাঁশিটি হাতে তুলে নিয়ে আর সেই পুরোনো কল্লোল যুগের সুরে বাজাবার চেষ্টা না করে নতুন ধারায় বাজাবার সাধনা শুরু করেন। তাঁর সেই সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল 'চর কাশেম'।

'চর কাশেম' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯৪৯) তখনই তা সাহিত্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় চেনা-জানা পূর্ব বাঙলার প্রকৃতি ও নরনারী তাঁর কলমে এক নতুন ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গভীর বাস্তববোধ, নিঃস্ব মানুষগুলির প্রতি মমতা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে তীক্ষ্ণ অথচ অতি সংযত প্রকাশভঙ্গি উপন্যাসটিকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। এই উপন্যাসটি প্রকাশের পরই তিনি প্রগতি লেখক আন্দোলনের অন্যতম শক্তিমান শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পান।

পূর্ব-বাঙলার চর নিয়ে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', কি এপার বাঙলার তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী'-র খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত। এ ছাড়াও পূর্ব-বাঙলার নদ-নদী-চর ইত্যাদি অবলম্বন করে বহু সার্থক ছোটগল্প প্রভৃতি আছে। সে তুলনায় 'চর কাশেম' কিছুটা নিষ্প্রভ হলেও সাহিত্য সমালোচকরা এঁকে সার্থক সৃষ্টি বলেই মনে করেন। যখন এটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখনই এর দু-একটি লাইন—'চর তো নয়—দুধের সর, চরের বুকে নরম পলিমাটি সে তো মাটি নয়—ক্ষীর'—কবিতার ছন্দের মতো পাঠকদের মনে স্থায়ীভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের প্রকাশভঙ্গি যেন বৈষ্ণব সাহিত্যের অতি সহজ অথচ প্রচণ্ড আবেদনশীলতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৃটিশ শাসনের শেষভাগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার ঔপনিবেশিক সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। এই সময়ের ঘটনাবলী, বিশেষ করে পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মানস-লোককে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' এই

মন্থনেরই ফসল। এই কালপর্ব নিয়ে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখদের উপন্যাস ও অন্যান্য লেখকদের অনেক শক্তিশালী ছোটগল্প আছে। 'চর কাশেম'-এর কাহিনীও এই সময়কাল নিয়ে।

কাহিনীর শুরু কাশেম নামে এক নিঃস্ব মুসলমান যুবককে নিয়ে, আজকের দিনে যাদের বলা হয় খতবন্দী শ্রমিক—কাশেমও অনেকটা তাই। তার বাবা মেছো হাসেম। কাশেমের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন সাময়িক একটা দুভিক্ষে হাসেম তার ছেলেকে বড় গৃহস্থ বাড়িতে আড়াই টাকায় বাঁধা দেয়। তারপর হাসেম মারা যায় তিলে তিলে অন্ন খেয়ে। কাশেম ঐ বাড়িতেই বড় হয়। তারপর যৌবনের শুরুতে এক দূর সম্পর্কের ফুফুর কাছ থেকে আড়াই টাকা সংগ্রহ করে নিজেকে মুক্ত করে। পেশা হিসাবে বেছে নেয় মাছধরা।

আর এই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মনিবের মেয়ে ফুলমনকে ভালবেসে ফেলে। ফুলমন কাশেমেরই সমবয়সী। কিন্তু সে চাকর হিসাবেই দেখে তাকে—"ডাকলে তাচ্ছিল্য করে জবাব দেয়—'কিরে কাশমা, কি?' একটু ঢেউ দিয়ে এমন একটা টান দেয় শেষের হরফটার ওপর যে কাশেমের মর্ম পর্যন্ত বিষিয়ে ওঠে।"

ফুলমনের তিন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। কিন্তু মারা যায় তার স্বামী। এখন ফুলমনের মনে স্বামীর ঘরের কোনো ছাপ নেই। সে অবচেতন মনে কাশেমকে ভালবাসলেও ওপরে তাকে আড়াই টাকার বান্দার বেশি ভাবতে পারে না।

ইতিমধ্যে কাশেমের নানার নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়া জমি 'নিরানব্বই কানি চর' জেগে ওঠে। সে চর সে রসময় আর জীবন পিওনের সহায়তায় বন্দোবস্ত নেয়। সে চরে উঠে গিয়ে ঘর বাঁধে কাশেম, রসময় ও গরিব মুসলমান ও হিন্দু পাড়ার লোকজন। বসতি গড়ে ওঠে। কাশেমের নামে চরের নাম হয় 'চর কাশেম'।

এধারে কাশেম বিয়ের দিনে ফুলমনকে লুট করে নিয়ে এসে চরে ঘর বাঁধে। বশ মানে ফুলমন। পেশা সকলেরই মাছধরা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় সে পেশা বন্ধ হয়ে যায়।

…'জাপানীরা নাকি আসছে। তারা নৌকা পেলে অনায়াসে দেশের ভিতর ঢুকে পড়বে। তাই এমনি হাজার হাজার নৌকা ধরে আটক করা হচ্ছে এখানে-ওখানে থানায়-থানায়। রুজি মরছে লক্ষ লক্ষ লোকের। তাতে কি?…সেই জাপানী শত্রুদের ভয়ে ধান চালও নাকি সরিয়ে-ফেলা হচ্ছে সব।

এখন চালের দাম পঞ্চাশ। সেও প্রকাশ্যে কেউ বেচে না। টাকা আগাম নেয়। অনুগ্রহ করে অন্ধকারে দেয়। এরা না থাকলে নাকি দেশ একেবারে উজাড় হয়ে যেত।'

এই দুর্ভিক্ষ থেকে চরের মানুষগুলি রেহাই পায় না। উপবাসী মানুষগুলি জেলা সদরে ছোটে প্রতিবাদ করতে।

এই হল চর কাশেমের মূল কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনী অবলম্বন করে যে চরিত্রগুলি আমাদের সামনে হাজির হয় সেগুলি একেবারে মাটির গন্ধমাখা জীবন্ত মানুষ। আর সেই সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার প্রকৃতির অনবদ্য বর্ণনার মধ্যে এই মানুষগুলির ক্রিয়াকলাপ একটা বিশেষ সময়ের গোটা সমাজজীবনকে সামনে তুলে ধরে।

আমরা যারা দেশ বিভাগের আগে বড় হয়েছি, তারা সাহিত্যে পূর্ব-বাঙলার প্রকৃতি, নদনদী, মানুষ প্রকৃতির ইতিহাস পড়েছি। তখন 'কীর্তিনাশা' নিয়ে কবিরা কবিতা লিখতেন। ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকে তা পড়ত। আজ দেশভাগের পর ওপার বাঙলার জীবন সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক এ দুই থেকেই বাদ পড়ে গেছে।

তাই জীবন পিওন যখন কীর্তিনাশার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে—"তোমরা দেখ নাই, আর দেখবাও না। শোন তবে—'জীবন মানচিত্রের বুকে আঙুল চালিয়ে দেখাতে থাকে; বলতে থাকে পূর্ব-বাঙলার রাজারাজরা, হিন্দু মুসলমান ভূঁইয়া বাদশার কীর্তিকাহিনী। এই ডাকিনীর খাড়া পাড়ে কত দেবালয়, দেউল, মসজিদ এবং মন্দির ছিল—তা রাক্ষুসী গিলে খেয়েছে। কত মনুষ্যবসতি ছিল, ছিল কত কল-কোলাহল মুখরিত জনপদ। আজ তা তলিয়ে গেছে ঐ ক্ষুধিতার অতলগর্ভে। কোথাও বা ছিল জনশূন্য প্রাচীন ঐতিহ্যের মনোরম নিদর্শন। সে সব আজ আর নেই। একুশ রত্নের মধ্যমণিতে জ্বলত নাকি কূলহারা নাবিকের জন্য নিশানী আলো। সে আলোও নিভে গেছে। কিন্তু নিভে যেতে পারে নি জীবন পিওনের মন থেকে কোন স্মৃতি। সে কি না জানে? সে নিজের কথা, কাশেমের কথা ভুলে গিয়ে এমন এক অপূর্ব যুগের মনুষ্যলোকে সকলকে নিয়ে যায়, এমন ভয়াল মধুর ও করুণ করে সে-সব কীর্তি ও ঐতিহ্যের কাহিনী বিনিয়ে বিনিয়ে বলে যে রসময় ও কাশেম কখনও আনন্দে, কখনও গর্বে অধীর হয়ে ওঠে। মধুর বিয়োগান্ত রাগিণীর মত জীবন পিওনের শেষ কথাগুলি তাদের কানে বাজে।

হিন্দু মুসলমান—ছুটি পূর্ব বাঙলার বন্ধু সম্প্রদায়ের একই মণিকোঠায় যে সম্পদ ছিল, তা আজ আর নেই—সবই অতলে তলিয়ে গেছে।'

'তোমরা দেখ নাই আর দেখবাও না'—এই একটিমাত্র বাক্যে লেখক একটি চরম সত্য প্রকাশ করে গেছেন। তা হল একালের নতুন প্রজন্ম এ জিনিস দেখেও নি বা দেখবেও না।

সত্যি করেই তারা দেখবে না নদীর ভাঙনের সেই ছবি—"দেখতে দেখতে নদী আরও ভয়াল হয়ে ওঠে। বিঘার পর বিঘা পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়তে থাকে জমি-ক্ষেত বাগ-বাগিচা সমেত। বড় বড় নারকোল সুপারি গাছ থৈ পায় না কুলের কাছে। জলের ঝাপটা—তুফান যেন আক্রোশে আছড়ে পড়ে পাড়ে। নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে চাইলে বুক শুকিয়ে যায়। চির-পরিচিতার একি প্রলয়ংকারী মূর্তি। স্নেহ নেই। মায়া নেই, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষুধা। লাবণ্য নেই, কেবলই উলংগ নৃশংস বর্বরতা। গাঙ গোঙাচ্ছে—ভাঙছে নিষ্করুণভাবে। ক্ষুধার্তা নাগিনী গিলে খাচ্ছে সব কিছু। মানুষ পালাচ্ছে বাড়ীঘর ছেড়ে।'

আবার এই অনবদ্য প্রকৃতির বর্ণনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের আলেখ্য—'বাড়ী ফিরে কাশেম দেখে যে কয়েকজন লাল পাগড়ি উঠোনে বসে। তাকে দেখতে পায় নি। সে আর যাবে কোথায়। অঞ্জুর ঘরে পিছন দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে। ফরিদ উঠোনে বসে। তার হাত বাঁধা। পঞ্চায়েত সঙ্গেই আছে। ব্যাপারটা আর তলিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। সেদিনের সেই পুলিশ তাড়ানোর আক্রোশ। রহিম বাড়ী নেই। বয়স্ক পুরুষ সব পলাতক। শুধু মহম্মদের বাপ আছে।···নিকটে কোন একটা ঘটনা হলে, সেটাকে উপলক্ষ করে পুলিশ না করতে পারে হেন কাজ নেই। কাশেম কেন; এসব কথা গ্রামের দুধের ছেলেও জানে।'

···'পঞ্চাইত সাহেব। বসেন তামাক খান, হাত আমার বাঁধা—একটু আগাইয়া-জোগাইয়া লন, নিজেও খান, এই অতিথিগোও খাওয়ান। এরাই তো আপনার খুঁটি।

'শপাশপ আচমকা বেত পড়ে ফরিদের পিঠে।'

পুলিশ পঞ্চায়েতের এই আঁতাত আজও তো মিথ্যা হয়ে যায় নি।

কিংবা জীবনের কথা—'তোমাগো চোর কয় কারা। জোতজমিন যাগো আছে, কি তালুক-মুলুকের অধিকারী যারা—এই নিবারণ ও পঞ্চাইতের দল। ওরাই কিন্তু তোমাগো সর্বস্ব হরণ করছে। সুযোগ বুইঝা টাকা-

পয়সা দাদন দিয়া জমিজমা বন্ধক রাইখা, না হইলে কবলা কইরা। হয়ত কারোর কারোরটা নিছক আদালতের পিওন পেশকারের যোগাযোগে নিলাম কইরা নিছে। সকলেই কি এমনি ভূমিহীন বিত্তহীন আছিলা? বাপ-দাদার আমলেও কি কারোর জমিন আছিল না এতটুকু?'

বৃটিশ শাসনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে ধনীচাষী, আমলা, জোতদার, মহাজনদের ষড়যন্ত্রে কৃষক কি করে নিঃস্ব হত এ হল তারই এক যথাযথ বর্ণনা।

আবার দুর্ভিক্ষে উদ্ধার হয়ে যাওয়া চরের বর্ণনা—'চরে শুধু আছে আজ্ঞে, রসময় ও কাশেমরা স্বামী-স্ত্রীতে। আর সব একে একে পালিয়েছে। কেউ গেছে আত্মীয়বাড়ী, কেও গেছে একেবারে দক্ষিণে। কেউ বা গেছে গঞ্জে ভিক্ষা করতে। কারো ঘর পড়ে আছে। কেউ বা টিন কাঠ বেচে খেয়ে একেবারে নিরুপায় হয়ে পথে নেমেছে। এতবড় চরটা পাহারা দিচ্ছে যেন এই চারটা প্রেতাত্মা।

একটা অবুঝ কোকিল ডাকে। দমকা হাওয়ায় আসে ফুলের গন্ধ।··· কাশেম ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়।

···অনেক কষ্টে জীবন ক্যানভাত নামায়। ভাতের গন্ধে রসময় ছাড়া সকলে উঠে বসে। ফুলমন বারন্দায় এগিয়ে আসে। তার ফুটন্ত ফুলের মত যৌবন যেন অকালে শুখিয়ে গেছে।

···চারজনের কাছে চারবাটি ভাত নামিয়ে দেয় জীবন। রসময়কে দিতে হয় খাইয়ে। সকলের মতই রসময় ভাবে—যখন জীবন এসেছে তখন এ যাত্রা রক্ষা করবেন তার হরগৌরী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জীবনের প্রথম দিনের কথা—'সব গরীবের হুক্কা এক করিতে হইবে।'

ক্ষুধার্ত জীবনের এই ধরনের নির্মম বর্ণনা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনগুলির ছবি।

আজ দিন বদলে গেছে। আজ যদি কেউ পূর্ব বাঙলায় গিয়ে কাশেম, ফুলমন, রসময়, জীবন, ফরিদ, অঞ্জু প্রভৃতিকে খোঁজেন, তবে বাস্তব জীবনে তাদের মত চরিত্র খুঁজে পাবেন না। সমাজ বিবর্তনের ধারার সাথে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে তারা, হারিয়ে গেছে, সে জীবনযাত্রা, সে আশা-আকাঙ্খা, সে জীবন সংগ্রাম, জীবনের সেই স্বপ্ন। পঞ্চাশের মন্বন্তর আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। দিন বদলের পালার সাথে সাথে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অভাবেরও ধরনধারণ পাল্টে গেছে।

সেকাল ও আজকের বঙ্গভূমির পার্থক্যটা বর্ণনা করা চলে ডিকেন্সের 'এ টেল অফ টু সিটিজ'-এর সূচনার ভঙ্গিকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে—সেদিন একটা দেশ ছিল। আজ দুটো দেশ। সেদিন দেশটা ছিল বৃটিশের অধীন, আজ দুটো দেশই স্বাধীন। সেদিন ছিল প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণ, আজ সেখানে সামনে এসেছে সাম্রাজ্যবাদ, দেশি বুর্জোয়া ও ভিন্ন রূপের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। শোষণের বিরুদ্ধে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সেদিন ছিল এক ধরনের সংগ্রাম, আজ তার রূপ, ধরন-ধারণ, সংগঠন সব আলাদা। সেদিনও দারিদ্র্য ছিল, আজও আছে। সেদিনও মানুষ শোষিত হত, আজও হয়। সেদিনও ক্ষুধায় মানুষ কাঁদত, আজও কাঁদে। শুধু অন্য রূপে, অন্যভাবে।

তাই সেদিনের সমাজচিত্রের সঙ্গেই আজকের জীবনের অবিকল মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু আবিকৃত রয়ে গেছে জীবনের কিছু মৌলিক মূল্যবোধ : সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ভবিষ্যতের প্রতি গভীর আশাবাদ, আর শোষণ থেকে মুক্তির স্বপ্ন।

আজকের তরুণ প্রজন্ম এই উপন্যাসে দেখবে তাদের পূর্ব পুরুষদের জীবন-সংগ্রাম ছিল কী ভীষণ কঠোর, কী ভয়াবহ নির্মম। কী গভীর অন্ধকারে তাদের আলোর ইশারা খুঁজতে হয়েছে।

সেইদিক থেকে উপন্যাসটি সেদিনের পূর্ব-বাঙলার নিঃস্ব মানুষদের একটি চমৎকার সামাজিক দলিল হিসাবে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

চরকাশেম। অমরেন্দ্র ঘোষ। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৯। প্রথম সারস্বত সংস্করণ ১লা আগস্ট ১৯৮৩। ১৮ টাকা।

সংস্কৃতির বিশ্বরূপ

হিমাচল চক্রবর্তী

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, culture বা civilization-এর অর্থ—দ্যোতক 'সংস্কৃতি' শব্দটি তিনি প্রথম পেয়েছিলেন তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছ থেকে, ১৯২২ সালে, প্যারিসে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি culture-এর প্রতিশব্দরূপে কৃষ্টির পরিবর্তে শব্দটির ব্যবহার অনুমোদন করেন ('সংস্কৃতি'-প্রবন্ধ)—এর আগে আমরা জানি, কবি 'চিত্তোৎকর্ষ' 'সমুৎকর্ষ' ইত্যাদি শব্দ নিয়ে ভেবেছেন, কারণ culture-এর মতই উৎকর্ষ শব্দে কর্ষণের ভাব আছে, (প্রতিশব্দ—১৯১৯), কিন্তু কোনটিই তাঁর মনঃপূত হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত 'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজী culture-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে প্রতিষ্ঠা পেল—এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে।

ইংরেজিতে culture-এর মূল অর্থ পশুপালন ও কৃষিকাজ (ভূমি পালন), এবং এই অর্থেই শব্দটি প্রচলিত ছিল আঠারো শতকের প্রায় শেষ অবধি; ঐ শতকের একেবারে শেষদিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় culture-এর অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে এবং তখন থেকে 'মানসিক উৎকর্ষ'ও culture-এর অভিধা-র অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে এটি ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে জটিল অর্থবহ দুটি বা তিনটি শব্দের অন্যতম। জটিলতার একটি কারণ, ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী এবং সমগ্র সমাজ, এই বিভিন্ন স্তরে শব্দটির প্রয়োগ। ম্যাথু

আর্নল্ড যে অর্থে (ব্যক্তি ও গোষ্ঠিগত অর্থে) শব্দটি ব্যবহার করেছেন টাইলর-এর 'প্রিমিটিভ কালচার' বই-এ cultute-এর অর্থ তার থেকে আলাদা। দ্বিতীয় একটি কারণ, শব্দটি বর্তমানে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় বা concept হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে এর সংজ্ঞা সর্বদা অভিন্ন নয়। সম্প্রতি cultural studies বা sociology of culture-ও নতুন আলোচ্য হয়ে দেখা দিয়েছে; এর একটা বড় অংশের উপর লেভি স্ট্রাউস-এর স্ট্রাকচারালিজম-এর প্রভাব সুবিদিত। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে যখন culture বলতে বোঝায় জীবনধারা এই নব্য শাস্ত্রে culture-এর অর্থ Symbolic system বা প্রতীক-কাঠামো। তাছাড়া জটিলতার সঙ্গে কালচার-এর সংজ্ঞা নিরূপণে দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যাও জড়িত আছে।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা খুব সামান্যই হয়েছে। তাতেও দেখা যায় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক শব্দের ব্যবহারে লেখকেরা একমত নন; ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞার্থে তাঁরা সংস্কৃতি শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। যেমন, সম্প্রতি-প্রকাশিত 'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে শ্রীশিবনারায়ণ রায় লিখেছেন, "প্রতি সমাজেই সংস্কৃতির স্রষ্টা, প্রবর্ধক ও প্রধান সংরক্ষক হচ্ছেন সেই সমাজের মনীষী ব্যক্তিরা" এবং "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করেন শিল্পী সাহিত্যিক" ইত্যাদি। এর থেকে সংস্কৃতির একটা এলিটিস্ট অর্থ পাওয়া যায়—বাংলার "বাবু কালচার"-এ সে অর্থ রূপ পেয়েছে। অন্যদিকে, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে লিখছেন, যা সভ্যতার আভ্যন্তর" "অথচ বাইরে প্রকাশমান" "অতিরিক্ত বস্তুটি", যা রূপ পায় সমাজের "মানসিক ও আনুভবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার বাহ্য সাধন আর প্রকাশ, তার দর্শন সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি, তার মানসিক প্রবৃত্তি আর অবচেতনা, তার নৈতিক আদর্শ আর তৎ প্রকাশক সহ-জ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিপাটি" ইত্যাদির মাধ্যমে, তাই সংস্কৃতি। আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" প্রবন্ধে (ভারত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত) গত এক হাজার বছর ধরে গড়ে-ওঠা "যে যে বস্তু বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করে" বাংলা দেশের সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করেছেন (সংস্কৃতির রূপান্তর-এ এর বিস্তৃত উদ্ধৃতি আছে)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই সাংস্কৃতিক উপকরণগুলি বিশেষভাবে "শিল্পী, সাহিত্যিক" বা মনীষী ব্যক্তিদের সৃষ্টি নয়, ইতিহাসের ধারায়

জীবন-সংগ্রামে রত অসংখ্য সাধারণ মানুষের কৃতির স্বাক্ষর! কাজেই, শিবনারায়ন রায় এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে সংস্কৃতির ধারণা উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। (সংস্কৃতি-র ধারণার ব্যবহারে আরও যেসব ভিন্নতা লক্ষ করা যায় তার উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থের লেখক 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছেন।)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ যে কতটা গুরুত্বপুর্ণ একটি উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট হবে। শিবনারায়ন রায় উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই অবক্ষয়ের কারণ হিশেবে চিহ্নিত করেছেন—"প্রবল কেন্দ্রাভিগ শক্তি" যা "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনের সর্ববিধ প্রকাশকে একই ছাঁচে ঢালায়," যার পরিণতি "মানসিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপ।" তাঁর মতে এর থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার উপায় "গণতন্ত্রের বলসাধন", যার জন্য চাই 'বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্ব, যে নেতৃত্বের শর্ত "দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক সমালোচক এবং শিক্ষকদের আপন আপন সাধনার ক্ষেত্রে অটল নিষ্ঠা যা ইন্টেগ্রিটি অর্জন"সত্যি কি তাই? শিল্পীর স্বাধীনতা বিনষ্টিই কী ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবক্ষয়ের কারণ, না তার লক্ষণ? ব্যক্তি শিল্পী, সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষকের অটল নিষ্ঠা বা ইন্টেগ্রিটিই কি এই অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে? শিবনারায়ন বাবুর এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের মূলে আছে সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা।

ফলত সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা সংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সাংস্কৃতিক সঙ্কটের আসল কারণ কী, কীভাবেই বা তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কী—শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক শ্রেণীর সংস্কৃতির ভূমিকা কী?—সংস্কৃতির রূপান্তরের সূত্রটাই কী রূপান্তর প্রক্রিয়ার গতিমুখই যা কোন দিকে—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসে, এবং সেগুলির উত্তর খোঁজা আমাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

ইউরোপে এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই মার্ক্সীয় "কালচারাল স্টাডিজ"-এর জন্ম। ১৯২২-২৩ এর পর—লুকাচ-এর লেখা হাতে এলে পর— বেশ কিছু মার্ক্সবাদী পণ্ডিতের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ১৯৫০-এর পরে গ্রামশির লেখা, বিশেষ করে তার "হিগেমনি"র তত্ত্ব, সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে এদের আরো বেশী উৎসাহিত করেছে; বস্তুত বর্তমানে যাকে Western Marxism" আখ্যা দেওয়া হচ্ছে তার মূল দৃষ্টিটাই এদিকে। "পশ্চিমী মার্ক্সবাদ"-এর এই

তাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতির প্রশ্ন নিয়ে এতই মেতে উঠেছেন যে তাঁদের লেখায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন উপেক্ষিত।

অন্যদিকে বাংলায় (বা ভারতেও) অর্থনৈতিক ও রাজনীতি নিয়ে বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেলেও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা খুব একটা হয়নি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি নিয়ে তত্ত্ব ভাবনা সম্ভবত প্রথম করেছিলেন আচার্য সুনীতি কুমার, আর মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রথম এবং প্রায় একক কৃতিত্ব শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের। বিনয় ঘোষ-এর "বাঙ্গালীর নবজাগৃতি", অন্য কিছু প্রবন্ধ কিংবা "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি," এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শ্রীযুক্ত হালদারই পথিকৃৎ।

যে তিনটি বই শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার-এর সংস্কৃতি-ভাবনার সাক্ষ্য বহন করে সেগুলিই একত্রে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ অরুণা হালদার এবং শ্রীঅমিয় ধর-এর সম্পাদনায় এবং ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যর একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু সুলিখিত ভূমিকা সহ সম্প্রতি "সংস্কৃতির বিশ্বরূপ" নামে প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসংশয়ে বলা যায় এটি সংস্কৃতি বিষয়ে একটি আকরগ্রন্থ, রচনা কালগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও।

২

১৯২৭-২৮ সালে অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে "গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান" নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে গোপাল হালদার-এর সমাজ-সংস্কৃতি ভাবনার শুরু। [তাঁর যে লেখা পাটনার ওরিয়েনটাল কনফারেন্সে পঠিত হয়েছিল, সেটি সম্পর্কে লেখক তাঁর আত্মজীবনী "রূপনারায়নের কূলে"-তে (২য় খণ্ড) মন্তব্য করেছেন "ও নিবন্ধ ছিল আমার সাংস্কৃতিক ভাবনার প্রাথমিক ভাবনা"। নিবন্ধটির একটি বঙ্গানুবাদ এই বই-এ যুক্ত হলে পাঠক উপকৃত হতেন।] ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় তিনি তখন লোক-শব্দ ও লোক-জীবন নিয়ে অনুসন্ধানে ব্রতী। ইতিমধ্যে ১৯২৮-এ শিক্ষক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সহযাত্রী হয়ে ওড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ তাঁকে ভারত-সংস্কৃতি বিষয়েও অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিল। এরপর তিরিশের বছরগুলিতে শনিবারের চিঠির আড্ডা, শনিমণ্ডলে 'বাঙ্গালীত্ব' নিয়ে মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তর্ক নতুন নতুন প্রশ্নের অবতারণা করেছে এবং—সব মিলিয়ে লেখকের মনে যে সংস্কৃতি-ভাবনার সঞ্চার হয়েছিল তাতে বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ এবং সমাজতন্ত্র নতুন প্রেক্ষিত যোগ করল। এই সময়েই তিনি সংস্কৃতি বিষয়ে

সুবৃহৎ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ "সংস্কৃতির রূপান্তর" রচনা করেন। সংস্কৃতির রূপান্তর-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৪১-এ, পরে একাধিকবার পরিমার্জিত হয়ে এটি শেষ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫'তে। 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ'-এর প্রথম লেখা হিসেবে এই সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্কারণটি স্থান পেয়েছে, শুধু আগের সংস্করণের "কথারম্ভ"টি এখানে 'পরিশিষ্ট'।

'সংস্কৃতির রূপান্তর'-র লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল "মানুষের মূল সৃষ্টিধারা ও বিকাশের নীতিনিয়ম, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের অগ্রগতি, আর তারই সঙ্গে দেশের, জাতির ইতিহাস ও গতিধারা বাঙ্গালী পাঠকের সামনে তুলে ধরা" —একথা লেখক নিজেই জানিয়েছেন আলোচ্য বইটির ১৯৮৬ সালে লেখা সংক্ষিপ্ত নিবেদন-এ। স্বাভাবিক ভাবে বইটির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবরণ ও ব্যাখ্যা এবং ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে ওঠা 'বাংলার কালচার', চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা। তথাপি সংস্কৃতির রূপান্তর শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ, তার সঙ্কট-সমস্যার ও রূপান্তরের পর্যালোচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংস্কৃতি ও তার রূপান্তরের সূত্রানুসন্ধানের তাত্ত্বিক প্রয়াসও।

বিজ্ঞানসম্মত যে কোনো আলোচনায় প্রথমেই ব্যবহৃত মূল প্রত্যয়ের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হয়। লেখক সংস্কৃতির যে সংজ্ঞাটি উপস্থিত করেছেন তা বিশেষ করে প্রণিধান যোগ্য। "সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি সম্পদও নয়," প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি ও প্রকৃতিকে আত্তীকরণ (appropriation) প্রচেষ্টার মধ্যেই এবং তার বাস্তব প্রয়োজনেই সংস্কৃতিকর জন্ম। এজন্য সংস্কৃতিকে এককথায় বলা যায় "বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব প্রকৃতির স্বরাজ-সাধনা।" সংস্কৃতির প্রকাশ "মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক" কীর্তি ও কর্মে, তার "জীবনযাত্রার আর্থিক ও সামাজিক রূপে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে, তার মানসিক ও অধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্পসৃষ্টি—সমস্ত কারুকলা ও চারুকলা ইত্যাদিতে (শেষ অংশ-বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ—কথাসূত্র—পৃঃ ২৩৫)। কডওয়েল-কে অনুসরণ করে লেখক জানিয়েছেন, সংস্কৃতির উদ্দেশ্য জীবন-সংগ্রামে শক্তি জোগান।

সংস্কৃতির এই সংজ্ঞা থেকে সংস্কৃতির ত্রি-স্তর অবয়বেরও পরিচয় পাওয়া যায় ; প্রথমটি মূল ভিত্তি—জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমূহ ; দ্বিতীয়টি

প্রধান আশ্রয় বা অবলম্বন—সমাজ-কাঠামো; এবং তৃতীয়টি শেষ পরিচয়—মানস সম্পদ। মানস-সম্পদই সাংস্কৃতিক উপকাঠামো বা সৌধ।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্মাণে লেখক স্পষ্টতই মার্ক্সীয় ভিত্তি—উপরিকাঠামোর উপমামূলক মডেলটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর সংজ্ঞায় বিশেষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড-এর প্রভাব লক্ষণীয়। চাইল্ড উৎপাদনের উপকরণ (tools, technological innovation) এর দ্বারা সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে সাংস্কৃতিক স্তর হিশেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত করার এটি একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়, কিন্তু সংগঠিত সমাজে টেকনোলজি গুরুত্বপুর্ণ হলেও নির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি এবং তার চৈতন্য গত প্রকাশের ভিত্তি নয়। মার্ক্স উৎপাদনের উপকরণকে নয়, তার বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে গড়ে-ওঠা উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টিকে ভিত্তি বলে (real foundation) চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর ভাষায় এর উপরই নির্ভর করে "সামাজিক চৈতন্য" বা Social conscionsness—সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদে যার প্রকাশ।

প্রসঙ্গত, নৃতাত্ত্বিক Kluckhohn সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন সংস্কৃতি "একটি মানব গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনধারা" বা "তাদের সম্পূর্ণ জীবন পদ্ধতি" (their Complete design for living)। এই জীবন পদ্ধতি আপনা-আপনি গড়ে ওঠেনা; উৎপাদন শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে যে সমাজপদ্ধতি বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সম্ভব করে, তার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এই জীবনপদ্ধতি। জীবন পদ্ধতির রূপান্তরও সূচিত হয় সমাজপদ্ধতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া শুধু জীবনপদ্ধতিই সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতির অবয়বের একটা অংশ মাত্র, সমাজ চৈতন্যের মাধ্যমে জীবনপদ্ধতির যে প্রতীকী প্রকাশ সেটি সংস্কৃতির একটি মূল অঙ্গ। এবং এতেই সংস্কৃতির শ্রেণীগত রূপ প্রকাশ পায়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞায় 'টেকনলজিক্যাল বায়াস' থাকলেও (বর্তমান সমালোচকের সংশয়); বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা উপকরণের কার্য কারণ সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর অমূল্য সম্পদ। বহু অনালোকিত দিককে লেখক আলোকিত করেছেন, অনেক ছোটখাটো বিষয়ও মূল্যবান হয়ে উঠেছে। এই বই পড়ার পর ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা, তার ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছেদ, সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বোধ গড়ে ওঠে—এতেই এই বই-এর সার্থকতা। সংস্কৃতির রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ

অধ্যায় (আমাদের কাছে) বাংলার সংস্কৃতি; লোকসংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক যুগের 'বাবু কালচার'-এর বিশ্লেষণ।

সম্প্রতি সাংস্কৃতির মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় ভিত্তি-উপরি সৌধের প্রকৃত তাৎপর্য, তাত্ত্বিক উপযোগিতা, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। (Raymond Williams—Base and superstrcture in Marxist Cultural Theory, Problems in Materialism and Cultural বই-এ, এবং Marxism and literature বই-এর cultural Theory শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে নানা বিষয়ে – যেমন, এশিয় সমাজ—অনেক নতুন নতুন তথ্য, নতুন নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। এসব রচনা-কালগত কারণেই লেখক ব্যবহার করতে পারেন নি। বিজ্ঞানের জগৎ পর্বেও কালিক সীমাবদ্ধতা আছে।

৩.

সংস্কৃতির রূপান্তরের পর সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত হালদার-এর আরও দুটি বই প্রকাশিত হয়েছিল—বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ, ১৯৪৭ সালে, এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, ১৯৫৬ সালে। সুদীর্ঘকাল বই দুটি অপ্রাপ্য ছিল, আলোচ্য 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দুটি বই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিষয় নিয়ে লেখা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ, পুস্তক পর্যালোচনা, এবং বক্তৃতার সমষ্টি ; ফলে বেশ কিছুটা সমসাময়িকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্যই লেখক অনুসৃত বিশ্লেষণ ধারা বা বিভিন্ন সমস্যার সংকেত আজও প্রাসঙ্গিক, কিন্তু উত্থাপিত বহু প্রশ্ন তাদের সমসাময়িক গুরুত্ব হারিয়েছে।

শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়, এই নিবন্ধনিচয়-এর কোনো কোনোটির ঐতিহাসিক বা গবেষণামূল্য থাকলেও প্রাসঙ্গিকতা নেই—যেমন, বাঙ্গালী সংস্কৃতির চলতি হিসাব। আবার এমন বেশ কিছু নিবন্ধ আছে যা আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ—যেমন, বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ-রেখা, বাঙ্গালী মুসলমান ও মুসলিম কালচার, মুসলমান বাঙ্গালীর কালচার, বাঙ্গালী মুসলমানের কাব্য সাহিত্য কিংবা 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'র অন্তর্গত ভাষা-সমস্যা ও লিপিসমস্যা নিয়ে বিতর্ক। বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রকৃতি আলোচনায় ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে 'বাবু কালচার' ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ রচিত হয়েছে সে-বিষয়ে লেখকের মন্তব্য আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঐ বিচ্ছেদ

এখনও অব্যাহত এবং লোক সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া সংস্কৃতি দুইই সঙ্কটে মুমূর্ষু। গত কয়েক দশকে সঙ্কর ধনতান্ত্রিক বিকাশ, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কল্যাণে গণপ্রচার মাধ্যমের প্রভাবের ব্যাপ্তি, আর এগুলির মাধ্যমে অবক্ষয়িত ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির সর্বনাশা সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ সঙ্কটকে গভীরতর এবং এর নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

প্রতিবাদী সংস্কৃতি বা আগামীকালের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা যে গড়ে ওঠেনি, তা নয়: তবে নানা কারণে তার প্রভাব সীমিত। এই প্রসঙ্গে, লেখকের 'কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব' শীর্ষক নিবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। "বাংলাদেশের কালচারাল সঙ্কটের স্বরূপ কী, তা কতটা জটিল, কতটা জরুরী" কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কর্মীদের তা অনুধাবন করতে হবে। অর্থাৎ অনুধাবন করতে হবে গত চার দশকে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন (মূল্যবোধের কাঠামোয় পরিবর্তন সর্বদা খুব স্পষ্ট বা সোচ্চার নয়) ঘটেছে এবং যেভাবে বুর্জোয়া hegemony প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে, তাকে। তা না হলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নীতি ও কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নির্দিষ্ট শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করা শোষক শ্রেণীর সংস্কৃতির একটি প্রধান কাজ। নানা ধরণের "ধোঁয়ার জাল" বা false consciousness সৃষ্টি করে শোষকশ্রেণী "নিজেদের আসন পাকা করতে" সচেষ্ট হয়। কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কর্মীদের দায়িত্ব হ'ল, বিপরীত মূল্য-কাঠামো ও প্রকৃত consciousness গঠন। এ-বিষয়ে পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট কর্মীরা কতটা সফল হয়েছে? একদা গণনাট্য সঙ্ঘ নতুন প্রেরণা সঞ্চার করলেও, বর্তমানে স্তিমিত। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাজনৈতিক দিক থেকে এগুলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে এসেছি—উদাহরণ, নাট্য আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা। কমিউনিস্টদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট সম্পর্কে চেতনার যে অভাব আছে, তার লক্ষণযুক্ত হালফিল একটি উদাহরণ, হোপ-৮৬।

প্রসঙ্গত কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক কর্মীদের শিল্পপ্রয়াস সম্পর্কেও লেখক যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা কঠিন: "যেসব শিল্প বা সাহিত্য আমরা কমিউনিস্টরা সৃষ্টি করছি তা প্রায়ই নিষ্প্রাণ হয়।...আমরা মজুতদার নিয়ে, দুঃস্থ নিয়ে, পঞ্চমবাহিনী নিয়ে বা দেশপ্রেমিক নিয়ে যে শিল্প রচনা করি তা সবই একটা এ্যাবস্ট্রাক্ট বা গত বাঁধা মজুতদার,

গৎ বাঁধা দুঃস্থ, গৎ বাঁধা পঞ্চম বাহিনী ও গৎ বাঁধা দেশপ্রেমিক হিসাবে আঁকি।...কিন্তু শিল্প মানে কোনো নীতি বা আইডিয়া বা শ্লোগান আওড়ানো নয়। যে মানুষ নানাসূত্রে বাঁধা, তার মনুষ্যত্ব জটিল বিচিত্র, ভালোবাসায়, দেশভক্তিতে, লোভে, ভয়ে—সব জড়িয়ে সে একটি বিশেষ মানব (individual)। তাই আমাদের শিল্পীরা এই পার্টি শ্লোগান বলবার ঝোঁকে শিল্পের উদ্দেশ্য ভুলে যান, মানে রূপ সৃষ্টি করতেই ভুলে যান।"

৪.

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর ভূমিকায় উপসংহারে বলেছেন—"এই রচনাবলীর মধ্যে লেখকের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিকবোধ পরিচ্ছন্ন মনন, গোঁড়ামিহীন দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শোষণ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠার উজ্জ্বল পরিচয় স্বয়ম্প্রভ হয়ে আছে। এটি এই আলোচনারও শেষ কথা।

বইটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক অবশ্যই গুণমুগ্ধ পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন। তবে এই বই-এর প্রকাশনার মান আর একটু উন্নত হওয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল, যেখানে দাম বাংলার প্রকাশনার মূল্যের পরিমাপে কম নয়।

সংস্কৃতির বিশ্বরূপ—গোপাল হালদার মনীষা গ্রন্থালয়: ৭৫ টাকা।

সংস্কৃতি : ইতিহাস ও প্রশ্ন

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে ছিল প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি প্রভৃতির দপ্তর। আনুষঙ্গিক বহু কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। '৪৬ নং' নামে একটি ছোট পুস্তিকা লিখেছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। আলোচ্য বইতে সেটি ছাড়াও আছে ৩৭টি লেখা। চল্লিশের দশকে যে গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ, তার নানা অঙ্গ নিয়ে এগুলি লিখিত। সাংস্কৃতিক-সাংগঠনিক কাজের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি যে সেল তৈরি করে, তাতে ছিলেন তিনজন—বিনয় রায়, সুধী প্রধান এবং চিন্মোহন সেহানবীশ। সেলের সেক্রেটারি ছিলেন শ্রীসেহানবীশ। সুতরাং ঐ সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যে খুবই ওয়াকিবহাল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর তথ্য নির্ভরযোগ্য। যত দিন যায়, খবর ততই বিস্মৃত বা বিকৃত হওয়ার আশংকা বাড়ে। তার আগেই তথ্যগুলি সংগৃহীত হওয়া দরকার। এই দরকারি কাজটা শ্রীসেহানবীশের চেয়ে ভালভাবে আর কে করতে পারতেন!

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর প্রবন্ধে তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, তার বিভিন্ন ভাষ্য ও ব্যাখ্যা, চীনের প্রয়াস ও 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। তত্ত্ব-বিলাস-নয়, বায়বীয় পরিস্থিতিতে তত্ত্ব নয়, দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্ব। আন্দোলন ও তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গি।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধ ব্যক্তিস্মৃতিমূলক। তারাশংকর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরভেজ শহীদী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায়, গঙ্গাপদ বসু, সুকান্ত—এই সব নাম দেখেই বোঝা যায় যে লেখাগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েও ইতিহাস-অনুসন্ধানী। যেমন, মানিক সম্পর্কিত প্রবন্ধটির নাম 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন'—এ থেকেই বোঝা যায় লেখাটির ধরন। তথ্য, তত্ত্ব, ব্যক্তি—এই তিন ভাগে আমরা ভাগ করলেও সব মিলিয়ে ইতিহাস। তবে ধারাবাহিক নয়। নানা সময়ে লেখা। পূর্বপরিকল্পিত নয়। তাই অসমতা আছে, হয়ত ফাঁক আছে। লেখকের স্বাস্থ্য ও বয়স অনুকূল থাকলে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার অনুরোধ করতাম তাঁকে। কিন্তু এ অনুরোধ এখন করা চলে না। তবু ইতিহাসের এই উপাদান-সংকলনেরও বিশেষ মূল্য আছে। অসুবিধা থেকে যাবে দুটি ক্ষেত্রে : (১) যে সব তথ্য সংকলিত হয়ে রইল না এখানে সেগুলি অজ্ঞাত থেকে যাবে, বা জনশ্রুতির ভিত্তিতে সংগৃহীত হবে। (২) যে সব ঘটনা এখনি বিকৃত বা বিতর্কিত হয়ে আছে, তার জট আর ছাড়ানো যাবে না। টুকরো প্রবন্ধ লিখে এই অসুবিধা যতটা দূর করতে পারেন লেখক ততটাই মঙ্গল।

দুটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে—'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার' ও 'রবীন্দ্রনাথ কি আজও প্রাসঙ্গিক?' আজও রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে লেখক মনে করেন। তিনি দেখেছেন—১৯৩৪-৩৫-এর তরুণ মার্কসবাদীরা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে 'ফিউডাল বা বুর্জোয়া বলে ধূলিসাৎ করবার চেষ্টা' করেছেন। এখন 'তারা রবীন্দ্রসাহিত্যের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছে।'—এতে লেখক খুশি বোধ করেছেন, 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদ যে শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয়েছে' সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ১৯৫০-এ লেখা এই প্রবন্ধে খুশি হওয়া বা নিশ্চিন্ত হওয়া সহজ ছিল। এখন হিসেবে দেখা যাচ্ছে কয়েক বছর বাদে বাদে মার্কসবাদীদের রবীন্দ্রবিমুখতা উত্তুঙ্গ হয়। ১৯৩৫-৩৬-এর কথা তো লেখক নিজেই বলেছেন। ১৯৪৮-৪৯-এ রবীন্দ্র-নিধন-যজ্ঞ অনেক ঘটেছে। ১৯৮৬-তে (রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীর সময়) পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের দুই মার্কসবাদী পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আহমদ শরীফ ঢাকার বিখ্যাত পণ্ডিত, অধ্যাপক, চীন-সমর্থক সাম্যবাদী। তিনি ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমী-র মুখপত্র 'উত্তরাধিকার'-এ রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বা জমিদার বলেই ক্ষান্ত হন নি, বলেছেন—সাম্প্রদায়িক। এই আবিষ্কার

নতুন। এর আগে আর কোনো মার্কসবাদী বলেছেন বলে জানি না। পশ্চিমবঙ্গে নারায়ণ চৌধুরী। গান্ধীবাদী ছিলেন। এখন মার্কসবাদী। চিন্মোহন সেহানবীশের ভাষায় 'অসাধারণ বুদ্ধির মানুষ'। ইনি শারদীয় (১৯৮৬) 'অগ্রণী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে কম্যুনিস্ট পার্টির 'উনপঞ্চাশী' আমলের গালাগাল সবকটি দিয়েছেন। তখনকার রবীন্দ্র-বিরোধী লেখাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা রবীন্দ্র-অনুষ্ঠান করেছে বলে তিনি ক্ষুব্ধ। রবীন্দ্রসৃষ্টির শিল্পরূপ বিষয়ে গভীর আলোচনা কেউই করেন নি। চিত্রটা যেন এখনো গোলমেলে। সন্দেহ জাগে, শৈশব কি সত্যিই অতিক্রান্ত? নাকি অ্যাডসেমেণ্ট অবস্থা চলছে?

সাহিত্য ও মার্কসবাদ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা আছে কয়েকটি প্রবন্ধে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এসেছে লুকাচের কথা, গারোদির কথা। খুব খুঁটিয়ে আলোচনা নয়, এঁদের বক্তব্যগুলি বোঝবার চেষ্টা। বহু আলোচিত 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' প্রবন্ধটি এ বইতে পুনর্মুদ্রিত। ১৯৪৯ সালের ২২-২৪ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র চতুর্থ সম্মেলনে পঠিত এবং 'পরিচয়' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬) প্রকাশিত। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুই পরে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' সূত্রে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই 'উনপঞ্চাশী' তত্ত্বকে লেখক এখন সমর্থন করেন না। 'ভ্রান্ত ও আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক' বলে মনে করেন। কিন্তু এক সময়ের একটি দলিল হিসেবে ছেপে ঠিকই করেছেন লেখক। ইতিহাসটা চোখের সামনে থাকা দরকার। কারণ 'উনপঞ্চাশী' প্রবণতা এখনো যথেষ্ট বর্তমান দুই বাংলাদেশে।

চীন সম্পর্কে আছে তিনটি প্রবন্ধ। ১৯৫১-তে লেখা প্রবন্ধে (শিল্প-সাহিত্যের সমস্যা : চীনের পথ) সমস্যা-সমাধানের চৈনিক প্রয়াসকে উৎসাহ ভরে সমর্থন করেছেন। পরে সুরু হয় চীনের 'সংস্কৃতি-বিপ্লব'। পরের দুটি প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখক তাঁর মত জানিয়েছেন স্পষ্ট উচ্চারণে : 'এই অপপ্রয়াস যুক্তিবিরোধী ও মানবতাবিরোধী আর তাই মার্কসবাদ বিরোধীও। মার্কস-এঙ্গেলস্ প্লেখানভ-লেনিনের সংস্কৃতি চিন্তার সঙ্গে কোন মিল নেই চীনের এই 'সংস্কৃতি-বিপ্লবের'।'

আমাদের দেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ, বিবরণ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে রয়েছে অনেকগুলি লেখা। তখন দেশে একটা নবীন প্রেরণা এসেছিল। দেশের কৃতী এবং উঠতি শিল্পীরা অনুপ্রাণিত

হয়েছিলেন। সেই উৎসাহিত দিনগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখাগুলিতে। মজলিশী ধরন। সহজ, অন্তরঙ্গ সুখপাঠ্য। খুব অল্পদিনের মধ্যেই আসে ভাঁটা। না ভাঁটাও নয়, ভাঙন। প্রগতি লেখক সংঘ কার্যত অস্তিত্ব হারায়। গণনাট্য হয় অতি স্তিমিত। বহু প্রতিভাধর স্রষ্টা সংঘ ত্যাগ করেন। খেয়োখেয়ি, কাঁদা ছোঁড়া। ভাঙনের পর অপভাষণ। ডঃ নীহার রায় একটি সভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, এতবড় আন্দোলন এত তাড়াতাড়ি ভাঙল কেন? উত্তরে শ্রীসেহানবীশ বলেছেন, আন্দোলনের 'সীমাবদ্ধতা', 'ব্যর্থতা,' 'অসম্পূর্ণতা' ছিল; কমিউনিস্ট পার্টির 'ভ্রান্তি' ছিল, 'সংকীর্ণতা' ছিল। এই স্বীকৃতির, এই আত্মসমালোচনার দরকার রয়েছে, কেননা, অনেকে এই দায়িত্ব কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। পার্টির বা আন্দোলনের দুর্বলতার কথা এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকরা মানেন না। ফলে তাঁদের সিদ্ধান্ত একপেশে।

শ্রীসেহানবীশ পার্টির 'ভ্রান্তি'র উল্লেখ করেছেন মাত্র, কিন্তু তাকে বিশদ করেন নি। বিশদ করলে ভাল হত, বোঝা যেত ভেতরকার ঘটনাগুলি। আর ভবিষ্যতে সঠিক পদক্ষেপের সুবিধে হত।

আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়। কেন নয়? শুধু কয়েকজন ব্যক্তির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে? অথবা সেই সংকীর্ণতা? শৈশব কি তাহলে ঘুরে ঘুরে আসে? বারবার? যদি তা আসে তাহলে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি, কারণ এখন রাষ্ট্রশক্তিতে শক্তিমান আমরা।

কিন্তু অতীত ছেড়ে প্রায় বর্তমানে এসে পড়েছি আমরা। আলোচ্য বইয়ের বাইরে চলে এসেছি। তাই প্রশ্নটা তুলেই বিদায় নিই। উত্তরের প্রত্যাশা রেখে এ বিদায়।

---

৬৩ নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে। চিন্মোহন সেহানবীশ। রিসার্চ ইণ্ডিয়া। ৬ টাকা।

কম্পিউটার সাহিত্যের দৃষ্টান্ত

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

এক

কোপেনহাগেনে তাঁর বাড়িতে বসে ড্যানিশ ভাষার বিশিষ্ট কবি, লেখক ও সমালোচক এরিক স্টাইনাস দুঃখ করেছিলেন, শুধু ভারতবর্ষ কেন, তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে গোটা পশ্চিম ইউরোপে যে বিপুল আগ্রহ দেখেছিলাম, তার সাহিত্য, শিল্প, সমাজতত্ব, রাজনীতি সবকিছু নিয়ে আগ্রহের যে জোয়ার দেখা গিয়েছিল, সত্তরের দশক থেকেই তাতে কেমন ভাঁটা পড়ে গেছে।

অথচ বার্লিনে এক সন্ধ্যায় আমাদের বিয়ারগার্টেনের আড্ডায় রিচার্ড এলেন একখানা বই হাতে করে। বাগানটা বার্লিনের ঠিক মাঝখানে আলেকজাণ্ডার প্লাৎস-এ, হোটেল স্টাড বার্লিনের গা ঘেঁসে। খোলা আকাশের নীচে গরমকালের আড্ডা। বইটা এগিয়ে দিতে দিতে রিচার্ড বললেন, 'তোমার শহর নিয়ে লেখা, পড়েছ নাকি?' দোমিনিক লাপিয়েরের 'সিটি অফ জয়।' কলকাতা ছাড়ার আগেই হাতে এসেছিল বইটা। কয়েক জেনারেশন এই শহরে থেকে কলকাত্তাইয়া হয়ে গেছে এমন একটি অবাঙালী পরিবারের ছেলে, আমার এক বন্ধু, বাড়ি বয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

'কেমন লাগছে তোমার?'

'সবে আরম্ভ করেছি, তবে বইটার উদ্দেশ্য তো মনে হচ্ছে ভালোই।'

'কী রকম ?'

'টাইটেল পেজে যা লেখা হয়েছে…'

লেখা হয়েছে, লেখক ও তাঁর পত্নী 'অ্যাকশন এইড ফর লেপার্স চিল্‌ড্রেন অফ ক্যালকাটা' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন যার সদর দপ্তর প্যারিসে। ইওরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংস্থার পাঁচ হাজার সদস্য আছেন। এই সংস্থার সংগৃহীত দান ব্যয় করা হবে কলকাতায় কুষ্ঠরোগীদের—আড়াইশ সন্তানের জন্য একটি হোমকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।'

এই সঙ্গে আরো ঘোষণা করা হয়েছে, "এই বই বিক্রীর টাকার একটা অংশ 'সিটি অফ জয়'-এ লেখকের বন্ধুদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হবে।"

রিচার্ড ক্রাইস্ট জি-ডি-আরের একজন বড় মাপের আধুনিক লেখক। গল্প, উপন্যাস, রিপোর্টাজ, প্রবন্ধ ছাড়া ট্রাভেলোগও লেখেন। সোভিয়েত ইউ-নিয়নের কোণে কোণে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তাঁর 'অ্যারাউণ্ড হাফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন নাইনটি ডেজ' অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছে। জি-ডি-আরের লেখক হওয়ার ফলে পশ্চিমের পাঠকের কাছে পৌঁছবার অনিবার্য বাধা সত্ত্বেও জার্মান ভাষাপ্রধান দেশে, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানিতে তিনি যথেষ্ট পরিচিত। ইওরোপের নানা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমেও তিনি পরিচিত। বেশ কয়েকবার ভারতবর্ষে এসেছেন। এদেশে তাঁর ঘোরাঘুরি নিয়ে লেখা 'মাইন ইণ্ডিয়েন' হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়েছে এবং এখনো হয়, জি-ডি-আর-এ এবং বাইরে। আমি বইটি প্রথম দেখি পশ্চিম জার্মানিতেই। বেশ মোটা এই বইটির বড় একটা অংশ জুড়ে আছে তাঁর কলকাতা দর্শনের অভিজ্ঞতা।

বার্লিনে বসে কলকাতাপ্রেমিক এক জার্মান লেখকের হাতে ইংরিজি অনুবাদে এক ফরাসী লেখকের কলকাতা সম্পর্কিত বই একই সঙ্গে মনে আহ্লাদ এবং সংশয় জাগায়। কানে তখনও এরিকের কথাগুলো ভাসছে।

দুই

দোমিনিক লাপিয়েরে খুব জনপ্রিয় লেখক। সাধারণতঃ তিনি লেখেন ল্যারি কলিন্সের সঙ্গে যৌথভাবে, তবে এদানিং জোড় ভেঙে একাই লিখছেন। তাঁরা বা তিনি যা কিছু লিখেছেন সবই খুব জনপ্রিয় হয়েছে, প্রায় প্রতিটি বই বিক্রী হয়েছে লক্ষ লক্ষ কপি। ফরাসিতে লিখলেও তাঁর বই গোড়াতেই সরাসরি প্রকাশিত হয় ফরাসি, ইংরিজি, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ডাচ

নানা ভাষায়। তাঁর নিজস্ব প্রকাশক রয়েছেন প্যারিসে, লণ্ডনে, নিউইয়র্কে, বার্সেলোনায়, মিলানে,মিউনিখে এবং আমস্টারডামে। তাঁকে মালটিন্যাশনাল কালচারের লেখক বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর লেখার টেকনোলজিও অন্যরকম। বিষয় ঠিক করে নেওয়ার পর তিনি শুরু করেন গবেষণা, প্রায়শঃই পেশাদার গবেষক নিয়োগও করেন। বহু লোককে ইন্টারভিউ করা হয়। তারপর এসবের ফলাফল ঢেলে দেওয়া হয় কমপিউটারে। এবং কমপিউটার তো প্রায় ভগবানই। লাপিয়েরের মতো লেখকও তাঁদের পদ্ধতি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে, অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া, মানুষের আবেগ ও অভিজ্ঞতার ভাগ নেওয়া, অনুভূতির গভীরতা, কল্পনার দীপ্তি, দর্শকের ব্যাপ্তি, প্রতিভা এসব যেন নিতান্তই ছেঁদো কথা, এবং গোর্কি, হেমিংওয়ে, জ্যাক লণ্ডন থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জাতের লেখকরা ও তাঁদের পদ্ধতি যেন নেহাৎই সেকেলে।

হয়তো সেই কারণেই লাপিয়েরের লেখা যে ঠিক কী তা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁরা বা তিনি একই পদ্ধতিতে ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন, অথচ তাতে আর যা-ই থাক ইতিহাস নেই, দৃষ্টান্ত 'ইজ প্যারিস বার্নিং'। রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন, 'রাজনীতি' বাদ দিয়ে, দৃষ্টান্ত 'ওহ জেরুজালেম'। কখনো বা তাঁর তথা তাঁদের লেখা পড়তে পড়তে থ্রিলার পড়ার অনুভূতি হয়, দৃষ্টান্ত 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট'। তিনি নিশ্চয়ই দাবি করবেন, ওটা ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। কেউ কেউ বলেন, লাপিয়েরে যা লেখেন তা আসলে সংবাদ সাহিত্য, বৃহৎ মাপের রিপোর্টাজ। এ জাতের লেখার সঙ্গে আমরা যে অপরিচিত তা নয়। এতে অন্ততঃ সংবাদের সত্যতা ও সাহিত্যের স্বাদু মেজাজ থাকা খুবই জরুরি।

তাঁর লেখা কখনও আবার মাঝারি মানের উপন্যাসের মতো ঠেকে, যেমন 'সিটি অফ জয়', যদিও এটি আর যাই হোক উপন্যাস তো নয়। শুধু একটা জিনিস তাঁদের বা তাঁর সব লেখায় সব সময় একই থেকে যায়, প্রায় একটুও বদলায় না, লেখার স্টাইল। দেশ-কাল-বিষয় নির্বিশেষে একজন লেখক একই স্টাইলে কেমন করে লেখেন, লিখতে পারেন; এমন জগজ্জয়ী লেখক, আমাদের ভাবিয়ে তোলে। হয়তো কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এরই অশিস এটা। কমপিউটার ভগবানের আর একটা মুশকিলও থেকেই যায়, ফর্মুলার এবং সীমাবদ্ধতার দাগটা কিছুতেই যায় না।

'সিটি অফ জয়'-এর মুখবন্ধে ও কৃতজ্ঞতা পত্রে ভারতবর্ষ ও কলকাতার

প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা ঘোষণার পর লাপিয়েরে কিছু খবর দিয়েছেন। (১) কলকাতা ও 'বেংগলে'র বিভিন্ন এলাকায় তিন বছর ধরে যা ব্যাপক গবেষণা তিনি চালিয়েছেন তা-ই এই 'স্টোরি'র ভিত্তি। (২) বহু লোকের ব্যক্তিগত ডায়েরি ও চিঠিপত্র পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। (৩) দু'শ-র ওপর লোককে দীর্ঘ ইন্টারভিউ করেছেন তিনি, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায়, দোভাষীর সাহায্যে এবং সেসব ফরাসী ও ইংরিজি ভাষায় রূপান্তরিত করে তার ভিত্তিতেই 'স্টোরি'র সংলাপ লিখেছেন। (৪) 'ব্যাপক গবেষণার ফল এই বই'। গবেষণার কাজ গুটিয়ে তুলতে তাঁকে সাহায্য করেছে মার্সাই শহরের মেডিয়াটেক কমপিউটার এজেন্সি। বলা বাহুল্য, টেকনোলজি ও ম্যানেজমেণ্ট সায়েন্স এবারেও ব্যর্থ হয় নি; 'সিটি অফ জয়' দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমের বাজারে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার থেকেছে এবং বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশেই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে।

তিন

লাপিয়েরে তাঁর 'স্টোরি'তে ভারতবর্ষ, ইওরোপ ও মার্কিন দেশের অনেক চরিত্র এনেছেন, কিন্তু কাহিনী এগিয়েছে প্রধানতঃ দুটি চরিত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাজারি পাল ও স্তেপান কোভালস্কি। পশ্চিম বাংলার বাঁকুলি গ্রামের (জেলার নাম জানা যায় না) নিঃস্ব চাষী হাজারি কলকাতায় রিকশা টানেন এবং সপরিবারে বস্তিতে বাস করেন। ক্যাথলিক পাদ্রী কোভালস্কি পোল্যাণ্ডের উদ্বাস্তু এক খনি শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে উত্তর ফ্রান্সের খনি অঞ্চলে, ধর্মশিক্ষা করেছেন বেলজিয়ামের এক মনাস্টারিতে, দরিদ্র মানুষের সেবার মিশন নিয়ে তিনি এসেছেন পিলখানার বস্তিতে। কাহিনীর আসল বিষয় এই বস্তি, লাপিয়েরের আনন্দনগর, 'সিটি অফ জয়' এবং কলকাতা।

আনন্দনগরের ছবিটি বীভৎস। আশাহীন মূল্যবোধহীন, পরস্পরে সম্পর্কহীন, নানাভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনাচরণের মানুষ সেখানে দিন কাটায় নরকের পূতিগন্ধময় পরিবেশে। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা, হিংসা, দ্বেষ সেখানকার শাসক। এই বিশ্বে কালো রঙের যা কিছু হতে পারে, নর্দমায় শিশুর শব থেকে হিজরার দল বা গডফাদার সবই উপস্থিত সেখানে। বস্তির প্রান্তে, ঠিক বাইরে, কুষ্ঠরোগীদের পৃথক, বিচ্ছিন্ন এক বসতি, অন্য এক জগৎ। সেখানে প্রবেশ করতে নরকেরও পা কাঁপে। কোভালস্কির কার্যকলাপ দিয়ে তা-ও হয়ে ওঠে আনন্দনগরের অংশ।

গঙ্গার অপর পারে কলকাতার ছবিটি বীভৎসতর। সে ছবি আঁকা হয় প্রধানতঃ হাজারি ও তাঁর পরিবারকে ধরে, নানা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাদের নিয়ে যেতে যেতে। বাকিটুকু আসে প্রত্যক্ষ, লেখকের কলম থেকে। হাওড়া স্টেশন থেকে মধ্য কলকাতার ফুটপাথ, বড়বাজারের বিপুল বৈচিত্র্য, অমানবিক। ফুটপাথের জীবনে বালক পুত্র ভিক্ষা করে, কিশোর চলে যায় ওয়াগন ভাঙতে, কিশোরী বেশ্যা হয়ে যায়। কলকাতার রক্ত কেনাবেচার র‍্যাকেট। রিক্সাচালকের শোষণ ও যন্ত্রণার জীবন মালিকদের র‍্যাকেট। ফুসফুস থেকে উঠে আসা যক্ষ্মা রক্ত লুকোতে পান খায় রিক্সা-চালকরা। মানুষের হাড়ের ব্যবসা। জীবিত মানুষকে দাদন দিয়ে তার হাড়গোড় কিনে রাখে ব্যবসায়ী। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে সেই টাকাই নিতে হয় হাজারিকে। বিয়ের রাত্রেই তার মৃত্যু হয়! সঙ্গে সঙ্গে, যেন মাটি ফুড়ে হাজির ব্যবসায়ীর দুই দূত, বাকি টাকা হাতে নিয়ে। মৃতদেহ নিয়ে যাবে, ও দেহের সব হাড় তাদের। নিয়ে যায়। কেনা হয়, বেচা হয় মায়ের পেটের ভ্রূণও। সে প্রক্রিয়ায় মা মারা গেলে তার রক্তে ভাসা দেহ পড়ে থাকে কলকাতার বৃহৎ জঙ্গলে।

কলকাতার গৌরবের কথাও আছে লাপিয়েরের বইয়ে। জানিয়েছেন, এ শহরে নিত্যনতুন নাটক প্রযোজিত হয়, ইংরিজিতে অনুবাদ হওয়ার আগেই বাংলায় এসেছেন মলিয়ের। সারা দেশে যতো নাটকের গ্রুপ আছে তার অর্ধেকই এই শহরের। কলকাতার গর্বের সন্তানদের তালিকাও করেছেন তিনি—রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, সত্যেন বোস, রবিশংকর, সত্যজিৎ রায়। তথ্যের সূত্র নেই কিন্তু বলেছেন, প্যারিস রোম দুইয়ে মিলে যতো লেখক তৈরি করে একা কলকাতা জন্ম দেয় তার চেয়ে বেশি, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক একত্রে যতো সাহিত্য সমালোচনা লেখে, কলকাতা একাই লেখে তার অধিক। গোটা ভারতে যতো পুস্তক প্রকাশক আছে কলকাতায় আছে তার চেয়ে বেশি।

বইয়ের শুরুতে 'বেংগলে'র গ্রামজীবনের বেশ মোলায়েম ও রোমান্টিক ছবিও আছে। দরিদ্র কিন্তু শান্ত, সমাহিত, রূপময়, প্রেমময়, চোখে জল আনার মতো, আমাদের বাল্য স্কুলপাঠ্য পদ্যে যেমন থাকত।

আনন্দনগর ও কলকাতার ছবি গাঢ় কালো রঙে আঁকা হলেও মাঝে মাঝে, যেন মিলিয়ে মিলিয়ে, ব্যবহৃত হয়েছে উজ্জ্বল হলুদ, নীল এবং হালকা গোলাপী রঙও। কোভালাস্কির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনন্দনগরে আসে

মালটি-মিলিওনেয়ার এক মার্কিন পরিবারের উত্তরাধিকারী। সেই সূত্রে মার্কিন বড়লোকীর রূপকথার মতো জীবন ও প্রেমের ছবি আসে। আসে এই শহরের গ্র্যাণ্ড হোটেলের আরাম। আর আসে শহরের হাই সোসাইটি এবং যেন তারই প্রতিনিধি, সংস্কৃতি জগতের এক রুচিময়ী, রূপময়ী নায়িকা, ধনী শিল্পপতির স্ত্রী, কিছু বয়স হলেও লাস্যময়ী এবং আকাংখিতা। সে ছবিতে সহজেই আসে ফরাসী শ্যাম্পেন, স্কচ হুইস্কি, আরব্য উপন্যাসের বিছানা এবং সেক্স। শুধুই বীভৎসা নয়, মাঝেমাঝেই রিলিফ আছে, আরামের। একটা বই কি এমনি এমনি বেস্ট সেলার হয়!

চার

'ব্যাপক গবেষণার ফল এই বই।'

কিন্তু শুধু গবেষণাতে কি সাহিত্য হয়? কমপিউটার তথ্য দিতে পারে, হয়তো তথ্যের বিশ্লেষণও, হয়তো নির্ভুলও ; কিন্তু আত্মার অন্তর কি সে স্পর্শ করতে পারে? দর্শনের অঙ্গীকার দিতে পারে? অথবা সত্যের আকাঙ্ক্ষা? এইখানেই সব গোলমাল হয়ে যায় 'সিটি অফ জয়'-এ।

লাপিয়েরে গবেষণা করেছেন, মানুষের অভিজ্ঞতা, বোধ আর আবেগের অংশীদার হন নি। ফলে এমন কি সাধারণ ডিটেইলও গুলিয়ে গেছে, কমপিউটার বাঁচাতে পারেন নি। ছোটখাট ব্যাপার, কিন্তু এই ছোটখাট ব্যাপারগুলোই তো সত্যের প্রাণ, বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

বিক্রী হয়ে যাওয়া গোরু খেতে চায় না, হাম্বারবে কাঁদে। এই কান্না বড় কুলক্ষণ, বোঝা যায়, গো-পালের দেবতা কৃষ্ণের প্রেমিকা রাধা রুষ্টা হয়েছেন, সর্বনাশ হবে।

বৃষ্টির দেবতা গণেশ, তাঁর পূজা দেয় গ্রামবাসীরা খরা দূর করতে। তারা রেডিওতে আবহাওয়ার সংবাদ শোনে না, জানে, যতোদিন না কোকিল চোখে দেখা যাবে ততোদিন বৃষ্টি নামবে না।

বাঙালী চাষীর ঘরে গৃহদেবতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান ও গণেশ।

হাজারির ভাই অভাবের জ্বালায় ভাগচাষ ছেড়ে চাকরি নেয়, ক্ষেত-মজুরের চাকরি।

খরায় জলকষ্ট চরমে উঠতে গ্রামের 'মিউনিসিপ্যাল অথরিটি' জলের রেশন

করে দেয়, 'মেয়রের' বাড়ি গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে এক কাপ করে জল খেয়ে আসে সবাই।

রক্ত বিক্রী করে প্রথম রোজগারের টাকায় হাজারি ফুটপাথবাসী তার পরিবারের জন্যে মিষ্টি কিনে ফেলে, 'বাঙালীর প্রিয় মিষ্টি বরফি।'

এইসব খবরে বিদেশী পাঠকরা হয়তো চমৎকৃত হন, হবেন, বাঙ্গালী পাঠক মজা পান, কিন্তু সত্য নিকটবর্তী হয় না। বোঝাই যায়, হয় কমপিউটার ফিডিং-এ গোল ঘটেছে, নয় ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের বৈচিত্র্য গুলিয়ে ফেলে লেখক উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।

তিন বছর ধরে গবেষণা করেছেন লাপিয়েরে। কিন্তু কোথাও বলেন নি কোন্ তিন বছর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁর লেখাতে যে সব ঘটনার উল্লেখ আছে তা থেকেই একটা আন্দাজ করতে হয়, বাধ্য হয়ে। চীনভারত যুদ্ধ (১৯৬২), পাকভারত যুদ্ধ (১৯৬৫), বিহারের ভয়ংকর খরা (১৯৬৮) উল্লিখিত হয়েছে। আবার এক জায়গায় গ্রামে 'ফুড ফর ওয়ার্কে'র ঘোষণার কথা বলেছেন। তবে কি সত্তরের দশকের শেষভাগে কাজ করেছেন তিনি? তা হলে তো তাঁর সমগ্র গবেষণা ও লেখার সত্যতা নিয়েই কথা উঠবে। অভাবের তাড়নায় গ্রাম থেকে দলে দলে কলকাতায় চলে আসার যে 'স্টোরি' তিনি বলেছেন সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকেই তা সেকেলে হয়ে গেছে। আটাত্তরের ভয়াবহ বন্যাতেও একটি পরিবারকেও গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসতে হয় নি। অথচ তাঁর গবেষণার সময় সত্তরের শেষ ভাগ হওয়া খুবই সম্ভব। তাঁর মতো দরের লেখক ষাটের দশকের শেষে বা সত্তরের গোড়ায় গবেষণা করবেন এবং বই বেরোবে ছিয়াশিতে (প্রথম ব্রিটিশ সংস্করণ ১৯৮৬) এটা ভাবা খুবই কঠিন। ভাবা ঠিকও নয়, কারণ তিনি মুরহাউসের 'ক্যালকাটা' বইখানির প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন। 'ক্যালকাটা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। ফলে খুবই সন্দেহ হয়, পুরোনো এবং বাতিল তথ্যের ভিত্তিতে বুঝি বা বইটি লিখেছেন তিনি, কারণ একমাত্র তার ভিত্তিতেই হাজারির মতো ট্রাজিক চরিত্র তৈরি করা যায় এবং তা তিনি জানেন বলেই হয়তো পাঁচ শ' পাতার চেয়ে মোটা বইয়ের কোথাও 'স্টোরি'র সময় নির্দিষ্ট করেন নি। কোনো লেখক সম্পর্কে এমন সন্দেহ সত্য হলে সাধারণতঃ তাঁকে অসৎ বলা হয়। কথাটার জোর আরো বাড়ে যেহেতু লেখক দাবি করেছেনঃ লেখাটি কাল্পনিক নয় এবং গবেষণাভিত্তিক।

নিছক গবেষণাভিত্তিক এ জাতীয় লেখার আরো কিছু বিপদ থাকে।

সমাজের ও মানুষের কিছু বিষয় ও বৈশিষ্ট্য স্পর্শ করাও তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে ওঠে। তাই আকাল পড়তেই যৌথ পরিবার ভেঙে হাজারি কলকাতায় চলে যায় তার একক পারিবারিক ইউনিট, বউ, মেয়ে ও দুই ছেলেকে নিয়ে; বাবা, মা, ভাই, ভাইয়ের বৌ-বাচ্চাদের ফেলে রেখে। ভারতীয় গ্রামীন পরিমণ্ডলে এমতাবস্থায় সাধারণত হয় সবাই মিলে পাড়ি দেয়, নয় সক্ষমদেহ পুরুষরা রোজগারে যায়, বাকিরা থেকে যায় মূল পরিবারে। কলকাতার অসংখ্য রিকশাওয়ালাই তাই করে। অন্যদিকে হাজারিরা যখন গ্রাম ছেড়ে যায় গ্রামের একটি মানুষও এসে দাঁড়ায় না সে দৃশ্যের পাশে, এদেশের গ্রামের যৌথ জীবনের প্রেক্ষাপটে যা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, শহরে অনেক লড়াইয়ের পর সে যখন আশ্রয় ও আহার্যের যা হোক কিছু ব্যবস্থা করতে পারে, একবারও, এমন কি একান্ত ভাবনাতেও, ফেলে আসা পরিবারের কথা ভাবে না। অভিন্ন জমিতে শ্রম করার ভিত্তিতে যৌথ পারিবারিক জীবনে, গ্রামে, আজও পরস্পরে যে টানের বাঁধন আছে হাজারির পরিবারই যার দৃষ্টান্ত, তাতে এই না-ভাবা ভয়ংকর অসম্ভব। প্রত্যক্ষ চাষী হাজারি, জমির সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘর্মের ও রক্তের। অথচ শহর জীবনে সে অনেক স্বপ্ন দেখলেও একবারও ঘরে ফেরার, জমিতে ফেরার স্বপ্ন দেখে না। অথচ বাস্তবে তার অবস্থার প্রায় প্রত্যেকেই যে শুধু এই স্বপ্ন দেখে তাই নয়, পারলেই দেশে টাকা পাঠায়, মহাজনের হাত থেকে জমি ছাড়ায়, নতুন জমি কেনে। তারা মনে মনে সারাক্ষণ বাস করে তাদের গ্রামে। হাজারিকে লেখক তার সব শেকড় থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন মনের মতো করে, ইওরোপীয়ান সর্বহারার আদলে। এদেশের শহরে সর্বহারার তলায় তলায়, বিশেষতঃ প্রথম জেনারেশনের মনের গভীরে যে গ্রামীণ টান থাকে, পারিবারিক মায়া থাকে আজকের পশ্চিমের বাস্তবতায় তা হয়তো ভাবাই যায় না। অথচ ভাবতে না পারলে এদেশের সত্য স্পর্শ করা সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে এবং তখন বানাতে হয়, ফর্মুলায় ফেলে। লাপিয়েরেকে তাই করতে হয়েছে, অনেকাংশে।

তাঁর লেখায় কলকাতা যে অসম্ভব খণ্ডিত হয়ে এসেছে এটা তার অন্যতম কারণ, ঘোরতর আরো কারণ আছে। এ শহরের আনাচে-কানাচে ও গোপন জীবনে অনেক কলংক ও কালিমা জমে আছে আজও। তাই তিনি দেখেছেন ও লিখেছেন, কিন্তু শুধু তাই। সঙ্গে মিশিয়েছেন প্রয়োজনমতো হাই সোসাইটির রঙীন চেহারা। তাঁর 'ব্যাপক গবেষণা' ও দীর্ঘ শহর পরিক্রমায় ঘটনাচক্রেও একটা মিছিল, সমাবেশ, ঘেরাও, ধর্ণা, লাল পতাকা,

তেরঙ্গা পতাকা, ধর্মঘট, ইউনিয়ন, এমন কি রাজনৈতিক সংঘাত, সংঘর্ষ কিছুই আসে না। কলকাতার দগদগে ঘা সত্য, কিন্তু আর এক সত্য, কলকাতার আসল মুখ, রাগী, অহংকারী এবং সংগ্রামী মুখ ভুলেও আসে নি তাঁর লেখায়। অথচ সে সংগ্রামে শহরের মধ্যবিত্ত যেমন থাকে তেমনি থাকে 'সিটি অফ জয়'-এর সর্বহারাও। সংগ্রাম, সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, একতা ও চেতনা তার কষ্ট আর লাঞ্ছনার জীবনে এক আশ্চর্য ডাইমেনশন যোগ করে যা ছাড়া সে কিছুই নয়। এবং লাপিয়েরের লেখায় কিছুতেই সে সত্য আসে না বলেই, আনা হয় না বলেই হাজারিদের মুখ দেখে মনে হয় তারা বুঝি সত্যিই কিছুই নয়। কলকাতা ও তার মানুষ সম্পর্কে এর চেয়ে বড় অসত্য আর কিছুই হতে পারে না। এ অসত্য লাপিয়েরের 'স্টোরি' ও তার নামের বৈপরীত্যেই স্পষ্ট। স্টোরির কোথাও কোনো আশা নেই, আনন্দ তো নেই-ই। লেখাকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন লেখার নাম।

কলকাতা নিয়ে দু'জন বিদেশীর লেখা দুটি বইয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। জিওফ্রে মুরহাউসের লেখা 'ক্যালকাটা' এবং ক্যাথরিন স্পিংক-এর লেখা 'দ্য মিরাকল অফ লাভ'। স্পিংক লিখেছেন মাদার টেরেসা ও তাঁর কাজ নিয়ে। প্রসঙ্গতঃ, 'সিটি অফ জয়' তিনিই অনুবাদ করেছেন ইংরিজিতে। মুরহাউসের কাছে লাপিয়েরে বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করেছেন। এ ঋণস্বীকারের কারণ বোঝা দায়। মুরহাউস আন্তরিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন কলকাতাকে। শত ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি সৎ সাংবাদিক গবেষকের মতোই এ শহরকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বই বেস্ট সেলার হয় নি কিন্তু সিরিয়াস লেখা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। মুরহাউসের লেখায় কলকাতার সংগ্রামী চেহারা ও তার রাজনৈতিক সত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর বইয়ের এগারোটি অধ্যায়, তিনটির নাম, 'পভার্টি', 'ওয়েলথ' ও 'পেট্রিফায়িং জাংগল', আর তিনটি অধ্যায়ের নাম 'পিপল পিপল', 'দ্য রোড টু রেভোলিউশন' ও 'জিন্দাবাদ'। মূল্যায়ণে বা সিদ্ধান্তে কখনো কখনো তিনি বরং কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন, তাঁর মন্তব্য, দু'জন মানুষ এ শহরকে বদলে দিয়েছেন, একজন রবীন্দ্রনাথ অন্যজন জ্যোতি বসু।

লাপিয়েরে যদি তাঁর কাছ থেকে সামান্যও ঋণ নিতেন তবে রক্ত ব্যবসার র‍্যাকেটের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজ অফিস কারখানায় স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলন এবং ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও অনুরূপ সংগঠনও তাঁর চোখে পড়ত। শুধু রিক্সাওয়ালার করুণ জান্তব জীবন দেখতেন না তিনি,

এ জীবনের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ও সংগঠনও দেখতে পেতেন। বস্তিজীবনের নারকীয় অস্তিত্ব তিনি এঁকেছেন মস্ত ক্যানভাসে, কিন্তু সে জীবন বদলাবার জন্যে বস্তিবাসীর লড়াই ও সংগঠন, বস্তিমালিক, পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধেও, এবং তাকে কেন্দ্র করে তাদের সমবেত জীবন ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক-চেতনা এমন করে বাদ পড়ত না তাঁর লেখা থেকে। এইসব মিলিয়ে, এসবের সার বিপুল রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রাম ও সংগঠন নিয়ে যে-কলকাতা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার তুল্য বিশ্বের সমস্ত মেট্রোপলিটান শহরকে ছাড়িয়ে, অনন্য হয়ে, তা কিছুতেই তাঁর নজর ও কলম এড়াতে পারত না। অথচ এই কলকাতাই তো আসল কলকাতা, সত্য কলকাতা। এই সত্যের জন্যেই তো এ শহর কারো কাছে খ্যাত, কারো কাছে কুখ্যাত, কারো কাছে স্বপ্নের, কারো কাছে দুঃস্বপ্নের, কারো কাছে প্রাণবন্ত, কারো কাছে বা মৃতই। তবু এ সত্য এমনই তীব্র যে কিছুতেই তাকে অস্বীকার করা যায় না।

তিন বছরের গবেষণা, এতো মানুষের ইণ্টারভিউ, এতো চিঠিপত্র ও ডায়েরি পাঠ, 'ক্যালকাটা'র প্রতি এমন ঋণস্বীকার, কলকাতার প্রতি বারবার ঘোষিত প্রেম, তবু অনস্বীকার্য এই সত্য কেমন করে পিছলে গেল লাপিয়েরের নজর থেকে? কেন গেল? সত্য তাঁকে ফাঁক দেয় নি, তিনিই এড়িয়ে গেছেন তাকে, সতর্কভাবে পরিকল্পিতভাবে। গোটা লেখাটা তিনি যে জায়গায়, যে চেহারায় ধরে রেখেছেন, রাখতে চেয়েছেন, সে পরিকল্পনায় সংগ্রামী রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংগ্রাম এক বিপজ্জনক, অচ্ছুৎ ব্যাপার। তার মানে তিনি বা তাঁর লেখা অরাজনৈতিক এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সে অন্য এক রাজনীতি। 'ইজ প্যারিস বার্নিং' প্রমাণ করেছে, নাৎসি দখলের সময় এবং তাদের পরাজয়ের মুহূর্তে হিটলারের সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্বেও প্যারিস যে ধ্বংস হয়ে যায় নি, পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি, তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণই প্যারিসের নাৎসি প্রশাসক জেনারেল ফন কোলভিৎস-এর। "ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইটে'র ভাষ্য অনুসারে গান্ধীহন্তা নাথুরাম গডসে বীরই ছিল। লেখার স্টাইলের মতো লাপিয়েরের দৃষ্টিভঙ্গিতেও কোনো বদল হয় নি, 'সিটি অফ জয়'-এ। আর সেই কারণেই তিনি তাঁর গবেষণার কাল স্পষ্ট করেন না। সেই কারণেই 'সিটি অফ জয়'-এর মানুষগুলি প্রত্যেকে দুঃখী একক, গোষ্ঠিবদ্ধ, শ্রেণীগত বা সমবেত কোনো অস্তিত্ব তাদের নেই, পরিবর্তনপ্রয়াসী কোনো সংগ্রামী জীবন তো নেই-ই। সেই কারণেই এ বইয়ের কলকাতা এক বিশাল নরক, তার কোথাও কোনো আশা নেই। এ শহরের মানুষ শুধুই কৃপার যোগ্য, করুণাপ্রার্থী।

অথচ সবকিছুই এমন দরদী ভঙ্গিতে লেখা, ট্র্যাজেডির ঘটনা ও মুহূর্তগুলি এমনই নাটকীয় করে আঁকা সরল ও দরদী পাঠকের চোখে জল এনে দিতে পারে। কিন্তু কোথাও, কোথাও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মানের কোনো বোধ বা বোধের চিহ্নমাত্র নেই। প্রতিটি মানুষই যেন দুঃখে-কষ্টে বা জন্মে ভিখারী, যেন তার কোনো আত্মসম্মান নেই, অহংকার নেই।

এটা লেখকের খেয়ালের আকস্মিকতা নয়, সুচিন্তিত এক দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমের ঔপনিবেশিক মানসিকতারই হ্যাংওভার, যা তৃতীয় বিশ্বের দুঃখী মানুষকে কৃপা করার বিলাস চায়। আজকের জটিল পরিস্থিতিতে এ বিলাস তার জরুরি প্রয়োজন। অথচ বিত্তহীন কিন্তু মর্যাদাবান, দরিদ্র কিন্তু আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, দুঃখী কিন্তু সংগ্রামী, একা হয়তো অসহায় কিন্তু সমবেত অস্তিত্বে অহংকারী মানুষকে আর যাই হোক কৃপা করা যায় না, বরং শ্রদ্ধাই করতে হয় এবং নেহাৎ তা করতে না পারলে অন্ততঃ সম্মান জানাতেই হয়।

পশ্চিমের বিলাস মেটাতে তাই 'সিটি অফ জয়'-এর মানুষগুলিকে হতে হয় নিছকই কৃপার পাত্র, করুণাপ্রার্থী। লাপিয়েরের 'সিটি অফ জয়' তাই শুধু কলকাতা ও তার বস্তিজীবনের এক অক্ষম ও অসত্য চিত্রই নয়, কলকাতার নিষ্ঠুর অসম্মানও।

তবে শত কথার পরেও জেদী কলকাতা তার ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে বিনীত কণ্ঠে এক নির্বিকার ভঙ্গিতে জানাতেই পারে, ওতে তার কিছু যায় আসে না।

পাঁচ

ইওরোপ থেকে ফিরে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি খবর পড়লাম। পিলখানার বস্তির দুঃখী মানুষের উপকারার্থে লাপিয়েরে কয়েক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানকার মানুষ বিনীতভাবে সে টাকা প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছেন, লাপিয়েরে তাঁর বই 'সিটি অফ জয়'-এ কলকাতার রিকশাওয়ালাদের জীবনের বিকৃত ছবি এঁকেছেন, তাদের অসম্মান করেছেন। বার্লিনের সেই সন্ধ্যায় রিচার্ড ক্রাইস্ট যে প্রশ্ন করেছিলেন কলকাতা যেন তারই উত্তর দিয়েছে। খবরটা কেটে তাঁকে পাঠাতে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় সহস্রতম বার মনে হলো, এই হলো কলকাতা, আমাদের ভালোবাসা ও অহংকারের কলকাতা যে তার দুঃখের চরমতম মুহূর্তেও আত্মসম্মান হারায় না, নিজেকে হারায় না।

সিটি অফ জয়, দোমিনিক লাপিয়েরে, অ্যারো বুকস লিমিটেড, লণ্ডন। দাম—সাড়ে তিন পাউণ্ড।

বাংলায় থিসরাস চর্চা

সুভাষ ভট্টাচার্য

লেক্সিকন (Laxicon) শব্দটির সূতিকাগার যেমন গ্রীস, তেমনই থিসরাস শব্দটির মূল খুঁজলেও আমরা একটি গ্রীক শব্দ পাই, থিসরস। তুলনীয় একটি লাতিন শব্দও আছে, ত্রেজাউরুস। এই গ্রীক ও লাতিন দুটি শব্দেরই অর্থ ভাণ্ডার বা ঐশ্বর্য। বলা বাহুল্য, ইংরেজি treasure শব্দটিও এ থেকেই এসেছে এবং বলা বাহুল্য, দীর্ঘকাল ধরে থিসরাস শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে নিছক ভাণ্ডার অর্থে নয়, শব্দভাণ্ডার অর্থে, শব্দকোষ অর্থে। প্রাচীন গ্রীসে শব্দবিদ্যার চর্চা ছিল বহু পণ্ডিতের সানন্দ উপজীব্য। সেযুগে থিসরাস বলতে যে কোনও অভিধান বা শব্দকোষকেই বোঝাত। কিন্তু থিসরাসের অভিনব প্রয়োগ দেখা গেল ১৮৫২ সালে যখন পিটার মার্ক রজে তাঁর Thesaurus of English Words and Phrases প্রকাশ করলেন। এই অভিধানে সংকলিত হল শুধুই প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। পরবর্তীকালে রজের থিসরাসের উপযোগিতা কতদূর তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হলেও এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই বই ইংরেজিভাষী জগতের ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রজের থিসরাস সম্পর্কে একালের কোনও কোনও ইংরেজ সমালোচক যে নিরতিশয় বিমুখ তার একটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬২ সালের ১০ই আগস্ট টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্টে জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন—

"How far Roget's thesaurus is useful is open to dispute. To the naturally creative writer one may doubt if is any use at all. To have a substantial word-store available at need is minimum equipment for such a person, and without it another profession should have been chosen." পাঠক এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি ক্ষমা করবেন। আসলে রজের থিসরাস সম্পর্কে এই উক্তি শুধু ভ্রমাত্মক নয়, বিপজ্জনকও বটে। আর এই উক্তি শুধু থিসরাস সম্পর্কেই আপত্তিকর নয়, যে কোনও শব্দ-অভিধান সম্পর্কেই এতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ওই সমালোচকের বক্তব্য মেনে নিলে তো একথাও স্বীকার করতে হয় যে অভিধানের উপযোগিতা খুবই সংকীর্ণ এবং তা শুধু তাঁদেরই কাজে যাঁদের word-store তেমন substantial নয়। একে পরিহাস বলব, না দম্ভোক্তি বলব? কোনও সাহিত্যিক বা naturally creative writer অভিধান দেখার প্রয়োজনই বোধ করবেন না? অভিধান সম্পর্কে এই বক্তব্য কোনও অর্ধ-শিক্ষিত লোকের হতে পারত, কিন্তু টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্টের সমালোচকের পক্ষে এই উক্তি মানানসই নয়।

এই ধরনের সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন রজের থিসরাসের সর্বশেষ সম্পাদক রবার্ট ডাচ। ১৮৫২ সালে ওই থিসরাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার সময় রজে ছিলেন চুয়াত্তর বছরের প্রবীণ যুবক। রজের মৃত্যু হয় ১৮৬৯ সালে একানব্বই বছর বয়সে। এবং ততদিনে তাঁর থিসরাসের আঠাশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত "it has never gone out of print." এই তথ্যের ভিত্তিতে রবার্ট ডাচ লিখেছেন—"Famous as it is, Roget's Thesaurus lives not by the praises of past generations, but by its enduring usefulness."

থিসরাস বলতে আজ আমরা বিশেষ এক রকম অভিধান বুঝি। এই অভিধানে শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ বা উচ্চারণের নির্দেশ থাকে না। আগেই বলা হয়েছে এতে কেবল প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ বিবৃত হয়। এই ধরনের অভিধানে যেহেতু শব্দার্থ থাকে না, যেহেতু এক একটি শব্দই কেবল বিবৃত হয়, তার সম্পর্কে পদনাম ছাড়া, অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনও সংবাদ যেহেতু এই অভিধানে থাকে না, তাই কারও কারও মনে হতে পারে এই ধরনের অভিধানের উপযোগিতার পরিধি খুবই সংকীর্ণ; যেমন মনে হয়েছিল টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্টের সমালোচকের। কিন্তু

সত্যিই কি তাই? থিসরাসের প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ যোগান দেওয়া। দ্বিতীয়ত, যেখানে "অর্থ, ভাব বা বিষয় জানা আছে, অথচ ঠিক শব্দটি জানা নেই কিংবা মনে আসছে না তখনই এই জাতীয় অভিধানের সাহায্য" দরকার হয়। ধরা যাক একটি শব্দ জানা আছে কিন্তু তার অর্থ জানা নেই। এক্ষেত্রেও থিসরাস সাহায্য করে। জানা শব্দটির একই পর্যায়ভুক্ত অন্য শব্দ দেখে এবং জানা শব্দটি কোন্ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত তা দেখে অর্থ-না-জানা শব্দটির অর্থ জেনে নেওয়া সম্ভব। তৃতীয়ত, কোনও ভাষা প্রতিশব্দে অর্থাৎ সমার্থক শব্দে কী পরিমাণ সমৃদ্ধ তার অভ্রান্ত দর্পণ থিসরাস। থিসরাসের এইসব উপযোগিতা কী করে ভুলে যাওয়া সম্ভব?

২.

কয়েক বছর ধরে বাংলাভাষায় নানান ধরনের অভিধান সংকলনের কাজ হচ্ছে। কয়েকটি অভিধান প্রকাশিতও হয়েছে। কোনওটি সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, কোনওটি একক প্রচেষ্টায়। এই আয়োজনের মধ্যে থিসরাসও অবহেলিত হয় নি। ইতিমধ্যেই তিনটি বাংলা থিসরাস যে প্রকাশিত হয়ে গেছে এই সংবাদে বাংলায় অভিধান-চর্চার ব্যস্ত আয়োজনই প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি-প্রকাশিত তিনটি থিসরাসের মধ্যে প্রথমটি ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'যথাশব্দ', দ্বিতীয়টি ১৯৮৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'মণিমঞ্জুষা' এবং তৃতীয়টি কলকাতা থেকেই সদ্য প্রকাশিত অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'সমার্থশব্দকোষ'। ত্রিশ বছর আগে প্রাণতোষ ঘটকও সংকলন করেছিলেন একখানি কৃশকায় থিসরাস। 'রত্নাবলী' নামের সেই বইটিই প্রথম বাংলা থিসরাস হিসাবে মান্য হলেও আকৃতিতে সেটি এতই ক্ষুদ্র এবং এত কম শব্দ এতে স্থান পেয়েছিল যে এটিকে ঠিক ব্যবহারযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য শব্দভাণ্ডার বলে গণ্য করা যায় না। এই বইটিকে আমরা আলোচনার বাইরে রাখাই শ্রেয় মনে করি।

রজের থিসরাসের পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম যে বাংলা থিসরাসটি সংকলিত হয়েছে সেটি 'যথাশব্দ'। এটিকে লেখক ভাব-অভিধান বলে বর্ণনা করেছেন। শব্দার্থ দেওয়া না থাকলেও শব্দের অর্থ নির্ণয়ে সহায়তার জন্য এবং ভাবপ্রকাশে যথার্থ শব্দ নির্বাচনে সহায়তার জন্য এই অভিধান ভাবানুক্রমে বিন্যস্ত। তবে যাঁরা কোনও বিশেষ একটি শব্দ খুঁজবেন তাঁরা সেই শব্দটি কিংবা ভাব ও অর্থের দিক থেকে ওই শব্দের কাছাকাছি কোনও শব্দ নির্ঘণ্টে দেখবেন।

বলা বাহুল্য রজের থিসরাসের মত যথাশব্দেও মূল গ্রন্থে শব্দ বিষয়ানুগ এবং নির্ঘণ্ট বর্ণানুক্রমিক। এই বইয়ে বাংলাভাষায় সমুদয় শব্দকে এক হাজার পর্যায়ে এবং ওই এক হাজার পর্যায়কে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর বইয়ের পরিকল্পনায় রজের পরিকল্পনা প্রায় হুবহু অনুসরণ করেছেন। রজের থিসরাস শুরু হয়েছে Existence দিয়ে, শেষ হয়েছে Temple-এ। যথাশব্দ শুরু হয়েছে অস্তিত্ব দিয়ে, শেষ হয়েছে ধর্মালয়-এ। রজের থিসরাসের দ্বিতীয় প্রধান শব্দ Non-existence, তৃতীয়টি Substantiality, অষ্টমটি Circumstance. 'যথাশব্দে' দ্বিতীয় প্রধান শব্দটি অনস্তিত্ব, তৃতীয়টি সারবত্তা এবং অষ্টমটি পরিস্থিতি। এইভাবে দেখা যাবে যে 'যথাশব্দ' প্রায় রজের থিসরাসের বঙ্গানুবাদ। যথাশব্দের শেষে আছে দুশো ত্রিশ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ নির্ঘণ্ট। থিসরাসে শব্দ খুঁজে পেতে হলে নির্ঘণ্ট খুবই সহায়ক। তাই এতে সযত্নে নির্ঘণ্টটিকে সাজাতে হয়।

'যথাশব্দ' প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা থিসরাস। এর জন্য সংকলনের প্রচুর সাধুবাদ প্রাপ্য। বাঙালি পাঠক, লেখক এবং অন্য ভাষা ব্যবহারকারীর এতে মোটামুটি কাজ চলে যায়। 'যথাশব্দে' প্রতিটি শব্দকে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে প্রত্যেকটি বিশেষ্য শব্দের বিশেষণে ও ক্রিয়াপদকে এবং প্রত্যেকটি বিশেষণ শব্দের বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত ও ব্যবহারযোগ্য সমার্থক শব্দ বিবৃত করা হয়েছে। সমার্থক শব্দের বিবৃতি প্রায়ই সম্পূর্ণ। আনুষঙ্গিক শব্দের (associated words) বিবৃতি সম্পূর্ণ না হলেও একেবারে উপেক্ষিতও নয়। 'যথাশব্দে'র একটি বৈশিষ্ট্য প্রচুর মুসলমানি শব্দের অন্তর্ভুক্তি। এতে এলেম, মুনাফা, কসুর, মুসাবিদা, ফিকির, দফতর প্রভৃতি শব্দ তো আছেই। এগুলিকে অবশ্যই এখন আর নিছক মুসলমানি শব্দ বলা যায় না। বহুদিন হল এগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসে গেছে। যে কোনও বাংলা অভিধানে এগুলির অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু এমন বহু শব্দও আছে, যেগুলি আরবি-ফার্সি থেকে এসেছে, যেগুলি এখনও পর্যন্ত মূলত মুসলমান সাহিত্যেই বেশি ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের অজস্র শব্দ 'যথাশব্দে' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এন্তেকাল, এন্তেজাম, জরুরাত, নাজাত, মুনাসিব, মুয়াজ্জীন, মুরীদ, ইবাদত, সালাত, দরুদ প্রভৃতি মুসলমানি শব্দ এই বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। 'যথাশব্দ' পরিকল্পনায় রজের থিসরাসের হুবহু অনুসৃতি হলেও এটি পরিণামে একটি বাংলা থিসরাস হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে বাংলায় ব্যবহৃত অর্থাৎ

সাহিত্যে, সংবাদপত্রে ব্যবহৃত শব্দ তো আছেই। তাছাড়া আছে শিষ্ট কথ্য (Standard Colloquial) বাংলায় ব্যবহৃত বহু ভাব-প্রকাশক শব্দ বা শব্দবন্ধ। আর আছে বাংলায় নির্বিবাদে আমরা ব্যবহার করি এমন প্রচুর ইংরেজি শব্দ। শীতক, শীতনযন্ত্র, হিমায়নযন্ত্র রেফ্রিজারেটার—এইভাবে শীতক শব্দের সমার্থক শব্দ দেওয়া হয়েছে। পিঠা বা পিঠে-র পাশাপাশি রাখা হয়েছে কেক ও পেস্ট্রি। প্রচুর পারিভাষিক শব্দও 'যথাশব্দে'র যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে।

কিন্তু 'যথাশব্দ' বইটির একটি অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য এর মুদ্রণপ্রমাদ। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রণপ্রমাদের পৌনঃপুনিকতা এই বইয়ের বিরাট ক্ষতি করেছে। নির্ঘণ্টে প্রায়ই বর্ণানুক্রম ব্যাহত হয়েছে। আশ্চর্যের কথা, বইয়ের শেষে শুদ্ধিপত্রে যে দুশো ছাব্বিশটি ভুলের তালিকা দেওয়া আছে, তার বাইরেও ভুল আছে অন্তত আরও দেড়শো। সম্পাদনার ত্রুটি ও মুদ্রণে পরিপাট্যের অভাব ও অযত্ন খুবই পীড়াদায়ক।

জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'মণিমঞ্জুষা' অবশ্য খাঁটি বাংলা থিসরাস নয়। এটি একটি দ্বিভাষিক থিসরাস। এতে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শব্দও আছে। পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে 'মণিমঞ্জুষা' রজে বা 'যথাশব্দ' বা 'সমার্থশব্দ কোষের' থেকে অনেক আলাদা। এই থিসরাসটির বিন্যাস বিষয়ভিত্তিক নয়। এটি আদ্যন্ত বর্ণানুক্রমিক। স্বভাবতই এতে নির্ঘণ্টের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। পুরো বইটি বর্ণানুক্রমিক হওয়ায় পাঠককে দুবার দুজায়গায় শব্দ দেখতে হয় না। লেখক দাবি করেছেন যে 'মণিমঞ্জুষা' বাংলা ভাষায় একটি অভিনব গ্রন্থ। "বাংলা থিসরাস তো বটেই, সেই সঙ্গে এটি আরও কিছু।" লেখকের আরও দাবি, এটি একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। "এরকম পূর্ণাঙ্গ দ্বিভাষিক থিসরাস পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতে রচিত হয়েছে বলে জানা নেই।" বলা হয়েছে যে এতে শব্দের যে ভোজসভা বসেছে তাতে হাত বাড়ালে উপকৃত হবেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক, শিক্ষাব্রতী, ছাত্র-ছাত্রী, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সাংবাদিক প্রভৃতি।

'মণিমঞ্জুষা'র প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সরল পরিকল্পনায়। প্রয়োজনীয় শব্দটি খুঁজে নেওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। বর্ণানুক্রমিকভাবে শব্দগুলি পরপর সাজানো আছে। বিবৃতিও খুবই সরল। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

আচ্ছাদন বি. আবরণ, ঢাকনি, ছাউনি, পরিধেয় বস্ত্রাদি।

Cover, covering, veil, clothes, clothings. এর চেয়ে সরল বিবৃতি আর কী হতে পারে? আচ্ছাদন শব্দটি যদি মনে না আসে, তবে

আবরণ (পৃ. ১১৭) দেখা যেতে পারে। কিংবা ঢাকনি (পৃ. ২৫০) কিংবা ছাউনি (পৃ. ২২৯)। কিন্তু সরলতাই কি সব? এই বইয়ের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ নয়। দেখা যাক 'যথাশব্দে' আচ্ছাদন-এর সমশব্দ বা সমার্থক শব্দ হিসাবে কী পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে আছে—আবরণ, প্রচ্ছদ, প্রচ্ছাদন, ঢাকনা, আবরণী, আচ্ছাদনী, সংবৃতি। এবং আনুষঙ্গিক শব্দ (associated words) হিসাবে আছে আরও বহু শব্দ—সরা, শরপোষ, চাঁদোয়া, শামিয়ানা, চন্দ্রাতপ, বোরখা, গুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, ঘোমটা, পর্দা, মোড়ক, দোলাই ইত্যাদি। এছাড়া আছে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে আচ্ছাদন-এর সমার্থক শব্দ। কতকগুলি ক্ষেত্রে 'মণিমঞ্জুষা'-র বিবৃতি নিঃসন্দেহে উপযোগী ও প্রায় সম্পূর্ণ এবং সেই কারণে প্রশংসনীয়। নক্ষত্র (পৃ. ২৭৯) শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে আছে তারকা ও তারা। তাছাড়া আনুষঙ্গিক শব্দ হিসাবে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রপাত, তারাছুট, নক্ষত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। এছাড়া আছে অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা প্রভৃতি ২৭ নক্ষত্রের নাম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিবৃতি এমন পূর্ণাঙ্গ নয়। কুপিত (পৃ. ১৭৯) শব্দের বিবৃতিতে বিশেষ্যে এবং বিশেষণে নানান সমশব্দ বা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে, কিন্তু ক্রিয়াপদেও যে এর সমার্থক শব্দের অভাব নেই, অর্থাৎ ক্রিয়াপদেও যে এই শব্দটিকে এবং তার সমার্থক শব্দগুলিকে ব্যবহার করা যায়, তা এই বিবৃতি থেকে জানা যায় না। চিৎকার (বিশেষ্য) এবং চিৎকার করা (ক্রি) যেখানে পৃথকভাবে বিবৃত হয়েছে, সেখানে কুপিত-র পাশাপাশি কুপিত হওয়া বিবৃত হওয়া উচিত ছিল। আনুষঙ্গিক শব্দের বিবৃতিতেও অনেক ফাঁক থেকে গেছে। মুণ্ড আছে, মুণ্ডপাত নেই। মুশকিল আছে মুশকিল আসান নেই। খরা আছে, খরাপীড়িত বা খরাক্লিষ্ট নেই। কিরীট আছে কিরীটী নেই। জঙ্গল আছে, জংলী নেই। আনুষঙ্গিক শব্দের বিবৃতিতে কোথাও কোথাও কিছু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। দুগ্ধ শব্দের বিবৃতিতে মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া (পৃ. ২৬৬) সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ছোটখাট ভ্রান্তিও কম নয়। টাক এর সমার্থক শব্দ হিসাবে আছে কেশহীনতা ও ইন্দ্রলুপ্তি (পৃ. ২৪৩)। শব্দটি কিন্তু ইন্দ্রলুপ্তি নয়, ওটি হবে ইন্দ্রলুপ্ত। ধাঁধা শব্দে চন্দ্রবিন্দু কেবল প্রথম ধ-য়। 'মণিমঞ্জুষা'য় ধাঁধাঁ (পৃ ২৭৭) বানান রয়েছে। 'মণিমঞ্জুষা'য় তাছাড়া বহু পরিচিত ও প্রয়োজনীয় শব্দ অনুপস্থিত। অকালকুষ্মাণ্ড, অক্ষাংশ, অগুন্তি, সবান্ধব, করদ, সবিশেষ, যমালয়, পক্ষপাত, কম্পমান, নৈরাজ্য, কাণ্ডারী, চতুষ্পদ, দিশা, দিশাহারা, দুর্যোগ, নাল, নালা, নালী প্রভৃতি বহু

পরিচিত শব্দ এই বইয়ে নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমার্থক শব্দের বিবৃতি অসম্পূর্ণ। কেচ্ছা (পৃ. ১৮৩) শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে আছে কাহিনী, আখ্যান, কথা, গল্প। কিন্তু এতে কেচ্ছা শব্দের সঙ্গে যে লজ্জাজনক, মর্যাদাহানিকর বা কলঙ্কজনক অনুষঙ্গ আছে তা বোঝা গেল কি?

এইসব ত্রুটি দূরীকৃত হলে 'মণিমঞ্জুষা' একটি অনাড়ম্বর ও কেজো থিসরাস হয়ে উঠতে পারে। নিছক সরলতা কোনও অভিধানের একমাত্র গুণ হতে পারে না। বিশেষত এটি যখন ছাত্র-ভোগ্য থিসরাস নয়, যখন এর উদ্দেশ্য শিক্ষক, অধ্যাপক, সম্পাদক, সাংবাদিক, কবি ও ঔপন্যাসিক সকলের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য একটি দ্বিভাষিক থিসরাস হয়ে ওঠা, তখন সরলতার পায়ে পূর্ণতাকে উৎসর্গ করা উচিত হয় নি। সব অর্থে পূর্ণাঙ্গ হয় নি বলে এটি ঠিক থিসরাস হয়ে ওঠে নি, এটি একটি বাংলা-ইংরেজি প্রতিশব্দ অভিধান হিসাবে গ্রহণীয়।

৩.

অশোক মুখোপাধ্যায়ের সংসদ সমার্থ শব্দকোষ এবছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এটি আদ্যন্ত সুসংকলিত ও সুমুদ্রিত। সংকলকের নিরলস ও নিশ্ছিদ্র পরিশ্রম এবং প্রকাশকের তরফে মুদ্রণ পারিপাট্যের ছাপ এত স্পষ্ট যে তা আঙুল তুলে নির্দেশ করার প্রয়োজন করে না। বলতে দ্বিধা নেই এ পর্যন্ত যে তিনখানি বাংলা থিসরাসের কথা আমরা বললাম, সংসদ সমার্থশব্দকোষ তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার্য এবং নির্ভরযোগ্য। এই থিসরাসটি প্রকৃত অর্থেই পূর্ণাঙ্গ।

অশোকবাবুর সামনে মডেল হিসাবে ছিল চারটি থিসরাস। বলা বাহুল্য, তার মধ্যে একটি পূর্বোক্ত রজের ইংরেজি থিসরাস এবং দুটি বাংলা থিসরাস, 'যথাশব্দ' ও 'মণিমঞ্জুষা'। চতুর্থ আর একটি থিসরাসও অশোকবাবু নিশ্চয় বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। সেটি অমরসিংহ রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত শব্দাভিধান, 'অমরকোষ'। ভারতের সংস্কৃতজীবী পণ্ডিতরা অভিধান-চর্চায় কিছু বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। 'অমরকোষ' সেই ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। 'অমরকোষে'র একটি বিকল্প নামও আছে—'অমরার্থ-চন্দ্রিকা'। শব্দাভিধান হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি থিসরাস অর্থাৎ সমার্থক শব্দকোষ। পরিকল্পনায় এর সঙ্গে রজের থিসরাসের অনেক পার্থক্য। অমরসিংহ তাঁর এই অভিধানের প্রস্তাবনায় বলেছেন—

সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি সংক্ষিপ্তৈঃ প্রতিসংস্কৃতৈঃ।
সম্পূর্ণমুচ্যতে বর্গৈর্নামলিঙ্গানুশাসনম্ ॥

অতএব তিনি সংক্ষিপ্ত ও প্রতিসংস্কৃত শব্দসমন্বিত ও বর্গদ্বারা বিভক্ত অভিধান সংকলন করেছেন। সমগ্র অভিধানটিকে তিনি স্বর্গ, কাল, ধী, শব্দ, নাট্য, বারি, পাতাল, ভূমি, পুর, মনুষ্য, ক্ষত্রিয়, বনৌষধি প্রভৃতি বাইশটি বর্গে বিন্যস্ত করেছেন এবং শ্লোকের মাধ্যমে সমার্থক শব্দ ও সমশব্দ বিবৃত করেছেন। একটি উদাহরণ দিয়ে 'অমরকোষে'র পরিকল্পনাটি বোঝানো যাক। 'অমরকোষে'র ভূমি বর্গের ২৪-সংখ্যক পর্যায়ে জলময় স্থানের সমার্থক শব্দ বা সমনাম হিসাবে আছে—

জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ পুংসি কচ্ছস্তথাবিধঃ

এ থেকে আমরা জলময় স্থানের সমার্থক শব্দ হিসাবে পেয়ে গেলাম জলপ্রায়, অনূপ, কচ্ছ এই তিনটি শব্দ। তবে সমগ্র অভিধানটি না ঘেঁটে কোনও শব্দ খুঁজে পাওয়া নিশ্চয় কষ্টকর ছিল। এখন আমরা অমরকোষের শেষে যে নির্ঘণ্ট দেখি তা পরবর্তীকালের সম্পাদকদের সংযোজন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অশোক মুখোপাধ্যায়ের সমার্থ শব্দকোষের আলোচনা করলেই এর প্রকৃত গুরুত্ব পরিস্ফুট হবে। এই বইয়ে তাবত বাংলা শব্দকে ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ত্রিশটি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত প্রধান শব্দের সংখ্যা সাতশো সাতান্ন। পরিচ্ছেদ বিভাগ অপ্রতিরোধ্যভাবে অমরকোষের বর্গ-ভাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওই সাতশো সাতান্নটি প্রধান শব্দের অন্তর্গত, সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক শব্দের সংখ্যা কম-বেশি সাঁইত্রিশ হাজার। পরিচ্ছেদগুলির নাম এই রকম—মহাবিশ্ব-প্রকৃতি-পৃথিবী-গাছপালা, প্রাণ-প্রাণী-শরীর, ইন্দ্রিয়-অনুভূতি, কাল-ঋতু-বয়স, গতি-প্রবাহ-পরিবহন ইত্যাদি। বোঝা কঠিন নয়, এই বিন্যাস বিষয়ানুগ, বর্ণানুক্রমিক নয়। তবে কোনও শব্দ খুঁজে পেতে পাঠককে গলদঘর্ম হতে হয় না। 'সমার্থশব্দ কোষের' প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়ে রয়েছে এক দীর্ঘ 'বর্ণানুক্রমিক সূচি' যা কিনা মূল গ্রন্থের চাবিকাঠি।

এতাবৎ আলোচিত অন্যান্য প্রতিশব্দ অভিধানের তুলনায় 'সমার্থশব্দ-কোষের' উৎকর্ষ নানাক্ষেত্রেই পরিলক্ষণীয়। বাংলায় ব্যবহৃত হয় এমন বিস্তর ইংরেজি শব্দ এই বইয়ে ধরা আছে। ট্যাবলেট, টর্পেডো, টম্যাটো, জংশন, স্পিকার (অধ্যক্ষ অর্থে), গ্র্যাজুয়েট, পেণ্ডুলাম, প্যাস্টেল, প্যারাবোলা, পেস্ট, পোস্টার, এনামেল, এক্সপ্রেস, গ্রামার প্রভৃতি অজস্র ইংরেজি শব্দ

অশোকবাবু বিবৃত করে উচিত কাজই করেছেন। প্রচুর পারিভাষিক শব্দও এই অভিধানে এসেছে—গতিবিদ্যা, ক্ষারীয়, ত্বরণ, কলন, উত্তল, অবতল, অশ্বশক্তি, ঘনীভবন, অশ্মীভবন প্রভৃতি শত শত পারিভাষিক শব্দ এই অভিধানের মর্যাদা বাড়িয়েছে। এই অভিধানে শ্রীকৃষ্ণের আটানব্বইটি নাম (৫৭৮.৯) আছে। আছে শ্রীরাধার একুশটি নাম (৫৭৮.১৯) এবং শিবের একশ বত্রিশটি নাম (৫৭৮.৭)। এতে আছে কমসে কম (৪৪৭), যাচ্ছেতাই (৫৫৭), হাড়হদ্দ (৪০৫), হাড্ডিসার (৭৭), ফিচলেমি (২৩৫)-এর মত কথ্যরীতির শব্দ ও শব্দবন্ধ। শুধু একক শব্দ নয়, এই 'সমার্থ শব্দকোষে' আছে অজস্র শব্দগুচ্ছ, প্রচলিত বাংলা ইডিয়ম ও ফ্রেজ। কমসে কম ও যাচ্ছেতাই-এর উল্লেখ আগেই করেছি। এছাড়া আছে মাথার দিব্যি (২৮৪), মাথায় খুন চাপা (২৩০), বুঝে শুনে চলা (৭৩২), ডাকসাইটে সুন্দরী (৫২৬), কচি কলাপাতা রং (৫৩৪.৪) প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক শব্দবন্ধ। মুসলমানি শব্দের বিবৃতিতে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তুলনায় অশোকবাবু সংগতভাবেই কিছুটা সতর্ক। তিনি কেবল সেইসব মুসলমানি শব্দই রেখেছেন যেগুলির অল্পবিস্তর প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে এবং কথ্য ভাষায় এসে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, সমার্থ শব্দকোষে এন্তেকাল আছে, কিন্তু এন্তেজাম নেই। জরুরত আছে, নাজাত নেই। মুনাসিব আছে, মুয়াজ্জীন নেই। ইবাদত আছে সালাত নেই। মুরীদ আছে, হকিকত আছে। আছে দরুদ, কাজিয়া প্রভৃতির মতো প্রচলিত ও কেজো শব্দ।

এই ধরনের একটি বিপুল প্রচেষ্টার জন্য এবং এমন নির্ভরযোগ্য একটি অভিধান এককভাবে সংকলন করে ওঠার জন্য অশোক মুখোপাধ্যায় প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির অভিনন্দন পাবেন। তবে এই বইয়ে কিছু তুচ্ছ ত্রুটিও থেকে গেছে। সে সম্পর্কেও সংকলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

কোনও কোনও শব্দের এমন একটি-দুটি সমার্থক শব্দ বাদ গেছে যা খুবই প্রচলিত। পরিবর্তনশীল (২৬৬) ও রূপান্তরশীল আছে, কিন্তু পরিবর্তমান নেই। পর্যায়ক্রমে আছে (২৬৫), কিন্তু পর্যায় নেই। বইয়ের ভিতরে ও নির্ঘণ্টে কোথাও পর্যায় শব্দটি খুঁজে পাওয়া গেল না। কিছু কিছু শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সমান করে সমাসবদ্ধ শব্দটি বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি সবক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় নি। গ্রীষ্মাধিক্য (১৬০.১) আছে, গ্রীষ্মাতিশয্য (১৬০.১) আছে, কিন্তু শৈত্যাধিক্য নেই। গ্রীষ্মপ্রধান (৫৬৯) থাকলে শীতপ্রধান থাকবে না কেন? স্ফুটন (৫১৩, ৩৩, ১৪২) আছে,

কিন্তু স্ফুটনাঙ্ক নেই। অকুণ্ঠ, নির্দ্বিধ, কুণ্ঠাহীন প্রভৃতির পাশে অনায়াসে থাকতে পারত নিষ্কুণ্ঠ শব্দটি। অন্নসত্র (৭০, ৭০৫) আছে, কিন্তু দানসত্র নেই। ১৮৭-তে আশ্রয়হীনতা পর্যায়শব্দে গৃহহীন, আশ্রয়হীন প্রভৃতির পাশে অনিকেত শব্দটি থাকা উচিত ছিল। নির্বিচার, নিস্তরণ, প্রাগুক্ত, নীলাভ, নতুবা, ঝামর, ঝামরচুলো প্রভৃতি কিছু পরিচিত শব্দ 'সমার্থ শব্দকোষ'-এ অনুপস্থিত।

একথা অনস্বীকার্য যে ভাব-অভিধান হিসাবে 'সমার্থ শব্দকোষ' মোটামুটি সফল। তবে থিসরাসের এ হেন ব্যবহারে নির্ঘণ্টটিকে নিশ্চিতভাবে পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। অশোকবাবু তাঁর বইয়ের ভূমিকায় নিজেই লিখেছেন—"বর্ণানুক্রমিক সূচিতে মূলগ্রন্থের সমস্ত শব্দ দেওয়ার দরকার হয় নি।" কিন্তু সত্যিই কি দরকার ছিল না? মনে রাখতে হবে পাঠক যে-শব্দ খুঁজবেন তা তাঁর মনে আছেই এমন নাও হতে পারে। অন্য কাছাকাছি শব্দের অর্থগত নৈকট্য তাঁকে উদ্দিষ্ট শব্দটি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তাই নির্ঘণ্টে সমস্ত শব্দই থাকা বাঞ্ছনীয়। অকল্যাণ শব্দটি যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে, কিন্তু নির্ঘণ্টে নেই। রোমন্থন শব্দটি মূলগ্রন্থে ৭০-সংখ্যক পর্যায়ে আছে, কিন্তু নির্ঘণ্টে তার জায়গা হয় নি। তাছাড়া বিশেষ্য রোমন্থন ও রোমন্থ এই দুটি রূপই প্রচলিত। সেটাও দেখানো জরুরি। নির্ঘণ্টে দুরবগাহ শব্দটির পাশে প্রশান্ত ও গভীর এই দুটি শব্দ থাকায় ধরে নেওয়া হবে যে ওই শব্দটির কেবল ওই দুটি অর্থই আছে। ২৩৬-সংখ্যক বিবৃতিতে গাম্ভীর্য-এর মধ্যে বিশেষণে দুরবগাহ রয়েছে। আবার ৪৬০-সংখ্যক বিবৃতিতে গভীরতার মধ্যে বিশেষণে দুরবগাহ রয়েছে। শব্দটির একটি অত্যন্ত প্রচলিত ফিগারেটিভ অর্থ বা রূপকার্থ যে দুর্বোধ্য তা কিন্তু এ থেকে বোঝা যাচ্ছে না। ৫৩৯ সংখ্যায় 'আধার' এই প্রধান শব্দের অন্তর্গত ৫৩৯.৪ এ নানা ধরনের থালা ও ডিশ জাতীয় পাত্রের সমাবেশ। কিন্তু তৃতীয় অনুচ্ছেদে একটি মাত্র শব্দ রয়েছে—'খঞ্চিপোশ'। এ থেকে পাঠক খঞ্চিপোশ শব্দের ঠিক অর্থ বা সংজ্ঞা ধরতে পারবেন বলে মনে হয় না। ওটি যে একরকম পাত্র তা বোঝা গেলেও তার সঠিক ব্যঞ্জনা বা বর্ণনা ধরা যায় না। অবশ্য একথা সর্বৈব স্বীকার্য যে, এই সীমাবদ্ধতা থেকে কোনও থিসরাসই মুক্ত নয়।

বানান সম্পর্কে অশোকবাবু মোটামুটিভাবে সংস্কারমুক্ত। তবে বহুক্ষেত্রে তিনি পাশাপাশি একই শব্দের পুরনো ও নতুন বানান বিবৃত করেছেন। যেখানে একটি বানানই রেখেছেন সেখানে সাধারণত বর্তমানে বেশি প্রচলিত

বানানই স্থান পেয়েছে। রূপা ও রূপো দুইই আছে। আবার বাড়ি আছে, বাড়ী নেই। একাজ একশ ভাগ সমর্থনীয়। এখানে একটি-দুটি ব্যতিক্রমের কথা বলি। আপোশ (২৪০, ২৭৯, ৬৮৭) বানান কি এখন তেমন প্রচলিত? বরং আপস বানানই এখন বেশি প্রচলিত। অশোকবাবু কিন্তু আপোশ রেখেছেন। হয়ত ব্যক্তিগত রুচি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসুও আপোশ বানানেরই সমর্থক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, সুহৃৎ আছে, সুহৃদ (সুহৃদ্) নেই। সুহৃৎ সম্পর্কে প্রশ্ন নেই। কিন্তু আধুনিক বাংলায় সুহৃদ তো পরিত্যক্ত নয়। শুধু সমাসবদ্ধ পদেই নয়, পৃথক শব্দ হিসাবেও সুহৃদ খুবই প্রচলিত। এই রূপটি থাকা উচিত ছিল।

বানান সম্পর্কেই শুধু নয়, অশোকবাবু অন্য অনেক ব্যাপারেই সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শব্দ নির্বাচনে তিনি তেমন দুঃসাহস দেখান নি। দুঃসাহসী তিনি নিশ্চয় হতেও চান নি। কিছু শব্দ ছেঁটে বাদ দেওয়া চলত। তাতে এই চমৎকার অভিধানের মানহানি হত না। জল এর সমার্থক শব্দ হিসাবে উড়ু (১১) এবং সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মত্ব ও ক্ষুদ্রতার প্রতিশব্দ হিসাবে সৌক্ষ্ম্যশব্দের (৪৫৮) বিবৃতি খুব একটা অপরিহার্য নয়। বর্ণানুক্রমের যে নিয়ম অশোকবাবু অনুসরণ করেছেন সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আছে। তিনি ব-ফলাকে য-ফলা, র-ফলার আগে এনেছেন। কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় ব-ফলা য, র, ল, ব এইভাবে আছে এখনও এবং এতে বিশেষ অসুবিধা নেই। এবং যেহেতু এই ব-ফলা অন্তঃস্থ-ব তাই ব-ফলাকে য, র, ল এই তিনের পরে আনাই যুক্তিযুক্ত। অশোকবাবুর বইয়ের নির্ঘণ্টে ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক, ধ্বস্ত প্রভৃতি আগে গেছে। ধ্যান, ধ্রুপদ প্রভৃতি পরে এসেছে। পরিশেষে দুটি কথা। প্রথমত, পরিবহন শব্দে মূর্ধণ্য-ণ কেন? সূচিপত্রে এবং নির্ঘণ্টে দুই জায়গাতেই পরিবহণ বানান রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সংসদ বাঙ্গালা অভিধানেও পরিবহণ বানান আছে (পৃ ৪৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৪)। দ্বিতীয়ত, সমার্থশব্দ কোষের টাইটল পৃষ্ঠায় নামপত্রে বইয়ের নাম—সংসদ্ সমার্থ শব্দকোষ। কিন্তু প্রচ্ছদে রয়েছে হস্-বিহীন সংসদ। এটি নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। তবে এই ত্রুটি না থাকলেই ভাল ছিল।

সমার্থ শব্দকোষ। অশোক মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ। ৪০ টাকা।

নিহিত স্বপ্নের খোঁজে

আফসার আমেদ

এই গ্রহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে চল্লিশ বছরের ওপর। স্বাধীনতা ও যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রধানত অর্থনৈতিক, আর সবকিছুই তার প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতজনিত ফলাফল। যদিও তা অমোঘ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। আধুনিক জীবন জটিলতা, বিচ্ছিন্নতা, ভঙ্গুরতা শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলনজনিত ফল নয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভেতর থেকেই তার অস্থির যাত্রাপথ উদ্ভিন্ন হয়েছে। এই অস্থিরতার ভেতরেই আমাদের দেশের সাহিত্য আজ সমস্বভাব খুঁজে নিয়েছে।

এই সামাজিক স্তর বদলের নিহিতে অমলেন্দু চক্রবর্তীর অনুসন্ধান। বাইরে ও ভেতরে আমাদের অজস্র ভাঙন। ব্যক্তি-ভাঙনের নির্মোহ নির্লিপ্ততা এখন আর অসহনীয় নয়। মধ্যবিত্ত তার স্বপ্ন ও আদর্শের শ্রী হারিয়েছে। মধ্যবিত্তকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—ভগ্নাংশ কিছু পাওয়া যায়, আর তার থেকে উদ্ভূত নয়া-মধ্যবিত্তকে। মধ্যবিত্ত বিকার ও বিভ্রান্তি হতাশা ও অবনমনের চোরাস্রোতে ভেসে গেছে, ভেঙে গেছে। অখণ্ড বামরাজনীতির বাতাবরণে মধ্যবিত্ত আদর্শ ঐশ্বর্যভূমি পেয়েছিল, তারই মূলত মানস ভাঙন।

গোপন সদর্থ আর প্রতিবেশের অসঙ্গতির বিন্যাস ও প্রতিবিন্যাসের সম্পর্কদ্বন্দ্বই অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পের উপজীব্য। আলো আঁধার ঠোকাঠুকির শিল্পরূপ। প্রতিবেশের চাপে উদ্ভূত ব্যক্তির অবনমনের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটান

তিনি। গোপন সন্দর্থ সেখানে ফুঁসে ওঠে সাবেক মূল্যবোধের সত্যতার জোরে। এটা নস্টালজিয়ার স্বোপার্জিত আত্মশরণ না আধুনিক সাহিত্যের স্বভাব-নির্মিতি? ব্যক্তির সম্পর্কের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তির চরিতার্থতা প্রতিবেশের কাছে সমর্পণে হাঁটে—মোহাঙ্কে তো বটেই, সামঞ্জস্যের স্থিতিও তার দরকার। ফিরে যাবার আকুলতা থাকলেও ফিরে যেতে পারে না। অসম্ভব ব্যক্তিক ফাঁক বা বিচ্ছিন্নতা দেখিয়ে দেন অমলেন্দু চক্রবর্তী।

আসলে মধ্যবিত্তের সঙ্কটই তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। গল্পের সারমর্ম তারই ত্রাণের উপায়। শুদ্ধরূপ নয়, দায়বদ্ধতার শিল্পরূপ। সমাজ দায়ববদ্ধতার শিল্পরূপ তাঁর গল্পের সংক্ষিপ্তসার, লভ্য মুখ্যার্থ। বাঙালি মনীষা বা মধ্যবিত্তের সাবেক ঐতিহ্যের সত্যিটা, আর অধুনা জীবনপ্রবাহে তাকে চরিত্র করেই আধুনিক জটিল ব্যক্তি পাই, যার শুরু ও মাঝের শেষ অসঙ্গতির ভিতরেই তলিয়ে যাওয়া হৃত মূল্যবোধ খুঁজে চলেন তিনি।

'গৃহে গ্রহান্তরে' সঙ্কলন তিনটি গল্প নিয়ে। প্রথম গল্পটি 'গ্রহান্তরে একদিন' ও শেষ গল্প 'চাবিটা সাবধান' মধ্যবিত্ত পরিণতির ঘেরাটোপে অনুপরিবারে যন্ত্রণারুদ্ধ ব্যক্তির অস্তিত্ব, মাঝের গল্প 'জাতকগাথা' মধ্যবিত্তের ভগ্নাবশেষ। ব্যক্তির সংঘর্ষটা কা'তে বেশি চরমতা পেয়েছে ভেবে দেখবার বিষয়। যেখানে এখনো বাহ্য পারিবারিক মধ্যবিত্তের সূচক আছে, সেখানে ভগ্নাংশের অনেকাংশ জুড়েই তার সংস্কারের অংশ। তারই পাশাপাশি অবস্থান করছে এখনকার সময়ের দ্বন্দ্ব। মাঝের গল্প নতুন সম্ভাবনার দিকে, প্রথম ও শেষের গল্প সম্ভাবনার পথে এসে নতুন সম্ভাবনার দিকে যাত্রা। সংঘাতের দিক থেকে উভয়তই ঐক্যে আছে, কিন্তু মূল্যবোধের রকমফেরে দুটি দুই দিকে প্রবাহিত। সমাজ অবস্থিতিই এমন তালগোল পাকানো, ভিন্ন ভিন্ন ঘূর্ণাবর্ত, মূলীভূত ব্যক্তিসঙ্কট, যা লেখকের বিষয়সাম্য পেয়ে যায়।

লেখকের দেখার ভিন্নতা, গল্পের ছক প্রকরণ আজ আর কোনো বাঁধাধরা পথে চলে না। চরিত্র বিকিরণ বা ঘটনার প্রাধান্য, দুটির প্রসিদ্ধি ছক ভেঙে গেছে আজ। কোনোটারই প্রসিদ্ধ ধারায় অমলেন্দু চক্রবর্তী চলেন না। নিজস্ব আখ্যানবিন্যাস যাতে চরিত্রের বিকিরণও আছে, ঘটনার প্রাধান্যও আছে। আখ্যানবিন্যাসের নিজস্বতায় যুগ্ম-স্বভাবকে ধরে রাখেন—চরিত্রের বিকিরণ ও ঘটনার প্রতিঘাত। দুই-এর সমআসক্তি লেখকের প্রকরণে প্রাধান্য পেয়েছে। একে অন্যে উভয়ের ব্যঞ্জনার মধ্যে ঢুকে যায়। অমলেন্দু চক্রবর্তী গল্পে ঘটনার মধ্যেই চরিত্রের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব দেখান। চরিত্রের

অন্তর্লোক ঘটনায় এসে ধরা দেয়; চরিত্রের পারিপার্শ্বিক ও সম্পর্কজনিত দ্বন্দ্ব ঘটনায় এসে চরিত্রের মনোলোকে ধরা দেয়। সেই অর্থে আধুনিকতার লক্ষণ থেকে তিনি যেমন দূরে নন, তেমনি আক্রান্ত-ও তিনি নন। আবার চরিত্রটি ব্যক্তি-বিন্যাসে নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু লেখকের একধরনের আবেগ চরিত্রটির মধ্যে সঞ্চারিত হয় যা কিনা চরিত্রের স্বাধর্ম্য থেকে বিচ্যুতি মনে হতে পারে। এসবই লেখকের লেখার নিজস্বতার স্বভাব-বিশিষ্ট। তাতে যে অধুনা নৈর্ব্যক্তিকতার চাহিদা পুরণ হচ্ছে না তা নয়, চরিত্রের মৌলিকত্ব তাকে সংরক্ষিত করছে।

এখানে চরিত্ররস ঘটনায় শিকড় চালায়। অমলেন্দু চক্রবর্তী ব্যক্তির দ্বন্দ্বের নিভৃতি এনে দেন ঘটনার মধ্য থেকে। সুপ্রযুক্ত হয় এক ধরনের সংলাপ-দৃশ্যে জীবন্ত নাট্যগুণ। নাটকে সাজানো ঘটনার সমাবেশ থাকে, অভিমুখ ধরা যায়, যেহেতু অভিনয় শিল্প সেটুকু মুছে দেয় কুশলী অভিনয়ে। এখানে ঘটনার সে ধরনের পরম্পরা থাকে না, চরিত্রদ্বন্দ্বের বাইরের প্রকাশেই ঘটনা আশ্রিত হয় যেহেতু।

'গৃহে গ্রহান্তরে' লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। আগের গল্পগ্রন্থ 'অবিরত চেনামুখ'। এক যুগ পরে দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ, তিনটি গল্প নিয়ে। তার আগে অগ্রন্থিত গল্পের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। এই পর্বেই সাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তীর বিকাশ। তিনটি উপন্যাস তিনি গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। আরো দুটি উপন্যাসের খসড়া প্রস্তুত। 'যাবজ্জীবন' উপন্যাসের জন্য এ বছর নরসিংহ দাস পুরস্কারের সম্মান তিনি পেলেন। এই পর্বের 'গৃহে গ্রহান্তরে'-র তিনটি গল্প লেখকের মানসভূমির পরিচয়ের ক্ষেত্রে কম নয়। 'গৃহে গ্রহান্তরে' নামটিতেই আজকের সময়ের ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার মূল সুর ধরেছেন। সমাজ ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে, ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করছে, রাজনীতির জীবনে কোনো স্থিতি নেই। এই সময়ের ভেতর থেকে লেখককে তাঁর গল্পের উপকরণ খুঁজে নিতে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতই আমরা ক্রমশ নিজস্ব গ্রহ সৃষ্টি করে চলেছি, যাতে একার বাস—অসংযুক্তির দৈন্য আছে, সংযুক্তিহীনতার বেদনা আছে, আকুলতা আছে অন্বয়ের। প্রথম গল্প 'গ্রহান্তরে একদিন' গ্রন্থনামের স্বগোত্র ও পরিপূরক।

২

'গ্রহান্তরে একদিন' গল্পের 'একদিন'-টা বহুদিনের সত্যির মুছে যাওয়া ধূসর

হয়ে যাওয়ার এক সংযোগ। তার কোনো প্রবাহপথ নেই, অথচ বিকারের বিষণ্ণ পাথর এসে বসে গেছে গুহামুখে। নলিনাক্ষ চক্রবর্তী, যাঁর বৃত্তি অধ্যাপনা, স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা, দুই মেয়ে টপ্পা ঠুংরী—বড় মেয়ে এম এ পাঠরত। —এঁদের ভিন্নগ্রহে যাবার একদিনের প্রতিক্রিয়া কী, গল্পটিতে ধরা আছে। নলিনাক্ষর বেদনাসুন্দর এক শৈশব ছিল। মেঘনা-তীরস্থ মানিকগঞ্জের শ্যামগাঁ ছিল, যেখানে বাবা কাকা জ্যেঠাদের বসবাসে আত্মিক কোনো ব্যবধান ছিল না। একে অন্যের পরিবারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি হয়ে যেত। জ্যাঠার মৃত্যু ও মায়ের মৃত্যুতে দুটি পরিবার এক হয়ে গিয়েছিল নলিনাক্ষদের বাল্যে-কৈশোরে। জ্যাঠাইমা ও তাঁর বড় মেয়ে মহামায়া তাঁদের সংসার সামলেছেন এসে। এতে তাঁদেরও দারিদ্র্যমোচন হয়েছিল। আজ নিজেদের পরিবারই নানাদিকে ছড়িয়ে গেছে। নলিনাক্ষ নিজস্বতার বৃত্তে ও পারিপার্শ্বের নির্বিকারত্বে অন্যগ্রহে আবর্তিত এখন। জ্যেঠতুতো ভাই গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী সাবেক ঠিকানা ঘুরে খুঁজে পেয়েছে নলিনাক্ষকে। আবর্তনের অঙ্কের হিশেবে যেন দুটি গ্রহের সরলরেখায় অবস্থান। গণেশ মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছে তাঁদের।

> "যেন তিনশো কি পাঁচশো ফিট কুয়োর তলায় কোনো এক কালে, দামি হীরের আংটি হারিয়ে ফেলেছিলেন পিতামহ প্রপিতামহদের কেউ একজন। অনেক তোলপাড় করেও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় নি সেদিন। গপ্পোটা গপ্পো বলেই শুনে এসেছে সারাজীবন। এতকাল পরে আজ হঠাৎ-খরায় উজ্জ্বলভাবে সেই হীরের টুকরোটা। অনেক নীচে, অনেক গভীরে। (১৩ ১৪ পৃঃ)

জ্যেঠতুতো ভাই-এর মেয়ের বিয়েতে সপরিবারে যান নলিনাক্ষ। স্মৃতিতাড়িত বাতাস এসে বার বার তাঁকে চমকিত করেছে। তাঁদের সংসার সামাল দিতে এসে তাঁদেরই ভাতরান্না করতে গিয়ে যাঁর পুড়ে গিয়েছিল নিম্নাংশ, সেই জ্যেঠতুতো মহামায়া দিদির পাশে এখন ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি আর হাজার টাকার শাল গায়ে দিয়ে নলিনাক্ষ বড় বেমানান! জ্ঞাতি-পরিজনদের কাছে তাঁর পরিবারটাই অন্য-বিচ্ছিন্ন। নলিনাক্ষর ভেতরে কোথাও সেই গোপন সংযোগটা ছিল বলেই এবং সেই নস্টালজিয়ার প্রেমে সে মিলিত হয়, আত্মিক অনুভব বোধ করেন। ভয়চকিত হয় তাঁদের মূল্যবোধে, আবার তাঁদের সঙ্গে নিজেদের বৈপরীত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়। উভয়ের কাছে

এই অসম মিলন সহজ স্বচ্ছন্দ নয়। উভয়ের তিক্ততা বাড়ে। সহাবস্থান অসহনীয়।

> "এই গ্রহকেই একমাত্র জীবনবৃত্ত জেনে বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছরে লম্বা বেঁটে ফর্সা কালো মোটা নারী বা পুরুষ, শিশু বা বৃদ্ধ, হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষের মিছিলে জনতার ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলির নিত্যভ্রমণে যাদের সে চিনত না কোনোদিন, মুখোমুখি দাঁড়ালেও চিনে নেবার সাধ্য ছিল না কাউকে, সেইসব ব্যক্তিরা সকলেই আদৌ অজ্ঞাত কিনা, আজ বিভ্রম জাগে।" (২৪ পৃঃ)

স্মৃতিতাড়িত জ্ঞাতিসূত্রতা আছে, কিন্তু এখনের অন্য মানুষ নলিনাক্ষ। আত্মিক যোগটা এখন তিনি খুইয়ে বসেছেন। নিরবচ্ছিন্ন এই সংঘাত চলেছিল পাশাপাশি। এখন তা গ্রহ-গ্রহান্তর। আর যাই হোক আত্মিক সূত্রটা তাঁর এক বড় প্রাপ্তি, দূরত্বটা তাতে আরো বাড়ল।

এই আত্মিক দূরত্বটা আবার এক সারণীর কাছে এবং একই পরিবারের দুই ব্যক্তির কাছে গ্রহ-দূরত্ব এনেছে। কমলেশ ও এণাক্ষীর পরিবার উত্তরভারত ঘুরে বিপুল লটবহরসহ ফিরছেন মাঝরাতে সরকারি হাউজিং কমপ্লেকেস-এর ফ্ল্যাটে। রাত্রি তখন একটা। দরজায় আট লিভারের দুটি তালা। ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় দেখা গেল—চাবি খোয়া গেছে। প্রতিবেশীরা সুখনিদ্রায় মগ্ন, আর তাঁরা নিজের ফ্ল্যাটের সামনে নিরাশ্রয় প্রতিবেশীহীন পড়ে থাকেন পথশ্রমের ক্লান্তি নিয়ে। তার চেয়ে কমলেশ ও এণাক্ষী অনেক বেশি জীবনের গতানুগতিকতায় ক্লান্ত। উভয়েই মোটা মাইনের চাকরি করেন। একজন ব্যাঙ্কে অন্যজন সরকারি। কমলেশ তাঁর জীবনের পরম স্বপ্নগুলি হারিয়ে ফেলেছেন, আর এণাক্ষী সংসার সাজাচ্ছেন অরান্তর সুখের উপকরণে। আসলে এণাক্ষী যা চান কমলেশ তা চান না। কমলেশ কী চান তা কমলেশ স্পষ্টত বোঝাতে পারেন না। আসলে কমলেশের চাওয়ার ব্যঞ্জনা ব্যাখ্যার অতীত। উভয়েই দুই গ্রহ। গল্পের নাম 'চাবিটা সাবধান'।

পাত্র-পাত্রী মধ্যবিত্তের ঐশ্বর্যভূমি থেকে সরে গিয়েছেন। মূল পরিবার থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিজেদের যে গ্রহ বানিয়েছেন তার আবর্তন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তারাও অপসৃত অতীতকে চকিতে আঁকড়ে ধরেছেন। প্রতিষ্ঠার স্রোতে অবগাহন করে তাঁরা জীবনকীট মাত্র হয়ে গেছেন। মধ্যবিত্তের বসবাসে যে স্বপ্নের জগত তৈরি করেছিলেন কমলেশ, তার হদিশ খুঁজে পান

না আর। সব কিছু ভেঙে আছে। দুজনে অনুভব করেন, নিজেদের মধ্যেও দূরত্ব আছে ঢের।

কথোপকথনে—

> 'আমি কেন তোমার মতো নই, এ-একটা কথা হলো? কেউ কারুর মতো হয় না ওভাবে।' 'আমি কাউকে আমার মতো হতে বলি নি। সে হয় না জানি। কিন্তু একসঙ্গে বসবাসে দুটো কথাবার্তা তো চলতে পারে দুজনের…' (১৫৯ পৃঃ)

কমলেশ এখন বৃহৎ বিশ্বজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে যে দায়বদ্ধতার প্রেরণা পেত আজ আর তার অবশেষটুকুও নেই। তাঁর কাছে এখন সমস্যা হয় দুদিনের ছুটি কিভাবে তিনি কাটাবেন। এণাক্ষী তাঁকে ঠাট্টা করতে ভোলেন না।

> গোটা শরীরে ঢেউ খেলিয়ে হেসে উঠেছিল এণাক্ষী। যেন মস্ত কৌতুক—'সে কি গো! সব কথা ফুরিয়ে গেছে? তাহলে কী হবে? এত এত বছর ধরে এত কথা তোমাদের! এত দেশোদ্ধারের গপ্‌পো…' (১৬৩ পৃঃ)

এ স্রেফ কমলেশের জীবনীশক্তির সঙ্কট নয়, গোটা অস্তিত্বেরই বিপর্যয়। রক্তের ভিতরেই তার অসুখ জমে উঠেছে।

> কমলেশ কাজ না-থাকার ঝঞ্ঝাটে। দেশের দুর্দশা বা বিশ্বসঙ্কট নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। এক কাপ চায়ের সঙ্গে দুটো বিস্কুটের মতো খবরের কাগজটা কয়েক পলকেই শেষ হয়ে যায়। (১৬৪ পৃঃ)

বিশ্বভাবনায় সমন্বিত হওয়া তো দূরস্থ, এতবড় হাউজিং কমপ্লেক্স্‌-এ আশ্রয়হীন অনাত্মীয় তাঁরা। ব্যাক্তি থেকে ব্যষ্টি পর্যন্ত অন্তলীন হয়ে যায় এই সঙ্কট। অথচ এই তালার শক্তিমত্তা ও প্রহরায় তাদের সুখের উপকরণগুলি সুরক্ষিত আছে। অথচ কমলেশ এও জানেন এই উপকরণে প্রকৃত স্বচ্ছলতা নেই সমৃদ্ধি নেই। বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে তিনি আহত, বিপরীতে সংযুক্তির আকুলতা বাড়তে বাধ্য।

কমলেশ জানেন এই আঘাত ও কান্না তাঁর একার নয়। কান্নাতুর শিশুকে কাঁধে ফেলে হাউজিং কমপ্লেক্স্‌-এর চারধারে ঘুরতে থাকেন। এ লেখকের নির্দেশিত সর্বজনীন অস্তিত্বের রূপক।

> কান্নাকে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে দেবার প্রশ্রয়ে প্রাসাদ উপবনে আবাসনের রাস্তায় হাঁটে কমলেশ। যেন সে এক কান্নার ফেরিওয়ালা।

ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চায় আহত পাখির মতোই কোনো নিরর্থক
অবোধ চিৎকার। দরজা জানালাগুলি খুলে যাক টপাটপ, অলিন্দে
অলিন্দে ভেঙে পড়ুক মানুষের মুখ। (১৭৪ পৃঃ)

অনাত্মীয়তার বোধের বাইরে কমলেশকে রাখেন না বলেই এ-গল্পের বিচ্ছিন্নতা আধার হয়, পরিণতি নয়। সদর্থক মানুষটা বেঁচে থাকেন। গল্পটিতে চরিত্রের বিরোধ-বিশ্লেষণ-উজ্জীবন একাকার হয়ে আছে। আলো-আঁধারির ভেতর থেকে একটা মানুষের অসহায়তা-বেদনা-স্ববিরোধ ছুঁয়েছেন লেখক।

এক দৈনিকপত্রের সংবাদ-কাটিং দিয়ে গল্পটি শুরু। দুর্ঘটনায় সন্তানের জন্ম দিয়ে জননীর মৃত্যু। এখানে এক জননীও অনিবার্য দুর্ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে। নিজের হনন অবশ্যম্ভাবী, সন্তানকে জীবিত রেখে যাবার লড়ায়ে সে নিশ্চল। গল্পটির নাম 'জাতকগাথা'। মার্কেট রিসার্চ সংস্থার কর্মী সোমা সেন জীবনযুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছে। স্বামী বেকার যুবক, কর্ম খুইয়ে বসা একজন ফুটবলার। স্বামী অভীক চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তি এখন ধুলোয় লুণ্ঠিত। পাত্র-পাত্রীর অবস্থান মধ্যবিত্তের ভগ্নাবশেষের মধ্যে। অভীকের কাছে সোমা শুধু মাত্র সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের নারীমাত্র। তাদের প্রেম ও বিয়ে মুহূর্তের খেলাচ্ছলে ঘটে গেছে। সম-মানসিকতা যাচাইয়ের কোনো অপেক্ষা ছিল না। অভীক মদ্যপ লম্পট, সোমার ওপর তার অত্যাচারের হাত ছুটে যায়। সোমা এক সন্তানের জননী। তার কোনো ফেরার রাস্তা নেই। সোমার মার্কেট রিসার্চ-এর কাজে ফ্যাশনদুরস্ত সাজপোশাকের উগ্রতা ও বাড়ি বাড়ি ঘোরাফেরার কাজ মধ্যবিত্ত পরিবারের নজরে বিসদৃশ লাগত। সোমা ও শ্বশুরবাড়ির পরিবার দুটি দুই গ্রহ হয়ে উঠেছিল। তাকে কেন্দ্র করেই স্বামী ও ভাসুরের যুদ্ধ বেধেছিল, মাঝে সোমা বলি হতে বসেছিল। অভীক মদ খেয়ে এসে সোমাকে এক রকম মেরেই ফেলতে চেয়েছিল।

ছেলেকে নিয়ে দাদার পরিবারে সোমা ফিরে এসেছিল পরদিন। অভীকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্রস্তুত সে। মা ও বৌদির কাছে নিজেকে মেলাতে পেরেছিল না সোমা। অভীকের কাছ থেকে চলে আসবার পর থেকে সোমা বুঝতে পারে সে সন্তানসম্ভবা। শ্বশুরবাড়িতে এমনিতে তার উগ্র পোশাক-আশাক ও চলাফেরার জন্য সন্দেহ ও বদনাম রটেছিল। অভীকের কাছ থেকে চলে এসে সন্তানসম্ভবা বুঝতে পারায় ঘনঘোর সমস্যায় পড়ে যায়

সোমা। সোমা অভীককে চায় না, অথচ তার সম্পর্কেই যে সন্তানকে গর্ভে লালন করে চলেছে, তার সামাজিক স্বীকৃতি তার বড় প্রয়োজন। অভীকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চেয়েছে, কিন্তু তার গর্ভে যে সন্তান তার পিতাকে অস্বীকার করতে চায় নি। সোমার একার বাঁচার ক্ষেত্রে প্রয়োজনও ছিল। সে নিজেই জানে তার সন্তানের জনক অভীক, এ হেন সঙ্কটাবস্থায়, অসহায়-ভাবে ক্লিনিকে গিয়ে ভ্রূণহত্যার চেষ্টাও পর্যন্ত করেছিল। কোর্টের কাছে ডিভোর্সের আবেদন করার মুখে সোমার এ-এক সমস্যা। অভীক নারীর শরীর ছাড়া বাঁচতে পারবে না জানে সোমা। অফিসের নীচে অভীকের হানা দেওয়ায় বিপর্যস্ত সে। অফিসের কাজে বাড়ি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বিপর্যস্ত। জনমানসের চাহিদা জেনে নিতে হচ্ছে বিভিন্ন সব প্রশ্নে। 'কার উপন্যাস বেশি ভালো লাগে আপনার? রবীন্দ্রনাথ না গোবিন্দ পাল?' বিধ্বস্ত হয়ে কলকাতার পথে হাঁটতে হাঁটতে জেনে নিতে হচ্ছে—'কলকাতা! এ-শহরটা কেমন লাগছে আপনার?'

ঘরে ফিরে এসেও শান্তি নেই। সোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সজ্জন দাদার কাছে অভীকের উৎপাত। অভীককে ত্যাগ করার স্বার্থেই অভীকের অ্যাপয়েনমেন্টে সাড়া দিয়েছিল সোমা। বার-রেস্তোরাঁয় নিজের পয়সায় অভীককে মদ খাইয়ে বলেছিল তার সন্তান সম্ভাবনার কথা।

> 'মাতাল হয়েছি বলে তোমার চালাকি বুঝি না কিছু? অ্যাঁ, এক নম্বরের হারামি বদ মেয়েছেলে'......'তাই ত বলি শালা, এত মহব্বত কেন? আমাকে মাল খাইয়ে ফিট করতে এসেছিস রেণ্ডি মাগী'...
>
> (১৪৫ পৃঃ)

সোমার আসন্ন সন্তানের জন্মদাতা ছাড়া আর অভীকের কাছে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

> ঘৃণার ঘৃণায় সত্য হয়ে ওঠা অবাস্তব নাড়ুগোপাল যদি কোনোদিন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে এই বুকে, বাজারে তার দর না থাক, একটু আদরের জমি তাকে খুঁজে দিতেই হবে পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো প্রান্তে। জানবে ওরা—একজন পাপী ছিল, কোনো পাপ ছিল না ওদের রক্তে। (১৪৬ পৃ.)

এখানেও আমরা লেখকের ইতিবাচক ভাবনার প্রতিফলন পেয়ে যাই। সন্তানের সুস্থ সুন্দর জীবনের এক স্বপ্ন বুনে দেন লেখক। সাম্প্রতিকের ঘাতে-অভিঘাতে জীবনের ভঙ্গুর বিচ্ছিন্নতা আর তার পাশে সদর্থের স্বপ্নজগত,

—আধারের হতাশার চেয়ে অনেক বেশি আশাব্যঞ্জনার নিমিতি ধরা পড়েছে অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'গৃহে গ্রহান্তরে' গল্পগ্রন্থের তিনটি গল্পে।

মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গের অন্তর্লোক বিধ্বস্ত, অসহায় ও অনন্যোপায়। ব্যক্তির হারিয়ে ফেলা অভিষ্ট ও স্বপ্নচারী মনটাকে খোঁজেন লেখক। আসলে ইপ্সিত পরিমণ্ডল মরে যেতে পারে কিন্তু ব্যক্তির অন্তর্লোকে তার সংরক্ষণ থাকে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর লেখায় বিগত মূল্যবোধের ক্ষীণ সদর্থের স্বর্ণরেখা পথে জন্ম নেয় ভবিষ্যের এক স্বপ্ন।

গৃহে গ্রহান্তরে। অমলেন্দু চক্রবর্তী। দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭৩। ২০ টাকা

শিল্পীর স্মৃতিকথায় চল্লিশের শিল্পকলা

মৃণাল ঘোষ

বাংলা ভাষায় শিল্পচিন্তা বা শিল্প-আলোচনায় শিল্পীদের লেখার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। সেসব লেখা কখনো প্রত্যক্ষভাবে শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কখনো বা স্মৃতিচারণার মধ্যদিয়ে শিল্পের নানা দুর্গম ও প্রায়ান্ধকার ক্ষেত্রে শিল্পীদের নিজস্ব উপলব্ধির আলোকপাতের প্রয়াস। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বাংলা ভাষায় শিল্প-আলোচনার মান ও পরিমাণগত যে অভাব, তার অনেকটা পূরণ হয়েছে শিল্পীদের লেখার মধ্য দিয়েই। অবনীন্দ্রনাথে যে ঐতিহ্যের শুরু, নন্দলাল, বিনোদবিহারী, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত হয়ে সে ধারা এসেছে একেবারে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত। প্রদোষ দাশগুপ্তের সম্প্রতি প্রকাশিত 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা (ক্যালকাটা গ্রুপ)' বইটি সেই ধারাতেই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এ বইটির গুরুত্ব আরও এজন্য যে, যে চল্লিশের দশক আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে পালাবদল ও নতুন দিক নির্ণয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে স্মরণীয়, আমাদের দৃশ্যশিল্পের ইতিহাসে যে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছিল যে সময়ে, এই বইটিতে সেই ইতিবৃত্তেরই উজ্জ্বল স্মৃতিচারণা পেয়েছি আমরা, অবশ্যই কেবল চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে। চল্লিশ দশকের শিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধ আলোচনা হয়ত কম প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু বাংলাভাষায় এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-রচনার প্রয়াস সম্ভবত এই প্রথম।

এ ছাড়াও এ আলোচনা পেলাম এমন একজনের কাছ থেকে চল্লিশ দশকে শিল্পের মোড় ঘোরানোর আন্দোলনে যার ব্যক্তিগত অবদান আজ অবিস্মরণীয়। আমাদের আধুনিক ভাস্কর্যের ইতিহাসে প্রদোষ দাশগুপ্ত যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি এবং হয়ত তার চেয়ে বেশি তিনি স্মরণীয় ক্যালকাটা গ্রুপের প্রধানতম এক সংগঠক হিসেবে, যে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' আমরা জানি, আমাদের শিল্পের আধুনিকতার উত্তরণের দিক থেকে প্রথম এক বলিষ্ঠ আন্দোলন।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, 'খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বে' তিনি 'ব্রতী' হয়েছেন এই গ্রন্থ রচনায়। কেননা ক্যালকাটা গ্রুপে'র অন্যতম একজন সদস্য ছিলেন তিনিও, তাই লেখার মধ্যে তাঁর নিজের মতামতটা প্রাধান্য পাবে, এই আশঙ্কা ছিল তাঁর। তবু এ-কাজে ব্রতী হতে হল তাঁকে, কেন না, সম্প্রতি-কালে গ্রুপ নিয়ে নানা বিতর্ক ও বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হচ্ছিল নানা লেখায়, কিন্তু এর সামগ্রিক ইতিহাস রচনার কোনো প্রয়াস এখন পর্যন্ত হয় নি, তাই সেই সমস্ত বিতর্কের উত্তর এবং তথ্যনিষ্ঠ একটি ইতিবৃত্ত রেখে যাওয়ার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা। আর সেটা তিনি করেছেন অনেকটা আত্মকথার ভঙ্গিতে, নিজস্ব স্মৃতিচারণার পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন একটা বিশেষ সময়ের শিল্পের পরিস্থিতি। প্রসঙ্গক্রমে এসে গেছে সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশও, ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্য শিল্পীদের শিল্পকর্মের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ ছাড়াও এসেছে আধুনিক ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পের নানা প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণ। তিনটি অংশে ভাগ করে নেওয়া যায় বইটিকে, প্রথমটি চল্লিশ দশকে ক্যালকাটা গ্রুপ গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিল্পের নান্দনিক পরিস্থিতি, দ্বিতীয় অংশে গ্রুপের অন্তর্গত চোদ্দজন শিল্পীর শিল্পকর্মের পরিচয় এবং তৃতীয় অংশে লেখক চেষ্টা করেছেন গ্রুপ সম্পর্কে যেসব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সমস্ত সমালোচনার উত্তর দিতে।

এই আলোচনার সমৃদ্ধতম অংশ প্রধানত দুটি। চল্লিশ দশক থেকে আমাদের শিল্প যে নতুন পথ খুঁজছিল, পূর্ববর্তী তিনটি দশকের জাতীয়তা অনুপ্রাণিত পুনরুজ্জীবনবাদী ধ্রুপদী ভারতীয়তার বিরুদ্ধে লোকায়ত ভারতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়ে দেশ ও কাল সম্পৃক্ত বাস্তবতার প্রত্যক্ষ সংযোগ ও অনুপ্রেরণায় গড়ে তুলতে চাইছিল শিল্পের যে স্বতন্ত্র আদল, যাকে সঠিকভাবেই 'দ্বিতীয় রেণেসাঁস' বলতে চেয়েছেন লেখক, দ্বিতীয়

পর্যায়ের সেই আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে এ আলোচনাগুলির নানা জায়গায়। বিভিন্ন প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গটি ফিরে ফিরে এসেছে। একেবারে প্রথম প্রবন্ধ 'আমার নিজের কথা'তে নিজের শৈশব ও ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আলোচনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, দেবীপ্রসাদ প্রমুখ শিল্পীদের নির্দিষ্ট কিছু কিছু ছবির বৈশিষ্ট্য, সে আলোচনার মধ্য দিয়েই সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হতে পেরেছে সমকালীন ধারা থেকে গগনেন্দ্রনাথ ও দেবীপ্রসাদের ছবির ভিন্নতা ও দিক পরিবর্তনের স্তিমিত সংকেত। তৃতীয় প্রবন্ধ 'নতুন জগৎ, নতুন আর্ট'-এ দেখিয়েছেন ১৯৪০ সাল থেকেই কেমন করে শুরু হল বেঙ্গল স্কুলের ক্রমঅবনতি, কেমন করে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায় ও অমৃত শেরগিল—এই চারজন শিল্পীর কাজের মধ্য দিয়ে সূচিত হতে লাগল নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত, আর সেই ইঙ্গিতই কেমন করে সম্পূর্ণতার দিকে এগোতে লাগল ক্যালকাটা গ্রুপের তরুণ শিল্পীদের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। এই আলোচনাই আধুনিকতার দর্শনের আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে পূর্ণ রূপ পেল 'নতুন যুগের পথ প্রদর্শক' নামের পরবর্তী প্রবন্ধে। কিন্তু এই 'দ্বিতীয় রেনেসাঁস' বা নবতম আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণে সফলতম আলোচনা সম্ভবত 'মডার্ণ আর্ট ও তার পরিবেশ' নামের শেষ প্রবন্ধটি, যেটি নন্দলাল বসুর 'মডার্ণ আর্ট' বিষয়ক সমালোচনার উত্তর। এই প্রবন্ধেই প্রসঙ্গক্রমে লেখক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দুটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। ঐতিহ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'অতীত থেকে বর্তমান, এই যোগসূত্রকেই বলি ঐতিহ্য। আর আমিই তো সেই যোগসূত্রের প্রতীক।' আধুনিকতা সম্পর্কে বলেছেন, 'মডার্ণ আর্ট'-কে বুঝতে হলে তাই বুঝতে হবে আজকের এই নতুন পরিবেশকে যা বর্তমান রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও কৃষ্টি-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।' আধুনিকতার বিশেষত চল্লিশ দশকের আধুনিকতার বাস্তবতায় অন্বিত এই যে সঠিক স্বরূপ, সেই বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নির্ধারণের মধ্যেই, আমরা পরে বুঝতে চেষ্টা করবো এই আলোচনার সফলতা ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলিকে।

আধুনিকতার স্বরূপ নির্ধারণের এই ক্ষেত্রটি ছাড়া এই বই-এর দ্বিতীয় সমৃদ্ধ অংশ ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের কাজের স্বরূপ সম্বন্ধে অত্যন্ত নিবিষ্ট ও ঘনিষ্ট আলোচনার অংশটি। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে প্রায় সকলের শিল্পের আলোচনাতেই লেখক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প পরিস্থিতি-সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তাঁর লেখা থেকে

আমরা খুব সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারি তাঁর নিজের ভাস্কর্যের মধ্যে ভারতীয়তার স্বরূপ কি। আকারের গভীর কেন্দ্রে ধরা থাকবে অন্তর্মুখী বিপুল শক্তির উৎস। তা বিচ্ছুরিত হয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়বে না, যেমন দেখা যায় অনেক পাশ্চাত্য ভাস্কর্যে, বরং তা হবে কেন্দ্রাভিমুখী। ১৯৭৮-এ আমেরিকার প্রখ্যাত ভাস্কর রিচার্ড হাণ্টের সঙ্গে কথোপকথনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে বুঝিয়েছেন বিষয়টি—"আপনি যদি এখন কোনো ভাস্কর্য গড়েন যার প্রাণবায়ু চারদিকে বিক্ষিপ্ত তাহলে তার নিজস্ব কোনো গম্ভীর মেজাজ থাকে না, খুবই হালকা লাগবে দেখতে। আমরা ভারতীয়রা, এই প্রাণবায়ুকে ধরে রাখার দার্শনিক যুক্তি পেয়েছি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ থেকে। ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ তো ডিম্বাকৃতি। আর ডিমই তো প্রাণবায়ুর ধারক।" (পৃষ্ঠা-৬৮) আবার হেমন্ত মিশ্রের ছবিতে সুরিয়ালিয়ালিজমের প্রয়োগ প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন হতাশা বা নৈরাজ্যের রূপায়ণের দিকে না গিয়ে সুরিয়ালিজম কেমন করে এক সদর্থক সৌন্দর্যচেতনারও বাহক হতে পারে। এইরকম টুকরো টুকরো অজস্র প্রজ্ঞাময় মত ও মন্তব্য বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়, শিল্পীর রসচেতনা ও শিল্পবেত্তার পাণ্ডিত্যের সুষম সমন্বয়েই যা সম্ভব।

এছাডাও আকর্ষণীয় পূর্ণেন্দু পত্রীকৃত বইটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা ছবি দিয়ে সাজানো। এই ছবি থেকেও পরিচয় ঘটে যায় আলোচিত সময়ের শিল্পের স্বরূপ ও বিবর্তন সম্বন্ধে। মুদ্রণ প্রমাদ দু একটি আছে, তবে তা নগন্য।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এরকম অজস্র বৈভব, পাঠককে আলোকিত করে ঠিকই। তা সত্ত্বেও বইটি পড়তে পড়তে কিছু কিছু প্রশ্ন দানা বাঁধতে থাকে পাঠকের মনে, লেখকের অনেক সিদ্ধান্ত ও মন্তব্যকেই নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। লেখক তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, মত-অমত খুব তীক্ষ্ণ ও তীব্রভাবে ব্যক্ত করেন। সেটা একটা গুণ হতে পারত, সমৃদ্ধ করতে পারত রচনাকে, যদি তা দৃঢ় কোনো আদর্শগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হত এবং যদি সেই ভিত্তি থেকে লেখক যুক্তিনিষ্ঠভাবে তার বিশ্লেষণ করতেন। কিন্তু সর্বত্র তা ঘটে না। লেখক সমস্ত রকম বিরুদ্ধ মতবাদকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন অত্যন্ত কঠোরভাবে, এতটাই কঠোরভাবে যে অনেক সময়ই তা স্বাভাবিক সৌজন্য বোধের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, হয়ে উঠেছে অসহিষ্ণু, সর্বত্র শালীনতাকেও অমলিন রাখে নি।

আমরা প্রথমে লেখকের আদর্শগত ও নান্দনিক ভিত্তিভূমিকে বোঝার

চেষ্টা করবো। এ বইয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'আর্ট ও রাজনীতি'। এখানে লেখক শিল্পের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ভাবধারাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন এই ভাবধারার মূল কথা হল 'প্রোপাগাণ্ডা'। 'শিল্পীর শিল্প প্রেরণাকে গণ্ডীবদ্ধ' করা হয় এখানে। শিল্পীকে নিয়োজিত করা হয় 'কোনো রাজনীতির আদর্শের খাতিরে, হাতিয়ার হিসেবে।' 'আর্টকে দেখা' হয় 'একটা উপায় হিসেবে··· সাধারণের মনে শিল্প প্রেরণার রাজনৈতিক প্রেরণা জোগানোর প্রয়োজনে।' তারপর প্রশ্ন করেছেন—'ভারতে কম্যুনিস্ট ভাবধারা কি এই একই ছাঁচে তৈরি নয়? (পৃঃ ২৭) এজন্যই, বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার তিনি আমাদের জানিয়েছেন, তাঁদের গ্রুপকে কখনোই তিনি রাজনীতির আওতায় আনতে চান নি, মার্ক্সীয় রাজনীতিতে তো কখনোই নয়। ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে তিনি আনতে চেয়েছেন দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। প্রমাণ হিসেবে যে সব তথ্য হাজির করেছেন, তার মধ্যে প্রধান ১৯৪২-এর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' ঘোষণার সুপরিচিত নীতিকে।

বিষয়টি এতই বহু-ব্যবহৃত যে এ নিয়ে আলোচনার তেমন কোনো প্রয়োজন আজ হয়ত আর নেই। তবু বিষয়টি একটু ভেবে দেখা দরকার; কেননা এর সঙ্গে তৎকালীন আন্তর্জাতিকতাবোধের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, যে আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ না বুঝলে চল্লিশের সংস্কৃতি ও শিল্পের পরিস্থিতি এমন কি ক্যালকাটা গ্রুপের আন্দোলনের স্বরূপও সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। 'জনযুদ্ধ' বিষয়টি সম্ভবত তত সরল নয় যত সরলভাবে কুৎসা প্রচারের কাজে একে ব্যবহার করা হয়ে এসেছে বা আজও হয়ে থাকে। ১৯৪২-এর সেই বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করতে কুণ্ঠিত ছিলেন দেশের যে কোনো সচেতন ও বিবেকবান মানুষই। এসব তথ্য তো আজ সুপরিচিত যে ১৯৪১-এর আগস্টে তাঁর মৃত্যু শয্যাতেও রবীন্দ্রনাথ উদগ্রীব থাকতেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার জয়ের খবর শোনার জন্য। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে দ্বিধা ছিল জওহরলালেরও, কেননা বিপন্ন রাশিয়া ও চীন-সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল এমনই, যাকে নাকি গান্ধীজিও বলেছেন 'তা আমার বর্ণনা করার শক্তি নেই।' এমনকি সুভাষচন্দ্র বসুও ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে বসে তীব্র বিরোধিতা করেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে রেডিও প্রচার চালানোর প্রস্তাবে। জাতীয়তার সহজ ও সুলভ পথ ছেড়ে আন্তর্জাতিকতায় সুদূরপ্রসারী ফলাফলের দিকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করেছিলেন কি ভুল করেছিলেন তৎকালীন বামপন্থীরা তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু কোনো

ক্ষুদ্র স্বার্থের সম্পর্ক নিরপেক্ষ বৃহত্তর আন্তর্জাতিক মঙ্গলবোধই যে ছিল এর প্রেরণা সে বিষয়ে আজও কি কোনো সংশয় আছে? 'ওয়াভেল পেপারস' (Wavell Papers) নামে তৎকালীন বড়লাটের যে সব কাগজপত্র বেরিয়েছে পরবর্তীকালে, তা থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি পাই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৩২)। তাতে বৃটিশরাজের মনোভাব ছিল এরকম : "কম্যুনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধোদ্যোগ সমর্থন করে বটে, কিন্তু তাদের প্রচার আগের মতো এখনো (১৯৪৩-৪৪) ব্রিটিশ-রাজের বিপক্ষে, আর তারা ক্রমাগত কংগ্রেসী বন্দীদের মুক্তি দাবি করে চলেছে। 'হোম' সেক্রেটারি টট্নহাম ভেবেছিলেন যে পার্টিকে আবার নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত কিন্তু পরে স্থির করেন সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের অভিমত অনুযায়ী জোর করেই বলা হচ্ছে যে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির আইনসংগত অস্তিত্ব যতদিন যুদ্ধ চলছে ততদিনের জন্যই, তারপরে আর নয়।" এর, বোধ হয় আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর এও তো ঠিক এই ঘটনার পর দেশের মধ্যে পার্টির জনসমর্থন আরও বেড়েছিল। ১৯৪২-এ পার্টির সদস্য ছিল ৪০০০, ১৯৪৩-এর মে মাসে তা বেড়ে হয়েছিল ১৫০০০, আর ১৯৪৮-এর মাঝামাঝি সময়ে হয়েছিল ৫৩০০০, ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে এক লক্ষ।

কিন্তু এসমস্ত তথ্য আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে ততটা জরুরি নয় যতটা জরুরি এটা বোঝা যে এই আন্তর্জাতিকতা এবং সেই সঙ্গে সম্পর্কিত গভীরতর বাস্তবতা ও সময়চেতনা উপরোক্ত প্রসঙ্গে যেমন, তেমনি মার্ক্সীয় নন্দনেরও গভীরতর চালকশক্তি। আদর্শগতভাবে সেই নান্দনিক ভিত্তিকে কেউ সমর্থন না করতেও পারেন, তাতে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু তার বহুমাত্রিক জটিলতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে যখন সরলভাবে তা বুঝতে বা বোঝাতে চান, তখন সেটা ক্ষতিকর হয়, প্রতিষ্ঠিত সেই আদর্শগত ভিত্তির পক্ষে ততটা নয়, যতটা লেখকের নিজস্ব নান্দনিক ভুবনের প্রতিষ্ঠায়।

মার্ক্সীয় নন্দনকে লেখক সরল করে বুঝেছেন এভাবে "এই কম্যুনিস্ট 'ইডিওলজি অ্যাণ্ড আইডিয়াজ'-কে সাধারণের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দেবার জন্য আর্ট-এর প্রয়োজন হলো এবং তাই শিল্পীদের কি করা উচিত কিংবা না উচিত তার জন্য নির্দেশ দেওয়ারও প্রয়োজন হলো।" (পৃঃ ২৭) এরপর অবশ্য পরের লাইনেই লেখক লুকাচের নামটা করেছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন নি স্তালিনের নেতৃত্বকালে মার্ক্সীয় নন্দনের যে সরলীকরণ মার্ক্সবাদের

ভিতর ঢুকে গিয়েছিল পরবর্তী দশকগুলিতে কেমন অবিরাম সংগ্রাম চলেছে সেই সরলীকরণের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী জুড়ে। লুকাচের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব, ব্রেখট ও সার্ত্রের সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যতত্ত্ব ছাড়াও চল্লিশ দশকের বিখ্যাত আরাগঁ-গারদি বিতর্ক থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এ ফরাসী তাত্ত্বিক লুসিয় গোল্ডমান রচনা 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও সাহিত্যের ইতিহাস', পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় এরেনবুর্গ-এর 'দি রাইটার অ্যাণ্ড হিজ ক্র্যাফ্‌ট' ও হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'অন আর্ট অ্যাণ্ড লিটারেচার', বা আরও পরে থিওডোর অ্যাডরনোর নানা লেখা, ইত্যাদি আরও অনেক তাত্ত্বিকদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত মার্ক্সীয় নন্দন চিন্তা যেভাবে প্রসারিত হয়েছে, যে প্রসারণকে আত্মস্থ করার ফলেই পৃথিবী পেয়েছে আরাগঁ, এলুয়ার, নেরুদার মতো কবি বা পিকাসোর মতো মহাশিল্পীকে, এই বিরাট সত্যকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে শিল্প তাত্ত্বিক কোনো লেখক যখন মার্ক্সীয় নন্দনকে নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেন এমন কি ১৯৮৭ তে প্রকাশিত কোনো বইতে, তখন তা কি গভীরতর এক সংকীর্ণতা দোষেই দুষ্ট হয়ে পড়ে না, অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত?

এর বদলে লেখক কোন্ নান্দনিক ভিত্তি গড়ে তুলেছেন? লেখক বলেছেন, "আমি হিউম্যানিষ্ট"…"তবে আমরা শিল্পের মূল তত্ত্ব অথবা শিল্পের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো রাজনৈতিক উপদেশ অথবা অনুশাসন মেনে চলি নি। আমরা শিল্পসৃষ্টি করি নিজের তাগিদে।" (পৃঃ ১৪৭) আর এ বিশ্বাসও তো তাঁর দৃঢ় যে, "বস্তুসর্বস্ব হলেই মানুষ নিঃস্ব হয়" (পৃঃ ১৪৬)। এজন্যই কি 'আনন্দ'ই তাঁর নন্দনের মূল কথা? সেই আনন্দের স্বরূপ কি? না—"আনন্দ হচ্ছে নিছক 'আনন্দ'। আনন্দম অমৃতম যদ্বিভাতি। যে সত্যিকারের শিল্পী সে ঐ আনন্দ সৃষ্টি করেই আনন্দ পাবে। তার জন্য মার্ক্সবাদ, ফ্যাসিবাদ, ডাইলেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম **এইসব অবান্তর রাজনৈতিক বকুনির** কোনো প্রশ্নই ওঠে না। **'আনন্দে'র সৃষ্টি করেই তার ছুটি ব্যাস্।**" (পৃঃ ৪৪) (মোটা হরফ বর্তমান লেখকের)

এই যে আনন্দের তত্ত্ব এটা কতটা সুপ্রযুক্ত হতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রে অন্তত চল্লিশের দশক প্রসঙ্গে আমরা আপাতত সেই তাত্ত্বিক আলোচনায় যাচ্ছি না। তার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেশি দূর না গিয়েও, যে পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত হল লেখকের এই মন্তব্য তার মুখোমুখী পৃষ্ঠাতেই দেখছি ছাপা হয়েছে লেখকের নিজেরই একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি। নাম 'দাসত্ব' (ব্রোঞ্জ, ১৯৫৩)। এই ভাস্কর্যে মূল যে অবয়ব তা এক মানুষের। তাঁর হাতদুটি

কি পিছনে বাঁধা ? সে তার স্ফীত উদ্ধত পর্বতপ্রতিম শরীর নিয়ে আকাশের দিকে মাথা উচু করে আছে তার মুখে কি করুণার অভিব্যক্তি ? তার শরীর বিন্যাসে কি ঘোষিত হচ্ছে শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ? অসামান্য এই ভাস্কর্যটির প্রতিলিপি দেখতে দেখতেই এ প্রশ্ন জাগে—এর যে অভিব্যক্তি, এর যে বিবাদ, এর যে যন্ত্রণা ও দীপ্ত প্রতিবাদ তার সবটা কি ঐ 'আনন্দ' শব্দটি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ?

এই ভাস্কর্যটি ১৯৫৩-র কাজ। সম্ভবত 'ক্যালকাটা গ্রুপের' আমলেরই। এর মধ্যে যে ভাবাদর্শ বা স্পিরিটটাকে পাই, সেটা চল্লিশের দশকেরই মূলগত ভাব। আর চল্লিশ দশকের নান্দনিক অবস্থানের ক্ষেত্রে এই 'আনন্দ' শব্দটিকে তো খুবই অপ্রতুল মনে হয়। কেননা তার আগের দশকগুলিতে বহুব্যবহারে বা কখনও অপ-ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে শব্দটি। চল্লিশ দশকের শিল্পের মূল বাস্তবতার যে গভীরে প্রোথিত, সেই সময় ও বাস্তবতার কারণেই তো চল্লিশ দশকে আমাদের শিল্পে স্বতন্ত্র একটি ধারার সূত্রপাত হয়েছিল যা সম্পূর্ণভাবেই এক সামাজিক দায়বোধের উপর গড়ে উঠেছিল। বামপন্থী আন্দোলনের তৃণ-মূল স্তর থেকেই জেগে উঠেছিলেন চিত্তপ্রসাদ বা সোমনাথ হোরের মতো শিল্পীরা। এই দায়বোধের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে, কখনও প্রত্যক্ষে কখনও পরোক্ষে, যুক্ত ছিলেন রথীন মৈত্র, গোবর্ধন আশ বা পরিতোষ সেনের মতো শিল্পীরা, যারা ক্যালকাটা গ্রুপেরও অংশ ছিলেন বা পরে যোগ দিয়েছিলেন। দায়বোধের এই ভাবাদর্শকে এড়িয়ে কি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় চল্লিশ দশকের শিল্পের স্বরূপ, এবং যার একটি বিশেষ প্রবাহ 'ক্যালকাটা গ্রুপ'—তারও স্বরূপ ?

এই দায়বদ্ধতার চেতনাকে এবং শিল্পে তার প্রতিফলনকে লেখক নস্যাৎ করতে চেয়েছেন শুধু 'ক্যালকাটা গ্রুপের ক্ষেত্রেই নয় এমনকি ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ ও আই. পি. টি. এ-র ক্ষেত্রেও'। তাঁর ভাষায় "অ্যান্টি ফাসিস্ট রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর-কর্তারা অনেক সভা সমিতি এবং হইচই করেছিলেন বটে কিন্তু প্রকৃত শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে কতখানি কৃতকার্য হয়েছিলেন বলা মুশকিল।" (পৃঃ ২৫) লেখক কি মনে রাখেন না যে সময়ে 'নবান্ন' প্রযোজিত হয়েছিল সেই সময়ের আবেগকে ? তারপর লেখক শম্ভু মিত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। আই. পি. টি. এ ভেঙে যাওয়ার পর তাঁরা 'বহুরূপী' গড়লেন আর সেখানে তাঁরা "কালিদাস, ভবভূতি, বানভট্ট থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত" নাট্যকারদের এমন কি গ্রীক কাব্য নিয়ে নাটক করেছেন "নিছক শিল্প সৃষ্টির

খাতিরে।" আর মন্তব্য করেছেন লেখক—"এখানে কম্যুনিস্ট আদর্শের কথা একেবারেই ওঠে না কারণ কম্যুনিস্ট আদর্শের বাঁধাবাঁধি নিয়ম কানুনের সঙ্গে মানিয়ে শিল্পের মান অক্ষুন্ন রেখে শিল্পসৃষ্টি সহজসাধ্য নয় এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন" (পৃঃ ২৫)। এর পরে বোধহয় আর বলার অপেক্ষা থাকে না যে গলদ একেবারে গোড়ায়। শম্ভু মিত্র কিন্তু তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'ও অভিনয় করেছিলেন। 'রক্তকরবী' অভিনয়ের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ এসেছিল যে মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে তিনি 'রক্ত করবী'র শুচিতা নষ্ট করেছেন। আর পরবর্তীকালে শম্ভু মিত্র এবং বহুরূপী গোষ্ঠী আলাদা আলাদা ভাবে ব্রেখটের 'গ্যালিলিও' অভিনয় করেছিলেন। এর কি ব্যাখ্যা হবে? "কমুনিস্ট আদর্শের বাঁধাবাঁধি নিয়ম কানুনে" শিল্পের মান অক্ষুন্ন থাকে না? লেখকের অনেক সিদ্ধান্তই উপযুক্ত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এটি তারই এক দৃষ্টান্ত।

চল্লিশ দশকের সাহিত্যে ও শিল্পে যে দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটেছিল, তার অন্যতম উৎস ছিল আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ। আর সেই আন্তর্জাতিকতা যে সমস্ত উৎসের থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল বিশেষত আমাদের কলকাতার শিল্পের পরিমণ্ডলে, তার অন্যতম প্রধান মার্কসবাদীচেতনা। একথা অস্বীকার করা সত্যেরই অপলাপ। 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র শিল্পীদের সকলে সে চেতনায় প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ না হতে পারেন, কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করলে ক্যালকাটা গ্রুপের স্বরূপ অনুধাবনেও ভুল থেকে যায়। কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত মত-অমতের থেকেও সময়ে অন্বিত সত্যের মূল্য কি বেশি নয়?

কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতাই চল্লিশ দশকের শিল্পের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ক্যালকাটা গ্রুপের ক্ষেত্রেও নয়। এই আন্তর্জাতিকতা আরও দুটি উৎসের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে গড়ে তুলেছিল চল্লিশ দশকের শিল্পের স্বরূপ। এই দুটির মধ্যে প্রধান হচ্ছে লোকায়ত চেতনা ও লোকায়ত আঙ্গিক। এবং দ্বিতীয়টি বেঙ্গল স্কুলের উত্তরাধিকার। এর প্রভাব খুব কম হলেও, এই ঐতিহ্যকে একেবারে উপেক্ষা করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

বিশ-এর দশক থেকে ভারতের রাজনীতি ও সমাজচেতনার বিস্তারের মধ্য দিয়ে লোকায়তিক জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধ কেমন করে ধীরে ধীরে এক জায়গায় মিলে গিয়ে শিল্প ও সংস্কৃতিতে নতুন এক প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল, তা আমরা বিস্তৃত ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম এই 'পরিচয়'

পত্রিকারই গত শারদীয় (১৯৮৬) সংখ্যার একটি প্রবন্ধে (ক্যালকাটা গ্রুপ ও চল্লিশের শিল্পকলা পরিপ্রেক্ষিত)। এখানে সে বিষয়টি পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই। লোকায়তের সেই বিশিষ্ট ভূমিকার কথা আলোচ্য গ্রন্থে তেমন একটা আলোচিত হয় নি। সেই সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকায়ত আঙ্গিক থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন নীরদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন, গোবর্ধন আশ, সুনীলমাধব সেন প্রমুখ শিল্পীরা। সে প্রভাবকে তাঁরা মেলাতে চেষ্টা করছিলেন তাঁদের পাশ্চাত্য আঙ্গিকগত অর্জনের সঙ্গে, কখনো বা সূক্ষ্মভাবে ধ্রুপদী ভারতীয়তার সঙ্গেও। আর এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তাঁরা গড়ে তুলছিলেন নিজস্ব আঙ্গিক যাতে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার গভীরতর প্রভাব ছিল। এই লোকায়তের উজ্জীবনের প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে কেবল পাশ্চাত্যের প্রতিফলন হিশেবে দেখলে সেই সময়ের ছবিকে, তাতে অর্ধসত্যের অসম্পূর্ণতা এসে যায়।

এরই প্রতিফলন থেকে যায় হয়ত লেখকের রামকিঙ্কর-মূল্যায়ণে। রামকিঙ্কর সম্পর্কে লিখেছেন, "তাঁকে এই বলে দোষারোপ করা যেতে পারে যে তাঁর নিজের গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তাঁর বেশিরভাগ কাজেরই কোনো সঙ্গতি নেই—রামকিঙ্করকে আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিশেবে গণ্য করার সময় এই প্রশ্ন সবসময়েই আমাদের মনে জেগে থাকবে। শান্তিনিকেতনের গ্রাম্য আবহাওয়া, তার পটুয়া, কুমোর-কামার এদের কাজের ফর্ম এবং নকশার বিশিষ্টতা রামকিঙ্করকে কোনো প্রকারেই অনুপ্রাণিত করতে পারে নি এটা খুবই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।" (পৃঃ ১২৯। পাশ্চাত্য প্রভাবকে রামকিঙ্কর আত্মস্থ করেছেন একথা ঠিকই, কিন্তু তাঁর ছবি বা ভাস্কর্যের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, যে আর্কায়িক বা মৌল-প্রতিমাজাত সংঘাতময় সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ, তাতে কি সংহত হয়ে নেই আদিম ভারতীয় উপজাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার? গভীর স্তরের এই লোকায়তই পাশ্চাত্য আধুনিকতায় জারিত হয়ে কি গড়ে তোলে নি তাঁর শিল্পের শক্তি ও সুষমা? এইরকমভাবেই কখনও প্রত্যক্ষে কখনও পরোক্ষে লোকায়তিক উত্তরাধিকার থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে চল্লিশের শিল্পকলা।

একদিকে যেমন লোকায়তের গভীরতর ভূমিকা ছিল চল্লিশের শিল্পকলায় তেমনি বেঙ্গল স্কুলের উত্তরাধিকারের কিছুটা প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে হলেও কি ছিল না? চল্লিশের সকল শিল্পধারাগুলিকে যদি তিনটি ভাগে ভাগ করে নিই, তাহলে তার শেষ দুটি ভাগ, যা অপেক্ষাকৃত বৈপ্লবিক প্রচলিতের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহই যেখানে প্রধান সুর, তার অন্তর্গত করে ভাবা যায় একদিকে ক্যালকাটা গ্রুপকে, অন্য ধারায় বামপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ প্রত্যক্ষ দায়বোধে অনুপ্রাণিত শিল্পীদের। এবং একেবারে প্রথম ধারায় আসেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা, বেঙ্গল স্কুলকে স্বীকার করেও যারা সেই ধ্রুপদী প্রবাহকে আধুনিকতায় ও আন্তর্জাতিকতায় অভিষিক্ত করেছিলেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে ক্যালকাটা গ্রুপের আলোচনায় বেঙ্গল স্কুলের উত্তরাধিকারকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও হয়ত চলে। কিন্তু সেই আন্দোলনকে একেবারে নস্যাৎ করার চেষ্টা করলে, সেটাও এক ধরনের সরলীকরণ হয়ে যায়। এই সরলীকরণেরই প্রকাশ ঘটে এরকম মন্তব্যে "আমার নিজের ধারণা বেঙ্গল স্কুলের কাঠামো শিল্পের শক্ত বাঁধুনিতে তৈরি হয় নি। একটা মিথ্যা জাতীয়তাবোধের ভাবপ্রবণতাই ছিল এর বাঁধুনি আর দেব-দেবীর সহজবোধ্য বিষয় ছিল এর প্রেরণা। তাই সাধারণের কাছে এর মূল্য ছিল শিল্পের খাতিরে নয়, নিছক জাতীয়তার ভাবপ্রবণের দিক থেকে।" (পৃঃ ৪৯)। সাধারণভাবে এরকম মন্তব্য করা কি সঙ্গত বেঙ্গল স্কুল সম্পর্কে, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের সারাজীবনের শিল্পকর্ম সত্ত্বেও? অবনীন্দ্রনাথ না হলে শিল্পের চল্লিশের দশকের দিক পরিবর্তনও কি সম্ভব হত?

আধুনিক শিল্পের আলোচনায় অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান জানাতেই হয়। সেই অভাববোধ কিছুটা থেকে যায় এই বই পড়ার পর। তবু সেটা তেমন গুরুত্বের নয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অন্য একটি মন্তব্যে একটু থমকে যেতে হয়।

'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় প্রকাশিত ক্যালকাটা গ্রুপ বিষয়ক প্রবন্ধের উত্তর' নামের আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের ভারত শিল্প-সম্পর্কিত একটি উক্তি সমর্থন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন লেখক—"অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেত্রিশ বছর (১৯০৪) যখন তিনি ভারতীয় ঢঙ-এ ছবি আঁকার প্রথম প্রয়াস করলেন রাধাকৃষ্ণ সিরিজের ছবি এঁকে। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ আমাদের এত বড় একটা বিরাট শিল্প সংস্কৃতির খবর কিছুই জানতেন না, যখন পেলেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ আর ইহলোকে নেই। স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই।" (পৃঃ ১৫০) বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আমাদের বিচার্য নয়। অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে দুটি মন্তব্য ভেবে দেখবার। অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণ সিরিজের ছবি এঁকেছিলেন কি ১৯০৪ সালে? যতদূর জানা আছে 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রমালা তো ১৮৯৫-এর কাজ। প্রমাণ স্বরূপ কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহ—

শালা প্রকাশিত (১৯৬৬) রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আদিপর্বের শিল্পকর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যায়। ১৫ পৃষ্ঠায় লিখছেন "১৮৯৫ সালে আঁকা 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রমালায় অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর। ভারত চিত্রকলায় ইতিহাসে এই ছবিগুলি নূতন এক যুগের দ্যোতক।" আবার ১৭ পৃষ্ঠায়—"অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাঙ্কণে আধুনিক এক শিল্পভাষার প্রবর্তন করেছিলেন। ১৮৯৫ সালে রাধাকৃষ্ণ চিত্রমালা রচনার কালে তিনি অত্যন্ত স্বল্প-পরিচিত ছিলেন।..." ইত্যাদি। সে যাই হোক, কিন্তু ১৯০২-এর আগে "অবনীন্দ্রনাথ আমাদের এতবড় একটা বিরাট শিল্প সংস্কৃতির খবর কিছুই জানতেন না' কি? ১৮৯৫-তে তিনি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বিশেষ ধারার সমন্বয়ে সৃষ্টি করলেন তাঁর নিজস্ব এক আঙ্গিক, একেবারে কিছুই না জেনে কি? ভারতীয় শিল্পের প্রত্যক্ষ চর্চা কি আরও আগে শুরু হয় নি? ১৮৭৫-এ বেরিয়েছিল উড়িষ্যার পুরাকীর্তি বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বই-এর প্রথম খণ্ড, ১৮৯৬-তে প্রকাশিত হয়েছিল জেমস ফরগুসনের ভারতীয় স্থাপত্যের উপর বই। ১৮৯৭-তে হ্যাভেল শুরু করেন ভারতীয় শিল্প নিয়ে গবেষণা। ১৮৯৮-তে বেরয় ফরাসি ভাষায় মরিস সঁ্যাস্ত্রর বই। তারও আগে ১৮৭৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় প্রথম ভারত শিল্প বিষয়ক আলোচনা—শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প চাতুরি'। এই শ্যামাচরণ শ্রীমানীর যোগ ছিল হিন্দু মেলার সঙ্গে। হিন্দু মেলার সঙ্গে ঠাকুর বাড়ির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আর অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'-র পাঠক জানেন হিন্দুমেলা বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্যের কথা। এছাড়াও শ্যামাচরণ শ্রীমানীর রচনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়ের প্রমাণ আছে। ১৯০২ সালে ওকাকুরা প্রথমবার এসেছিলেন কলকাতায়। এশিয়ার শিল্পের ঐক্য বিষয়ে তাঁর চিন্তার রেশ পৌঁছেছিল এখানে। এ সমস্ত সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত কি সঙ্গত যে ১৯০২-এর আগে কিছুই জানতেন না অবনীন্দ্রনাথ ভারত শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে? এটা ভেবে দেখবার। লেখক তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে তেমন কিছু তথ্য বা যুক্তি দেখান নি।

পরিশেষে, এই গ্রন্থের কোনো কোনো পাঠক আহত ও ব্যথিত বোধ করতে পারেন নীরদ মজুমদার সম্পর্কে লেখকের কিছু কিছু মন্তব্যে। নীরদ মজুমদারের ছবির বিবর্তন নিয়ে লেখক সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাঁর পরিণত পর্যায়ের ছবির ব্যর্থতা যেখানে বলে মনে হয়েছে লেখকের, সে বিষয়ে

আমরা পাই কিছু আলোকিত উক্তি। নীরদ মজুমদার নিজের ছবির গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতেন, 'বিন্দু-কেন্দ্রিক সমন্বয় সূত্রে জ্যামিতিক অগ্রগামিতা'। বিন্দু থেকে বিস্তারের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন লেখক। বলেছেন, 'আমার নিজের কাছে কসমসের এই অনন্ত পরিব্যাপ্তির মধ্যে একটা বিশেষ কনসেন্ট্রিক বিন্দুর প্রয়োজন ছবির ক্ষেত্রে আছে' যা হবে ছবির দৃষ্টিবিন্দু (ফোকাল পয়েন্ট) অথবা প্রাণশক্তি, যা নিজের গুণে ধরে রাখবে সমস্ত ছবির আশেপাশের অংশগুলিকে এমনভাবে যেন দেখে মনে হবে এই বিন্দুকেই বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই অংশগুলির প্রয়োজন নিজেদের অস্তিত্বের বিনিময়ে। তা না হলে, বিন্দু নিজের অস্তিত্ব খুইয়ে মিশে যাবে বিস্তারে। তার আর কোনও দৃষ্টিবিন্দুই থাকবে না। আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়বে ছবির সর্বত্র; এখানে সেখানে। ফলে চোখ ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মরবে মাথা ঠুকে ছবির সর্বত্র, এবং সেই হেতু ছবি অসার, অর্থহীন মনে হবে। আমি দেখেছি, নীরদের বেশিরভাগ ছবিই এই দোষে দুষ্ট'। (পৃঃ ৯০)। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই কিন্তু নীরদ মজুমদারের ছবির প্রতি আমাদের মুগ্ধতা পাল্টায় না সামান্যও।

নীরদ মজুমদারের ছবির স্বকীয়তা, ভাব ও আঙ্গিকগত ঐশ্বর্য, তাঁর মানবিকতা সেসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। অন্যত্র সে চেষ্টা আমরা করেছি (দ্রষ্টব্যঃ 'নিষ্পন্ন', শারদীয় ১৯৮৫)। আধুনিক ভারতীয় ছবিতে, বিশেষত তেলরঙ মাধ্যমে নীরদ মজুমদার যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, একথা অনেকেই মানেন। সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে এরকম কেউ কেউ আছেন যাঁরা তাঁর ছবির ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন, তবু তৈল মাধ্যমে তাঁর দক্ষতাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁর সমকালীন ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের দুজন প্রখ্যাত শিল্পীর তাঁর ছবি সম্বন্ধে মুগ্ধতার কথা উদ্ধৃত করা যায়। পরিতোষ সেন লিখেছেন—"দ্বিমাত্রিক চিত্রপটে রেখার বাঁধুনিতে নক্সাকে যেভাবে তিনি তৈলচিত্রের মাধ্যমে এবং আধুনিক প্রয়োগ কৌশলে রূপ দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তথাকথিত ভারতীয় ঐতিহ্যকে বদ্ধ খাঁচার থেকে তিনি মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।' প্রকাশ কর্মকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'এখানেই হচ্ছে নীরুদার সার্থকতা। ভারতবর্ষ তার রাজকীয় ঐশ্বর্যের সুষমা, তার সমান্তরাল রঙ লেপনে তৃতীয় তলের উপেক্ষায় কাব্যিক পরিণতি, তার প্যাসিভ নমনীয়তা। তার গর্ভচেতনা

সমৃদ্ধসাপেক্ষে চার দেয়ালের বিন্যাস নির্ভর চিত্রের পরিণতি তাঁর ইউরোপীয় সমৃদ্ধতার বিন্যাস রঙের বিভোরতা ও লেপন। এ সবই ছিল নতুনভাবে ভারতীয়তার সংযোজন যা এই মূর্খের দেশে কেউ বুঝল না।' (দ্রষ্টব্য: কিঞ্জল, মাঘ ১৩৯২, পৃঃ ১১ ও ১৬)।

নীরদ মজুমদারের ছবিতে এই সমস্ত ঐশ্বর্য আছে। কেউ যদি তা অনুভব না করেন বা না মানেন তা নিয়ে তর্ক চলে না। কিন্তু এতবড় একজন শিল্পী সম্বন্ধে যদি এমন কিছু লেখা হয় যা সৌজন্যের পক্ষে হানিকর, যার মধ্যে ব্যক্তি-মানুষ হিশেবে তাঁকে অবনমিত করার প্রয়াস থাকে, তাহলে তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ আমরা আহত না হয়ে পারি না। ছাপার অক্ষরে এরকম কথা আমরা পড়ি এ বইতে—"আমি নীরুকে (নীরদ মজুমদার) যতখানি বুঝতে পেরেছি তাতে আমার মনে হয় ও বরাবরই কেমন যেন হতবুদ্ধি ছিল, কোনো দিনই কোনো আত্মপ্রত্যয় ছিল না কোনো বিষয়ে। অনেক আবোল-তাবোল কথা বলতো।' (পৃঃ ৮৮)। 'আমি নীরদের চরিত্র-চিত্রণে পূর্বেই বলেছি যে নীরদের আবোল-তাবোল, উল্টো-পাল্টা কথার কোনো মূল্যই আমি কোনোদিন দিই নি।...আমার নিজের ধারণায় নীরদ ফরাসী দেশ থেকে দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফিরে এসে কতগুলো কমপ্লেক্স-এ ভুগছিল নিজের স্বীকৃতির চাহিদার বিষয় নিয়ে। তারই প্রতিক্রিয়া হিশেবে ওর মুখ থেকে এইসব কথা যেন উদ্‌গারের মতো বেরিয়ে যেত। (পৃঃ ১৪৫)। 'আমাদের মাথা যাচাই করার ভার কি শুধু নীরদের উপরই দেওয়া ছিল? নীরদের স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি শুধু এইটুকুই বলব যে আমাদেরও তেমনি অধিকার জন্মেছে নীরদের মাথা যাচাই করে দেখবার।' (পৃঃ ১৪৬)। ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় পাগলের পর্যায়েই কি পৌঁছে দেওয়া হল না এতবড় একজন শিল্পীকে? এ নিয়ে তর্ক বা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। মানুষের পরিচয় তাঁর কাজে। নীরদ মজুমদারের ছবি মুগ্ধ দর্শক বা তাঁর 'পুনশ্চ প্যারী' গ্রন্থের পাঠক এইসব উক্তির নীরবতা যাচাই করতে ভুল করবেন না।

যুক্তির এরকম অসংবদ্ধতা, মন্তব্যে এরকম অসহিষ্ণুতার আরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে এ বই জুড়ে। সেসব প্রসঙ্গ না বাড়ানোই ভাল, তা কেবল মালিন্যই বাড়াবে। বইটি শেষ করে আমাদের জ্ঞানে ও বোধে সদর্থক যা কিছু যুক্তি হল, তার প্রতি বিনত থেকেও এ বিস্ময়কে আবৃত করতে পারি না, এত বড় একজন শিল্পী, এত প্রাজ্ঞ একজন মানুষ তাঁর লেখায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এত সাধারণ্যে ভেসে গেলেন কেমন করে।

স্মৃতিকথা শিল্পকথা (ক্যালকাটা গ্রুপ)। প্রদোষ দাশগুপ্ত। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫০ টাকা।

সময়ের মর্মস্থল ছুঁয়ে

কেশব দাশ

'লেখকের আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজ জিজ্ঞাসাকে ক্রমাগত এক করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নইলে সে লেখক কেন?'

অসীম রায়ের এটা নিছক স্বীকারোক্তি নয়, তাঁর লেখক সত্তার উপলব্ধি, যে উপলব্ধির বাস্তবায়ন আমরা লক্ষ্য করি তাঁর গল্প ও উপন্যাসে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৮৫ এই চার দশকে অসীম রায় ডজন খানেক উপন্যাস ও শতাধিক ছোটগল্প তুলে দিয়েছেন পাঠকের হাতে। তাঁর গল্প-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যময় পরম্পরার একটি বিশেষ ধারাকে পরিপুষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। উল্লেখিত চার দশক তো বাঙালি জীবন ও সমাজে ক্রমা-স্বয়িক ভাঙন ও সংঘাতে খরস্রোত সময়, এবং অসীম রায়ের সাহিত্য, অনেকটাই, হয়ে উঠতে পেরেছে এই সময়ের দর্পণ। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় বিবেকবিদ্ধ হয়ে অসীম রায় লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'একালের কথা'। মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার ঘুমন্ত দানব ভয়ঙ্কর মূর্তিতে জেগে উঠে মানবতার টুঁটি টিপে ধরতে উদ্যত, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও হানাহানি—এমন একটা কলঙ্কিত সময়কে তিনি নথিভুক্ত করেন উপন্যাসের কাঠামোয়—'একালের কথা'-য়। 'একালের কথা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫০-এ। এর তেইশ বছর পর ১৯৭৩-এ বের হয় 'অসংলগ্ন কাব্য', যার বিষয়গত প্রেক্ষিতও আর একটি ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা; নকশালবাড়ি আন্দোলন জনিত পরিস্থিতির।

আসলে এই আমাদের বিশাল দেশের বৈচিত্র্যময় শ্রেণী, পেশা, ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের অন্তঃপ্রবাহী সংকট ও সংঘাতের যে প্রতিফলন শহর-ভিত্তিক মধ্যবিত্ত সমাজে, তারই উপস্থাপন লক্ষ্য করি অসীম রায়ের সাহিত্যে। বিষয়ের দিক দিয়ে যদিও বা তাঁর কিছু গল্পে পাওয়া যায় শহর-বর্জিত পটভূমি, কিন্তু উপন্যাসের পরিমণ্ডল কলকাতা-কেন্দ্রিক। এবং তাঁর রচনার পাদপ্রদীপে যে সমস্ত চরিত্র উঠে আসে তাঁদের অধিকাংশ বুদ্ধিদীপ্ত ও যুক্তিবাদী। চেতনায় খর্বুটে নয়, বরং প্রখর। অসীম রায়ের কিছু উপন্যাস, এমন কি গল্পেও, কাহিনী পল্লবিত হয় দুটি বৃত্তে। প্রথম বৃত্তটি পারিবারিক, এবং দ্বিতীয়টি সামাজিক। তাঁর কাহিনীর নারী-পুরুষরা এই দুই বৃত্তের মধ্যে পদচারণা করতে করতে নিজেদের অস্তিত্ব ও অবস্থান সন্ধান করে ফেরে। এভাবে তিনি তাঁর সমকালীন এক-একটা পর্ব, তার ঘাত-প্রতিঘাত আশা-নিরাশা সহ, ধরতে চেয়েছেন পরিবার সমাজ ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর পটভূমিতে।

অসীম রায় তাঁর গল্পেও, আপাত হিউমার অথচ অন্তঃপ্রবাহী গভীরতায় কি অদ্ভুত ভাবে—কোথাও কোথাও গল্পের বিষয়গত ছক ভেঙেও—ছুঁয়ে যান রাজনীতি, কমিউনিস্ট-কংগ্রেস, ক্রিকেট, বাজারদর, আর্ট ফিল্ম ইত্যাদি আমাদের 'চায়ের কাপে তুফান তোলা' প্রসঙ্গ। এতে গল্পের বিষয়গত প্রসারতা ক্ষুণ্ণ তো হয়ই না, বরং নতুনতর মাত্রা পায়। যেমন আলোচ্য গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'ডনা পলা'-য় ট্রাভেলার্স বাসে গোয়া ভ্রমণকারী দুই বাঙালি-মানব ও আর এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের মধ্যে আলাপচারিতায় কলকাতা ও বম্বে প্রসঙ্গ উঠতেই ভদ্রলোকের মন্তব্য—'বম্বে হল ক্যাপিটালিস্টদের শহর। আর কলকাতা হল কমিউনিস্টদের।' অথবা এই গল্পেরই এক জায়গায়, ষোড়শ শতাব্দীর এক গীর্জায় ঢুকে মানব যখন শোনে সন্ত ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মমিকৃত দেহ থেকে একটা হাত ভক্তরা কেটে নিয়ে গেছে ইতালির কোনো এক ক্যাথিড্রালে, মানবের তখন তার কাকার কাছে শোনা ভক্তির এই পরাকাষ্ঠার আর এক গল্প মনে পড়ে—'নিমতলা শ্মশানে শায়িত রবীন্দ্রনাথের দাড়ি পটাপট উপড়ানো আর শিল্পী নন্দলাল বসুর হাতপাখার বাঁট দিয়ে ভক্তদের তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা…' ইত্যাদি।

সদ্যপরিণীত মানব আর রমলা এসেছে গোয়ায়, হনিমুনে। মানব 'ব্যাঙ্ক অফিসার গ্রেড পেয়েছে। সল্ট লেকে তাদের সুদৃশ্য বাড়ি উঠেছে।' মানব তার পূর্বপ্রেমিক রেণুকে বিয়ে করে নি, কারণ, 'রেণু ঠিক ফিট করে না তাদের

সংসারে…'। আর চিফ ইঞ্জিনিয়ারের একমাত্র মেয়ে কমলা 'যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, অকারণ ভাবালুতায় আচ্ছন্ন নয়। দাম্পত্য সুখের প্রধান উপকরণ যে সচ্ছলতা' তা সে ভালোভাবেই জানে। …'ভালোবাসা-টালোবাসা নিয়ে গল্প লেখা যায়, কিন্তু আসলে যা দাঁড়ায় তা হল টাকা; এব্যাপারে তারা দুজনেই একমত।'

এ-হেন বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন যুবক-যুবতী, পারিবেশিক আনুকূল্য ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, দেহ ও মনে আমূল অপার্থিব মিলন সুখে একাত্ম হতে পারে না। পার্থিব পাওয়া না-পাওয়ার সজাগ শীতল টানাপোড়েন তাদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কনডাক্টেড ট্যুরের বাস আসে দ্য লাস্ট আইটেম ডনা পলা-য়।

গাইড ঘোষণা করে, 'দ্য টিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি লাভ স্টোরি বিটুইন দ্য পর্তুগীজ গভর্নরস ডটার অ্যাণ্ড এ ইয়ং ফিসার ম্যান…'

চারশো বছর আগের কাহিনী। ধীবর যুবকের সঙ্গে গভর্নর কন্যা ডনা পলা-র অসম প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতি। পাহাড়ের চুড়ো থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে ডনা পলা-র আত্মবিসর্জন।

'এক চাপা অস্পষ্ট আবেগ যাত্রীদের আচ্ছন্ন করে…প্রেম একটা আলাদা চীজ, একটা স্বপ্ন, তা গোদরেজের আলমারি নয়, ফ্রিজ নয়, ইনক্রিমেণ্ট নয়…'

'ডনা পলা' নিছক রোমান্টিক প্রেমের গল্প নয়, অথবা আদর্শবাদী প্রেমের আখ্যানও। ক্রমান্বয়িক ভোগ-সর্বস্বতার বেনো জলে নারী-পুরুষের প্রেম ভালোবাসা বিশ্বাসের সনাতন বোধগুলি কি ভাবে নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে, তারই উপস্থাপন গল্পটিতে।

'অসীম রায়ের ছোট গল্প' গ্রন্থটি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত আগের মোট পনেরোটি গল্প এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (অসীম রায়ের মৃত্যু ১৯৮৬-র গোড়ায়)। অবশ্যই অসীম রায়ের 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র', 'শ্রেণীশত্রু' বা 'অলি'-র মতো উল্লেখযোগ্য বা সমমানের গল্প এই সংকলনটিতে নেই। তা সত্ত্বেও এ সংকলনে ভালো লাগা কয়েকটি গল্প হল: 'ডনা পলা', 'শৈলেনবাবু সমাচার', 'মা-ছেলে', 'অনিল-সুনীল'।

'শৈলেনবাবু সমাচার' গল্পে আমরা পাই সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ড্রাফটস্‌ম্যান শৈলেনবাবুর দ্বিতীয় ভুবন—সাঁওতাল পরগনার নিভৃত সৌন্দর্যে আটবিঘার

একটি বাগান—আমলকি, ইউক্যালিপটাস, কাঠ চাঁপার আত্মিক টান। শৈলেনবাবু 'স্ত্রীর শ্রাদ্ধের সময় বাগান বিক্রির সংকল্প করলেন। কিন্তু বিক্রি করতে এসে আবার নতুন গাছ পুঁতলেন, বেড়া দিলেন। আবার তাঁর ভালোবাসার জগতে গেলেন তলিয়ে।' পঞ্চাশ বছর ধরে নিজের হাতে তৈরি এই আটবিঘার সবুজিমা, শৈলেনবাবুর লরঝরে শহুরে জীবনের মধ্যেও, এক মুঠো স্বপ্ন, একটা আকাশ।

'মা ও ছেলে' গল্পে কেরিয়ার তৈরির চাপিয়ে দেওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর চতুঃপার্শ্বের অসম প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত এক তরুণ—শেষ পর্যন্ত যে আশ্রয় নেয় আধ্যাত্মিকতার পরাবাস্তবতায়।

এই সংকলনের বাড়তি প্রাপ্তি ভূমিকা হিসাবে 'লেখকের জবানবন্দি'—মাত্র তিন পৃষ্ঠায় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে অসীম রায়ের মূল্যবান আলোচনা।

অসীম রায়ের উপন্যাস ও গল্পের ধারা বিশ্লেষণে বলা যায়, তিনি ধূর্জটি-প্রসাদ ও গোপাল হালদারের উত্তরসূরী। এই তিন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে মেধা ও মননধর্মী রচনার দিকটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন (এ ক্ষেত্রে অসীম রায়কে পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসেই)। আর মেজাজ ও ব্যক্তি সত্তায়ও অসীম রায় ছিলেন গোপাল হালদার বা ধূর্জটিপ্রসাদের মতো নিভৃতচারী ও আত্মপ্রচার বিমুখ, কিছুটা বা অভিমানী।

অসীম রায়ের ছোটগল্প (আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালা / ১)। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ কলকাতা। পনের টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সৃষ্টি

দেবদাস জোয়ারদার

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো মনীষিগণ আমাদের সমাজ 'অচলায়তনে'র পঞ্চক। তাঁরা এই অচলায়তনের জানলা খুলে দিয়েছিলেন। সেই জানলা দিয়ে নারীমুক্তির আলো এসে পড়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃহত্তর সামাজিক জীবনে তাঁদের মতো বড় কাজ করেন নি। তিনি শুধু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জীবনে একটি জানলা খুলে দিলেন। আর সেই পথে বাইরের আলো এসে পৌঁছলো এ বাড়ির সদর থেকে অন্দরে, পুরুষের ফরাস থেকে মহিলামহলে। এ বাড়ির দিক থেকে এই কাজটির কথা মনে রাখলে তাঁকেও বলতে হয় পঞ্চক। সেকাল থেকে শতবর্ষ পরে তাঁর কথা সুদূর আগরতলার উচ্চশিক্ষিতা এক ভদ্রমহিলা তাঁর গবেষণাসূত্রে শ্রদ্ধা ভরে লিখেছেন। তাতেই প্রমাণিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথ যে-কাজটি তাঁর পরিবারে শুরু করেছিলেন, তার সুফল সেই বিশেষ বাড়ির গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ দূর দূরান্তরে ফলেছে। এ বিশেষভাবে আনন্দের কথা যে 'বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিকৃৎ' সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়ে পুরুষের ওপর বরাত না দিয়ে এক নারীই প্রথম বিস্তৃত আলোচনার জন্য এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই লেখিকা ডক্টর অমিতা ভট্টাচার্য দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে চিরতরে চলে গেলেন। এই আনন্দবেদনার মিশ্র অনুভূতি 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' 'জীবন ও সৃষ্টি' সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে প্রথমই আমাদের মনে জাগছে।

সত্যেন্দ্রনাথ নারীমুক্তি বিষয়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। লেখিকা বহু অনুসন্ধানেও বইটি পান নি। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'আমার বাল্যকথা'য় জানিয়েছেন জনস্টুয়ার্ট মিলের Subjection of women গ্রন্থ প'ড়েই তিনি উৎসাহিত হয়ে তাঁর পুস্তিকাটি লেখেন। মিলের বইটি ১৮৬২-তে লেখা হলেও নিজের লেখা বার বার প্রকাশের আগে সংশোধনের অভ্যাস থাকায় ১৮৬৯-এ ছাপা হয়। ১৮৬৫-১৮৬৮ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে নারীর ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব মিল সমর্থন করেন। সত্যেন্দ্রনাথের ছোটো বোন স্বর্ণকুমারীর কথা—তাঁর মেজদাদার 'স্ত্রী স্বাধীনতা' বই আই. সি. এসের জন্য ১৮৬২-তে প্রথম বিলেত যাত্রার আগে লেখা হয়েছে, তা যথার্থ হতে পারে না। লেখিকার এই ধারণার কারণ তখনও সত্যেন্দ্রনাথের উল্লিখিত পাশ্চাত্য দেশে নারীমুক্তি সম্পর্কে মিলের যুগান্তকারী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন, বোধহয় দ্বিতীয়বার ১৮৭৮-এ বিলেত যাওয়ার আগে সত্যেন্দ্রনাথ এই বই লিখেছেন। নির্বাচিত উদ্ধৃতিসহ মিলের গ্রন্থের পরিচয়ও লেখিকা দিয়েছেন। এইভাবে সংস্কৃত ইংরেজি যখন যা দরকার হয়েছে, তার মূলে অনায়াসে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন। সাহিত্যসাধক চরিতমালার লেখক সত্যেন্দ্রনাথের এই বইটির প্রকাশকাল জানান নি। তিনিও বোধহয় বইটির সন্ধান পাননি। তবে সম্ভাব্য রচনাকাল বর্তমান লেখিকাই প্রথম নির্দেশ করেছেন, তাঁর অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠা বোঝার জন্য এই আপাততুচ্ছ বিষয়েও তাঁর মনোনিবেশ লক্ষণীয়। তথ্যকে তিনি তথ্যের দ্বারা বিচার করতে করতে এগিয়েছেন। বই পড়ার সময় তা আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগায়।

কিন্তু এই তথ্যনিষ্ঠাই সব নয়। তথ্যের শিলাবেদিমূলে তিনি সত্যের দীপমালা জ্বালিয়েছেন আর তার আলোকে সত্যেন্দ্রনাথের নানা রূপ আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটি তাঁর নারীমুক্তিকামীর রূপ। একদিন যখন আমাদের সমাজ পুরুষে-নারীতে দুস্তর ব্যবধানে বিভক্ত ছিল, বাংলার রেনেসাঁসের পাদপীঠ ঠাকুরবাড়ির বংশধর সত্যেন্দ্রনাথের আচরণে ও ভাবনায় তখনই অনেক নতুন চেতনা জেগেছিল। তাঁর মতে বাল্যবিবাহ যথার্থ বিবাহ নয়, বহু বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ, নারীর অবরোধ অসহ্য। কেননা নারীর আত্মরক্ষার শক্তি বাইরে বেরিয়েই অর্জন করতে হয়। নারীশিক্ষা ছাড়া সমাজ-প্রগতির অন্য কোনও পথ নেই। ভাগিনেয়ী সরলার চাকরি করাটা সম্ভ্রান্ত ঠাকুরবাড়ির দিক থেকে তাঁর অবমাননাকর মনে হয়নি। কেন না

নারীর জীবিকা নির্বাহের অধিকার তিনি স্বীকার করেন। বিধবাবিবাহ তিনি সমর্থন করেছেন। জাতিভেদ তাঁর কাছে নিন্দনীয় ঠেকেছে। একান্নবর্তী যৌথ পরিবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও উপকারী হলেও তিনি মনে করতেন, এই ব্যবস্থা অলস অকর্মণ্য পুরুষকে অকারণে পরনির্ভরশীল করে তোলে এবং তাতে অন্যের জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। যৌথ পরিবারের নামে স্ত্রীকে তাঁর শ্বশুরের আশ্রয়ে স্বামীর কর্মস্থল থেকে দূরে রাখাও তাঁর অন্যায় মনে হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিয়ের আগে বর-কনের পরস্পরের প্রতি প্রণয় সঞ্চার প্রয়োজন। তাহলে পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের বোঝাপড়ার অভাবের জন্য অন্য কাউকে দোষ দেওয়ার সুযোগ থাকে না। সে যা হোক, সত্যেন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা আজকের দিনের বিচারে অত্যন্ত সাধারণ মনে হলেও আমাদের ভুললে চলবে না এ সবের জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে পিতা দেবেন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতে হয়েছে। এ শুধু এক পরিবার-প্রধানের সঙ্গে বিরোধিতা নয়, এক বিদায়ী যুগের সঙ্গে অনাগত যুগের বিরোধিতা। দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতার মূল্য রবীন্দ্রনাথ বারবার শোধ করলেও এ বিষয়ে কবি নিজে নীরব—যদিও তাঁর পিতৃদেব বিষয়ে তিনি অজস্রবার লিখেছেন। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছায়ই ভাইপো বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী সাহানার আবার বিয়ের পথে রবীন্দ্রনাথ বাদ সেধেছেন, পরে যদিও নিজপুত্রের সঙ্গে বিধবা প্রতিমার বিয়ে দিয়েছেন। অনুমান করতে পারি, পিতৃচ্ছায়ায় গ্রামের কবি তাঁর প্রথম দুই কন্যার বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। মনে রাখা চাই এই বিয়ে দুটির বহু আগে ১৮৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমাজের উন্নত শ্রেণীতে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা 'হিন্দুবিবাহ' নামক প্রবন্ধে করেছিলেন। এই প্রবন্ধে সমাজের সব জায়গায় না হলেও পরিবর্তিত অবস্থায় যৌথপরিবার অচল বলেও তিনি তাঁর মত জানিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা যে সংকুচিত ছিল তাঁর পিতৃদেবের পিছুটানের জন্য তার আভাস তিনি কোথাও দেন নি। তাই মনে হয়, ডক্টর অমিতা ভট্টাচার্যের মতো লেখক-লেখিকা রবীন্দ্রনাথের পরিবার-পরিজন নিয়ে যতো আলোচনা করবেন, আমরা ততো বেশি লাভবান হব। এমনকি রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠেও তা আমাদের সাহায্য করবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে নিজের বিয়ের সময় সত্যেন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১৭ আর স্ত্রী জ্ঞানদার ৮। লুসি সম্পর্কে ওয়াডস্‌ওয়ার্থের কথা মনে রেখে বলতে পারি, সত্যেন্দ্রনাথ আট বছরের বালিকাবধূকে made a lady of his own।

বনোয়ারির মতো 'অমর শতকের কবিতাগুলা' সত্যেন্দ্রনাথের বিসর্জন দিতে হয় নি, ফুলতলির ফুলি অর্থাৎ ভবতারিণী বা মৃণালিনীকে বিয়ে করে রবীন্দ্রনাথকেও তা করতে হয় নি। অনুভূতির জগতে শুধু সমানধর্মা জ্ঞানদাকেই সত্যেন্দ্রনাথ পাননি। তিনি সাহেবসুবের দরবারে গেছেন স্বামী ছাড়া একা, বিলেতের পথে পাড়ি জমিয়েছেন ঠিক একইভাবে। চারদিকে ছি ছি রব উঠেছে। বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বেণী গাঙ্গুলির ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে ছোট ভাই জ্যোতির বিয়েতে সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তির কারণ ছিল, এখনও ভাইটির লেখাপড়া শেখা হয় নি, জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হন নি, মেয়েটিও খুব ছোট্ট। তাছাড়া অন্য কোনও কারণ ছিল না। তাঁর যুক্তি মেনে নিয়েও আমরা ভাবি, ভাগ্যিস এ বিয়ে হয়েছিল। নইলে কোথায় পেতাম মৃত্যুর আড়ালে স্থগিত গতি সেই অনন্তযৌবনা ও রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রেরণাস্বরূপ কাদম্বরী দেবীকে? স্বামীদের ইচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই জ্ঞানদা আর কাদম্বরীরাই সে যুগে নারী মুক্তির পথ কাটছিলেন। এমনকি বাইরে বেরোনোর মতো শাড়ি ব্লাউজ পরার ধরনটি পর্যন্ত জ্ঞানদাই সুদূর বোম্বাই শহরের পার্সী সমাজের মেয়েদের কাছ থেকে বাঙালিনীদের জন্য এনেছিলেন। প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. নিজে ও তাঁর গৃহিণী কেউই ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে নাম লেখান নি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভারতীয় ও বিশেষভাবে বাঙালি ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাচকে দেহচালনার ও স্বাস্থ্যলাভের উপযোগী মনে করতেন। স্বামী ও স্ত্রীর একসঙ্গে খেতে বসার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। আবার কর্মস্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার সময় পশ্চিমভারতীয় দেশী রীতি অনুযায়ী পানসুপুরির নিমন্ত্রণ রক্ষায় উৎসাহ বোধ করতেন। যুগোপযোগী পাশ্চাত্য আচার আচরণের সঙ্গে ভারতের ও বিশেষভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদের সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছিলেন। এরকম অনেক মূল্যবান সংবাদে ও বিশ্লেষণে আমাদের আলোচ্য বইটি ভরপুর।

'সমস্যা পূরণ' গল্পে অছিমদ্দি, 'হালদার গোষ্ঠী'তে মধু কৈবর্ত, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে পঞ্চুর মতো রায়তদের কথার লেখক রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের 'অর্থনৈতিক চিন্তা' শিরোনামে লেখিকা বিশেষভাবে এই আই. সি. এস. মনীষীর 'বোম্বাই রায়ত' প্রবন্ধটির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে রায়তদরদী মনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ ব্যবস্থা মনে হয়েছে। মহারাষ্ট্রে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত সাহুকারদের অত্যাচারের

প্রশ্রয়দাতা বলে তিনি রায় দিয়েছেন। চাষ আবাদে সক্ষম ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁর জমি একটু বেশি আছে যাতে চাষ আবাদ লাভজনক হতে পারে, দেনার দায়ে ও লোভে পড়ে জমি যিনি বেচে দেবেন না—এমন কৃষকের জমির মালিকানা থাকা উচিত। এই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের মত। কৃষকের দারিদ্র্য দূর না হলে জমির মালিকানা কিভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে, তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র থেকে আরম্ভ ক রে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত মনীষীদের রায়ত চিন্তা সম্পর্কে নতুন করে ভাববার অবকাশ আছে।

এছাড়া আমরা সত্যেন্দ্রনাথের ধর্মবোধ, অর্থনীতি ও রাজনীতি চিন্তা, স্বদেশ ও ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে যে-সব বিশ্লেষণ পেয়েছি, সে-সব লেখিকার বহুমুখী জিজ্ঞাসু মনের আলোয় দীপ্ত। সত্যেন্দ্রনাথের ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও সকল ধর্মের প্রতি উদারতা। সেই ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে রামকৃষ্ণের 'যত মত, তত পথ' এই মহাবাক্যের কোনও বিরোধ ছিল না। তিনি রামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁর পিতার প্রভাবে হাফেজের মতো পারস্যের সাধকদের অনুভূতিতেও তিনি আপ্লুত হয়েছেন। তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীতের তালিকাসহ এসবের অন্তর্লীন অনুভূতিলোকের পরিচয় লেখিকা শ্রদ্ধাভরে দিয়েছেন। তাঁর বদলির চাকরি-জীবনে যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানকার সামাজিক জীবনে নিজে আসন পেতে মানুষের ধর্মবোধকে সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর ছিল জলন্ত উৎসাহ। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে সমূলে উৎপাটিত করে ব্রহ্মে বা শূন্যে বিলীন হওয়ায় যে-মুক্তির ধারণা, তা দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ, তাতে তিনি আস্থাহীন। বৌদ্ধধর্মের আলোচনায়ও তাঁর রচনায় দেখছি, নির্বাণ ভাবনায় তিনি আকৃষ্ট হন নি। কিন্তু এসব কথায় পরে আসছি। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধারণায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাংলার ব্রাহ্মসমাজও মহারাষ্ট্রের প্রার্থনা সমাজের মধ্যে যোগ স্থাপনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাঁর অনুসরণে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ও উত্তরভারতের আর্য সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ শুধু হিন্দু একেশ্বরবাদীদের মিলনক্ষেত্র হবে না, এমনকি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হবে না—এ হবে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান যাবতীয় ধর্মবিশ্বাসী একেশ্বরবাদীদের একটি মিলনের অন্তঃপুর। এই ভাবনাই ছিল রামমোহনের ভাবনা। এভাবে তিনি ভারতবর্ষে জাতীয়

সংহতির ক্ষেত্র কর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। লেখিকার বইটি পড়ে মনে হয়েছে, রামমোহনের এই মূল ভাবনার শরিক সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন। নইলে যেখানেই তিনি কর্মসূত্রে থাকতেন, সেখানকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মেলামেশায়, আলাপ-আলোচনায়, নানা সাধকের ইতিহাস সন্ধানে কখনোই এভাবে আত্মনিয়োগ করতেন না। এই প্রেরণায়ই তিনি মহারাষ্ট্রের জাতীয় সাধক কবি তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গমালার বাংলা অনুবাদ বাঙালীকে উপহার দিয়েছেন। সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ জেলায় তিনি যখন জজ ছিলেন, তখন সন্ধ্যায় সিন্ধুনদীতে নৌভ্রমণে এক শিখ যুবক এই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গী হতেন। তাঁর কণ্ঠের শিখ-ভজনের সুর মিশে যেত সিন্ধুর কলধ্বনির সঙ্গে। সেই ভজনের প্রারম্ভিক চরণটি ছিল: 'গগনমেঁ থাল রবিচন্দ দীপক বনে।' আকাশের থালায় চন্দ্রসূর্যকে বার বার দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত বোধ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাত্ররা কে না জানেন যে আকাশ থালার চিত্রকল্প এই শিখভজনের মতো তাঁর সাহিত্যে পুনরাবৃত্ত? এই গান কবিরও প্রিয়। আমরা শুধু 'পূরবী'র কবিতা থেকেই এই আকাশ-থালার চিত্রকল্পের দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: 'এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায় / নক্ষত্রের মাঝে'—'অন্ধকার' / 'নীলকান্ত আকাশের থালা / তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা'—'পঁচিশে বৈশাখ'। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, আচার-বিচার সর্বস্বতা যা-কিছু আমাদের জাতীয় জীবনকে ধর্মের নামে স্থবির করেছে, সব কিছুর ওপর সত্যেন্দ্রনাথ খড়্গহস্ত ছিলেন, লেখিকার আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হিন্দুমেলার জন্য 'মিলে সবে ভারত সন্তান' জাতীয় সংগীতও তিনিই লিখেছিলেন। তবে ব্রিটিশশাসনমুক্ত ভারতের কল্পনা তাঁর মনে ছিল না। সম্পূর্ণ ব্রিটিশবিরোধী সঞ্জীবনী সভার সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা শোনা যায়নি। গভীর দেশপ্রেমের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক মূল্যবোধের সমন্বয় ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। ব্রিটিশের সদিচ্ছায় আস্থা থাকা সত্ত্বেও রাজশক্তির অন্যায় অবিচার তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। রাজনীতিতে 'মডারেট' সত্যেন্দ্রনাথের আবেদন নিবেদনে আস্থা ছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিন্তা মেলে না। আবার মেলে এমন চিন্তার ক্ষেত্রও আছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁরও ছিল দেশের সকল মানুষের সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বে ভরসা। তা একমাত্র আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন, রাজস্ব আইন সংশোধন। রেলপথ ও জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন,

এগুলিকে তিনি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কার্যকরী উপায় বলে বিশ্বাস করতেন। আর দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসার ও ইংরেজির বদলে মাতৃভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত ও ইংরেজি শিক্ষা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতে ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী এক শোচনীয় দেশবিভাগ রদের চিন্তা সেকালের বিখ্যাত অনেক মনীষীর মতো তাঁর মনেও ছিল। নিজের পুত্রকন্যাদের সিমলার সাহেবি স্কুলে ভর্তি করিয়েও শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্সে ও লরেটোতে নিয়ে আসেন এবং এখানে হোস্টেলে না রেখে বাড়িতে রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। কেননা তাতে তাঁর মনে হয়েছিল পুত্রকন্যা যেমন ইংরেজি ভালো শিখবেন, বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপিত হবে। ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের দিকে তাকালে বলতেই হয় যে পিতার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। এই সূত্রে মনে রাখতে হবে, পরাধীন ভারতে আধুনিক শিক্ষায় ইংরেজির স্থান অনেক বেশি এমনিতেই ছিল। তাই সাহেবি স্কুলে পড়িয়ে ও নিজের বাড়িতে রেখে, যে-সমন্বয় সাধন তিনি চেয়েছিলেন, তার মধ্যে আদর্শ ও বাস্তবের মেলবন্ধন ছিল।

ঠাকুর বাড়ির তিন ভাইয়ের রাজনৈতিক চিন্তায় কম বেশি পার্থক্য থাকলেও মনুষ্যত্বের অবমাননায় বিদেশী শাসননীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে কারোরই সাহসিকতার অভাব হয় নি বলে নানা দৃষ্টান্ত সহযোগে লেখিকা 'সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা' অধ্যায়ে ছেদ টেনেছেন। এই ছিল এ বাড়ির চরিত্র। রবীন্দ্রবিদূষণ ব্যবসায়ীদের এই চারিত্র্য বিষয়ে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আর নিজেদের চারিত্রের শোচনীয় অভাব এখানে নাইবা কথা তুললাম।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদকর্মের উপর আলোচনায় লেখিকার কৃতিত্ব যথার্থই প্রশংসনীয়। সত্যেন্দ্রনাথকৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ সম্পৃক্ত আলোচনায় বাংলার একাল পর্যন্ত মেঘদূত চর্চা ও অনুবাদের প্রেক্ষাপটে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান তিনি নির্দেশ করেছেন, এমনকি উইলসনের ইংরেজি অনুবাদের নমুনাও তিনি পাদটীকায় দিয়েছেন। মেঘদূত বা গীতার পদ্যানুবাদ, শেক্সপীয়রের সিম্বেলিনের অনুবাদ 'সুশীলা-বীরসিংহ' বা 'হ্যামলেট'-এর আংশিক অনুবাদ 'রাজার আত্মগ্লানি' (তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য) হ্যামলেটের কাকা ক্লডিয়াসের বিবেকদষ্ট অন্তরের পরিচয়বহ নাট্যাংশের অনুবাদ 'ঈশ্বরের উপাসনা', সত্যেন্দ্র-নাথের নির্বাচিত দেশবিদেশের সাহিত্যিক রত্নে গ্রথিত 'নবরত্নমালা' বা তুকা-

রামের রচনা থেকে অনূদিত 'অংশমালা' যার আলোচনাই হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল সৃষ্টি সামনে রেখে বাংলা রূপান্তরের দোষগুণ বিচারে ও অন্য অনুবাদকদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে মেঘদূত অনুবাদের আলোচনায় এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'গচ্ছন্তীনাং এণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তম্'-রমর অনুবাদে 'যোষিৎ' স্থলে 'রমণী' প্রয়োগে 'ভাবগত অর্থের হানি হয় নি'। আমরা এ বিষয়ে লেখিকার সঙ্গে একমত। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূত অনুবাদের আরম্ভে এবং শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের 'মেঘদূত পরিচয়' বইটির ভূমিকায় ব্যক্ত বিপরীত ধারণা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের মতে সংস্কৃত ভাষায় একই শব্দের এত অজস্র প্রতিশব্দ দুর্বলতার কারণ। পার্বতীচরণ সংস্কৃত অভিধানের স্ত্রী-বাচক প্রতিটি শব্দের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের অন্ধ বা প্রায়ান্ধ চোখে আলো জেলে দেখিয়ে দিয়েছেন। কালিদাস মেঘদূতের নানা শ্লোকে এই পার্থক্য কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তা শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝিয়েছেন। লেখিকা বলেছেন, স্ত্রী-বাচক যেখানে যে-শব্দ মূল মেঘদূতে আছে সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদে তা যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখেছেন। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মতো সব প্রতিশব্দ তাঁর হৃদয়ে এক মনে হয় নি। পার্বতীচরণের ব্যাখ্যাত সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ সত্যেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশের ধ্রুপদী সংস্কৃত, বিদেশের ইংরেজি, পারসী ইত্যাদি ভাষা থেকে অবিস্মরণীয় সকুক্তি ও মধুরবচনরাজি রেছে নিয়ে বাংলায় 'নবরত্নমালা' নামে অনুবাদ করেন। তার মধ্যে কিছু অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথেরও। রবীন্দ্রনাথের 'মালতীপুঁথি' ও পরবর্তীকালে পুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'রূপান্তর' এই দু'টিতে কবির যে-অনুবাদগুলি পাচ্ছি, এদের সঙ্গে 'নবরত্নমালা'য় স্থানপ্রাপ্ত রূপের পাঠভেদ বিষয়েও লেখিকা আলোচনা করেছেন। তাছাড়া শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের একটি পুরোনো প্রবন্ধের সাহায্যে এদের মধ্যে ঠিক কোন্‌গুলি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ, তাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন। এখানে সংকলিত যাবতীয় অনূদিত শ্লোকের মূল উৎস নির্দেশে তাঁর আদর্শ গবেষণার পরিচয় পাই। এইসব শ্লোকের প্রারম্ভিক পদের তালিকা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, সত্যেন্দ্রনাথের নির্বাচনে দেশবিদেশের বাক্যের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর কী এক বিস্ময়কর সর্বতোভদ্র সহিষ্ণু মনের মতো সুস্পষ্ট! ভাবছিলাম, এই অনুবাদ সম্পদ 'নবরত্নমালা' একালের কোনও

প্রকাশক যদি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে আমাদের হাতে তুলে দিতেন, তাহলে একটি কাজের কাজ হত। এখানে উপনিষদ্ গীতা থেকে চাণক্যশ্লোক, গ্যয়টের শকুন্তলা প্রশস্তি থেকে হাতেম তাইয়ের প্রিয় ঘোড়া দুলদুলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর মধ্যেকার অতিথি-সৎকারের জন্য ত্যাগব্রত সবই 'নবরত্নমালা'য় স্থান পেয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের মতোই পারস্য সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। 'নবরত্নমালা'র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত একটি নবরত্নের অঙ্গুরীয়ের তাৎপর্য লেখিকা তাঁর নিজের শিল্পবোধের আলোয় ব্যাখ্যা ক'রে লিখেছেন, এ যেন নীলসাগর থেকে আহরণ করা বিবিধ রত্নের একটি অঙ্গুরীয় যা ধারণে অর্থাৎ অনুসরণে মানুষের জীবনবন্দিত ও সুশোভিত হতে পারে'। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে বিশ্বমানব-মনের নীলসাগর এবং তা থেকে আহৃত নানা জাতের রত্নে সৃষ্ট হয়েছে এক দুর্লভ অঙ্গুরীয় এবং তা ধারণে গ্রহ শান্তি হয় না, প্রাণ ও মন সমৃদ্ধ হয়। গ্রন্থের মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি যেভাবে অংশত বা সম্পূর্ণত লেখিকা তুলে দিয়ে তাঁর তালিকা সাজিয়েছেন, তাতে আর একটি কথা মনে জেগেছে। রবীন্দ্ররচনাবলীতে নানাপ্রসঙ্গে যে সব সংস্কৃত উদ্ধৃতি আছে, তার বেশ কয়টি এই তালিকায় আমরা পেয়ে যাই। তাই 'নবরত্নমালা'র পুনর্মুদ্রণ রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাত্রদের জন্যও প্রয়োজন।

সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহ দ্বারকানাথের মতো যেমন শ্রদ্ধাবান্, তেমনি তাঁদের বহু ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ভট্ট নারায়ণের কথাও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতেন। এই বাঙালি সংস্কৃত কবি তাঁর 'বেণীসংহার' নাটকে দৈবাহত অথচ পৌরুষদীপ্ত কর্ণের মুখে পুরুষকার দিয়ে ভাগ্য খণ্ডনের মৃত্যুঞ্জয় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই উৎসাহ দূরের কথা, আমাদের এমনই করুণ অবস্থা যে আমরা উৎসাহের 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি'। আমাদের পূর্বপুরুষগণের স্মিতমুখ, ভূয়োদর্শী দু'টি চোখ, প্রত্যয় দৃঢ়কণ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ স্বভাব, সৌন্দর্যের অনুভূতি, ব্যবহারিক জীবনবোধ—যেখানে যা প্রকাশ পেয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথ সেখান থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁর 'নবরত্নমালা' গেঁথেছেন। আর ফাঁকে ফাঁকে প্রথিত হয়েছে বিদেশী রত্ন।

সত্যেন্দ্রনাথের দু'একটি স্মৃতিকথা ছাড়া তাঁর কোনও অনুবাদকর্ম বা মৌলিক রচনার সঙ্গে বর্তমান সমালোচকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই। একথা কবুল করার পর বলছি, প্রয়াতা অমিতা ভট্টাচার্যের বইটি প'ড়ে মনে হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের সারস্বতকীর্তির মধ্যে উজ্জ্বলতম তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ। বৌদ্ধধর্ম

শুধু নির্বাণ আর শূন্যবাদ আশ্রয় করে বিকশিত হয়নি। দুঃখের অনলে প্রজ্বলিত থাকা সত্ত্বেও এই মানব সংসারে আরও একটু ভালোভাবে বাঁচার পথ এই ধর্মে দেখানো হয়েছে। এজন্যই রামমোহন, রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, রামদাস সেন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দরের মতো একালের অনেক মনীষী বুদ্ধদেবের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবান্। আবার পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে রিস্ ডেভিড্‌স্, এড্‌ুইন আর্‌নল্ড প্রমুখ বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁর চিন্তাভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেশবিদেশের অনেকের এবিষয়ে মনোনিবেশের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যয়ন ও রচনার তুলনামূলক আলোচনা এই গ্রন্থে আমরা পেয়ে যাই। বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনার সারকথা সত্যেন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় লেখিকা আমাদের শুনিয়েছেন: 'মনে করুন তাড়িতশক্তির ন্যায় কর্মবল বলিয়া একটি শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত হইতেছে।' কর্মই একমাত্র যোগসূত্র। বৌদ্ধদর্শনে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকৃত। পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জীবন ও বিয়োগের মৃত্যু। কর্মবলের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের প্রদত্ত তাড়িতশক্তির উপমা নানাদিক্ থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কর্মই বৌদ্ধদর্শনমতে মানুষের জন্ম ও জন্মান্তরের একমাত্র নিয়ন্ত্রী শক্তি। অষ্টাঙ্গিক মার্গের একটি সম্যক কর্মের মার্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ ধরে চললে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা দূর হয় এবং নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের নির্বাণ লাভ করতে হয়, তা হলে তাঁর নিজেরই লাভ করতে হবে। একমাত্র নিজের উদ্যমে ও সাধনায় এই মুক্তিলাভ সম্ভব, মুক্তি কারও আশীর্বাদে লভ্য নয়; গুরুর কৃপায় অপ্রাপ্য। গুরু বড়জোর পথটি দেখাতে পারেন, কিন্তু সেই পথে চলতে ও লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে একা সেই মুক্তি-কামীকেই। বৌদ্ধধর্মের এই মূল সংবৃত সত্য সত্যেন্দ্রনাথ এভাবে বিবৃত করেছেন ব'লে লেখিকা আমাদের জানিয়েছেন। 'বৌদ্ধ আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন যষ্টি'—লেখিকার উদ্ধৃত সত্যেন্দ্রনাথের এই বাক্যটিতে আসলে শুনি বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্বে শোকাকুল শিষ্য আনন্দর উদ্দেশে এই মহাপুরুষের উপদেশের প্রতিধ্বনি।

লেখিকা এই গবেষণার জন্য কি করেন নি? জীবনী অংশে আরম্ভে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন, আই. সি. এস. পড়তে যাওয়ার কথা, বন্ধু মনোমোহন ঘোষের প্রসঙ্গ থেকে তাঁর কর্মজীবনের যাবতীয় রেকর্ড্‌স্ দেখার জন্য কর্মস্থলগুলির প্রায় সব ক'টিতে লেখিকা তথ্য অনুসন্ধান করেছেন। আবার সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অবসর জীবনে যে-এগারো বছর বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের সঙ্গে সভাপতি হিসেবে বা অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই সময়কার পরিষদের কার্যবিবরণী তিনি দেখেছেন। তাতেই বাংলাভাষা, গন্তরীতি, ব্যাকরণ বিষয়ে এই মনীষীর কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা ও রচনার সন্ধান তিনি পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির সেই বিখ্যাত 'পারিবারিক খাতা'র সকলের সব লেখা তিনি পড়েছেন। এই সেই 'পারিবারিক খাতা' যা থেকে অঙ্কুরিত হলো পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের অনন্য বই রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত। এই 'পারিবারিক খাতা'তেও সত্যেন্দ্রনাথ যৌথ পরিবারের কুফল সম্পর্কে লিখেছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাইরে পৃথগন্নে কার্যতঃ ১৮৮১ থেকেই কাটিয়েছেন কলকাতা শহরে। এই ব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয় তাঁর পুত্রকন্যাদের লরেটো ও সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ানোর বাস্তব সুবিধার খাতিরে। তা সত্ত্বেও পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। আমরা জানি, কলকাতা শহরে সত্যেন্দ্রনাথ যে-সব বাড়িতে কাটিয়েছেন, এগুলি তাঁর ভাইদের প্রাণে মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিত এবং সাহিত্য সংগীত তাতে নিত্যগুঞ্জরিত হতো। আবার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই পুত্রের সম্পর্কের কিছুমাত্র প্রত্যয় হয় নি। এই বই পড়তে পড়তে এমন তথ্য পেয়ে যাই যাতে স্বর্ভোঠাকুর বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথের যে-কুৎসা রটিয়ে মৃত্যুর পূর্বে শেষ মুহূর্তে জলে উঠেছিলেন, তাও খণ্ডন করা যেতো। হেমেন্দ্রনাথের বংশধরদের উইল সম্পর্কে অসন্তোষের নিরসন ঘটেছিল। এই মর্মে জ্যেঠা-মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা হিতেন্দ্রনাথের চিঠির প্রতিলিপি বইটিতে ছাপানো রয়েছে।

পরিবার পরিজনের মধ্যে, বাস্তব সান্নিধ্যে, কৌতুকাবহ ছদ্মবেশধারণে, সংস্কৃত-ইংরেজি-বাংলা বিশেষভাবে রবীন্দ্রকবিতার অনাটকীয় আবৃত্তিতে আর সর্বোপরি স্নেহে প্রেমে প্রীতিতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানারূপ যেভাবে ডক্টর অমিতা ভট্টাচার্যের এই বৃহৎ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, তাতে গবেষণার আড়ালে তাঁর সাহিত্যিক লিপিকুশলতায় আমরা আনন্দিত। সেই আনন্দের মধ্যে এই দুঃখ থেকেই যাচ্ছে যে এই অকালপ্রয়াতা লেখিকাকে আমাদের আনন্দ জানানোর উপায় আজ আর নেই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সৃষ্টি। ডঃ অমিতা ভট্টাচার্য। গোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। ১০০ টাকা।

অমিয়ভূষণ ঃ বন্দীত্বের স্বরূপ সন্ধানে

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

"মানুষ নিজের মধ্যেই অবরুদ্ধ; যে-সব দেয়াল তাকে ঘিরে থাকে তা থেকে সে মুক্তও হয় না, সে যে অবরুদ্ধ সেই বোধও তাকে মুক্তি দেয় না। এইসব দেয়াল মিলে একটি বন্দীশালা তৈরি করে, একটি একক ক্রিয়া হয়ে ওঠে। তাঁর প্রত্যেকটি আত্মপ্রকাশই রূপান্তরিত হয়, রূপান্তরিত হয়েই চলে, এবং তাঁর রূপান্তরের অভিঘাত পড়ে অন্য সকলের উপরে।" ষাট দশকের গোড়ায় প্রকাশিত 'দ্য প্রবলেম অব মেথড' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে জাঁ-পল সার্ত্রের এই মন্তব্যটি থেকেই আমরা চিনে নিতে পারি যুদ্ধোত্তর আধুনিক পৃথিবীর ব্যক্তি-মানুষের সংকটকে। আবার বন্দীদশার মধ্যে থেকেও নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কারের এই প্রবণতাই আমরা দেখেছি সার্ত্রের গল্প উপন্যাস অথবা নাটকে। মানুষ একদিকে যেমন অবরুদ্ধ নিজের অজ্ঞান অবচেতনের কাছে, তাঁর সামনে উপস্থিত প্রতিটি পরিস্থিতির ফাঁদেও একইভাবে আটকা পড়েছে সে। আবার যুদ্ধ-পরবর্তী ইয়োরোপের বুর্জোয়া সমাজের তীব্র অমানবিক কাজকর্মও মানুষকে প্রতিমুহূর্তে ঠেলে দিচ্ছে দুর্জয় একাকীত্বের দিকে। সার্ত্র তাঁর সমস্ত জীবন ধরে অনুভব করেছেন এই বন্দীত্বের যন্ত্রনাকে, এবং সেই কারণেই হয়তো বুর্জোয়া এলিটিজমকে অতিক্রম করে বারেবারেই মিলতে চেয়েছেন ফ্রান্সের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই বন্দীত্বের অনুভবটি আরো অনেক জটিল। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক অপশাসনের ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রজন্মের মানুষের যোগাযোগটি ক্রমে ক্ষীণ। অথচ নতুন কোনো ঐতিহ্যকে গড়ে তোলাও সম্ভব হয়নি। ফলে জন্মকাল থেকেই ভারতবর্ষের একজন শিশু রূপকথার পরিবর্তে কমিক স্ট্রিপে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মননশীল সাহিত্যের বদলে অভ্যস্ত হয় প্রাতিষ্ঠানিক থ্রিলার-সাহিত্যে, অথবা মার্গ-সঙ্গীতের পরিবর্তে মার্কিনী পপ-সঙ্গীতে। পাশাপাশি চলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের যুগপৎ নগ্ন

আক্রমণ। পাঁচতারা হোটেলের তলায় গজিয়ে ওঠে ঝুপড়ি, আবার বিপ্লবী ভাইকে আশ্রয়দানের অভিযোগে পুলিশের লাথিতে গর্ভপাত হয়ে যায় যুবতী নারীর। এই প্রক্রিয়ায়, একবিংশ শতাব্দীর দেড়-দশক আগে, সমস্ত দুনিয়াটাই পরিবর্তিত হয়েছে একটি চলমান, গতিশীল বন্দীশালায়।

এই সামগ্রিক বন্দীত্বের স্বরূপটিকে সাহিত্যের আওতায় নিয়ে আসার কাজটি যে বেশ জটিল, সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখকের সামনে সমস্যাটি তখন থাকে দুভাবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন মানুষ তিনি, এবং যেহেতু তিনি নিজেও এই বন্দীশালার বাইরে নন, ফলত এই পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে তার আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি তার নিজস্ব শ্রেণীর প্রতি নিছকই সহানুভূতিসূচক হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে অবরুদ্ধতাকে যুক্তির সাহায্যে প্রশংসনীয় করে তোলা সম্ভব। এর থেকে ক্ষতিকর সম্ভবত আর কিছুই নেই। অন্যদিকে যে দেয়ালগুলি সবসময় ঘিরে থাকে আমাদের, পাঠককে তা চিনিয়ে দেয়াই লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্ধকারকে জয়ের জন্য সবচেয়ে প্রথমে তাকে ভালভাবে বোঝার দরকার আছে। নতুবা আত্মপ্রকাশের রূপান্তর ও অন্যের ওপর তাঁর অভিঘাতের স্বরূপটি অস্পষ্ট থেকে যাবে। অর্থাৎ বন্দীশালোর দেয়ালগুলি যে কিছুঅংশে মানুষ নিজেই, সার্ত্রের ভাষার 'অপর মানুষই নরক'—এই সত্যটি পাঠকদের সামনে অজানা রয়ে যেতে পারে। এই রহস্যময় আলো-আঁধারে সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য লেখকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তথা আঙ্গিকের প্রয়োজন আছে।

এই দুধরণের সমস্যার মোকাবিলার জন্য জরুরী উপাদান হচ্ছে নির্মোহ ভঙ্গি ও নতুনতর ভাষা। প্রথমটির কারণে লেখক তাঁর শ্রেণীকে অতিক্রমে সক্ষম, দ্বিতীয়টির সাহায্যে সামাজিক পরিবেশের জটিলতা থেকে সত্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদা এমনই এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব, যিনি দীর্ঘ জীবন ধরে অসাধারণ শ্রম-নিষ্ঠায় এই কাজটি করে চলেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অমিয়ভূষণের গল্প-গ্রন্থের আলোচনায় এই দীর্ঘ ভূমিকার কী প্রয়োজন ছিল? এই আলোচনার সাহায্যে অমিয়ভূষণের ছোটগল্পের মূল প্রেক্ষিতটিকে খুঁজে নেয়া যায়। এই প্রেক্ষিত ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থটি, অর্থাৎ অমিয়ভূষণের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটিকে বোঝার কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই সংকলনে গল্প আছে মোট দশটি, যার সবকটিই ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। এই অভিযোগ অনেকেই তুলতে পারেন, সংকলনটিতে বাদ

গেছে এমন অনেক পরিচিত গল্প, যেগুলি অনায়াসেই এখানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। কিন্তু অমিয়ভূষণ এখনো জীবিত, এবং গল্প-নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত। বেশ বোঝা যায়, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি সংকলনটি সাজিয়েছেন। ওপরের আলোচনাটি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে অনেকটাই সাহায্য করবে।

বছর পাঁচেক আগেও সাধারণ পাঠকসমাজে অমিয়ভূষণ নামটি ছিল অপরিচিত। যদিও ইতিমধ্যেই তাঁর সাতটি উপন্যাস ও দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কোনদিনই তিনি প্রতিষ্ঠানের নাচ-মহলে আশ্রয় চাননি, অথচ গত একবছরে পরপর দুটি পুরস্কার তাঁকে পরিচিত করেছে বৃহত্তর পাঠকদের কাছে। কিন্তু এইভাবে কলকাতা থেকে বহুদূরে, সুদূর উত্তরবঙ্গে বসে নিঃসঙ্গ এই সাহিত্য-সাধনার জোর তিনি কোথায় পেলেন, তা ভাবতেও অবাক হতে হয়। 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনের গল্পগুলি ১৯৪৭ থেকে ৮১-র মধ্যে লেখা। মোটামুটিভাবে, তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরুতে এখানিকার শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে ঘটে গিয়েছিল আমূল পরিবর্তন। তথাকথিত নান্দনিক সৌন্দর্যবোধের বদলে লেখার শরীরের সঙ্গে যুক্ত হল সামাজিক বাস্তবতা। দেশবিভাগ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ঘটনা নাড়িয়ে দিয়ে গেল শিল্পের ভিত্তিভূমি। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে এই বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশের শুরু রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রে এই বদলটা ঘটেছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়ায়। অন্যান্য লেখকদের ক্ষেত্রে পরিবেশের তীব্র পরিবর্তন প্রভাবিত করল গল্পের চরিত্রদের। কিন্তু অমিয়ভূষণের গল্পের চরিত্ররা যেন ব্যক্তির সীমানায় যাচাই করতে চায় বহুমাত্রিক সমাজকে, তার পরিবর্তনকে। এবং এই অনুভূতির পরিণতিতেই তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে বন্দীত্বের ধাতব-শিকল। শুধুমাত্র এই কারণেই সমসাময়িক গল্পকারদের থেকে অমিয়ভূষণ স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ।

আলোচ্য সংকলনটি থেকে আমরা এই অমিয়ভূষণকেই চিনে নিতে পারি, যাতে তিনি ধরতে চাইছেন অবক্ষয়ী নাগরিকতাকে। লতার মতো পায়ে পায়ে পরিণত হয় মানুষ, সম্পর্ক গড়ে তোলে, আঠালো সেই সম্পর্ক দুটি জোড়বদ্ধ মানুষকে নিয়ে গড়িয়ে চলে অজানা শূন্যের দিকে। 'এপস এণ্ড পিকক', 'শ্রীলতার দ্বীপ', 'উরুণ্ডী', 'মামকাঃ' গল্পগুলি এই ধারার। প্রাথমিক ভাবে মনে হতে পারে যে গল্পগুলি কিছুটা কৃত্রিম, আড়ষ্ট। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, অমিয়ভূষণ ঘটনার বিবরণ বা চরিত্রদের আচরণের কাহিনী

শোনাচ্ছেন না, বরং তাদের কাজকর্ম বা আচরণের পদ্ধতির ওপরই বেশি জোর দিচ্ছেন। অর্থাৎ পাঠকের সামনে সামাজিক দুর্দশা প্রকাশ করা অর্থহীন; তারা এই সমাজেরই অধিবাসী, বরং তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক দেয়ালটিকেই চিনিয়ে দিতে অনেক বেশি আগ্রহী লেখক। ঐ দেয়াল সত্যের খণ্ড-অংশ, তা না ভাঙলে পরিপূর্ণ সত্যের দেখা পাওয়া যাবে না। 'এপস এণ্ড পিকক' গল্পে সৌম্য ও শমিতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেখক তাকে চিনিয়ে দেন :

> "চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল সৌম্য। শমিতা সিদ্ধান্ত করলে ওর মুখের দিকে না চাওয়াই ভালো। ও যা বলবে তা বলুক। কথাটাকে ঘুরিয়ে দেয়া উচিত হবে না।—তা যদি বিটলদের কথাই হয়। কিংবা সৌম্য কি বিটল কথাটা ইচ্ছে করেই পরিবর্তে ব্যবহার করছে। অথবা হয়তো ও দুটো ব্যাপারই সৌম্যর চোখে এক। কিন্তু একটা গলার কাছে অনুভব করল শমিতা। সেটাকে গিলে ফেলাই ভালো; কিন্তু তা যদি কান্না হয়? না না। আরও ক্লেদাক্ত হয় না তা হলে।
>
> চা খেলো সৌম্য, সিগারেট ধরালো। হাতের তেলো দুটো একটার গায়ে অন্যটা লাগিয়ে ম্যাটিং-এর দিকে চেয়ে রইল। শমিতা বলল— "আচ্ছা, কোন একটা কথা কি, বলছিলাম—" হঠাৎ যেন একটা অপরিসীম ব্যথার ছাপ পড়ল সৌম্যর মুখে। আর শমিতা বরং খবরের কাগজ দিয়ে মুখ আড়াল করল।"

কিন্তু এই আড়ালটিও রাখা সম্ভব হয় 'মামকাঃ' গল্পে। এককালের বন্ধু, ছাত্রনেতা, বর্তমানে পুলিশের গুলিতে আহত সুপর্ণ ভাগ্যচক্রে এসে পড়ে পৃথা ও পান্নার নিস্তরঙ্গ পরিবারে। একদিকে পুলিশের ভয়, অন্যদিকে বন্ধুর জীবন— এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তারা ক্ষতবিক্ষত। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার পান্না অভিমত দেয় : সুপর্ণর জীবন বাঁচতে পারে একমাত্র অপারেশন করলে। কিন্তু পুলিশ তো তখন খবর পাবেই। আবার বাড়িতে রাখার অর্থ বাল্যবন্ধুর মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখা। এই দ্বন্দ্বের সামনে পৃথা ও পান্নাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে লেখক গল্প শেষ করেন। কোনো সমাধান নেই, সম্ভবও নয় তা'—শুধু নিশ্ছিদ্র দেয়ালকে সর্বশরীর দিয়ে অনুভব করি আমরা।

অমিয়ভূষণ প্রকৃতপক্ষে, কোনো নিটোল গল্প বলতে চান না। কোনো একটা বিষয়কে আবছাভাবে দাঁড় করিয়ে, তিনি পাঠককে শোনাতে চান

নিজের কথাটুকুই। হয়তো স্বশ্রেণীর প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতেই এই কৌশল, যেখানে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে চরিত্রগুলিকে দেখা যায়। আবার হয়তো এই কারণেই তিনি বেশি জোর দেন চরিত্রদের চিন্তা পদ্ধতির ওপর, তাদের আচরণের তুলনায়। সব মিলিয়ে, বাস্তব জীবনের বিপরীতে সমান্তরাল আর একটি জীবনের ছবি ফুটে ওঠে অমিয়ভূষণের লেখা। এ-কোনো স্বপ্নের জীবন নয়, বরং সম্ভাবনায় কুঁড়ি হয়ে যা ফোটার প্রতীক্ষায়, কখনো কখনো যাকে আমরা অনুভব করি, এ-যেন তাঁরই মহৎ প্রতিচ্ছবি। তখন গল্প আর শুধু গল্প থাকে না, হয়ে ওঠে চেতনার অন্তর্নিহিত ভাস্কর্য।

এই নাগরিক কথকতার বাইরে আরো একধরণের লেখাকে সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে। এই গল্পগুলির চরিত্ররা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে একেবারেই অচেনা। পূর্বকথিত অবক্ষয়ী নাগরিকতার বহিঃপ্রকাশ যে গল্পগুলিতে, সেখানে অমিয়ভূষণ যেন ব্যক্তির আয়নার প্রতিফলনে বুঝে নিতে চান সামাজিক অবস্থাকে। ব্যক্তি সেখানে শেষপর্যন্ত অভিন্ন হয়ে ওঠে সমষ্টির সঙ্গে। এর বিপরীতে, তিনি অন্যধরণের গল্পগুলিতে সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে খুঁজে নিতে চান ব্যক্তির অন্ধকারময় মুহূর্তগুলিকে। বা বলা যায়, তিনি যেন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে দিয়ে অতিক্রমরত ব্যক্তির ছবিটিকেই ধরতে চান গল্পের পরিসরে। 'তাঁতী বউ', 'দুলারহিন্‌দের উপকথা', 'অ্যাভলনের সরাই', 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পগুলি দ্বিতীয় ধারার আওতায় পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই, আঙ্গিকের বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় দেয়ালের স্বরূপটিও। অবরুদ্ধতা সেখানে আরো আদিম, বিস্তৃত তার রূপ। 'দুলারহিন্‌দের উপকথা' গল্পে ভুখনের সঙ্গে দুলারহিনের সম্পর্ক ছিল শৈশব থেকে। পরস্পরকে তারা অভ্যস্ত হয়েছে ভাই-বোন হিশেবে ভাবতে। কিন্তু তাদের সম্পর্কের রহস্যময়তা দুজনকেই ক্ষতবিক্ষত করে, যেন একটি আরোপিত সম্পর্কের বেড়াজালে বন্দী তাঁরা। পরে ভুখনের বিয়ের জন্য অর্থসংগ্রহে পথে নামে দুলারহিন্। অচেনা লোকের হাতে ধর্ষিত হয়, অবশেষে মান-সম্মান হারিয়ে একজনকে বিবাহ করে। দীর্ঘদিন কেটে যায়, ভুখনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ঘটে না।

> 'এখন দুলারহিন্ আর চট করে যেতে পারে না কোথাও। মাটিতে শিকড় বসিয়ে দিয়েছে সে। তিন-চারটি ছেলেমেয়ে তার। তাঁরা সবাই তার দেহকে এবং অধিকাংশ মনকে নিজেদের পরিবারে দৃঢ়বদ্ধ করে দিয়েছে। এখন বড়জোর মনের একটা উন্মুক্ত অংশ তার

ছোটবেলাকার গাঁয়ের দিকে বাতাসে বাতাসে আগ্রহের পল্লব মেলে ডাকতে পারে।'

এরই পাশাপাশি, 'অ্যাভলনের সরাই' গল্পটি উদ্বাস্তুদের নিয়ে, যাদের "দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, মৃত্যু এসব সম্বন্ধেই একটা না একটা ফরমুলা প্রচলিত হয়েছে।' গল্পে রাষ্ট্রের নজরদারি উপেক্ষা করে, একদল মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে পথে বেরিয়ে পড়েছে। গল্পের পটভূমি যুদ্ধোত্তর জার্মাণীর। কিন্তু যতই আমরা পরিণতির দিকে এগোই, বোঝা যায়, এই মহাযাত্রার কোনো শেষ নেই। কারণ তাদের গন্তব্যস্থল অ্যাভলনের সরাই সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা সেই দলটির নেই। এই চেনা অথবা না-চেনার বিষয়টি তখন ধোঁয়াটে মনে হয়। কারণ, "এই অপরিচিত পথে পথ চেনে এমন কেউ হয়তো আছে, নতুবা অ্যাভলনের সরাই থেকে আগে তারা যেমন দূরে ছিল তেমনি আছে। কিন্তু এখন আর বসে থাকাও চলে না, কারণ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে আর সকলে।"

দ্বিতীয় ধারার এই গল্পগুলিতে বর্তমান পৃথিবীর জটিলতম সংকট, অর্থাৎ সমষ্টির সঙ্গে সংঘাতে ব্যক্তির যন্ত্রণাকাতর ছবিটিকে ফুটে উঠতে দেখি। এই ছবির চালচিত্র পৃথিবী, অথচ তাঁর কেন্দ্রস্থলে মানুষ। এর সামগ্রিক রূপটি ক্রমশ দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে। এখানে কোনো আত্মতৃপ্তি বা সহানুভূতির সুযোগ নেই, বরং অমিয়ভূষণের চরিত্ররা ক্রমশ মিলে যেতে থাকেন ইতিহাসের নিজস্ব গতির সঙ্গে। এই পটভূমি বাদ দিয়ে তাদের কথা ভাবা যায় না, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রতিটি ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক ঘটনাচক্রের সঙ্গে তাঁরা অভিন্ন হয়ে আছে। এইভাবেই সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য এবং ইতিহাসচেতনা পাশাপাশি জায়গা পেয়ে যায় অমিয়ভূষণের রচনায়।

তবে বিষয় ও আঙ্গিকের নতুনত্বে, সামগ্রিক বন্দীদশাকে উপলব্ধির ধ্যানে, সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্পটি সম্ভবত 'পায়রার খোপ'। ভাষার দিক থেকে, এমনকি যে অমিয়ভূষণ স্থান-কাল-পাত্রের নিরিখে গল্পকে চিরায়ত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী, সেই বস্তমাত্রিক নির্দিষ্টতায় গল্পটি পাঠকদের অভিজ্ঞতার অনেক কাছাকাছি। সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে একটি পরিবার ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিভাবে চোরাস্রোতে তলিয়ে যেতে পারে, সেই বাড়িরই ছোট ছেলে সুবি-র চোখে সমস্ত ঘটনাটি নিখুঁত বর্ণনায় ফুটে ওঠে। সেই পরিবারের বড় ছেলে ট্রেনের তার চুরি করতে গিয়ে মারা যায়। অথচ বাড়িতে সে পরিচিতি দিত রেলকর্মচারী হিশেবে। মেজ ছেলে পুলিশের চাকরী করার অপরাধে উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়। তার বিধবা স্ত্রী, সুবি,

তাঁর বাবা-মা এবং একটি পায়রার খোপ নিয়ে তাঁদের হালফিলের সংসার। গল্পের শুরু হয় স্থবির মেজদার হত্যাকাণ্ডের মাস তিনেক পরে। সমস্ত বাড়ির পরিবেশটি ভুতুড়ে এবং অবাস্তব।

> 'আজকাল এই ছোট্ট বাড়িটাতে ছোট্ট একটা ঘটনার পিছনে অনেক কথা, অনেক অনেক শব্দ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, চাপ দিয়ে দিয়ে তারা এগোতে চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে হলে কথা দিয়ে বাঁধ দিতে হয়। এদিকের কথার শব্দ হলে ওদিকের শব্দ এগোয় না।'

এখানে অমিয়ভূষণের কৌশলটি লক্ষণীয়। কোনো পরিণতির দিকে তিনি আমাদের নিয়ে যান না। বিপরীতে প্রতিটি ঘটনার মধ্যে স্থবি নিজের অপূর্ণতাকে দেখতে পায়। এই দীন-দরিদ্র পরিবারটিকে সে ক্রমাগত শোষণ করেছে। অথচ তাঁরই বন্ধুদের হাতে মেজদা অথবা মুকুলের হত্যাকাণ্ডকে জানা সত্ত্বেও সে আটকানোর চেষ্টা করেনি। স্থবি ক্রমশ পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়, যেখান থেকে কোনোভাবেই তাঁর মুক্তির আশা নেই। এই প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত স্থবি প্রশ্ন করে: 'একটা আদর্শ সামনে রেখে যে কোন উপায়ে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যর হিসাবকে তুচ্ছ করে, তার দিকে ছুটে চলা কি সত্যি সম্ভব হয়? আদর্শ ঠিক হলেই হল, পথ পচা পাঁকে ডুবে থাকলেও ক্ষতি নেই, এমনকি সম্ভব হতে পারে?' গল্প শেষ হওয়ার পর আমাদের জন্য কোনো সহানুভূতি অবশিষ্ট থাকে না—বুঝতে পারি, কখন যেন অজান্তেই গোটা পরিবারটি রূপান্তরিত হয়ে যায় ছোট একটি পায়রার খোপে, যেখানকার বাসিন্দারা আর কোনদিনই আকাশের বিস্তৃত নীলিমার সন্ধান পাবে না।

গল্পের বিষয়বস্তুর প্রতি অমিয়ভূষণের নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনায় এনেছে চেতনাসমৃদ্ধ মননশীলতা। এই দিক থেকে তিনি স্বশ্রেণীচ্যুত কথাশিল্পী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম, তাঁর আধুনিকতা বা অসম্পূর্ণতার প্রতি অমিয়ভূষণের কোনো আনুগত্য নেই। এই নিরাসক্তির কারণ, তাদের চারপাশের দেয়ালগুলি যে আসলে তাঁরাই সৃষ্টি করে. এই সত্য অমিয়ভূষণের অজানা ছিল না। বাংলা সাহিত্যে এই নিরাসক্তি আর কেবলমাত্র লক্ষ করা যায় কমলকুমার মজুমদারের রচনার মধ্যে।

শুধু নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, বিষয়ের সঙ্গে অমিয়ভূষণের সংযোগ ঘটে শুধুমাত্র আবেগের বশে নয়, জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষাই এই একাত্মতাবোধের কারণ। নৃবিজ্ঞানীর চেতনায় তিনি লক্ষ করেন মানব-সমাজের আচরণগত প্রবৃত্তির সামাজিক রূপরেখা। সামাজিক পটভূমিতে

ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্লেষণের কারণেই হয়তো তাঁর লেখার প্রতীক অথবা ইমেজের প্রাধান্য এতো বেশি। সব মিলিয়ে, তাঁর চরিত্ররা বন্দীশালার মধ্যে থেকেও আবিষ্কার করতে চায় সত্যের দীপ্ত রেখাকে।

আবার এই আবিষ্কারের জন্যই অমিয়ভূষণকে সন্ধান করতে হয় নতুন কোনো ভাষার। যে ভাষার নিজস্ব মেরুদণ্ড আছে, অথচ যে ভাষা স্থান-কাল অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'আমাদের শব্দগুলি দিয়ে দুনিয়ার ঘটনাবলীকে আয়ত্ত করার অক্ষমতা'—সার্ত্রের এই উচ্চারণকে মনে রেখেই যেন, প্রথম থেকেই প্রচলিত ভাষাকে ভেঙেচুরে অথবা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার থেকে পৃথক করে দেখতে চেয়েছেন অমিয়ভূষণ। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি বুঝি অবচেতন- অভিজ্ঞতার গহনে ভাষাকে নামিয়ে তার প্রকৃত শক্তিকে প্রতিমুহূর্তে যাচাই করতে চেয়েছেন। যেন তার সাহায্যে স্থূল বস্তুজগৎ এবং ধূসর মনোজগতের মধ্যে এক ধরণের যোগসূত্র তৈরি করা যায়। অমিয়ভূষণের কাছে ভাষা একটি ক্রিয়া, যার মাধ্যমে তিনি গল্পের চরিত্রদের তুলে ধরেছেন অন্তর্দৃষ্টির শিখরে। ভাষা যে সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এই সত্যটি যেন নতুনভাবে এখানে ফুটে উঠতে দেখি।

আলোচনার শুরুতে অমিয়ভূষণের সঙ্গে ভাবনাচিন্তায় সার্ত্রের কিছু মিল লক্ষ্য করেছিলাম। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, প্রকৃতিগত দিক থেকেও তারা দুজনেই অনেক কাছাকাছি। বরং বলা যায়, ইয়োরোপের মানচিত্রে সার্ত্র আর্থ-সামাজিক অবদমনের যে রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরই ভিন্ন চেহারাকে, তৃতীয় বিশ্বের তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশে নতুনভাবে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন অমিয়ভূষণ, তাঁর গল্প এবং উপন্যাসে। অবরুদ্ধতার ছবিটি এখানে অনেক বেশি জটিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে, দুটি ভিন্ন মহাদেশের বাসিন্দা যাদের মধ্যে কখনো সাক্ষাৎ হয় নি, অথচ ভাবনায় একটা সূক্ষ্ম মিল লক্ষ্য করা যায়। তাই দৃষ্টিভঙ্গিতেই অমিয়ভূষণ তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনটিকে সাজিয়েছেন। তাই যদি কোনো পাঠক প্রশ্ন করেন, কেন সেখানে অনুপস্থিত ইতিমধ্যেই প্রকাশিত লেখকের অনেক স্মরণীয় গল্প ; সবিনয়ে জানানো যায়, একটি বিশেষ চিন্তাস্রোতের গল্প দিয়েই লেখক তাঁর গ্রন্থটিকে সাজিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, সংকলনটি অনায়াসেই একটি সামগ্রিকতার চেহারা পেয়ে যায়, যার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই।

শ্রেষ্ঠ গল্প। অমিয়ভূষণ মজুমদার। বাণীশিল্প। ৩৫ টাকা।

বীরভূমের আর্থনীতিক জীবন

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

অধ্যাপক রঞ্জনকুমার গুপ্তের The Economic Life of a Bengal District (Birbhum 1770—1857) বইটি আর্থনীতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বীরভূমের সমাজ-আর্থনীতিক জীবন নিয়ে তিনি ১৯৬৩ সাল থেকে একটানা বিরতিহীন গবেষণা করে চলেছেন। এবং তাঁর গবেষণালব্ধ পত্র ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য এবং নামী জার্ণালে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বইটি তাঁর বিস্তৃত গবেষণা কর্মের অংশ বিশেষ। রঞ্জনবাবু তাঁর বইয়ের ভূমিকাতে লিখেছেন, মূল কাজটি দুটি ভাগে বিভক্ত—আর্থনীতিক ও সামাজিক। বর্তমান বইটি তাঁর কাজের প্রথম অংশ নিয়ে লিখিত। বীরভূমের সামাজিক জীবন নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলে আমরা বীরভূমের সমাজ-আর্থনীতিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাব।

১৭৭০ থেকে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালের বীরভূমের আর্থনীতিক জীবনের পরিবর্তনের ধারাটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকাল। কিন্তু ১৭৭০ সালের বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। এর পরে আরেকটি ধাক্কা আসে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ায়। বীরভূমের পুরনো এবং নতুন

জমিদারগণ কোম্পানির নতুন খাজনা ব্যবস্থায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। জমিদার পরিবারগুলির উত্থান-পতন, বীরভূম জেলার অর্থনীতিতে তাঁদের ভূমিকা, কৃষক-বিদ্রোহ, আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের বহু মানুষের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও আর্থনীতিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয় এই বইতে আলোচিত হয়েছে। বীরভূমের ভৌগোলিক অবস্থা এবং অর্থনীতিতে তার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে রঞ্জনবাবু দেখিয়েছেন, ঐ অঞ্চলের দুই তৃতীয়াংশ ছিল হিংস্র বন্য জন্তু সংকুল। সেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা ছিলই, তার ওপর বাংলার এই পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বারবার আক্রমণকারীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হত। বীরভূমের কৃষি উন্নতির জন্য জমিদারগণের কী ভূমিকা এবং অন্যান্যদের ভূমিকাই বা কী সে সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে। এর পিছনে নানাবিধ কারণ নিহিত ছিল— "Such as the quantity and quality of land, the irrigation facilities and the availability of sufficient labour and capital, the size of holding, the number and quality of draught cattle and of implements, rate and the market facilities." (পৃ. XI) তা ছাড়া এ অঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন রকমের শস্য সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক রঞ্জনকুমার গুপ্ত বীরভূম জেলার শাসনতান্ত্রিক, রাজস্ব-সংস্কার, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি-ব্যবস্থা কেন্দ্রিক সমাজ-আর্থনীতিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

ইদানীং আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস বলতে কোনো অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন ইতিহাস বোঝায় না। দেশের ইতিহাসের মূল ধারার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ইতিহাসকে স্থাপিত করে আলোচনা এবং মূল্যায়ণ করতে হয়। কারণ কোনো অঞ্চলের ইতিহাস কখনোই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র হতে পারে না। তেমনি বীরভূম জেলার ইতিহাসও বিচ্ছিন্ন নয়, দেশের ইতিহাসের মূল স্রোতের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। অধ্যাপক গুপ্ত বাংলার ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেই বীরভূম জেলার আঞ্চলিক ইতিবৃত্ত রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। অবশ্য এটিই বীরভূম জেলার প্রথম ইতিহাস নয়। লেখক তেমন দাবীও করেন নি। অনেকেই এই জেলার ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। সেগুলি অবশ্য কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়, তবে ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে লেখা

নানাবিধ 'রিপোর্ট'-এ উক্ত জেলার বহু ঐতিহাসিক উপাদান নিহিত আছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের রচনাবলী রঞ্জনবাবুর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ডব্লিউ, ডব্লিউ. হাণ্টারের 'দি অ্যানালস অভ রুরাল বেঙ্গল' বইটিকে প্রথম এবং পথিকৃৎ কাজ হিশেবে ধরা যেতে পারে। সেখানে হাণ্টার সাহেব সরকারি করেস্‌পণ্ডেন্সকে যোগ্যতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরেট ই. জি. ড্রেক্‌স্‌-ব্রোক্‌ম্যান নথিপত্র সংকলন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'নোট্‌স অন্ আর্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অভ্ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অভ. বীরভূম' রচনা করেছেন। তা ছাড়া ওমালি সাহেবের 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অভ্‌ বীরভূম' (১৯১০ খৃ.) ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক গ্রন্থ সন্দেহ নেই। বীরভূমের ইতিহাস রচনার আকরগ্রন্থ হিশেবে উপরি উল্লিখিত বইগুলি সম্পর্কে রঞ্জনবাবু তাঁর বইয়ের ভূমিকায় আলোচনা করেছেন। তাঁর বর্তমান বইটি লিখতে গিয়ে সাহায্যও নিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র এগুলির ওপর নির্ভর করে তাঁর গবেষণালব্ধ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাঁর গবেষণা কর্মে বেশির ভাগই ব্যবহৃত হয়েছে অমুদ্রিত এবং অপ্রকাশিত মূল তথ্য সূত্র। তথ্য-সূত্রের দুটি ভাগ—১. সরকারি এবং ২.—বেসরকারি। বীরভূমের কালেক্টরেট রেকর্ডরুম, কলকাতা স্টেট আর্কাইভ্‌সে রক্ষিত জেলা জজ্‌ কোর্টের নথিপত্র, বীরভূম জেলায় রক্ষিত সরকারি নথিপত্র প্রভৃতি ভালোভাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র লেখনাগারে বসে নথিপত্র টুকে রঞ্জনবাবু ইতিহাস তৈরি করেন নি। তিনি নিজেই লিখেছেন, "The knowledge derived from such records has occasionally been supplemented by my field work in some locality." (পৃ. xiii)। সরকারি তথ্য-সূত্রের পাশাপাশি বেসরকারি দলিল, নানাবিধ নথিপত্র, তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বেসরকারি তথ্যাবলী কি কি দেখেছেন তার একটা বিবরণ তিনি দিয়েছেন—চিঠিপত্র, গাথা, সিউড়ি রতন লাইব্রেরিতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, সুরুলের কান্তিভূষণ সরকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, সিউড়ির জমিদারের লেখ্যাগার, বিশ্বভারতী লাইব্রেরির বাংলা পাণ্ডুলিপি বিভাগ (এখানে প্রচুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র রক্ষিত আছে), 'সুরুল পেপার্স' প্রভৃতি। এই গবেষণা-কর্মে পূর্বে ব্যবহৃত হয় নি এমন অনেক তথ্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য বইটিতে মোট নয়টি অধ্যায় আছে—১. দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দ্য

পিপল, ২. দি গ্রেট ফেমিন অ্যাণ্ড এ সিভিল রিবেলিয়ন : প্রেলিউড টু দ্য পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট, ৩. পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট ইন অপারেশন : ইম্প্যাক্ট অন ল্যাণ্ডেড ইণ্টারেস্টস, ৪. দি ডিস্ট্রিক্ট ইকনমি : এগ্রিকালচার, ৫, দি ডিস্ট্রিক্ট ইকনমি : রুরাল ম্যানুফ্যাকচার অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি, ৬. দি ডিস্ট্রিক্ট ইকনমি : ট্রেড, ৭. গ্রোথ অভ টাউন্স অ্যাণ্ড ট্রেড মার্টস, ৮. সোসাল ডাইমেনসান অভ্ ইকনমিক লাইফ এবং ৯. কনক্লুসান।

প্রথম অধ্যায়ে রঞ্জনবাবু বীরভূম নামের উৎপত্তি এবং সেখানকার মানুষের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাছাড়া কৃষি, সমাজ, যানবাহন প্রভৃতি এই অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও অনালোচিত থাকে নি। মুণ্ডারী ভাষায় 'বীর' শব্দটির অর্থ 'জঙ্গল', আর 'ভূম' বা 'ভূমি' হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ। দুটি শব্দ মিলে হয় 'জঙ্গল ভূমি'। এঅঞ্চলের প্রাকৃতিক রূপ অনুযায়ী নামটি অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে—দুটি শব্দই যদি সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার থেকে গৃহীত হয় তবে এর অর্থ দাঁড়ায় 'বীরের দেশ'। তৃতীয় ব্যাখ্যাটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়—প্রাচীনকালে 'বীর' নামে এক উপজাতি এখানে বাস করত, সেই বীরদের বাসস্থান অর্থে 'বীরভূম' নামের উৎপত্তি। রঞ্জনবাবু পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন, "There are, in fact, a large number of people, called Bir Bangshi, a sub-caste of dominant semi-tribal caste of Dom in the district." (পৃ. ২১)। উপরে উল্লিখিত বীরভূম নামের সম্ভাব্য তিনটি অর্থের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বা বেশি গ্রাহ্য সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। এখন তর্কের পরিধি বিস্তারই একমাত্র পথ, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অসম্ভব। অবশ্য এ আলোচনা বর্তমান বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; তবে আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।

বারবার বীরভূম হাত বদল হয়েছে বিভিন্ন শাসকের। আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চল অষ্টম শতাব্দী অর্থাৎ ধর্মপালের রাজত্বকাল থেকে হিন্দু রাজাদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত। ইংরেজদের আক্রমণের কাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে মুসলমান জমিদারদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে। সেই সময় থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বীরভূমে ইংরেজদের অধীনে বিচার ও শাসনতান্ত্রিক যে পরিবর্তনগুলি হয়েছিল সেগুলি রঞ্জনবাবু বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। চুয়াড়,

সাঁওতাল প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় মানুষদের বিভিন্ন সময়ের বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে ঢেলে সাজাতে বাধ্য করেছে। জঙ্গলময় বীরভূমের কৃষিকাজের অসুবিধার কথাও এখানে বলা হয়েছে। "...only one-third of the total area of the distict was under cultivation, the remaining two-thirds being covered with forests and jungles. The name of the district of Birbhum, literally meaning 'the law of jungles' is fully justified." (পৃ. ১০)। তাছাড়া হিংস্র বন্যজন্তুর উৎপাত তো ছিলই। প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম ছাড়াও কিছু কুটির শিল্প এবং সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য করে এ অঞ্চলের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। একথা মানতেই হয় যে, বীরভূম অর্থনীতির দিক থেকে ছিল পিছিয়ে। কারণ "This backward and precarious nature of the village economy explains the lack of necessary capital for a solid foundation of trade and industry," (পৃ. ১৫)। পুঁজির অভাব তো ছিলই, তার উপর ছিল যানবাহন ও যোগাযোগের অব্যবস্থা। আর্থনীতিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক কাঠামোটি ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আদিবাসীদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের মিলন যেমন কখনো কখনো হয়েছে তেমনি উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণী "formed the power structure in a village. They had ascended the socio-economic ladder and reduced the Sons of the soil, the low Caste Hindus and the tribals—to the lowest status." (পৃ-২০)। জমিদার, অবস্থাপন্ন রায়ত, মণ্ডল প্রভৃতিরা উর্বর জমিগুলি নিজেদের অধীনে রাখত। সাধারণ রায়ত এবং কৃষিশ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমির অধিকারী হতো। ব্যবসায়ী, সুদের কারবারী মহাজনেরা গ্রামে বিশেষ প্রাধান্য পেত। সাঁওতাল এবং অন্যান্য উপজাতিরা জমিদার মহাজন বা উচ্চ সম্প্রদায় কর্তৃক শোষিত এবং স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের দিয়ে জঙ্গল হাসিল করানো হয়েছিল। নিম্নবর্গীয় মানুষেরা কখনো কখনো শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একই মঞ্চে আন্দোলন করছে। "The Santhal Rebellion joined by the low-Caste Hindus and the poor Muslims shook the very foundation of the British Raj throughout the affected districts" (পৃ. ১৯)। লেখক ভূমি, জন-বিন্যাস, অর্থনীতি কেন্দ্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বিশ্বস্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের আগেই দুর্ভিক্ষ (১৭৭০ খৃ.) এবং মারাঠাদের ঘন ঘন আক্রমণের ফলে বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বীরভূমও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোম্পানি-সরকার এবং জমিদার কেউই রাজস্ব-খাজনা আদায়ের ব্যাপারে রায়ত-প্রজাদের ওপর কোনো সহৃদয়তা দেখায় নি। ফলে দুর্ভিক্ষের ফলাফল হয় আরো করুণ। বলা বাহুল্য ১৭৭০ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কৃষিতে আঘাত হেনেছে। "In 1771, mone tham one-third of the Cultivable lamd was shown as 'Deserted in the offieile return ... There was am acute dearth of Cultivatons everywhere," (পৃ, ৩১)। ফলে জমিদাররাও মহাসমস্যায় পড়ে। বীরভূমের কৃষি সমাজের কাঠামো ছিল বিচিত্র রকমের। কৃষিকাজের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, নানা জাত-পাতের মানুষ যুক্ত ছিল। এমন-কি 'বামুন-চাষা'-র অস্তিত্ব ছিল। ব্রাহ্মণদের কৃষি কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাঙলা দেশে অন্যত্র বিশেষ দেখা যায় না। যাই হোক, কৃষি শ্রমিক এবং জমিদারদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলত মণ্ডলরা। জমিদারি এবং সরকারি চাপে অনেক রায়ত পালিয়ে যায়। এই পলাতক রায়তদের জায়গায় প্রতিবেশী জেলাগুলি থেকে পাইকস্ত রায়তদের এনে বসানো হয়। তা ছাড়া কৃষির অবস্থা ফেরানোর জন্য জমিদাররা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নিষ্কর জমি দান করে। কিন্তু সরকার তা বেআইনি ঘোষণা করে। দুর্ভিক্ষের ফল স্বরূপ কৃষিজ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের আকাস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে গোটা বীরভূম জেলাতে অরাজকতা-অস্থিরতা দেখা দিল। শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। চারিদিকে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকার ও জমিদার। ডাকাতি বৃদ্ধি পায়। সরকার এ সমস্ত বন্ধ করার জন্য বদ্ধপারকর হন। শেষ পর্যন্ত তোষণ-নীতির আশ্রয় নিতে হয়। এবং "The appeasement measures of the Government towards the rebel ryots were of speciel interests for revenue settlement of the district," (পৃ, ৫১)। রঞ্জনবাবু দেখিয়েছেন, বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিভাবে বীরভূম জেলার অর্থনীতিক বিপর্যয় ঘটেছিল।

১৭৯৩ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় গোটা বাংলায় ভূমি-ভূমাধিকারী এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেল। স্বভাবতই বীরভূম জেলা তার থেকে বাদ যায় নি। অন্যান্য জেলার মতো বীরভূমেও পুরানো জমিদার শ্রেণীর পতনের সূত্রপাত হয়। বীরভূমের

জমিদার মুহম্মদ-উজ্-জামান সরকারি খাজনা দিতে না পারায় কোম্পানি তাঁকে ১৭৯৩-র মে মাসে বন্দী করে। 'খাজনা সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব কর্মচারীরাও তাঁকে বিপদে ফেলে।" ফলে "His own machinery to Collect rent failed, and he Contracted huge loans from the Calcutta banians, and mahajans, mortgaging some of his mahals to them." (পৃ. ৬৯)। এমন কি কিছু মহল বিক্রি করতেও বাধ্য হয়। ১৭৯৫-র মে মাসে মুহম্মদ-উজ্-জামানকে জমিদার হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করে টি, এইচ, আর্নস্টকে উক্ত জমিদারির কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। এই ভাবে নানান টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে বড়ো জমিদারি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেখানে এল নতুন জমিদার শ্রেণী। এক্ষেত্রে সারা বাংলার জমিদারদের চরিত্র এক রকম। রাজস্ব আদায় করাই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য। আর তাঁদের আমলারা? "Most of them were admittely Corrupt and umscrupulous" (পৃ, ৭৬)। বীরভূমে আর্থনীতিক দুরবস্থা চরমে ওঠে। জমিদাররা সুদখোরদের খপ্পরে প্রায় সর্বস্ব হারাতে বসে। এই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ জঙ্গল হাসিল করে কৃষিতে বিশেষ মনোযোগী হলেও মূল সমস্যার তেমন সুরাহা হয় নি। রঞ্জনবাবু জমি, জমির নতুন আইন, পুরানো জমিদারদের হটিয়ে নিজেদের স্বার্থে কোম্পানির নতুন জমিদারদের প্রশ্রয় দান প্রভৃতি বিষয়-গুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করছেন সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্র ঘেঁটে। অন্যের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর না করে, নথিপত্র থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন। বীরভূমের আর্থনীতিক দুরবস্থার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে অনেকাংশেই দায়ী তা এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। ঐ একই অধ্যায়ে রঞ্জনবাবু একটি তথ্য উদ্ধার করেছেন—জমিদারদের মধ্যে অনেকেই চুরি-ডাকাতির পয়সায় নিজেদের অবস্থা ফিরিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়মিত অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে চোর-ডাকাতদের পরিপোষণ করতেন, এমন তথ্য পাওয়া গেছে। আবার হেতমপুরের জমিদারের সঙ্গে ফৌজদারি আদালতের সেরেস্তাদারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অর্থাৎ আত্মীয়তা স্থাপনের মধ্যে জটিল স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে তাঁদের ঐক্যের পিছনে ছিল অসৎ উদ্দেশ্য। অবশ্য পরবর্তীকালে হেতমপুরের জমিদার বৃটিশ রাজকর্তৃক 'রাজাবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

কৃষি, গ্রামীণ শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য—এই তিনটি অংশে বিভক্ত করে

বীরভূম জেলার অর্থনীতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভূমি ও মাটির বৈচিত্র্য, নিত্যসঙ্গি খরা, নদী-উপনদী সম্পর্কে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিক অবস্থার পরিণাম পরিমাপ করতে লেখক প্রয়াসী হয়েছেন। জেলার অর্থনীতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কৃষিতে প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। কৃষিতে সেচ ব্যবস্থা সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কৃষি সবচেয়ে আঘাত পেল জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে। "The district for three generations since the great famine had been reeling under depopulation." (পৃ. ১২৩)। শ্রমিকের অভাব হেতু জমিদারেরা "customarily alloted additional plots on unwilling ryots and imposed a system of beggar (unpaid labour) on the agricultural labourers in order to make good the imbalance. This being proved inadequate, they employed pykast ryots and brought the aboriginal immigrants to the district" (পৃ. ১২৪)। তা সত্ত্বেও কৃষি-শ্রমিকের অভাব থেকেই গেছে। অভাব ছিল গবাদি পশু, কৃষিকাজের জন্য লাঙল, যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতির। তবু বীরভূমের মাটিতে চাষবাসের যে বৈচিত্র্য ছিল তার উল্লেখ এবং বিশ্লেষণ করেছেন রঞ্জনবাবু; দেখিয়েছেন বীরভূমের অর্থনীতিতে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রভাব কতটা ছিল। ধান-গম ছাড়াও নতুন তরিতরকারির চাষ এবং প্রচুর পরিমাণে আখ, তুলো, তুঁত এবং নীল চাষ হত। এই চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল গুড়, চিনি, সুতিবস্ত্র, রেশম প্রভৃতি শিল্পের। সামান্য পরিমাণে পান ও তামাকের চাষও হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষি উপযোগী জমি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর খাজনার চাপ ছিল অত্যধিক। বস্ত্র শিল্পে ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি বণিকদের প্রভাব খাটানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সর্বোপরি ক্ষমতা ছিল কোম্পানি সরকারের। বীরভূমে উৎপাদিত দ্রব্যাদি নিয়ে দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে লাভবান হয়েছে ইংরেজরাই। এখানকার কৃষক, কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা এবং বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগের যথার্থ মূল্য পায় নি। বরং আর্থিক শোষণে এই জেলা জর্জরিত হয়েছে। বীরভূম অঞ্চলে কয়লা এবং লোহা পাওয়া গেছে। কয়লা যৎসামান্য মিলেছে, কিন্তু "The iron ore bed, on the other hand, was of a far greater dimension; and the

extraction and manufacture of iron formed a much more important industry of the district." (পৃ. ১৯৬-৯৭)। (এ সম্পর্কে রঞ্জনবাবু "বীরভূমের লৌহ উৎপাদন শিল্প : উত্থান ও পতন" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ / 'ঐতিহাসিক' (জুলাই, ১৯৭৮) পত্রিকায় লিখেছিলেন।) বীরভূমের লোহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল না। "Birbhum iron was not suitable for railway works···It was extensively used in making agricultural implements and domestic utensils." (পৃ. ২০৫)।

বীরভূমের "import-export trade was monopolised by foreign merchants and natives···" (পৃ. ২২২)। চাল, চিনি, গুড়, রেশম, কাঠ, গালা, নীল প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানি করা হত। নদীয়া থেকে তামাক, হলুদ, সুপারি; হুগলি-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ থেকে কাগজ আমদানি করা হত। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার। শাসন-ব্যবস্থাও ছিল দুর্বল। আর "Like agriculture and industry, the trade of the district also suffered from the great famine···The trade routes became extremely unsafe for normal commercial activities." (পৃ. ২৩৭)। তা ছাড়া খুচরোর অভাব ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামগ্রিকভাবে স্থানীয় অর্থনীতিতে সুদূর-প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

১৭৭০ সালের পর থেকে বীরভূমে নগরায়ন শুরু হয়। গড়ে ওঠে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-কেন্দ্র। সিউড়ি প্রধান নগরে পরিণত হয়। এর পিছনে কোম্পানি সরকারের বিশেষ অবদান আছে।

রঞ্জনবাবু যে বীরভূমের আর্থনীতিক ইতিহাস রচনা করেছেন সেই বীরভূমের ভৌগোলিক সীমা আজকের থেকে আলাদা। সে সময়ে বীরভূম জেলার আয়তন ছিল অনেক বড়। তখনকার মানুষের আর্থনীতিক জীবন বলতে শুধুমাত্র বর্তমান বীরভূমের সীমায় আবদ্ধ মানুষজনের জীবন চিত্র বোঝায় না। সেকালে যে অঞ্চলটা বীরভূম হিসেবে পরিচিত ছিল রঞ্জনবাবু তারই ইতিহাস রচনা করেছেন। আর্থনীতিক জীবন পর্যালোচনা করতে যে-যে দিকগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন, তিনি সমস্ত দিকগুলিরই বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্য গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সাবধানী। উল্লেখ্য, second hand materials তাঁর কোনো সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমি নয়। সরকারি-বেসরকারি বহু নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, করেসপণ্ডেন্স,

দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের নথিপত্র, সরকারি ও ব্যক্তিগত লেখ্যাগারের ডকুমেন্টস তিনি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে মানুষের ইতিহাস রচনা করেছেন। ফুটে উঠেছে একটি জেলার আর্থনীতিক জীবনের নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য ছবি। তবু খেদ থেকে যায়। কারণ, সামাজিক ইতিহাস অনুপস্থিত। কিন্তু আমরা জানি, রঞ্জনবাবু সামাজিক ইতিহাস লেখার কাজটাও শেষ করেছেন। সেটি বই রূপে করে আমাদের হাতে আসবে? পাঠকেরা বীরভূমের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস (বিশেষ সময়কালের) জানতে পারবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বই দুটি এক সঙ্গে পড়ে। পরিশেষে বলি, বইটি প্রচারে প্রকাশকের আরো যত্নবান হওয়া উচিত।

The Economic Life of a Bengal District/Dr. Ranjan kumar Gupta/The University of Burdwan, 1984, Rs.40/-

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা : সামাজিক অভিজ্ঞতার দলিল

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

ইন্‌ডিপেনডেনস্ অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ। ভাগ হল মাটি। ভাগ হলো শিল্পী-সংস্কৃতিবানরা। বিচিত্র অবস্থা হল শিল্প-সাহিত্যের। গান-বাজনা-অভিনয়ের। দুই পারে তার দুই রূপ। এক দেশের নাড়ি থেকে ছিঁড়ে অকৃতার্থভাবে বেঁচে আছে পাকিস্তান। আবার সেখানেও বৈচিত্র্য! দুই অঙ্গে, ধর্মে তারা এক, ভাষায় স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র আচারে-বিচারে, মননে-নিষ্ঠায়, অনুশীলনে, চিন্তায় সংস্কৃতি-ভাবনায়, বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে—পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে নতুন রক্তের সঞ্চার করল, হিন্দু-মুসলমানের জনমুখী বঙ্গসংস্কৃতি সে পথে ক্রমশ উত্তরিত হল। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনেই হয়ত বা পশ্চিমের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি একদিন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

অবশেষে মুক্ত হল। গঠিত হল স্বাধীন বাংলা। বাংলাদেশ। দেশে মুক্ত, সংস্কৃতিচর্চার একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল। সাংস্কৃতিক কর্মীরাও নতুন উদ্যম নিয়ে নতুন কিছু করার বাসনায় কাজ শুরু করলেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের একটা অবয়ব গড়ে উঠতে হলে, নির্দিষ্ট রূপ পেতে হলে এবং প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে হলে অনেক সময় দরকার। দেশভাগের পর এই সময়সীমায় প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান রূপে ও পরে বাংলাদেশ রূপে এ ভু-ভাগের একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সত্তা গড়ে উঠেছে। যদিও এ সত্তার

স্বরূপ একাত্তরের আগে যা ছিল, একাত্তরের পরে হল ভিন্ন। সাহিত্য সংস্কৃতি কিন্তু এমন অল্প সময়সীমায় একটা নির্দিষ্ট রূপ পায় না, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হতে পারে না।

২.

রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা' প্রবন্ধ সংকলনে রাজনৈতিক পালাবদল ও নবপর্যায়ে নামকরণের দিনটিকে নবনাট্যচর্চার 'শুরু' হিশেবে বিবেচিত হয়েছে। ভূমিকায় স্পষ্ট বলেছেন, '১৯৭২ থেকে আমাদের নাটকের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন ধারা, যাকে আমরা অভিহিত করতে চাই নবনাট্য চর্চা বলে।'. বাংলাদেশ-অভ্যুদয়ের আগে এই ভূখণ্ডে নাটক হত না এমন নয়, কিন্তু নিয়মিত নাট্যচর্চার কোন ধারার সৃষ্টি হয় নি। এই দেশে বিশেষ করে পাকিস্থানী আমলে নাটকের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা ছিল, বেশির ভাগ নাট্যকারের মঞ্চের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। ব্যতিক্রম ছিলেন নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ। ফলে এই শাখাটির আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নি। নাট্যকার-অভিনেতা-অভিনেত্রী, নেপথ্য কলাকুশলীদের যৌথ উদ্যোগে যে নাট্যধারা সূচিত হয়, তা থেকেই সম্ভব শুদ্ধ ও সঠিক নাট্যচর্চার।

'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা'—বাংলাদেশের থিয়েটার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত সংকলন। সময় নেওয়া হয়েছে বাহাত্তর থেকে ছিয়াশি। বাংলাদেশের প্রথম নাট্য পত্রিকা 'থিয়েটার' বাংলাদেশের নাট্যচর্চার এক বিশ্বস্ত সহযাত্রী। মুক্ত বাংলায় সংস্কৃতির অন্যান্য দিকের সঙ্গে নাট্যচর্চার প্রসার শুরু হওয়ার পরই ঐতিহাসিক নিয়মে নাট্যভাবনা বিনিময়ের তাগিদে প্রতিষ্ঠিত হল 'থিয়েটার'। তারপর দীর্ঘ ক'বছর ধরে প্রকাশিত সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের নাটকের বিভিন্ন আলোচনা, মৌলিক ও অনূদিত নাটক।

মোট চব্বিশটি প্রবন্ধ বাছা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আধুনিক নাটক ও নাট্যতত্ত্বের উপর আলোচনা করেছেন মুনীর চৌধুরী ও আলাউদ্দিন আল আজাদ। প্রায় এক পর্যায়ে নাট্যতত্ত্বের উপর নয়, সাহিত্যের বিচারে নাটক দেখেছেন আবদুল হক। সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাকে নাট্যচর্চায়। থাকে 'শখ'-এর সঙ্গে কমিটমেন্টের দ্বন্দ্ব। এবং কমিট-মেন্টের জয় হলে যে কোন শিল্পচর্চাই রূপ নেয় আন্দোলনে। তাই এই বিষয়ে

আলোচিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। 'থিয়েটার ও রাজনীতি' (আবু কায়েস মাহমুদ), 'নাটক নাট্য আন্দোলন ও বিবিধ সমস্যা' (আবদুল্লাহ আল মামুন), 'নাট্য ও কাঙ্খিত নাট্য আন্দোলন' (আনু মুহাম্মদ) ও 'নাট্য আন্দোলনের সমস্যা' (শাহরিয়ার কবির)। শুধু বাংলাদেশের নাটকের প্রেক্ষায় একই আলোচনা বাংলাদেশের নাটক : 'অন্তর্গত উপলব্ধি' (অসীম সাহা), 'বাংলাদেশের নাটক সমস্যা ও প্রবণতা' (আলী আনোয়ার)। নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মমতাজউদ্দিন আহমদ ও রামেন্দু চৌধুরী। মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের আধুনিক নাটকের জনক। ফলে তাঁর নাট্যকৃতির একক আলোচনা করেছেন আবুহেনা মোস্তাফা কামাল ও আনিসুজ্জামান। একক নাট্য-ব্যক্তিত্বের আর একটি আলোচনা হয়েছে বজলুল করিম সম্পর্কে, মূলত ড্রামাসার্কল-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে কবীর চৌধুরীর লেখায়। শেকস্পীয়র (বাংলায় শেকস্পীয়র) ও রবীন্দ্রনাথ-এর উপর (মূলত রক্তকরবী) আলোচনা করেছেন যথাক্রমে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল মোমেন। মঞ্চ, অভিনয় মাধ্যম ও নাট্য প্রকাশনার উপর আলোচিত প্রবন্ধ 'মঞ্চসজ্জার গোড়ার কথা' (ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়), 'অভিনয় : বিভিন্ন মাধ্যমে' (মোহাম্মদ জাকারিয়া), ও 'মেঘ কেটে যাচ্ছে' (মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর)। এছাড়া রনেশ দাশগুপ্ত ও শওকত ওসমানের দুটি মূল্যবান লেখা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে যা ভরপুর, সংকলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

৩.

সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের এক কঠিন সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশ নাট্যচর্চা যে নির্দিষ্ট প্রগতিতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে দুই শতাব্দীর পরাধীনতা এবং পরে ধর্মগত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ভাষাগত বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নিয়ে অতৃপ্ত স্বাধীনতা এবং তারও পরে মাত্র এক দশকের মুক্তির ইতিহাস, তাও আবার একটার পর একটা বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতার দৃষ্টান্তে ভরা।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট তো সব সময়ই একটা কঠিন ও সমকালীন সত্য। তার প্রকৃতিও ক্রমশ বদলাচ্ছে। এই সুদীর্ঘ ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যেও খোঁজ মিলেছিল বহু

প্রতিক্ষিত সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের, যিনি মানুষের বহু শুভেচ্ছা, বহু সংগ্রাম বহু প্রতিবাদকে একটা সার্থক রূপ দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হল না। সংকট মুক্তির সম্ভাবনা ক্রমশ বিলীয়মান হল। আরো গভীরে ঐ সংকটের পরিচয় পেতে গেলে নিশ্চয় আমাদের পুরো ঔপনিবেশিক অতীতটা তার কার্যকারণে ধরা পড়বে। এই বিচারের প্রয়োজন মানা দরকার। অশেষ প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা কীভাবে নাট্যচর্চার প্রসার ঘটিয়েছেন, তা দেখার বিষয়।

"বাংলা নাটকের জন্মস্থান ও বিকাশভূমি পশ্চিমবঙ্গ, এবং সেখানে রয়েছে অন্ততঃ একশ' বছরের জীবন্ত রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই সংস্কৃতি থেকে দূরে অবস্থান করছি" -১৯৭৬-এ লেখা এক প্রবন্ধে আলাউদ্দিন আল আজাদ খেদ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, "কলকাতার নাট্যসংস্কৃতি এখনো (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও) একটা বিদেশী উৎসের মতোই আমাদের কাছে বিরাজ করছে। কলকাতা ভৌগোলিক দিক থেকে প্যারীর নিকটবর্তী এইটুকু যা পার্থক্য।" এই খেদ শুধু আলাউদ্দিন আল আজাদের মতো ওপার বাংলার নাট্যপিপাসুদেরই না, আমরা যারা কলকাতায়, মফঃস্বল গ্রামবাংলায় নাট্যচর্চা করি, তারাও ঢাকার নাটকের সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে দেখতে পারি না একই ভাষার নাটক হওয়া সত্ত্বেও। ইদানিং এই জাতীয় নাট্যবিনিময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কলকাতায় একটি দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ওপার বাংলার বেশ কয়েকটি নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছি। এজাতীয় আদান-প্রদান যতোই হয় উভয় বাংলার কাছে ততই মঙ্গল।

৪.

সংকলনের শুরু মুনীর চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ দিয়ে। অনিবার্যভাবেই যা সঙ্গত। বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা তাঁদের দেশজ নাট্যচর্চায় মুনীর চৌধুরীকে একটু ভিন্ন অবস্থানে রাখেন, তাঁকে আধুনিক নাট্যচর্চার জনক বলে আখ্যা দেন। আধুনিক ধ্যানধারণা এবং আধুনিক বিশ্বনাটকের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তাঁর মাধ্যমে। সংকলিত প্রবন্ধে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের কয়েকজন আধুনিক নাট্যকারের নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আধুনিক নাটকের গতিপ্রকৃতির একটা ধারণা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মুনীর চৌধুরীর অনন্য সৃষ্টি 'কবর'। বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাসে 'কবর'

আর মুনীর চৌধুরীর নাম এক হয়ে গেছে। 'কবর' নাটকটি ছাপা হয় ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে, 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার আজাদী সংখ্যায়। লেখা হয়েছিল '৫৩ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। সঠিক তারিখ ১৭-১-১৯৫৩। কবর লেখার ইতিহাস জানতে পারি আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধ থেকে। "২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রথম বার্ষিকী সমাগত। মুনীর চৌধুরী জেলখানায় বন্দী। আরেকজন রাজবন্দী রনেশ দাশগুপ্ত অনুরোধ করলেন তাকে—জেলের মধ্যে রাজবন্দীরা অভিনয় করতে পারেন এমন নাটক লিখে দিতে হবে একুশের স্মরণে। লেখা হল 'কবর'। হ্যারিকেন প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময় অশরীরী পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হল।" নাটকটি রাজনৈতিক সচেতনায় উদ্দীপ্ত জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত প্রত্যয়বোধে ঋদ্ধ একটি সফল শিল্পরূপ। সমকালীন নাট্যচর্চায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল।

মুনীর চৌধুরীর নাট্যসাধনার সময় '৪৩ থেকে '৭১। স্বভাবতই তিনি দেশ ভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। এবং '৭১ এর যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনেই তাঁর নির্মম মৃত্যু। ফলে দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক সংকট তাঁর প্রতিটি নাটকেই নতুনভাবে ধরা দিয়েছে। তিনি অনুবাদ করেছেন বেশি। তুলনামূলকভাবে মৌলিক নাটক লিখেছেন কম। পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক মাত্র দুটি। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২) ও 'চিঠি' (১৯৬৬)। এছাড়া তিনটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বারোটি একাঙ্ক। ('কবর'; 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য')। 'মুনীর চৌধুরীর নাটক' (আবু হেনা মোস্তাফা কামাল) নিবন্ধটিতে তাঁর নাট্যকর্মের বিস্তারিত বিবরণ পাই।

৫.

নাটককে বলা হয় জীবনদর্পন। জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটছে। অভিনয় কলারও পরিবর্তন ঘটছে। আমাদের আধুনিক নাট্যশালা পাশ্চাত্য নাট্যধারা দ্বারা প্রভাবিত। সমকালীন পাশ্চাত্য নাটকের মতো সমকালীন বাংলা নাটক ও আধুনিক বাংলা নাটকের সর্বশেষ স্তর। আলাউদ্দিন আলআজাদ তাঁর নিবন্ধে বলেছেন—"সাম্প্রতিক কালে বাংলা-দেশে যে সব নাটক আমি অভিনীত হতে দেখেছি, তার বিষয়বস্তু প্রকরণ ও প্রয়োগকৌশলে এমন একটা অভিনবত্ব আছে, যাকে পুরোপুরি দেশীয় নিরিখে বিচার করা যায় না। এদের বিজাতিত্ব আমাদের চমক লাগায় কিন্তু বিস্মিত

করে না।" তিনি বলতে চেয়েছেন আমরা বিশ্বমানবিক। জাতীয়বোধ ছাপিয়ে আমরা আন্তর্জাতিকতা বোধে পৌছুতে চাই, তাই সমগ্র মানব সভ্যতাই হয়ে ওঠে আমাদের অবগাহনের অনন্ত সরোবর। এরকম ব্যাপক বিস্তৃত বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধের (আধুনিক নাট্যতত্ত্ব ও নাটক) এমন সংক্ষিপ্ত আলোচনা মনে বিশেষ দাগ কাটে না। অনুমান আলোচ্য বিষয়ের কোন মূল প্রবন্ধের অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে।

'সাহিত্য হিসাবে নাটক'—আবদুল হক-এর প্রবন্ধটিতে নাটকের সাহিত্য মূল্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নাটকের দুটো দিক আছে এক-তার মঞ্চে অভিনয় উপযোগিতা অপরটি তার সাহিত্য মূল্য। কালের বিচারে সেই সব নাটকই বেঁচে থাকবে, যে সব নাটকের সাহিত্য-মূল্য আছে, এই তাঁর মত। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক নাট্যকারের গোপন বাসনা থাকে এবং তার নাটকের সার্থকতা খুঁজে পায় মূলতঃ মঞ্চসাফল্যের উপর। মঞ্চের প্রয়োজনেই নাটকের উৎপত্তি তারপর সাহিত্য হয়ে উঠলে সে নাটক যথার্থ, এইটুকু বলা যায়। শেকস্পীয়র বা রবীন্দ্রনাথ-এর নাটকের সংলাপ বিচ্ছিন্নভাবেও এক একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য। নাট্যমঞ্চে উচ্চারিত হওয়ার পরও যার আবেদন ধ্বনি নিঃশেষ হয়ে যায় না।

বারবারই পাঠের ইচ্ছা জাগে। এসমস্ত কথা সত্ত্বেও মঞ্চের প্রয়োজনে সৃষ্ট নাটক যাকে মফিদুল হক 'স্ক্রীপট' বলেছেন এবং আগাগোড়া ঐ জাতীয় নাটকে সাহিত্যমূল্য খুঁজে না পাওয়ায় সমগ্র নাট্যচর্চাকে ব্যর্থ বলে মতামত প্রকাশ করেছেন তা সর্বাংশে ঠিক নয়। নাট্যশিল্প একটা আলাদা মাধ্যম, 'দর্শন' যেখানে শ্রবণের সঙ্গে মিশেছে। যার সাথে অন্যান্য কারিগরি, যেমন আলো, মঞ্চসজ্জা ও নেপথ্য সঙ্গীত সকলের যৌথ সৃষ্টি নাটক। ফলে সাহিত্য হিসাবে কোন নাটক যেমন 'কল্লোল' যুগোত্তীর্ণ না হলেও মঞ্চ সাফল্যে 'বিপ্লব' এনেছিল। নাট্য সাহিত্যে 'নবান্ন'-এর ভূমিকা যাই হোক, কিন্তু মঞ্চ-প্রয়োগে 'নবান্ন' অনন্য। তাই তিনি অতি সহজেই 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় (কোলকাতা) পশ্চিমবাংলায় একহাজার নাটক ও নাট্যকারের তালিকা দেখে হতাশ হন এবং মত প্রকাশ করেন 'পনের বছরে হাজার খানেক নাটক লিখিত হওয়ার অর্থ সবই অসার্থক রচনা।'

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই, নানারকম বিপর্যয় আর সংঘাতের দৃশ্যমান রূপায়ন-ই নাটক। এই যে জীবনের গভীরেই জীবনের মুক্তি-খোঁজার স্পৃহা, এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তার ক্রমাগমন, এই যে শিল্পধারা,

শিল্পচর্চা—এই শিল্পচর্চাই নাটক। ফলে নাটকে ধরা পরে সমকালীন জীবনের কথা, মানুষের কথা, সমকালীন ধ্যান ধারণার কথা। ফলে অন্য পাঁচটা শিল্পের মত নাটক ও সমাজ চিন্তা রাজনৈতিক চিন্তা বহির্ভূত হতে পারে না। এই নিরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে আবু কায়েস মাহমুদ বলেন, 'পলিটিক্যাল থিয়েটার'-এর কথা। তিনি তাঁর 'থিয়েটার ও রাজনীতি' প্রবন্ধে সরাসরি বলেন, "সেই জন্যই চাই বিপ্লবী কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং তার সহযোগী পর্যায়-গুলিতে আরো ঈপ্সিত গণমুখিনতা, যার সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত হবে সাংস্কৃতিক চেতনাশক্তি। আর নাট্যকলার উপস্থাপনায় যখন একজন শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মেহনতি মানুষ দেখতে পায় শ্রমিক উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছে, বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহে আত্মহারা কৃষক জমি দখল করে নিচ্ছে তখন সে সাময়িক ভাবে আনন্দ-বেদনার রসানুভব করলেও স্থায়ী আনন্দ চর্বন সপক্ষে উদ্বেলিত হয় না। কারণ উন্নয়নশীল দেশের থিয়েটারে শ্রমিকশ্রেণী দেখতে চায় তার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি, তার ভূমিকা হঠকারী আন্দোলনের উগ্রতায় পর্যবসিত হয় নি। সার্বিক চেতনায় শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যরীতি সে অনুসরণ করতে চায় গণ শিল্পচর্চায়।" আসলে আদর্শ শিল্প-কর্মের ভাষা বুঝতে হবে। দর্শককেও যথার্থ চিন্তা ও ভাষা বোঝাতে হবে, নয়তো গণশিল্পের আহ্বান শুধু আস্ফালনে পর্যবসিত হবে। আবদুল্লাহ্ আল মামুন-এর লেখায় কমার্শিয়াল থিয়েটারের ক্যাবারে নাচের বিপক্ষে তার অভিজ্ঞতা জানা যায়, "অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে 'চৌরঙ্গী' দেখেছি, নাটক দেখতে গিয়ে ক্যাবারের অহেতুক রোমান্টিক সংলাপের অসহ্য নির্যাতন সহ্য করেছি। পাশাপাশি দেখেছি নান্দীকার 'তিন পয়সার পালা' নিয়ে হাউসফুল অভিনয় করে চলেছেন।" বলতে চেয়েছেন গণশিল্পকে উন্নত আর্টকর্মে উন্নীত করে লড়াইয়ে নামালেই তবে জেতার সম্ভবনা থাকে নয়তো বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে মার্কস মুখস্থ বলে নাটকের শেষে পেছনে লাল আলো জ্বালালে নাট্যআন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হবে। চিন্তা ও ক্ষমতার অপদার্থতাকে 'গণথিয়েটারের ব্যর্থতা বলে পরিগণিত হবে। একথা বাংলা-দেশের নাট্যচর্চায় বিভিন্ন প্রবন্ধে বারবার বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

৬.

পাকিস্থানী আমল থেকেই পূর্ববাংলার নাটকেও একটা ধারা লক্ষ করা যায়। ইব্রাহিম খাঁ-র 'কাফেলা' ও আবুল ফজলের 'কায়েদ আজম' দিয়ে

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে জাতীয়তাবাদী নাটকের ধারা উদ্ভাবিত হয়। মুসলিম আত্মানুসন্ধানের রাজনৈতিক আবেগের প্রবলতা স্বাভাবিক ভাবেই এই পর্যায়ে মানুষের অন্যতর কোন পরিচয়ের বৃত্তে নাটকের ফোকাসটিকে সংস্থিত হতে দেয় নি। ফলে চিরায়ত নাটকের বিষয়বস্তু কাল চিহ্নহীন সম্প্রদায় নিরপেক্ষ বিশুদ্ধতা নাট্যকারদের কল্পনার বাইরে থেকে গেছে। পরবর্তীকালে মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এই জাতীয়তাবাদী ধারার নাটক থেকে খুব বেশী দূরে নয়। চরিত্র-সংঘাতে ও নাট্যকুশলতায় মুনীর চৌধুরী, আবুল ফজল বা ইব্রাহিম খাঁকে অতিক্রম করে গেছেন অনায়াস সাফল্যে। তবে তাঁর সমগ্রজীবনের নাট্যকর্মের সীমাবদ্ধতাও মুসলিম সমাজে নাট্য সংকটেরই ভিন্নতর দ্যোতক।

আসকার ইবনে শাইখকে দিয়ে মুসলিম সামাজিক নাটকের ধারার শুরু। আনিস চৌধুরীর মধ্যেও তা প্রবাহমান। আসকার ইবনে শাইখের নাটকে সম্প্রদায়গত পরিচয়টি ক্রমশঃই গৌণ হয়ে আসে। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা, প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের, প্রথাগত গ্রামীণ সমাজ অবস্থানের সঙ্গে আধুনিক সমাজ সংস্থানের বিরোধ তাঁর বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আর আনিস চৌধুরীর নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্বিরোধ, দীনতা ও ট্রাজেডি মূলতঃ প্রাধান্য পায়।

বিভাগোত্তর পূর্ববাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য চরিত্রেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক নগর সভ্যতার সঙ্গে সনাতন, গ্রামীণ মূল্যবোধের বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি আধা আন্তর্জাতিক শহর গড়ে ওঠে ত্রিশ বছরের পরিসরে। বিবিধ বিচিত্র জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আশঙ্কার হাতছানি যুগান্তব্যাপী স্থাণুসমাজকে সচকিত করে তোলে। এর কিছুটা প্রাক্ চেতনা আসকার ইবনে শাইখ ও আনিস চৌধুরীর নাটকে দেখা গেলেও উনিশশো বাহাত্তরে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট-পালাবদলের দিনে ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ার কারণে একগুচ্ছ তরুণ নাট্যকারের আবির্ভাবে যে বিস্ফোরণের তীব্রতা সূচিত হয় তার তুলনায় পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টা প্রায় কিছুই নয়।

কারণ হিশাবে আলি আনোয়ার তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন "বস্তুতপক্ষে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১-এর গণ-আন্দোলন, ২৫শে মার্চ ও তৎপরবর্তীকালীন গণহত্যা ও প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা, পুরনো মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছে তরুণদের মনে। তরুণ সম্প্রদায় স্বাধীনতা আন্দোলনের মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

যে মহৎ প্রাপ্তির সূচনা করেন, তা অগ্রজরা দূরতম কল্পনাতেও ভাবতে পারেন নি।" আসলে দেশের প্রতি রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধে পরিবর্তিত হয়।

মমতাজ উদ্দিন আহমেদ একগুচ্ছ তরুণ নাট্যকার ও নাট্যচর্চার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে পেয়েছেন পূর্বতনদের চারটি ঘটনা।

(ক) ১৭৯৫—১৫ নভেম্বর। লেবেদেফের প্রযোজনায় বাংলায় রূপান্তরিত 'ছদ্মবেশী' নাটকের অভিনয়।

(খ) ১৮৫৯—৩ সেপ্টেম্বর। মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'-র অভিনয়।

(গ) ১৮৭২—৭ ডিসেম্বর। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' অভিনয়।

(ঘ) ১৯৫৩—২১ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের একটি কক্ষে রাত দশটায় আট দশটি হ্যারিকেনের আলোয় মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটকের অভিনয়।

ফলে বাংলাদেশের বাংলা নাটকের আধুনিক প্রেরণা এগুলিই। তাই সাম্প্রতিক কালের নাট্যচর্চা বলতে ১৯৪৭ সাল, ভারত বিখণ্ডের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের তারিখ, তারপর আর এক ধাপ ১৯৭১, ঘোলাটে, আলো আর নিরুত্তাপ অন্ধকারের মধ্যে 'এল ঝড় অবশেষে'। যুদ্ধ শুরু হল, ১৮৭০-এর নভেম্বরের জোয়ারে গাঙের ব-দ্বীপের মানুষ, সমুদ্রের নোনা জলে ডুবে মরেছিল, আর ১৯৭১-এর মার্চের জোয়ারের টানে এ দেশের মানুষ দেশ ছেড়েছে, না হয় রুদ্ধশ্বাস শঙ্কায় অন্ধকারে বসে আলোর তপস্যা করছে, অবশেষে একদিন স্বাধীন হয়েছে দেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ভিত্তিক ছত্রিশ জন নাট্যকারের উনপঞ্চাশটি নাটকের তালিকা দিয়েছেন মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। সব নাটকই বাহাত্তর-তিয়াত্তরে রচিত। পাকিস্থানী সৈন্যদের বন্দীদশা গ্রহণ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অন্তবর্তীকালে রচিত। কালের বিচারে, সাহিত্যের বিচারে এ সব নাটকে যেমন অক্ষয়মূল্য নেই, তেমনি আবার অবক্ষয় মূল্যও নেই। এমন চিহ্নিত, উন্মত্ত এবং উদ্বৃত্ত বাণী-যোজনাকারী নাটকের কাছে শিল্প কুশলতাও দাবি করা নিরর্থক। এসব নাটকে শুধু আছে যুদ্ধের সংবাদ। আছে নারী ধর্ষণের চিত্র। প্রমত্ত উন্মাদনা আছে, মাঠের করতালি-কাঁপানো সংলাপ আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক নাট্যচর্চায় যে জোয়ার বয়েছে তার কারণ ছিল এই একটাই, একথা অস্বীকারের উপায় নেই।

৭.

গত কয়েক বছর যে কজন নাট্যকারের রচনা বহুল আলোচিত এবং বহুল অভিনীত হয়েছে, তাঁরা হলেন সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন, সেলিম আল-দীন ও মামুনুর রশীদ। এই চারজন নাট্যকার বাংলাদেশে নবনাট্যের ভিত্তিকে মজবুত করেছেন, সর্বোপরি কালের দাবি মিটিয়েছেন। আমরা এপার বাংলায় বসে দেখেছি আবদুল্লাহ আল মামুনের 'এখনও ক্রীতদাস' কিম্বা সেলিম আল দীন এর 'কিত্তন খোলা' বুঝেছি এই শক্তিমান নাট্যকারেরা বাংলাদেশ নাট্যসাহিত্যের সম্পদ।

সৈয়দ শামসুল হক মূলত কবি ও ঔপন্যাসিক বলে পরিচিত। কিন্তু এযাবৎ মুক্তিযুদ্ধের ওপর শ্রেষ্ঠ নাট্য কর্ম 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাট্য-কর্মের স্রষ্টা তিনি। ভাষার গীতিমাত্রার গ্রামীন জীবন থেকে নেওয়ার অসাধারণ ব্যবহারে তিনি মুন্সীয়ানার পরিচয় দেখিয়েছিলেন উক্ত কাব্যনাট্যে।

যুদ্ধোত্তর হতাশা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে লেখা নাটক 'সুবচন নির্বাসন' বাংলাদেশে প্রায় সর্বাধিক অভিনীত নাটক। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন। 'এখন দুঃসময়' ও 'এখনও ক্রীতদাস'ও তার অন্যতম মঞ্চসফল নাটক। সর্বাধিক আলোচিত নাটক 'ওরা কদম আলী'। নাট্যকার মামুনুর রশীদ। রামেন্দু মজুমদার এর মতে 'সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সমাজ সচেতন, 'এখানে নোঙর' 'গিনিপিগ' ও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে।

তরুণতম নাট্যকার সেলিম আল দিন বাংলাদেশে সব চেয়ে আলোচিত নাট্যকার, 'সংবাদ কার্টুন'-এর মধ্য দিয়ে যাঁর আবির্ভাব। 'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন' করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা, সাম্প্রতিক নাটক কেরামত মঙ্গল-এর মধ্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু। তার নতুন রচনা বাংলাদেশ নাট্য-সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করবে আমাদের বিশ্বাস।

৮.

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা প্রবন্ধ সংকলনটি পড়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশ নাট্যচর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ আভাস পাওয়া যাবে। আমরা যারা এপারে নাট্য-কর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং ইদানিং কালে-ভদ্রে বাংলাদেশের দু একটি নাটক দেখার সৌভাগ্য পাই, তারা এইরকম একটি সংকলনে আকাঙ্খিত বহু নাট্যতথ্যেরই সন্ধান পাব। রামেন্দু মজুমদার সংকলনটি সম্পাদনার ব্যাপারে সমস্ত দিকেই সবিশেষ নজর রেখেছেন একথা আগেই বলেছি, কিন্তু নাট্যকর্মী হিসাবে নাটকে

আলোক সম্পাতের ওপর কোন আলোচনা না রেখে আমাদের অপূর্ণ রেখেছেন। আমরা জানতে পারিনি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রূপ সজ্জার গুরুত্ব। সাম্প্রতিক নাট্যকার ও নাট্যদলের নাটকে পরিচয় পেয়েছি। অভিনয় জগতে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোন তথ্য আমরা পাইনি। আমরা পাইনি পরিচালকদের নাম। জানতে পারিনি ওপার বাংলায় কোন্ নতুন 'তাপস সেন' কিম্বা 'শক্তি সেন' তৈরী হয়েছেন কিনা, মঞ্চসজ্জায় নতুন ডাইমেনশন এনেছেন এমন কোন নাট্যব্যক্তিত্বের নাম।

পাওয়ার তুলনায় যদিও এগুলো খুব নগণ্য তবু ২য় সংস্করণে আশা করি উক্ত নতুন বিষয়গুলি সংযোজন হবে।

পরিশেষে রামেন্দু মজুমদার এর 'সম্পাদকের নিবেদন' এর শেষ পংক্তির উত্তরে বলছি বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে একটা প্রাথমিক পরিচয় অবশ্যই পেয়েছি এবং উক্ত শ্রম সার্থক হয়েছে, আর তাঁর লিখিত প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭২-৮৬'-এর শেষ পংক্তি দিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

"স্বাধীনতার পর নাটক যতদূর এগিয়েছে, তাতে গর্ব করার অধিকার আছে নাট্যকর্মীদের, তবে আত্মতৃপ্তির অবকাশ নেই। নাটক তো চলমান শিল্প। দর্শকদের প্রত্যাশা প্রতিদিন বাড়ছে। আমরা নিশ্চিত, নাট্যকর্মীরা নতুন নতুন প্রত্যয়ে সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে যাবেন।"

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা। রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত। মুক্তধারা। ঢাকা বাংলাদেশ। সাদা : সত্তর টাকা। লেখক প্রিন্ট : বাহাত্তর টাকা।

রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদনের নতুন পথ

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সর্বশেষ স্তরে এসে একটি কবিতায় লিখলেন :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।

১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই সকাল সাড়ে নটায় মুখে মুখে বলে গেলেন কবিতাটি। 'শেষ লেখা' নামে প্রকাশিত কবিতা-অংশের ১৫ নম্বর কবিতা এটি। জীবনের শেষ কবিতাও বলা যায় এটিকে।

এর প্রথম শব্দ 'তোমার' এই সর্বনামটি নিয়ে সাধারণভাবে সংশয় নেই। সৃষ্টির অন্তরালবর্তিনী কোনও শক্তিকে 'ছলনাময়ী' মনে করেছেন তিনি। তিনি নিপুণ হাতে সরল জীবনের মধ্যে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতে রাখেন। এই ছলনা যে সহ্য করে সে পায় সেই ছলনাময়ীর হাতে শান্তির 'অক্ষয় অধিকার'।

যদি জীবন ও সৃষ্টির বিরাট ক্যানভাস থেকে তুলে এনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবন ও কাব্যসৃষ্টির অপেক্ষাকৃত ছোট ক্যানভাসে একথা স্থাপন করা যায় তাহলেও যে কাব্যস্বাদময় প্রকরণগুলি পাই, যে আস্বাদময় মুহূর্তগুলি লাভ করি তাতেও সত্য হয়ে ওঠে একই উক্তি। সত্য হয় বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ চিত্রকল্পগুলি।

যে কাব্যপ্রকরণগুলি তাদের মনোহরণ ক্ষমতায় আমাদের আবিষ্ট করে রাখে তারপর তো সহজ পথ নয়। সে তো বহু উপমা ও সাদৃশ্যের ধারায় অলক্ষ্যভাবে আমাদের মন জয় করে বসে থাকে তার জন্য তো আমরা সময় দিই না। ভাল লাগল এই কথাটি মনে বলে চলে যাই। কেন ভাল লাগল তার কারণ ভাবতে বসেন এখন সহৃদয় সামাজিক কেউ কেউ আছেন। তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কত রহস্য এই ভাল লাগার অন্তরালে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রীদেবদাস জোয়ারদার সেই সহৃদয় সামাজিক পাঠক—যিনি আস্বাদন করেই ক্ষান্ত হননি, একটা নির্মোহ বিজ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জটিলতাকে। জটিল জালিকাটি তুলে ধরে পাঠককে তার বর্ণালী সুষমা প্রদর্শন করে সেই স্বগত উক্তি করেন,

> 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি
> বিচিত্র ছলনাজালে',

নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টির অন্তরালবর্তিনী কোনও ছলনাময়ীকে সম্বোধন করছেন না। তাঁর সমস্ত অন্বেষণ যাঁর কাব্যসৌন্দর্যের স্বরূপ অনুধাবনে নিবিষ্ট সেই রবীন্দ্রনাথকেই তাঁর সম্বোধন।

রবীন্দ্রকাব্যপাঠে বিস্মিত পাঠক এই শিরোনামই বেছে নেবেন বইয়ের জন্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি রবীন্দ্রকাব্যের একটি পংক্তিমান ব্যবহার করলেন শিরোনামে কিন্তু তার সঙ্গে আরও যে সব কাজ করলেন তা উপ-শিরোনামে বিশদীকৃত করলেন: 'রবীন্দ্রকবিতার চিত্রকল্প—উৎস. সৃষ্টি অনুবৃত্তি।' বইয়ের নামে বিস্ময় আছে কিন্তু উপশিরোনামে আছে তাঁর গভীর অভিনিবিষ্ট সন্ধানের পরিচয়।

২.

উপমা না চিত্রকল্প? বাক্‌প্রতিভা না ইমেজ? কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে আলোচনার মাপকাঠিগুলি স্থির করে নিতে হয়। দেবদাসবাবু উপমা শব্দের অনেক অর্থবহনক্ষম শক্তির কথা বলেও চিত্রকল্প শব্দটিকে বেছে নিয়েছেন এই জন্য যে উপমাতে একটা যথার্থ পরিমাপের প্রত্যাশা থাকে, চিত্রকল্প সেই যথার্থ পরিমাপনের দায়টি ঘুচিয়ে দেয়—শুদ্ধ মনের আলোয় জ্বলে ওঠা সাদৃশ্যকে পরম যত্নে আস্বাদন করায়।

এই আস্বাদনের জন্য তিনি নতুন কিছু করছেন বলে দাবী করেন নি।

তাঁর বক্তব্য, মানুষ যখনই ভাষায় কথা বলে নির্মাণ করে শব্দরাজি তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে চিত্রকল্পসন্ধানী। ফলতঃ 'নক্ষত্র' শব্দ যখন কেউ প্রথম উচ্চারণ করেছিল তখন সে দেখতে পেয়েছিল রাতের আকাশের প্রহরীকে নক্ রাত্রি আর ক্ষত্র তার প্রহরী। সে যখন 'নদী' শব্দ উচ্চারণ করেছিল তখন তার উপলব্ধিতে ছিল জলধারার সেই সত্তা যে কি না 'নদতি' শব্দ করছে। বিদ্যুৎ মনে জাগিয়েছিল দ্যুতি, খদ্যোৎ বহন করে এনেছিল আকাশের সেই আলো যা বিদ্যুতেও দ্যুতিমান।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৮।১১) যে অক্ষরপুরুষের কথা চিন্তা করেছিলেন সেই আমলের স্রষ্টারা, তাঁরা তাঁকে দিয়ে আকাশকে বস্ত্রের মত আবৃত কল্পনা করে যে শব্দবন্ধে তাঁর বর্ণনা দিয়েছিলেন তা হল 'ওতোপ্রোত'। এতস্মিন্ খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ। ওত মানে কাপড় বোনার টানা সুতো আর প্রোত চওড়া দিকের সুতো। টানাপড়েনে গাঁথা বস্ত্রের মত অম্বর আবৃত করে তিনি আছেন। এসব যে চিত্রকল্পই তাতে সন্দেহ নেই। তবে বহুব্যবহারদীর্ণ ওতোপ্রোত শব্দের এই মানে মনের কাছে যে এল তা দেবদাসবাবুর কৃপা আলোকসম্পাতের জন্যই।

এতো শুরুর কথা। দেবদাসবাবুর অসাধারণ সংবেদনশীল মন রবীন্দ্রকাব্যের অসংখ্য চিত্রকল্পের আস্বাদন পর্বে পৌঁছবার আগে পাঠককে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য দেখিয়েছেন চিত্রকল্পের আশ্চর্য ব্যবহারে মেঘদূত বা মৃচ্ছকটিক প্রাচীন হয়েও কতখানি আধুনিক। আকাশহর্ম্য থেকে দিগন্তে নেমে আসা চাঁদ অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার জায়গা করে দিচ্ছেন এ বর্ণনায় অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্যের সম্ভাবনায় আধুনিক মন কিন্তু খুশি হয়ে ওঠে না। তেমনি আধুনিক কবিতার আপত্তি পারম্পর্যবিহীন বর্ণনার মধ্যেও কীভাবে থাকে একটা texture বা বুনট যার আড়ালে গোপনে গোপনে কাজ করে যায় একএকটি চিত্রকল্প একথা জেনেও মন খুশি হয়ে ওঠে। হয়তো সে চিত্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ—বা সিনেসথেসিয়া (Synaesthesis)

> 'চাঁপার কাঞ্চনআভা সে যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা
> নাগকেশরের গন্ধ সে যে কার বেণীবন্ধে বাঁধা।'

কিংবা

> 'করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণ ঝঙ্কার সুরে মাখা,
> কদম্ব কেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় মাখা।'

বিরহিণী চাঁপার কাঞ্চনআভা কাঞ্চনান্বিত হয়ে উঠেছে তা কার সোনার কণ্ঠস্বরে সাধা হয়ে—বেণীবন্ধনে বাঁধা পড়ে নাগকেশরের গন্ধ। করবীর রাঙা

রঙ কঙ্কণঝঙ্কারের সুরে মিশ্রিত কিংবা সারারাত্রি জাগরণজনিত বেদনায় কদম্বকেশরগুলির রূপ ফুটে উঠছে এ সবের মধ্যে সাদৃশ্য নয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিপর্যস্ত প্রকাশই ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা দীর্ঘদিন ধরে শিখে চলা এক একটা পৃথক কবিতার মালা। কিছু ফুল নিয়ে এক একটা মালা, কিছু কবিতা নিয়ে এক একটা কাব্যে রূপ নিয়েছে। একই বিষয়ে বড় কাব্য তিনি লেখেন নি। এই গীতিকবিতার মালাও পরস্পর যোগসূত্র রেখে চলেছে। পূরবীর বিপাশা, প্রভাতী, মধু, বনস্পতি, শেষবসন্ত, আশঙ্কা, মিলন এসব কবিতায়, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এইরকম একটা বুনট ধরা পড়ে।

এসব নতুন চিত্রকল্প ও কবিতাপরম্পরায় ধরা তার বুনটটি যত বিশ্লেষণ করা যায় ততই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আস্বাদ্যমানতা বাড়তে থাকে। প্রশ্ন ওঠে চিত্রকল্পগুলি কি রবীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পেয়েছেন। তা নয়। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যবহার প্রেরণা নিশ্চয়ই প্রথমতঃ পেয়েছিলেন ইংরেজী সাহিত্য থেকে।

শেলী যখন Epipsychidion-এ লেখেন :

...our lips
With other eloquence than words

রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর অনুবাদ করেন :

মোদের অধরদুটি কথা ভুলি গিয়া
কবে শুধু উচ্ছসিত চুম্বনের ভাষা।

এই ভাষাভঙ্গি বুঝে উঠতে পারেন নি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদরা, বুঝতে পারেন নি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতিরা। বিশুদ্ধ উপমার বদলে শব্দ-স্পর্শ-ঘ্রাণ একাকার হওয়া ইন্দ্রিয় ও চিত্রকল্পগুলি এসব পংক্তির মধ্যে ধরা পড়েছে, এরকম ব্যবহারে তাঁরা আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না।

দেবদাসবাবু দেখিয়েছেন শ্রব্য ও দৃশ্য এই দুই জাতের কল্পনাতেই রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ ঐশ্বর্যসম্পন্ন। শ্রব্য-কল্পনার মধ্যে বিশ্লেষিত অবস্থায় ধরা পড়ে স্বরব্যঞ্জনের ব্যঞ্জনাঢ্য ইঙ্গিতবহ ধ্বনি।

যদিও I. A. Richards থেকে অনেকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির বিশেষ বিশেষ ভাববহন বা ভাবসংক্রমণ ক্ষমতার কথা বলেছিলেন—কিন্তু এ ব্যাপারটাতে যতটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও নির্মোহ পরীক্ষণ-রীতি প্রয়োগ করা উচিত ছিল ততটা পরীক্ষণ আজও হয়েছে কি না জানি না। কিন্তু আপাত-ভাবে ধ্বনি পরম্পরার বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা মন্দ লাগে না।

আ-কারে আছে উদার বিস্তৃতি—পক্ষান্তরে উ-কারে আছে ক্ষুদ্রতা, ছোট্ট ভাবটুকু বহু উপকরণে পরীক্ষাকার সর্বজনীন সত্য বলে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে কি না তা বলা মুস্কিল। কিন্তু যখন শুনি

চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা

কিংবা রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুর ধারা খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা

তখন অজস্র আকার একটা মহাশূন্যের অসহায় বিস্তৃতির ভাব বহন করে—এ কথা সত্য বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে

ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা
করেছিনু আশা

এর উ-কারগুলি আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতির বদলে ক্ষুদ্রতার প্রতিই ইঙ্গিত করছে—এ সব কথাও ঠিক বলে মনে হয়।

কিন্তু যখন দেখি :

'তরল আর ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনে করুণ কোমলতা, দন্ত্য ও মূর্ধণ্য ব্যঞ্জনে কঠোরতা, বিবৃত স্বরে বিস্তার ও দূরত্ব সংবৃত্ত স্বরে ক্ষুদ্রতা, মৃদুতা ও মমত্ব প্রকাশ পায়।' —তখন এ সব উক্তির সর্বঘাতসহ সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু দেবদাসবাবু যখন দেখান :

আজি মুকুলদল খুলিল, দুলিল রে দুলিল
মানস সরসে রস পুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল

'মানসসরসে রস' শব্দবন্ধের উষ্ম ধ্বনি 'স'-তে আস্বাদ ও তরল ধ্বনি 'ল'-তে জলের তরল কলরব আমাদের ইন্দ্রিয়সীমায় এসে ধরা দেয়"—তখন সংশয় যেন চলে যায়। মনে হয় এমনি করে দেখিয়ে না দিলে এসবের কাব্যস্বাদ নেবার ক্ষমতাই থাকত না আমাদের।

এ জাতীয় বিশ্লেষণে দুয়ারের পর দুয়ার যায় খুলে। 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে / তব কুঞ্জবনে / বসন্তের মাধবী মঞ্জরী / যেইক্ষণে দেয় ভরি মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল / এসব পংক্তির অনুপ্রাণিত ভাষণের অন্তরালে দুটি ঘোষধ্বনি ঞ ও জ কখন একটি ঘোষ ও অপরটি অঘোষ ঞ ও চ-তে রূপান্তরিত হয়ে মালঞ্চ ও মাধবীমঞ্জরীর ক্ষয়িষ্ণুতার ভাবটিকে কীভাবে ধ্বনিত করে তা যেন হঠাৎ বুঝতে পারি—" 'মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল'-এর 'ঞ্চ'-র পাশেই 'ল'-র তরল আঘাতে চলিষ্ণুতার ভাবটিই কানে বাজে। এ শুধু অনুপ্রাসই নয় অনুভবও

বটে। পড়ার পরেও বারবার ফিরে ফিরে এই চরণটি মনের মধ্যে বাজতে থাকে। 'বিদায় গোধূলি আসে / ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল' এই চরণের পর্বদুটির প্রথম শব্দ দুটি 'বিদায়' আর 'ধূলায়'-এর দীর্ঘ স্বরের করুণ গম্ভীর মধ্যমিলের বিলম্বিত উচ্চারণে বসন্তশেষে অজস্রফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। চিত্রকল্প অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ, চোখ পেরিয়ে প্রথম কানে বাজে। তারপর মর্মে এসে এখানে কলধ্বনি তুলছে। দৃষ্টি ও শ্রুতি পরস্পরের সীমা ছাড়িয়ে এভাবে শ্রেষ্ঠ কবিতায় একাকার হয়ে ওঠে। এ সবই কাব্যকল্পনার মায়াবী স্পর্শে সম্ভব হয়।"

এই উদ্ধৃতিটি তুলে দিলাম এই কারণে যে পাঠক বুঝতে পারবেন এ বই পড়ে নতুন করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে কীভাবে লোভ লাগে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করতে ইচ্ছে হবে ভাল লাগার উপকরণগুলি কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। বারবার চাখতে ইচ্ছে হবে সেই সব উপাদান। আর এ সত্য শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষেত্রে নয়—বস্তুত দেবদাসবাবুর বই নতুন করে আমাদের কবিতার অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তার অন্দরে বিভিন্ন মহলগুলি সেই মহলের নিত্য অধিবাসীর মত চিনিয়ে দেয়। তখন মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কেন, আধুনিক কবিদের কাব্যর অন্তরতর স্বাদ পাবার জন্যও এইরকম আশ্চর্য পথ প্রদর্শককে আমাদের প্রয়োজন ছিল।

৩.

রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রকল্পের উৎস সন্ধান করতে গেলে অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে প্রথমত বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের দিকে, দ্বিতীয়ত আমাদের চারপাশে ছড়ানো লোকজীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের দিকে।

গবেষকের স্থির অন্বেষক-বিচারবুদ্ধি দিয়ে দেবদাসবাবু কালিদাস, ভবভূতি, বানভট্টের জগৎ ছাড়াও রামায়ণ মহাভারতের বিস্তৃত সাম্রাজ্য পর্যটন করেছেন। কোথায় রামায়ণের সীতার কাছে পাঠানো আংটি, কোথায় বিরহিণী নায়িকার কাছে পাঠানো যক্ষের বার্তা, যা পাঠানো হয়েছিল মেঘের মাধ্যমে—সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি এক অক্ষয়ভাণ্ডার খুঁজে পাচ্ছেন—সে ভাণ্ডার চিত্রকল্পের। সেখান থেকেই ধরা যাক মহুয়ার 'ঝামরী' কবিতায় উঠে আসে

সে যেন অশোকবনে সীতা
চারিদিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয়
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়

কিংবা বাল্মীকি উঠে আসেন 'সাবিত্রী' কবিতায়

তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও আদিকবি
ধ্বংস করি তম

অহল্যা উঠে আসেন রামায়ণ পেরিয়ে, পুরাণের মীথের মধ্য দিয়ে উঠে আসে মহাভারতের অভিজ্ঞতা লব্ধ দ্যূতসভা

দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়

কালিদাস থেকে চলে আসে কত যে চিত্রকল্প তার ইয়ত্তা নেই। যক্ষবধূ বিরহের বাকি দিনগুলিকে দেহলীতে রাখা ফুল দিয়ে গণনা করছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে যখন শুনি উদাস হাওয়ায় ঝরে পড়া ও পিয়ার কোলে ফুটে ওঠা ফুলগুলি দিয়ে মালা গাঁথার কথা আর মালা গাঁথবার সময় তাঁকে স্মরণ করবার জন্য মিনতি—মালাগাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনাভরে যেন আমায় স্মরণ করে, তখন চমকে উঠি চিত্রকল্পের সাদৃশ্যে। চমকে উঠি শিশুতীর্থ পড়ে।

মা বসে আছেন তৃণশয্যায় কোলে তার শিশু
উষার কোলে যেন শুকতারা

এ ছবির আড়ালে রঘুবংশের শ্লোকে ধৃত চিত্রকল্প রাত্রির গর্ভে প্রভাতের যেমন শুকতারা তেমনিই সুদক্ষিণার গর্ভে তাঁর পুত্র।

উদাহরণ বাড়িয়ে কতদূর যাব। দেবদাসবাবু মিল দেখাতে বসেন নি। আসলে প্রাচীনকালের কল্পনার শুভ্র সূর্যকিরণ যেন বর্ণালী বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে ছড়িয়ে পড়েছে। সপ্তবর্ণচ্ছটায় তাঁর কাব্য যে পরিণতি পেয়েছে তা খুঁজে দেখার মধ্যেও এক আনন্দ আছে। সেই আনন্দ তিনি পেয়েছেন আমাদেরও পেতে শিখিয়েছেন।

এ আনন্দ পুনরায় পাই লোকসাহিত্যে বিধৃত চিত্রকল্পগুলির আশ্চর্য ব্যবহারে। রূপকথাবাহিত জগৎ, লোকসাহিত্যবাহিত উপাদান যেমন নৌকো, পদ্ম, পাখি, তেপান্তরের মাঠ, কৃষ্ণরাধিকার পালা, ছড়ার জগৎ, কলসীতে জলভরা, আকাশপ্রদীপ জ্বালোনো, সেঁজুতিব্রত, এর দান কি কম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চিত্রকল্পের ভাণ্ডারে? ভাণ্ডার কি পুষ্ট করে তোলেনি তাঁর শৈশবস্মৃতির জগত থেকে বয়ে আসা ঘণ্টাধ্বনি, দোলনার ছবি তাঁর শৈশবকাল থেকে দেখে আসা সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের ছবি, রুদ্ধগৃহ বা পথপ্রান্ত বা বটগাছের বিস্তার? চারদিকে ছড়ানো অতল অনন্ত জীবন যেন, কবি তার থেকে আশ্চর্য চিত্রকল্পগুলি তুলে আনেন।

গ্রন্থকার তাঁর বিশ্লেষণী চোখ দিয়ে আমাদের সেই আশ্চর্য যাদুভাণ্ডারটি দেখিয়ে দেন।

৪.

গ্রন্থের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ স্থষ্ট চিত্রকল্পগুলির ব্যবহার যা রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা আজও করে চলেছেন। একদিন উপমার স্পষ্টতার জগতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট অপূর্ণ বিশ্লেষিত চিত্রকল্পগুলি দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালের আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথকে, অতিরিক্ত সুবোধ্য মনে করে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন—নিয়তি এমনিভাবেও পরিহাস করে। আশ্চর্য এই যে সেই আধুনিক কবিরাও নিত্য আহরণ করে চলেছেন চিত্রকল্পের ফসল অথচ সে ফসল ফলেছে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারের সুফলা পলিমাটিতে। কালিদাসের কাব্যের অনুষঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যে বাহিত হয়েছে ঢের সময় পরে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পও তেমনি পরবর্তীকালে কেউ বহন করে নিয়ে যাবে পূর্বপুরুষের রিকৃথের মত। কিন্তু একালে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর মত কবিও কি কম ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রচিত্রকল্প? একেই বলে অনুবৃত্তি। স্বপ্ন কবিতার উজ্জয়িনীবাসিনী নারীর সঙ্গে হাজার বছর পথ পরিক্রমণের শেষে দেখতে পাওয়া বনলতা সেনের কি কোনও মিল নেই? অমিল যথেষ্টই আছে কিন্তু 'দুদণ্ডের শান্তিতে' কোথায় যেন এক ঐক্যবোধও ধরা পড়ে। তেমনি অমিয় চক্রবর্তী বা সুধীন দত্ত তো সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রব্যবহৃত শব্দবন্ধ চিত্রকল্প, চিত্রাণু আর শব্দ। বিষ্ণু দে ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে প্রাণের গর্জন খোলা রাখার কথা। তাকে চিরস্থায়ী জটাজালে না বেঁধে গানে গানে সমুদ্রের দিকে বয়ে নিয়ে চলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি।

এঁরা ছাড়াও আরও বহু কবি যে এ কাজে নেমেছেন তার ইঙ্গিতটুকু দিয়ে দেবদাসবাবুর এই বৃহৎ গ্রন্থখানি শেষ হল। শেষ হল বলামাত্রই নতুন অতৃপ্তি এসে গ্রাস করে। এই সাহিত্যরস আস্বাদক সমালোচক আমাদের চাহিদা বাড়িয়ে দেন। কবিতার এরকম বিশ্লেষণ আরও চলুক, তাঁর লেখনী নিত্য নতুন দৃষ্টিতে চিত্রকল্প বিশ্লেষণে নিয়োজিত হোক—তাঁর সেই চাওয়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিনি—সত্য কথা বলতে কি, যেন 'চিনি আপনারে।' এই চিনিয়ে দেওয়ার কাজে আরও তিনি নিরত থাকুন এই হল পাঠকদের আন্তরিক দাবী তাঁর কাছে।

তোমার সৃষ্টির পথ—দেবদাস জোয়ারদার। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা ২৬। ৬০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্তাসংকটের গভীরতায় ও তার উত্তরণের শেষ জীবন পর্যন্ত ক্লান্তিহীন মহত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশশতকের এক অনন্য ব্যক্তিপুরুষ। এই সার্থকতার অন্যতম কারণ ব্যক্তিগতকে বৃহত্তরর সঙ্গে সংযোগ ঘটানোয়, 'এঁগাজে' হওয়ার বিস্ময়কর চলিষ্ণুতা—নিজ বাস্তব সম্পর্কে সচেতন অবহিতি। এই চলিষ্ণু অবহিতির দরুনই এই মহাকবি ভাবিত হন, সক্রিয় হন নানা বিষয়ে, কর্মকাণ্ডে, যা পাওয়া যায় না 'বিশুদ্ধ' কবিদের বিচ্ছিন্ন আধুনিকতায়—রবীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তার সংকট উত্তরণ, লড়াইয়ের জন্য এসব প্রয়োজন, এ কিন্তু তাঁর শিল্পীজীবনের বাইরের ব্যাপার নয়। এই বিস্তৃত বিজড়িত হওয়া, সংযোগের পর সংযোগের সেতু নির্মাণ ছিল বলেই কবি কাহিনীর কবি শেষ লেখায় পৌঁছান, হিন্দুমেলার কিশোর, ফ্যাসীবিরোধী প্রগতি লেখক সংঘের চূড়ামণি। ভারতীয় জাতীয় জাগরণ ও আন্দোলনের নানা পর্যায় তাঁর জীবৎকালেই দেখা গেছে, এ সম্পর্কে তাঁর মতামত স্পষ্ট। রাজনীতি যেহেতু তাঁর কাছে সমাজনীতি অর্থনীতি-নীতিশাস্ত্রর সবের সঙ্গে জড়িত এবং এর ভিত্তি সাধারণ মানুষ, সেহেতু সমগ্র ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে তিনি মিলতে পারেন নি। স্বদেশী যুগেই স্বপ্ন ও সৌন্দর্য-বোধের যে রাজনীতি তিনি চেয়েছিলেন, তার ব্যত্যয় সর্বব্যাপী দেখে সরে যান। বোঝেন গ্রামের সেই আদি-মানুষটি এ রাজনীতির বাইরে থেকে

যাচ্ছে। কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে অবহিতি তাঁর সজাগ থাকে, সভ্যতার রথের রশি যে শূদ্ররাই টানবে, এই চেতনায় তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিত হন।

বলাই বাহুল্য, বৃহত্তর সংযোগ যাঁর কবিজীবনের অন্যতম প্রবল কথা, তিনি সেই রাজনীতিকেই চাইবেন, যা জনসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধপাতে ভাস্বর, জনগণকে নৈতিক রাজনীতির মূল্যবোধ সমন্বিত রাজনৈতিক বৃত্তে আনায় প্রয়াসী, তাকে অভিনন্দন জানাবেন। স্বদেশীযুগের "ভদ্রলোক" রাজনীতির সমালোচনা 'ঘরে বাইরে'তে করেছিলেন, আর সেই কারণেই গান্ধীর সঙ্গে সব ব্যাপারে মতের মিল না হলেও তাঁকে মহাত্মা বলতে তাঁর বাধেনি—কারণ ১৯২০-২১ গান্ধী নিজের মত করে খুলে দিয়েছিলেন এই সংযোগের উৎসমুখ। বিপ্লবীসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী, বিপ্লবীদেরই সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। এক্ষেত্রে আরও স্মরণীয়, ভারতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীদের মধ্যে এরাই তাঁর শিল্পীসত্তাকে নাড়া দিয়েছিল সর্বাধিক, তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল। মতাদর্শের দিক থেকে সমর্থন না করলেও, যেখানেই রবীন্দ্রনাথ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ দেখেছেন সে বন্দীবীরই হোক, বা রাজপুত যোদ্ধাই হোক, সেখানেই তাঁর মানবিক শিল্পবোধকে সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছেন। আসলে এদের মধ্যেই তিনি তাঁর শিল্পসত্তার সংকট সমাধানের লড়াইয়ের প্রতিরূপ পান—ব্যক্তিগতকে অতিক্রম করে বৃহত্তরর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, বৃহত্তরর জন্য যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুবরণ করা।

শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে সযত্নে ও ঐতিহাসিকের তথ্যনিষ্ঠায় তুলে ধরে এই মহাভারকেই স্পষ্ট করে তুললেন এমন সময়ে যখন তাঁর সম্পর্কে সেই পুরনো কুৎসা রটনাই প্রথা হিসাবে কারুর কারুর কাছে নিত্যপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত—তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী, বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীজীবনের সঙ্কিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ—এই তিনটি প্রধান অধ্যায় ১৫ থেকে ১৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম পনেরো পৃষ্ঠায় জোড়াসাঁকোর পৃষ্ঠপট ও রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন কী না, এ প্রসঙ্গ আলোচিত। এছাড়া পরিশিষ্ট আছে, যেখানে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের, রবীন্দ্রনাথের শহর ও গ্রাম বিষয়ক এই প্রবন্ধের সমালোচনা আছে। শ্রীযুক্ত সেহানবীশ তথ্যের ইঁট সাজিয়ে যে স্থাপত্য রচনাটি করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের চলিষ্ণু মনের, মানবিক দায়বদ্ধতার চিত্রটি ধরা পড়ে। বিপ্লবীদের মত ও পথ, রবীন্দ্রনাথ

কোনদিন মানেন নি—কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তার সামাজিক-মানবিক আবেগ এমনই বিশুদ্ধ যে বারবার তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কবি-শিল্পীর দায়বদ্ধতার এটাই বড় কথা।* মতাদর্শের পার্থক্য আছে, থাকারই কথা কারণ বৃহত্তর মানুষের সঙ্গে যিনি সংযোগ চান তাঁর কাছে বিপ্লবীদের মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতা, সন্ত্রাসের পথ গ্রাহ্য হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে, তিনি এই তরুণদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। যথার্থ শিল্পী তা পারেন না চিন্মোহন সেহানবীশ নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই রবীন্দ্রনাথকে সামনে নিয়ে এসেছেন। ১৯৩৯-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "পরবর্তীকালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসীলেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে, তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে? বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ণে শুধু নিবিড় মমতা নেই, ঐতিহাসিক সত্যও আছে। এই তারুণ্য রবীন্দ্রনাথকে বারবার ভারিয়েছে—'চার অধ্যায়ে', 'শেষ কথা', 'বদনামে'। হৃদয়বিদারক প্রমাদ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এদের মধ্যেই খুঁজেছিলেন তাঁর স্বপ্নের রাজনীতিকে, তাই মহাত্মার অহিংসরা নয়, এরাই বার বার ফিরে এসেছে তাঁর উপন্যাসে-গল্পে।

অন্যদিকে চিন্মোহন সেহানবীশ চমৎকার দেখান যে বিপ্লবীরা তাঁদের অনুসৃত পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামতের গুরুত্বও তাদের কাছে বিশেষ ছিল না। দুএকবার বিতর্ক ছাড়া অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণও করেন নি। অথচ

---

* মনে পড়ে জঁ্যাপল সাত্র্র কথা: মাওবাদীদের সঙ্গে মতৈক্য না হলেও, তাদের বিরুদ্ধে দমননীতির জন্যই তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

তাঁর গান, কবিতা ও সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁদের দুর্গম পথের পাথেয়। জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ গানে কবিতায় বিপ্লবীদের প্রেরণা হয়ে উঠেছেন। "কবির প্রতি বিপ্লবীদের সেই চিরন্তন শ্রদ্ধা, ভালবাসার ধারায় ছেদ পড়ার নজির যৎসামান্য।" এই যৎসামান্য নজিরও শ্রীসেহানবীশ তুলে ধরেছেন। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত চার অধ্যায় বিপ্লবীদের বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করে। সরোজ আচার্যর লেখায় এই ক্ষোভ বেদনার আকারে দেখা দিল: 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের রবীন্দ্রনাথ'। তিনি এই বই লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ জুড়ে অ্যাণ্ডারসনী তাণ্ডব চলছে। এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছ থেকে যে বিপ্লবীরা জপমন্ত্র পেয়েছিল, "ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে, নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ ?" কিন্তু এই মানসিকতাও স্বল্পস্থায়ী ছিল। ১৯৪০ এই দেখা যাচ্ছে বিপ্লবী নেতারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা করছেন, সতীন্দ্রনাথ সেন ১৯৩৯-এ বরানগরে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাচ্ছেন। এমন কি ১৯৪০-এ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও মনোরঞ্জন গুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "যদিও আমরা আজ প্রধানত আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেই নিযুক্ত তবু আমরা বিশ্বভারতীকে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র হিসাবেই দেখি." চিন্মোহন সেহানবীশ রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিপ্লবীদের মনোভাবটিকে সুন্দর সাজিয়ে ধরে দিয়েছেন—এ বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে, "রীতিমত রবীন্দ্রচর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।" রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তাঁদের লেখা বইও সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে—রাজনৈতিক বন্দীদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজশাহী জেলের ভাষণই পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রচিত্রকলা' নামে প্রকাশিত—লেখক মনোরঞ্জন গুপ্ত।

'দুটি অধ্যায়ে' রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী ও বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার পর চিন্মোহন সেহানবীশ বইটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ লিখেছেন। বস্তুতঃ এ অংশটি শিল্পতত্ত্বেরই আলোচনা। একটি কবিতা বা গান প্রাথমিক স্ট্রাকচার হিসাবে যা, পরবর্তী সময়ে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে, নানা ব্যক্তির কাছে তার তাৎপর্য, সাড়া অন্যরকম। একটি শিল্প অনন্য ও বিশেষ স্ট্রাকচারে বাঁধা, কিন্তু এই গ্রহণ ও ব্যাখ্যার স্রোতস্বিনীতেই সে চলিষ্ণু, বিশেষ নির্মাণের গণ্ডী পেরিয়ে প্রসারিত। বড় শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণই এই। সামান্য-বিশেষের সীমাও এতে মুছে যায়। "একলা চলো রে" বিপ্লবীদের গান মনে হয়, আবার গান্ধীরও প্রিয়—আর সুরের কাঠামোটি তো আবার আলাদা।

"বন্দীবীরে"র দুই ছত্রেই সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি মনে হয়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আশা ও আশাভঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সহায়। জেলের দেওয়ালে বন্দুক-পিস্তল আঁকা, কোথাও ভারতের মানচিত্র—তার পাশেই বিপ্লবী লিখেছেন: 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে। যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' বন্দীজীবনে 'গীতাঞ্জলি'কে মনে হয়েছে বন্দীর মুক্তিপিপাসু অন্তরের কথা। "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া," কোনো কোনো বিপ্লবীদের মনে হয়েছিল, এই নতুন বিপ্লবপথের যাত্রাকে লক্ষ্য করে লেখা। আর ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা থেকে জানা যায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর কাছে এই গানটির ব্যাখ্যা ছিল: "তরণী হ'ল Ship of State—'অমল ধবল পাল' হল গিয়ে আমাদের political consciousness—feudal যুগেরই পাল তোলা জাহাজ, তবেই 'মন্দ মধুর হাওয়া' কিনা moderate, liberal movement এই দাঁড়ায় ইত্যাদি।" যাদুগোপালের "ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল / কার তরে সব ছুটে এলি সৌরভে আকুল"—এই ছত্র দুটি পড়ে মনে হয় "বালেশ্বরের যুদ্ধের ঘটনা [অর্থাৎ শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গীদের আত্মদান] কি বিশ্বকবির মনকে স্পর্শ করেছিল?...কারা তাঁর পাশাপাশ চাঁপা ও উন্মত্ত বকুল?" 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে'-র অর্থ বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর কাছে একরকম, আবু সঈদ আইয়ুব-এর কাছে আর একরকম। চিন্মোহন সেহানবীশ একের পর এক তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজের ইতিবৃত্তে এভাবেই শিল্পের জীবন হয়ে ওঠা, জীবনের বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ আনন্দে-সংকটে কবিতা-গান তার অর্থের রূপান্তরে জীবনের আকাশে ওড়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে যান। বীণা ভৌমিক প্রভৃতি রাজবন্দিনীরা 'মালিনী' নাটক করেন, সূর্য সেন ভালবাসেন 'হে ক্ষণিকের অতিথি', দূর দেশী রাখাল ছেলের ডাক আসত তাঁদের কাছে, ভগৎ সিং-এর নির্জন সেলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হুগো-ফ্রাঁস-রাসেল-সিনক্লেয়ারের সঙ্গে, ফাঁসীর আগের রাতে বৈকুণ্ঠ সুকুল 'মরণ হে মোর মরণ'কে গান হিসাবে শুনতে চাইলেন। বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত নিরুপায় হয়ে দরবারী কানাড়ায় কবিতাটির গান গাইলেন, "অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ।" বিভূতিবাবু লিখেছেন "আমি কিন্তু সারা জীবনে ঐ একটি রাত্রিতেই একটি সার্থক গান গেয়েছিলাম।" এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয় এই বিপ্লবীদের আবেগের শুদ্ধতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, সেই সঙ্গে তাদের Sensblity-কেও। কবিতায় ও গানে এই যে আবেগ মুক্তির সন্ধান, এও

এক মূল্যবোধের রাজনীতি। নান্দনিক আন্দোলনের দিক, যা অহিংস গান্ধীবাদে দুর্লভ্য।

চিন্মোহন সেহানবীশ একালের পাঠকের জানা, স্বল্প-জানা ও না-জানা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর গবেষণাকর্মটি গড়ে তুলেছেন। প্রচলিত যে সব "গবেষণা" দেখা যায়, তার থেকে এই বইটির পার্থক্য এই যে, লেখকেরও একটি দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়েছে বইটিতে। দ্বান্দ্বিক বীক্ষায় লেখক আস্থা রাখেন, আর সেই বীক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ-বিপ্লবীসমাজ, বিপ্লবীসমাজ-রবীন্দ্রনাথ ও তারপর বিপ্লবী জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা-প্রবন্ধর প্রায় স্বাধীন ভূমিকা. এইভাবে সাজানোর ফলে বইটি কেবল রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন হয়ে ওঠে নি। মতাদর্শের পার্থক্য পেরিয়ে একজন কবির, শিল্পীর কাজ কেমনভাবে পৌঁছে যায়, বিশেষ গঠন ও অর্থের সীমা পেরিয়ে রূপান্তরিত হয় দ্বন্দ্বময় ইতিহাসে, ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় তাও চিন্মোহন সেহানবীশ দেখিয়েছেন। গীতাঞ্জলির কবিতাও পেয়ে যায় নতুন অর্থ; এ শুধু বিশেষ বিপ্লবীসমাজ নয়, পূর্বেকার দুই ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি ও তাঁদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার, পরাণ দিয়ে সেতু বাঁধবার অঙ্গীকারও প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ইন্দো-নেশিয়ার কমিউনিস্ট নেত নূজোটোও অন্তিম বিবৃতি শেষ করেন, রবীন্দ্র-নাথের গানে: 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে / ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।' আসলে রবীন্দ্রনাথ সেই মহাকবি, যাঁর সারাজীবনের উত্তরণের পর্বে পর্বে স্বদেশ-আত্মাই বাণীমূর্তি লাভ করে, আর যেহেতু এই বাণীমূর্তি ঔপনিবেশিক সব কিছুর বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিবাদ ও প্রত্যাখান, সেহেতু এই আবেদন সর্বজনীন, এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রামের প্রেরণা. সোভিয়েট অধ্যাপক কোগনের ভাষায় বলা যায় "beautiful call for liberation." আর এ আহ্বান কোন প্রাগাধুনিক বিদ্রোহ নয়, এ আত্মসচেতন, আধুনিক। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আসেন নানাভাবে নানারূপে। ডাকঘরের অমলের রাজার ডাকহরকরা হয়ে চিঠি পৌঁছে দেবার স্বপ্নে আজকের বিপ্লবীও তার স্বপ্নকে দেখতে পেতে পারে: বিপ্লবের ডাককে দিকে দিগন্তে পৌঁছে দেবার। আবার অমলের মৃত্যুকেও নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে এক বাঙালী বিপ্লবী সরোজ দত্তর মনে হয়েছিল "ঘরে বাইরে" is a great anti-fascist novel. এ উপন্যাসের রচনাকাল ১৯১৬—তথাপি

ফ্যাসিবাদ বাংলা উপন্যাসে আসতে পারে না। কিন্তু ১৯৪৩-এর বিশেষ পরিস্থিতিতে সরোজ দত্তের এটাই মনে হয়: "আজ পৃথিবীতে যে যুদ্ধ চলিয়াছে তাহা এই নিখিলেশ ও সন্দীপের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে।" এভাবেই রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের কাছে, বিদ্রোহীদের কাছে, সংগ্রামীদের কাছে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হন। এর প্রতিপক্ষে, স্থিতাবস্থাবজায়কারী, শাসক-শোষকরাও রবীন্দ্রনাথকে হয় সেকেলে, অনাধুনিক বলে বাতিল করেন, নয় নিজেদের মত করে ঋষি-গুরুদেব বানান, যেমন ১৯৬০-৭০-এর দশকে শ্রেণী-সংগ্রাম বিপ্লবীসত্তা থেকে বিচ্যুত করে প্রথমদিকের মার্কস-চর্চা ইউরোপে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সৌন্দর্য্য সন্ধানী তথা উত্তরণের লড়াইয়ে পাওয়াটাই এখন জরুরী; তিনিই সেই সংগ্রামের চিত্রকল্প প্রত্নপ্রতিমা। আবার কালান্তরে ব্যক্তি যখন স্বাধীন হবে, আপন সত্তায় হবে স্থির, তখন রবীন্দ্রনাথ আসবেন, অন্যভাবে, গানে গানে, কবিতায়, শিল্পে, উপন্যাসে-গল্পে সে মুক্তি যুগান্তরের। চিন্মোহন সেহানবীশ প্রথম পাওয়াকেই প্রশস্ত করতে চেয়েছেন—এখানেই তাঁর বইয়ের তাৎপর্য, এজন্য তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ। চিন্মোহন সেহানবীশ। বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ। ৩৫ টাকা।

বিহার : বহ্নিমান কৃষিক্ষেত্র

মিলন দত্ত

বিহারের সমতল আর বনাঞ্চল এখন জ্বলছে। পূর্ণিয়া থেকে পালামু আর ভোজপুর থেকে ভাগলপুর গোটা রাজ্য জুড়ে কৃষি শ্রমিক আর দরিদ্র চাষীরা আজ অস্ত্রহাতে রুখে দাঁড়িয়েছে। আজকের বিহারের প্রতিদিনের খবর হল : জোতদারদের নিজস্ব সেবা বাহিনীর সঙ্গে গরীব চাষী আর ক্ষেত মজুরদের লড়াই। সশস্ত্র এইসব লড়াই কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে, কুখ্যাত জোতদার খুন কিংবা কোন কৃষক নেতা নিহত হয়, জনতার মিছিলে বা গণ সমাবেশে পুলিশের গুলি চলে, পুলিশ সংঘর্ষের নামে ঠাণ্ডা মাথায় বিপ্লবীদের হত্যা করে, কৃষকদের গেরিলা স্কোয়াড পুলিশ ক্যাম্প দখল করে ছিনিয়ে নেয় রাইফেল, কৃষি শ্রমিকের ধর্মঘট হয় এবং নেমে আসে জোতদারদের সংগঠিত সন্ত্রাস। হত্যাকাণ্ডের সাম্প্রতিকতম ঘটনাটি ঘটে গেছে গয়া জেলার অরওয়ালে—কৃষকদের একটি সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৬০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করে। হত্যার সমস্ত রেকর্ডকে পুলিশ ছাড়িয়ে গেছে অরওয়ালে। অরওয়াল হল বিহারের মাটিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি।

মূল যুদ্ধক্ষেত্রটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে মধ্যবিহারের মোট পাঁচটি জেলায়—ভোজপুর, গয়া, পাটনা, নালন্দা এবং ঔরঙ্গাবাদ। এই লড়াইয়ের প্রভাব ছড়িয়ে গেছে ওয়ার্দা, হাজারিবাগ, পালামু এবং রোতাস জেলায়। এছাড়া

বিহারের সীমান্তবর্তী উত্তরপ্রদেশের বারাণসী, গাজিয়াপুর এবং বালিয়া জেলায়ও এই আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

এই আন্দোলনে যে মুখ্য সংগঠনগুলো কৃষকদের পক্ষ নিয়েছে তারা হল : সি পি আই-এম এল (লিবারেশন), সি পি আই-এম-এল (পার্টি ইউনিটি) এবং মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র (এম সি সি)। এছাড়া কয়েকটি ছোট ছোট পকেটে পি সি সি—সি পি আই-এম. এল এবং লিন পি-আও পন্থী কয়েকটি গ্রুপ সক্রিয়। আবার দুটি একটি ক্ষেত্রে জয়প্রকাশপন্থী ছাত্র সংগঠন ছাত্র যুব সংঘর্ষ বাহিনী আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী গ্রুপগুলো কৃষকদের যেসব গণ সংগঠন গড়ে তুলেছে তার মধ্যে প্রকাশ্য, আধা-প্রকাশ্য এবং গোপন এই তিন ধরনের সংগঠনই আছে এবং এরাই রয়েছে লড়াইয়ের সামনের সারিতে। আর আছে জোতদার এবং পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া বন্দুক আর রাইফেলে সজ্জিত কৃষকদের গেরিলা স্কোয়াড। এরা অবশ্য লাল সেনা বা রেড গার্ড নামেই বেশি পরিচিত। এই গেরিলা স্কোয়াডগুলোই হল আন্দোলনের মেরুদণ্ড।

উপরের অংশটি কোন দৈনিক বা সাময়িক পত্রের প্রতিবেদন নয়—আলোচিত বইটির প্রারম্ভাংশের একটি অনুচ্ছেদের হুবহু অনুবাদ। বিহারের এই ছবিটা দ্রুত পালটে যাচ্ছে। এক দশক আগেও বিহারের ছবিটা এমন ছিলনা—একতরফা মার খাওয়ার সময় ছিল তখন। জাত-পাতের বিভাজনে জীর্ণ গোটা রাজ্যে উঁচু জাতের হাতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছে নিচু জাতের মানুষ। অথবা এভাবে বলা যায়—বৃহৎ ভূস্বামী আর জোতদারের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হল বিহার। আবার জাতপাতের জটিল বিন্যাস এখানে শ্রেণী সম্পর্কের জানা তত্ত্বগুলোকেও অসুবিধেয় ফেলে। জোতদার, মধ্যচাষী, বাটাইদার এবং ক্ষেতমজুর—গ্রামীণ বিহারের জনসংখ্যাকে এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করার পরেও রাজনৈতিক দলিলে উল্লেখ করতে হয় : "জাতপাতের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়। জোতদাররা বেশির ভাগই উঁচুজাতের লোক, কোথাও কোথাও কুরমি এবং যাদবদের মতো পশ্চাৎপদ জাতের ওপরের দিকে কিছু কিছু জোতদার দেখা যায়। আওয়াধিয়া কুরমিদের একটা অংশ এখন জাতে উঠেছে। তাদের মধ্যে একটা অংশ এখন নতুন জোতদার। কিন্তু ধনী চাষী যেমন উঁচু জাতেও আছে তেমনি আছে নিচু জাতের ওপর তলার দিকে। আর মধ্য-চাষী পাওয়া যাবে পূর্বোক্ত দুই জাত ছাড়াও অন্যান্য জাত এমন কি হরিজন,

এবং উপজাতিদের মধ্যেও। নিম্ন-মধ্য এবং দরিদ্র চাষী আর ক্ষেতমজুররা সবই প্রায় পশ্চাৎপদ জাত হরিজন আর আদিবাসী। পার্টিকে অনেক সময় যাদব বা কুরমি বা অন্যান্য জাতের কাছে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন রাখতে হয়েছে। আবার 'কৃষক আন্দোলনের নীতি' নির্ধারণ করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হয়েছে জাতপাতের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়াগুলো কিভাবে ভেঙে ফেলতে হবে বা টপকে পেরতে হবে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। চারু মজুমদার প্রতিষ্ঠিত সি পি আই (এম এল)-এর মূল ধারাটির যারা এক মাত্র অনুকারী সেই সি পি আই (এম এল) লিবারেশন এই সব ভাবনা চিন্তা সুসংহতভাবে কার্যকর করতে শুরু করেছে মাত্র ৮০-র দশক থেকে। এই দশকের গোড়ার দিকেই ওই দল নিজেদের কেবল গোপন সংগঠনের মধ্যে আটকে না রেখে ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্‌স ফ্রন্টের (আই পি এফ) মতো জাতীয়স্তরের প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চ এবং রাজ্য স্তরে কিষাণ সভার মতো গণ সংগঠনগুলো গড়ে তুলল। সি পি আই (এম এল)-এর এই গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদকের নাম বিনোদ মিশ্র। বিহারের পরিস্থিতি এবং আন্দোলনের ওপর পার্টির দলিলের সংকলন এই বইয়ের একটি মূল্যবান অংশ বিনোদ মিশ্র লিখিত ভূমিকাটি।

বিনোদ মিশ্র জানিয়েছেন, ১৯২১ সালে লেনিন প্রাচ্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে উপদেশ দিয়েছিলেন রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের মতো করে কৌশলগুলোকে তৈরি করে নেবার জন্য। তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন তাঁরা যেন কোন কমিউনিস্ট নেতার থেকে তাঁদের সমস্যার সমাধান না খোঁজেন।' এরপর বিনোদ মিশ্রের মন্তব্য হল, 'মাও সে-তুঙ অত্যন্ত সফলভাবে লেনিনের এই উপদেশ কাজে লাগালেন আর ভারত তার মর্মার্থ বুঝতেই ব্যর্থ হল।' আর এই কারণেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কৃষক এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি সঠিকভাবে সমাধান করে পার্টি জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের নেতৃত্বকারী শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টরা ওই দুটি সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য কোন সুসংহত নীতি গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে থেকে যায় জাতীয় কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট পার্টি চিহ্নিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী, এমনকি বিশ্বাসঘাতক হিশেবে।

ভূমিকায় বিনোদ মিশ্র তেলেঙ্গানা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়া এবং পরবর্তী-কালে দুই কমিউনিস্ট পার্টির নীতি এবং দর্শনকে ব্যাখ্যা করে তাদের

সংশোধনবাদী প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এর পরে আসে নকশালবাড়ীর অভ্যুত্থান প্রসঙ্গ। শ্রী মিশ্র মন্তব্য করেছেন, "এমন একটি সময়ে নকশালবাড়ী অভ্যুত্থান ঘটেছে যখন শাসক শ্রেণী আর পুরনো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না।"

সে যাই হোক আমরা দেখেছি ষাটের দশকের শেষ ভাগের তরাইয়ের সেই কৃষক আন্দোলনের টানে সি পি আই (এম)-এর বহু রাজ্য কমিটির প্রায় সমস্ত সদস্য পার্টির প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে নকশালবাড়ী আন্দোলনের পক্ষ নেয়। তারপর অল ইণ্ডিয়া কো-অরডিনেশন কমিটি অব দি কমিউনিস্ট রেভলিউশানারি (এ আই সি সি সি আর) গঠন এবং চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সি পি আই (এম-এল)-এর প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিমবাংলা, বিহার, অন্ধ্রসহ ভারতের একটা বড় অংশে আন্দোলনের জোয়ার আছড়ে পড়া এবং ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

কিন্তু আন্দোলনের সেই জোয়ার ক্রমে স্তিমিত হল। সরকার এবং বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠিত হবার কৌশল এবং সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী কলহে আর মতবিরোধিতায় ক্ষয়ে যেতে যেতে এক চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছিল এই আন্দোলন। এবং আজও ঐক্যের ব্যাপারে কোন উন্নতি বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

ব্যতিক্রম কেবল বিহার। আশির দশকের গোড়া থেকেই বিহারের আন্দোলন এক অন্য রূপ নেয়। চারু মজুমদার পন্থী হয়েও এই দল তাদের পুরনো খতম, ব্যাপক গণ সংগঠন না করা এবং নির্বাচন বয়কটের নীতিকে স্থানীয় প্রয়োজনে খানিকটা পালটে নিয়ে সরাসরি সংঘাতের পথকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে ব্যাপক আকারে গণ সংগঠন গড়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সেদিন থেকে এই দলটি রীতিমতো মূল্যবান। কারণ বিহারে জাতপাতের লড়াইকে কীভাবে এটা শ্রেণীর লড়াই-এ উত্তীর্ণ করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা এখানে পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে কিভাবে পার্টি তার প্রতিদিনের আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোয় প্রচলিত কৌশলকে পালটে নিচ্ছে।

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত, লেনিনের ১৯২১ সালের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য বলে মনে হয়। আই পি এফ-এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ এবং বিভিন্ন ইস্যুতে এমনকি লোকদলের সঙ্গেও যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া নিশ্চয়ই "কমিউনিস্ট কেতার থেকে সমস্যার সমাধান" বা গোঁড়ার

প্রয়াস। দেখা গেছে নির্বাচন এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বহু সময়েই আই পি এফ তাদের সংগঠনকে আরো বাড়িয়ে নিতে পেরেছে।

যাই হোক গোটা বিহার জুড়ে এই আন্দোলনের পুরোভাগে আছে আই পি এফ। এবং আই পি এফই হল এখন বিহারের কৃষক আন্দোলনে একটি প্রধান শক্তি। কিন্তু এই দলিলের কোথাও এসব উল্লেখ নেই যে তাদের পাশাপাশি অন্য নকশালপন্থী গোষ্ঠীগুলো কাজ করছে না বা তাদের মধ্যেকার মত বিরোধ লুপ্ত হয়ে গেছে। বরং আলোচিত বইটিতে জানান হয়েছে যে অন্যান্যদের তুলনায় আই পি এফ-এর নীতি এবং রাজনৈতিক আবেদন ব্যাপক মানুষের কাছে গ্রাহ্য হচ্ছে।

বিহারে জোতদারদের জাতপাতের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন সেনার বিরুদ্ধে আই পি এফ কে আইনী গণআন্দোলন দিয়ে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কিন্তু সশস্ত্র সংঘর্ষেও এড়ান যাচ্ছে না এবং এসব ক্ষেত্রে পার্টির গোপন সংগঠন লাল সেনা সেকাজে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। আই পি এফ-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিহারের তাবৎ জোতদার তাদের পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেস সরকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাম দলগুলিও। এই বিশাল বিরোধিতাকে কাটিয়ে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে ঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল ওই সংগঠনের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আবার এই চ্যালেঞ্জের গুরুত্ব থেকেই বুঝে নেওয়া যায় বিহারে আই পি এফের শক্তি। এই বিশাল শক্তি এবং গণভিত্তি অর্জন করতে দলকে যে নমনীয়তা এবং অবস্থা বুঝে কৌশল পাল্টানোর নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে তার জন্য পার্টিকে শিক্ষা নিতে হয়েছে ১৯২৭ সালে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর কিষাণ সভা আন্দোলন থেকেও। বিহারের কৃষক আন্দোলনের আধুনিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে চম্পারনের সত্যাগ্রহ, সহজানন্দের আন্দোলন থেকে নকশালবাড়ী এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার আন্দোলনের প্রসঙ্গও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

গোটা বইটিতে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার যেটা সামনে এসেছে, সেটা হল জাতপাত। কিন্তু এখন জাতপাতের সমস্যা এবং জটিলতার পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মধ্যচাষীদের আন্দোলনে সামিল করা। ব্যাপক মধ্যচাষীদের আন্দোলনের মিত্র শক্তি হিসেবে না পেলে গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের ভিতকে কোন দিন শক্ত রাখা যাবে না। কিন্তু

অন্যদিকে ক্ষেত মজুর এবং প্রান্তিক চাষীদের এই আন্দোলনে মধ্য চাষী-দের ঝোঁক জোতদারের দিকেই বেশি—আন্দোলনে সামিল করা রীতি মতো কঠিন দায়িত্ব। আবার কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ যত বাড়ছে মধ্যচাষীদের মধ্যেও নাকি বিপ্লব-বিমুখতা বাড়ছে তত বেশি, এবং সদ্য-জমির-মালিক হওয়া কিছু চাষীর মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তবে এ বই থেকে একটা ব্যাপার বেশ স্পষ্ট বেরিয়ে আসে—কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের যথেষ্ট প্রসার না হলে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা বরং সহায়ক হবে।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, বইটিতে স্বীকার করা হয়েছে, ভারতীয় পরিস্থিতিতে পার্টির উচিত নয় কেবলমাত্র পাহাড়ী এবং অরণ্য অঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা তৈরির চেষ্টা করা। গত কয়েক বছরে বিহারের সমতল অঞ্চলের কার্যাবলী প্রমাণ করেছে ছোট ছোট গেরিলা স্কোয়াড প্রয়োজন হলে সমতল এলাকাতেও সফল অ্যাকশান চালাতে পারে।

তবে দলিল থেকেই বেরিয়ে এসেছে এই সত্য : ভোজপুর পাটনা, নালন্দা বা গয়া কোথাও দলের মূল শক্তি এখনো অ্যাকশন নয়— বরং বিপুল সংখ্যক চাষী এবং ক্ষেতমজুর। দলিলে উল্লেখ না থাকলেও বিহারের আন্দোলনে অন্য একটি দুর্বলতা হল, শহরে বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে যথেষ্ট পরিমানে এই আন্দোলনের সপক্ষে সামিল করা যায়নি। কিন্তু দলিলে দাবি করা হয়েছে, অনেক পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বহু সংখ্যক অ-কমিউনিস্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষকে আই পি এফ তাদের আন্দোলনের শামিল করতে পেরেছে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বিহারের এই আন্দোলন নিজেদের ভুলগুলোকে স্বীকার করে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে, সেগুলোকে সংশোধন করার মধ্যে দিয়ে দ্রুত না হলেও এগিয়ে যেতে পারছে। এবং এজন্যই তবে সরকার যখন বলে, 'কোন সভ্য সরকার পাল্টা প্রশাসন চলতে দিতে পারে না'—তখন আন্দোলনকারীরা উত্তর দিতে পারে : 'কোন গণহত্যা কৃষকদের সভ্য সমাজ গড়ার কাজকে প্রতিহত করতে পারে না। যুদ্ধের সীমারেখা টানা হয়ে গেছে স্পষ্ট—যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধ চলছে এবং চলবেও।

রিপোর্ট ফ্রম দা ফ্লেমিং ফিল্ডস অব বিহার—এ সি পি আই (এম এল) ডকুমেন্ট। প্রকাশক, প্রবোধ ভট্টাচার্য। ১৯৮৬, দাম : ৫০ টাকা।

কবিকে চেনার নানা ধরন

শুভ বসু

১১ জুলাই ১৯৮৫-তে লোকান্তরিত হন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাঁদের প্রত্যাশার স্বাভাবিক সংগতিতেই তাঁর শেষ যাত্রা হয়ে উঠেছিল যে কোনো কবির পক্ষেই ঈর্ষণীয়। কৌতূহলী জনতার খুব দমবন্ধ করা ভিড় হয়তো ছিল না সেখানে। কিন্তু যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ভালোবাসা ও আবেগের তাড়নায় অধীর। ক্যাওড়াতলা শ্মশানের চত্বর জুড়ে চারিদিকে ছড়ানো পোস্টারে তাঁর স্কেচ, তাঁর কবিতার উদ্ধৃতি। অর্থাৎ প্রাণবন্ত বহু তরুণের ভালোবাসা যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে যায় নি, তার পরিচয় মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিনকার প্রতিটি মুহূর্তে।

সে পরিচয় যে স্থায়ী রূপ লাভ করবে বাংলা সাহিত্যকর্মীদের অনেকেরই রচনায় তা নিশ্চয় আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশারই ঘটনা। ফলে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাদের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ বহুকালের, তাদের এভাবে একটা সুযোগ জুটে যায় তাঁকে তাঁর সম্পূর্ণতায় চিনে নেবার। একটি নামী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, একটি সংকলনগ্রন্থ এবং তাঁর সমসাময়িক একজন প্রধান কবির লেখা বই জরুরী হয়ে ওঠে। তৃতীয় বইটিও অবশ্য 'সারস্বত' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনারই গ্রন্থবদ্ধ রূপ, যাতে সংকলিত হয়েছে বিশেষভাবে নির্বাচিত কিছু কবিতাও।

কিন্তু সমসাময়িক কোনো পাঠক যখন মৃত্যুর পর কোনো কবির সমগ্র চেহারাটি চিনে নিতে চাইবেন তখন ঠিক কীভাবে নিতে চাইবেন তাঁকে? সে কি কেবলমাত্র তাঁর কবিস্বরূপকেই চিনে নেয়া, শব্দের পর শব্দে বহুকাল ধরে কবি যাকে রচনা করে চলেন এবং যার ভেতর দিয়ে নিজেরই এক গূঢ় এবং জরুরীতর পরিচয় রেখে যান ইতিহাসের জন্য? নিশ্চয় সেভাবে চেনাই কবিকে সবচেয়ে ভালো করে চেনা। কিন্তু বহু কবিকেই চিনতে তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও জরুরী। বস্তুত তা যেন সেইসব কবির কবি-ব্যক্তিত্বেরই পরিপূরক। এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও কি চেনা যায় সমসাময়িক সমাজ রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকার বিবর্তনের ইতিহাসটি না চিনলে?

বিশেষত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত কবিকে চিনতে তাঁর সমাজ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বটিকে চেনা জরুরী হয়ে ওঠে, যেহেতু পরিণত বয়সে তাঁর অস্তিত্বের আগাপাশতলা নিয়ন্ত্রিতই হত সমসাময়িক সমাজরাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সংগে সংঘাতে ও সংলগ্নতায়। গোষ্ঠীগত পরিচয়ের ভেতর দিয়েও তাঁকে পুরোপুরি চিনে ওঠা অসম্ভব। কেননা বহু বিষয়েই তাঁর মতামত ছিল তাঁর নিজস্ব। অতএব এক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সমাজরাজনৈতিক আবেগের কেন্দ্রটিকে চিনে নেবার প্রয়াস প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

আর, প্রিয় মানুষের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তো তাঁর সম্পর্কে যে কোনো আলোচনায় আসবেই। বিশেষ কারো আন্তরিকতা, হৃদয়বত্তা, স্পষ্টবাদিতা যদি তাঁকে অন্যান্যদের ভালোবাসার পাত্র করে তোলে তবে, এমনকি কবি হয়েও তিনি তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় সেসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এড়াতে পারেন না। যেমন তাঁর মত প্রবল প্রতাপশালী কম্বুকণ্ঠ কবির ডাকনাম 'তুরতুরি'— এ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আপাতদৃষ্টিতে কবিতা বিচারে অপ্রয়োজনীয় হলেও মানবিক কারণে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তাঁর স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্রকন্যা, সমসাময়িক সুহৃদবৃন্দ ও অনুজ গুণমুগ্ধদের স্মৃতিচারণায় এভাবে ব্যক্তি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমাজরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বটি চমৎকার ফুটে ওঠে। বস্তুত 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা'য় এবং 'কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি' প্রকাশিত সংকলন পুস্তিকাটিতে যেন অজান্তেই কবির ব্যক্তিত্বের সাহিত্য অতিরিক্ত দিকগুলির ওপর একটু বেশি জোরে পড়ে যায়। যেমন 'অনুষ্টুপ' তো তাঁদের স্মরণসংখ্যার একটি বড় অংশই রেখেছেন—'কাছ থেকে দেখা', যাতে মুদ্রিত হয়েছে তাঁর পরিবারের বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণ।

তাঁর স্ত্রী রাণী চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণটি নানা কারণে আকর্ষণীয় শুধু নয়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চেনার পক্ষে জরুরী হয়ে ওঠে। শুরু থেকে একটু উদ্ধৃত করা যাক '১৩৫১ সাল। ২৩শে ভাদ্র। রাত দুটোর পর বিয়ের লগ্ন ছিল। শুভদৃষ্টির সময় তাকালাম আর অবাক হলাম যে উনি নাকি খুব ধনী বাড়ির ছেলে আর কবিতা লেখেন। হাবে ভাবে কোন মিল পেলাম না। তারপর নানান আচার অনুষ্ঠানের সময় পুরোহিত মশাইকে তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্য অনুরোধ করলেন। মন্ত্র কিছু পড়লেন বলে মনে হলো না। বিয়ের পর্ব শেষ, রাতও শেষ। ভোরের দিকে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি সুখী হয়েছি কিনা।'

যিনি সারাজীবন খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁকে, তাঁর সেই আন্তরিক চেনা এভাবেই চমৎকার রেখাচিত্রে জীবন্ত করে তুলতে পারেন রাণী চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা কবির সারা জীবনের ছবিটিকে যেন বেশ নিবিড় আনন্দে চিনে নিতে পারি। জানতে পারি, একজন চঞ্চল, আপনভোলা আর বেপরোয়া সৎ মানুষ কিভাবে সারাটা জীবন যন্ত্রণা আর আর্তিতে, কিন্তু হতাশ না হবার প্রতিজ্ঞায় অতিবাহিত করেন। সেই সঙ্গে কিছু খুচরো তথ্যও জুটে যায় আমাদের। খুচরো, কিন্তু প্রয়োজনীয়।

যেমন, 'নরেন সেনের মুখে রবীন্দ্রনাথের 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু' এই গান ছিল ওর খুব প্রিয়। আর ভালোবাসতেন উমা বসু, জগন্ময় মিত্র, নজরুল ইসলাম, কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গান। এদের নতুন গানের রেকর্ড বেরুলেই উনি তখুনি কিনতেন। আর সারাদিন গান শোনা একটা বাতিক ছিল।'

'ইতিমধ্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানশিপ পড়তে শুরু করলেন। ফাঁক পেলেই চিড়িয়াখানা ঘুরে আসা একটা নেশা। ওখান থেকে ফেরার পথে প্রায়ই হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস বা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।" এ ধরনের ব্যক্তিগত কিন্তু আকর্ষণীয় তথ্যের অজস্রতা স্ত্রীর মত আর কেই বা এত সফলভাবে দিতে পারেন?

এভাবেই আমাদের জানা হয়ে যায় যে, তিনিও আরো কোনো কোনো কবির মতই 'কবিতার লাইন মাথায় এলে হাতের কাছে যা থাকতো সিগারেটের প্যাকেট বা বাসের টিকিট তাতেই একটা দুটো লাইন লিখে রাখতেন। এমন হয়েছে, ছোটাছুটি করে বাড়ি এলেন। কী হলো কোনো জবাব নেই—ঘরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছেন, সামনে একটা ট্রাম বা বাসের টিকিট। বাসে যেতে যেতে হয়তো মনে হয়েছে, নিজের

কলম খুঁজে না পেয়ে পাশের লোকের থেকে কলম চেয়ে নিয়ে একটা কি দুটো কথা লিখে রেখেছেন ফিরে এসে সেটাই লিখছেন।'

এরকমই সব ছোট ছোট তথ্য মারফৎ মর্মগ্রাহী হয়ে ওঠে তাঁর মুখের ছবি। আমাদের চেনা হয়ে যায় তাঁর ভালোবাসা, আত্মসম্মানবোধ, তাঁর প্রতিবাদ। ১৯৭১-এ পুলিশী অত্যাচারের একটি ঘটনায় কবির প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা করেন তিনি। জানান একটি জরুরী তথ্য 'এরপর থেকেই তরুণ কবি লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।" কিংবা ১৯৭৮-এর একটি ঘটনায় কবির গভীর, প্রায় ব্যতিক্রমী আত্মসম্মানবোধের ছবি আঁকেন এভাবে, 'দিল্লী থেকে যখন অফিসিয়াল চিঠিটি এল পুরস্কারের তারিখটি দিয়ে, তাতে লেখা ছিল যে পুরস্কার নেবার পূর্বে মঞ্চে একবার মহড়া দিয়ে নিতে হবে, পড়েই তো সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিয়ে দিলেন—উনি যেতে পারছেন না, ওনারা যেন বাড়ীতে ডাক মারফৎ পাঠিয়ে দেন।' উল্লিখিত পুরস্কারটি দিল্লী বিদ্যালয়ের নরসিংহ পুরস্কার।

আমরা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যেভাবে চিনতে শিখছিলাম তার সঙ্গেই তো মিলে যায় তাঁর স্ত্রীর দেওয়া তথ্য যে, তাঁর অসুখটি যে ক্যানসার একথা ডাক্তারের কাছ থেকে জানবার পর ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও 'বাড়ীতে এসে সবাইকে হাসতে হাসতে ওর রোগের কথা বললেন।'

তাঁর বোন ও পুত্রকন্যার স্মৃতিচারণেও পারিবারিক আলোতেই কবির অন্তরঙ্গ ছবিটি ধরে দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। অবশ্য পুত্র বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটিতে কবির সমাজরাজনৈতিক ভূমিকাটিতে বিশেষত সত্তর আশির দশকের ক্রিয়াকর্মের ওপরে বেশি জোর পড়েছে। গুণ্ডামীর সঙ্গে মোকাবেলা আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি কেমন জেদী, বেপরোয়া আর আপোষহীন রয়ে গিয়েছিলেন তিনি তার চমৎকার এক ছবি ফুটে ওঠে,—একটু যেন অধৈর্য আর আবেগপ্রবণ।

'অনুষ্টুপ' বিশেষ সংখ্যা এবং স্মারক সংকলন গ্রন্থটির অধিকাংশ রচনাতেই এই একরোখা আর আবেগপ্রবণ, আপোষহীন আর উদার, সংবেদনশীল আর যন্ত্রণাকাতর মানুষটিরই ছবি। একটু যেন দ্রুত সিদ্ধান্ত আর অবস্থান গ্রহণের প্রবণতা ছিল তাঁর, যেমন ছিল নিজের কোনো সিদ্ধান্ত আর অবস্থানের ভ্রান্তি বিষয়ে সচেতন হবার মুহূর্তে বিপরীত অবস্থানে নিজেকে স্থানান্তরিত করবার মানসিক সচলতা। অতীন্দ্র মজুমদার আর কমলেশ সেনের স্মৃতির সূত্রে ৬৩-র চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের অব্যবহিত পরবর্তীকালীন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

তীব্র চীন বিরোধী প্রচার এবং তারপর মোহভঙ্গে সে অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ সরে আসা, তার চমৎকার উদাহরণ।

মহাশ্বেতা দেবী, অতীন্দ্র মজুমদার, সত্যপ্রিয় ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নরেন সেনগুপ্ত প্রভৃতি যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ এবং কবির দীর্ঘকালীন সুহৃদ বা সুহৃদপ্রতিম তাঁদের লেখাতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসেন তাঁর যৌবনস্মৃতিসহ ব্যক্তিগত সুহৃদের আন্তরিকতায়। সব মিলিয়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে সুহৃদ ও মানুষ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও ছবি।

'অনুষ্টুপ' বিশেষ সংখ্যার দীর্ঘ স্মৃতিচারণাটিতে অতীন্দ্র মজুমদার কবির ব্যক্তিত্বের বিবর্তনটি বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপকে চেনাতে চেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন কেন অল্পকালের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য পদপ্রার্থী হয়েও শেষ পর্যন্ত সরে গেলেন তিনি। তাঁর কবিজীবনে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার, যার কথা রাণী চট্টোপাধ্যায়সহ আর কারো কারো লেখায় বেশ প্রাধান্য পেয়েছে, প্রসঙ্গটি খানিকটা বিশদভাবেই জানিয়েছেন অতীন্দ্র মজুমদার। এ বিষয়ে তাঁর একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য 'পরবর্তী জীবনে দেখেছি বীরেন অন্তত একটা ব্যাপারে সঞ্জয়দার আদর্শ পুরোপুরি মেনে নিয়েছিল। সেটা হচ্ছে তরুণ অনুজ কবিদের প্রতি শুধু সহানুভূতির বা সমবেদনাই নয়, সুযোগ পেলেই অকুণ্ঠভাবে তাদের উৎসাহদান, প্রকাশিত হতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং প্রয়োজন হলে সপ্রেম তিরস্কারের দ্বারা তাদের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে বাধ্য করা।'

তাঁর আর একটি মন্তব্যও সম্ভবত কবিকে বোঝবার পক্ষে খুব গভীর অর্থে জরুরি বলে বিবেচিত হতে পারে। মন্তব্যটি কবির রাজনৈতিক মতামত প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'সে ঢাকায় থাকাকালীন 'অনুশীলন দলে'র সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই সূত্রে আর-এস-পি-র সবাইকে চেনে। প্রসঙ্গত বলে রাখি আর-এস-পি-র জন্ম অনুশীলন সমিতি থেকেই, প্রায় সব আর-এস-পি-র সদস্য বা সমর্থক এসেছেন অনুশীলন সমিতির সূত্রে। এর সুফল বা কুফল তাঁরাই ভোগ করেছেন।

এর থেকে বোঝা যাবে বীরেন কেন পার্টির দৈনিক পত্রিকার 'গণবার্তা', 'সাপ্তাহিক গণবার্তা', 'মাসিক ক্রান্তি' প্রভৃতির সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং সেবাও করেছিল শেষ দিন পর্যন্ত।'

অতীন্দ্র মজুমদারের এই রচনাটি ছাড়া উপরোক্ত লেখাগুলির সবকটিই

'স্মরণ কমিটি'-র সংকলনগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ছোটবড় প্রতিটি লেখাতেই যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামের মানুষটিকে ছুঁতে পারা যায়, তার কারণ তাঁরা প্রায় সবাই কবির ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু শোভেন সোম, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রভৃতি অনুজ, যাঁরা তাঁর তেমন ব্যক্তিগত বন্ধু নন এবং যাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা মূলত সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক তাঁদের স্মৃতিও অকপট আর উষ্ণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অস্তিত্বের প্রবলতার দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করে। এ সবগুলিই 'স্মরণ কমিটি'র সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

শোভন সোম ১৯৫৮-তে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম কবিতা মেলার প্রসঙ্গটি এনেছেন, যা হয়তো এখনকার বেশির ভাগ মানুষই হয় জানেন না হয় ভুলে গিয়েছেন। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বুদ্ধদেব বসুকে আক্রমণ করে লেখা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছড়া ও সে প্রসঙ্গে দুজনের মতান্তরের এক চমৎকার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। অমিতাভ দাশগুপ্ত আমাদের চিনিয়েছেন আপাদমস্তক কাব্যপ্রাণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তরুণ এবং ঈষৎ বোহেমিয়ান চরিত্রটিকে।

নবারুণ ভট্টাচার্য, সাগর চক্রবর্তী, রত্নাংশু বর্গী, কালীকৃষ্ণ গুহ, রত্না মিত্র, সমীর রায়, দীপেন্দু চক্রবর্তী বা অনিল আচার্যের মত স্মৃতিচারণকারীদের অনেকেই কবির স্নেহভাজন অনুজ। কবিকে তাঁদের দেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুণমুগ্ধ অনুসরণকামীর। কবির প্রতি অনেকেরই অনুরাগের মূলে কবির রাজনৈতিক,—না, ঠিক রাজনৈতিক মতামত নয়, উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী সত্তাই ক্রিয়াশীল। তাছাড়া, কবি যে খুব সহজভাবে অহংকার বিসর্জন দিয়ে অনুজদের মতন হতে পারতেন সেও নিশ্চয়ই নাড়া দিয়েছিল অনেককেই।

স্মৃতিচারণ ব্যাপারটা অবশ্য অনেকটাই ব্যক্তিগত। আর, ব্যক্তিগতের ভেতর দিয়ে কবি বা শিল্পীর সত্যস্বরূপ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তবুও, এসবের ভেতর দিয়ে যে মানুষটিকে চিনে নেবার সুযোগ পাই আমরা, তা যে কবিকেই চেনার দিকে অনেকটা এগিয়ে দেয় আমাদের, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ কম। ফলত, এইসব স্মৃতিচারণে অনেকটা ব্যক্তিগত স্তরে যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারি আমরা, 'অনুষ্টুপ' সংকলনে মুদ্রিত বেশ কিছু চিঠি, কিছু সাক্ষাৎকার ও কিছু গদ্য রচনা যেন তাকেই সহায়তা দান করে থাকে।

চিঠিগুলোর ভেতর তাঁকে লেখা বিভিন্ন চিঠি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে

তাঁরও নানাজনকে লেখা। প্রেরকদের ভেতর জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন রায়ের মত প্রথিতযশা অগ্রজরা যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন দূর মফঃস্বলের প্রায় অজ্ঞাত সাহিত্যানুরাগীরা। তাঁর মানবিক লেনদেনের একটা চমৎকার ছবি এসবের ভেতর দিয়ে পাওয়া যায় যদিও, তবু প্রশ্ন জাগে; সমস্ত পত্রই কি তাঁকে চেনার পক্ষে জরুরি ছিল? একটু সংশয় জাগে, যেন সম্পাদক নির্বিচারে প্রায় সমস্ত কিছুকেই মুদ্রণযোগ্য বলে মনে করেছেন। এ বিষয়ে আর একটু যত্নবান হলে অহেতুক অপব্যয় এড়ানো যেত। তাছাড়া চিঠির মূল্য তো প্রেরকের দিক থেকেই। হয়তো প্রাপকের একটা পরিচয়ের আভাসও সেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু সবসময়ই তা কি মুদ্রণযোগ্য পরিচয়? 'যাহা পাই তাহাই ছাপাই' নীতি ছাড়া আর কোনো নীতিতেই নিশ্চয় তা নয়।

সেদিক থেকে বিভিন্ন জনকে লেখা তাঁর পত্রগ্রন্থগুলির মূল্য অনস্বীকার্য। প্রাপকদের ভেতর আছেন অরুণ মিত্র, অতীন্দ্র মজুমদার, শোভন সোম, কালীকৃষ্ণ গুহ; ও সমীর রায়। প্রতিটি পত্রগুচ্ছের সঙ্গে ছাপা হয়েছে প্রাপকদের পক্ষ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু কথা, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ জরুরি, কখনো কখনো তথ্য হিসেবে তো বটেই আবার সে সূত্রে প্রাপকদের কবির স্মৃতিচারণে।

সাধারণত কবির চিঠি বলতে মানুষের মনে যেমন ধারণা কাজ করে, তেমন একটা ভাবপূর্ণ কিছু নয় চিঠিগুলো। বরং অনেক পরিমাণেই কেজো। এইসব চিঠির ভেতরে সংস্কৃতি ও রাজনীতিকর্মী সেই ব্যস্ত আর প্রবল আবেগবান সেই মানুষটির আদলই ফুটে ওঠে, স্পষ্টভাষী যিনি আন্তরিক আর আবেগবান এবং সদা নানা সাহিত্যপ্রয়াসে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। সব মিলিয়ে একজন সত্যিকারের বড় মাপের মানুষ এসে দাঁড়ান আমাদের সামনে। ফলে, তাঁর ক্ষোভ, ক্রোধ, হতাশা অভিমান সমস্তই মর্মস্পর্শ হয়ে ওঠে।

উদাহরণ হিসেবে এখানে ৬৭ সালের জুন মাসে অগ্রজ ও অগ্রণী কবি অরুণ মিত্রকে লেখা একটা চিঠির খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক: "...এখন আমাদের চারদিকে কবিতার কোনো আবহাওয়াই নেই; বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীতেই নেই। সেজন্য মাঝেমধ্যে মনে হয় আমরা হয়তো হাওয়ার বিরুদ্ধ লড়াই করে চলছি, যেখানে পরাজয় অনিবার্য।

কিন্তু তবু, এ সময়ে পিছনে হাঁটিতেও আমার আপত্তি আছে। এবং এটা নিশ্চয় আমাদের সকলের কথা। পৃথিবী থেকে একদিন কবিতা যদি মুছেই

যায়, চারিদিকে কবিতার নামে যদি অশ্লীল ইতরামো আর মাতালের অট্টহাসিই ভেসে আসতে থাকে। আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য পালন করে যাবো। এমন কি তা যদি Don Quixote-এর পাগলামোও হয়, ক্ষতি কি?"

অবশ্য তাঁর চিঠিপত্রে কবিত্ব কম ছিল একথা বলা পুরোপুরি সংগত নয় এ কারণে যে, এসব চিঠির ভেতরে তিনি প্রায়ই কবিতাও পাঠাতেন।

তবে, সন্দেহ নেই অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ কবির সাক্ষাৎকার ও গদ্যরচনাগুলি। এগুলো সবই সংকলিত হয়েছে 'অনুষ্টুপ' স্মরণ সংখ্যাটিতে। সাক্ষাৎকারগুলিতে তার উত্তর দ্ব্যর্থহীন এবং স্পষ্ট। স্মৃতিকথাগুলিতে তাঁর স্পষ্টবাদিতা এবং আপোষহীনতার যে ছবি আমরা বারবার পেয়েছি, এখানে তার পাশাপাশি শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে তাঁর মানসিক উদারতা এবং বিশেষত শিল্পসাহিত্য বিষয়ে তীব্র সংকীর্ণতাবিরোধী মনোভাব। তা এতটাই যে, পড়তে পড়তে মনে হয়, যাঁরা তাঁর আপোষহীন আর প্রতিবাদী চরিত্রটিকেই অনুসরণীয় বলে ভাবতে চান, তাঁরা কেন ভুলে যান যে এই আপোষহীনতা আর প্রতিবাদ সম্পূর্ণতা অর্জন করে অমন মানসিক উদারতা এবং সংকীর্ণতাহীনতারই মধ্যে? সেটা ভুলে গেলে যে কবির প্রকৃত মুখচ্ছবি আর মহত্বকেই অস্বীকার করা হবে সেকথা মনে রাখা দরকার। আর, কবির সেই সমগ্রতাকে ছুঁতে সহায়ক হয়ে ওঠে এই 'বিশেষ সংখ্যায়' পুনর্মুদ্রিত চারটি সাক্ষাৎকার।

প্রশ্নগুলির মূল বিষয় সাহিত্যকেন্দ্রিক হলেও, তাতে প্রাসঙ্গিক হিসেবে সমাজরাজনীতির নানা কথাও এসেছে। সময়ের দিক থেকে চল্লিশ দশকের কবি হওয়া সত্ত্বেও বলছেন "আমার কবিতা কোনোদিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতা ও কবিদের কাছে অন্ন বা জল আহরণ করে নি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি, আমার কবিতার শিকড় অন্যখানে। সেখানে আজো যাঁরা জলসিঞ্চন করছেন তাঁরা সবাই দলছুট একক কবি—যেমন জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ।" অন্যত্র কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলছেন 'কবিতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকলে আমি খুশি হই। আমি এই ধরণের কবিতাই বেশি লিখতে চাই। তবে কোন কবির সব কবিতার সঙ্গে বা সব কবির কবিতার সঙ্গেই রাজনীতির সম্পর্ক থাকতে হবে এমন কোন নির্দেশনামা আমি ভেতর থেকে পাই না, অথবা বাইরে থেকে কেউ দিলেও আমি পছন্দ করি না।'

'এ্যান্টি পোয়েট্রি' সম্পর্কে তাঁর সমর্থনের কথা স্পষ্ট জানিয়েছেন। কিন্তু

সে সমর্থনের প্রকৃতিটিও নির্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট 'যাঁরা কবিতা মানেই বিশুদ্ধ কবিতা—হরবখৎ এ ধরণের কথা বলেন, তাঁদের সঙ্গে এ্যান্টি পোয়েট্রির হয়ে আমি নিশ্চয় লড়াই করে থাকি এবং তাই করবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কবিতাকে সব সময় এ্যান্টি পোয়েট্রির নিয়ম মেনে চলতে হবে।'

'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রিয় দেশী এবং বিদেশী কবিদের নাম বলছেন 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখ। এ ছাড়া প্রাচীন চীনা কবিতা, নিগ্রো কবিতা, 'পোষ্ট-ওয়ার পোলিশ পোয়েট্রি'-ইত্যাদি। ভিন্ন সাক্ষাৎকারে অবশ্য বায়রণের নাম করেছি, তাঁর পৌরুষের জন্য।' প্রিয় গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকদের নাম "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ" এবং 'ডস্টয়েভস্কি, হুগো, গোর্কি, জ্যাকলণ্ডন, হেমিংওয়ে, কাফকা'।" তারপর সাক্ষাৎকারী মনে করিয়ে দেবার পর যোগ করছেন 'সারভেন্টেজ'-এর নাম। আর 'প্রিয় নাট্যকার কারা' এ প্রশ্নের উত্তরে বলছেন "[একটু ভেবে] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রেশট না ব্রেখট কী লিখবেন ? জাঁ পল সার্ত্র, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'।

নানা প্রসঙ্গ অবলম্বন করে এভাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর মতামতের স্বচ্ছ উদারতা। এই সূত্রে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অত্যন্ত জরুরি একটি দিক নিয়ে তাঁর মতামত উদ্ধারের লোভ সংবরণ কঠিন। 'বিজ্ঞাপন পর্ব'-এর 'আমাদের দেশের বামপন্থী পার্টিগুলোর সাহিত্য সম্পর্কে অনীহা বামপন্থী সাহিত্যের কবর রচনা করছে' এই মতামত সম্বলিত প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন—

"আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। চল্লিশ পঞ্চাশের কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলতে পারি—সাহিত্য সম্পর্কে ঐ পার্টির 'ভ্যানগার্ডেরা' যথেষ্ট যত্ন নিতেন। সঙ্গীত, অভিনয়, চিত্রকলা সম্পর্কেও। তাঁদের রাজনীতিতে অনেক ভুল ছিল ; ঐ ভুলের খেসারত আমরা আজো দিচ্ছি। কিন্তু তাঁরা একটি প্রগতিশীল সাহিত্যের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পার্টি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরেও সি পি আই এখনো পর্যন্ত সাহিত্যিকদের প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত নয়—অনেক দূরে থেকেও বিষয়টি আমরা অনুভব করতে পারি। অন্য আর একটি বামপন্থী পার্টির কথা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যাঁরা কাছের ও দূরের সাহিত্যানুরাগী মানুষদের যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকেন···· দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এইসব

পত্র পত্রিকায় কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি এখনো যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়; যদিও প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি সমান শক্তি নিয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এঁরা কখনো অর্জন করেন নি।......যাঁদের আজ ক্ষমতা অর্জন করার কথা, সেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক বা একাধিক সংগঠন থাকা সত্ত্বেও, ঐ প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত শিশুসুলভ দুর্বলতা রয়ে গেছে। পার্টি সমর্থক লেখকদের বাইরে কয়েক পা এগুতেও তাঁদের ভয়, অথবা অনিচ্ছা। এই সংকীর্ণতা বিভিন্ন নকশাল শিবিরেও ইতস্তত চোখে পড়ে।'

গতায়ু এই কবি এভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্ত স্পষ্টতা নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ান এবং মনে করিয়ে দেন যে, তিনি সম্ভবত আমাদের সেই বিরল অগ্রজদের একজন, যাঁরা হয়ত প্রায় ব্যতিক্রমী স্বভাবে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন যে চালাকীর দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম সম্পন্ন হয় না।

এতো গেল ব্যক্তি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্বতার কথা, তাঁর সাহিত্যিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মতামতের কথা। কিন্তু প্রধানত তিনি তো কবিই। অতএব তাঁর সেই কবিত্বের পরিচয় চেনা তাঁর অনুরাগীদের প্রধানতম দায়। উল্লিখিত 'অনুষ্টুপ' বিশেষ সংখ্যা এবং স্মরণ কমিটির সংকলন গ্রন্থের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে এবং 'সারস্বত লাইব্রেরী' প্রকাশিত মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থটিতে একটিমাত্র দীর্ঘ আলোচনায় প্রবীন নবীন অনেকেই এগিয়ে এসেছেন তাঁর কবিস্বরূপকে চিনে নেওয়ার কাজে, তাঁর মূল্যায়নে। কোনো কোনোটিতে আছে তাঁর রচনার বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা, কোথাও বা আবার সমগ্রতায় ছুঁতে চাওয়া হয়েছে তাকে।

'অনুষ্টুপ' বিশেষ সংখ্যায় পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদকর্ম আলোচনার মাধ্যমে কবিকে চিনতে চেষ্টা করেছেন। 'মহা-পৃথিবীর কবিতা' নামের আলোচনাটিতে তিনি বুঝতে চেয়েছেন 'কী আছে এই আশি পাতার বইটিতে, যাকে বলা যেতে পারে 'মহাপৃথিবীর কবিতা!' এবং দেখিয়েছেন "কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবি হিসেবে খাপছাড়া কোনো কাজে হাত দেন নি; একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই কবিতার নির্বাচন ও অনুবাদ। মহাপৃথিবীর সেই গান গাথা কবিতাতেই অনুবাদকের প্রবল আগ্রহ যেখানে রূপ পেয়েছে শোষিত নিপীড়িত মানবাত্মার বঞ্চনা অপমান হতাশা নৈরাশ্য; যেখানে সেই মানুষের অপরাহত আশা স্বপ্ন উদ্দীপনা প্রতিবাদ আর সংগ্রামের কথা স্বাধীনতা আর মুক্তির চেতনায় এসে মিশেছে।"

কথাগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে অজস্র উদাহরণ তুলে ধরেছেন তিনি। সারা
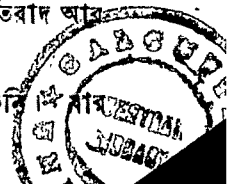
ভেতর দিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ এবং অনুবাদক্ষমতা দুয়েরই পরিচয় পেতে পারি আমরা।

'স্মরণ কমিটি'-র সংকলন গ্রন্থটিতে এরকম কয়েকটি প্রবন্ধ বেশ মূল্যবান। 'কবিতার মিল : কবির ভাবনা' প্রবন্ধটিতে স্মিতা চক্রবর্তী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দ মিলের বিবর্তনের আলোচনার শেষে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন কাব্যানুরাগীদের কাছে তা বিশেষ জরুরি : "অনেকের এরকম ধারণা আছে যে কবিতার মন্থন কলায় তিনি তুলনামূলকভাবে কম পারদর্শী। কথাটি বস্তুত তথ্যসমর্থিত নয়। কেবলমাত্র সত্তর ও আশির দশকে অস্থির সময়ের তাড়ায় ও বিচলিত মানসিকতার চাপে দ্রুতরচিত কিছু বক্তব্যপ্রধান কবিতা সম্পর্কে একথা হয়তো আংশিকভাবে খাটে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতার নির্মাণ কুশলতারই অন্যতম প্রমাণ কবিতার মিল সম্পর্কে তাঁর ভাবনায় এবং মিলের প্রয়োগে।"

মালিনী ভট্টাচার্যের 'মিথের' ব্যবহার ও 'মিথ' সৃষ্টি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি কবিতা' রচনাটিও লেখিকার সংবেদন সামর্থ্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন, একটিতে প্রচলিত 'মিথ' যেমন কবির হাতে সার্থক হয়ে ওঠে তেমনি অন্যটিতে যেন তিনি নিজেই বানিয়ে তোলেন নতুন মিথের সম্ভাবনা। 'অন্ধকারে মৃত মানুষ' কবিতায়, তাঁর মতে 'সুকান্ত—সোমেন চন্দ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মিথের' পর্যায়ে উত্তীর্ণ।' পুরাণেরই আর এক প্রয়োগের আলোচনা করেছেন ইরাবান বসুরায়, 'অন্য মহাশ্বেতা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে, যেখানে কবির ব্যবহৃত উক্ত পুরাণ প্রতিমাটি বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে আলোচক খুঁজে পেয়েছেন কবির সত্তাপরিচয়কে 'এই মৃত্তিকাস্পর্শিত ভালোবাসাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রেরণা, এই লৌকিক প্রতিমাই তাঁর মহাশ্বেতা।'

কিন্তু এও তো গেল কবিকে বিভিন্ন প্রসঙ্গের ভেতর খণ্ড খণ্ড করে চেনার চেষ্টা। তার মূল্য কম নিশ্চয় নয়। কিন্তু এসবের চেয়েও তো বেশি জরুরী তাঁর কবিব্যক্তিত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রশ্নটি, সেই স্বরূপকে চেনার, যা তাঁকে বিভিন্ন পাঠকের কাছে গ্রহণীয় কেবল নয়, বিশেষ প্রিয় করে তুলেছিল।

স্মরণ কমিটির সংকলন গ্রন্থটিতে তেমন প্রয়াস খুব বেশি না থাকলেও অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর "ফিনকি দেওয়া খুনের নিশান" প্রবন্ধটি বীরেন্দ্র কাব্যানুরাগীদের ভালো লাগবে। শোষণ আর অত্যাচারের বিরোধী, নিরন্ন মানুষ আর বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি সম্পন্ন বিক্ষুব্ধ কবির

প্রতি লেখকের পক্ষপাতের চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে। কাব্য আস্বাদনের তথাকথিত বামপন্থী এই ধরাটিতে কবির কাছে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের চেয়ে গভীরতর সত্য আর সৌন্দর্যের অনুসন্ধান হয়ত খানিকটা অপ্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হয়, তবু এখানে যে কবির কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতামতের পাশে তাঁর কাব্যভাষা বিষয়ে প্রবন্ধাকারের সচেতনতা বেশ উল্লেখযোগ্য মনে হয়।

তুলনায় 'অনুষ্টুপ' বিশেষ সংখ্যায় জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা 'কবিতা মানুষ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' রচনাটি মনে হয় অনেক বেশি সংবেদনশীল, শিল্পসচেতন ও বস্তুনিষ্ঠ। রচনাটির প্রথম অনুচ্ছেদটিই তাঁর ভাবনার মৌলিকতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নেয়ঃ

"বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ যখন বলেন, বীরেন্দ্র স্লোগানকে কবিতা করেছেন, কবিতাকে স্লোগান করেন নি, তা আমরা মেনে নিই। কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে কেবল এভাবে দেখাটা বোধ হয় ঠিক হবে না; কেননা এ ধরণের মন্তব্যে থাকে একটা সরলীকরণের ঝোঁক, যে ঝোঁক একবগ্‌গা। বস্তুত, এ জাতীয় ভাবনা থেকেই আসে বীরেন্দ্র কাব্যকৃতি সম্পর্কে তরল স্তুতি, যা খতিয়ে দেখে না কবিতার হাড়-মাস-মজ্জা, যা বাহিরঙ্গেই থাকতে সন্তুষ্ট অথবা প্রকাশ করে বিরক্তি। এই একমাত্রিক হিসেবেই দেখতে চায়, বিশেষত তার শেষপর্বের লেখাগুলিকে।"

এরপর তিনি কবির 'মাতলামো' শিরোনামের পাঁচটি মাত্র কবিতার বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে ছুঁতে চেয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আজীবন বিক্ষুব্ধ আর অস্থির চরিত্রের স্বরূপ। তাঁর আজীবন শুদ্ধ ও পবিত্র যন্ত্রণার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সমর সেনসুলভ নাগরিকতার অভাবকে, যে নাগরিকতা প্রথমাবধি এতই পোড়খাওয়া এবং অভিজ্ঞতাক্লিষ্ট যে নাড়িছেঁড়ার যন্ত্রণা অনুভব করে না, করতে পারে না; সমস্ত ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ঠাণ্ডা বুদ্ধি দিয়ে। নাতিদীর্ঘ তাঁর বিশ্লেষণকে লেখক আমাদের বোধস্পর্শী করে তুলতে পারেন বলেই প্রবন্ধের শেষে যখন শঙ্খ ঘোষের তিনটি পংক্তি প্রয়োগ করেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে, তখন মনে হয় আমাদের কবিকে চেনায় একটা বিশেষ মাত্রা যুক্ত হল ঃ

আরো একটু মাতাল করে দাও।
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবে না!

রঞ্জিত গুপ্তর 'কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আত্মসমীক্ষার দর্পন' রচনাটি উপরোক্ত একবগ্‌গা ঝোঁকের এক চমৎকার উদাহরণ। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এই সত্য যে, 'কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই বিরল 'কেউ কেউ'-দের একজন, যিনি কবি এবং সত্যদ্রষ্টা।' কিন্তু কবির সত্য যে মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র অংশের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার মন্ময়তা ও তার সমর্থক নন এমন সকলের প্রতি বিক্ষোভের প্রতিশব্দ নয় সে কথা বোঝবার মত মনের নৈর্ব্যক্তিকতা হারিয়ে ধারণার যে নৈরাজ্যে তিনি পৌঁছেছেন আমাদের শিল্প-সাহিত্য বিচারে তা বিপজ্জনক। তাই তাঁর কাছে বিষ্ণু দে ও চল্লিশের দশকের মার্কসবাদী কাব্যচর্চার ঐতিহ্যকে বর্জনীয় ও নজরুল-জীবনানন্দকে গ্রহণীয় মনে হয়।

বরং ইরাবান বসুরায়ের 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা: জন্মভূমির বর্ণপরিচয়' বস্তুনিষ্ঠতার গুণে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দুই পর্বে বিভক্ত এই রচনাটির প্রথম পর্বে তিনি উচ্ছ্বাসহীন নৈর্ব্যক্তিকতাতেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিচরিত্রের বিশিষ্টতাটি বুঝে নিতে চেয়েছেন। তিনি যে মূলত তাঁর কবিতা ও কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিকেই আশ্রয় করেছেন তা থেকেই প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়—বস্তুনিষ্ঠ, সংবেদনশীল ও সাহিত্যবোধ সম্পন্ন। একজন কবিকে চিনতে যে তাঁর আজীবন ভাষাকর্মের ভেতর দিয়ে সংবেদনশীল ও সন্ধানী মন নিয়ে হাঁটতে হয়, সে কথা তিনি মানেন। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে 'রাজনৈতিক কবি, বামপন্থী কবি' ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ। সশ্রদ্ধ কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে তিনি, তারপর যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চেনার পক্ষে জরুরি মনে হতে পারে—'আসলে রাজনীতি তার মানবতাকে তৈরি করে নি, মানবতার হাত ধরেই তিনি রাজনীতির সঙ্গ পেয়েছেন। আর সেই রাজনীতি ততটা তত্ত্বগত নয়, যতটা তা সময় ও স্বদেশের আলোড়নে আন্দোলিত একটি মানুষের উপলব্ধি। এবং স্বদেশ ও সময়কে তিনি রাজনীতি দিয়ে বিচার না করে মানবতা দিয়ে, সহমর্মিতা দিয়েই বুঝতে চেয়েছিলেন—'।

'অনুষ্টুপ্‌' বিশেষ সংখ্যার সবচেয়ে মূল্যবান লেখাটি, বলা বাহুল্য শঙ্খ ঘোষের 'আগুন হাতে প্রেমের গান', যা কালধ্বনি' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। যে সূক্ষ্ম সংবেদনময় বিশ্লেষণ তাঁর বন্ধিক ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞানেরই মত হয়ে উঠেছে আজ, তার দীপ্তিতে এই প্ত প্রবন্ধটিতে তিনি আমাদের পৌঁছে দিতে চান বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

কবিব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে। জানাতে চান, কীভাবে চিনতে হবে তাঁকে, তাঁর প্রাতিস্বিককে। সেভাবে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতার এক ধরণের মূল্যায়ন ঘটে যায় তাঁর হাতে, ধরা পড়ে যায় আধুনিক কবিতার বিচার সম্পর্কেই তাঁর এখনকার মতামতের এক ছবি। সেদিক থেকেও রচনাটি আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

আমাদের আধুনিক কবিতা আন্দোলনের শুরুতে 'রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাস' থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য কবিতা কোনো নতুন পথ খুঁজছিল তখন। বিচিত্র সেই পথগুলির দুটো সাধারণ লক্ষণ ছিল শিল্পিতা আর মনীষিতার আতিশয্য, জানিয়েছেন তিনি। 'এই ঝোঁক থেকে মূল্যবান এবং স্মরণীয় কিছু সৃষ্টি সম্ভব' হলেও, যেহেতু তার ভেতরে রয়ে গেছে 'কোনো এক প্রসাধনের শিল্পিত ঝোঁক', তাই শঙ্খ ঘোষ যেন সামান্য বিরাগই পোষণ করেন তার সম্পর্কে। লক্ষ্য করেন যে, তার থেকে বেরিয়ে আসবার ঝোঁক, 'দূরে থাকবার প্রবণতা' ছিল জীবনানন্দের। 'মাথার ভিতরে—মেধা নয়—কোনো এক বোধ কাজ করেছিল তাঁর। তারই প্রকাশের জন্য তিনি অনেকখানি শিথিল করে দিতে পেরেছিলেন কবিতার বহিরাবয়ব। জানান যে, জীবনানন্দের পথেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কবিতাকে এক নূতন পর্যায়ে নিয়ে এলেন 'যখন শিল্প মনীষাকে সরিয়ে দিয়ে কবিতার ভাষাকে তিনি দিতে চান সহজাত বোধের ভিত্তি, দিতে চান সরল উচ্চারণের তীব্রতা।' আর সেই সরল উচ্চারণের কবিত্ব সম্পর্কে সম্ভাব্য সংশয়ের জবাবে জানিয়ে রাখেন—'কী কবিতা তার কোনো প্রাক্তন ধারণা থেকে পাঠক তখন আর এই কবির রচনা পড়বেন না, এই কবির রচনা থেকেই তৈরী হয়ে উঠবে 'কবিতা কী' প্রশ্নের নতুন একটা উত্তর।'

অতএব, তিনি সিদ্ধান্তে পৌছোন 'এই অর্থে বাংলা কবিতাকে একটা নতুন ভাষা দিতে পারেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। এবং 'সেই ভাষায়, কবিতা তাঁর কাছে পায় স্লোগানের তেজ আর সরলতা, সে স্লোগানও হয়ে ওঠে মন্ত্রের মত ঘন।' এভাবেই তাঁর কাছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করেন শঙ্খ ঘোষ। তারপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি রেখায় ফুটিয়ে তুলতে চান এরই আলোয় তাঁর মুখচ্ছবি।

কিন্তু দুচারটি প্রশ্ন এরপরেও আমাদের মনে খোঁচা দিতেই থাকে। 'কবিতা কী', এই প্রশ্নের নূতন একটা উত্তর পাওয়া গেল কি? কী সেই উত্তর? মনন বর্জন এবং স্লোগানের তেজ আর সরলতা? সে নিরিখেই কি কবিতাকে বিচার করতে হবে এবার? কারণ, কোনো নূতন উত্তর যখন আসে

তখন তা পুরনোকে বাতিল করেই তো আসে। তাহলে মনন বর্জন—এমন এক নেতির ওপরেই কি আমাদের এবার থেকে কবির সাফল্যকে খুঁজতে হবে? বোধ 'সহজাত' বলেই কি বাঞ্ছিত মনে হবে তাকে, আর মনন অর্জিত বলেই কি অবাঞ্ছনীয়? সমস্ত সভ্যতাটাই কি আমাদের অর্জিত নয়?

'কবিতা কী' এ সম্পর্কে এই নূতন ধারণার ওপর দাঁড়াতে গেলে অনেক কবিকেই তো তাঁর পুরনো আসন থেকে সরিয়ে দিতে হবে আমাদের। তা কি সঙ্গত হবে- বা, তেমন কি চাইবেন শঙ্খ ঘোষ? নাকি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ক্ষেত্রেই এমন নিরিখ ব্যবহার করব আমরা? অন্যদের ক্ষেত্রে অন্যরকম?

তা যদি না হয়, তবে তো একটু ভয়ই হয় ভেবে যে, যাঁরা দর্শন বিজ্ঞান অর্থাৎ মননের ভেতর দিয়ে জগৎকে চিনতে চান তাঁদের কি এবার তাহলে আত্মাধিকারে ভাবতে হবে, আমাদের ভাষায় কবিতা নেই? মনন প্রবণতার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের প্রশ্নটি কি এবার থেকে ব্যক্তিত্ব বিভিন্নতার দিক থেকে না ভেবে সমর্থন অসমর্থনের দিক থেকে ভাবতে হবে আমাদের?

কিন্তু মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে এমন-কিছু আছে যা প্রগতিশীল কবিদের মধ্যেও খুব একটা সুলভ নয়'—তখন কিন্তু নূতন কোনো মান আরোপ করে তা করেন না। গত কয়েক দশকে মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারের যে ঐতিহ্য স্বীকৃত হয়ে চলেছে, তারই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বলেন। তাঁর 'কঠিন সবিতাব্রত : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিকর্ম' রচনাটি তাঁর 'প্রয়াণে তাঁর কবিকৃতি স্মরণ' উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল 'সারস্বত' পত্রিকায়, যা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুনির্বাচিত একগুচ্ছ কবিতাসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে সেই একই প্রকাশনা থেকে।

রচনাটির শুরুতেই মঙ্গলাচরণ তাঁর লক্ষ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন—'বন্ধু বীরেন্দ্রের কবিকৃতির—তাঁর চল্লিশোর্ধ বছরের দীর্ঘ ও অক্লান্ত সৃষ্টিকর্মের—অন্তত্র একটি বিষয়মুখ (objective) ন্যূনতম ভিত রচনার কাজে হাত দেয়া বন্ধু, সহকর্মী ও সহমর্মী হিসেবে আমার কর্তব্য বিবেচনায় এই কলম ধরা।' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গকে এনে এক বিশাল পটভূমির ভেতর স্থাপন করতে চান বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিকৃতিকে। যেহেতু মার্কসবাদই তাঁর গৃহীত পদ্ধতি অতএব দীর্ঘ সে আলোচনায় কবিতা ও রাজনীতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়টি যেমন আসে তেমনি আসে প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মত।

তিনি মূলত প্রেমের কবি এবং তিনি মূলত প্রতিবাদের কবি এই দুই মেরু বিপরীত মতের সূত্রেই মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় শুরু করেন তাঁর আলোচনা। বলেন 'আমার ধারণায় ওই দুটি মতের মধ্যেই সত্যের বীজ নিহিত, আবার সমগ্র বিচারে দুটি মতই খণ্ডিত সত্য।' তারপর বাঞ্ছিত বস্তুনিষ্ঠতায় পাতার পর পাতা জুড়ে ফুটিয়ে তোলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিত্বের স্বরূপ ও সৌন্দর্য। দেখিয়ে যান ব্যক্তিগত প্রেমে ও সামাজিক প্রসঙ্গে তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। চিনিয়ে দেন ঠিক কখন থেকে নিভৃত প্রেমের কবি হয়ে ওঠেন শ্রেণীসচেতন। সরলতাপ্রবণের সোচ্ছ্বাস স্তুতিবাচনের বিরোধিতা করেন এ কারণে যে তাতে সত্য মূল্যায়ন বিপন্ন হতে পারে।

তাঁর প্রতিবাদের কবিতাবলী কোথায় কিভাবে অনবদ্য হয়ে ওঠে তার বহু উদাহরণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করেও তিনি দেখাতে ভোলেন না যে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ও আবেগ কোথায় কখন বিপথগামী করে তাঁকে। আর দীর্ঘ আলোচনাটির শেষে তিনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সাহিত্যের ইতিহাসের যেখানে স্থাপন করতে চান তা থেকেই বেরিয়ে আসে তাঁর মূল্যায়নের গভীরতা :

'সমগ্র বীরেন্দ্র কাব্যবিচারে কবিকে যদি বিশেষভাবে চিহ্নিত করতেই হয় তাহলে তাঁকে বসাতে হবে প্রগতিশীলদের মধ্যেও ছোট একটি গোষ্ঠীতে— ইউরোপে একদা যাঁদের বলা হোত প্রোলেতারিয়ান কবি কিংবা জনকবি। উনিশ শতকের ইউরোপে এই গোষ্ঠীতে জোর্জ হ্বীর্ট ও বিশ শতকে বের্টোল্ট ব্রেশ্ট্, দেমিয়ান বেদ্নি প্রমুখ স্থান পাওয়ার যোগ্য। এদেশে আমরা এর প্রতিধ্বনি করে বীরেন্দ্রকে বলব, জনকবি।'

আমাদের সাহিত্যশিল্পের ইতিহাসকে মার্কসবাদী দর্শন মননের ঐতিহ্যে যাঁদের তেমন বিরাগ নেই, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিত্বের স্বরূপ সন্ধানে এই রচনাটি এবং সঙ্গের সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে তাঁদের কাছে।

অনুষ্টুপ
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৬ মূল্য ১৫ টাকা।
কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে
প্রকাশক : কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি, মূল্য ১৫ টাকা।
কঠিন সবিতাব্রত
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিকর্ম ও কবিতা
প্রকাশক : সারস্বত লাইব্রেরী, মূল্য ১০ টাকা।

দেখা হবে মুক্ত স্বদেশে

অশোক মুখোপাধ্যায়

বাংলা গদ্যসাহিত্যের নানা উন্নতি ও ঐশ্বর্যের কথা যতটা বলা হয়, এর নানা অভাব ও দুর্বলতার কথা ততটা বোধহয় আলোচিত হয় না। যেমন, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী আলোচনা পড়েছি বা শুনেছি বলে মনে হয় না। অথচ সংবাদ পরিবেশন নিছক মুহূর্তের দাবী পার হয়ে কখনো কখনো দূর প্রজন্মকে ছুঁয়েছে, ছুঁতে পেরেছে, এমন দৃষ্টান্ত এদেশে দুর্লভ হলেও অনুপস্থিত নয়। তাৎক্ষণিক ঘটনা বিষয়ে যে সাংবাদিক বিবরণী তৎক্ষণকে পার হয়েও পাঠ্য ও স্মর্তব্য থেকে যায়, বাংলায় তার কোনো ভালো নামও আমরা ঠিক করতে পারি নি। বোধহয় এই জাতীয় রচনার দুর্লভতার জন্যই এদিকে মনোযোগ পড়ে নি। তাই এখনো 'রিপোর্টাজ' নামক একটি বিদেশী শব্দ দিয়েই এই ধরণের লেখা বাংলাতেও চিহ্নিত হয়ে আসছে।

দুর্লভ হলেও এই ধরণের স্মরণীয় রচনা নিতান্ত বিরল নয়। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বা 'আলালের ঘরের দুলাল' এই ঐতিহ্যসৃষ্টিতে পথিকৃতের সম্মান দাবী করতে পারে কিনা, জানিনা। তবে সংবাদ পরিবেশণকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস ও ধারা বাংলা সংবাদপত্রের ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগেই। সাম্প্রতিক কালে কলকাতার বড় খবরের কাগজগুলিতে 'কালপেঁচা', 'নিরপেক্ষ', 'রূপদর্শী'

ইত্যাদি ছদ্মনামের আড়ালে প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী সাংবাদিক সাহিত্যিক-দের রচনা খুবই জনপ্রিয় হতে দেখেছি।

আমাদের সমাজের মত সাহিত্যেও বামপন্থা সর্বদাই তাজা বিকল্প নিয়ে হাজির হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী সাংবাদিকতা নতুন মাত্রা খুঁজেছে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অন্যতর ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে ধীরে ধীরে। সংবাদ মূলতঃ কাব্য কিনা জানি না, তবে সংবাদের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল সংবাদ আবিষ্কারের দায় সাংবাদিককে নিতে হয়, একথা একটু একটু করে বোঝা গেছে।' বামপন্থায় বিশ্বাসী সাংবাদিক প্রথমেই বুর্জোয়া সংবাদপত্রের তথাকথিত ছদ্ম নিরপেক্ষতাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাধারণ মানুষের দিকে, তার যূথবদ্ধতার দিকে নজর পড়েছে। মার-খাওয়া মানুষের কষ্ট ও তাদের ঘুরে দাঁড়াবার মরীয়া শপথ ও প্রয়াসের মধ্যে কোথায় কখন ঝিলিক দিয়ে উঠছে ইতিহাসের ইঙ্গিত, তার খোঁজে সতর্ক চোখ মেলেছে এই বামপন্থী সাংবাদিকতা। চোখ মেলেছে, কাণ পেতেছে। কাব্য আরেকটু বাড়ালে, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছে।

অগ্রজদের কাছে শুনেছি, খুব ছোটোবেলায় একটু-আধটু পড়েছি মনে আছে, 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় রিপোর্টাজের এই নতুন ঘরানা তৈরি হতে থাকছিল। তরুণ সাংবাদিকদের এই কাজে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি উৎসাহ ও ভরসা জোগাতেন নাকি সোমনাথ লাহিড়ী। সেই সময়কার স্বাধীনতা-য় প্রকাশিত স্মরণীয় রিপোর্টাজ-এর কোনো সংকলন যদি এযুগে প্রকাশিত হত, খুব ভালো হত। পরবর্তী সময়ের পাঠকরা একটা আন্দাজ পেতেন। আমরা পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে আজ পর্যন্ত যেসব বামপন্থী সাংবাদিক-সাহিত্যিককে এই ধরণের রচনায় নানা সময়ে উৎসাহী হতে দেখেছি তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা দেবেশ রায়ের নাম বেশি করে মনে পড়ছে। তবে যে দুজন এই রিপোর্টাজ রচনার আধুনিক বামপন্থী ধারায় সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন গোলাম কুদ্দুস ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুসের 'সম্বোধন'-এ সংকলিত লেখাগুলি রচনা এমনকি প্রকাশের (১৯৬৫) এত বছর পরেও মুগ্ধ হয়ে পড়তে হয়। তেমনি 'ডাকবাংলোর ডায়েরি'-র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মরমী কলমে মূর্ত হয়ে আছে কত ছবি।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সীমানা যেখানে ক্রমাগত একাকার হয়ে

যাচ্ছে সেই এলাকায় আরেকজন যাঁকে আমাদের কালে বিচরণ করতে দেখেছি সহজ নৈপুণ্যে, তিনি জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। গভীর ভালবাসা ও অতন্দ্র দায়িত্ববোধ নিয়ে দীর্ঘকাল এই কাজ করে চলেছেন তিনি— সংবাদের আড়ালে মানুষ, মানুষের আড়ালে ইতিহাস আবিষ্কারের এই কঠিন অথচ জরুরী কাজ। পেশায় অধ্যাপক, জীবনচর্চায় কমিউনিস্ট কর্মী, সৃষ্টির তৃতীয় ভুবন সাহিত্য—এই আকর্ষণীয় সম্মিলন দেখা গেছে জ্যোতিপ্রকাশের মধ্যে। তাই হয়তো নানা ভাবে নানা কোণ থেকে জীবনকে দেখতে পেয়েছেন তিনি। তাঁর সেই জীবনদেখার ফসল যেমন তাঁর গল্পে-উপন্যাসে এসেছে, তেমনি আবার তাঁর রিপোর্টাজ ধর্মী লেখাতেও ছড়িয়ে আছে সেই পর্যবেক্ষণ, বোধ ও মমতা। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৩, আঠারো বছরে প্রকাশিত লেখা থেকে মাত্র পনেরোটি বেছে নিয়ে ছাপা হয়েছে তাঁর নতুন গ্রন্থে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'দেখা হবে'। প্রকাশক মণীষা-কে ধন্যবাদ। রিপোর্টাজ-এর সংকলন প্রকাশ চোখেই পড়ে না প্রায়। সেক্ষেত্রে তাঁদের এই উদ্যোগ ও সাহস সঙ্গত কারণেই প্রশংসা দাবী করে।

আঠারো বছর মানে প্রায় দুই দশক। বহু উথাল-পাতাল ঘটনায় চিহ্নিত এই সময়-পর্ব। স্মৃতিতে রেখে গেছে বহু অনপনেয় দাগ। অনেক গর্ব ও লজ্জা দিয়ে গেছে। অনেক আবির্ভাব ও বিদায়, জন্ম ও মৃত্যুতে চিহ্নিত হয়ে আছে। জ্যোতিপ্রকাশের লেখায়, স্বভাবতঃই, এই সময়ের ছাপ দগদগে হয়ে পড়েছে। তিনি কেবল দেখেন নি, ভেবেছেন। শুধু ভাবেন নি, ভাবতে চেয়েছেন। তাঁর আবেদন শুধু ভাবনার কাছে নয়, আবেগের কাছেও। মূলতঃ আবেগেরই কাছে। নানা সময়ে, নানা উপলক্ষ্যে, নানা কারণে তাঁর আবেগ ও চৈতন্য তাড়িত হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যগুলিও যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র লেখকের প্রতিক্রিয়া।

রচনাগুলির সংক্ষিপ্ততম উল্লেখ থেকেও বিষয়ের এই বৈচিত্র্য, প্রেক্ষাপটের ব্যাপ্তি বুঝে নেওয়া যাবে হয়তো। যেমন, 'অহল্যা মা', 'লালপতাকার খামার' বা 'সেই ছেলেটি' লেখকের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে মোলাকাতের ফসল। যদিও 'সেই ছেলেটি' শহর-গ্রামের যোগাযোগকারী বাসের বিচিত্র ভিখারী, তবু সে গ্রামেরই ছেলে। তেমনি আবার 'ওঁ মা! ভাড়ার জন্য' নামক বিচিত্রস্বাদের লেখাটিতে শহরের মধ্যবিত্তের আন্দোলন-মুখীনতার গল্প বলা হয়েছে। কোনো পতাকার তলায় দাঁড়ানো কমিটেড মধ্যবিত্ত নয়, নিতান্তই পথ-চলতি বাবা ও মেয়ে, আন্দোলনে উত্তাল কলকাতা যাদের ছুঁয়ে দেয়,

কংগ্রেসী মস্তানের ভাড়ার লরী-র ডাক সরিয়ে যারা হেঁটে যায় প্রতিবাদী ভিড়ের সঙ্গে।

দুটি খুব মূল্যবান লেখা আছে এযুগের দুই বিরাট শিল্পীকে নিয়ে। 'ভিক্ষাপাত্রটি কোথায়' দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেজ, মহত্ব ও অপোস-হীনতার প্রতি চমৎকার শ্রদ্ধার্ঘ। তেমনি 'থিয়েটারের ক্রীতদাস' অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত প্রতিভার জরিপ করতে চায়। বোঝা যায়, এই দুজন দুভাবে লেখকের চৈতন্যে গভীর ছাপ ফেলে গেছেন। রাজনীতির কাজ এবং সাহিত্যের সাধনা—এই দুই কঠিনকে মেলাবার কাজে দীপেন্দ্রনাথ বিরাট নিবেদন। লেখকের গভীর ঋণ এই মানুষটির প্রতি। লেখাতেও তা ভারী স্পষ্ট।

'এ তোমার, এ আমার' সাম্প্রদায়িকতার বিষের দিকে অমোঘ অঙ্গুলি-নির্দেশ। রচনাকাল উল্লেখ করা আছে। তবু বোঝা যায়, শুধু ঐদিন নয়, শুধু পশ্চিমবাংলার গ্রামে নয়, গোটা ভারতের শিরা-ধমণীতে এই বিষ ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পিত কাজ চলছে বহু বছর ধরে।

কয়েকটি লেখা স্বদেশের সীমানাকে পার হয়ে যায়। গল্পের চেয়েও আকর্ষক গল্প শোনা যায় ভিয়েতনামের সংগ্রামী যোদ্ধার কাছ থেকে। তবে ঐ রচনার শিরোনামে 'গেরিলা' শব্দটির ব্যবহার একটু অস্বস্তি জাগায়। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা-রণকৌশলের আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু তাকে শুধু গেরিলা বললে তার ভূমিকা একটু খাটো হয়ে যায়। ব্যঙ্গবিদ্রূপে শাণিত লেখা 'অ্যামেরিকার লঙ্গরখানায়।' রেগন প্রশাসনের স্বরূপ এমন ঠাট্টার ভেতর দিয়ে খুলে খুলে দেখানো বেশ ক্ষমতার পরিচায়ক। 'দেখা হবে মুক্ত স্বদেশে' লেবাননের মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে ঝটিতি সাক্ষাৎকারের অন্তস্পর্শী বিবরণ।

দেখাই যাচ্ছে, কতরকম জায়গা থেকে লেখার বিষয় তুলে এনেছেন জ্যোতিপ্রকাশ। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আমাদের দেখা-জানা গত কুড়ি বছরকে আবার নতুন করে দেখছি। সময়ের এই ধারাভাষ্য রচনায় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শৈলীও পালটে পালটে নিয়েছেন লেখক। এইখানে তাঁর বড় কৃতিত্ব। দীপেন্দ্রনাথকে যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে ট্রিবিউট দেন, তাঁর থেকে সম্পূর্ণ অন্য কোটিতে চলে যায় ভঙ্গী ও স্টাইল যখন আক্রমণ করেন সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্প্রদায়িকতাকে। গ্রামের শহীদদের মায়ের দুঃখে যে থমথমে অঙ্গীকার তার থেকে আলাদা সুরে বেজে ওঠে বহু মানুষের মিছিলের ঐক্যতান।

পর পর লেখাগুলি পড়তে পড়তে একটা কথা মনে হয়—একটু যেন বেশি বলা আছে। আরেকটু কম করে বললে এফেক্ট হয়তো বেশি হত। পাঠকের ভাবার জন্য একটু জায়গা থাকলে ভালো হত। পরিমিতি বা স্বল্প-ভাষণে যে ব্যঞ্জনা তৈরি করা যায় তার বদলে একটু উচ্চকিত নাটকীয়তা প্রশ্রয় পেয়েছে বহু জায়গায়। রাজনৈতিক প্রচারক এবং সুবক্তা জ্যোতিপ্রকাশ কোথাও কোথাও শিল্পী জ্যোতিপ্রকাশকে হারিয়ে দিয়েছেন। আবেগময়তাকে আরেকটু কঠিন শিকলে বাঁধলে হয়তো আবেগ আরও দূরভেদী হ'ত। আরেকটি কথা। লেখা বাছার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা ছিল। তাই আঠার বছরের মাত্র পনেরটি লেখা জায়গা পেয়েছে। তবু বলব, 'পোস্টারের ছবি' বা 'মিছিল যেন সাগরে' এই গ্রন্থের অন্য লেখার তুলনায় অনুজ্জ্বল। তাই, বর্জনীয় ছিল। কোন লেখা কত সালে প্রকাশিত সে তথ্য আছে। কোথায় প্রকাশিত এই খবরও থাকলে পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে আরও সাহায্য হ'ত।

মনীষা-কে আগেই ধন্যবাদ দিয়েছি প্রকাশনার সাহসের জন্য। এবার দেব মুদ্রণপ্রমাদের প্রায় অনুপস্থিতির কারণে। তবে আভ্যন্তরীণ লে-আউট মামুলী।

একটা কথা, জ্যোতিপ্রকাশের পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত পটেও, কোথাও, এযুগের ছেলেমেয়ে গ্রামে বা শহরে—তাদের কাজ বা স্বপ্ন বা জ্বালা—জায়গা পেল না কেন?

দেখা হবে। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। মনীষা গ্রন্থালয়। ২০ টাকা।

'শুভ্র ফুলের জন্য'

অমিতাভ গুপ্ত

একটি বিস্ময়ের বক্তাভায় ন্যস্ত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ধ্বনিগঠন। সারল্যের স্পর্দ্ধা কবিতার অবয়বকে যতদূরে নিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে আরো কিছু দূরে যেখানে শব্দ থেকে চ্যুত মানবিক আসক্তি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দেয় আলো ও আলোকভস্ম, যেখানে ভস্ম থেকে কন্দর্পের মতো উঠে আসে জীবনের রূপার্ত ব্যঞ্জনা, ততদূরে, তাঁর প্রতিভার প্রস্থানভূমির কাছে নম্র হ'য়ে পাঠকের শেষপর্যন্ত মনে পড়ে যায় বাংলা কবিতার সেই প্রতিশ্রুতিময় সময়ের আয়োজনটিকে।

যে-প্রতিশ্রুতি আজ যুগান্ধকারের আড়ালে, আমাদের শিল্পবিরোধিতা ও জীবনবিরোধিতার আবর্তে যা অস্পষ্ট-অচেনা হ'য়ে উঠেছে, তাকেই মনে করিয়ে দিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনটি। প্রসঙ্গত, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলন-উদ্যোগের বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রে বোধহয় আর লাভ নেই। কীভাবে যে কিছু কবিতাকে 'শ্রেষ্ঠ' (এবং সংকলনবহির্ভূত কবিতাকে 'শ্রেষ্ঠ নয়') মনে করা হয়, তা অবশ্য আমাদের বুদ্ধির বাইরেই থাকবে।

যাক সে কথা। বর্তমান সংকলনটিতে আমরা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-প্রণীত অর্ধশতাধিক কবিতা পাচ্ছি, এও তো কম পাওয়া নয়। অবশ্য যাঁরা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতার বই তিনটি দেখবার সুযোগ পাননি তাঁদের কাছে প্রশ্ন থেকে যাবে—কেন কোনো কোনো কবিতা শ্রেষ্ঠ এবং কোনো কোনো

কবিতা শ্রেষ্ঠ নয়, এ প্রশ্ন ছাড়াও অন্য একটি—কোন্ কোন্ কবিতা শ্রেষ্ঠতার বিচারে পরাস্ত হ'ল। এক পৃষ্ঠার পরিচিতিতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাব্যগ্রন্থগুলি সম্পর্কে প্রকাশক ছাড়া আর কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম কবিতা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল সে তথ্যটি ছাড়া তাঁর কবিতাচর্চা সম্পর্কে অন্য কিছু বলা হয়নি, যদিও জানানো হয়েছে যে তিনি সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও জেম্‌স্ আইভরির ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন।

এই তথ্যটিই বা কীভাবে তাঁর কবিতা চর্চা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পাঠককে সাহায্য করবে, সে প্রশ্নও থাক। কিন্তু অন্য একটি প্রশ্ন বোধহয় অনিবার্য। কোনো কবিতার যে পাঠভেদ পাওয়া যাচ্ছে, তার মীমাংসা হবে কী ক'রে। পাঠকের কাছে সবচেয়ে সহজলভ্য দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই 'বোকারো' কবিতাটি ('রাজধানী ও মধুবংশীর গলি' এর অন্তর্ভুক্ত), যে কবিতাটিকে 'অরণি' শিরোনামে পাওয়া যাচ্ছে বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা'য়। পাঠান্তরের দৃষ্টান্ত ঃ

'বোকারো' (শ্রেষ্ঠ কবিতা)	'অরণি' (একালের কবিতা)
ছত্র ৩. অদ্ভুত ভূগোলে শাল মহুয়া পলাশে	৩. অদ্ভুত ভূগোলে, শাল মহুয়া পলাশে
ছত্র ৫. তোমাদের দূর কোনো সমতল শহরের থেকে	৫. তোমাদের দূর কোনে সমতল শহরের থেকে
ছত্র ৬. সন্ধ্যার বিদ্যুৎ-আলো ছুটে এসে এসে	৬. সন্ধ্যার বিদ্যুৎ-দ্যুতি ছুটে এসে এসে
ছত্র ৯. দিন ডুবে যায়	৯. দিন ডুবে গিয়ে
ছত্র ১০. ওপরের দিনে	১০. ওপারের দিনে
ছত্র ১১. একটি দিনের আয়ু নিবে গেল বুঝি	১১. একটি দিন আয়ু নিভে যায় বুঝি !
ছত্র ১২. কত আয়ু সব জীবনের গায়ে লেগে লেগে	১২. কত আয়ু কত জীবনের পরে লেগে লেগে

(ত্রয়োদশ ছত্রটি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পংক্তিবিন্যাসও কিছুটা অন্যরকম।)

ছত্র ১৭-১৮. "আমরা" ও "তোমরার" এপারে ওপারে / পাড় বুনে চলো	১৬-১৭ 'আমরা ও তোমরা'র এপারে ওপারে / জীবনের পাড় বুনে চলো

ছত্র ২৪. তবুও এখানে এক	২৩. তবুও এখানে এক
ছত্র ২৭. অন্ধকার মসৃণ শরীরে	২৭. অন্ধকার মসৃণ শরীর—
ছত্র ২৮. চোখের গভীরে..	২৮. চোখের গভীর
শেষ ছত্র. পত্রঝরা	শেষ ছত্র. পত্র—ঝর

কোন পাঠটিকে তাহলে প্রামাণ্য ব'লে মনে করবেন পাঠক? প্রকাশ-কালের বিচারে, 'একালের কবিতা' 'রাজধানী ও মধুবংশীর গলি'র আগে ছাপা হয়েছিল। এ নিশ্চয়ই 'বোকারো'র পাঠ গ্রাহ্য করবার পক্ষে খুব জোরালো যুক্তি। প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' মানে তাহলে কী, কবির প্রকাশিত বইগুলির সম্পূর্ণ আংশিক মুদ্রণের সঙ্গে গ্রন্থবহির্ভূত কিছু কবিতা সংকলন করা?

এই সংকলনের জন্য ছড়া ও কবিতা নির্বাচন করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীতশোক ভট্টাচার্য ও ধীমান দাশগুপ্ত। বীতশোক ভট্টাচার্য প্রণীত 'অনুকথন' সংকলনের আট পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে। বীতশোক ভট্টাচার্যের ভাষাব্যবহারের সাহস ও সৌন্দর্য যেন তুলনারহিত বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর নাম পাওয়া যায় না, এতে অবাক হবার কিছু নেই। বাঙালির ইতিহাসে তাঁর নাম থেকে যাবে।' নান্দনিক চেতনার যে-গভীরতা থেকে এই প্রত্যয় উঠে এসেছে, তার কাছে নম্র না হ'য়ে উপায় নেই। শঙ্খ ঘোষের বর্ণনাশৈলীর আদলে রচিত চল্লিশের দশকের ভাষা-চিত্রটিও অনবদ্য হ'য়ে ফুটেছে বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে। 'বলাকার পাখার ঘায়ে তাঁর কবিতা চমকে চমকে উঠেছে' কিংবা 'যা ছিল এলিয়ে-পড়া লতিয়ে-ধরা রবীন্দ্রগীতি···জ্যোতিরিন্দ্রর সবল কণ্ঠ তাকে যূথজনতার মাঝখানে এনে আবার দাঁড় করিয়ে দিল' ইত্যাদি উক্তির অভিজ্ঞানে নতুন কালের গবেষকদের জন্য ভাবনাসংকেত রয়ে গেল।

তবু হয়ত তর্ক উঠবে পাঠকের মনে, যত ভালোই হোক না কেন কী প্রয়োজন ছিল বীতশোক ভট্টাচার্যের এই রচনাটিকে সংকলনের মধ্যে রাখবার। যে বাণিজ্যিক উৎসাহে জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ প্রচ্ছদে রবীন্দ্র-নাথের বাণী উৎকীর্ণ হয় সেই একই প্রবণতায় প্রমোদ বসুর কবিতার বইয়ের সঙ্গে আলোক সরকারের সার্টিফিকেট না-ছাপালে চলে না। এই ন্যক্কারজনক প্রথা থেকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতার সংকলন দূরে থাকলেই পাঠক স্বস্তি পেতেন। বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি আরো বড়ো আকারে অন্য কোনো পত্রিকা মারফৎ যদি পৌঁছত পাঠকের কাছে, যদি ওই আট পৃষ্ঠায় পাওয়া যেত

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আরো কয়েকটি কবিতা কিংবা কোনো গদ্যাংশ তাহলে পাঠক-কবি-নির্বাচকমণ্ডলী কারোরই সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়েছে ব'লে মনে হতো না। উল্লেখযোগ্য, 'সংকলনটি এক অনন্য সংযোজন' এই বিজ্ঞপ্তিটুকু দেওয়া ছাড়া '৬.৪.৮৫' তারিখচিহ্নিত এ প্রবন্ধের কবিতা সংকলনের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্য কি, তা' বীতশোক ভট্টাচার্যও জানান নি—উদ্দেশ্য নিশ্চয় এতটাই স্পষ্ট।

সংকলনটি যে 'এক অনন্য সংযোজন' সে সম্পর্কে পাঠকের কোনো ভিন্নচিন্তা থাকতে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের চেতনার দুর্গত যে সংকলনের পাতায় পাতায় বিকীর্ণ হ'য়ে রয়েছে, যার স্পন্দনে ছন্দে চিত্রাভাসে যুগান্ধকার পেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি ঘটে পাঠকের মনে—এমন একটি সংকলন হাতে পাওয়ার জন্য প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ না হ'য়ে উপায় নেই।

কৃতজ্ঞতাবোধ, মনকে হয়ত একটু অধিক সংবেদনশীলও ক'রে তোলে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতা সংকলনের শেষ পৃষ্ঠায় তাই যখন চোখে পড়ে প্রকাশন সংস্থার পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত বইয়ের তালিকা, তখন চকিতে সব কৃতজ্ঞতাবোধকে আড়াল ক'রে, জেগে ওঠে কিছু আর্তি ও উৎকণ্ঠতা! বাণিজ্যের স্বার্থে, কিছুই কী অসঙ্গত নয় এখন? কিছুই কী অশালীন ব'লে মনে হয় না?

শ্রেষ্ঠ কবিতা। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। বাণীশিল্প। ১৫ টাকা।

আর্কিটাইপ-এর আদিমাতা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পার্বতী নামে এক ধোপা বৌ অথবা ধাই বৌ-কে নিয়ে 'মহারাণী' উপন্যাসটি লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায়, মেগালিথিক যুগের টোটেমের এক প্রতীকের মত রাতের আকাশের নিচে মরে কাঠ হয়ে শুয়ে আছে নগ্ন, অতিবৃদ্ধা পার্বতী। তার চারপাশে নিঃস্বতা আর নশ্বরতার গন্ধ।

পূর্ণেন্দুর উপন্যাসটি খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। একদিকে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন এই রচনায় আদিম লোকশিল্পের সহজ সাহস সঞ্চার করতে, অন্যদিকে একটি দীর্ঘ, কষ্টকর অস্তিত্বের যাবতীয় জট-জটিলতাকে বাঁধতে চেয়েছেন মেধাবী বেদনা দিয়ে। কোথাও বা গতকালের গ্রাম-বাংলার পরিবেশের ওপর এসে পড়েছে সুদূর গ্রীসের বিষাদ নাটকের তাড়িত আলো। নান্দনিক কমলকুমার মজুমদারও হয়তো ভিতরে-ভিতরে এখানে কাজ করেছেন পূর্ণেন্দুর রক্তে। উপন্যাসটির বন্দিশ শুনতে শুনতে কেন যেন কানের ভেতরে বেজে উঠছিল—ক্রমে আলো আসিতেছে।

একটি রূপসী যুবতী শ্রমজীবিনী তার জীবন ও বয়সের সকল মুকুল ঝরাতে ঝরাতে স্থবিরতার ক্ষমাহীন শূন্যতায় কিভাবে এসে দাঁড়াল, তারই বহুমাত্রিক উপন্যাস 'মহারাণী'। নহলা গাঁয়ের রজক মুকুন্দের স্ত্রী পার্বতী। সে একদিকে যেমন উদয়াস্ত পরিশ্রমী স্বামীর সহকর্মিনী, তেমনই অসাধারণ দক্ষ ধাই।

"গ্রামের যেখানেই ছেলে বিয়োক, রাত জাগতে পার্বতী। গ্রামের যেখানেই পেটের ছেলে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হোক, নাড়ি কাটবে পার্বতী।" তাছাড়া অন্দরবাসিনীদের হাজার কাজে-অকাজে পার্বতীর চাইতে ভরসা কেউ নেই। মেয়েলি অসুখের সবরকম টোটকা চিকিৎসা তার জানা। গাঁয়ের মেয়েমহলের ছোটোখাটো উটকো ঝামেলা থেকে শুরু করে মারাত্মক বিপদ সামাল দিতে পার্বতীরই ডাক পড়ে।

প্রতিমার মত কাঠামো পার্বতীর। তার ওপর নজর পড়েছিল গাঁয়ের জমিদারদের দুর্যোধনবাবুর। অন্ধকার বাঁশঝাড়ের আড়ালে ঘন্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষমান সেই রাজাবাবু শান্তি পাচ্ছিল না সামান্য আঁচড় কামড়ের ছিটে-ফোঁটায়। এই অধীর প্রেমিকই আড়ালে থেকে শিখণ্ডী দিয়ে খুন করে মুকুন্দকে। পার্বতীর কিশোর ছেলে পচা মারা যায় জলে ডুবে। তারপর থেকেই একটি একটি করে ইঁটের স্খলনের মতো খসে খসে পড়তে থাকে বহুকষ্টে ধরে-বেঁধে জড়ো করে রাখা পার্বতীর যা-কিছু সব। স্মৃতি-বিস্মৃতি ও এই ক্রমান্বয়িক স্খলনের কমি-ট্রাজিক এক আদিমাতার অমোঘ আর্কিটাইপ-এ দাঁড়িয়ে যায় কালহীনা, আকারহীনা রমণীটি। যে অসংখ্য প্রাণ তার রক্তাক্ত করতলে মুকুলিত হয়ে উঠেছে, ডাটো হয়ে ওটা সেই গ্রামীন পুরুষ-নারীদের পৃথিবীতে অতীত ও ইতিহাসের এক নড়বড়ে অথচ মায়াবী সেতুবন্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শেষ-মেশ পরিত্রাণহীনতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় পার্বতী। প্রাচীন লেখক হলে উপন্যাসটির দিতে পারতেন এক নিয়তিবাদী শিরোনাম 'হা, পরিণাম'! বস্তুত, পার্বতীর গঙ্গাজল সুরোবালা নাপতেনির ছেলে অক্ষয় যখন গাঁয়ের হাটের খটখটে দুপুরে উকুনে ঠাসা মাথা যত্ন করে কামিয়ে দিচ্ছিল তাঁর মাতৃপ্রতিম অতিবৃদ্ধার, তখন তারও বুক টনটন করে উঠেছিল অনিত্য জগতের প্রপঞ্চের কথা ভেবে। এবং, "অনেকটা তার অজ্ঞাতসারেই বুক ঠেলে বেরিয়ে-আসা একটা পাতলা দীর্ঘশ্বাস পার্বতীর কামানো মাথার নীল শিরাগুলিকে ছুঁয়ে উড়ে গিয়েছিল টিউবওয়েলের ওপারের গাছপালার জঙ্গলের দিকে।"

যাকে পুরোনো অর্থে কাহিনী বলে, সেরকম কিছু পাওয়া যাবে না 'মহারাণী'-তে। অবশ্য, কাহিনীর 'সংগঠন' বলতে কি বোঝায়, তা ঠিক জানা নেই আমার। ওলোট-পালোট হাওয়ার মত এখানে চারধার থেকে এসে মিশে গেছে নানা ঘটনা, চিত্রমালা, চিন্তা, টুকরো টুকরো আখ্যান, লোভ ও অতিরেকহীন, আভাষময় বিন্যাসের সংযম। মাঝে মাঝেই ঝিকিয়ে ওঠে

ডিটেল্‌স-এর পংখ-কাজ। আয়াস ছাড়াই মূর্তি নিয়ে দাঁড়ায় হাওড়া-মেদিনীপুর সীমান্ত অঞ্চলের লোকযানি মেজাজ, জিভের ভাষা, সংস্কার, লোকাচার, বিশ্বাসে ঠাসা আঞ্চলিকতা। সামন্ত-সভ্যতার অস্তগামী সবিতার আলো এসে পড়ে একই সঙ্গে সাবেক মূল্যবোধ ও তার বিনাশের মোহনায়। কোথাও কোথাও আন্তর্জাতিকতার প্রসারিত ডানার ছায়া ছড়িয়ে যায় একটি তুচ্ছ নারীর ও একটি অজানা গাঁয়ের একান্ত আটপৌরে জীবনচর্চার ওপর। অসংখ্য অসঙ্গতি, এমনকি সে-সব নিয়ে মাত্রাছাড়া, নিষ্ঠুরতম রসিকতাও বাঁধা পড়ে এমন এক স্তব্ধতায়, যার হিম শৈত্য উপন্যাসের অস্তিমে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় পাঠকের অস্থি-মজ্জা।

বেশ বয়স্কভাবেই পূর্ণেন্দু একটি সাধারণ রমণীকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন জীবপালিকা-রূপে। ধাই পার্বতীর হাতেই শুধু নয়, তার বুকের দুধ খেয়ে জন্মে, বেড়ে উঠেছে যে-জাতকেরা, তাদের প্রতি অপার মমতায় নিজেকে মহাভারতের শতপুত্রবতী গান্ধারীর সঙ্গে তুলনা করে পার্বতী। মায়া এ-উপন্যাসের গিঁঠে-গিঁটে। এর টানেই অশক্ত বৃদ্ধা মরতে-মরতেও প্রতি সোম ও শুক্রবার আসে গাঁয়ের হাটে। পূর্ণেন্দু লিখছেন, 'হাটের এই দুটো দিনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে পার্বতী। ফোকোটে তরিতরকারির উপকরণ পেয়ে যাওয়ার লোভটাই তার একমাত্র কারণ নয়।... হাটে আসা মানে নিজের ছেলেপুলে আত্মীয়-স্বজনের কাছে আসা।" ক্ষয় যখন জমিদারের ছেলেকে হাটে দোকান দিতে বাধ্য করে; তখন ওই মায়াতেই বুড়ির ভাবনায় আপশোষের বাতাস লাগে, "ওদের কি দোকান দেওয়া সাজে! জমিদার বাড়ির ছেলে। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে কোথায় ঘরে বসে তাস খেলবে, তা নয় দোকানদারি।" এই মায়াই বুড়ির মাথার ওপর চলমান অক্ষয় পরমানিকের ক্ষুরে, শতদলবাসিনী বা শতপথী-গিন্নি 'বড়মা'-র পার্বতীর প্রতি পক্ষপাতে। এই মায়া ক্ষীর হয়ে লেগে থাকে বড়মা-র মেয়ে বকুলের প্রথম প্রসবের প্রস্তুতি ও প্রসব-পর্বে পার্বতীর সর্বব্যাপিনী ভূমিকায়। বিশেষত এই অংশটিতে পূর্ণেন্দু পরিবেশের সৃষ্টি, মনস্তাত্ত্বিকতা, অভিজ্ঞতা ও ভাষা-সৃষ্টিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠককে একেবারে বেঁধে ফেলে। খানিকটা অংশ আমাকে অনিবার্যভাবেই উল্লেখ করতে হচ্ছে।

কলকাতার ভাড়া বাড়িতে আঁতুড় ঘর থাকে না বলে বারান্দার এককোণে বকুলের প্রসবের জন্য আঁতুড়ঘর বানানো হয়েছে। বকুলের স্বামী, ব্যাংকের

জাঁদরেল অফিসার নিশীথকে দিয়ে আঁতুড়ে যা-যা লাগে সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কিনিয়ে এনেছে পার্বতী। বড়মা-র মুখ রাখতে গাঁয়ের সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে কলকাতায় আসা পার্বতীর। তাই সব কিছু সে পরম সতর্কতার সঙ্গে পালন করতে চায়। এসেছে ব্যাণ্ডেজের তুলো, ক্যাস্টর অয়েল, নাড়ি কাটার কাঁচি ও সুতো, মাটির মালসা থেকে শুরু করে ঘুঁটে-কয়লা-গুল ও নারকেলের ছোবড়া। পূর্ণেন্দু এখানে বর্ণনা দেন, "অল্প দিনের সংসার। তাই ছেঁড়া কাপড় আছে কি না ভেবে বড়মা সঙ্গে এনেছিলেন দু-তিনটে। সে-সব কাপড়কে কেটে-ছিঁড়ে নানা আকারের ফালির পর ফালি। তারও আবার দুটো ভাগ। একটা পোয়াতির। একটা ছেলের। পোয়াতির রক্ত মোছার কাপড় যেমন-তেমন হলে চলবে। কিন্তু ছেলের নাড়ি বাঁধতে, গায়ের লালা মুছতে, গায়ে চাপা দিতে যে-কাপড় সে হবে নরম, মিহি সুতোর। আবার প্রসবের পর পোয়াতির পেট বাঁধা হবে যে কাপড়ে সে তো ফেঁসা কাপড় হলে চলবে না। শক্ত হতে হবে নতুন কাপড়ের মতো। কাপড়ের সরু মোটা ফালি নিয়েও তাই পার্বতীর কড়া-ক্রান্তি-মেলানো হিশেব।"

আর, এই বর্ণনারই প্রায় পিঠে-পিঠে ঝিকিয়ে ওঠে বকুলের প্রসবের চূড়ান্ত মুহূর্তে পার্বতীর মুখে ভাষা-প্রয়োগে পূর্ণেন্দু-র তুলনারহিত দক্ষতা :

"রণ দামামা বাজিয়ে আসল যুদ্ধের শুরু বিকেল গড়িয়ে সন্ধের দিকে। সতরঞ্চি টাঙিয়ে বানানো আঁতুড় ঘরে।

—ওকি করছিস, শব্দ করতেছ কেন, মুখ দিয়ে শব্দ করবি নি, ওতে তো দম বেরিয়ে যাবে, বেথা দিবি কি করে, না, মা অমন অবুঝ হলে, চলবে নি এইন এগঁদম কান্নাকাটি নয়, কিছু ভয় নেই, এই তো সেঁক দিচ্ছি গরম তেলের, ক্যাস্টো ওয়েলটা খেয়েছে তো সবটুকু, উঁ উঁ উঁ, কোমর একদম উপর বাগে তুলবিনি, কোমর উঁচুতে তুললে জরায়ুর মুখ বন্দো হয়ে যাবে, পোসব-দ্বার চিরে যেতে পারে, দাঁতে দাঁত চিপে, না, না, ইপাশ-উপাশ করবি নি, উকি, অমন করতে আছে নাকি, তুই কি গভ্যের ছেলেটাকে কানা-খোঁড়া বানিয়ে মা হতে চাউ নাকি, ছেলেমানুষি কব্বিস নি, ইটা ছটফট করার বেপার নয়, হড়বড় করে ছেলে বিয়ানো যায় নাকি, ইটা একটা সিষ্টির কাজ, একজনকে জন্ম দেবা, গভ্যের অন্দোকার থেকে পিথিবীর আলোয় আনতেছু একজনকে। ভগোমান দিয়েছেন বলে পাচ্ছু…" স্থানাভাবে সংযত হতে হল, না হলে পার্বতীর পুরো উক্তিই তুলে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে সঠিকভাবে দেখানো

যেত কিভাবে জীবিকা-জীবন-মায়া-রক্তমাংস-ভাষা-আঙ্গিক-উদ্বেগ-আশ্বাস মিলে মিলে শিল্পের আটচালা গড়ে তোলে।

যে-মায়ার কথা বলছিলাম। এই মায়ায় গাঁয়ের বৌ শৈলবালা, বিশেষত তার ছোট মেয়ে ফেলি বাঁধা পড়ে সর্বরিক্ত বুড়ি পার্বতীর সঙ্গে। ফেলি-পার্বতীর সম্পর্ক ছোট ছোট আখরে তুলে ধরতে গিয়ে পূর্ণেন্দু হয়তো অজান্তেই বাঙালী পাঠকের মনের সেই নিবিড় আঁতে হাত দিয়ে ফেলেন, যেখানে স্থায়ী সুর হয়ে আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'-র দুর্গা-ইন্দির ঠাকরুণের সম্পর্কের বিষণ্ণ-মেদুর রূপ। এই মায়াতেই গাঁয়ের কোনো তরুণ পাঁজাকোলা করে গর্ত আর পথের শ্রান্তি পার করে দেয় বুড়িকে, কেউ তাকে এক গ্লাস চা দেয় হাটে, কেউবা কুমড়োফুল ভাজা খেতে সাধে। আর এই মায়ারই মধু গেঁজে শেষ-অবধি হয়ে ওঠে বিষ, যে মধুর নাম মৃত্যু।

গাঁয়ের অনেক নিন্দে-মন্দি থেকে একটা বড় ছাতার মত পার্বতীকে আড়াল করে রেখেছিলেন বড়মা। মুকুন্দ যতদিন বেঁচে, ততদিন প্রতি জামাই-ষষ্ঠিতে তাদের নেমন্তন্ন করে নিজের হাতে ভালো-মন্দ রেঁধে খাওয়াতেন তিনি। মুকুন্দর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে, বড়মা পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, পার্বতী পুত্রহারা ও বৃদ্ধা হয়েছে, ধীরে ধীরে কাল তার শ্রবণ, বিবেচনা, বাস্তবতাবোধ ও স্মৃতির উপর জবরদস্ত দখল কায়েম করেছে। পার্বতীর এখন স্থান-কাল-পাত্র গুলিয়ে যায়, ক্রমশই সে চলে যায় সময়বোধহীন, আকারহীন এক নিরালম্বতায়। তবু, একদিন, এক খাওয়া-দাওয়ার বাড়িতে পোড়া ঘিয়ের গন্ধে তার অসার স্নায়ুতে হঠাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহের মত চনমন করে ওঠে বড়মা-র হাতের সোনার বরণ মোহনভোগের স্মৃতি। এটুকু পার্বতী বোঝে, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাই তার শেষ কামনা প্রাণপণ হয়ে ওঠে, মৃত্যুর আগে একবার বড়মা-র রান্না মোহনভোগ খাবে। "ই মুহোনভোগ যে এগবার চেখেছে, ঐ জিভে গাঁথা হয়ে গেল চিরতরে। না মরা পর্যন্ত মুছবে নি। মরণ সেই কবে থিকেন ডাক দিয়েছে। আমি যমকে জানিয়ে দিয়েছি যতই ডাকাডাকি করো, বড়মার হাতের মুহোনভোগটি খাবার আগে নড়তেছি নি।"

এই একটি সামান্য আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই পূর্ণেন্দু গড়ে তোলেন উপন্যাস ও পার্বতীর জীবনের অন্তিম পর্বটিকে অকম্পিত হাতে, নির্মম ক্লুয়োটিক ভঙ্গিতে। বড়মার হাতে মোহনভোগ খাওয়ার বাসনা পার্বতীর

মধ্যে সৃষ্টি করে অস্তিত্বের চরিতার্থতার জন্য একমাত্র জরুরী শর্তের। পালটে যায় গোটা উপন্যাসের ঢিলেঢালা মেজাজ, পাট। গ্রাহাম গ্রীন যাকে বলেছেন 'টেরিবল অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড ফিন্যাল'—বড়মার হাতের মোহনভোগ-অভিসারিণী পার্বতীর গাঁয়ের পর গাঁ-পেরোনো দীর্ঘ পদযাত্রাকে প্রচণ্ড কমিক অথচ এক চিরায়ত আতাতিতে দৃঢ় মুঠোয় ধরবার চেষ্টা করতে থাকেন পূর্ণেন্দু। পঞ্চায়েতের মেম্বার মানিকের মস্করাবোধে জোয়ার খেলে যায় ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। পার্বতীর যাত্রায় মুখ্য তদারকি কাঁধে তুলে নেয় সে। "মানিক, মানিকের বৌ চিনু, মানিকের বৌদি রম্ভা আর পাড়ার সেজো খুড়ি এই চারজনের তদারকিতে স্নানের পর গায়ে লাল বেনারসী, পায়ে আলতা, গলায় গয়নাগাটি পরানোর পালা শুরু হলে পার্বতীর স্মৃতি পিছিয়ে যায় আরো দূরে, প্রায় শৈশবের দিকে। গায়ে-হলুদের দিনের গন্ধ মনে উড়ে আসে।"

মানিকের নেতৃত্বে ছেলে-মেয়ে-বুড়োর হাসি-ঠাট্টা-রগড়ে ঠাসা মিছিলে এক বীভৎস অসঙ্গতির প্রতীক হয়ে হাঁটতে শুরু করে পার্বতী। ক্রমশ তার হাঁটু ও কোমর ভেঙে পড়ে, গলা থেকে কোমর-অবধি ধুলোয় খসে পড়ে লাল বেনারসী, বারবার মূর্ছার মত হতে থাকে তার। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে মানতের পূজো দিতে যাচ্ছিল একদল বাজনা বাজিয়ে, তারাও এই যাত্রিনীর সহ-মিছিলের অংশ হয়ে যায়। ঘুম ও জাগরণের আলপথের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে পার্বতী। ছাল-ছাড়ানো মুরগীর মত শরীরের উলঙ্গ উপরাংশ, "ন্যাড়া মাথা আর কুঁজো ভঙ্গির সঙ্গে বেনারসীর বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতা জরি-চুমকি গায়ে রোদের ছাট লেগে ঠিকরোন আগুন-ফুলকি দীপ্তি গলার হার, হাতের চুড়ি-রুলি আর পায়ের রুপোর তোড়া মিলেমিশে অসঙ্গতির এক উৎকটতম দৃষ্টান্ত যেন।" স্নানরতা কোনো গ্রামের বৌ একঝলক তাকে দেখেই ভেবেছে মহামায়া, তাকে আক্রমণ করেছে পুরাণের গরুড়ের ডানার মত অতিকায় প্রসারিত ঘুম। এই হাস্যকর, করুণ, রাজকীয় শরীরের যাত্রা যেন পুরাণেরই মহাপ্রস্থানের পথে। স্বপ্নের মধ্যে জলঝর্ণার ধ্বনির মত তার মরণাপন্ন অস্তিত্বে তখন কেবলই অলীক মোহনভোগের ঘ্রাণ। তারপর ভাঙনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী মুখব্যাদান, আকাশের আগুন দিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে চাওয়া এবং ধুলোমাটিতে দীর্ঘ বেদনাপ্রধান জীবনের বোঝা নামিয়ে "শিল্পের নগ্নতা" নিয়ে মহাশয়ন। জীবনানন্দের পংক্তিটি মনে পড়ে যায়, 'এই ঘুম পেয়েছিল বুঝি'—স্থবির ইঁদুরের রক্ত মুখ থেৎলে পড়া ঘুম। মনে পড়ে যেতে পারে ভারতচন্দ্র

রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল'-এর জরতীর চেহারাটি, যাবতীয় লোকশ্রুতির অনুসঙ্গ-সহ। ফলে নহলা গায়ের এক সাধারণ নারীর জীবনকাহিনীর ওপর এসে পড়ে একই সঙ্গে চিরায়ত ও লোকায়তের আলো, জীবধাত্রীর আর্কিটাইপের ওপর সভের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে স্যাটায়ারের তীক্ষ্ণশীর্ষ পালক। উপন্যাসের অন্তিমার্ধে পূর্ণেন্দু প্রবল স্বেচ্ছাচারে ভেঙে ফেলেন তাঁর সযত্নলালিত স্মৃতি, কথকতার ঢিলেঢালা ভঙ্গি, তাঁর হাতে ঝলসে ওঠে নির্লিপ্তি ও প্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতার খর কুঠার।

কবি, চিত্রী এমনকি কথাসাহিত্যিকেরাও পূর্ণেন্দু 'মহারাণী' পড়ে দেখলে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, মনে হয়।

---

[১] মহারাণী। পূর্ণেন্দু পত্রী। দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩। ১৫ টাকা।

রূপান্তরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয় এবং মঞ্চ-প্রযোজনার নিরলস নাট্য-সংগঠক হিসাবে যিনি পরিচিত, যাত্রা শিল্পী এবং চলচ্চিত্রশিল্পী হিসাবে যিনি এই দেশের আপামর জনসাধারণের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন, তাঁর নাট্যরচনার দিকটি নিয়ে এই সামান্য আলোচনা। তাও তাঁর মৌলিক নাটক নিয়ে নয়, শুধুমাত্র তাঁর বহুমুখী কৃতিত্বের একটি দিক—তাঁর তিনখানি রূপান্তরিত নাটক, চেখভ, ব্রেখ্‌ট্‌ এবং পিরান্দেল্লো-এর একটি করে নাটক নিয়ে। 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'তিন পয়সার পালা' এবং 'শের আফগান'। তিনটি ভিন্ন স্বাদের নাটক, নাটকের আঙ্গিকও এখানে ভিন্ন। তবে মানবিক যন্ত্রণা ও মুক্তির আর্তির কথা মনে রেখেই হয়ত জাতীয় সাহিত্য পরিষদ নাটক তিনটিকে একই মলাটের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। নাটকগুলি জীবনের মতোই সরস এবং জীবনের মতোই জটিল। দৃশ্যে বা সংলাপে হাসিকান্নার দ্বন্দ্ব মুখরতা আমাদের ভাষায় এবং সেই চিন্তার মধ্যে মুক্তির বাতাসও যেন অনুভব করা যায়, আর নাটকগুলি মৌলিক না হয়েও ক্রমে মৌলিকতার রূপ পাচ্ছে, কেননা নাটক-গুলির রূপান্তর তো শুধু আক্ষরিক অনুবাদ নয়, এ রূপান্তর বাংলাদেশের জল-হাওয়ার লাবণ্যে উজ্জ্বল। এখানে শুধু ভাষার রূপান্তর ঘটে নি, বদলে গেছে ঘটনার প্রেক্ষাপট, পাত্রপাত্রীর নাম, সাজ-সজ্জা, তাদের আচার-আচরণ। নাটকের এই দেশজকরণ মৌলিক নাট্যচিন্তারই ফলশ্রুতি। চেরী

উদ্যান কেটে ফেলার দুঃখের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিলেন আম্র উদ্যান কেটে ফেলার দুঃখের গভীরতা।

একটি যুগ সন্ধিক্ষণের নাটক 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'। ক্যালারামের যুগের শেষে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল লালমোহনের যুগ। একটি দুর্ধর্ষ বাস্তব অবস্থা একটি দীর্ঘদিনের বাস্তব অবস্থাকে সরিয়ে দিল। নাটকের সংলাপের মাধ্যমে এটি রূপান্তরিত হয়েছে। যে লালমোহন সমাজের নিচুতলা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটি পুরানো ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা করবে, নাটকের শুরুতে সেই লালমোহনের সরল স্বীকারোক্তি, 'সে তুর মা বাপের আশীর্বাদে —অল্প সল্প টাকা কামাইছি—কিন্তু হইলে কী হবেক—এই কইলজা পালিস হইল না, যে চাষা, সেই চাষাই রইয়ে গেলম—এইযে বইট হাথে লিয়ে বইসে ছিলম—ভাল বই, শিক্ষার বই—তা মাইরি একবন্ন মাথায় ঢুইকল নাই—বইয়ের পাতা খুলাই রইল—আর্ মার ঘুম্—মার ঘুম্...।' এই লালমোহনই নাটকের মুখ্য চরিত্র। নাটক এগিয়ে গেছে এই লালমোহনের নেতৃত্বে আর চিরকালীন ছাত্র তাপস-মারফৎ পাঠক পেয়ে যায় তার ব্যাখ্যা। নাটকে অবক্ষয়ী সমাজের উঁচুতলার মানুষদের অবস্থা বর্ণনা করেছে সেই অভিজাত সমাজের শেষ বংশধর অনিমার মুখের সংলাপ, "এই সারা দেশে আমাদের নিজেদের বলতে এক চিলতে জমি নেই। যার হাতে যা পয়সা আছে সে তো নামমাত্র। কোনো রকমে এখানে এসে পৌঁছোবার মতো খরচ জোগাড় করে দুজনে চলে এসেছি।' এই ভেঙে পড়া সামন্ততান্ত্রিক অর্থ-নীতিকে চাঙা করতে চেয়েছে বারবার উঠতি পুঁজিপতি লালমোহন। সে সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি থাকতে চেয়েছে। সে প্রথম থেকে নিলামকে এড়িয়ে গিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের বিরোধিতা করেছে। যদিও আম্রউদ্যান বা ট্রাডিসনের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই সে বারবার লাবণ্য এবং গিরীন্দ্রকে আমবাগান প্লট প্লট করে ভাগ করে কলোনি বসাতে বলেছে। আর এখানেই লাবণ্য এবং গিরীন্দ্রের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ঐতিহ্যের বিনষ্টিতে সায় দিতে পারে নি। এখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে সামন্ততন্ত্রের। পরিশেষে সুন্দরকে রক্ষা করা গেল না। সে বেদনা শাশ্বত হয়ে রইল সমস্ত নাটকে। নতুন যুগের দিশারী লালমোহন সব পেয়েও আক্ষেপে উন্মাদ,...'ক্যানে তখন আমার কথা কানে তুললেন না মা? আমি যে হাজার বার বইলেছিলম তখন, এখন হাতের ঢিল একবার ছুঁড়ে দিয়েছেন, আর যে হাঁতে ঘুইরবে না

মা।···মাগো, আমি সত্যি বলছি মা, আমার সুখ হইল না, যদি কুনদিন আমাদের কারুর কিছু না থাইকত ত সেই ছিল ভাল। চখের জল ভেইঙ্গনামা, মাগো···।' সত্যিই হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে আর ফিরে আসে না, শুরু হয় নতুন যুগ, নতুন ব্যবস্থা। আর সেই ব্যবস্থায় সান্ত্বনা দিতে থাকে আমিনা, '···চলো তুমি আমার সঙ্গে, আমি তো খানিকটা পড়াশুনা করেছি, তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো, আমি চাকরি করবো, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমরা মা আর মেয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবো, সেইতো আমাদের নতুন ঘর। নতুন বাগান হবে মা।'

দ্বিতীয় নাটক 'তিন পয়সার পালা।' ব্রেখ্‌টের নাটকের রূপান্তর। এর আঙ্গিক আলাদা, এখানে নাটকের সংলাপের মাঝে-মাঝে কবিতা, গান ও পোষ্টার, অর্থাৎ নাটককে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রেখে কিছুটা বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের পথে বেরিয়ে আসে সামাজিক চেহারা। চরিত্র বহুল এ নাটকে দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা বর্তমান। নাটকের ইলিউশন ভাঙার চেষ্টা আছে রিয়ালিটিকে তুলে ধরার প্রয়োজনে। এ নাটকের রূপান্তরে কতটুকু ব্রেখ্‌ট্‌ আছে জানি না, কিন্তু যতটুকু আছে ততটুকুই নাটকের প্রয়োজন মিটিয়েছে। এ নাটকে তীব্র ব্যাঙ্গে, নাচে, গানে, সামগ্রিক সংলাপে যে পাঞ্চা পেয়েছি তা সমাজের এক পঙ্কিল চেহারা—যে চেহারায় আজ আমরা অনেকেই শঙ্কিত। যেখানে মানুষ আর তার অর্থ উপার্জনের পন্থা এমনই বিষিয়ে গেছে যে খুনী দস্যু মহীমবাবুতে আর যে কোনো শিল্পপতিতে কোনো তফাৎ নেই। আর মানুষের দুঃখবোধ ভাঙিয়ে যতীনবাবুর ব্যবসা চলে। আস্তাবলে মহীন্দ্র ও পারুলবালার বিয়ের দৃশ্যে মহীন্দ্রের কিছু সংলাপ—'আবে, বসরে নাবে সবাই, নৃত্যগীতের আয়োজনটা শেষ করে আগে। মামাকে একটা পেলেটে করে বিশেক সন্দেশ দে। জল দিবি। বুইলে গো, এই যে দেখছ বড়বাবু, এ হল গিয়ে তোমার বটকেষ্ট সরকার, সবাই বলে বাঘাকেষ্ট! আমি বলি মামা, কেন জানো? তা হলুম গিয়ে মুখুসুখু মানুষ, সাদাসিদে লোক, ছোটোখাটো লুটপাটের বিজনেস করে যাই, যখন যা পাই মামাকে তার ভাগ দিই বড় ভাগটাই তো দিতে হয়, কী বলো মামা? হাজার হোক এঁরা হলেন যাকে বলে গিয়ে গভ্‌মেণ্টের লোক। আগে এঁদের গভ্‌ভে দেব, তবে অন্য কথা।। নইলে গভ্‌মেণ্টই বা টিকবে কী করে, আমরা বিজনেসম্যানরাই বা টিকব কী করে? এই আর কি···মানে দেয়া আর নেওয়া, আর 'নেয়া আর দেয়া, এই র‌্যাম র‌্যাম, সব

বুঝলি? শুনে শেখ, এই যে খাচ্ছ মামা, বড়ো আনন্দ হচ্ছে। সত্যি বড় সুখ হল।'—এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শক্তি কিন্তু ভীষণ। যার কাছে মানুষ বড় অসহায়। পারুলের কৈফিয়তের কিছু সংলাপ—'কিন্তু হঠাৎ একদিন, বিশ্বাস করো মা, হঠাৎই একদিন, আমার ঘরে এলো এক উদ্দাম অতিথি! আশ্চর্য! সে গুণী নয়, জ্ঞানী নয়, ভদ্র নয়, তার গায়ের রং কালো, সে লেখাপড়া জানে না, সে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না কিছুতেই, ...এমন তো আমি কখনও দেখিনি মা। সে হতাশা জানে না, দুঃখ না, ক্ষোভ না, ভিক্ষে না, ভয় না। সে জোরে হাসতে জানে, সে চীৎকার করে কথা বলে, সে উদ্দাম, সে অদ্ভুত, সে সরল, সে পুরুষ! কোনদিন তো বল নি মা, এমন ছেলেও থাকতে পারে এরা এলে কী বলব?...ও আমার সমস্ত শক্তি, অহংকার, সমস্ত শিক্ষা, তেজ ভাসিয়ে নিয়ে গেল, আমি অসহায় ঝাঁপ দিলুম।' —এই শক্তিকে ঠেকাতে পারে নি নাটকের কোনো পাত্রপাত্রী। চোরা স্রোতের মতো তার টান। ব্যবস্থাকে কায়েম করতে যাকে যেখানে প্রয়োজন তাকে সেই জায়গায় এনে দাঁড় করায়। ফাঁসির দৃশ্যে মহীন্দ্রের একটি সংলাপ —'শুনুন, আপনারা সবাই শুনুন, আমি ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে চললুম, আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি—এক বিলীয়মান যুগের ক্ষীয়মান প্রতিনিধি। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহীন ডাকাত রঘু-ডাকাত প্রভৃতিদের যুগ শেষ। এর পরে শুরু হবে বড় ডাকাতের যুগ।...সেই ডাকাতেরা আপনাদের রক্ত মাটিতে ফেলবে না, কারখানা খুলে, তাতে আপনাদের চাকরি দিয়ে দেবে। তারা আমাদের মতো একদিনে আপনাদের শেষ করবে না, তারা বহুদিন ধরে অফিসে, মিলে, তিলে তিলে আপনাদের রক্ত খাবে। তারা আমাদের মতই মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করবে, তার ছাপ আপনারা চাকরি ফেরৎ প্রত্যেকটি মহিলার শরীরে দেখতে পাবেন। আমাদের গৌরব ছিল, তাদের গৌরব হবে আরো বড়, কেননা তারা বড় ডাকাত। বলবেন, তাদের ঝুঁকি নিতে হয়, আমরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম। ব্যবসা মানেই তাই। এই হল সমাজ ব্যবস্থা।' নাটকের শেষে অবশ্য এই মহীন্দ্র অর্ধেক দেবতা ও অর্ধেক পুলিশের ক্ষমা পেলেন ও সঙ্গে আশীর্বাদ স্বরূপ পেলেন সরকারী খেতাব, ভাইসরয় কৌন্সিলের সভ্যপদ ও দশটি বৃহৎশিল্প এবং একবিংশটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা। দৃশ্যটি উপভোগ্য এবং মনমাতানো। তবে সমগ্র নাটকটিতে মন জাগানোর চেষ্টাও করা হয়েছে।

তৃতীয় নাটকটি পিরান্দেল্লোর রচনার রূপান্তর 'শের আফগান।' এখানেও একটি ভিন্ন ফর্ম, কিছুটা যাত্রার ফর্ম এর মধ্যে রয়েছে, সেটা অবশ্য বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে। এখানে প্রত্যেক মানুষ এক একটি মুখোশ পরে আছে এবং শুধু তাই নয়, এক একজন মানুষ বিভিন্ন রকম পোষাক পরে সমাজে অভিনয় করে চলেছে। মানুষ যখন জীবনকে হারিয়ে শুধু অভিনয় করে চলেছে তখনকার নাটক এই 'শের আফগান।' উপেন চরিত্রটির সংলাপে—'তার মানে, শের আফগানের যারা রিয়্যাল সভাসদ ছিল তারা কিন্তু আমাদের চেয়ে বেটার ছিল। আফটার অল তাদের তো অভিনয় করতে হত না, তারা যা করত সেইটেই তাদের লাইফ ছিল—এইসব ড্রেস ফেস পরে এ রকম রিয়্যাল প্যালেস, জিংক-ফিংক ছাড়াই এরকম রিয়্যাল গায়ের রং, কালিঝুলি ছাড়াই এরকম রিয়্যাল দাড়ি গোঁফ, আজ একে তলোয়ার দিকে খুঁচিয়ে দিচ্ছে, কাল ওকে শুলে চড়াচ্ছে—পরশু তাকে ঝপ্ করে একটা জায়গীর বেচে দিচ্ছে—আর আমরা কী? জাষ্ট কতকগুলো পুতুল। খালি অ্যাক্টিং কর, অ্যাক্টিং কর। যা রিয়্যালি নও, ভাণ করে যাও।'—এই ভাণ, এই অভিনয় মানুষকে অসহায়ের মতো করে যেতে হয়। এমন কি পেছন থেকে দোলার দড়িটা কেটে দিচ্ছে অথচ তখন দেখেও না দেখার ভাণ করে যেতে হয়। তখন শুরু হয় আর এক অভিনয়। এই ভাবেই সহজ জীবনগুলি ক্রমে এক একটি মুখোশের আড়ালে চলে যায়। শের আফগানের শেষ সংলাপ—'…এখন তো আমাকে শের আফগান সেজে থাকতে হবে চিরকাল। তোমরা কেউ আমাকে ছেড়ে যেওনা। কেউ যেওনা কাছে থাক। থাক।'—অর্থাৎ মুখোশের আড়ালে থাকতে বাধ্য হলেও সে মানুষ চায়, ভালোবাসা চায়, তাই তখনও সে থাকতে চায় মানুষের কাছাকাছি। এইখানেই নাটকের জীবন জিজ্ঞাসা, জীবনের অন্বেষণ। যেখানে দেশকালের বন্ধন ঘুচে যায়। পিরান্দেল্লোর 'এনরিক দ্য ফোর্থ' রূপান্তরিত হয় অজিতেশের 'শের আফগান'-এ।

মঞ্চে অভিনয়ের নানা অনুষঙ্গ বাদ দিলেও হাতের কাছের এই নাট্য সংগ্রহটি পাঠযোগ্য হয়ে থাকে এর সংলাপ ও দৃশ্য পরিকল্পনা। নিজস্ব সংগ্রহে রাখার মতো গ্রন্থ। আর যাঁরা অজিতেশের নির্দেশনায় এবং অভিনয়ে নাটকগুলি মঞ্চে দেখেছেন, তাদের কাছে তো নাটকগুলি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠবে স্মৃতির উজ্জ্বল রত্নমালা। এই নাট্য সংগ্রহ প্রকাশের জন্য জাতীয় সাহিত্য পরিষদকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অজিতেশ নাট্য সংগ্রহ। সম্পাদনা: সুনীল দত্ত ও সন্ধ্যা দে। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ২৮ টাকা।

দুর্মর গানের উজ্জ্বল নিশান

অপূর্ব কর

রাজ্য সঙ্গীত একাডেমির ব্যবস্থাপনায় গত বছর প্রকাশিত হয়েছে প্রখ্যাত লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের পঞ্চাশটি গানের এক সংকলন। প্রকৃত গানের বই বলতে যা বোঝায়, গান ও স্বরলিপি এক আধারে, দু-মলাটের নীচে উজ্জ্বল ভাণ্ডার।

বাংলার লোকসঙ্গীতের জগতে গণকবি নিবারণ পণ্ডিতের গান এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। হৃদয় খুলে নানা প্রোজ্জ্বল স্মৃতির মিছিল মুখর ভাবে হঠাৎ হাঁটাহাঁটি শুরু করে। বয়সের গাছ-পাথর মাপার হিসাবহীনতার কোন্ অতলান্ত যুগে এদেশে, বাংলার জল-মাটি-হাওয়ার এক অনুপম অনন্য ললিত ভূমি থেকে কবিগান নামীয় যে বিশিষ্ট লোকগানের ধারার উৎসার শুরু হয়েছিল তা অনেক কাল, বহু যোজন পথ পরিক্রমা ও কত নব নব রূপে-রীতে অগন্য বাঁক পেরোনো শেষে এক গর্বের উষ্ণীষে—ধরা-চূড়া পরে মহিমান্বিত বেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এ শতকের গোড়ায় কিঞ্চিদধিক দু'-আড়াই দশক বাদ দিয়ে।

নাগরিক সংস্কৃতির ছোঁয়া ও বিস্মিত জগৎ-জীবন থেকে দূরে থাকার ফলে পূর্ববঙ্গে লোকগান কবিগান আপন মহিমায় সুদীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সে-ও তথাকথিত 'কবি-গানে' রূপান্তরিত হয়ে উঠল।

বস্তুত বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ কবিগানের শিল্পীদের ভাগ্যে সামগ্রিক

বৃত্ত মেলালে যে গোটা সমাজ তার স্বীকৃতি জুটেছে এক কথায় বড় অকিঞ্চিতকর। তা না হলে কবিয়াল রমেশ শীল, গুমানী দেওয়ান, পূর্ববঙ্গের কবি গানের কিংবদন্তী পুরুষ হরিচরণ আচার্য প্রথিতযশা কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার প্রমুখ কবি-ব্যক্তিত্ব কি জীবদ্দশায় অথবা মরণের পরে উচ্চকটি মহলে অন্য প্রশ্ন থাক, পরিচিতি স্বীকৃতিই বা পেয়েছেন কতটুকু!

এই দীন হীন গণজীবনের মুকুটহীন সম্রাটদের সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতি তুলে ধরতে, এ প্রসঙ্গে বলা যায়, নানা মহলের প্রয়োজনীয় অনেক দায়িত্ব পালন করার ছিল। দু'এক জনের ভাগ্যে কিছু প্রশংসনীয় প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে একটু-আধটু শ্রদ্ধা-সম্মানলাভ যদিও জুটেছে তবে এক, এঁরা যে বিরাটমাপের তার তুলনায় তা বড় নগন্য, দুই, তালিকা মেলালে অনেকেই ভেসে ওঠেন নি সন্ধানী আলোক-সরণিতে।

শুধু কি নাম? মুখর অস্তিত্ব? আলোচ্য নিবারণ পণ্ডিত-ই অনেক গান চিরকুটে এমন কি ঠোঙার পাতায় লিখে রেখেছিলেন, এরকম ঘটেছে প্রায় সকলের ক্ষেত্রে, মুখে মুখে আসরে আসরে গান বেঁধেছেন, পাণ্ডুলিপির পাতায় সেসবের হিমবাহ-স্মরণ মাথা তুলেছে সামান্যই, আবার যদিও বা কালে-ভদ্রে কোন খাতা, (এঁদের জীবনই শ্যাওলা ভাসা স্রোতের মতো ভেসেছে এমন) রচনা, সৃষ্টিকৃতি সব তছনছ হয়েছে বারবার কত রূঢ় তরঙ্গাঘাতে। নিবারণ পণ্ডিতই তাঁর এমনি পাণ্ডুলিপিটি হারিয়েছিলেন ওপার থেকে এপার বাংলায় চলে আসার সময়।

লাখো মানুষের বুকে এঁদের অনেক গান ধরা থেকেছে। মজুত থেকেছে বিশ্বস্ত ভাণ্ডার হিসেবে, বিশেষত ওপরে যাঁদের নাম করা হয়েছে এঁদের গানে যে রাজদ্রোহিতা, প্রোজ্জ্বল আগুন, শোষণ-বঞ্চনা পীড়নের উন্মোচন, শেকল ছেঁড়ার ডাক, সর্বোপরি তিনের দশকের শেষ থেকে প্রগতি-ভাবনা, গণ-সংস্কৃতি চর্চার উত্তাল জোয়ারের দিন, তাতে এদের গান তো ছিল পুরোদস্তুর 'কমুনিস্টি', কিছুটা আপাত গুহ্য-সাধনার মতো ব্যাপার তো ছিল, গানে-কথায় অন্যভাবে ব্যঞ্জনা এলেও 'সন্ধ্যাভাষা'র মতো এদেরকে অনেক সময় কথা বলতে হয়েছে। স্মৃতিনির্ভর সে লোক-'শ্রুতি'কে যথা সময়ে আহরণ করে আনা বহুক্ষেত্রেই করা হয়নি।

স্পষ্টত খেদ রয়েছে, রমেশ শীল, রশিদ উদ্দীন, অখিল চক্রবর্তী, শেখ গুমানী, হরিচরণ আচার্য, নকুলেশ্বর সরকার প্রমুখ কবি তিল্কদেরও যা প্রাপ্য ছিল কবি নিবারণ পণ্ডিত অন্তত তা পেলেন, সরকারী উদ্যোগে তাঁর গানের

স্বরলিপি সম্বলিত স্থায়ী স্বীকৃত বই। কথার মীড়ে যে গোপন আনন্দ ও বেদনা আছে তা-ও অনুভবনীয়, অনির্বচনীয়ও বটে।

কবি নিবারণ পণ্ডিতের লেখা গানের সংখ্যা কত সঠিকভাবে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। ময়মনসিংহ জেলার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে কবি রচিত গানের একটি সংকলন ("লোকসঙ্গীত") ১৯৪৫ সালে প্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর তাঁর রচিত বেশিরভাগ গান সংগৃহীত হয়েছে। কবি নিজে প্রায় ৩০-৩৫টি পুস্তিকা পরবর্তী সময় প্রকাশ করেছিলেন। "জনযুদ্ধ", "স্বাধীনতা", "পরিচয়", বিষ্ণু দে সম্পাদিত "সাহিত্য পত্র", "কালান্তর"-এর রবিবারের পাতায় এবং শারদীয় সংখ্যায়, "গণনাট্য", "নন্দন", "প্রস্তুতি পর্ব" প্রভৃতি পত্রিকায় নানা সময় তাঁর বহু কবিতা (গান) প্রকাশিত হয়েছে।

কবির নিজের কথায় জানা যায়, তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় বাইশটি সুর নিয়ে কাজ করেছেন। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ (স্বাধীনতার আগে তিনি তাঁর এই নিজের জেলারই অসামান্য লোক-সংস্কৃতি ভাণ্ডারের কাব্য সম্পদ দারুণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন) উত্তরবঙ্গের। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং গোয়ালপাড়া (আসামের) অধিকাংশ সুর তাঁর গানে রকমফেরে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাটিয়ালি, জারী, সারী, পুঁথি পড়ার সুর, ঘোষার সুর, বিভিন্ন ধরনের ছড়ার সুর, টপ্পা, কীর্তন, ভাওয়াইয়া, চটকা নানা ধরনের বাউল সুর তিনি ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন সময় একাধিক সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি নানা নূতন সুর-ও সৃষ্টি করেছেন।

পরিচয়-এর মার্চ ১৯৮৬ সংখ্যায় মাণিক সরকার এক আলোচনায় লিখেছেন—"জারি গান নিয়ে চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের জন্মলগ্নে মৈমনসিংহের শ্রীনিবারণ পণ্ডিত একটা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিষ্ঠা এবং কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বিষাদের গান যে সংগ্রামের বীরগাথায় রূপান্তরিত হতে পারে তা প্রমাণ করেছিলেন। মার্কসীয় চিন্তায় সেকালের কৃষক ও গণআন্দোলনের যথার্থ বাহন হিসাবে নতুন ধরনের, নতুন কালের 'জারি গানে'র তিনি প্রবর্তন করেছিলেন।" ঐ প্রসঙ্গে শ্রীসরকার 'জারি গান'-এর অনুষঙ্গ একপ্রকার 'ধুয়োজারি' গানের কথা উল্লেখ করেছেন।

কবি নিবারণ পণ্ডিত আঞ্চলিক নামানুসারে বিভক্ত নানা ভাওয়াইয়া গানে (চিতান ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া, দরীয়া ও দীঘল নাসা ভাওয়াইয়া, গড়ান ভাওয়াইয়া, মইষালী ভাওয়াইয়ায়) ব্যবহৃত গোয়ালপাড়া থেকে

কুচবিহার জলপাইগুড়ি প্রভৃতি নানা অঞ্চলের সুর-বৈচিত্র্য নিয়েও তাঁর গান বেঁধেছেন। তিনি তাঁর গানে আঞ্চলিক ভাষা ও সুররীতির প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। পূর্ববঙ্গে রচিত গানগুলিতে যেমন প্রচলিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, তেমনি আঞ্চলিক সুরের বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসার পর তিনি গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সুর রীতি আয়ত্ত করেন। তাঁর ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিষ সবিশেষ লক্ষ্যণীয়, গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি প্রবহমান লোক সম্পদকে আহরণ করেছেন। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চর্বিত-চর্বণ করেন নি। বারবার নিজেকে ভেঙেছেন, পাল্টেছেন। নিজে অত্যন্ত এ ব্যাপারে যেমন নিষ্ঠাশীল থেকেছেন তেমনি নিষ্ঠাবোধে আগ্রহী গায়ককে গান শিখিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সঠিকভাবে গাওয়া হয়, তিনি কাউকে প্রকাশ্যে গান গাইতে অনুমতি দেন নি।

তিরিশের দশকের পর থেকে কবিগানের ভাবরাজ্যে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে গেল (কারণ আগে উল্লিখিত)। তাই সংকলনের দ্বিতীয় গান ১৯৪১ সালে ঢাকায়, ময়মনসিংহ ও খুলনায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক সভার নেতৃত্বে দাঙ্গা-বিরোধী অভিযানের সূত্রে লেখা—

হরি তোমার অপার লীলা বুঝা হল ভার
সৃজন পালন সংহার তুমি কেন কর বারবার।
শুনতে পাই ঢাকা সরে, মানুষে মানুষ মারে
ঘর পোড়ায় দিন দুপুরে, করে নানা অত্যাচার
যে যাহারে যেথায় পায়, ছুরিকাঘাত করে গায়
পিছন থেকে মারে মাথায়, নাই তার কোন প্রতিকার।

১৯৪৩-৪৪এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনিত মন্বন্তরের দিনে অন্যান্য অভাবের সঙ্গে নিদারুন লবণাভাব.—নিবারণ পণ্ডিতের গানের কথামালা—

আমার মান্কুর মায়ে তো কনট্রোল বুঝে না,
রান্‌তে গেলে কানতে বসে লবণ ছাড়া রান্ধে না।

কিংবা ঐ সময়কালে তীব্র বস্ত্রাভাবের পটভূমিতে লেখা—

বঙ্গনারী হইল বিবসনা
(তারা) দিবসেতে ঘর হইতে, বের হইতে আর পারে না।
কলসী কাঁখে অপরাহ্নে
যায় না রে জলের জন্যে

জলের ঘাটে গ্রাম ললনা
(তারা) আঁধার হলে
যায় রে জলে দিনের আলোয়
আর আসে না। (সুর বাউল ভৈরবী মিশ্র)

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫-১৭-য় ভারত সভা হলে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী বিশ্ব সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব তখন। সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহমেদ, গোপাল হালদার এবং শচীন দেব বর্মন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সম্মেলনে সেবার শতাধিক প্রতিনিধি এসেছিলেন দূর-দূরান্ত থেকে। সুদূর ময়মনসিংহ থেকে হাজির হয়েছিলেন 'ময়মনসিংহের পাঁচালি গায়ক নিবারণ পণ্ডিত' ফ্যাসিবিরোধী দশক, বাংলায়—অবন্তীকুমার সান্যাল, পরিচয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি—১৯৮০ সংখ্যা, হাজার হাজার মানুষের সামনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গেয়েছিলেন গান। সাংস্কৃতিক সেদিন ছিল অভিনবতম সম্মেলন। বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গতিতে জগতের সেদিন যে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ ও তার ফলশ্রুতিতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন, তার পূর্ণ দিকনির্দেশ সঞ্চিত হয়েছিল কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিতের মনের ঝুলিতে। মেলবন্ধনও গড়ে উঠেছিল সতীর্থ সমাজের সঙ্গে অঙ্গার পরমাত্মীয়তায়। যে উত্তাপ, প্রদীপ্ত চেতনা, স্বচ্ছ দৃষ্টিবোধে সেদিন নিবারণ পণ্ডিত পরম উজ্জীবিত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন আপন ভুবনে, প্রখর টানটান এক গণশিল্পী হয়ে আরো মহান উদ্‌ভাসিত হতে এরজন্য তাঁর পক্ষে বেশিদিন সময় লাগে নি। এ সময়কালের দেশচেতনা, যুগ চেতনা, প্রগাঢ় বীক্ষণ সামগ্রিক ভাবে এনেছিল কবিগানে যে মহোত্তম উত্তরণ, তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত কবিগানের সে স্বনিল পতাকাকে আমৃত্যু বড় উজ্জ্বলভাবে বহন করে গেছেন। পালন করে গেছেন যথার্থ শিল্পীর আচরণীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দলিল চিত্রের মিছিল সম্বলিত বেশ কয়েকটি গান পর পর এই সংকলনে স্থান পেয়েছে, (গান সংখ্যা ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ প্রভৃতি)। এ অংশে বিশেষ লক্ষ্যণীয় কবি বাংলার দেশজ এবং বিশেষ লোক প্রচলিত সুরগুলিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি ভাবনায় সাম্যবাদী ভাবনা-চিন্তা ক্রমোত্তরণে বিকাশ লাভ করছে।

হায়রে কেন ঘুমিয়ে রলে
জেগে দেখ তোর ঘরে সিঁদ কেটেছে চোরের দলে
আর বা কত ঘুমিয়ে রবে
ঘুম ভাঙিয়া জাগতে হবে
নইলে তোর সবই যাবে বুক ভাসাবে নয়ন জলে

কিংবা—

দেশের যত ধনী মানী, তারা খাইল লবণ চিনি
এই কথাটা সবেই জানি বলতে হয় না আর
তবু কেন দেশের মানুষ হইল না হুঁসিয়ার
এই দেশটারে লুইট্যা খাইলো ঘুষখোর আর মজুতদার।

এই ক্রমোত্তরণের সরণি বেয়ে কবির সেই বহুল প্রচারিত দক্ষতার বৈদুর্যমণি উদ্ভাসিত জারি গানের সুরে কবির জীবনের অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ভাস্বর অর্ঘ্য রচনা, ১৯৪৫-য়ের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় সারাভারত কৃষক সভার নবম সম্মেলন উপলক্ষে অজস্র গানের অযুত উচ্ছ্বসিত ডালি। কবি ঐতিহাসিক এই সম্মেলনের প্রস্তুতি ও প্রচারাভিযানে তাঁর দিল-উজাড় সৃজনশীলতার ভাণ্ডার নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সময়ের একটি প্রসিদ্ধ গান—(সংকলনে ১৫ সংখ্যক গান)—

একসাথে চল গড়বো মোরা রাঙ্গা দুনিয়া
সবে মিলে থাকবো সেথা বিভেদ ভুলিয়া
বিভেদ ভুলিয়া।

সংকলনে স্থান পেয়েছে টংক প্রথা বিষয়ক ও হাজং আন্দোলন সংক্রান্ত দুটি গান যাতে আছে অবিসম্বাদী কমিউনিস্ট নেতা মণিসিংহের বীরগাথা। "স্বাধীনতা" ও "জনযুদ্ধ"-এ বা ১৯৬৬-র শারদীয় কালান্তরে পুনর্মুদ্রিত ১৯৪৬-এর নির্বাচনের পটভূমিতে লেখা বহুল জনপ্রিয় গান—

তোমরা এবার লও চিনিয়া—তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছে কত দেশদরদী ভোটাভুটির গন্ধ পাইয়া
শুনতে পাই হাটবাজারে এবার যত জমিদারে
টাকা পয়সা খরচ করে ভোট নিবেন কিনিয়া
খদ্দর টুপি ধরছেন কেহ কোলাম্বর ছাড়িয়া
আইতে যাইতে জিজ্ঞাস করেন কেমন আছেন সেলাম দিয়া।
কেউ কেউ লীগের নাম ধরে বলছেন লম্বা উয়াজ পড়ে
এবার ভোট দাও আমারে মুসলমান বলিয়া

আমি আছি লীগের মেম্বার সাত বছর ধরিয়া
এবার ভোট না দিলে হিন্দু যাবে স্বরাজ লইয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উদ্ধৃত উপরোক্ত গানটি 'স্বাধীনতা' বা 'জনযুদ্ধে' যে বয়ানে প্রকাশিত হয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থে তার অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লক্ষ্যণীয়। এতে কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়, গানটির প্রথমাংশের ষষ্ঠ পঙক্তিতে সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে এমন কথা—আইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করেন···, 'স্বাধীনতা' বা 'জনযুদ্ধে' রয়েছে—'আইতে যাইতে জিজ্ঞাস করেন'। বলা বাহুল্য ছন্দ মিল এবং গানের তাল-মাত্রা বিভাজনে 'জিজ্ঞাস' হওয়াই সঙ্গত। এরকম কয়েকটি গানে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষার শুদ্ধ পাঠ-ও গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে—১৭ ও ১৮ সংখ্যক গানে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। উপভাষার অপিনিহিতি ও পীনায়ন ঝোঁকের স্পষ্টত কিছু ব্যত্যয় উল্লেখনীয়।

গ্রন্থের শুরুতে কবির একটি গানের পাণ্ডুলিপির চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। সুন্দর ঝকঝকে সাবলীল লেখার ঠাঁট। এখানেও লক্ষ্যণীয় যেখানে কবি লিখছেন স্পষ্ট 'বন্ধু দরদিয়া' সেখানে উদ্ধৃত গানে ও নোটেশনে দেখি লেখা হয়েছে 'দরদীয়া'। 'শূন্য' বানানও 'শূণ্য'। অন্য কথা মনে পড়ে, ভাবা হত লিপিকর—প্রমাদে ঐ 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য বা পূর্ণ মাঘ মাস' হয়ে যায়; না, আধুনিক যুগ ও তার ব্যতিক্রম নয়। এ কথা সবিশেষ বলার উদ্দেশ্য চোখের সামনে পাণ্ডুলিপিতে এক বানান, অন্যত্র আরেকরকম, নানা প্রশ্ন ওঠার রন্ধ্রপথ থেকে যায়।

সংকলনে উদ্ধৃত কবির কৈশোর কাল থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত উদ্ধৃত পঞ্চাশটি গান কবি জীবনের নানা বাঁকের যথার্থই প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে। ১৯৫০-এর ডিসেম্বরে ছিন্নমূল এক উদ্বাস্তু হয়ে এ পারে আসা তক সেই সেদিনের কাব রচিত 'বাস্তুহারার মরণকান্না' পুস্তকায় ছাপা গান থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নানা টালমাটালে দেশ-কালের চলিষ্ণুতায় প্রখর শরীকত্বে লীন যে পরিচয়ে নিবারণ পণ্ডিত কবিয়াল, গণশিল্পী, যাঁর গান ভাসে দুর্মর এক ঝলকে, তার পূর্ণ উন্মোচন এ গ্রন্থে উপস্থিত হয়েছে।

বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যে নিষ্ঠা দেখানো হয়েছে তা একাধারে প্রশংসনীয় ও বিস্ময়কর। বইটির সুলভ মূল্য, বিভাগের 'রাজ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার ঘটাবার উদ্দেশ্য'—এর মহৎ লক্ষ্যপ্রাপ্তির সার্থক উদাহরণ।

স্বরলিপিকার কঙ্কন ভট্টাচার্যের সবিশেষ বড়ো মাপের অভিনন্দন প্রাপ্য, মূল্যবান কৃতি সত্যিই তিনি উপহার দিয়েছেন।

নিবারণ পণ্ডিতের গান। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমি। ৩৬ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড। কলকাতা-৩৩। দশ টাকা

লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে পথিকৃৎ গ্রন্থ

বেলা দত্তগুপ্ত

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক একবার সখেদে মন্তব্য করেছিলেন যে বর্তমান সমাজে হৃদয়প্রকৃতির সমস্ত স্বাভাবিক ভাষা অবলুপ্ত হতে চলেছে। আফ্রিকার অরণ্যবাসিনী রমণীর কণ্ঠে যখন একই সুরের প্রতিধ্বনি পাই—"Try to listen to silence and you will hear music in it"—তখন আমাদের স্বতঃই মনে হতে থাকে যে জীবনবৃত্তে আমাদের দৈনন্দিনের পরিক্রমা, তা কত কৃত্রিম, কত প্রকৃতি-নিরপেক্ষ। ফলে, বর্তমানে হৃদয়প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাষা খোঁজার এবং ফিরে পাবার এক বিশেষ প্রয়াস চলেছে। এই প্রচেষ্টায় সুধী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে লোকায়ত জীবনের প্রতি প্রাক্-অক্ষরিক সমাজের মানুষের প্রতি, তাদের কথা, সুর, গান ছাড়াও আরোও জীবনের বিভিন্ন প্রকাশের প্রতি।

লোকায়ত জীবনের প্রতি বর্তমানের এই আগ্রহের সূত্রপাত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বলা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধরত দূরপ্রাচ্যের, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটেন ও আমেরিকার বহু সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীকে বাধ্যতামূলক ভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল। সে সময় তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে "other culture"-এর মুখোমুখি হন এবং দীর্ঘদিন এই "other culture"-এর সংস্পর্শে থেকে তাঁরা প্রাক্-অক্ষরিক ও লোকায়ত দুনিয়ার মানুষদের সম্বন্ধে ধ্যানধারণা অনেকটা-ই

পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এই সব সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা লোকায়তজীবনের তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা বিশাল তথ্যাদি পূর্ণ Yale Area File-এর অধিকারী হয়েছি। এই File-এ সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে এখনও কাজকর্ম চলছে এবং ভবিষ্যতে তা' আরও ফলপ্রসূ হবে।

লোকায়তজীবনের সম্বন্ধে আগ্রহ যে কতটা ব্যাপক হয় তার প্রমাণ মেলে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রচেষ্টায়। ১৯৬০-এর দশকে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা অভিজ্ঞ চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের একটি দল প্রাক-অক্ষরিক, লোকায়ত সমাজে ব্যবহৃত ঔষধ্ঔষধির সন্ধান নেবার জন্য বিশ্ব পরিক্রমায় পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল, লোকায়ত সমাজে রোগ ও তার প্রাকৃত চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু জানা। ঐ সংস্থার প্রতিবেদন থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। লোকায়ত সমাজে ব্যবহৃত অনেক ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে বর্তমানে।

এদের ভেষজ সম্পদ ছাড়া অন্যদিকেও সুধীসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

বর্তমানে, লিখিত ইতিহাসবিহীন দেশের ও মহাদেশের ইতিহাস রচনার কাজে 'Oral Tradition'-এর মূল্য অপরিসীম। এবং এই 'Oral tradition'-এর উৎস হল লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি। 'কৃষ্ণ মহাদেশ' আফ্রিকার ইতিহাস গড়ে উঠছে লোকসংস্কৃতি নির্ভর এই 'Oral Tradition'-এর উপর। লোকায়ত জীবনের গভীর দার্শনিকতার, মননশীলতার কথা ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-সমাজবিজ্ঞানী ক্যাষ্টানাডার আনুকুল্যে সুধীসমাজের কারুর-ই আর অজানা নয় এখন। আমাদের দেশের পুরাণও কি একই ধারার বাহক নয়? কিন্তু প্রাকৃতজনের এই সব সম্পদ সমাজের সংস্কৃতিবানদের কাছে চিরদিনই উপেক্ষিত হয়েছে। ফরাসী নৃ-সমাজবিজ্ঞানী লেভিব্রুল প্রাকৃত সমাজে মানুষদের 'Pre-logical' বলে আখ্যাত করেছিলেন। এটা খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। ভদ্রলোক, ছোটলোক, সংস্কৃত, প্রাকৃতের এই দ্বিত্বতা দীর্ঘদিনের এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের স্মারক। আমাদের দেশের সংস্কৃত নাটকে তাই দেখি উচ্চবর্ণের মানুষেরা কথা কন সংস্কৃতে এবং নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গের মানুষের ভাবনা বিনিময়ের মাধ্যম হল প্রাকৃত। ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ের-এর L. Bourgeois Gentilehomme নাটকের নায়কের কবিতায় কথা বলার হাস্যকর প্রচেষ্টার কথাও আমরা জানি।

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে সুধীসমাজের আগ্রহ ঠিক হালফিলের নয়, দীর্ঘ-

দিনের। বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানে শুরু হয়েছিল বিজ্ঞান ও গণিতবিপ্লব। তারই সূত্র ধরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব। ইওরোপের, বিশেষ করে পশ্চিম ইওরোপের সর্বত্র তখন গণিত, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের জয়লাপ; দেকার্ত, লিবনিজ, নিউটনের গুণকীর্তন। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অনুসরণে মানুষ হয়ে উঠল যুক্তিবাদী, হিসেবী ও তথ্যনিষ্ঠ। বেকন নির্দেশিত সমস্তরকম 'Idols' বর্জন করতে তৎপর হয়ে ওঠে মানুষ। প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয় Romantic Movement। এর প্রবক্তা ও পুরোধারা মুক্তি খুঁজলেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের "শুষ্কং কাষ্ঠম্"-এর বেড়াজাল থেকে। চাইলেন ফিরে যেতে সমাজের শৈশবে; যেতে চাইলেন সেইসব দেশে যেখানে সময় মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেনা, সময় যেখানে থেমে আছে তার অনিন্দ্যসুন্দর মহিমায়। ইওহান গটফ্রিড হেয়ারডার (১৭৪৪-১৮০৩) তাঁর "ফোক টেলস্ অব অল নেশনস" প্রকাশ করে সমস্ত দুনিয়াকে লোকায়ত সম্বন্ধে সন্ধান দিয়ে স্তম্ভিত করে দেন। রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ফ্রেডেরিখ শ্লেগেল ১৮০৮ সনে তাঁর "উবের ডি সপ্রাখে উণ্ড ভাইসহাইট" অর্থাৎ 'ভাষা ও বিজ্ঞতা' প্রসঙ্গে বইটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে, লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী হিবলহেলম্ ভুন্ট তাঁর দশ খণ্ডে সমাপ্ত "ফোলকেরসিকোলোগি" অর্থাৎ "লোকমনোবিজ্ঞান" প্রকাশ করেন। লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে জর্মনীর অনুরাগ কত গভীরচারী ছিল তার একটি পরোক্ষ প্রমাণও বর্তমান। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইওরোপে যান। আশীর দশকে তিনি সেন্ট পিটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানের লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়)-এর প্রাচ্যতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর ডক্টরেট গবেষণার ডিগ্রি ছিল জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তিনি 'ভারতীয় যাত্রা'-র উপর তাঁর গবেষণা নিবন্ধ পেশ করেন। লোকায়তের প্রতি আকর্ষণের এর চেয়ে আর কি অন্য দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। লোকসংস্কৃতির প্রতি জর্মনীর এই আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতি অধ্যয়ন গবেষণার জনক হিসেবে উইলিয়ম জে থমস্-কে মেনে নিতে একটু দ্বিধা বোধ হয়। তাছাড়া, রোমান্টিক আন্দোলনের ঢেউ পূর্ব ইওরোপকেও যথেষ্ট ভাবে নাড়া দিয়েছিল। ইগর-গাথা-র দেশ রাশিয়াতেও তাই লোকসংস্কৃতির গভীর চর্চা দেখতে পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল বলেই পরবর্তীকালে আমরা রুশ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির প্রপ-এর তন্নিষ্ঠ গবেষণার সাক্ষাৎ

পেয়েছি। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধুনা বিস্মৃত "বৈদেশিকী" বইটিও আমাদের ইওরোপের লোকসংস্কৃতি বিষয়ে সজাগ করে তুলবে।

ইওরোপের এই লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের রাজকর্মচারীদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। শাসনকার্য্য বহির্ভূত সময়ে তাঁদের অনেকেই লোককৃতির সন্ধানে রত ছিলেন। রাজকর্মচারী ছাড়া বিদেশী মিশনারীরাও ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। উইলিয়ম কেরীর নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এদেশীয় মিশনারী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র নামও এখানে স্মর্তব্য। ১৮৮৩ সালে তাঁর "ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল" লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য, ইংরেজি ভাষায়। তবে, এসব লেখকেরা গল্প সংগ্রাহক ছিলেন মাত্র। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত অর্থে চর্চা করেন নি।

লোকসংস্কৃতির সীমানা অত্যন্ত বিস্তৃত। সেক্ষেত্রে লোক সংস্কৃতি বলতে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন অর্থ করেছেন এবং প্রতিক্ষেত্রেই তাঁরা চৌহদ্দির একটা সীমানা দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি-র একটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত সংজ্ঞা আমরা পাই অটোয়াস্থিত ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়ম-এর সংরক্ষক মেরিয়াস বারবোর লেখায়।

বর্তমানের বিজ্ঞাননির্ভর সমাজের বহুপরিবেশ বিজ্ঞানী লোকসংস্কৃতির সূত্র ধরে গ্রামীন মানুষের Prception study করছেন। প্রখ্যাত নৃ-সমাজ-বিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসু লোকসংস্কৃতির সূত্রেই কোনার্কের বিখ্যাত সূর্য্য-মন্দিরের স্থাপত্য কৌশল জানতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। "Nothing is new under the sun" এরই মতই বলা যেতে পারে যে nothing is alien to folk culture, লোকসংস্কৃতির এই গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশের এই প্রাকৃত সম্পদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বহুবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিত বিদ্যাশিক্ষার পরিমণ্ডল মুক্ত হয়ে আমাদের মন সহজে এই অন্ত্যজ, ব্রাত্য জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। ডঃ চট্টোপাধ্যায় এ হিসেবে এক বিশাল গুরুঋণ পরিশোধ করলেন।

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত "ফোকলোর ঃ পরিভাষার সমস্যা ও সংজ্ঞা নির্ণয়" বর্তমান সমালোচকের মতে আর একটু স্বল্প পরিসরের হলে ভাল হত। 'ফোকলোর' কথাটির সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয় কারণ এর পরিধি ক্রমবর্ধমান।

আমাদের দেশে যাঁরা 'ফোকলোর' নিয়ে এতাবৎকাল চর্চা করেছেন তাঁরা কেউ-ই এর বিস্তৃত সংজ্ঞার কথা ভাবেন নি। সীমিত পরিসরেই তাঁদের ভাবনা-চিন্তা বহতা ছিল।

"সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার ভূমিকা" অধ্যায়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্বতন 'Survival' মতবাদ পরিহার করে লোকসংস্কৃতিকে সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। এটি তাঁর বিশেষ অবদান। এবং এই কারণেই বর্তমান লোকসংস্কৃতি পণ্ডিত তথা সমাজবিজ্ঞানী নৃবিজ্ঞানীরা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় উৎসাহী হয়ে উঠেছেন যথা ethnomedicine, ethnoarchitecture, ethnoculinary art, ethno-communication ইত্যাদি। আফ্রিকার Drum language নিয়ে স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত চর্চা হচ্ছে। চর্চা হচ্ছে আফ্রিকায় লোকায়ত জীবনের অন্যান্য দিকগুলো নিয়েও। ডঃ চট্টোপাধ্যায় এসবকিছুরই ইঙ্গিত তাঁর বইতে দিয়েছেন।

"মতবাদ ও অনুশীলন পদ্ধতি" অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতির অনুশীলন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ, আমেরিকান, জর্মন, রাশিয়ান বহু মতবাদ আছে এবং এ সমস্ত মতবাদ সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান আশ্রয়ী। এই সব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে রুশোর "Noble Savage" অন্বেষণ পর্ব থেকে। সেক্ষেত্রে, ঐসব বিজ্ঞানের নিত্য পরিপরিবর্তনশীল প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রায়োগিক মূল্য ও যাথার্থ্য অনুধাবন করা সাধারণভাবে কষ্টকর। তাছাড়া সাংগঠনিক মতবাদের তো অসংখ্য শাখা, উপশাখা বর্তমানে। লেভি স্ট্রাউসের Binary analysis সম্বন্ধেও সুধীসমাজে দ্বিধা আছে। তাছাড়া, পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক মানসিকতাও যে কাজ করেনি তা নয়। Functional বিচার পদ্ধতি এই মানসিকতার বাহক ও সমর্থক। মার্ক্সীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত আলোচনা থাকলে ভাল হত। ডঃ চট্টোপাধ্যায় মাও জে ডং এর উল্লেখ করেছেন। লুস্থন কিন্তু স্বল্প উদ্ধৃত। অথচ লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ ও অনুশীলনের কথা তো আজ আর কারো অজানা নয়। এ সব ধরণের কিছু কিছু ত্রুটি আছে বইটিতে।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক যখন আলোচনা, বইটির ভাষা আরও সহজ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে আমি রেখাচিত্রগুলির গুরুত্ব খুব উপলব্ধি

করিনি। ঐ রেখাচিত্র বা diagram গুলির বিদ্যায়াতনিক দিক থেকে গুরুত্ব কোন মতেই অবশ্য কম নয়। বইটিতে বহু ইংরেজি উদ্ধৃতি আছে। তাদের অনুবাদ থাকলে ভালো হতো। বইটির শেষ অধ্যায়—"ক্ষেত্রানুসন্ধান" অত্যন্ত সুলিখিত এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে, ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে সাধুবাদ জানাই। লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে ওঁর জিজ্ঞাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক। অনেক কাজ করুন। অনেক লিখুন। লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই পথিকৃৎ গ্রন্থ অনেককেই উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করবে এবং আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি বিদ্যাচর্চার পথ প্রশস্ত করবে—এই আমার বিশ্বাস। এই মূল্যবান বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়। এ, মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ। ৫০ টাকা।

পরিণত কবির আত্মানুসন্ধানের কবিতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

চার-এর দশক রাজনৈতিক উত্থানপতনে সতত স্পন্দিত ছিল, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, দেশবিভাগ, তেভাগা আন্দোলন এসময়ের বাংলাকে অস্থির, উদ্‌বিগ্ন আর বিষণ্ন করেছে যেমন, তেমনি সাম্যবাদী পৃথিবী গড়ে তোলার সংকল্প ও স্বপ্নে বাঙালী তখন প্রতিজ্ঞ, আবেগোচ্ছল। এই পরিবেশে যে কজন তরুণ কবি কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, সে কবিতা রচনার পেছনে শুধু ব্যক্তিগত কবিখ্যাতির স্বপ্ন নয়, বড়ো আদর্শ, সমাজ বদলের আদর্শ, দায়িত্বে উদ্‌বুদ্ধ হবার প্রেরণা রূপে কাজ করেছে, কবি রাম বসু তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য; তিনি কবিতা দিয়েই, কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে হাতে নিয়েই পৃথিবীকে বদলে দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; তাঁর প্রেরণা সে সময়ে এমনই আন্তরিক ছিল, যে তা কবিতার সর্ত পুরণ করেও অপরকে প্রাণিত করতে পেরেছে; আমাদের কৈশোরে রাম বসুর জনপ্রিয়তা এমনই দেখেছি, অনেকেরই মুখে তাঁর পুরো একটা কবিতা বা স্তবক বা পংক্তি নিজের মনে আবৃত্তি করতে দেখেছি।

মনে রাখতে হবে, সেসময় সুকান্ত সব চাইতে জনপ্রিয় কবি; লোকপ্রিয় এই কবির সহজ উচ্চারণ ভঙ্গি, আন্তরিক সাম্যবাদী ভাবনা সহজেই তরুণতম কবিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে কবিতা রচনায়; এ ছাড়া গদ্যের ও ছন্দের নানা কসরৎ ও কারুকাজে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়ে খ্যাতির শিখরে

উঠছেন ; রয়েছেন সমর সেনের তির্যক ভঙ্গির কাটছাঁট স্মার্ট গদ্য কবিতা। এছাড়া বিষ্ণু দের এক স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গি, বিষয়ের বিস্তৃতি ও লোকায়তিক ভাবনার সংমিশ্রণ তাকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছে ; আশ্চর্য হল, জীবনানন্দ দাশ তখনও জনপ্রিয়তা কোনো অর্থেই পাননি ; কিন্তু কবি ও কবিতা প্রেমিকমাত্রই তাঁর বিশিষ্টতা উপলব্ধি করতে শুরু কোরেছেন তখনই ; ঠিক এই সময় রাম বসুর কাব্যচর্চার সূত্রপাত ; ফলত কবির কাম্য নিজস্ব ভাষা ও দেখার একটি স্বতন্ত্র কোন আবিষ্কার এ সময়ে আয়ত্ত করা যথেষ্ট কঠিন ছিল, কারণ আধুনিক কবিতার ঐতিহ্য তখন দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ কবির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হয়েছে শুরু। বুদ্ধদেব বসু ও সমগোত্রীয়দের বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষে প্রচার, 'কবিতার কোনো দায় নেই, কবির কোনো নির্দিষ্ট দায় থাকতে পারেনা, তার কাজ অনুভূতি ও উপলব্ধির ব্যক্তিগত'—এ উচ্চারণ মন্ত্রের মতন মেনে নিয়ে বিশুদ্ধ কবি হিসেবে তরুণের দল আসর জমিয়েছেন। অন্যদিকে মার্কসীয় ভাবনার ভাবিত, অনুপ্রাণিত কবিদের চারপাশের সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা, সেখানে বিষয় পাচ্ছে গুরুত্ব, নান্দনিক দিকটা প্রায়শই অবহেলিত হচ্ছে ; এরই মাঝখানে রাম বসু পথ খুঁজেছেন ; এবং নিজেকে স্বতন্ত্র ভূমিতে দাঁড় করাবার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন কিভাবে, তাঁর কবিতার একনিষ্ঠ পাঠকের তা অজানা নেই।

সদ্যপ্রকাশিত 'দুটি কাব্য নাটক ও কিছু কবিতা' রাম বসুর ইদানিংকালের রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যনাটক লেখায় রাম বসু ইতিপূর্বে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যদিও আমাদের অজানা নয়, এই সাহিত্যশাখাটিতে উত্তীর্ণ কারিগর হওয়া বেশ কঠিন, কেননা কাব্যনাটক কথাটির মধ্যে কবিতা ও নাট্যগুণ, অভিনয়যোগ্যতার সমন্বয় করতে হবে ; শুধু কাব্যগুণান্বিত দীর্ঘ সংলাপ পাত্রপাত্রীর মুখে জুড়ে দিলে বক্তৃতার ঢঙে, কাব্যনাট্য হয় না। নাট্যকার অবশ্যই কবি হবেন, থাকবে মঞ্চ সম্বন্ধে, প্রয়োগরীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। এই রীতিতে সফল টি, এস, এলিয়ট বলেছিলেন যে আবেগের তীব্রতা কাব্যের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ সম্ভব, কেননা কাব্যের আছে অসীম বিস্তারের সম্ভাবনা ; গদ্যে দৈনন্দিন জীবনের হালকা দিকটাকেই প্রকাশ করা যায়। কাব্যনাটক রচনায় সফল কবি এলিয়ট অনেক শিল্পীকেই এই ধারায় সে ব্যর্থ হতে দেখেছেন তার কারণ নাট্য মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না বলে।

এই মন্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে না ; যদি নাটক লিখি, তবে মঞ্চসাফল্যের জন্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই হবে। অথচ আমাদের এদেশে যেসব কাব্যনাট্য বলে একজাতের লেখা বাজার চালু, তা কাব্যাক্রান্ত সংলাপ, তার অভিনয়যোগ্যতা একেবারেই নেই। রামবসুর নাটকে কিছুটা মঞ্চনির্দেশনা রয়েছে, রয়েছে নাট্যগুণ, নাট্যিক মুহূর্ত ; এসব মিলিয়ে অভিনেয় গুণ বা যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়। 'নিজের মুখোমুখি আধঘন্টা' কাব্য নাটকের কথাই ধরা যাক। "সোহাগা আলোর ভিতর দিয়ে একটা প্রৌঢ় মানুষ এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। এক আদিম মানুষ। ট্রাইবাল অর্থে আদিম নয় ; আদি অর্থে, অনন্তকালের মানুষ। তাকে যে কেমন দেখতে তা আমি নিজেই সঠিক জানি না। তবে এইটুকু জানি, সে মানুষটা আমাদের অন্তর্লোকবাসী।' এচ প্রতীকিতা কাব্যনাট্যের শুরুতেই এর কাব্যগুণ সম্বন্ধে সচেতন করে দেয় আমাদের। কবি এ মানুষটাকে মঞ্চে আনেন নি, পর্দায় ফেলিয়েছেন। তার প্রাণসত্তা নারী ও পুরুষকে, যারা এই সময়েরই, আবার এই সময়েতেই নিঃশেষিত নয় ; সময়াতীত ; মূর্তঅমূর্ত ; ইন্দ্রিয়জ অতীন্দ্রিয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

এরা 'কে আমি ?'—অর্থাৎ চিরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন দিয়ে সংলাপ শুরু করেছে। 'তাহলে আমরা নাকি অরাজক অণুপুঞ্জ' 'অথবা আমরা নাকি ব্রহ্ম, রস ও আনন্দ / ঈশ্বরের ছাঁদে গড়া।' 'অথবা আমরা নাকি আঠেরো শতকী যুক্তিবাদ অনুসারে / পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত' ইত্যাদি ইত্যাদি সত্তার উৎস ও অস্তিত্ব ধারণ নিয়ে প্রশ্ন করেছে প্রতীকী নারী ও পুরুষ। খুবই সিরিয়াস বিষয়, ভঙ্গিও তাই, কিন্তু তৎসম শব্দ ভারাক্রান্ত ও দর্শন-পীড়িত বলে একটা দমচাপা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ; রামবসুর কাব্যনাট্যে যে সহজ জীবন, প্রীতি ও অনুভব সহজিয়া ভঙ্গিতে, কাব্যরীতিতে, আগে দেখেছি, এখানে তা নেই। এছাড়া বিশ্বাসের ভিতটাও নড়বড়ে হয়েছে ; "আমরা হারিয়ে গেছি। আমরা হারিয়ে গেছি / আমাদের মতো ভ্রান্ত ভ্রষ্ট তীর্থযাত্রী আছো নাকি কেউ ?" এই প্রশ্ন, তার উত্তর সন্ধান, কাব্যনাট্যের টেনশান সৃষ্টি করেছে, কিন্তু বড়ো বেশি বক্তৃতার চঙ—সার্থক বিপ্লব তাই যেখানে বহিরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় অন্তর্গত প্রকৃতি প্রবৃত্তি :—

এরকম দার্শনিকতা যত্রতত্র বলে অনুভূত জীবন, অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের দেখা এখানে পাইনা ; তত্ত্ব এখানে কাব্যকে আচ্ছন্ন করেছে ; ফলত নাটকীয় আবেদন সৃষ্টি হতে পারছে না অনেক সময়।

'এরা চারজন' আর একটি কাব্যনাটক ; এই নাটকটিতে বরং বাস্তবতার জায়গাকে ব্যবহার করা হয়েছে ; যদিও কাব্যনাটকে বাস্তবতা থাকতেই হবে এমন দাবী এলিয়ট খারিজ করে দেন, তবু একালের সাম্যবাদী চিন্তায় দীপ্তিত একজন লেখকের কাছে পাঠক শুধুই দার্শনিকতা ও বিমূর্ত চরিত্র, তাদের দার্শনিক অনুসন্ধান আশা করে না।

একালের চার যুবকের সংলাপ এই নাটকটিকে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা কোরে রচিত,

"পর্দা উঠলে দেখা যাবে কেউ গালে হাত দিয়ে ভাবছে, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কেউ।...কারো মুখে কথা নেই। একজন পকেট হাতড়ে সিগারেট প্যাকেট বার করলো। ফাঁকা প্যাকেট, বোঝা যাচ্ছে নাটকের চরিত্রগুলি কি কথা বলবে, এবং তারা কোন সময়ের, কোন শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

এই নাটকটিতে কাব্যগুণ ও নাটকীয়তা অনেকটাই সমন্বিত বলে এর অভিনয়যোগ্যতা অনেকখানি; বিশেষত সংলাপে চলতি শব্দের ব্যবহারে অনেক প্রাণ স্পন্দিত হয়েছে। তবু বলবো, রাম বসুর বিশ্বাসের জগৎ নড়ে গেছে, তিনি এখন ক্ষুব্ধ, বিতৃষ্ণ, তিক্তও বটে।

যাও নবা থিয়েটারে যাও
বিপ্লবের কারবারে এখন লোকসান নেই
হিল্লি দিল্লী ঘুরে আসবে
দু চার হাজার কামাবে, নাম ডাকও হবে
ব্ল্যাকমানিওয়ালা বড় বড় কোম্পানী মালিক
ওরাইতো আভাগ্রাঁদ (?) বিপ্লবী শিল্পের
আগমার্কা পেট্রন এখন
কিভাবে নিধন হচ্ছে ছুঁচো বুর্জোয়ারা
না খেয়ে না দেয়ে সারারাত কিউ দেবে জনগণ
কাগজে কাগজে ফুলপেজ বিজ্ঞাপন, সরকারী খেতাব খয়রাৎ
বিপ্লবের কারবারে এখন লোকসান নেই।

একজন যুবকের উক্তি। এখানে সমকালীন ছবি দেখছি, হয়তো আংশিক সত্যও, তবু সেকথাও শিল্পীও করে যেমন কথাগুলো বলা যেত, তেমনি বিষয়টিকে উপরতলা থেকে না দেখলে হয়তো সদর্থক দিকও দেখা যেতে পারত। লোভ ও ঘৃণা বড়ো বেশি প্রকট। অথচ এই নাটকটির মধ্যে সমকালীন যুব—

মানসের নৈরাশ্যজনক উপস্থাপনা যথেষ্ট কবিত্ব ও নাটকীয় মুহূর্তে সমৃদ্ধ বলে মনে হয়েছে।

রাম বসুর কবিতা আমাকে নাড়া দেয় বরাবরই, এই বইটিতে কিছু কবিতা রয়েছে, দীর্ঘ কবিতা, অন্তত আয়তনে দীর্ঘ; অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারের কিছু কবিতা রয়েছে; এই পর্বে রাম বসু চিন্তাকেই আবেগের উপর স্থান দিয়েছেন; খুবই প্রাজ্ঞ এই গ্রন্থে রামবাবু, সংহত তাঁর প্রকাশ। শব্দ নির্বাচনে তৎসম আধিক্য বিশেষ ধ্রুপদী মেজাজের সৃষ্টি করেছে। যদি কবিতার পংক্তি প্রবচনের চরিত্র পায়, আমাদের চলতি ফিরতির ব্যস্ততায় বেজে ওঠে গভীর সত্য কথনের তাৎপর্যে, তবে তা কবিতা পাঠকের বাড়তি লাভ। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে-র অজস্র পংক্তি ও স্তবকের এই হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠার ক্ষমতা আমাদের মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। রামবাবুর কবিতায় এই চরিত্র রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকবিতা লিখেছেন এখানে, সমকালীন দেশকালকে সুদূর ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত কোরে দেখতে চেয়েছেন;

প্রথম কাব্যনাটকটিতে সেই অসামান্য উচ্চারণ:—

অন্তর্গত আকাশে তাকাও
অন্তর্গত আকাশে তাকালে
তুমি হবে সংহত কোরক

তাঁর কবিতা এখন 'সংহত কোরক' হতে চেয়েছে। কোরক, কেননা কবিতা পূর্ণ উন্মীলনে কখনোই যেতে পারে না, তার মধ্যে থাকে সম্ভাবনার বীজটুকু ধরা; পূর্ণ বিকাশে কবির মৃত্যু, শব্দকে ব্রহ্ম হিসেবে জানা, উপলব্ধি করার সেই স্তর সবসময়ই দূরায়ত, আর অন্তর্গত আকাশে তাকাবার যে আমন্ত্রণ করেছেন কবি এখানে, তা তাঁর কবিতার কাছেও সত্য হয়েছে, এই কবিতা অন্তর্গত আকাশের কবিতা; যেখানে বহির্বিশ্ব ছায়া ফেলেছে স্থির জলে প্রতিবিম্ব মেলে; কিন্তু কবি তাকে শোধন করে নিচ্ছেন; আপনবোধে জারিত কোরে নিচ্ছেন।

'জয়াইকেলার রাত্রি' একটি দীর্ঘ কবিতা। জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদের জীবন, যা শহুরে সভ্যতা গ্রাস করেছে নানা অশান্তি অস্থিরতা দিয়ে, তাকে তুলে ধরেছেন কবি এই কবিতায়; কিন্তু গঠনে একমুখিনতা না থাকায় দীর্ঘ কবিতার মধ্যে যে মহাকাব্যিক ধ্রুপদী চরিত্র থাকে, তা এখানে নেই; বরং বেশি মাত্রায় রোমান্টিক, চিন্তাস্রোত বারবার অন্য ভাবনার সঙ্গে সংঘাতে মেতেছে, সূত্র গেছে ছিঁড়ে। তবু অসাধারণ বর্ণনা, চিত্রকল্প এবং উপলব্ধির পরিচয় এ

কবিতায় সর্বত্র পরিস্ফুট ; রাম বসু কবি হিশেবে পরিণতিতে পৌঁছে গেছেন এই বইএর কবিতায়। যা তাঁর আগের কবিতায় দেখিনি, এরকম কিছু লক্ষ্যণীয় চরিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে, ইন্দ্রিয়চেতনা, অনৈসর্গিক জগৎ সম্বন্ধে অনুভব, কখনো কখনো ঈশ্বরভাবনা ; এ কি ভারতের মাটির গুণ, যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আধ্যাত্মিকতা, অন্তত পরিণত বয়সে এ দেশের মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি সচেতন হয়ে পড়ে। মানুষ বলেই একজন কবির নানা বিবর্তন, নানা ভাবনার বিস্তার, গভীরতা ও সংহতি আশা করতে পারি।

সাধিকার মত ধীর পায়ে রাত্রি এল

যুক্ত হয়েছে রাম বসুর কবিতায় সিরিনিটি।

বাতাস, মহিমাময়ী বাতাস আমাকে প্লাবিত হতে দাও
বিপুল নৈঃশব্দে
চোখের তারায় যে সাধিকা হিরণ্ময় করুণা দাও

এ হলো উচ্চকিত কবিতার আড়ালে উপলব্ধির অনন্য প্রকাশ। এ এক নতুন অর্জন রাম বসুর ;

তিনি প্রসারিত হলেন
তাঁর ছায়ার নীচে দুই হাঁটুর নিবিড়ে মুখ রেখে মনে হল
আমি অজ্ঞেয় উত্তাপের খুব কাছাকাছি
অপার্থিব শুভ্রতার খুব কাছাকাছি।

আশাকরি রাম বসুর কবিতার নিষ্ঠ পাঠকের কাছে এই নতুন রাম বসু উন্মোচিত হলেন; এই মিসটিসিজম আমাদের একালের মানুষের জীবনে কতোটা প্রার্থিত, সে প্রশ্নে না গিয়ে বলবো, কবি পরিণত বয়সে জগতের অন্যপারে অন্য এক জগৎ ও তার সর্বনিয়ন্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন ; এ গ্রন্থে আমরা অন্য এক রাম বসুকে খুঁজে পেলাম। এই পরিণাম কবিরই হতে পারে।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে নির্জনতা
এখন ঘুমিয়ে পড়েছে জরাইকেলা
শুধু দেখে আছি আমি, যাঁতি ফুলের সুগন্ধি।

আমরাও কবির এই দেখে থাকার অংশী হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে আপন কোরে পেতে পারি এক গ্রন্থের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে।

দুটি কাব্যনাটক ও কিছু কবিতা। রাম বসু। সারস্বত লাইব্রেরী। ৮ টাকা।

'ক্ষুদ্র জীবন থেকে কিছু কথা'

দেবেশ রায়

থিওডর ডবলিউ এ্যাডরনোর লেখা 'মিনিমা মোরালিয়া' এই লেখাটির কারণ। কিন্তু তা সম্পূর্ণ পড়া হয়ে গিয়েছে এমন কথা বলতে পারছি না। পড়ে, বা বুঝে, উঠতে না-পারার একটি মুখ্য হেতু ব্যক্তিগত অক্ষমতা বটেই, কিন্তু অপর কারণটিও নেহাত কম প্রধান নয়। এ্যাডরনোর দার্শনিক নান্দনিক রচনা শুধু বিষয়ের কারণেই দুর্গম নয়, তাঁর ভাষা ও ভঙ্গিতেও আছে এক চর্চিত দুর্বোধ্যতা। সে-দুর্বোধ্যতাও কোনো কুশলতার চর্চামাত্র নয়, দুর্বোধ্যতায় এ্যাডরনোর দার্শনিক বিশ্বাস। যে-কোনো রচনার সহজপাঠ্যতা সে-রচনাকে শিল্পচ্যুত করে—এ্যাডরনো সাহিত্য সম্পর্কেও এ-রকম ভাবছেন, সংগীত বিষয়েও এ-রকম ভাবছেন। তার ওপর তিনি একটি বিষয় নিয়ে লিখতে-লিখতেই পাঠককে জানিয়ে যেতে থাকেন কেন তিনি ঐ-ভাষায় ঐ-ভঙ্গিতে লিখছেন। এ যেন লিখতে-লিখতে নিজেরই সমালোচনা করে যাওয়া বা পাঠককে জানিয়ে যাওয়া কীভাবে পড়তে হবে। তাই তাঁর অনেক লেখাই হয়ে ওঠে আসলে দুটো লেখা—বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য আর শৈলী নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যান।

তেমনি একটি রচনায় আর একবার এ্যাডরনো দার্শনিক দেকার্তের 'ডিসকোর্স অন মেথড' লেখাটি নিয়ে পড়েছিলেন। দেকার্তে লেখালেখির যে-চারটি নিয়ম বাতলেছিলেন প্রথমটি বাদ দিয়ে তার বাকি তিনটিই বাতিল

করে দিয়েছিলেন এ্যাডরনো দ্বিতীয় নিয়মটিতেই দেকার্তের পরামর্শ, বিষয়কে ছোট-ছোট অংশে ভাগ করা সম্ভব, ভাগ করে নিতে হবে, কারণ, যে-উপাদানগুলি দিয়ে বিষয়টি তৈরি তা ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়ে যাবে। যেন, অনেকটা ডাক্তারির ব্যবচ্ছেদের মতো। এ্যাডরনোর আপত্তি টুকরোগুলো মিলে ত সমগ্রটি তৈরি হয় না, বরং, সমগ্রটি তৈরি হয়ে গেলেই টুকরোগুলোর অর্থ বোঝা যায়, নইলে ত সেগুলি অবান্তর। দেকার্তের তৃতীয় নিয়মের সুপারিশ, সবচেয়ে সহজ কথা দিয়ে শুরু করে ধীরে-ধীরে ও ধাপে-ধাপে সবচেয়ে কঠিন কথাগুলির দিকে এগতে হবে। এ্যাডরনোর কাছে মনন একটা জটিল প্রক্রিয়া, সেটা ধাপে-ধাপে ঘটে না; রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতো একবারে ঘটে। মননের সমগ্র জটিলতাকেই ধরতে হবে। দেকার্তের চতুর্থ নিয়ম—সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মূল কথা এতটাই বিস্তারিত করতে হবে যাতে কোনো কিছু বাদ না পড়ে। এ্যাডরনো মনে করেন, স্থিতাবস্থার বিরোধী একটা বাস্তবতাকে উপস্থিত করতে হবে, সেখানে এমন কথা আসে কী করে যে কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। এ্যাডরনো বলেন, বরং 'এসে' বা রচনা ত ভাঙাচোরা বাস্তবেরই একটা ভাঙাচোরা চেহারা হয়ে উঠতে পারে, সেই ভাঙাচোরাটা দেখানোই ত কাজ, সেটাকে পলেস্তারা দেয়া নয়। এ্যাডরনো বেশ সূত্রই বানান—'এসে' বা রচনা ত আধাবিজ্ঞান ও আধাশিল্প। এর বিষয় ত ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তা থেকেই তৈরি হয় সংস্কৃতির দর্শন।

দেকার্তের রচনাবিষয়ক নিয়মগুলো সম্পর্কে এ্যাডরনোর এই আপত্তি থেকেই নিজের লেখা তিনি কী ভাবে লিখতে চান তার একটা আন্দাজ জোটে। এইটুকু আন্দাজ নিয়ে পড়তে গেলে অবিশ্যি ঠেকে শিখতে হয় আন্দাজটা যথেষ্ট নয়। তিনি কী বলতে চান ও কী ভাবে বলতে চান এ নিয়েই তাঁর লেখাগুলির চেহারাচরিত্র তৈরি হয়। সেই চিন্তা থেকেই তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছুনোর সমস্যাটা দেখেন। পাঠকের দিক থেকে রচনার কাছে পৌঁছুনোর সমস্যাটি তিনি দেখতে চান না। এ যেন একটা সাঁকো তৈরির ব্যাপার যা দু-পার থেকে তৈরি হয়ে উঠবে বটে কিন্তু এ্যাডরনো শুধু তাঁর নিজের পারের দিক থেকে সামনের শূন্যতার অর্ধপথ পর্যন্ত প্রসারিত সেতুটির নির্মাণ সংকট ও সমাধান নিয়ে কাতর। ওদিক থেকে শূন্যতার বাকি অর্ধপথ শূন্যই থেকে গেল কী না সেটা তাঁর চিন্তনীয় বিষয় নয়। করণীয় ত নয়ই। 'তিনি কোনো 'টার্ম' বা তাঁর ব্যবহৃত পদের সংজ্ঞা দেন না। একই পদ নানা অর্থে ব্যবহার করে যান। কারণ যে শব্দটিকে তিনি 'পদ' বা

'টার্ম' হিশেবে ব্যবহার করছেন সেই শব্দটি ত ভাষার অন্যান্য শব্দের মতই বহু যুগের বহু অর্থে দ্যুতিগর্ভ হয়ে আছে। একই শব্দের ভিতরে অনেক অর্থের দ্যুতি নিহিত থাকে বলেই ত শব্দ এমন বহু অন্বয়ময় হয়ে উঠতে পারে। শব্দ থেকে এই 'মিথিক্যাল রিমাইণ্ডার', স্মৃতির অবশেষটুকু মুছে দিয়ে তাকে যদি গাণিতিক বিভাগের পরিভাষাতুল্য করে ফেলা হয় তা হলে ত শব্দ তার সত্য থেকে চ্যুত হবে। তাই শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় কোনো 'টার্ম' বা 'পদ' পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। পাঠকের সংযোগের জন্যে যদি শব্দের শরীর থেকে অর্থের এই বহুব্যাপ্তিকে ছেঁটে দেয়া হয় তা হলে পাঠক ত সেই শব্দমালায় সমাজ ও সভ্যতার যে-সত্য গ্রথিত হয়ে আছে তার কাছে পৌছুতেই পারবে না। এ্যাডরনোর কাছে শিল্পসাহিত্যের নানা কর্ম ত বিচ্ছিন্ন কিছু নয়—সমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার অংশ। শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা তাই তাঁর কাছে সমাজেরই বিচার ও সমাজেরই দর্শন। এই একই বোধ থেকে এ্যাডরনো তাঁর লেখায় কোনো প্রতিষ্ঠিত বা পরিচিত 'কনসেপ্ট' বা ধারণাও ব্যবহার করেন না, নিজেও কোনো নতুন ধারণা তৈরিও করেন না। বাস্তবতার সবটুকু কোনো কনসেপ্টই ধরতে চায় না। কনসেপ্ট চায় বাস্তবতার সূত্র বানাতে। একটা ধারণাকে ধরে নিয়ে যদি কথাগুলো বলা যায় তা হলে আসলে আরো বহু ধারণাকে আড়ালে ফেলে দেয়া হয়। কোনো 'কনসেপ্ট' নয়, কোনো 'টার্ম' নয়—সমালোচনা হবে একটা স্বাধীন রচনা যেখানে পাঠক বাস্তবতাকে তার সমগ্রতায় চিনবে—যেমন একটা ছবিতে, বা গানে, বা সাহিত্যে চেনে।

অথচ লেখার ব্যবহার্য উপকরণগুলি নিয়ে এ্যাডরনোর খুবই ব্যস্ততা—লেখার শিরোনাম কী হবে, যতিচিহ্ন কী ভাবে বসবে, বিদেশী শব্দ তিনি কী ভাবে ব্যবহার করেছেন, বাক্যগঠন ও শব্দার্থের সংকট কী ভাবে মিটবে, এ-সব নিয়েও তাঁকে লিখতে হয়, বা কোনো লেখার ভিতরেই তিনি এ-সব নিয়েও কথা বলে নেন।

প্রায় নৈয়ায়িকের নিষ্ঠায় যিনি দর্শনের নৈয়ায়িক কাঠামো ভাঙেন তিনি নিজেকে দার্শনিকই ভাবতেন হয় ত, কিন্তু প্রায় সারা জীবন তিনি দর্শনের মূল সংজ্ঞা পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজছেন। ইয়োরোপের সমস্ত দার্শনিক মেথড আর জ্ঞানতত্ত্বকে ধূলিসাৎ করে জার্মানিতে নাৎসিবাদ ক্ষমতায় আসছিল। এর পর আর এনলাইটেনমেন্টের তত্ত্ব চলে না। এ্যাডরনোর কাছে তাই দর্শন কোনো 'মেথড' নয়। এক-একটি দার্শনিক প্রস্থান এক-একটি মেথডের সঙ্গে

বাঁধা পড়ে দর্শনের মূল সংজ্ঞা নষ্ট করে ফেলে। তিনি দর্শনের এই মেথডেরই বিরুদ্ধে। তাই তাঁর দর্শন তিনি কোনো দার্শনিক বই লিখে প্রমাণ করেন না। তাঁর কাছে 'এসে' বা রচনাই হচ্ছে দর্শনের যোগ্য কাঠামো।

এমন-কি আমরা যাকে আজকালকার ভাষায় 'রিভিয়ু' বলি, এ্যাডরনো মনে করেন সেগুলোই হচ্ছে দার্শনিক আলোচনার যথোচিত আধার। সেখানে হেতু-প্রত্যয়ের মূলে যাবার দায় নেই, সেখানে সিদ্ধান্তের কোনো দায়িত্ব নেই। একটা গান, বা ছবি, বা কবিতা, বা ভাস্কর্যের আলোচনায় সমাজের ও ইতিহাসের সত্য উঠে আসেতে পারে আর সেই সত্যই শিল্পের প্রকরণের সমস্যাকে চিনিয়ে দিতে পারে। এ-রকম আলোচনা যিনি করেন, তাঁকে ত নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পথ ধরেই এগতে হবে আর সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত কোনো একটি মাত্র মেথডে বাঁধা হতে পারে না।

এ্যাডরনো তাই টুকরো-টুকরো লেখাই লিখে যেতেন। সেই টুকরোগুলো থেকেই পরে তৈরি হয়ে উঠত তাঁর বইগুলো। বইয়ের চেহারায় এলেও— টুকরো লেখার খণ্ডতাতেই তিনি তাঁর কথা বলতেন।

এতগুলো কথা বলে রাখতে হল হয়ত ক্ষমাই এই ব্যক্তিগত অহমিকাটুকু-বজায় রাখতে যে এ্যাডরনো পড়ে ওঠা সত্যি-সত্যি বেশ দুরূহ। এ-কথাগুলিরও জানা অন্তত কিছু গেল, 'মিনিমা মোরালিয়া' বইটি পড়ার কাজ সহজতর করে নেয়ার উদ্দেশে গিলিয়ান রোজ-এর লেখা 'দি মেলানকলি সায়েন্স—এ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি থট অব থিয়োডর ডবলিউ এ্যাডরনো' বইটি পড়ে।

এ্যাডরনো সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ অনেক দিনের। কয়েক বছর আগে 'পরিচয়'-এর একটি সংখ্যায় এ্যাডরনোর একটি লেখা অনুবাদও করেছিলাম সেই উৎসাহের সূচনায়। কিন্তু ইংরেজিতে এ্যাডরনো অনুবাদ খুব বেশি দিন শুরু হয়নি। যাও-বা হয়েছে আমাদের দেশে পেয়ে ওঠা বেশ দুর্ঘট। ফলে এবারের বইমেলায় প্রায় একই সঙ্গে এ্যাডরনোর 'মিনিমা মোরালিয়া' ও 'থিয়োরি অব এনলাইটেনমেন্ট' পেয়ে যাওয়ায় সেই পুরনো উৎসাহ ফিরে এল।

উৎসাহের কারণটা খুব ব্যক্তিগত নয়, তা আমাদের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে জড়িত। আমাদের দেশে এখন 'মিডিয়া এক্সপ্লোশন', প্রচার মাধ্যমগুলির বিস্ফোরণ, ঘটে যাচ্ছে। একের পর এক দৈনিক কাগজ বেরচ্ছে, ইংরেজিতে ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়, ম্যাগাজিনের ত কথাই নেই, দূরদর্শনের একটার পর একটা নতুন কেন্দ্র হচ্ছে, নতুন-নতুন চ্যানেলও হচ্ছে। রেডিও হয় ত

একটু বয়স্ক বলেই দমে আছে। কিন্তু টিভিও এখনও পকেটে নিয়ে ঘোরার মত হয়নি—সেখানে ট্র্যানজিস্টরই ভরসা। ফলে, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিগত জীবন সব কিছুই প্রচারিত হয়ে যাবার বিষয় হয়ে উঠছে। নেহাত পারিবারিক, নেহাত ব্যক্তিগত, কোনো ঘটনাও সংবাদ হয়ে উঠছে এমন-কি আমাদের এই কলকাতা শহরেও। আমাদেরই এক প্রবীণ কবির কথা জানি, যিনি ব্যক্তি হিশেবে হয়ত-বা একটু একান্ততাই পছন্দ করেন, অন্তত বারকয়েক তাঁর বন্ধুবান্ধব স্ত্রী-কন্যা সমন্বিত ব্যক্তিগত, দৈনিক কাগজে খবর হয়ে গিয়ে তাঁকে নিজের কাছেই অপ্রস্তুত করেছে।

কিন্তু এই যে এত কাগজ, এত খবর, তার একটির থেকে আর একটিকে আলাদা করার আর-কোনো উপায় নেই—হরফের চেহারা ছাড়া। কিন্তু ওটুকু পার্থক্যও ত সব সময় থাকে না কারণ আধুনিক ফটো টাইপ সেটিং-এর টাইপ তৈরি করেন সাহেবরা। তাঁরা বাংলা হরফের আর-কত বৈচিত্র্যই বা সাধতে পারেন। আমরা আমাদেরই হরফ ধার করে এনে প্রতিদিন নতুন নতুন কাগজ বের করছি। একটি কাগজের সঙ্গে আর-একটি কাগজের প্রায় কোথাও কোনো তফাৎ ঘটে না, যাতে না ঘটে সে-বিষয়েও সবাই সতর্ক থাকে। একই খবর বিভিন্ন শিরোনামে আমরা পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি। সব কাগজই আমাদের কাছে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সবার আগে পৌঁছতে চায়। জনসংযোগ, জনসংযোগ, জনসংযোগই এক ও একমাত্র লক্ষ্য। বিজ্ঞাপনের ভাষা, টেলি-ভিশন রেডিয়োতে বিজ্ঞাপনের শব্দ আর ছবি—সবাই আমাদের কাছে অন্যদের চাইতে আগে পৌঁছে যেতে চাইছে। আমরা—পাঠক, দর্শক বা শ্রোতা—শব্দের বা ছবির পেছনে ছুটছি বা, শব্দ বা ছবি আমাদের পেছনে ছুটছে।

এটা একটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিক যখন তাঁর গান গাইতে বা ছবি আঁকতে বা কবিতা-উপন্যাস লিখতে চান, তখন তাঁকে এক বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। কারণ তিনি ত স্বরকে অবলম্বন করে অপধ্বনিতে নিমজ্জন থেকে ভেসে উঠতে চান, কথার অর্থের পেছনে-পেছনে অজ্ঞাতবাসে যেতে চান, রং ও রেখার গুপ্ত খনি আবিষ্কার করতে চান। তা হলে ত এখন শব্দ বা ছবি বা গান বা রং যে-দ্রুততায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে পড়ছে, নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেও ঢুকে পড়ছে—সেই দ্রুততার এক বিপরীত পথ তাঁকে খুঁজে নিতে হবে, যেখানে একটি শব্দ তার নিকটতম প্রতিবেশী থেকেও স্বতন্ত্র হয়ে যাবে, অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যই

তাকে প্রতিবেশীর ঘনিষ্ঠ করে তুলবে, যেখানে অর্থবোধ একটা মানসিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠবে। জনসংযোগ নয়, শিল্পের সংযোগের জন্যে যেখানে অপর পার থেকেও সেতুনির্মাণের প্রয়োজন হবে। কেউ ভাবতে পারেন, কেউ-কেউ এমন ভাবেনও দেখি, লোকের পড়ার জন্যেই ত লেখা, যে-লেখা লোকে পড়ে নিল না সে-লেখা লিখে কী লাভ। অন্য কেউ ভাবতে পারেন, লোকের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার জন্যে লিখব না কিন্তু লোকে যাতে পড়তে না-পারে সে জন্যেও নিশ্চয় লিখব না।

কিন্তু এর বিপরীতে এমনও ত কেউ ভাবতে পারি, একটু বাড়াবাড়ি করেই ভাবতে পারি—লেখাটাই হয়ে উঠবে একটা দুর্গের মত, তার গড়নে থাকবে প্রধানত আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য প্রাকার, তার মিনারে থাকবে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত প্রহরা, তার জীবনযাত্রা হবে এমন যে অবরোধের মধ্যেও তা অব্যাহত থাকবে, খবরের কাগজের পঠনাভ্যাস সেখানে প্রতিহত হতে থাকবে, শব্দের অভ্যস্ত পরিচয় ভেঙে যাবে। লেখা কেন হয়ে উঠবে না এমনই দুর্গ, যেখানে পাঠককেও ঢুকতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে। পুরো সেতুর বদলে মাত্র আধখানা সেতুই কখনো-কখনো, যেমন এখন, হয়ে উঠতে পারে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। কেউ-কেউ ত সেই উপায়টি বেছে নিতে পারেন। দুর্বোধ্যতা ত কখনো, কোনো সময়ে লেখাটিকে বাঁচিয়েও দিতে পারে। এ্যাডরনো সেই দুর্বোধ্যতার, শিল্পের চর্চিত দুর্বোধ্যতার একটা সমর্থন জোগাতে পারেন। এ্যাডরনোতে তাই আমাদের এমন উৎসাহ।

কিন্তু এ্যাডরনোই কেন? আর কেউও ত এই প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে দিতে পারতেন। তেমন কোনো দার্শনিক সমালোচক ত তত দুর্লভ নন যাঁরা জনসম্পর্কশূন্য শুদ্ধতার জন্যে শিল্প-সাহিত্যকে দুর্বোধ্যতার অভিজাত আড়াল দিতে চান।

এ্যাডরনোর কাছে শিল্প-সাহিত্য ছিল নাৎসিবাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার বর্ম। গত শতকের শেষ দশক থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্ঞানচর্চার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জার্মানিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও দুনিয়ায় জার্মানির নতুন ভূমিকা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়। পুরনো সব দার্শনিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক রীতি ছেড়ে দিয়ে এক নতুন দর্শন ও নতুন বিজ্ঞানের জন্যে যেন তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। ১৯২৩ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল রিসার্চ তৈরি হয়। বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে তার পদ্ধতিগুলো থেকে কতকগুলি সাধারণ সত্যে যাতে

পৌঁছনো যায় তার চেষ্টা এই স্কুলে চলতে থাকে। তিরিশের দশকের শুরুতে হোর্কহাইমার এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তখন থেকেই তাঁর পরিচালনায় 'জার্নাল ফর সোশ্যাল রিসার্চ' বেরতে থাকে। এ্যাডরনো এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন আর এই জার্নালেই তাঁর লেখাগুলি নিয়মিত বেরত। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর এই স্কুলের কর্মীরাও জার্মানি ছেড়ে এসে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। হোর্কহাইমার ও এ্যাডরনো শেষ পর্যন্ত মার্কিন দেশে এসে এই স্কুলের একটি শাখা আবার তৈরি করেন, জার্নালটিও নিয়মিত বেরতে শুরু করে। যুদ্ধের শেষে হোর্কহাইমার ও এ্যাডরনো পশ্চিম জার্মানিতে ফিরে যান ও সেখানে স্কুলটি আবার শুরু হয়। কিন্তু তত দিনে নতুন পশ্চিম জার্মানির শাসকগোষ্ঠী ও প্রধান জনমতের সঙ্গে এঁদের বিরোধ বাড়তে থাকে। জার্মানি ছেড়ে যাবার আগেই এ্যাডরনো তাঁর বিভিন্ন রচনায় জার্মানিতে নাৎসিদের জয়ের কারণ খুঁজছিলেন। সত্যি করেই যখন সেই জয় ঘটে গেল ও তাঁদের দেশ ছাড়তে হল, তখন প্রবাসে, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের প্রধান চেষ্টা ছিল একই সঙ্গে জার্মান সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার রক্ষণ আর জার্মান সমাজে যেখানে নাৎসিবাদের মূল নিহিত ছিল তার উদ্ঘাটন। এ বড় কঠিন চেষ্টা। ফলে তাঁরা একই সঙ্গে উভয় পক্ষের শত্রু হয়ে পড়লেন। ষাটের দশকে জার্মানিতে যে ছাত্র বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল তা থেকে হোর্কহাইমার ও এ্যাডরনো বাদ পড়েন নি। হোর্কহাইমার অসুস্থ, এ্যাডরনো মারা যান ১৯৬৯-এই। আজ হোর্কহাইমার ও এ্যাডরনোর রচনাবলিতে নাৎসিবাদ আক্রান্ত জার্মান সংস্কৃতির এক অন্য ভাষ্য আমরা পাচ্ছি—মার্কস-বাদের সহজ-সরল কোনো সংস্করণের সূত্রে সে ভাষ্য কোনো জনপ্রিয় ব্যাখ্যা দেয় না, আবার মার্কসবিরোধী কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সে ভাষ্যে নিহিত নেই। ইহুদি পিতার সন্তান এ্যাডরনোকে (জন্ম ১৯০৩) নাৎসিরা ১৯৩৩-এ ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৯৩৪-এই তাঁকে লণ্ডনে চলে আসতে হল। অক্সফোর্ডে কিছুদিন কাটিয়ে ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকাপাকিভাবে চলে গেলেন। ১৯৪১ থেকে ক্যালিফর্নিয়ায় হোর্কহাইমার, হানস আইসলার, টমাস মান ও অন্যান্যদের সঙ্গে এ্যাডরনো 'দি অথরিটেরিয়ান পার্সনালিটি' প্রকল্পে কাজ শুরু করেন। অর্থাৎ এ্যাডরনোর কর্মজীবনের প্রথমার্ধ কেটেছে জার্মান-ইহুদি হিশেবে নাৎসিবাদের শিকার হয়ে। আর মহাযুদ্ধের পরে তাঁর কর্মজীবনের দ্বিতীয়ার্ধ কেটেছে পশ্চিম জার্মানিতে নাৎসিবাদ সম্পর্কিত প্রশ্ন নতুন করে উত্থাপনের

পরিবর্তিত অবস্থায়। পশ্চিম জার্মানিতে নাৎসিবাদের কার্যকারণ ব্যাখ্যার রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি হল না। এ্যাডরনো তাই সেখানেও যেন প্রবাসেই এলেন, তাঁর প্রাচীন সব প্রশ্ন নিয়ে। বোধহয়, নিজের জীবন, যা অনেক জার্মান লেখক বুদ্ধিজীবীরই জীবনের অনুরূপ, এ্যাডরনোর কাছে শিল্প-সংস্কৃতির নান্দনিক-সামাজিক প্রশ্নকে এমন অব্যবহিত করে তুলেছিল। আর তাই তাঁর সমস্ত তত্ত্বের বা মন্তব্যের মধ্যেই গোপন থাকে এক আত্মজীবনী। নিজের সেই আত্মজীবনীর তত্ত্ব লিখতে গিয়েই কখনো তিনি তাঁর বই 'মিনিমা মোরালিয়া'কে বলেন তাঁর 'মেলানকলি সায়েন্স' থেকে কিছু উপহার। আবারও বলেন, 'ক্ষুণ্ণ (broken) এক জীবনের কিছু টুকরো।' 'উৎসর্গ'-য় এ্যাডরনো একটু ব্যাখ্যা করেই বলেছেন যে কেন এমন টুকরো লেখাতেই তার আগ্রহ, যে-টুকরো লেখাতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগতের অনেকটাই পাঠককে জানাতে পারবেন। তাই এই লেখাগুলি আত্মকথনের মত—অনায়াসে কখনো-বা আসছে হেগেলের কোনো ছোট মন্তব্য, মার্কসের কোনো একটা পদ্ধতি, আজকাল মানুষের স্বভাব কী ভাবে পাল্টে যাচ্ছে তার দু-একটা পথ-চলতি উদাহরণ। দরজা বন্ধ করতে হয় কী ভাবে তা ভুলে গেছে সবাই, কী ভাবে উপহার দিতে হয় তা নিয়ে আর ভাবে না কেউ। এ্যাডরনোর এই ধরনটাকেই কেউ বলেছেন একটু বেঁকিয়ে কথাটাকে উল্টে দেয়ার কৌশল—'আয়রনিক ইনভার্শন'। এই কৌশলটি এ্যাডরনোর খুব প্রিয় কিন্তু 'মিনিমা মোরালিয়া'তে তিনি এর সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করেছেন। তাঁর অন্যান্য রচনায় অনেক সময় এই বেঁকিয়ে দেয়াটা ধরা পড়ে না—ফলে তাঁর কথার সোজাসুজি অর্থ যা দাঁড়ায় তাতে তাঁর ঈপ্সিত অর্থের উল্টোটাই পাঠক বুঝে নেয়। ইয়োরোপীয় দর্শনে যে-সব কথা প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্য সেগুলোকে উল্টে দিয়ে এ্যাডরনো পরোক্ষে বুঝিয়ে দেন যে নাৎসিবাদের উত্থান সম্ভব করে তুলে ইয়োরোপ নিজের দর্শনের উচ্ছিষ্ট নিজেই চাটছে কেমন। কিয়েরকেগার্দ-এর একটি রচনার নাম—'আমৃত্যু অসুখ'। তাতে কিয়েরকেগার্দ সমাজে প্রচলিত স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে ভেবেছেন। এ্যাডরনো সেটাকে উল্টে দিলেন 'আমৃত্যু স্বাস্থ্য'। সে-রকমই আর-এক মৌলিক চেষ্টায় তিনি হেগেলের 'সমগ্রতাই সত্য' এই বচনটা উল্টে দেন 'সমগ্রতাই মিথ্যা'। এ্যাডরনো তত্ত্ব আর বাস্তবের পার্থক্যকেই বলেন, 'আয়রনি'। 'সেই আয়রনিটাই আজ মিথ্যে হয়ে গেছে'।

'মিনিমা মোরালিয়া' বইটি দেখে-দেখে বুঝে নেবার মতই বটে কারণ

এ্যাডরনোর কাছে যে-কোনো একটি বইয়ের অর্থই, হয়ে ওঠা। সেখানে তিনি নিজেকে এনলাইটেনমেণ্টের দার্শনিকদের থেকে নিজেকে আলাদা করেন। তাঁর কাছে কোনো বই কোনো জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নয়—আত্মদর্শনের প্রতিষ্ঠা। তাঁর এক পরোক্ষ প্রত্যাখ্যানই থাকে কাণ্ট, হেগেল, কিয়েৰ্কেগার্দ-এর পদ্ধতির প্রতি, যদিও তিনি মার্কসবাদের ভিতরে থেকেও মার্কসবাদের বাইরের দার্শনিক প্রস্থানগুলিকে ব্যবহার করতে চান, বিশেষত হেগেলকে ত বটেই। তিনি যেন বরং সঙ্গ পেতে চান প্রাক-এনলাইটেনমেণ্ট দার্শনিকদের যাঁরা মানুষকে শেখাতে চেয়েছেন জীবনযাপনের কতকগুলি নিয়ম—বুদ্ধ, কনফুসিয়স থেকে শুরু করে এরিস্টটল পর্যন্ত। আর আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি বিনিময় নিৎসের সঙ্গে হয়ত এই কারণেই যে নিৎসেও জীবনের কথা বলেন—তাঁর নিজের মত করে, জ্ঞানতত্ত্বের কোনো পদ্ধতি বা কথা বলবার কোনো রীতি প্রমাণ করেন না।

এরিস্টটল লিখেছিলেন 'ম্যাগনা মোরালিয়া', সেটা মনে রেখেই এ্যাডরনো তাঁর বইয়ের নামটি বেছেছেন। এই ঠাট্টা মার্কসকে মনে পড়ায়। প্রুধোঁর 'ফিলজফি অব পভার্টি'-র জবাবে লেখেন মার্কস 'পভার্টি অব ফিলজফি'। তাঁর বইটির একটা উপনামও অ্যাডরনো ব্যবহার করেন—'রিফ্লেকশনস ফ্রম এ ড্যামেজড্ লাইফ'। ম্যাক্স হোর্কহাইমার-এর পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষ হয়েছিল এই বইটি লেখার। সেই দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। কিন্তু বইটির তিনটি ভাগে আছে ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬-৪৭ এই তিন সময়ে লেখা যথাক্রমে ৫০টি, ৫০টি ও ৫৩টি রচনা। সেগুলির কোনোটিই প্রায় এক-দেড় পৃষ্ঠার বেশি নয়, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। 'ডেডিকেশন' নাম দিয়ে এ্যাডরনো একটা ভূমিকাই লিখেছেন। তাতে বলেছেন, 'এই তিন ভাগেই শুরু হয়েছে সংকীর্ণতম ব্যক্তিগত কথা দিয়ে—প্রবাসী এক মননকর্মীর কথা।' আবার বলেছেন—লেখাগুলি তৈরি হয়ে উঠছিল হোর্কহাইমার আর এ্যাডরনো যখন একটু আলাদা-আলাদা কাজ করছিলেন। ('থিয়োরি অব এনলাইটেন-মেণ্ট' ওঁদের যৌথ রচনা)। এই রচনাগুলিতে এ্যাডরনো 'কৃতজ্ঞতা আর আনুগত্য' দেখাতে চেয়েছেন, দু জনের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই, পার্থক্য নেই। এ্যাডরনো লিখছেন, তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক এই বইটি সম্পর্কেই লিখছেন, 'এ যেন এক অন্তরঙ্গ সংলাপের সাক্ষ্য বইছে: এই বইয়ের এমন কোনো কথা বলা হয় নি যা ততটাই হোর্কহাইমারের নয়, যতটা তার, যে কথাগুলি বলার সময় করতে পেরেছে'। ১৯৩৪-এ জন্মের দেশ থেকে উদ্বাস্তু এই দুই মননকর্মী

যে বন্ধুত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি, ধ্বংস ও অবসানের বছরগুলিতে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয়কে বুঝতে চেয়েছেন ইয়োরোপীয় সভ্যতার এক মন্বন্তরের নিরিখে—তা এতই ব্যক্তিগত ও একান্ত, যেন তাঁরা আত্মার সহোদর, অথচ তা এমনই নৈর্ব্যক্তিক যে বন্ধুতার সূত্রে গঠিত এমন রচনাটি হয়ে ওঠে যুদ্ধের সময়েরই এক জার্নাল। এই দশটি বছর হচ্ছে সেই সময় যখন টমাস মান প্রায় একই জায়গায় বসে শেষ করছেন যোশেফ পুরাণ আর শুরু করেছেন ডক্টর ফস্টাস। এই ডক্টর ফস্টাস রচনায় এ্যাডরনো তাঁকে সাহায্য করেন ইয়ারোপীয় সংগীতের তথ্য ও তত্ত্ব বিষয়ে নিয়ত অবহিত রেখে। জার্মানিতে নাৎসিবাদের সমার্থক জার্মান সংস্কৃতি যখন নিজেকে ধ্বংস করে ইয়োরোপীয় আধুনিকতার আত্মপ্রতারণা উদ্‌ঘাটন করে রাখছে ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডে ঠিক তখনই, জার্মানি ও ইয়োরোপ থেকে দূরে, প্রবাসে, জার্মানির এই সকল স্রষ্টা ও মননকর্মী এমন কিছু রচনা করে রাখছিলেন, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যা জার্মান মানসের শ্রেষ্ঠ ফসল হিশেবে মানবসভ্যতাকে দু হাত পেতে নিতে হবে। সেই ১৯৪৫ থেকে আমরা ত মাত্র ৪২টি বছর পেরিয়ে এসেছি!

কিন্তু এই কাজ যখন তাঁদের করতে হয়েছে তখন কী গ্রীক ট্র্যাজেডিতুল্য আত্মবৈপরীত্যের মধ্যেই-না এঁদের দিন কেটেছে। 'ব্যক্তির অভিজ্ঞতা থেকে সামাজিক বিজ্ঞান অতুলনীয় শিক্ষা পেতে পারে,…আর তার বিপরীতে বিরাট সব ঐতিহাসিক যুক্তিপুঞ্জ নিয়ে ইতিমধ্যে যা কিছু ঘটানো হয়েছে তাতে সে-সবকে আর জালিয়াতির সন্দেহের ঊর্দ্ধে ভাবা যায় না।'

'তার ধ্বংসের পর্বে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, আর বাইরে সে যা কিছু দেখেছে, সে-সবই, জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াচ্ছে আরো একবার।'

'এককালে দার্শনিকরা যাকে জীবন বলে জানতেন, তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জগৎ আর শুধু পণ্যভোগের জীবন…।'

'অব্যবহিত জীবন সম্পর্কে যে কিছু জানতে চায়, তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে গোপনতম অবকাশেও ব্যক্তিগত জীবনকে যে নিয়ন্ত্রণ করে সেই নৈর্ব্যক্তিক শক্তিগুলোকে।'

'জীবনের পরিপ্রেক্ষিত এখন একটা তত্ত্বমাত্র। সেই তত্ত্ব শুধু এই সত্যটা গোপন করছে যে কোথাও কোনো জীবন নেই।'

'টেকনোলজি সব ভঙ্গিকে করে দিচ্ছে নির্দিষ্ট, কঠিন মানুষকেও। ভঙ্গি থেকে চলে যাচ্ছে দ্বিধা, ইচ্ছা, সামাজিকতা।…এই ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটা দরজা আস্তে করে ভালভাবে বেশ সেঁটে বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা।

গাড়ির ও রেফ্রিজারেটারের দরজা ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করা হয়, কোনো-কোনো দরজা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে চায়—ফলে যে-ঢোকে তার ওপর পেছন ফিরে না-দেখার অভব্যতা চেপে বসে, যে-গৃহে সে ঢুকছে তার অন্তঃপুরকে রক্ষার দায়িত্ব আর সে নেয় না।'

'উপহার কী ভাবে দিতে হয় আমরা ভুলে যাচ্ছি।...কিছু দেয়ার কাজটা যে কত খারাপ হয়ে গেছে তা বোঝা যায় উপহার দ্রব্যের বাহুল্যে, যেন যে দেবে সে জানেই না, কী দেবে'।

'এই যুদ্ধের পরও জীবন 'স্বাভাবিক' ভাবে চলবে এবং এমন-কি সংস্কৃতিও আবার বানিয়ে তোলা যাবে। যেন সংস্কৃতির এই পুনর্নির্মাণ মানেই সংস্কৃতি ধারাবাহিকতা অস্বীকার করা নয়। এ-সব ভাবা বোকামি, মূর্খতা। লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনাটিই কি চরম সর্বনাশ নয়, এ কি এক অন্তর্নাটক মাত্র? এতে কি ইয়োরোপীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোনো ব্যাঘাতই ঘটেনি?'

যাঁরা মার্কসবাদের এক ও অদ্বিতীয় পাঠে বিশ্বাসী তাঁদের এ্যাডরনোর অনেক বক্তব্যই ভাল লাগবে না। কিন্তু এটা ভাল-মন্দ লাগার ব্যক্তিগত কথা নয়। এনলাইটেনমেন্ট যেমন ইয়োরোপের দর্শন চর্চার বহু মুখ খুলে দিয়েছিল, মার্কসবাদ তেমনি আধুনিক বিশ্বের দর্শন চিন্তাকে নানা নতুন সমস্যার সম্মুখীন করেছে। ইয়োরোপে নাৎসিবাদ ও ইয়োরোপীয় চিন্তায় তার প্রভাব এ্যাডরনোকে সমাজ ও শিল্প সম্পর্কে নানা সিদ্ধান্তে উন্মুখ করেছে। সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর যন্ত্রণাখিন্ন ব্যক্তিগত জীবন। তাই তাঁর লেখা থেকে আমাদের এখনকার ভারতীয় অস্তিত্ব নিয়েও আমরা প্রশ্নাতুর হয়ে উঠতে পারি—সে-ভারতীয় অস্তিত্ব ত আধুনিক বিশ্বেরই একটা অংশ।

মিনিমা মোরালিয়া। থিওডর ডবলিউ এ্যাডরনো।

তিন স্তম্ভ ও বাংলার শিল্পের স্বাগত্য

পূর্ণেন্দু পত্রী

'তিন শিল্পী' সম্ভবত শোভন সোম-এর তিন নম্বর বই, শিল্প বিষয়ে। আগের দুটি বই যথাক্রমে 'শিল্প, শিল্পী ও সমাজ' আর 'বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা'। শেষ বইটিতে তিনি অবশ্য লেখক নন, সম্পাদক। সম্পাদনাতেও সহযোগী হিসেবে রয়েছেন আর একজন, অনিল আচার্য। তিনটে বই-ই আমাদের দেশের শিল্প-কানা গুমোট আবহাওয়ায় ঝমঝমে বৃষ্টির মত জরুরী। একে সর্বান্তকরণে স্বাগত না জানিয়ে উপায় নেই। আমাদের সংস্কৃতি চর্চায় যে-বিষয়টি গত প্রায় চার দশক জুড়ে সব চেয়ে উপেক্ষিত, যার গায়ে অমনোযোগের ধুলো জমে চলেছে পরতে পরতে, ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আবর্জনাসদৃশ খড়-কুটো জড়ো হচ্ছে যার উপর, যার আঁশ দেখেই শাঁসের খবর লিখে যাওয়ার অভ্যস্থ প্রথা গড়ে উঠছে পত্র-পত্রিকায়, আর যা আজও কিছুতেই হয়ে উঠতে পারছে না আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের বৃত্তের সম্পূর্ণতা-সাধক অপরিহার্য রেখা, তা এই শিল্পই।

হাঙ্গেরীর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক, চলচ্চিত্র সমালোচনার মানদণ্ড নির্মাণে যাঁর অগ্রগামী ভূমিকা ইতিহাস-স্বীকৃত, সেই বেলা বালাজের বেদনার্ত কণ্ঠস্বরে একবার ফুটে উঠেছিল এই রকম উচ্চারণ—"একজন মানুষ যিনি জীবনেও বেটোফেন অথবা মাইকেলএঞ্জেলার নাম শোনেন নি তিনি সাংস্কৃতিক জগতে কোনো রকম পাত্তাই পাবেন না। কিন্তু তাঁর যদি চলচ্চিত্র শিল্পের মূল

রূপনীতি সম্বন্ধে কনামাত্র ধারণা না থাকে, এবং জীবনেও যদি না শুনে থাকেন আর্স্টা নিয়েলসন অথবা ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথের নাম, তবুও তিনি, এমন কি উচ্চতম স্তরেও, একজন সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে গৃহীত হয়ে যাবেন স্বচ্ছন্দে।"

এখন, আমাদের এই স্বাধীনতাত্তোর পশ্চিমবঙ্গে দৈবক্রমে হাজির হওয়ার সুযোগ পেতেন যদি বেলা বালাজ, খুশি হতেন অন্তত এইটুকু দেখে কোনো না কোনো ভাবে চলচ্চিত্র-বিষয়টিকে অনালোচিত রেখে একটি দিনও অস্ত যায় না এখানে। আর তাঁর মোটামুটি পরিতৃপ্ত প্রস্থানের পর যদি দৈবক্রমে রাসকিন কিংবা ওয়ালটার পেটারের মতো প্রাচীন প্রান্তের পরিবর্তে আধুনিক রুডলফ আর্নহাইমও হাজির হতেন এখানে, আমরা শুনতে পেতাম অবিকল বেলা বালাজের ভঙ্গীতে উচ্চারিত এই রকম বিষণ্ণ স্বগতোক্তি—

"হায়! দিনান্তে একবারও শিল্পকলার বিষয়ে না ভেবে এখানে মানুষ উঠে যেতে পারে সমাজের কত উচ্চস্তরে আর গৃহীতও হয়ে যেতে পারে সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবানের তালিকায় কত স্বচ্ছন্দে।"

এই রকম ফাটলের রাস্তার উপর দিয়েই আমাদের এখনকার হাঁটাহাঁটি। চোখ বুজিয়ে নির্বিঘ্নে হেঁটে যেতে পারেন যে-সব নিত্যযাত্রী, তাঁরা তো চমৎকারভাবে নিরাপদ। কিন্তু যাঁরা আছাড় খান, যাঁদের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে, যাঁরা ঐসব গর্ত-গহ্বরের অসামাজিক অবস্থানের দিকে তাকিয়ে আশঙ্কিত হন আরো বড় সর্বনাশের সম্ভাবনায় তাঁদের আশু শুশ্রূষার জন্যে অবশ্যই দরকার খানিকটা তুলো, ব্যাণ্ডেজ আর রক্তক্ষয় বিরোধী ওষুধ।

শোভন সোম-এর 'তিন শিল্পী' পড়তে পড়তে মনে হল, যে কাটা-ঘায়ে সমাজ ছিটিয়ে চলেছে নুনের ছিটে, এখানে তারই চিন্তাসিদ্ধ আরোগ্যের আয়োজন। সংশয়-সঙ্কুল অস্ত্রোপচারের আগে রোগী যখন জানতে পারে যে শিয়রে মজুদ আছে প্রয়োজনীয় রক্তের বোতল, অনেকটা সেই রকমই নিশ্চিতির স্বাদ এই বইয়ে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে শিল্পের সঙ্গে আমাদের এখনকার সহজাত বিচ্ছিন্নতাবোধকে জোড়া লাগাবার উদ্যমের দিনে এই বা এই জাতীয় বই থেকেই আমরা পেয়ে যাবো ছেঁড়া হাড়-মাস জোড়া লাগাবার দরকারী ইতিহাস অথবা ওষুধ।

২

নাটকের উপমায় উপস্থাপিত করতে চাইলে 'তিন শিল্পী' সম্বন্ধে বলতে হয়,

এর প্রধান চরিত্রের সংখ্যা তিন। নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ আর রামকিঙ্কর। কিন্তু পার্শ্বচরিত্রের সংখ্যা অগন্য। আর কাল যদিও সীমাবদ্ধ, মোটামুটিভাবে বর্তমান শতাব্দী, কিন্তু স্থান পৃথিবীর দশ দিগন্তে ছড়ানো। আর সমস্ত স্থান-কাল ও চরিত্রকে ছাড়িয়ে যিনি এর সম্রাট-সুলভ নায়ক, সন্দেহাতীতরূপেই, রবীন্দ্রনাথ।

এও এক পরমাশ্চর্য যে, ভারতবর্ষের সাহিত্যকে যিনি একাই আঞ্চলিকতার ঘেরাটোপ থেকে উপড়ে এনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বের প্রাঙ্গনে, সেই তিনিই বিশ্বের প্রাঙ্গন থেকে রোদ-জল-আলো-আকাশের অভিজ্ঞতা এনে এনে এ-দেশের অজীর্ণ রোগাক্রান্ত চিত্রশিল্পকেও বাঁচিয়ে তুললেন স্বাস্থ্য ও শক্তির সমুজ্জলতায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা' উপন্যাসে আশ্রম-বর্ণনার টানে এসে যায় এক তালগাছের কথা, আশ্রম-সীমানার অন্তর্গত মাঝারি মাপের সব কিছুকে ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে যার উচ্চতা। কিন্তু মানিকবাবু তালগাছটিকে ব্যবহার করেন নি আশ্রম-পরিমণ্ডলের নানা তল রচনার সাদা-মাঠা প্রয়োজনে। ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বৃহৎ পরিধির ঐ আশ্রমেরও নিয়মতান্ত্রিকতার ধরাবাঁধা জীবনযাপনের সংকীর্ণতার বিপরীতে লেখক-আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির প্রতীকরূপেই যেন। ছোট-বড়য় মেশানো অন্য সব গাছপালা এবং গাছপালার মতই পোষমানা আশ্রমিকেরা যখন আশ্রমের দেয়ালের সমান্তরালে সীমাবদ্ধ সংস্কারের ঘেরাটোপে আটকানো, একমাত্র সেই তালগাছটিই আশ্রম-বহির্ভূত বৃহৎ বিশ্বের আলো-বাতাসের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে আপ্লুত।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সেই সদম্ভ অধিকার বিস্তারের যুগে, দীপ্ত চিন্তা ও ব্যাপ্ত মননের ক্রমবিকাশের পরিপন্থী পরিবেশে, ব্যক্তিত্বের খর্বকায় এবং একপেশে বিকাশই যখন জ্যামিতিক উপপাদ্য অনুযায়ী স্বাভাবিক, তখনই বিরাট ব্যতিক্রমের মতো এক সমুন্নত তালগাছকে পেয়ে গিয়েছিলাম আমরাও, বিশ্বযোগে যাঁর বিহার। এবং তিনিই রবীন্দ্রনাথ। মাঝারি মাপের বহু উজ্জ্বলতর ভাবনাপুঞ্জ ডিঙিয়ে আরো ঊর্ধচারিতায় এক ব্যাপকতর বিশ্ব-পটের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উঠতে পারার পরিনামেই, যা তাঁর নিজস্ব চর্চার সীমানাযুক্ত নয়, সেই চিত্রশিল্পেরও সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন-উত্তরণ হয়ে উঠতে পারল তাঁর নিয়ত অনুধাবনের বিষয়। জানি না, যাঁকে হয়ে উঠতে হবে পৃথিবীর কবি, তাঁকে কবিতারই সহোদরসদৃশ শিল্পকলা বিষয়ে যে নিতেই হবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা, এ শিক্ষা তিনি গ্যেটের কাছে পেয়েছিলেন কিনা।

আবার গোটের কথা এই প্রসঙ্গে মনে এসে যায় যখন, অথবা তাঁকে পার হয়ে ফরাসী শিল্পআন্দোলনের পর্ব-পর্বান্তরের স্মৃতি মনে পড়ে যায় যে-মুহূর্তে, তখন আর ব্যতিক্রম মনে হয় না কবির ঐ ভূমিকা পালনকে। মেনে নিতে হয় একান্ত স্বাভাবিক, এমনকি স্বধর্মপালনকারী কর্তব্যপালন হিসেবেই যেন। যেন ইতিহাসের দায়ে মাথা পেতে দেওয়া।

গোটে, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকের ভঙ্গীতেই, চর্চা করেছিলেন প্রকৃতির ও চিত্রশিল্পের রঙ। তাঁর 'থিয়োরি অফ কালার' জার্মান একস্‌প্রেশনিস্টদের সীমানা ছড়িয়ে পড়েছিল ইংলিশ চ্যানেলের এপারেও। কিন্তু কোনো বিশেষ শিল্প-আন্দোলনের অধিনায়ক পদে নিজেকে স্বেচ্ছাব্রতী করেন নি কখনো। যা করেছিলেন ফরাসি কবিরা। ফরাসি শিল্পআন্দোলনের এ এক মহৎ সৌভাগ্য যে, আন্দোলনের প্রত্যেক পর্বে তাঁরা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে, অথবা তার চেয়েও বড়, অভিভাবক হিসেবে, কিংবা আরো সঠিক অর্থে দার্শনিক প্রবক্তা হিসেবে, পেয়ে গেছেন এক একজন প্রথম সারির কবিকেই। কিউবিজম ও পিকাসোর প্রতিষ্ঠার মূলে অ্যাপোলিনেরের প্রাণপাত। বোদলেয়ার তাঁর সমসময়ের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্প-ব্যাখ্যাতা। এখানে হয়তো মালার্মে-র নাম খানিকটা বিস্ময়চিহ্ন ফোটাতে পারে আমাদের কপালে। কিন্তু এটা ইতিহাসেরই ঘটনা যে 'ইমপ্রেশনিজম' আন্দোলনের মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে নয়, মূল সভাপতি হিসেবেই হাজির ছিলেন তিনি। ১৮৭৬-এর 'দা আর্ট মান্থলি রিভিউ'-এ ছাপা হয়েছিল তাঁর মূল ফরাসি প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ 'দি ইমপ্রেশনিস্ট অ্যাণ্ড এদোয়ার্দ মানে'। কীভাবে যেন হদিশহীন হয়ে যায় মূল ফরাসি প্রবন্ধ। ১৯৬৮-তে পুনরাবিষ্কার। মালার্মে 'ভার্স লিবরে'-র সঙ্গে একাকার করেই বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছিলেন ইমপ্রেশনিজম-এর তাৎপর্য। সুররিয়ালিজম-এর আগে যে দাদাইজম, সেখানেও তার প্রধান স্থপতি দুই কবি, ত্রিস্তান জারা আর হ্যান্‌স্ আর্প। সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের মঞ্চ তো কবিতে কবিতে ছয়লাপ। যাঁরা শিল্পী তাঁরা ছাড়াও, যাঁরা মুখ্য প্রচারক, তাঁরাও। তেমন দুই কবির লুই আরাগঁ আর পল এলুয়ার।

কিন্তু বিষয়টা কবিকে পাওয়া না-পাওয়ার মধ্যেই আটকানো নয়। ইউরোপের নানা দেশের শিল্পী এবং শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে সাহিত্যের আন্দোলন এবং সাহিত্য-কর্মীরা এক অচ্ছেদ্য সংস্পর্শে জড়ানো, এটাই ঘটনা হিসেবে বেশি তাৎপর্যময়। ঐতিহ্যের পরম্পরা থেকেই এটা তাদের উপার্জন।

চিন্তার মননের আর অর্জিত অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই এক শিল্প আরেক শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় যেমন, তেমনি এক শিল্পের সমস্যা, সংকট ও সংগ্রামে আরেক শিল্প এগিয়ে আসে সেখানে সহযোদ্ধার ভঙ্গীকে।

রবীন্দ্রনাথকে সেই কারণেই বিস্ময়কর লাগে এতখানি। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই মেলালেন সংস্কৃতির দুই কুম্ভকে এক বৃত্তে। তাঁর একার নেতৃত্বেই সম্ভব হল সাহিত্য-শিল্পের যুগলমিলন ঘটানো ঐতিহ্য। শিল্পের সাহিত্য-নির্ভরতা অনেককালের পুরনো। রবীন্দ্রনাথ যা ঘটালেন, তা হল সাহিত্যচর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে শিক্ষা ভাবনাকে পিছনের বেঞ্চ থেকে সামনের সারিতে এনে বসিয়ে দেওয়া। আর এই সদ্যজাত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার দায় আমরা প্রত্যক্ষ করলাম পরবর্তী তিরিশ যুগের কবি সাহিত্যিকদের আচরণে। যামিনী রায়কে কেন্দ্র করে, তাঁর শিল্পের নবজাগরণের দিনে, কলকাতায় গড়ে উঠেছিল যে কবি-চক্র, সেখানে দুই সহধর্মী সুহৃদ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুকে পাশে নিয়েই বিষ্ণু দে পালন করে গেলেন প্রধান প্রবক্তার ভূমিকা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র যে নিয়মিত সাংস্কৃতিক আড্ডা, সেখানে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের নিয়মিত আসা-যাওয়া। আর সেখানে অধিকাংশ দিনের আলোচনাতেই বারে বারে এসে গেছে যামিনী রায়ের দুঃসাহসিক চিত্র-চর্চার প্রসঙ্গ। যামিনী রায়কে নিয়ে তাঁদের কেউ কেউ লিখেছেনও কবিতা এবং তাঁর ছবির সমীক্ষাধর্মী দীর্ঘ প্রবন্ধ। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে, রবীন্দ্রনাথ-নন্দলাল পর্বকে সরিয়ে রাখলে, শিল্পী এবং ছবির এমন যুগলবন্দী সহাবস্থান সম্ভব হয়নি আর, যেমন ঘটেছিল যামিনী রায় আর বিষ্ণু দের বেলায়। তাঁদের বয়স-এড়ানো মৈত্রীর নিবিড়তার পিছনে কাজ করে গেছে নিছক কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৌতূহল নয়, পারস্পরিক সমৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনে সমাজজিজ্ঞাসার সমান্তরালে শিল্প-জিজ্ঞাসারও নানা টানা-পোড়েনের উত্তর সন্ধান।

সাহিত্য ও শিল্পের সহাবস্থানের অর্থাৎ শিল্পীও সাহিত্যকর্মীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সেতুবন্ধের শেষ দৃষ্টান্ত সম্ভবত 'ক্যালকাটা গ্রুপ' পর্বে। তারপরই বিপর্যয়, এবং প্রায়ান্ধকার।

কিন্তু এমন ভাবলে বিষয়টাকে খুবই ছোট করে দেখা হবে যে, রবীন্দ্রনাথ যা রচনা করে গেলেন তা সাহিত্য এবং শিল্পের মধ্যে বিভেদ-ঘোচানো গমনাগমনের এক স্বচ্ছন্দ সেতুই শুধু। যে জায়গায় ইউরোপীয় কবি শিল্পীদের

ভিত্তিয় আরো বৃহত্তর বেদীর উপর পেতে দিলেন তিনি শিল্পের আসন, তা শিক্ষা। শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' গড়ে তোলার ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় শিল্পের স্থান নির্ণয়ে তৎপর। পরে যখন 'বিশ্বভারতী' গড়ে উঠল ধীরে ধীরে, কলা আর সঙ্গীতচর্চাকে শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে জুড়ে দিলেন পূর্ণাঙ্গ আকারে। তৈরী হল কলাভবন। এই প্রসঙ্গে শোভনবাবুর মন্তব্য যথার্থই।

"বিচিত্রা স্টুডিয়ো থেকে কলাভবনের বিবর্তন নন্দলালেরও শিল্পদৃষ্টির বিবর্তন। কলাভবনের মুক্ত পাঠ্যসূচী ব্যাতিরেকে রামকিঙ্কর আধুনিককালের মূর্তিকর হতে পারতেন না।"

এরই সঙ্গে যোগ হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথেরও মুক্ত দৃষ্টি। 'সহজ পাঠ'-এর ছবিতে নন্দলাল যখন আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করছেন না কবির দেওয়া তথ্য, অথবা রামকিঙ্কর যখন বহিরাবয়বের সাদৃশ্যকে বর্জন করে নিজের ভাস্কর্যে ঢের বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন চরিত্রের অন্তর্গত মৌন কিন্তু উৎক্ষিপ্ত আভ্যন্তরিক অভিঘাত, রবীন্দ্রনাথের অকাতর প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে তারা শিল্পেরই সত্যানুসন্ধান হিসেবে।

একদিকে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অন্যদিকে বিশ্বের সজীব এবং দুঃসাহসে-ভরা নানামুখী শিল্পবিকাশের সঙ্গে যোগাযোগহীন নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সংকীর্ণ জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ একাই এদেশের শিল্পচর্চার পালে লাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন যতখানি খোলা হাওয়া, শোভনবাবুর এ বইটি থেকে পাঠক পেয়ে যাবেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস ও কার্যকারণ বিশ্লেষণ।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাকি যে তিনটি লেখা, 'বিচিত্রা স্টুডিয়ো থেকে কলাভবন', 'নন্দলাল' আর 'রামকিঙ্কর', সেখানেও রবীন্দ্রনাথই যেন আসল আলোচ্য। সেখানেও সমস্ত আবর্তন-বিবর্তনের কেন্দ্রে তিনিই।

৩.

ব্যক্তি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যেমন এ-বইটির নায়ক বাংলার চিত্রশিল্পের বিশ্বায়নে, স্থান হিসেবেও তেমনি নায়কোচিত সম্মানের চন্দনতিলক পরাতে হয় যে-দেশের ললাটে, তা জাপান।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের শিল্পকলাকেই জাপান এক সময়ে জুগিয়েছে অব্যর্থ মৃতসঞ্জীবনী সুধা, যখন সত্যিই বিশ্বের শিল্পকলাকে গ্রাস করে বসেছিল

স্বাস্থ্যহীনতার ব্যাধি, অথবা স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রচণ্ড আকুতি নিয়ে বিশ্বশিল্প খুঁজে বেড়াচ্ছিল প্রকরণ-উপকরণের সজীব প্রেরণা। শোভনবাবু একেবারে গোড়াতেই, ভূমিকায়, তুলেছেন সে প্রসঙ্গ।

"উনিশ শতকের শেষে জাপানি শিল্পের সংসর্গে যেমন য়োরোপীয় শিল্পের বন্ধ্যা সময়কে উজ্জীবনের বেগ দিয়েছিল, তেমনই জাপানি শিল্পের তুলনামূলক সান্নিধ্যে ভারতীয় সমকালিক শিল্পের ব্যর্থতা রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল।"

এখানে একটা ছোট্ট প্রশ্ন। শোভনবাবু সময়টাকে উনিশ শতকের শেষাংশ হিশেবে চিহ্নিত করলেন কি করে? জাপানি ছাপাই-ছবির চাক্ষুষ সান্নিধ্য থেকে ইউরোপিয় চিত্রকলায় যে যুগান্তকারী ইমপ্রেশনিজমের জন্ম, তার সঠিক জন্মলগ্ন তো ১৮৫৬। যদিও ইমপ্রেশনিস্ট গ্রুপের ঐ নামের লেবেল-আঁটা প্রথম প্রদর্শনীর বছরটা ছিল ১৮৭৪।

'এনজয়িং মডার্ন আর্ট'-এ ঐ সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরকম—

"There was another influence, which came about almost by accident, that at this period affected not only Manet but many of the young painters, the American Whistler among them. It was the sudden carze for Japanese prints. Japan had been opened to the West in 1853 by Commodore Perry of the U. S. Navy. Three years later a small shipment of Japanese procelain reached Paris, with prints by master arist Hokusai used as part of the packing material. These caused such interest, even excitement, among the artists, that an assortment of prints was ordered by another Paris shop frequented by painters and writers. These prints finally arrived in 1862.

এর পাঁচ বছর পরে প্যারিসে বিশ্বমেলা, সেখানে একটা বিশাল মণ্ডপে শুধু জাপানি জিনিষ, সাজপোশাক, পোর্সেলিন আর ছবির প্রিন্ট। মনে, মোনে, হুইসলার, ভ্যান গগ, গঁগ্যা, দেগা, লুত্রেক প্রমুখেরা—'became enthusiastic for things Japanese, incorporating fans, prints, procelain, hangings, and even costumes into their paintings as decrative accents. A few were seriously influ-

enced by the flat-patterned, boldly coloured, two-dimensional technique of Japanese Prints."

এই অল্প কয়েকজনের মধ্যে প্রধান হলেন মানে। যদিও ক্লদ মনে-র 'ইমপ্রেশন, সানরাইজ' ছবি থেকেই 'ইমপ্রেশনিজম' শৈলীর নামকরণ ও মানে-কেই বলা হয়ে থাকে ইমপ্রেশনিস্টদের রাজা। ভিকতর হুগো মালার্মেকে সম্বোধন করেছিলেন এক চিঠিতে 'ইমপ্রেশনিস্ট পোয়েট' উপাধিতে। সেই মালার্মের অনুবাদে এডগার এলেন পো-র 'দি র‍্যাভেন'-এর ইলাশট্রেশন করলেন মানে ১৮৭৫-এ। পরের বছর মালার্মের কবিতা 'ফনের দিবাস্বপ্ন'-র। দুটোতেই জাপানি ছবির প্রভাব। ফন-এর ইলাশটেশনে হকুশাই-এর প্রভাব একেবারে সরাসরি। ঐ বছরেই মালার্মের প্রবন্ধ 'ইমপ্রেশনিস্ট অ্যাণ্ড এদোয়ার্দ মানে'।

ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে জাপানি প্রভাবের ধারা তিন ধরনের। ১। দার্শনিক পথনির্দেশ যা পাওয়া গেছে ওকাকুরার কাছ থেকে। ২। সরাসরি অর্থাৎ হাতে কলমে শিক্ষানবিশি। যা পাওয়া গেছে আরাই কমপো, টাইকান, হিসিদা প্রমুখদের মারফৎ। ৩। প্রত্যক্ষ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের জীবনে। আরো পরে বিনোদবিহারীও। বিনোদ-বিহারীর স্মৃতিচারণায় আমরা পেয়ে যাই শিল্পের দেয়া-নেয়ার এক আশ্চর্য সংবাদ। যে ফরাসি দেশ একদিন জাপানি ছবি থেকেই আহরণ করে নিয়েছিল নিজেদের নতুন করে উর্বর করার উপকরণ, পরের শতাব্দীতে সেই জাপানই মেতে উঠেছিল ফরাসি প্রভাবে।

"আমি গিয়েছিলাম আর্টিস্টদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে এবং জাপানি শিল্পের মর্ম বুঝতে। জাপানি শিল্পীদের মধ্যে 'ইনপ্রেশনিস্টদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। মাতিস-এর প্রভাবে তাঁরা খুব ভাল করেই আয়ত্ত করেছিলেন। এই সময় প্যারিস-ফেরতা অনেক জাপানি নিজের দেশের পরম্পরাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। 'সুররিয়েলিসম' (surrealism) তখন সবেমাত্র টোকিও শহরে দেখা দিয়েছে। তখনো তা জাপানি শিল্পিদের আয়ত্তে আসেনি।"

ভারতবর্ষের শিল্পেও বিশ্বের সঙ্গে দেয়া-নেয়ার পালা চলেছে যুগে যুগে। গুপ্ত যুগ থেকে শুরু। মুসলিম পর্বে ভারতীয় স্থাপত্য আর চিত্রকলার চীন আর পারস্যের প্রবল প্রভাব। এরপর একটা দীর্ঘস্থায়ী বন্ধ্যা সময়। রবীন্দ্র-নাথের হাতে বিশ্বভারতী আর বিশ্বভারতীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কলা-

ভবনের প্রতিষ্ঠার পর আবার খুলে গেল বন্ধ দরজার খিল। পৃথিবীর আলো এসে পড়ল তার প্রাঙ্গনে। কবির ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথমে এলেন স্টেলা ক্রামরিশ, শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসেবে। তাঁর পরে আঁদ্রে কারপেলে কারুকলা শিক্ষার প্রবর্তনে। কলাভবনে কাঠখোদাই মাধ্যমকে শিখিয়ে-পড়িয়ে জনপ্রিয় করলেন। এর পরে মূর্তিকলা শেখাতে লিজা ফন পট আর মিস মিলওয়ার্ড। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন প্যাট্রিক গেডিস, শান্তিনিকেতনের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য গঠনে। এসেছিলেন মেক্সিকোর দেয়ালচিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ক্লাইমান।

আবার অন্যদিকে শান্তিনিকেতন থেকে জাপানে গিয়ে নন্দলাল বসুর ছেলে বিশ্বরূপ বসু শিখে এলেন রঙীন কাঠখোদাই-এর কাজ। প্যারিস আর লণ্ডন বেড়ানোর সময় প্রতিমা দেবী শিখে নিলেন ভিত্তিচিত্র, মৃৎপাত্র আর বাটিকের কাজ। সুরেন্দ্রনাথ কর এক বছরের জন্যে লণ্ডনে গিয়ে শিখে এসেছিলেন বই বাঁধানো আর লিথোগ্রাফ।

এইভাবে বিশ্বশিল্পের সারাৎসার এসে জমা হচ্ছে তখন শান্তিনিকেতনে। প্রতিদিন তরতাজা হয়ে উঠছে শিল্পের বৈভব ও বিকাশ।

এইসব বহুমুখী শিল্পধারাকে আত্মস্থ করে নন্দলাল কীভাবে ক্রমাগত প্রসারিত করে গেছেন তাঁর পুনরাবৃত্তিহীন ব্যাপ্ত শিল্পলোক, তার খানিকটা ছবি তুলে ধরতে চাইছি এখানে শোভনবাবুরই 'নন্দলাল' রচনা থেকে।

১। উনিশ শ ষোলোয় বিচিত্রা স্টুডিয়োতে যোগ। আরাই কাম্পোর কাছে জাপানি কালিতুলির করণকৌশল শেখা।

২। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন জাপান ভ্রমণকালে চীনা জাপানি ছবির তুলির চলন, ক্ষেত্রবিভাজন ও ব্যবহার রপ্ত করা।

৩। ধ্রুপদী তত্ত্বানুসন্ধান সূত্রে আসীরিয়, মিশরীয় ও গ্রীক থেকে ইমপ্রেশনিজম, একস্প্রেশানিজম বাংলার টেরাকোটা পট সবার নানা উপাদানের অভূতপূর্ব সমন্বয়।

৪। উনিশ শ আঠাশে, প্রথম হলকর্ষণ উৎসবের স্মরণে শ্রীনিকেতনে বিশেষভাবে তৈরি এক উন্মুক্ত দেয়ালে ইতালির ফ্রেসকো বুয়োনো পদ্ধতিতে হলকর্ষণ বিষয়ে ভিত্তিচিত্র।

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানির একস্প্রেসনিস্ট শিল্পীদের তৈরি কাঠখোদাই-এর সমকালিক ধারাকে শান্তিনিকেতনে আনলেন আঁদ্রে

কারপেলে। নন্দলাল-এর 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগের অলঙ্করণে এক্সপ্রেশানিস্ট কাঠখোদাই-এর গুণ।

৬। উনিশশ একত্রিশে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত, বসন্ত সিরিজের ছবিতে চওড়া চ্যাপ্টা তুলিতে অনচ্ছ রঙের ছোপ, দুই পাশাপাশি রঙের মাঝখান থেকে বিভাজন রেখা তুলে নেওয়ার ফলে ইমপ্রেশনিস্ট ছবির আদল।

৭। ইতালির পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের নিও-প্লেটোনিক চিত্রকর সান্দ্রো বতিচেল্লির ছবির ভরহীন অতিমানবিক আভায় উদ্ভাসিত প্রলম্বিত অবয়বের মতোই রোমান্টিক আবহ 'গরুড়স্তম্ভমূলে চৈতন্য' ছাবতে।

৮। 'শবরী' পর্বের 'জলন্ত পাইন' নামের ছোপের ছবিতেও ইমপ্রেশানিস্ট ছবির চাল।

৯। উনিশশো চুয়ান্ন থেকে শাদা পটে কালো কালির পর্দা বিন্যাসে জাপানি জেন বৌদ্ধ শিল্পীদের তুলির স্বতঃচলন।

এই অল্প কয়েকটি বাছাই-করা দৃষ্টান্ত থেকে, চির-অন্বেষী নন্দলালের সিদ্ধি-সার্থকতার সমান্তরালে আমরা বুঝে নিতে পারবো রবীন্দ্রনাথেরও কলাভবন সৃষ্টির সিদ্ধি সার্থকতা।

প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য, দেশ-দেশান্তরের বহু বিচিত্র শিল্পধারাকে আত্মীকরণের জোরদার সাহসে নিজের স্টাইলের অন্তর্গত করে নেওয়ার এই ব্রতপালনের উত্তরাধিকার গুরু নন্দলাল থেকে বর্তেছিল শিষ্য রামকিঙ্করে।

শান্তিনিকেতনের নিয়মহীন নিয়মের জগতে তো বটেই, বাংলা এমনকি ভারতীয় শিল্পকলার জগতেও, রামকিঙ্কর এমন একজন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন শিল্পী, যাঁর কোনো পূর্বপুরুষ নেই যেন। হঠাৎ-গাওয়া বাল্মিকীর ছন্দের মতই মনে হয় তাঁর সৃষ্টির উল্লাসিত উত্থান, আপন প্রাণের বেগে। তাঁর ভাস্কর্য যেন প্রাকৃতিক, আম বা শালের চারার সঙ্গেই একদিন বড় হয়ে উঠেছে তারা। মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যকে যিনি সাজিয়ে দিলেন এমন নজীর-বিহীন নবীনতায়, সেই রামকিঙ্কর, ভাবলে বিস্ময় থৈ পায় না, মূলত স্বশিক্ষিত ভাস্কর।

শোভনবাবু তত্ত্বে-তথ্যে সেই রামকিঙ্করকেই চিনিয়ে দেন আমাদের, যিনি আধুনিক বিশ্বের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমগ্ন অনুশীলন সত্ত্বেও, নিজের সৃষ্টিকে উত্‌রিয়ে দিতে পারেন এক পূর্বাপর-হারা সৌন্দর্যে, সৌন্দর্যেরও মেনে-আসা পরিধিকে ভেঙে আরো প্রসারিত করে দিয়ে।

শোভনবাবু রচনা থেকে তারই কিছু নিদর্শন—

১। দেয়ালে যা লেগে নেই অথচ পরিবেশে যা মানিয়ে যায়, এমন এক

বিশেষ ধরনের মূর্তির পরিকল্পনাকালে রামকিঙ্কর কিউবিজমের স্টিরিয়ো ভিজুয়্যাল রিলেশনশিপ বিটুইন স্পেশ অ্যাণ্ড প্লেইন বা পরিবেশের সঙ্গে ঘনত্ব ও ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের সম্বন্ধ সূত্র স্বাভাবিকভাবেই অনুশীলন করেছিলেন। আবেগকে ইনটেলেকচুয়াল স্কিমিং বা মননশীল পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি কিউবিজমের দিকে তাকিয়েছিলেন।

২। জল রঙের স্বচ্ছতাকে সাবলীল খেলার মত পটে ছড়িয়ে যে ভাবে তুলির কঠিন পিছন দিক দিয়ে ইণ্ডিয়া কালির দ্রুতিময় সাঙ্কেতিক কয়েকটি রেখায় অবয়ব ও রূপের ছন্দোময়তা স্পষ্ট করতেন তার নজির আগে দেখা যায়নি।

৩। ···রামকিঙ্করের মূর্তিকলা ছিল একই সঙ্গে অর্বাচীন ও আদিম। পেলব ভঙ্গুর সৌন্দর্যের চেয়ে মাটি থেকে উঠে আসা, মাটি থেকে পাওয়া উপাদান কাঁকরের অমসৃণ আদিমতা তাঁর মূর্তিকে এক আলাদা চরিত্র নিয়েছিল। দৃঢ় টান সম্পন্ন এক আদিম শক্তি যেন তাঁর মূর্তির রূপের নিয়ামক ছিল। স্টুডিয়োতে তৈরী করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে তিনি মূর্তি বসান নি। যেখানে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে এগুলি তৈরি হয়েছে।"

৪। "রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রতিকৃতির মধ্যে প্রথমটি উনিশশো আটত্রিশে ও দ্বিতীয়টি উনিশশো একচল্লিশে করা। প্রথমটি যেন শুব্ধ জড়ীভূত তিরস্কাভিঘাত। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে কনস্ট্রাকটিভিজম্ দ্বারা প্রভাবিত মনে হতে পারে, তবে তত্ত্বগতভাবে এটিতে কনস্ট্রাকটিভিস্ট দর্শন প্রতিফলিত হয় নি। আঙ্গিকগত সাম্য এখানে সমাপতন মাত্র।"

৫। "মূর্তি যে সাদৃশ্যের বর্ণনা মাত্র নয়, উপকরণ ও আঙ্গিকের সুষ্ঠু ব্যবহারে তা-যে এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে, এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে ভাবের আকারগত রূপান্তরন, এই কথা আধুনিক মূর্তিকারদের মধ্যে এদেশে রামকিঙ্করই সবচেয়ে আগে বুঝেছিলেন। এদেশে আধুনিক মূর্তিকলাকে প্রথার জড়ত্ব থেকে তিনিই মুক্ত করেছিলেন।"

পাঠকের মনে ঔৎসুক্য উসকিয়ে দেবার প্রয়োজনেই এসব উদ্ধৃতি। পুরো প্রবন্ধটি পড়লে পাঠক আরো বড় মাপের রামকিঙ্করের মুখোমুখি হবেন।

অবশ্য যে পাঠক রবীন্দ্রনাথ-নন্দলাল ও রামকিঙ্করের শিল্পরচনার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন তেমন, অথবা স্বল্পপরিচিত, তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে একটাই অসুবিধে। শোভনবাবু এ বইয়ে নন্দলাল এবং রামকিঙ্করের বেলায়

স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ম ধরে ধরে বিশ্লেষণ করেছেন, আবার তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন কয়েক জায়গায় একই শিল্পীর দুটি পৃথক সৃজনের। এক্ষেত্রে ছবির নমুনা-নিদর্শন চোখের সামনে হাজির না-থাকলে, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার অভাবেই; পঠিত বাক্য বা ধারণা হয়ে উঠতে পারে না অভিজ্ঞতার অংশ। অন্তত বিশেষ কয়েকটি ছবির বা মূর্তির নমুনা এ-বইটিতে থাকা নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল সেই কারণে।

৫.

শোভনবাবুর এ-বইটির মুগ্ধ পাঠক হিসেবে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপনের পরও না তুলে উপায় নেই দুটো একটা খট্‌কার কথা।

উনিশ শতকের রেনেশান্স আমাদের কাছে অধুনা অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই মতো। যে-যার নিজস্ব ধরনে দেখার গণ্ডীকে সংকীর্ণ করে এনে তত্ত্বকথার দাপটে যখন খুশি তাঁকে বানিয়ে দিতে পারে উপনিষদের কবি, অথবা উন্মার্গের অথবা ইংরেজ-করুণাপ্রার্থী কবি, অথবা যত না বাস্তবতার তার চেয়ে বেশি রোমান্টিকতার কবি, অথবা মননের কবি নন—অনুভবরের কবি ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতি আধুনিক, অতি-সমাজসচেতন এবং অতি-বিপ্লবীয়ানায় বিশ্বাসী কারো কারো কাছে এক উপাদেয় বলির পাঁঠার মতই হয়ে উঠেছে এখন এই উনিশ শতক, কোপ বসানোর নানা ফাঁক-ফোঁকর খানিকটা সহজলভ্য বলেই হয়তো।

শোভনবাবুর এ-বইটি আগাগোড়া এই জাতীয় কৃত্রিম উনবিংশ-বিরোধিতা-বর্জিত বলেই ভীষণ রকম বেসুরো ঠেকে একেবারে প্রথম রচনার প্রথম পাতার অংশবিশেষ। আর তখনই অবাক হয়ে ভাবতে হয়, তাঁর অমন সবল স্বচ্ছন্দ হাঁটাও কিনা, যদিও মাত্র এক পলকের জন্যে, ছন্দ হারাল ঐ চোরা গর্তে পা ফেলে। একেবারে প্রথম রচনার প্রথম পাতায় তিনি লিখেছেন

"আমাদের তথাকথিত রেনেশাঁসে শিল্পবোধ ও শিল্পচর্চা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিল। আমাদের মণীষা এ বিষয়ে কেবল উদাসীন ছিলেন না, ছিলেন অপরিসীম অজ্ঞ।"

ঠিক এর পরের লাইনেই, অনেকটা প্রমাণ হিসেবে—

"বিবেকানন্দের মত দেশপ্রেমিক সারা দেশ পরিক্রমা করেও এদেশের

প্রাচীন শিল্পসম্ভার হয় দেখেন নি, কিংবা দেখলেও এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য' বইয়ের একেবারে শেষে তিনি আলটপ্‌কা মন্তব্য করলেন, বললেন 'ওদের' অর্থাৎ পাশ্চাত্যের 'মতো চিত্র বা ভাস্কর্যবিদ্যা হতে আমাদের এখনও অনেক দেরী। ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু।' 'ইউরোপী ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতি প্রকাণ্ড বিষয়'-এর তৌলে তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি তৎকালীন বাংলা পত্রপত্রিকায় য়োরোপের এমন কি নিকৃষ্ট মনের ছবি মূর্তির মুগ্ধবোধ আলোচনা পাওয়া যায়।"

রেনেশাঁসের সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলায় কার কতখানি শিল্প-বোধ ছিল বা ছিল না, তার মাত্রানিরূপণের কূটতর্কে জড়ানোর ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এদেশে ঐ সময়ে কী ঘটছে তারই অল্প একটু আভাস তুলে ধরতে চাইছি এখানে, যা থেকে ঐ সময়ের মণীষা, শিল্প সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞ থাকলেও, কখনো যে অপরিসীমরূপে অজ্ঞ ছিলেন না, এবং শিল্পচর্চা যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিতও ছিল না, তার অন্তত যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ মিলবে তার।

১৮৩৬। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে সাহেব-মেমদের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণের সময়ই অতিথিদের জানিয়ে দিয়েছিলেন দুটো বিষয়ের যার যেটা পছন্দ সঙ্গে আনতে হবে তার সরঞ্জাম। বিষয় দুটো ছবি আঁকা আর গান। ছবি আঁকার বেলার রঙ, তুলি, ক্যানভাস, ইজেল। গানের বেলায় শুধু পছন্দমত ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরলিপির বই। বাজনাবাদ্যি সঙ্গে আনার প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু সেসব আগেই ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর।

এরপর কি ঘটেছিল এমিলি ইডেনের চিঠি থেকেই শোনা যাক।

"দ্বারকানাথ তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের সবচেয়ে সেরা ছবি বের করে দিয়েছিলেন, চিত্রকরেরা যাতে কপি করতে পারেন। আর ছিল সবরকম বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীত-প্রেমীদের জন্য। একজন করে পেশাদার চিত্রকর ও সঙ্গীত শিল্পী হাজির ছিলেন অতিথিদের নিজ নিজ পছন্দসই কাজ চালু করার মদত দিতে। অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ কেউ গান গাইলেন, কেউ বাজালেন বাঁশি, কেউবা বেহালা ইত্যাদি। ক্যাপ্‌টেন স্বয়ং প্রাউট-এর একটি ছবির নিপুণ নকল খাড়া করেছিলেন।"

বেলগাছিয়া ভিলায়, একাধিকবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন এমিলি ইডেন। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"খাঁটি ইংরাজি ধরনে ভিলাটি নির্মিত ; বিলিয়র্ড রুম আছে, প্রদর্শনীকক্ষে

বেশ কিছু চিত্রী ও ভাস্করের কাজের নমুনা দেখা যায়; তাছাড়াও আছে কোপলে, ফিন্ডিংদের ও প্রাউটদের কাজ এবং ফরাসী সেরামিক।"

১৮৪১। প্রথমবারের বিলেত যাত্রার সময় বেলগাছিয়া ভিলা আর তার ভিতরের যাবতীয় শিল্পসামগ্রী বেচে দেওয়ার কথা হয়তো কোনো একসময় ভেবে থাকবেন দ্বারকানাথ। কেননা ঐ বছরের ২৫ ডিসেম্বরের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় বেলগাছিয়া ভিলার ছবি, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য বহুমূল্য সামগ্রী নীলামে ওঠার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ—

"যেসব মহামূল্য সামগ্রী এই একটি মনোরম স্থানে—এই পরীদের রাজ্যে দ্বারকানাথ সমাহৃত করেছেন, সে-সমস্তই কি বাকপটু নীলামদারের হাতুড়ির ঘায়ে বিকিয়ে যাবে, সর্বোচ্চ দাম যে হাঁকবে তার কাছে, জলের দরে?"

১৮৫৪। কলকাতায় 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' নামের বেসরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের জন্ম। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উৎসাহী বাঙালীরা হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী প্রমুখ।

১৮৬৪। সরকারের হাতে আসার পর এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নাম, 'গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট'। প্রথম প্রিন্সিপাল হেনরি হোভার লক।

১৮৭৫। ছেপে বেরল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা'র প্রথম খণ্ড। ভিতরে ৩৬টা লিথোগ্রাফ, আর ৫০টা কাঠখোদাই। শিল্পীরা সকলেই লকের হাতে-গড়া কৃতি বাঙালী ছাত্র। তাদের মধ্যে ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, গোপালচন্দ্র পাল, হরিশচন্দ্র খাঁ, উদয়চাঁদ সামন্ত প্রমুখ।

ঐ বইয়ের মুখবন্ধে লক-এর উদার সাহায্য-সহযোগিতার প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন অন্নদাপ্রসাদের কথা।

"When I was proceeding of my tour, he placed at my disposal the services of one of his best pupils, Annadaprasad Bagchi, who accompanied me to Orisa, and took sketches and plans of a large number of interesting objects."

১৮৭০। 'ন্যাশনাল মিটিং'-এর উদ্যোগে ক্যালকাটা ট্রেনিং আকাদেমিতে শ্যামাচরণ শ্রীমানী যে বক্তৃতামালার আয়োজন করেছিলেন সেখানে ১৯ নভেম্বরের অনুষ্ঠানে ভারতশিল্প বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শ্যামাচরণ শ্রীমানীর বক্তৃতা।

১৮৭২। হিন্দুমেলার প্রদর্শনীর জন্যে যে 'আর্ট সাব কমিটি', তার সদস্য

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রমুখ। ঐ বছরেই 'ন্যাশনাল স্কুলে' শুরু হয়ে যায় চারুকলা বিভাগ।

১৮৭৪—'আর্যজাতির শিল্পচাতুরি' লিখলেন শ্যামাচরণ শ্রীমানী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচন'-এর মধ্যে রয়েছে এই বইটিকে কেন্দ্র করে একটি প্রবন্ধ 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প'।

১৮৭১। কলকাতায় প্রথম আয়োজিত হল সর্বভারতীয় চারুকলার প্রদর্শনী।

১৮৭৪। আবার ঐ প্রদর্শনী।

১৮৮৫। বেরল চারুকলার প্রথম সাময়িক পত্র 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি', পরিচালক মণ্ডলীতে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শরৎচন্দ্র দেব, কালিদাস পাল, বিহারীলাল রায়, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯৪। রোমের 'রয়াল আকাদেমি'-তে ভর্তি হলেন শশীকুমার হেশ। শশীকুমারের অনুরাগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি নিজেও শিল্পী। প্রতিকৃতি আঁকায় অসম্ভব তাঁর পারদর্শিতা। শশীকুমার তাঁর মারফতই আমন্ত্রণ পেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৈলচিত্রের জন্যে। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তিনি।

এই ঠাকুরবাড়িতে লেখাপড়ার সঙ্গে কুস্তি লাঠিখেলা ইত্যাদি ব্যায়ামের মতোই অবশ্য-পালনীয় ছিল ছবি আঁকাও। রবীন্দ্রনাথকেও যে এ-নিয়ম মেনে চলতে হয়েছে বাল্যকালে, শৈশব-স্মৃতিচারণায় সে খবর নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের।

উনিশ শতকের মনীষা যে শিল্প-কানা ছিল না তার আভাসকে স্পষ্ট করে তোলার পক্ষে এই অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। আবার এমনও নয় যে শিল্পচর্চার এই প্রারম্ভিক পর্বে তাঁরা অসচেতন ছিলেন এইসব উদ্বুদ্ধ প্রয়াসেরও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। তা যে ছিলেন না তার স্বপক্ষে দুটি খেদোক্তি উদ্ধৃতি করছি এখানে।

"কিন্তু হায় তাঁহার আশা কতদূর সফল হইল। সেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আসিয়া যে মহাত্মা আমাদের শিল্প-শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন তাঁহার সেই মহৎ আশা আমরা কতদূর পূর্ণ করিলাম।"

এই উক্তি অবনীন্দ্রনাথের, মহাত্মারূপে পরিচিত হেনরি লকের পরলোক-গমনের পরে।

"সৌন্দর্যবিচার শক্তি, সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনসুখ বুঝি বিধাতা বাঙালির কপালে লিখেন নাই।"

এটি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'আর্যজাতির শিল্পচাতুরী' বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে।

জীবিত থাকলে আজকের এই ১৯৮৭-তেও ঐ একই ব্যথিত-বচনের আরও তীব্রতর পুনরুক্তি ঘটাতে হত এঁদের। কারণ, উনিশ শতকের সেই পুরোপুরি ঔপনিবেশিকতা-আক্রান্ত সময়ে বাঙালীর মণীষাকে নিজেদের আইডেনটিটির অন্বেষণে যে বিপুল প্রতিবন্ধকতা ঠেলে একই সঙ্গে ঝুঁকতে হয়েছিল পাশ্চাত্য শিল্পের পাঠে আর ভারতীয় শিল্পের পাঠোদ্ধারে, পরের শতাব্দী তাকে পৌঁছে দিতে পারে নি সার্থকতার এমন বিন্দুতে যে গলা ছেড়ে বলা যাবে শিল্পবোধ এখন দেশের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। কিংবা বিংশশতাব্দীর মনীষা শিল্পকলা বিষয়ে অপরিসীমরূপে প্রাজ্ঞ।

বরং উনিশ শতকের মনীষার সঙ্গে বিশ শতকের মণীষার তফাতটা এখন হয়ে উঠেছে দূর থেকে চোখে পড়ার মতই জ্বলজ্বলে। উনিশ শতকের মনীষাকে সব কিছুই গড়তে হয়েছে নিজেদের উদ্যমে, নিজেদের হাতে, নিজেদের শ্রমে ও শক্তিতে। তাই সীমাবদ্ধতা সেখানে স্বাভাবিক এবং সে সীমাবদ্ধতাও অগ্রগতির অংশ। বিশ শতকের মনীষা স্বহস্তে, স্বকীয় উদ্যমে কোনো কিছু গড়ার দায়বদ্ধতা থেকে নির্ঝঞ্ঝাটরূপে মুক্ত। উনিশ শতক ছিল বহুলাংশে আত্মনির্ভর। বিশ শতক হয় সংস্থা নয় সরকার-নির্ভর।

বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক এবার।

শোভনবাবু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা ঠিকই। কিন্তু তিনি সম্ভবত ঐ বইটি ছাড়া বিবেকানন্দের আর কোনো রচনার দিকে চোখ মেলবার মত সময় করে উঠতে পারেন নি। পারলে তাঁর চোখে পড়ত নিশ্চয়ই ১৮৯৭-এর ৩ জানুয়ারি মেরী হেলকে লেখা সেই চিঠি যেখানে তিনি আলোচনা করছেন ভারতবর্ষ আর ইউরোপের প্রাচীন শিল্প বিষয়ে আর সেই সঙ্গে স্বীকার করছেন নিজের আগের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা।

"মিস লককে বোলো, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম 'মানবমূর্তির ভাস্কর্যসৃষ্টির ক্ষমতা গ্রীকদের তুল্য ভারতীয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি'—আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গুসন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের যে সব গ্রন্থ এখন পড়ছি পড়ে দেখছি উড়িষ্যায় (যেখানে আমার যাওয়া হয়নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের নৈপুণ্যে সেগুলি যে কোন গ্রীকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়।..."

১৯০৬-এ ম্যাক্সমুলার সঙ্গে বিবেকানন্দের আলোচনার বিষয় ছিল ভারতীয়

স্থাপত্য। সেখানেই প্রসঙ্গক্রমে এসে গেল ভারতীয় ভাস্কর্য। ভারতবর্ষ হয়তো গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, ম্যাক্সমুলারের এই মন্তব্যের বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন উত্তরে, তা জানতে পারি শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সেনের প্রবন্ধ থেকে।

"যদি গ্রীকদের ভারতে নিছক উপস্থিতিই ভারতীয় স্থাপত্যের উপর তাদের প্রভাবের একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহলে সেই একই যুক্তি ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায়, গ্রীকশিল্প ভারতের কাছে ঋণী। বৌদ্ধযুগের শিল্পের সঙ্গে গ্রীক-শিল্পের কোনো সাদৃশ্য নেই। গ্রীকরা বহির্বস্তুর রূপায়ণে চরম পারদর্শী। আর ভারতীয় ভাস্কর্য অন্তঃপ্রকৃতির উদ্‌ঘাটনে ইচ্ছুক, তার জন্যে বাস্তবতাকে বলি দিতেও প্রস্তুত। শারীর সংস্থানের খুঁটিনাটি রূপায়নে গ্রীকরা অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন; অপরপক্ষে ভারতীয়রা তাকে প্রায় কোনো মূল্য না দিয়ে মানসিক অবস্থাকে উন্মোচন করতে ব্রতী। ভারতে প্রাচীনকালে প্রতি ভাস্করই নিপুণ শিল্পী; গয়া জেলায় তার সাক্ষ্য এখনো মিলবে। গয়ার কিছু মন্দির নির্মাণের সময়ে অযোধ্যা থেকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভাস্কর-মিস্ত্রী আনা হয়েছিল, যাদের বংশধরেরা এখনো সেই জেলার গ্রামে বাস করে এবং একই বৃত্তিধারী হয়ে আছে। যদি গ্রীকরা আমাদের স্থাপত্য শিখিয়ে থাকে, তাহলে তারা আমাদের ভাস্কর্যের দোষগুলি সংশোধন করল না কেন, যখন দেখলে ভারতীয় স্থাপত্য ঢাকা পড়ে আছে মূর্তিতে?"

ম্যাকসমূলার যা বলছেন, তা অনেকটাই ফার্গুসনের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দ যা বলছেন, তা ফার্গুসনের একমাত্র ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দীর্ঘ শ্রমসাধ্য গবেষণায় প্রভাবিত। ফার্গুসন বনাম রাজেন্দ্রলাল বিতর্ক ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। বিবেকানন্দ সে বিতর্ক খুঁটিয়ে পড়েছিলেন।

ভারতীয় স্থাপত্য অথবা ভাস্কর্য অথবা চিত্রকলাই নয় শুধু, ভারতের ও বাংলার গ্রামীন ও লোকায়ত শিল্প সম্বন্ধে অজস্র মন্তব্য ছড়ানো রয়েছে তাঁর নিজের ও তাঁর সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক রচনায়। হয়তো আমাদের মনে নেই যে, বিবেকানন্দের আগে রবি বর্মার ছবি সম্পর্কে দেশজোড়া মুগ্ধতাবোধকে ঘা মারতে সাহস দেখান নি আর কেউ। তাঁর বহু বক্তৃতার ভাষা ও ভাষ্য হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো যথাসময়ে যথাযথ অনুলেখনের অনুৎসাহে। ১৮৯৪-য় আমেরিকায় মেম্ফিস শহরে 'ভারতে আচার-ব্যবহার ও রাজনীতি' বিষয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে ছিল ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের গৌরবময়

সৃষ্টিশীলতার প্রসঙ্গ। সে-ভাবণের পরিবর্তে এখন আমাদের সম্বল 'অ্যাপ্রীল আভালেঞ্চ' নামের পত্রিকার বেরনো এইটুকু সংবাদ—

"His description of the ancient mausoleums and temples were beautiful beyond comparison, and goes to show that the ancient possessed scientific knowledge far superior to the most artisan of the present day."

শোভনবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে যে উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন তাঁর রচনায়, তা আংশিক। আর এই আংশিকতার ফলে পাঠক প্রতারিত হতে পারেন সহজেই। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিতে আমরা যা পাই তা ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণের জন্যে এক অস্থির আতুরতাই বরং।

শোভনবাবু উদ্ধৃতিতে যা নেই, সেই অনুক্ত অংশটির দিকে তাকানো যাক।

"আমাদের ঠাকুর-দেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম। বড় জোর ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি -করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবি বর্মা-ফর্মা চিত্রী দেখলে লজ্জায় মাথা যায়। বরং জয়পুরে সোনালি চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।"

এই কথাগুলো যাঁর তিনি শিল্পের তাৎপর্য উপলব্ধিতে অক্ষম, এমন ধারনায় পৌঁছতে সত্যিই সাহায্য করে কি আমাদের? বরং গোটা রচনাটা পড়লে যে-কোনো বুদ্ধিমান পাঠক এটুকু বুঝতে পেরে যান যে, তাঁর আক্রমণের এবং অভিযোগের লক্ষ্য শহুরে শিল্পচর্চার না-ঘরকা না-ঘাটকা অন্তঃসারশূন্যতা। ঐ প্রবন্ধেই তাই তাঁকে লিখতে হয়—

"ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায় নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়িরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত, বাহার করে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্প-চাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোতে গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরনোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্য-চচ্চড়ি! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনো দূর পাড়াগাঁয়ে পুরনো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এস গে। কলকাতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না। দোর কি আগড় বোঝবার উপায় নেই। কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলেতী যন্ত্র কেনা। এই অবস্থা সর্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের যা ছিল, তা তো সব

যাচ্ছে, অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাক্যি-যন্ত্রণা মাত্র। খালি পুঁথি পড়ছ আর পুঁথি পড়ছ। আমাদের বাঙালী আর বিলেতে আইরিশ, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকবক করছে।"

এই অনুরাগ-প্রধান বিক্ষোভ কি প্রমাণ করে যে তিনি শিল্পবোধ বিবর্জিত আর স্বদেশী শিল্পের চেয়ে বিদেশী শিল্পের প্রতি তাঁর যুক্তিহীন পক্ষপাত ?

আর ইউরোপীয় ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির প্রসঙ্গে 'সে এক প্রকাণ্ড বিষয়' বিবেকানন্দের এই উচ্চারণ কেন যে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ইউরোপের নিকৃষ্ট মানের ছবি সম্পর্কেও মুগ্ধবোধ জাগিতে তুলতে সাহায্য করবে, তার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

ইউরোপের শিল্প তো সত্যিই এক প্রকাণ্ড বিষয়। তা না হলে শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথকেই বা কেন ডেকে আনতে হবে স্টেলা ক্রামরিশকে? আর স্টেলা ক্রামরিশকেই বা কেন আলোচনা করতে হবে টিশিয়ান, ডুরার, রেমব্রান্ট থেকে ইমপ্রেশনিজম আর কিউবিজম? কেন আঁদ্রে কারপেলে শান্তিনিকেতনে এসে শেখাবেন ইউরোপীয় কাঠখোদাই? কেনই বা কলকাতায় প্রদর্শনী করতে হবে জার্মান একস্‌প্রেশনিস্টদের? কলাভবনের লাইব্রেরীতে কেনই জমা হবে ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বের সচিত্র বইপত্র? কেনই বা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতে হয় দৌহিত্র নীতুর কাছে—"জার্মানীতে Art magazine যা বেরোয়, তারই দুটো একটার গ্রাহক হতে চাই। কত দাম লাগে জানালে পাঠিয়ে দোব।"

আর বিবেকানন্দের অনেক পরে রবীন্দ্রনাথই বা কেন বলেন—"য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে; ···আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্‌বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে।"

বিবেকানন্দ শিল্পটা যে বুঝতেন, জানতেন তার সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি এবং নন্দলালের শ্রদ্ধার্ঘে। তাঁর বিবেকানন্দ

"শিল্পে বহুদিনের জটিল ম্যানারিজমকে কঠোর আঘাত করেছেন। আগতকালের শিল্প তাঁর বাণী অনুসরণ করে আবার সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে। শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর আইডিয়াল শিল্পের backbone-এর মত।"

আলোচনা করার মত আরো দুটো-একটা প্রশ্ন

১। নন্দলাল ধর্মীয় প্রতীকগুলোকে সরিয়ে আলপনায় পঞ্চশস্য, কুমড়ি, গেরি, এলা প্রভৃতির ব্যবহার ঘটিয়ে বিস্তৃতি ঘটিয়ে দিয়েছিলেন

আলপনার। এবং তা শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দি অতিক্রম করে গৃহীত হয়েছে দেশের সার্বিক উৎসবে। এ পর্যন্ত একমত হওয়া গেল শোভনবাবুর সঙ্গে। কিন্তু এর পরেই তিনি লিখছেন—

"যে আলপনা ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ ছিল, তা এভাবে লোকায়ত হয়ে ওঠে"।

তাহলে স্বীকার করতে হয় যে আজ গোটা বাংলাদেশে নন্দলাল বসুর ছকে-যাওয়া আলপনারই চল? এবং সেটাই লোকায়ত? তাহলে আসল আলপনার বিশেষন কি দাঁড়াবে? অভিজাত?

আর এ-তথ্যই বা শোভনবাবু কোথায় পেলেন যে প্রাচীন আলপনা ছিল ধর্মীয় প্রতীকে কণ্টকিত? চিরুনী, ঢেকী, কাজললতা, আয়না, তাবিজ, পাশা, হাঁসুলি, বাজু, নথ, গাছ, মাছ এসবও কি ধর্মীয় প্রতীক নাকি? তথাকথিত ধর্মীয় প্রতীকের কোনো রকম ব্যবহার ঘটেনি, এমন অজস্র আলপনার অস্তিত্ব কি জানা নেই আমাদের? শঙ্খলতা, খেয়েলতা, খুন্তিলতা, কলমিলতা, বাউটিলতা, মুক্তালতা, দোপাটিলতা, এসবেও কি ধর্মের অনুপ্রবেশ? আবার একটু খোঁজ নিলে এও জানা যাবে আলপনায় ফুলখড়ি, গেরি, এলা মাটির মতো, পঞ্চশস্যের মতো, হলুদ গুঁড়ো, রঙীন আবীর ইত্যাদির ব্যবহারটাও আমাদের এই বাংলায় এবং ভারতবর্ষে অনেককালের প্রাচীন। নন্দলাল এই প্রাচীন আলপনায় যা যোগ করতে চেয়েছিলেন প্রধানত, তা আধুনিক সফিসটিকেশন।

২। অতীত মহিমার কীর্তনে জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়ার কারণেই শোভনবাবুর মতে নন্দলালের—

"'সতী' ছবিতে একটি ঘৃণ্য কুপ্রথাও আদর্শায়িত হয়ে নিবেদিতা কর্তৃক এশীয় নারীত্বের মহিমা হিশাবে অভিনন্দিত হয়।"

কোনো বিশেষ সময়ে কে কোন্ ছবির কি ব্যাখ্যা করে তার উপর আসল ছবির গুণ বা মান যে নির্ভর করে, পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসে তার উদাহরণ হাজার হাজার। আগুনের সামনে বা ভিতরে কোনো নারী মানেই তা সতীদাহের সমগোত্রীয় ঘৃণ্য সংস্কারের প্রতীক হয়ে উঠবে, এই ভাবনাটাই বরং সতীদাহের মতো মারাত্মক ক্ষতিকারক কুসংস্কার।

তিন শিল্পী। শোভন সোম। বাণীশিল্প। ৩০ টাকা।

জন্মশতবর্ষে যামিনী রায়

অরুণ সেন

যে-কোনো বড় শিল্পীর জন্মশতবর্ষ লেখালেখির জগতে উদ্‌যাপিত হতে পারে দু-ভাবে : এক, সেই শিল্পীর স্বীকৃতির ইতিহাস, সমালোচনার ইতিহাস—তার ধারাবাহিকতার ডকুমেণ্টেশন। দুই, পরবর্তী প্রজন্মের উপর তাঁর প্রভাব এবং শিল্পীর সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার বিচার।

যামিনী রায় সূত্রে এই দুটি কাজের কোনোটিই সঠিকভাবে এখনো করা হয়েছে এমন বলা যায় না। তাই জন্মশতবর্ষে আমাদের দায় আরো বেড়ে যায়। যামিনী রায় শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি এবং বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যাণ্ড কালচারের যুগ্ম উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী উপলক্ষে যে গ্রন্থটি সম্প্রতি বেরিয়েছে 'দি আর্ট অব যামিনী রায়' নামে, তার বিষয়সূচি দেখে মনে হয় সমালোচনার ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করতেই চেয়েছেন উদ্যোক্তারা—যদিও কার্যত তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে এবং ধারাবাহিকও নয় ততটা।

শহিদ সুরাওয়ার্দি-র লেখা 'এ সর্ট নোট অন দি আর্ট অব যামিনী রায়'-কেই এ বিষয়ে লেখা প্রথম প্রবন্ধ বলে সাধারণত ধরা হয়ে থাকে। এটি বেরিয়েছিল যামিনী রায়ের ১৯৩৭ সালের একটি প্রদর্শনী উপলক্ষে। কিন্তু তার আগেই ১৯৩৩-এ শান্তা দেবী যামিনী রায়ের বাড়ির এক প্রদর্শনী দেখে সমালোচনা লিখেছিলেন 'প্রবাসী'-তে (বৈশাখ ১৩৩৯)। নিছক প্রদর্শনীর বিবরণী নয়, রচনাটিতে শিল্পী সম্পর্কে বেশ কিছু প্রণিধানযোগ্য এবং গ্রাহ্য

কথা বলেছিলেন শান্তা দেবী। যামিনী রায়ের ছবির রূপ ও রূপান্তর প্রসঙ্গে স্পষ্টভাষায় সেকালের নিতান্তই অপ্রস্তুত পাঠককে অতকাল আগে ওই প্রবন্ধেই তিনি জানাতে পেরেছিলেনঃ যদিও যামিনী রায়ের "চিত্রগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি বাংলার পট-অঙ্কনের পদ্ধতির মতো"—কিন্তু তা মোটেই পটের সঙ্গে তুলনীয় নয়, "তাহার সহিত পটের সাদৃশ্য আছে মাত্র"। বরং যার কথা তিনি আরো জোর দিয়ে বলেছেন, তা হল "বাংলা-চিত্র"। অজন্তা রাজপুত কিংবা মোগল-পদ্ধতি অনুকরণ না করে "বাঙালির একান্ত নিজস্ব চিত্র"-ই যামিনী রায়কে পথ দেখিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রবন্ধের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, "রঙের বাহুল্য বর্জন" করে, "শুধু রেখার ভাষার সাহায্যে" তিনি যে "মনের ভাব ব্যক্ত" করেছেন, তাতে "বাংলা ছবি"র পাশাপাশি "ইম্প্রেশানিস্ট রেখাচিত্রে"-র সাদৃশ্যের কথাও এসেছে। শান্তা দেবী যামিনী রায়ের ছবিকে বলেছেন "মণ্ডন-শিল্পের ধরনের"। "অলংকার বাহুল্যবর্জিত···রিক্ত ছবি", "বড় সাদা জমির উপর দু-চারিটি রঙের মোটা টান", বাংলা অঙ্কনরীতিকে অবলম্বন করেই, "ইচ্ছেমতো সেগুলিকে আরও সাদাসিধা" করে তোলা ইত্যাদি। শান্তা দেবী কিন্তু তখনই যামিনী রায়ের এই পথসন্ধানকে আকস্মিক ও পূর্বাপরহীন বলে মনে করেন নি। অবনীন্দ্রনাথের "দুই-একটি পটের ধরনের ছবি"-র কথা বলেছেন, নন্দলাল বসু-র ছবিতে "বাংলা পুঁথির পাটার চিত্রের পদ্ধতি"-র কথা বলেছেন, সুনয়নী দেবীর "বাংলার নিজস্ব চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রভাবে"র কথাও—তারই পটভূমিতে ও অসংলগ্নতায় প্রকাশ করেছেন যামিনী রায়ের বিশিষ্টতা। একটি সামান্য প্রদর্শনী-সমালোচনার মধ্য দিয়ে শান্তা দেবী যে অসাধারণ রসজ্ঞতা ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা কোনোক্রমেই দায়সারা ভাবে উল্লেখ করে শেষ করা যায় না। যামিনী-চর্চায় এর অগ্রগামীর ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে। সৌভাগ্যের কথা, আলোচ্য বইটিতে যামিনী-সমালোচনার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে শহিদ সুরাওয়ার্দিকে দিয়ে এবং শেষ হয়েছে শান্তা দেবীর এই অসামান্য রচনায়।

তবে সুরাওয়ার্দির প্রবন্ধের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার তুলনা হয় না। বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যই শুধু নয়, এখানে নন্দনের জমিই আলাদা। শান্তা দেবী অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-সুনয়নীর পাশে অনুকূল তুলনায় ও অনুষঙ্গে যামিনী রায়কে চিনতে চেয়েছেন—আর সুরাওয়ার্দি তাঁদের এবং বেঙ্গল স্কুলের বৈপরীত্যেই যামিনী রায়ের শিল্পকে গ্রহণ করতে চান। সুরাওয়ার্দির লেখায় আধুনিক দৃষ্টির যে তীব্র চাপ, তা শান্তা দেবীর স্নিগ্ধ পর্যবেক্ষণে নেই।

সুরাওয়ার্দির এই বিচারও, আমরা জানি, শুধু ব্যক্তিগত নয়। যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে গ্রহণ-বর্জন এবং তার মধ্য দিয়ে আত্ম-আবিষ্কারের যে নিহিত আধুনিকতা তার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব তাঁদের পক্ষেই যাঁরা সামগ্রিক-ভাবে বিশ্ববীক্ষা ও সংস্কৃতিচিন্তায় আধুনিকতার যাত্রী। সাহিত্যে এই আধুনিকতা তিরিশের দশকে যাঁদের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষ করা গিয়েছিল তাঁরা হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর লেখক কিংবা সুধীন্দ্রনাথ-পৃষ্ঠপোষিত 'পরিচয়'-এর আড্ডার সদস্য। সুরাওয়ার্দি ছিলেন এই আড্ডার ঘনিষ্ঠজন এবং সুধীন্দ্রনাথের বন্ধু। যামিনী রায়ের বাড়িতে ছবি দেখতে তাঁদের যৌথ বা একক গমনাগমনের কাহিনী আমরা অনেক পড়েছি। 'পরিচয়'-এর আড্ডায় একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিল যামিনী রায়। সুতরাং এই গুণগ্রাহিতা বা যামিনী রায়কে গ্রহণের এই আধুনিকতা পরিচয়-গোষ্ঠীর মিলিত অভিজ্ঞতার পরিণাম মনে করলে তেমন ভুল হবে না।

তাই ত দেখি, সুরাওয়ার্দির পরবর্তী আলোচকই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং। যদিও বেশ পরে, অন্তত ছ-বছর পরে, ১৯৪৩-এ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তও 'ওরিয়েন্ট লংম্যান্স মিসেলিনি'-তে লিখলেন একটি ইংরেজি প্রবন্ধ: 'যামিনী রায়'। দীর্ঘতর এবং সম্পূর্ণতর। এক বছর বাদে ১৯৪৪-এ বেরয় পরিচয়-এর আরেক সদস্য বিষ্ণু দে-র লেখা একই বিষয়ে, জর্জ আরুইনের সহযোগে। দীর্ঘতম এবং নানা দিক থেকে নিঃসন্দেহে আরো সম্পূর্ণ। লেখকদ্বয় প্রবন্ধটিতে সুরাওয়ার্দি ও সুধীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন, সপক্ষে উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ করে সুধীন্দ্র-নাথের প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র তারিফ ব্যক্তিগতভাবেও আমরা জানি। সাহিত্যপত্র-সম্পাদনার নতুন এক পর্বে, পরিকল্পনার গোড়াতেই বিষ্ণু দে প্রস্তাব করেন, সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাটি বাংলায় অনুবাদ করে ছাপানো হোক। ১৯৪৩-এর প্রবন্ধ ১৯৬৭-এও তিনি এতটাই জরুরি মনে করেছিলেন। আমাদের অনুরোধে বন্ধু আশীষ মজুমদার অনেক পরিশ্রম করে প্রায় সুধীন্দ্রদত্তীয় গদ্যের চালেই বাংলা করার দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেন। ছাপা হলে বিষ্ণু দে চিঠি লিখে জানান, "তোমার বন্ধুর বাহাদুরি আছে, সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদ করা বেশ শক্ত।"

'দি আর্ট অব যামিনী রায়' বইতে সুরাওয়ার্দি-র লেখাটি ছাপা হয়েছে এবং বিষ্ণু দে ও জন আরুইনের প্রবন্ধটিও, নামপত্র ও স্টেলা ক্রামরিশের মুখবন্ধ সহ। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, এই দুই রচনার মধ্যবর্তীকালীন সুধীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রবন্ধটি স্থান পায় নি। নিঃসন্দেহে পরিকল্পনার এটি একটি বড় ত্রুটি।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যামিনী রায় সম্পর্কিত এই তিনটি আদি প্রবন্ধই ইংরেজি ভাষায় লেখা। সম্ভবত এ থেকে এটাই বোঝা যায়, ইংরেজি-জানা ভোক্তা দর্শক ও পাঠক, দেশী কিংবা বিদেশী, এঁরাই ছিলেন যামিনী রায়ের সম্ভাব্য রসিক এবং নিশ্চয়ই ছবির ক্রেতা। যে-ভাষায় যামিনী রায়কে তাঁরা তারিফ করেছেন, তাও ইংরেজি-জানা বিদগ্ধ মানুষের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। সঙ্গে-সঙ্গে এটা তৎকালীন রুচির এক ধরনের ইঙ্গবঙ্গীয় বা ইংরেজ-নির্ভর রুচির পরিধির সীমাবদ্ধতাও প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে স্বয়ং কিংবা অশোক মিত্র প্রমুখ বাংলা ভাষায় সমানই সিরিয়স প্রবন্ধ লিখতে পেরেছিলেন যামিনী রায় বিষয়ে। তার উপযুক্ত পরিবেশ কি তখনও ছিল না?

তা ছাড়া, বোধহয়, সে-সময়ের পরিচয়-কেন্দ্রিক মানসিকতা ও রুচিই কম বেশি এই তিনজনের প্রেরণাস্থল হওয়াতে বক্তব্যবিষয়ের মধ্যে একটা সাম্যও লক্ষ করা যায়। সুরাওয়ার্দি যেমন বলেন, "The work is replete with latent vigour and so it is wrong to describe him, as it is often done, as a decorative painter. Pictures of such monumentality may incidentally serve a decorative purpose but they are really pure realisation of form executed to fulfil a disciplined artistic intention with a high sense of artistic responsibility", সুধীন্দ্রনাথ সে-কথাই বলেন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্ত থেকে : "As a matter of fact, even when most obsessed by the purely formal relation between the line and the volume, he had not entirely abandoned the representational method. So he had always considered his realistic work as exercises that laid the foundation for the ultimate abstraction."

বিষ্ণু দে ও আরুইন সেই শিল্প অভিজ্ঞতার সংহতিকেই দেখেন এইভাবে : "The lonely search for form became for Jamini Roy a great intellectual adventure. No painter, not even Cezanne, has treated his art more seriously; few have sacrificed more to it. His life has been a struggle to achieve integrity in painting, and for this he has endured years of unremitting, often unrewarded, labour."

নিছক ডিজাইন হিশেবে দেখার যে প্রবণতা এইসব লেখার আগে বা

সমকালে দেখা গিয়েছিল, তার যথার্থ ও যোগ্য প্রতিবাদ তিনজনের রচনায়, যদিও সে প্রবণতা এখনও কমেছে এমন বলা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ করবার, সমকালীন জীবনের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিক সম্পর্কে যামিনী রায়ের উদাসীনতাতে আপত্তি জানিয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। সুধীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন: আদিম কৃষক তাঁর মুগ্ধ বিস্ময়ের বস্তু, কিন্তু শিল্প-শ্রমিকদের প্রতি তাঁর প্রবল অনীহা। তিনি নমাজরত মুসলমানদের ছবি আঁকেন "কাব্যিক মোহে", কিন্তু "দাঙ্গার উন্মাদনা" নয়। সুধীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন, "সমবেদনার প্রসার সম্ভব হলে সংগঠিত শ্রমিক-মিছিল নিঃসন্দেহে অতিরেকযুক্ত কীর্তনীয়া দলের চেয়ে তাঁর কাছে অনেক কম ফর্মাল সমস্যা নিয়ে আসত।" এক বছর পরে বিষ্ণু দে ও আরুইনও প্রায় একই সুরে বলছেন: "সেখানে একজনও ঝাঁঝালো মানুষ নেই, একজনও বদমেজাজি নারী—যামিনী রায়ের বিশ্বে শুধুই মনের প্রশান্তি ও প্রশমিত সংরাগ।"

ফর্মের শুদ্ধতা অর্জনের অভিযান এবং তার উৎস চারিত্র ও পরিণাম সম্পর্কে যে উপলব্ধি ওঁদের লেখাতেই পেয়েছি, তার সঙ্গে এই অভিযোগ কতদূর সংগতিপূর্ণ একথা মনে হতেই পারে। অন্তত বিষ্ণু দে-র পরবর্তী অনেক ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধেই এই দ্বৈততার স্খালন হয়েছে। ১৯৫১-তে 'যামিনী রায়ের শিল্পসংগ্রাম' নামে যে প্রবন্ধটি ছাপা হয় (এটি ১৯৪৮-এ লেখা Jamini Roy: the great artist'-এর বঙ্গীয় সংস্করণ) তাতে বিষ্ণু দে বলেছেন: "মনে হতে পারে চিত্রিত বা কল্পিত এই আনন্দের ধ্যানে দর্শনে আনন্দের জন্য লড়াই থেকে লোকে নিরুদ্ধ হবে, আরাগঁ কিন্তু তা অস্বীকার করেন। তাই তিনি মাতিসকে মনে করেন সার্ত্র-মার্কা জরের যম, মনে করেন অতীতের জীর্ণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, আজকের আনন্দে কর্মিষ্ঠ মিছিলে মাতিস যেন একটা বিরাট নিশান।...যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙিন আনন্দের চিত্রলোক আমাদেরও যেন সেই নিশান নির্দেশ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায় গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়। মাতিস বলেছিলেন, শ্রমকাতর লোককে বিশ্রামের শান্তি দিতে চাই। যামিনী রায় চান ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ প্রতিবাদে ভেঙে গড়ারই পরোক্ষ প্রেরণা।"

সমকালীন জীবন বা ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ ও সুবোধ্য রূপায়ণেই শুধু শিল্পী বা লেখক নিজের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করেন—এ বিচার আজ বাতিল। শুদ্ধ ফর্মের বিশিষ্ট চর্চাও যে কখনো-কখনো শিল্পকে ফর্মের উৎসে নিয়ে যায়, প্রসঙ্গের নিহিত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়—তার দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা আমরা

খুঁজে পাই আধুনিক কবিতায়, উপন্যাসে বা সমালোচনায়ও। কিন্তু, ১৯৪৮-এ একথা বলার জন্য সাহসের দরকার ছিল, "চিত্রগুণে শুদ্ধ" যে চিত্রাবলি তারও "সামাজিক সত্তা" আছে, সামাজিক-অর্থে প্রতিবাদী চরিত্র আছে এবং প্রবলভাবে আছে।

কিন্তু সে-কথা থাক—ওসব ত পরের ব্যাপার। কিন্তু ডকুমেন্টেশনের খাতিরে ১৯৪৪-এর দুর্লভ লেখাটি সংগতভাবেই পুনর্মুদ্রিত হলেও, প্রশ্ন জাগে, এ থেকে যামিনী রায় বিষয়ে বিষ্ণু দে-র পরিণত ভাবনার পরিচয় কি পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরং 'In the Sun and the Rain' বইটি থেকে ১৯৪৮-এ লেখা 'Jamini Roy : the great artist' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করলেই কি যামিনী রায়ের মূল্যায়নের দিক থেকে ঠিক কাজ হত না? অবশ্য, আগেই বলেছি, মূল্যায়ন নয়, অসম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশনই সম্ভবত এই সংকলনের ফলশ্রুতি।

ঠিক একই কথা ওঠে অশোক মিত্রের প্রবন্ধটি পড়তে-পড়তেও। যামিনী রায়ের মৃত্যুর পর ওই তাৎক্ষণিক স্মৃতিমূলক রচনাটির নির্বাচনে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হল না। যামিনী রায় বিষয়ে তিনিও অনেক গভীর ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৬-য় 'পরিচয়' পত্রিকাতেই তাঁর সঙ্গে বিষ্ণু দে-র বাদানুবাদের উপলক্ষ হয়েছিল যে প্রবন্ধটি (অশোক মিত্র-র 'যামিনী রায়' বেরয় ভাদ্র ১৩৬২-তে এবং তার প্রতিবাদে বিষ্ণু দে-র 'যামিনী রায় ও শিল্প-বিচার' বেরয় পৌষ ১৩৬২-তে) তারও ইংরেজি অনুবাদ ছাপানো যেতে পারত—তাতেই ছিল এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ মতামত। নির্বাচিত লেখাটি ত তাঁর আদিলেখাও নয়, নেহাৎই সাম্প্রতিক।

মুলকরাজ আনন্দের প্রবন্ধটিও শেষ পর্যন্ত সুলিখিত সাংবাদিক রচনাই মাত্র—যদিও তাতে বেশ কিছু অভিনব ব্যাখ্যা ইংরেজি-জানা পাঠক পাবেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কীভাবে সাঁওতাল-নাচ থেকে শুরু করে পরবর্তী কীর্তনের ছবি পর্যন্ত কম্পোজিশনের নাটক তাঁর চিত্রকে পৌঁছে দিয়েছে সংগীতের কাছাকাছি। দেখেছেন গানের দলের শিশুসুলভ ফুর্তি, কুমারীর সরলতা, এসব ছাড়াও তাঁর অঙ্কিত মূর্তিতে রীতিবদ্ধ খোলা চোখের ভেতর প্রায় "insane look of dazzed horror", ইত্যাদি। নিজেই অবশ্য স্বীকার করেছেন এসবই "সাহিত্যাক্রান্ত" ভাবনা তবে মনে করেছেন এসবই নাকি আত্মসচেতন জিজ্ঞাসায় নিয়ে যায়। ইত্যাদি।

সহযোগী লেখক জন আরুইন ছাড়া চারজন বিদেশী লেখকও আছেন

এখানে। 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র শিল্প-সমালোচক রুডি ফন লাইডেন লিখেছেন 'যামিনী রায়'—যামিনী রায়ের ষাট বছর পূর্তির বছরটিতে। খুব একটা পুরনো লেখা নয়। উনিও উল্লেখ করেছেন, অংশত নির্ভরও করেছেন বিষ্ণু দে ও জন আরুইনের লেখাটির ওপর। খুবই আনন্দের কথা, সুপরিচিত ফরাসি শিল্পসমালোচক এরভে মাসন্-আ-র 'লার' নামক ফরাসি শিল্প-সাপ্তাহিক প্রকাশিত অসামান্য রচনার ইংরেজি ভাষ্য 'এ গ্রেট পেইন্টার—যামিনী রায়' এখানে ছাপা হয়েছে। বাঙালি পাঠকের অবশ্য বরাত তাঁরা অনেক আগেই এর চমৎকার বঙ্গানুবাদ পড়েছেন 'প্রবাসী'-র ষষ্ঠিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (চৈত্র ১৩৬৭/১৯৬১)—বিষ্ণু দে তাঁর 'যামিনী রায়ের ছবি' প্রবন্ধে অনুবাদটি করে দিয়েছিলেন। পরে সেটি 'বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি' নামে গ্রন্থস্থ হয়।

তৃতীয় বিদেশী লেখক অধ্যাপক রল্‌ফ ইটালিয়াণ্ডের—জর্মান লেখক ও শিল্পবিশেষজ্ঞ। ভারতবর্ষে কয়েকদিন কাটিয়ে, ৭০ বছরের যামিনী রায়ের সঙ্গে দেখা করে ও তাঁর ছবি দেখে, তিনি আফ্রিকা চলে গেছেন এবং সেখানকার জঙ্গলে বসেই শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই প্রবন্ধ স্মরণীয় কিছু নয় অবশ্যই।

চতুর্থ জন অস্টিন কোট্‌স—পরিচিতি হিশেবে লেখা আছে : লেখক এবং যামিনী রায়ের বন্ধু ও তাঁর ছবির সংগ্রাহক। আগের লেখার মতোই এটিও মূলত সাংবাদিক রচনাই। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন, "তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য এটাই যে নিরীহতম ভারতীয় চাষীও এ ছবি মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে ও উপভোগ করতে পারে।" আমাদের মনে পড়ে যায় এ সংকলনেরই প্রথম সমালোচনায় শহিদ সুরাওয়ার্দি লিখেছিলেন : "He cannot be easily appreciated by laymen and the whole trend of his life as an artist and as a man has been in the direction of evading popular praise." এ দুই রচনার কাল-ব্যবধান অনেক—কিন্তু সন্দেহ হয় আমাদের পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশেই হোক কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর অসম বিকাশের দেশেই হোক, শিল্পী ও দর্শকের সম্পর্কের যে বিচিত্র জটিলতা এখানে রূঢ় বাস্তব সে-বিষয়ে দুটি প্রবন্ধেই প্রকাশ পেয়েছে চরম অজ্ঞতা। তবে কোট্‌স সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন যামিনী রায় সম্পর্কে : "I have never known a famous man who has travelled less." । গল্পও শুনিয়েছেন একটা। নেহরু সরকার দিল্লি থেকে যাওয়া-আসার প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাঠিয়ে

দিয়েছে। তাঁকে পুরস্কৃত দেওয়া হবে। টিকিট হাতে বিহ্বল যামিনী রায় বলেছেন, "যদি দিতেই হয়, ওরা আসুক।" সত্যিই ওঁরাই এসেছিলেন। কোট্‌স গল্পটা বলেছেন, কিন্তু এমন খাপছাড়াভাবে এবং অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে যে মনে হতে পারে ঘরকুনো শিল্পীর এ এক স্বভাব। এই আচরণের তাৎপর্যটা বুঝিয়ে বলেন নি।

ডকুমেন্টেশন বলেই হয়ত বইয়ের গোড়ায় ও শেষে যথাক্রমে ছাপা হয়েছে বাংলার পট সম্পর্কে ও রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে যামিনী রায়ের সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ। এ ছাড়া যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। বইটি ত নানা স্কেচে ও ছবিতে অলংকৃত হয়েছেই, সামনেও আছে যামিনী রায়ের পিতামাতার, গ্রামের ও শহরের বাড়ির ছবি—তবে সবচেয়ে দামি শেষাংশে ২২টি নির্বাচিত রঙিন ছবির অ্যালবাম। বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন মেজাজের ছবি। যামিনী রায়ের ছবিতে বৈচিত্র্য নেই, এ-কুসংস্কারও ভাঙবে এই নির্বাচন।

The Art of Jamini Roy. যামিনী রায় সেন্টিনারি সেলিব্রেশন কমিটি। প্রকাশনা কমিটি : বিমল ধর, পার্থ চৌধুরী, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত।

মেধা ও স্বপ্নের বিষ ছেঁকে

সিদ্ধেশ্বর সেন

অগ্রজ কবি মণীন্দ্র রায়কে নিয়ে এই নাতি আলোচনা-নিবন্ধের সূচনাতে তাঁরই দুই যুগের কবিতার পদাংশ ব্যবহার করেছি।

তাঁর চতুর্থ বইটির নাম দেন তিনি 'সেতুবন্ধের গান'। এর প্রকাশ ১৯৪৮-এ। দেশের স্বাধীনতালাভের এক বছর পর। তার আগে থেকেই, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'একচক্ষু' থেকেই তাঁর কণ্ঠস্বরটি আমরা সনাক্ত করেছি। সে কথায় পরে আসছি। ১৯৪৮-এর শেষ দুই সংখ্যাকে উল্টিয়ে নিলেই যে ১৯৮৪ হয়, ঠিক সে-কারণেই নয়, বরং এখনও পর্যন্ত ওই বইয়ের প্রকাশিত তাঁর শেষ ও সাম্প্রতিকতম বইটি "মাথায় জড়ানো জলপাই পল্লব"-এর একটি কবিতার পঙক্তি উদ্ধার করে "মেধা ও স্বপ্নের বিষ" বাক্যবন্ধটি বসিয়েছি!

সেতুবন্ধ কেন? মণীন্দ্র রায় তাঁর দীর্ঘ কাব্যসিদ্ধির, যাকে তিনি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র (স্বমুদ্রণ সংস্করণ) মুখবন্ধে বলেছেন, "পঞ্চাশ বছর তো কম সময় নয়। জীবনবৃত্তের প্রায় সবটাই ধরা পড়ে তাতে। কবিতাতেও তার ছাপ দুর্নিরীক্ষ থাকেনি"—উপান্তে পৌঁছে এই নির্বাচিত সংকলনেরই শেষ কবিতায় একেবারে একালেরই কাব্যনিষ্ঠ-তরুণ প্রজন্মের কাছে বলতে চান নি কী:

> "রৌদ্রপায়ী হৃদয়
> এক-একটা জ্বলন্ত দিনকে
> ঢালাই করেছি শব্দের ছাঁচে।
> ... ...
> কিছুই হারাই নি আমি
> ...বয়স পিছনে টানছে, জানি
> পদক্ষেপ ক্রমেই ভারী।
> কিন্তু তোমরা তো রইলে।"

তবে কী নয় তাঁর পরিণত অভীপ্সা এই তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে একটা সেতু বেঁধে তোলার? বর্ষীয়ান এই কবির সেই ইচ্ছাকেই সম্মান করে আমি 'সেতুবন্ধের' কথাটি ব্যবহার করতে চেয়েছি নিবন্ধ-সূচনায়, যদিও জানি কবি যখন তাঁর প্রথম পর্বে 'সেতুবন্ধের গান' লেখেন, তখন সে সেতু বাঁধার তাগিদ ও হেতু ছিল অন্য।

মণীন্দ্র রায়ের স্বপ্নের বুননের ভিতরও মেধার অবলেপ ছিল প্রথমাবধিই। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার টানা পোড়েনে ও ওঠাপড়ায় কী বিষও জারিয়ে ওঠেনি তাতে অনেকখানিই! তাই তাঁর মুখবন্ধের বক্তব্যই আবার আশ্রয় করে বলে নিতে হল "অজস্র কবিতায় যেমন সমাজমুখিতা, এমনকি রাজনৈতিক পক্ষপাতের ছাপ সুব্যক্ত, তেমনি ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, আত্মসংগ্রাম এবং কর্কশ ক্রোধের প্রকাশও কম ঘটেনি।...অনেক কবিতাই সেজন্যে হয়ে উঠেছে অস্থির এবং উদ্বাস্তু; যদিও পুনর্বাসনই রয়ে গেছে নিয়ত অভিপ্রেত।"

এত সত্ত্বেও, কবির নিজেরই বলে-দেওয়া বক্তব্যের ভার সরিয়ে, এখন সংকলিত কবিতাগুলির কাছেই কেননা আমরা সরাসরি পৌঁছে যাই! তাহলে, তাতেই তো প্রকৃত পুরস্কৃত ও লাভবান হতে পারব আমরা।

তবু এই, সরাসরি তাঁর কবিতায় পৌঁছে যাবার আগে কবির আর একটি গদ্যাংশও আমরা মনে করে নিতে পারি। তাতে তাঁর একেবারে গোড়াকার পূর্বাপরের একটা খেই হয়তো আমরা পেয়ে যাব।

এই 'পরিচয়'-এই ১৯৮৫-তে কবি তাঁর লেখনের অর্ধশতক পূর্তি স্মরণ করে লিখেছিলেন, ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার পাতাতেই তাঁর প্রথম আত্ম-প্রকাশ। সদ্য ১৬ বছরের তরুণ। তখন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের খরদীপ্ত বৌদ্ধিক সম্পাদনার আমল। "আমার মতো মফঃস্বলবাসী এক অর্বাচীন প্রায় বালকের রচনা 'পরিচয়'-এর মতো সাড়া-জাগানো ত্রৈমাসিকে ঠাঁই দিয়ে সম্পাদক আমার মনের মধ্যে যে ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, তার ধাক্কায় রাতারাতি প্রায় আমি বয়ঃসন্ধি পার হয়ে গিয়েছিলাম···"

এই 'বয়ঃসন্ধি পার-হওয়া' কথাটির ওপর তাহলে জোর দিতে হয়। এবং এই হয়ে-ওঠা সেই তিরিশের চিন্তিত, ঋদ্ধ, বিদগ্ধ সাহিত্যধারার সঙ্গে যোগাযোগের প্রাথমিক সূত্রেই এই আমাদের এতকালের প্রতিষ্ঠিত ও নৈকট্যে-পাওয়া কবির পক্ষে যেমন, তেমনি আমাদের পক্ষেও যেন তাঁর স্ফূর্ত কবিত্বের ক্রমবিকাশের তাৎপর্যে প্রায় অবশ্যম্ভাবিতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

কবি মণীন্দ্র রায়ের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় (১৯৩৬-৮৪) তাই প্রায় প্রথমাবধিই, অন্তত তাঁর দ্বিতীয় বইটি 'একচক্ষু' থেকেই সন্ধিৎসু পাঠক সাক্ষাৎ পেয়ে যান এক পরিণত কলম ও আত্মানুসন্ধানী কবির মনের। তারপর থেকেই এই একাল পর্যন্তই দীর্ঘ ও নিয়ত পরিশীলনে, কাব্যশরীর নির্মাণে, তাঁর কর্তৃত্বে-রাখা সংহত ও স্বচ্ছল কবিত্বে তাঁকে আমাদের সমকালের নানান পর্ব-পর্বান্তরের এক প্রধান কবিস্বরূপে আমরা চিনে নিই। তাঁর কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠককে যা নিশ্চিত ও আশ্বস্ত করে।

তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় পেয়ে যাই আমাদের এই কবির বহুপ্রসূ রচনা-সম্ভার থেকে আঠারোটি কাব্যগ্রন্থের বাছাই-করা কবিতা। দশক হিসেবে দেখলে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিকে এক-এক পর্বের গুচ্ছ হিসেবে কবির ক্রম-পরিণতির বিবর্তনে এক ঝলক দেখে নিতে পারি বোধ হয় আমরা।

তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ত্রিশঙ্কু' বেরিয়েছিল ১৯৩৯-এ। বইয়ের এই নামকরণের মধ্যেই সে-সময়ের এই তরুণ কবির একটি দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত। 'ত্রিশঙ্কু' যে অবস্থা নাকি "ন যযৌ ন তস্থৌ-এর। কিংবা তিরিশের ইংরেজ কবি সিসিল ডে-লুইসের ভাষায় "only ghost can live between two fires." এই নয় কী সেই মধ্যবিত্ত মানস, যা ছাড়িয়ে সচেতন কবিকে একটি সামাজিক দায় বেছে নিতে, মেনে নিতে হবে? এ-ও তো সেই আত্মস্বরূপই খোঁজা, সমাজপ্রগতির শক্তির সঙ্গে সমীকরণে সেই চল্লিশের দশকের শুরুতে প্রশ্নক্ষুব্ধ এই কবির কিন্তু কোনো সহজ সমাধানের আশ্রয় ছিল

না। তাঁরই সমকালীন ও সমবয়সী তখনই 'পদাতিক'-বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন নিঃসংশয়িত উচ্চারণে বলছেন "লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা / দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে", মণীন্দ্র রায়ের কিন্তু তেমন নয়। তবু সেটাই তো তাঁকে দিল এক বিশিষ্টতা। পথ-সন্ধানের প্রক্রিয়ারই সাক্ষ্য। অরুণ মিত্র-কথিত সেই "অস্থির দিন এসেছে নাকি"-র সময়ে।

এই কালপর্বেই একটি প্রত্যাশিত পাওনা-ই যেন পেয়ে গিয়েছিলেন তরুণ মণীন্দ্র রায়, তিরিশের সেই প্রধান অগ্রজের স্বীকৃতি,—যাতে তাঁর মনে জেগেছিল একটি বাঞ্ছিত—"আইডেনটিটির আস্বাদ।"

তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই 'একচক্ষু' (১৯৪২)-এর নাতিদীর্ঘ সমালোচনায় লিখলেন বিষ্ণু দে, "...কিন্তু কবিত্ব তাঁর অবিসংবাদী এবং প্রগতির স্বাস্থ্যে ত তাঁর স্বকীয়তার আভাস উজ্জ্বল।" একটি "কিঞ্চিৎ তির্যকচারী" "দৃষ্টি ও "দ্বিধাগ্রস্ত বৈদগ্ধের আমেজে"-র কথা বলেন তিনি, "তা লেখকের আত্মজিজ্ঞাসারই অবশ্যম্ভাবী ক্রমবর্ধিষ্ণু বিকাশ।" আর লিখেছিলেন, "বহির্বিলাসী প্রগতিবাদের তুচ্ছতা ও অন্তর্বিলাসী আত্মসর্বস্বের ব্যর্থতার গ্লানি মুক্তি পায় যে মার্কসিস্ট চৈতন্যের অখণ্ডতায়, মনে হয় তার আভাস মণীন্দ্রের কাব্যচৈতন্যে বর্তমান।"—বোধ করি কবিসত্তার এই আত্মপরিচয়ের উদ্‌ঘাটনে ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার বোধে মণীন্দ্র রায় আর পিছনে ফিরে তাকান নি। কবি বিষ্ণু দে থেকে সূচিত প্রগতির এক আত্মসচেতন স্বস্থ ধারায় কাব্যসৃষ্টির নিজ সংযোজনটি দিয়ে গেছেন দীর্ঘকালব্যাপী, অবিরল।

মণীন্দ্র রায়-কে আমরা,—৪০ দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর ও মঙ্গলাচরণের অব্যবহিত পরেই যারা কবিতায় এলুম, প্রথমে চিনেছি, তাঁর কণ্ঠস্বরের বিশিষ্টতায়, এই মিতবাক্ "স্বদেশ" কবিতাটিরই কিন্তু এক অন্তর্গত স্পন্দমান দীপ্তিতে, যে-কবিতাটির কথা বিষ্ণুবাবু বলেছিলেন "বহিরঙ্গ বিলাস নয়।"

বইতে পড়ার আগে, প্রথমে আমার সেটি পড়ার সুযোগ হয় সেই ফ্যাসিবিরোধী লেখক আন্দোলনের যুগে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র প্রথম সংস্করণে। আধুনিক পর্বের কাব্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সংস্করণের গুরুত্বের কথা স্মরণীয়, যার যুগ্মসম্পাদনায় আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমরা পাই। মণীন্দ্র রায়ের কবিতাটি ছিল সেই সংকলনের কনিষ্ঠতম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এরই ঠিক আগে। তখনও আমাদের দেশ স্বাধীনতা পায় নি, মুক্তিসংগ্রামে দ্বৈরথে লিপ্ত :

> "ম্রিয়মান হৃতশক্তি হে স্বদেশ,
> প্রণাম। শতাব্দী শেষ
> বিহ্বল দিগন্ত পারে, স্নায়ু জনতার
> স্নায়ুজালে—ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে।
> জাগে স্তম্ভিত মাটির
> দলিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।"

মণীন্দ্র রায়ের এই দেশাত্মতা, সমাজসচেতন কবির প্রগতির দায় ও মানবিক উচ্চারণের এক স্থায়ী উপাদান হিসেবে তখন থেকেই থেকে গেছে। ব্যক্তিক ও সামাজিকের বোধের এই সমন্বিত রূপ তাঁর কবিতায় প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতিরও এক উৎস হয়ে দেখা দেয়। ১৯৪৪-এ "ছায়া-সহচর"-এর পর ১৯৪৮-এ বেরুল তাঁর "সেতুবন্ধের গান"। মারী, মন্বন্তর, দেশভাগের মধ্য দিয়ে আসা অভিজ্ঞতার বাস্তবতায় পোড়-খাওয়া। এই সময় "যাকে চাই" কবিতায় মিলিয়ে নিচ্ছেন, "যাকে চাই শত অপ্সরী

পলাতকার বেশে / স্খলিত আঁচলে

স্মৃতি তার সারা বাংলাদেশে।" ('অন্যপথ')

পঞ্চাশের দশকে মণীন্দ্র রায় পর পর প্রকাশ করছেন অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ, যাতে, তাঁর কবিতার স্ফুরণ নানামুখী সমৃদ্ধিতে স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়ে গেল। তাঁর নিজেরও পথ "অন্যপথ" (১৯৫১), "ফলে এই কাঁটাপথ, আমার নিজের পায়ে পায়ে হাঁটাপথ··· / পদক্ষেপে রাত্রিদিন / শুধু ধুলো ওড়ে, তবু আমি যাব / রক্তরাঙা এই পথে দিগন্তের দিকে।···এবার কথায় কিছু প্রেম দাও, আবেগ জমাও /···কাঁটাগুল্মে আগাছায় প্রাণের ঔরসে পথ এঁকে···" জীবনের সংগ্রামের নতুন মূল্যবোধ থেকে পাওয়া এমন চিত্রকল্প গড়ে তুলছেন—"আদিম চাষী।" কে? না, আমাদের চিরচেনা সূর্যই।

"নামে জীবনের মাঠে কাঁধে নিয়ে রোদের লাঙল
সূর্য—কৃষির দেশে বিদ্রোহী আদিম চাষী।"

লিখেছেন 'কৃষ্ণচূড়া' (১৯৫৫) কাব্যগ্রন্থে 'খোয়াই' "···কাঁটাঝোপে বালুতে কাঁকরে / আমি যেন বীরভূমের ভাঙাচোরা রক্তাক্ত খোয়াই, / কোদালে-লাঙলে সেচে চলে তবু শস্যের লড়াই।" মণীন্দ্র রায়ের কবিতায় যে পৌরুষ ও প্রাণশক্তির একটি পরিচয় আমরা পাই, এই পর্ব থেকে তাকে স্পষ্ট করে চেনা গেল "বজ্রের অঙ্গার ঢেকে অশ্বত্থ মেলেছে কী বৈভব।" ('উৎসব')

'কৃষ্ণচূড়া'-য় লিরিক-ও নতুন মূল্যবোধ পেল। এই দৃষ্টিপাতও ছিল প্রগতি কাব্য আন্দোলনের গুণমানের অঙ্গ। এই পর্বে আমার একটি প্রিয় কবিতা ছিল মণীন্দ্র রায়ের 'ভোরের স্বপ্ন', কর্ম ও শ্রমের সৌন্দর্য যেখানে পায় নান্দনিক উত্তাপ:

"দেখ তমস্বিনী মেলেছে চোখ
হেমকান্তি এই মেঘ সমাজে!
আজ সূর্যোদয় মধুর হোক,
জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে।

এসো রাত্রিশেষে ঘোমটা খুলে,
কর্মঘন আশা দু'চোখে জ্বালো,
শ্রমবিন্দু-ঘেরা কপালে চুলে
মুখশ্রী তোমার মানাবে ভালো।"

একটু ব্যক্তিগতও কী এখানে আসতে পারে?—বোধহয়। কবি মণীন্দ্র রায় যখন এই পর্যায়ের কবিতাগুলি এবং আরও অজস্র লিখছিলেন, তখন তাঁর 'সীমান্ত' কবিতাপত্র প্রকাশেরও যুগ। দুই-ই চলছিল একসঙ্গে। 'সীমান্তে'-র প্রস্তুতি-পর্বেও ছিল অনেক উত্তেজনা। নতুন কবিতার একটি ম্যানিফেস্টো-ও তৈরি হল স্বাক্ষরের জন্য। 'সীমান্ত'-এ মণীন্দ্র-মঙ্গলাচরণের সঙ্গে ছিলুম আমি ও আমার সমবয়সী কবিবন্ধুরা। রাম বসু, অসীম রায়, মৃগাঙ্ক রায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, তরুণ সান্যাল, অনেকেই। অগ্রজদের মধ্যে বিষ্ণুবাবু মণীন্দ্র রায়-এর কাছে জানতে চাইলেন নতুন আর কে, কে? মণীন্দ্র রায় যখন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার নামগুলি বললেন, আমার নাম এলে বিষ্ণুবাবু মজা করে বলেছিলেন, ও তো প্রাচীন-ই! তখন আমার লেখার বয়স কিন্তু খুব বেশি নয়। ক'বছর আগে যদিও 'নতুন সাহিত্য'-এ "আমার মা-কে" বেরিয়ে গেছে এবং সহসা পরিচিতির পরিধিও গিয়েছে বেড়ে। তবু, বিষ্ণুবাবুর এই রহস্যোক্তি আমার ও মণীন্দ্র রায়ের অনেক দিনের স্মৃতিচারণের মর্মে থেকে গেল!

'সীমান্ত'-বৈঠকে মণীন্দ্র রায় পড়তেন তাঁর নতুন কবিতা। "ভোরের স্বপ্ন" তাঁর মুখে তখনই শুনি, ছাপার আগে। আরও অনেক শুনি, আর আমরাও নতুন লেখা পড়তুম। যেমন সেখানেই শোনা তাঁর "সূর্যকেই বুঝি সে প্রেমিক":

> "সূর্যকেই বুঝি সে প্রেমিক চেয়েছিল তার ঘরে /...
> আসন্ন সন্ধ্যার রঙে···এঁকে দিল দীর্ঘ
> রেখা ঢেউয়ের উপরে / নদীর হৃদয়ে /···
> প্রেমিক দু'হাতে একবার / তুলে ধরে
> সে আগুন—/ তারপর ঝন্ ঝন্ শব্দে
> ভাঙে ঝাড়, খান-খান্ অগ্নির / টুকরোয়
> নক্ষত্র জ্বলে, যন্ত্রণায় পৃথিবী অস্থির।"

পঞ্চাশের গুচ্ছে মণীন্দ্র রায়ের আরও ক'টি বই বেরুল এমনি করে 'অমিল থেকে মিলে" (১৯৫৮) "মুখের মেলা" (১৯৫৯), ষাটের গুচ্ছে "অতিদূর আলোরেখা" (১৯৬২), "কালের নিস্বন" (১৯৬৬); "নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়" (১৯৬৮)।

"অতিদূর আলোরেখা"-য় এসে কী আলোরেখা সরে যেতে চায়! "ছড়ানো কাগজ, পাতা, শূন্যটিন, নেভানো উনুন, / বহু পোড়ানোর ছাই, এমনকি শালের মঞ্জরী / যা তোমাকে দিয়েছি সকালে, সব ফেলে / সবাই ফিরেছে, তুমি—তুমিও গিয়েছ সহচরী!"

"কালের নিস্বন"-এ আবার নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালেন—এর ভাবনাত্মক কবিতাগুলিতে। "স্বতোৎসারে, নিজে"-তে বলা হয়ে গেল: "সেই যন্ত্রণাই শুদ্ধ, বুকে যার ডাকিনী-চিৎকার /···মুছে যায় পূর্বাপর, শুধু এক তীক্ষ্ণ অনুভূতি / চেতনার নদী থেকে আরো দূর চেতনার বাঁকে / অদৃশ্য নৌকোর মতো রেখে যায় শূন্যের প্রস্তুতি /"

এ পর্বে তাঁর হাত থেকে আমরা পেলুম "এবার ভ্রূমধ্যে এসো", "আবার সৃষ্টির কেন্দ্রে", এবং পরে "হাজার কার্পাস ফাটে"-র মতো নিজেকে অতিক্রম করে যাবার কবিতাগুলি।

সত্তরের দশকে এসে মণীন্দ্র রায় আত্মিক বিষণ্ণতা থেকে এক সামাজিক বিপন্নতার বিরুদ্ধে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন। তাঁর স্বপ্নে বিষ এল কখন? "আমায় বাঁচতে দাও, জাগতে দাও"-এর দীর্ঘ উচ্চারণ কখন!

সত্তরের গুচ্ছের কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণ তাই এরকম: "আমায় রক্তের দাগ" (১৯৭০), "আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে জাগতে দাও" (১৯৭২), "এই আমার বিষ, এই আমার জীবন" (১৯৭০), "ঘন্টাঘড়ি" (১৯৭৪)। "পৃথিবী আমার, পৃথা" (১৯৭৫)।

সত্তরের পর্বের একটি কবিতা তাঁর তুলে দিই, সে / মরীয়া জীবনাশক্তির ও শিল্পের আশ্রয়ে বাঁচার জোরেরও। জল যেখানে সময়ের স্রোতের, এবং পাড়ের কিনারার মাটি সে আগ্রসে ভেঙে পড়তে চায়: "সেখানে জলের থেকে দশ হাত উঁচুতে / পতনের মুখোমুখি / উদ্ধত শিমূল এক ভাঙার মাটিতে / বজ্র মুঠি আঁকড়িয়ে স্বাধীন / ডালে ডালে জ্বালে অগ্নিশিখা /…আমার কবিতা আজীবন / তারই দূর প্রতিধ্বনি, ভাষা আর টীকা।"

("উদ্ধত শিমূল")—

কি "পৃথিবী আমার, পৃথা"-র আবার আত্ম-অতিক্রম করে মানবীকে সম্বোধনে বলা: "আমি বাজ পড়া গাছের মতো / জ্বলতে জ্বলতে বলে উঠেছি—না / আমি পূর্বতোরণে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছি, ঐ আমি।"

আশীর দশকে আর এক বৈচিত্র্যে তিনি উত্তরণের কথা বলতে চাইছেন: "আমাদের ইঁদারাগুলি হোক স্নায়ুর শান্তি / আমাদের আঙিনা হোক সুখের আল্পনা / আকন্দ পাতায় জড়িয়ে এনেছি চাঁপা রঙের হৃদয়…"

("৫টা ৩২-এর কবিতা")

এই পর্বে পাই "জিপসী মেয়ে" (১৯৮২), "মাথায় জড়ানো জলপাই পল্লব" (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থ দু'টি, যা দিয়ে তাঁর এই "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র সংকলনটি আপাতত শেষ হয়েছে।

* * *

'আপাতত', বললুম এ কারণে যে মণীন্দ্র রায় এখনও আমাদের তাঁর পরিণত কলমের উৎসার থেকে তো কই বঞ্চিত করেন না! এই তো সেদিন সাতাশির গোড়ায় পড়লুম তাঁর এই পদবন্ধের আকুতি:

"আর কি সময় পাব? হব শিশু, বৃক্ষ, কবি, চাষী?
আর্তিকে শিল্পের ঘ্রাণে পাব অন্নে? জন্ম-উপবাসী।"

—তবু, কিন্তু—কেন এই আকুলতা!

শ্রেষ্ঠ কবিতা / মণীন্দ্র রায় / সুমুদ্রণ / ২৫ টাকা

শারদীয় পরিচয়

১৩৯৪

এবারের বিশেষ আকর্ষণ

অপ্রকাশিত রচনা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

অমিয়নাথ সান্যাল

কমলকুমার মজুমদার

ঋত্বিক ঘটক

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিন্মোহন সেহানবীশ—এর সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার

পড়ুন

পড়ান

গ্রাহক হোন

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০০০৭
ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

পরিচয়

৫৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা জুন ১৯৮৭ আষাঢ় ১৩৯৪

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস-চেতনা চিন্মোহন সেহানবীশ ১

কবিতার অভিলাষ আনন্দ রথীন ভৌমিক ৭

চিনুদা গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৮৩

ভাষাতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথ ই. মি. বীকভা
[অনু: প্রদীপ বক্সী] ৭০

গল্প

দুই মৌজার গল্প প্রবীর নন্দী ১৮

কলিং বেল মণীন্দ্র চক্রবর্তী ৩৫

কবিতা

মণীন্দ্র রায় ৫ শ্যামসুন্দর দে ৮৮

কবিতাগুচ্ছ

শুভ বসু ১৩ সুবোধ সরকার ১৫ মহুয়া চৌধুরী ৪৩

অনুবাদ

দস্তয়েভস্কির শেষ ভালোবাসা সের্গেই বেলভ
[অনু: সত্য গুহ] ৬১

স্মৃতিকথা

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক সৌরি ঘটক ৪৬

পুস্তক পরিচয়

লোকশ্রুতি প্রসঙ্গে রবীন সুর ৮৯

সোমেন চন্দকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৯১

কিছু কথা, বিযুক্তির বিরুদ্ধে অনিশ্চয় চক্রবর্তী ৯৩

শ্রমিকের রক্ত, অশ্রু, ঘাম সুবীর ভট্টাচার্য ৯৭

সঙ্গীত আলোচনা

ঐ যে রাত্রি সুরসিক ৯৮

সংস্কৃতি সংবাদ

বঙ্কিম পুরস্কার পেলেন অমলেন্দু চক্রবর্তী অর্জুন সেন ১০০

বিয়োগপঞ্জী

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার অমিতাভ দাশগুপ্ত ১০১
খাজা আহমেদ আব্বাস ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১০৩

পাঠকগোষ্ঠী

বুদ্ধিজীবী-বিরোধী গান্ধীজী সুকুমার মিত্র ১০৫

প্রচ্ছদ

পাবলো পিকাসো

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত

অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপন দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস-চেতনা

চিন্মোহন সেহানবীশ

[কলকাতার বাসন্তী দেবী কলেজের প্রেক্ষাগৃহে রবিবার ১৭ মে ১৯৮৭। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকে চিন্মোহন সেহানবীশকে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা জানানো হয়। অসুস্থতার জন্য শ্রীসেহানবীশ সভাতে আসতে পারেন নি। মানপত্রের উত্তরে তাঁর লিখিত ভাষণটি পাঠিয়ে দেন। সভায় সেটি পাঠ করে শোনান অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। মাত্র দুদিন পরে, ১৯ মে সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শ্রীসেহানবীশ। ইতিহাস সংসদের অনুমতি নিয়ে আমরা শ্রীসেহানবীশের এই সর্বশেষ রচনাটি 'পরিচয়'-এ ছাপছি—তাঁকে আমাদের শোকাহত শ্রদ্ধানিবেদন হিসাবে।

সম্পাদক, পরিচয়।]

উপস্থিত বন্ধুরা,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকে আমাকে আজ যে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়েছে, তাতে আমি যেমন আনন্দিত বোধ করছি, তেমনই লজ্জিতও বোধ করছি। কেননা শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমার পক্ষে আজ আপনাদের সভাতে উপস্থিত থেকে "রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস-চেতনা" সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবু, সামান্য দু'চার কথা আমি বলছি এবং ইতিহাস সংসদের সভাপতি শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় তা লিখে নিচ্ছেন, যাতে তা আপনাদের সামনে পেশ করা যায়। ইচ্ছা রইল ভবিষ্যতে দীর্ঘ ও পরিণত প্রবন্ধ আপনাদের কাছে পেশ করার।

প্রথমেই আমি অভিনন্দন জানাতে চাই পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদকে—মাতৃভাষা বাংলাতে ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার নিরলস প্রচেষ্টা

তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে। তাঁদের প্রকাশিত দুটি খণ্ড মূল্যবান প্রবন্ধ-সমষ্টির গ্রন্থ আমি পড়েছি। আশা করছি তাঁদের এই ধরণের গ্রন্থপ্রকাশের ও আলোচনার ব্যবস্থা করার উদ্যম অব্যাহত থাকবে।

আমাদের ছেলেবেলায়, অর্থাৎ এই শতাব্দীর বিশের দশকে ভারতের ইতিহাস চর্চা বলতে এক অদ্ভুত জিনিসকে বোঝাত। আমার এক দাদা (প্রয়াত অজয়কুমার ঘোষের বড় ভাই) চমৎকার একটা ছড়া তৈরী করে সে যুগের ইতিহাস চর্চার অনবদ্য বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বন্দনা করেছিলেন হেষ্টিংস থেকে আরউইন পর্যন্ত সমস্ত বড়লাটকে এবং কোম্পানীর শাসনের জয়গান করে ছড়াটি শেষ করেছিলেন।

এই যখন ভারত ইতিহাস-চেতনার স্তর ছিল, তখন ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে হঠাৎ একদিন হাতে পড়ল, শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় "বঙ্গদর্শনে" লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ "ভারতবর্ষের ইতিহাস"। একটা নতুন চেতনার জগৎ আমাদের কিশোর মনের মধ্যে উন্মুক্ত হ'ল, যখন পড়লাম।

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল। একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান মোগল পর্তুগীজ ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্য পটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয়না। ভারতবাসী কোথায়, এসকল ইতিহাস তাহার কোনও উত্তর দেয়না। তখন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি, খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।…প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবন স্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমানের পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস, বঙ্গদর্শন ১৩০৯)

এই প্রবন্ধ পড়ার পর ৬০ বছর কেটে গেছে, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা আমার কাছে আরও সমুজ্জ্বল, আরও অর্থবহ হয়েছে। আগেই বলেছি, পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে, সে আলোচনা এক দীর্ঘ প্রবন্ধে ইতিহাস সংসদের কাছে পেশ করার আশা রাখি। তাই তার মধ্যে এখন যাব না।

এখন শুধু আমার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলব, যা থেকে হয়তো স্পষ্ট হবে নানান দেশের নানান মতের অনেক মহৎ মানুষদের চোখে কবির ইতিহাস-চেতনা কেমনভাবে ধরা পড়েছিল। আমি সেই সব মানুষদের কথাই বলছি, যাদের সম্বন্ধে কবি লিখেছিলেন:

"যেখানে নিঃসঙ্কবীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।"

দেশের মানুষের কথা দিয়েই শুরু করি। পাটনা জেলে ফাঁসী হবার অব্যবহিত কাল পূর্বে, তরুণ বিপ্লবী বৈকুণ্ঠ শুকুল, গান্ধীবাদী বন্দী বিভূতি দাসগুপ্তর কাছে জানালেন শেষ অনুরোধ 'দাদা, ওহি গানা গাইয়ে, রবীন্দ্রনাথকা 'মরণ হে মোর মরণ'। বিভূতি বাবু জানেন সেটি গান নয়, কবিতা। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী বীরের শেষ অনুরোধ যে রাখতেই হবে। দরবারী কানাড়াতে তিনি গান ধরলেন 'আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়, আমি করিব নীরবে তরণ'। গান শেষ হল, শুকুল বল্লেন 'দাদা চলি, আবার আসব, দেশতো এখনও আজাদ হয়নি, বন্দেমাতরম্।'"

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শওকৎ ওসমানের মুখে শুনেছি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি ঘটনা। জনাব এনায়েৎ করিম ছিলেন নিউইয়র্কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। তিনি বাঙালি ও শওকৎ ওসমানের বন্ধু। তাই ওসমান তাঁকে এক চিঠিতে লিখে পাঠান শুধু রবীন্দ্রনাথের এই কটি লাইন:

জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

পরে এনায়েৎ করিম বলেছিলেন তাঁদের মনে তখন দোটানা—তাঁরা, অর্থাৎ নিউইয়র্কে পাকিস্তানের বেতনভুক ১৪ জন বাঙ্গালি কূটনীতিবিদ। ওসমানের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের লাইনগুলি পড়ে তাঁদের দোটানা কেটে গেল—তাঁরা যোগ দিলেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে।

১৯৬৫-তে বর্মার গহন জঙ্গলে বন্দুক হাতে গণমুক্তির বিপ্লবী সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন বর্মার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালী বিপ্লবী সুবোধ মুখার্জি। জীবিত বা মৃত তাঁকে ধরে দিতে পারলে বর্মার সরকার তখন একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। রেঙ্গুনে তাঁর এক বন্ধুর কাছে

সুবোধ গোপন চিঠি পাঠালেন বহু কষ্ট করে। চিঠিতে তিনি চেয়ে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়িতা"র একটি কপি। বইটি তাঁকে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল, যদিও এর কয়েক মাস পরে সরকারী ফৌজের অতর্কিত আক্রমনে প্রাণ হারান সুবোধ।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর তরুণ সদস্য নুজোটোর মৃত্যুদণ্ড হলে, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি শেষ কথা বলে যান, কবিরই লেখা গানের দুটি কলি দিয়ে :

"আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে,
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।"

আর ১৯৭০-এ যখন দিল্লীতে যাই আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে, তখন সেখানে সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতাকে ধিক্কার দিয়ে, ভিয়েৎনাম গণ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা থেকে :

"নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে :
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা
অরণ্যের চেয়ে।"

তখনও দুই ভিয়েৎনাম এক হয়নি। তাই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধা আবৃত্তি করলেন কবির অন্য কটি লাইন :

"তোমরা এস তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ ঘোষণা বাণী জাগাও বীর রবে
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু
পরাণ দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।"

একটু ভিন্ন ধরণের দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। ১৯৬২-তে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি মহাসম্মেলনে আমার সৌভাগ্য হয় কৃষ্ণকায় মার্কিন মণীষী ডুবোয়ার সঙ্গে পরিচয়ের। তিনি আমাকে জানান যে রবীন্দ্রনাথ যখন শেষবার মার্কিণ মুলুকে যান, তখন ডুবোয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করে, কৃষ্ণকায় মানুষদের নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হবার সব তথ্য তাঁকে জানান। কবি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি দেশে ফিরে নিয়মিত ভাবে তাঁদের সম্বন্ধে সত্য কথা কাগজে লিখে যাবেন। ফিরে এসে বৎসরাধিক কাল কবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের উপর নির্মম অত্যাচারের কথা ধারাবাহিকভাবে লিখে যান "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকাতে, বিশেষ সংবাদদাতা ছদ্মনামের আড়ালে।

আর আমি যখন শেষবার মস্কোতে যাই, তখন সেখানে লেনিনের ব্যক্তিগত লেখার মহাফেজখানাতে দেখতে পাই ১৯২২-এ তাঁর স্ত্রী ক্রুপ্‌স্কায়া ও তৎকালীন সোভিয়েত শিক্ষা সচিব লুনাচারস্কিকে লেখা ২টি চিঠি। তাতে লেনিন লিখছেন যে ভারতের বিশিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যায়তন বানান। সেখানে নাকি তিনি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন শ্রমকে এবং শ্রমের সঙ্গে আনন্দকে। তিনি একেবারেই মার্কসবাদী নন, কিন্তু তাঁর ও আমাদের শিক্ষাদর্শতো খুবই কাছাকাছি রয়েছে। তোমরা এঁর সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত, ভাল করে জানবার চেষ্টা কর।

কত কাছাকাছি, তা লেনিন দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু পৃথিবী তা জানে, যখন কবি রাশিয়াতে গিয়ে বল্লেন যে এ দেশ না দেখলে তাঁর এ জন্মের তীর্থ দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

কবির জন্মের ১২৫ বছর উপলক্ষে বেতারে একটি ছোট বক্তৃতায় আমি যে কথা বলেছিলাম, তার অংশ দিয়েই আজ শেষ করছি ঃ

'অনেক মৌলিক ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য আজও আমাদের কাছে অম্লান। যেমন ধরা যেতে পারে যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সভ্যতার পিলসুজ' অথবা 'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাত'—সে সমস্যার কি আজও নিরাকরণ হয়েছে সারা পৃথিবীতে ?

অথচ সেটাই তো তাঁর মতে এ যুগের সব চেয়ে "বড় খবর"।...আর সব চেয়ে প্রাসঙ্গিক, দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় ইতিহাসের অগ্রগতির ছন্দের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর পা মেলানোর চেষ্টা, আর তারই জন্য তাঁর ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করার অশ্রান্ত, অসমসাহসিক প্রয়াস।

উত্তরাধিকার

(চিন্মোহন সেহানবীশ স্মরণে)

মনীন্দ্র রায়

এভাবেই চলে যায়
দিন মাস বছর বছর,
দান্তের কবিতা আসে
গালিলিও উদ্‌ভাসন
লেনিনের নতুন সমাজ,

একটি স্ফুলিঙ্গ তাঁর
লেগেছিল তোমার প্রাণেও
তুমি নম্র কর্মিষ্ঠ জীবনে
স্বপ্নে, ঘর্মে, সংগ্রামে, হাসিতে
বিকিরণে দিয়ে গেছ জ্যোতি ;
হে কিশোর, নব যুবকেরা,
নাও সেই বীজধান
ছড়াও দিগন্ত-ছোঁয়া
মানবজমিনে
শ্রমে-জলে গড়ে তোলো
মণ মণ সোনার ফসল—
এ তোমার উত্তরাধিকার।

কবিতার অভিলাষ আনন্দ

রথীন ভৌমিক

সেদিন এক তরুণ কবি কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, কবিতার রসাস্বাদন ব্যাপারে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরো' এই মতবাদ একদল প্রাচীন পুঁথি লেখকের। এসব পুরোনো ভাবনার আর কোনো ধার নেই আজ। লক্ষ্য করেছিলাম, তার কথা বলবার ভঙ্গির মধ্যে একধরণের উপেক্ষা ছিল। স্পর্ধিতভাবেই নেমে এসেছিল তার উচ্চারণগুলো অনেকটা। হয়তো এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তবু এটা বেশ তাৎপর্যময় বলে মনে হয়েছে আমার। কেননা তার চোখের মধ্যে এবং উচ্চারণে সবসময়ের তরুণ কবিদেরই বিলাসকে দেখেছিলাম। এটা যে আমাকে তেমন চমকে দিয়েছিলো তা নয়। ওই মুহূর্তে আমি ওই উত্তরটাই আশা করেছিলাম। আর এর একটামাত্র কারণই মনে হয়েছে আমার, ভারতমনীষার প্রতি একটা উন্নাসিকতা, যাকে ছুঁয়ে আছে চারপাশে একটা অর্ধসত্যের বেড়া এবং প্রতীচ্যের প্রতি অনঢ় বিশ্বাস।

না, আমি পাশ্চাত্যের প্রতিভা এবং মনীষাকে অস্বীকার করছি না। কারণ সে হবে প্রবল মিথ্যার সূচনা। আর এমন একটা প্রগলভ ভাবনা তৈরি করে তুলতে পারে এমন একটা অভাগ্য পরিণাম, যার কোনো প্রতিব্যূহ নেই। কিন্তু ভারতমনীষার এই অস্বীকৃতি, এতো অনিবার্য অন্তর্লীন কোনো বিচারবিক্ষোভ নয়, এতো এ ধরণের হীনমন্যতা রিক্ততার অবসাদ।

আবেগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্রই মেধা ও মননের দ্বারা কি কবিতার শরীরকে সাজিয়ে তোলা যায়! যেটা হয়, সেটা শুধুমাত্র শব্দ কৌশল। কিন্তু একটা আবেশ ক্রমশ ঘন হতে হতে যখন শব্দকে স্পর্শ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন অনেকটা অগোচরেই সৃষ্টি হতে থাকে কবিতার কথা। অর্থাৎ পংক্তির পর পংক্তিতে তৈরি হয়ে ওঠে একটা নিবিড় নির্মাণ, যেখানে আকাঙ্খা এবং আরক্ত অধীরতা এক অনায়াস সুষমায় দাঁড়াতে চায়। নিঃশব্দ অথচ মুহূর্তজাত এক প্রগাঢ় হিল্লোল, যা প্রাত্যহিকতার সীমানা হারানো এক গভীর চৈতন্যের রূপারতি।

তাহলে কিভাবে উঠে আসে কবিতা? তা কি শুধুমাত্র আকস্মিক অনুরণনের প্রতিস্বর? হয়তো তাই। কিন্তু পুরোটাই কি তাই? কবির

চেতনার গভীরে ভিতরে ভিতরে কিন্তু একটা সৃষ্টির ধ্বনি সংবৃত হয়ে উঠে আসতে চায়। অর্থাৎ যাকে বলে ভূমি, তা তৈরি হয়ে ওঠে। আর সেই মুহূর্তে যদি কোনো তীব্র আঘাত উঠে আসে বহির্বিশ্বের কোনো ঘটনা প্রবাহের সংঘর্ষে, তখনই খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে অন্তর্লীন সমস্ত স্পন্দন অনিবার্য ছন্দ শব্দের প্রবল বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। এভাবেও বলা যায়, বন্ধ দরজা খুলে যায়। অর্থাৎ কবির মনে পূর্ব থেকেই একটা প্রস্তুতি তৈরি হয়ে ওঠে, যা তাৎক্ষণিক (immediate cause) প্রত্যাঘাতে নিজস্ব প্রতিমা বাসনারঞ্জিত হয়ে নিষ্ক্রান্তির জন্য তৈরি হয়। শব্দে ছন্দে গ্রথিত হয়ে ওঠে একটা হৃদয়সংবাদ বা তীব্র অনুভব, যার মধ্যে প্রতিভাসিত হয় দিনযাপন এবং মনযাপনের সুষমাশাসিত অজস্র মুহূর্ত। প্রাক্ উন্মোচন কালে একান্তভাবে কবিরই থাকে সেই মুহূর্ত, কবির হৃদয়সংবাদে স্নাত। কবিরই অগোচরে অর্থাৎ কবি এ ব্যাপারে প্রকৃতই নির্বিকার এবং নিস্পৃহ থাকেন, পাঠকের সাথে তার যখন সংযোগ ঘটে অর্থাৎ আত্মনিবন্ধন ঘটে, তখনই উদ্‌বোধিত হয় 'রস'। আর এখানেই যত দায় কবির। অর্থাৎ কবির নির্মান প্রতিভার উপরই যত কিছু নির্ভর করে। আনন্দবর্ধন বলছেন, কাব্যের দোষ দুরকমের— কবির অব্যুৎপত্তি এবং অশক্তিজনিত। (দ্বিবিধো হি দোষঃ—কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোঽশক্তিকৃতশ্চ)। যদি সে সংযোগ ভুল হয়ে যায়, যদি তার প্রতিমাবিশ্ব শুধুমাত্র শব্দের ছল হয়ে দাঁড়ায়, যদি তাঁর আবর্তন এক সংকীর্ণ মণ্ডলে মগ্ন হয়ে পড়ে, তাহলে তাঁর সমস্ত যত্ন প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে 'রস'-এর উন্মোচনে। কেননা 'রস'-এর উন্মীলন কোনো পরাশ্রয়-নির্ভর নয়, ''রস'-ই তার নিজ প্রয়োজনে সৃষ্টি করে নেয় তার বহিরঙ্গ। অতএব কবিকে জানতেই হবে, কোথায় পৌঁছতে হবে, কতদূরে এবং কিভাবে। কিভাবে তাঁর প্রতিমাবিশ্বে উঠে আসবে সত্যের সমগ্রতা। আর এও তো অপূর্ব নির্মানক্ষম প্রজ্ঞা নির্ভর।

সেই বহু শতাব্দী পূর্বে এক কবির অন্তরীণ আবেগ তাঁর স্বতোপ্রণোদিত উচ্চারণে যে অবয়ব নিয়ে উঠে এসেছিলো, তা বিশ্বের প্রথম কবির কাছে এক বিস্ময়ই ছিলো,—

'তস্যৈবং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদিবীক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥'

শোকে অভিভূত হয়ে এই যে উচ্চারণ, এ কী? এই ছিলো কবির জিজ্ঞাসা। আমাদের ছন্দে রক্তে সেই জিজ্ঞাসার ধ্বনি আজও এক বিশ্বাসে বৃত হয়, এটি কাব্য ছাড়া আর কী? যে তরঙ্গ ছিল অন্তর্লীন, তা জেগে

ওঠে আলোয়। তার শব্দ স্পর্শ রূপ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়ে আমাদের ভিতরে গুহায়িত অবিচ্ছিন্ন এক মগ্নলোক উঠে আসে সমগ্রের সঙ্গে অনুরণিত হতে। অর্থাৎ পাঠক যেন বলে উঠতে পারেন, এ শুধু তোমার বাণী নয় গো বন্ধু, এতো আমারও।

কিন্তু কেন এই উজ্জ্বল বিশ্বাসবৃত উল্লাস? আসলে এতো এক মনসত্যের দরজায় পৌঁছবার সোপান। আর সত্য মানে কি, সত্যের ভগ্নাংশও? না কি আভা? না। খণ্ড নয়, সত্যের সমগ্রতার বিভা সেখানে, সেইখানে। কিন্তু তারও আগে আসে, কোন্ কারণে ওই সত্যের অনুরণন উঠে এলো, যে গুণে ওই কবিতা আমার বিশ্বাসের জগৎকে সম্পূর্ণ আবরিত করে, এক নব মহিমাব্জে বৃক্ত হলো।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞদের নানা মতপ্রবাহের মধ্যে আমরা হয়তো খুঁজে পাবো সঠিক উচ্চারণকে। রীতি, শব্দ, অলংকার বা বাচ্যার্থ—কোন্‌টি বরণীয়? নির্মম সত্য এই যে, ওইগুলি কাব্যের ভগ্নসত্যের উন্মোচন ছাড়া আর কি-ই বা! ওগুলির সাথে কবিতার নিবিড়-অবস্থার কোনো যোগ নেই। আসলে কাব্যের রসাস্বাদন, যা বোধ এবং বিশ্বাসের যুগল প্রক্রিয়া জাত, শুধুমাত্র পুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব কি? না। কারণ যথার্থ কাব্যের অন্তর্গত শরীরে যে আনন্দ অদৃশ্যভাবে স্পন্দিত, তার জন্য চাই স্বতন্ত্র এক কল্পবোধ, যা মেধার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ তো হৃদয়ের একটা দ্রব অবস্থা। আর এইখানে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, 'আনন্দ' কোনো-ভাবেই স্থূল 'খুশি'র অবস্থা নয়। 'আনন্দ' হচ্ছে মনের একটা 'দীপ্ত' প্রবৃত্তি-নিরপেক্ষ অবস্থা। আস্বাদন যার মূল কথা।

আর আনন্দের সন্ধানইতো পাঠকের মূল লক্ষ্য। অথচ আমরা কত সহজেই একটি কবিতার মূল্যায়ন সেরে, তার প্রাণহরণের ফতোয়া দিই। আসলে আমরা কাব্যের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা আর অভিমানকে বুঝতে চাই না। চতুর এবং ডগডগে শব্দবিন্যাসের চাতুর্যে ভুলে আমরা অ-কবিতাকে পুরস্কৃত করি। তুচ্ছ তাৎক্ষণিকের মোহে কবিতার আত্মা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থেকে যাচ্ছি। আমরা কেউ কেউ আজ যথার্থ কবিতার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-আবেগকে ধরে নিতে পারি না।

সেই প্রাচীন মনীষা বলছে, 'অথ চ বাচ্যবাচকরূপ লক্ষণ কৃত শ্রমানাং কাব্যতত্ত্বার্থ ভাবনাবিমুখানাং স্বরশ্রুত্যাদিলক্ষণমিব প্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণ-বিদামগোচর এবাসাবার্থঃ।' (ধ্বন্যালোক) বাচ্যবাচকের লক্ষণের জ্ঞান যাঁদের

যাঁদের সমস্ত শ্রম নিয়োজিত, অথচ বাইরেও অর্থাৎ বাচ্যের অতিরিক্ত কাব্য-তত্ত্বের আস্বাদনে অনাগ্রহী তাঁদের কাছে প্রকৃত কাব্য অর্থ কোনোদিনই উন্মোচিত হয় না। যেমন সংগীতের লক্ষণ নিয়েই যাদের কারবার, তাঁদের অনুভূতির মধ্যে সংগীতের সুর ও শ্রুতি কোনো কম্পন বা তরঙ্গই তোলে না। তাঁদের অনুভূতিতে মস্ত ফাঁক রয়ে যায়।

তাহলে এই অনুভূতিই কি কবিতা এবং পাঠকের মধ্যে সংবাহক রূপে কাজ করে না? আর এই অনুভূতিকে যাঁরা নির্মম ভাবে সরিয়ে দিতে চান, যাঁরা শুধু খুঁজে ফেরেন কবিতার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ফ্রেম, তাঁদের কবিতা আড়ম্বর যতই প্রসাধিত হোক না কেন, তাঁরা কোনোদিনই পৌঁছতে পারেন না কবিতার 'আত্মা'য়। 'আত্মা' তাঁদের নাগালের বাইরেই থাকে। সত্য উপলব্ধি থেকে তাঁরা অনেক দূরে।

মূল কথাটা কি, উঠে আসার ভাবনায়? ওই যে 'আত্মা' ওটাই কি তবে কবিতার 'অন্তর', যার মধ্যে সমস্ত 'না বলা বাণী' বাসনালিপ্ত হয়ে উন্মোচনের প্রতীক্ষায় সমাহিত, আমাতে তোমাতে উচ্চারিত এবং লগ্ন হতে চায়? গঙ্গোত্রী নয়, সাগর সঙ্গমই যার স্বরূপ, সেই 'অন্তর'-এর নিঃশব্দ সঞ্চারই তো আমাদের অভিলাষ। এ ভাবে বলা যায় কথাটা, 'আত্মা-কে কি ভাবে চিহ্নিত করবো? 'আত্মা'র কাজ কি? না শরীরকে অর্থাৎ গোটা শরীরকে চালিত করা। শুধুই কি শরীর? পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন নিয়ে যে শরীর, সেই শরীর। 'আত্মা'-র ধারণাটা তো আজও কেউ দিতে পারেন নি বলেই মনে হয় আমার। 'আত্মা' তো কোনো স্পর্শগ্রাহ্য বস্তু নয়। একটা অনুমানভিত্তিক ব্যাপার। অবশ্য 'অনুমান' অর্থে অনেকে 'ধারণা' ভাবতেই পারেন। কিন্তু 'অনুমান' এবং 'ধারণা' ঠিক সমার্থক নয়। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধ এই 'অনুমান'। অবশ্যই সে অনুসন্ধান মগ্নচৈতন্যের গভীরে লীনতার মধ্যে। ধারণা তো একটা বাহ্যিক সমর্থন থেকে উঠে আসা। এই 'আত্মা'কে ছোঁয়া যায় না। আবার তাকে অগ্রাহ্য করবো, সেখানেও আছে অনেক দীনতা। তা যদি না হতো, তাহলে তাকে বাইরে এনে অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যেত। আসলে তাকে বোঝাটাই মূল কথা। এবং এর জন্য চাই 'অনুভূতি', অপ্রত্যক্ষ একটা মনতরঙ্গ, যা অনুভাবনার চারপাশে একটা পদ্মের পাপড়ির

মতো ধীরে ধীরে ফুটে বেরোয়, যার অভাবে আমাদের বোঝার দরজায় এসে থেমে যেতে হয়।

আর কাব্যেরও তো 'আত্মা' অপ্রত্যক্ষ, অস্পর্শিত এবং উপলব্ধি ভিত্তিক ব্যাপার। আর কাব্যের 'আত্মা' তো ওই 'ধ্বনি'। তবে কাকে বলবো 'ধ্বনি'? সে কি শব্দ? না। এই 'ধ্বনি' হচ্ছে ব্যঞ্জনা। কাব্যের বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে যার বিহার অন্য কোনো লোকে। অর্থাৎ এই 'ধ্বনি'র মধ্যে রয়েছে এমন এক প্রসারণ সামর্থ্য, যা আমাদের চেতনায় গভীর থেকে গভীরতর লোকে বিন্যস্ত হয়। অর্থাৎ এ যেন এক শ্যামলিম সুরাভিসার। ওই যে নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে এক খণ্ড পাথরকে যদি ছুঁড়ে ফেলা যায়, সেখানে যেভাবে তরঙ্গের পর তরঙ্গের বিস্তার ঘটে, এও তো তাই। কিভাবে বোঝানো যাবে এ তত্ত্বকে? অলংকার শাস্ত্র বলছে, যার কিছুমাত্র কাব্যবোধ আছে, তাকে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখানো যায় যে কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'ধ্বনি'। কিন্তু এও তো এক ধরণের ভ্রান্তি। সংশয় আসে এখানেই। যা অপ্রত্যক্ষ বা অ-স্পর্শ অর্থাৎ মগ্নচৈতন্যে যার চলাচল, তাকে কীভাবে হাতে কলমে প্রমাণ করা যায়? যায় না। আর যায় না বলেই, এ বোধের দরজায় পৌঁছবার জন্য তৈরি হতে হয় পাঠককে। এখানে কিন্তু পাঠকের মস্ত দায় থেকেই যায়। নইলে পাঠকের সাথে কবিতার থেকে যায় দুস্তরণীয় দূরত্ব। কবিতার অন্তঃস্বর তার কাছে অজানাই রয়ে যায়। সে কিছুই অর্জন করতে পারে না। যখন কবি বললেন, 'আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা'—পাঠের পর কোন্ প্রতিক্রিয়ায় আমাদের কেঁপে উঠতে হয়? এর শব্দার্থকে নিয়ে যদি মেতে উঠি, যা পণ্ডিতমন্যেরা প্রায়শ করে থাকেন, তাহলে মস্ত এক ফাঁকিতে পড়ে যাব আমরা। এর আস্বাদ্যরূপটিকে কি কোনো শব্দের সাহায্যে সীমায়িত করা যায়, না অন্য হৃদয়ে সংবাহিত করা যায়? আমাদের অনুভূতিতে এই কবিতাটি এমন এক আনন্দ আস্বাদনে নিয়ে যায়, যা একমাত্র অনুভবেই উঠে আসে। মনের ভিতর কাঁপতে থাকে অজস্র না-বলা। কবিতাটি পাঠ অন্তে এক নিবিড় গোপন বেদনা এক চরম বিস্ময়-বোধ এবং নিরুত্তরতার মধ্যে গড়িয়ে পড়ে। আর একে হাতে-কলমে প্রমাণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সমমনের পাঠকই এর সাথে লগ্ন হতে পারেন। আর এই তো 'ধ্বনি'। শুধু আবিষ্ট, আবিষ্ট হয়ে পড়া। অথবা 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও / তারি রথ নিত্যই উধাও'—কবির এই জিজ্ঞাসা তাঁর আপন 'আমি'-র প্রতি সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন পাঠকের

বোধের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে মহাকালরূপ জ্যোতির্ময়তার মধ্যে মিশে যেতে চায়। এই সর্বময়তারই অন্য নাম 'ধ্বনি'। আর এখানেই, যেখানে অলংকার শাস্ত্র বলছে 'হাতে কলমে' প্রমাণ দেওয়া যায়, অলংকার শাস্ত্রের সাথে আমাদের মতান্তর। আরও ভাবনা এসে যায় এই ভাবে। কবি গাইলেন, 'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয় / মাঝে মাঝে তোমার পরশখানি দিও'—এ সংগীতের অভিঘাত অন্য কোথাও। এর 'আত্মা'-র অনুভবে ষোড়শ ইন্দ্রিয়ের বাইরে সপ্তদশ ইন্দ্রিয় 'মন'-ই পৌঁছতে পারে। পাঠকের 'অন্তর' আর কাব্যের 'অন্তর' পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যখন সঞ্চালিত হয়ে ওঠে, তখনই সম্পূর্ণ হয় এর 'রস'-এর আস্বাদন। অবচেতনের থেকে উঠে আসা এক জ্যোতিঃস্বত্ত্বা মনভুবনের নিঃশব্দ তরঙ্গ মিলে মিশে এক মন্ত্রের রূপ নেয়ঃ যেখানে উচ্চারিত হয় 'আলো আমার আলো, আলোয় ভুবন ভরা'।

অবশ্য অনেক কবিতা এমনই চারুময় যে, মনে হতে পারে এই বুঝি সে বাচ্যের সীমা ছাড়িয়ে 'ধ্বনি'তে মিলে গেলো। কিন্তু চারুতা যে কাব্যের 'ধ্বনি'র সহায়ক নয় সবসময়, এটাও জানা দরকার। অথচ আমরা প্রায়শ কবিতা পড়ে আহা / উহু বিশেষণে ভূষিত করি কবিতাকে। এটা যদি খেলাচ্ছলে হয়ে থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাতো ঘটে না সব সময়। 'ভালো লাগা' আর 'আনন্দ' এক নয়।

এবং 'আনন্দ'-ই ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম' কি? তার স্বরূপ কি? তার কি কোনো আকৃতি ও প্রকৃতি আছে? না, 'ব্রহ্ম'-কে আমরা কোনো আকৃতির মধ্যে পাই না। স্পর্শের মধ্যে পাই না। গন্ধের মধ্যে পাই না। শুধুমাত্র অনুভবে এবং ধ্যানে এর উন্মোচন। বা প্রকাশ। 'ব্রহ্ম' বাচ্যের বাইরে, 'অব্যক্ত'। বলা-ও না, না-বলাও না। তাকে বোঝানো যায় না। শুধু আলোড়ন। সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে, সমগ্র চৈতন্য জুড়ে, চেতন-অচেতন ব্যাপ্ত করে শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গের ওঠা নামা। এই তো 'ব্রহ্মে'র আস্বাদন। সনাতন মনীষার এইতো অনুধ্যান ব্রহ্মবিষয়ক। আর ঠিক, যথার্থ কবিতা পাঠে এইরকম এক ধরণের প্রবল আলোড়ন ওঠে সৎপাঠকের অর্থাৎ সমমর্মী পাঠকের সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে। তাকে কোনো 'শব্দে' ধরা যায় না। বোঝানো যায় না। আর সেই জন্যই সমৃদ্ধ কবিতা পাঠের যে আস্বাদন, তা ওই 'ব্রহ্মস্বাদ সহদরো'। 'আনন্দ'-র কোনো সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারেন নি বলেই ভারতমনীষা তাকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহদরো' বলে উল্লেখ করেছেন। 'আনন্দ'র চূড়ান্ত অবস্থা 'ব্রহ্ম' আস্বাদন। এ ছাড়া আর কিভাবে বোঝানো যাবে 'প্রবল আনন্দ' কে? 'আনন্দ'-র স্বরূপ কে?

অত্যন্ত বিনয়ের সাথেই বলবো, কবিতার আস্বাদনে যে আনন্দ, যা পাঠকের মগ্নচৈতন্যে জাড়িত হতে হতে এক অমরাবতীর দরজায় পৌঁছে দেয়, সেই আনন্দকে এর চাইতেও কোনো অনিবার্য এবং সুন্দরতম অনুভব এবং অভিধায় চিহ্নিত করতে পেরেছেন কি কোনো পাশ্চাত্য মনীষা?

শুভ বসুর কবিতা

ঢের হুজ্জোতের পর

রওনা হওয়ার লগ্নে বুক বাঁধবারই কথা ছিল
ছুটকরো যদিও, তবু পুরনো শিকল ছিঁড়ে জেগে উঠতেই
হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা আর ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ-এ
এত তুলকালাম ধুন্দুমার, মনে হত নটরাজ দুন্দুভি বাজিয়ে
এসে পড়লেন বলে জল-ছেঁচে-তুলে আনা লক্ষ্মীর দেশ এই
ভারত ভূমিতে
শুধু খানিকটা সবুর করার ব্যাপার
তারপর ছুরি আর রক্ত রক্ত আর আগুন আগুন আর মিছিল
নিঃসঙ্গ আইবুড়োদের যৌনতাপ, ফুটপাতের সংসারে ভাতের
ফ্যানের গন্ধ
কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া, কালো গাড়ি, সর্পপারাবত সহবাস
বিস্বাদ চায়ে কণ্ঠা বেরোন মুখ-ঝুলে-পড়া যৌবন
তবুতো স্বপ্ন প্রবল, নাছোড় কমলি

তাই ঝমাঝম দিন বদলের হল্লা, বিজয় উৎসব আর রক্তিম আবিরে
সময় গ্রন্থির মুখ লাল করে দেয়া, এ ওর মুখের দিকে রক্তিম
আবেগ নিয়ে ভাবা
ইতিহাস একেবারে সান্তাক্লস কখনো কখনো
সে খোঁয়াড়ি ভেঙে মানুষের মুখ আচমকা যেন নরকের
কাদায় কাদায় ভরে যায় যেন যমের দুয়ার খুলে যায় আর
তরুণ কিশোর
স্বেচ্ছায় তার টান মেনে নেয়, মোড়ে মোড়ে দিন অন্ধ এবং
বাবুদেরও নেই কান্নার আর বিষাদের আর সৃষ্টির কোনো গান
সেই তাণ্ডব মিটে গেলে এই অবাক পৃথিবী

আহা কী মাদক এখানে এখন আকাশে পাতালে চাতালে
মৃত্যু এবং জীবন দুজনই স্বাধীন খেয়ালে গাল টিপে দিয়ে
পরস্পরের
কানামাছি খেলে, সারা দিনমান আকাশ হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে
পরস্পরের সমঝদারিতে কী মজায় আছে ব্যাঙ আর সাপ বাঘ ও
হরিণ
নশ্বর হওয়ার আনন্দে বাঁচে গোরু আর ঘাস, কেয়াবাৎ নাচে
ঢেঁকি আর ধান
এই মজা মাজাকীও ছেড়ে যেতে হবে একদিন ?

দীর্ণ বীজের খোয়াব

তোমার হাতে তুলে দিয়েছি আমার দীর্ণ বীজের অপার তৃষ্ণা
এইবার তারা সব আলবাল উল্লাসে মাতিয়ে
প্রবল দাপটে ফাটবে এবং দিগন্তব্যাপী ফ্যাকাশে রেখার
হাহাকারের ওপর
গজিয়ে উঠবে হরিৎকুলের কলজে-মজানো আড্ডা
সপ্তসিন্ধু দাবড়ে বেড়ানো বাউণ্ডুলে বাতাস
সেখানে কখনো নিজের খেয়ালে চরণটি ফেলা মাত্র
মাথা নেড়ে দ্রুত কোরাস গাইবে ছোকরা এবং তরুণ হরিৎসন্তান
ভোর হলে রোজ অন্তরীক্ষে নহবৎ বসাবেই বিহঙ্গমদল
চারিদিকে রমরমা এমন উৎসব আহা ফোটানো ব্রততয় ছয়লাপ
ইঁদুরকুলও ভুলবে শেকড়-কাটার কারণ কৌশল
কিন্তু যে মাটিকে নিয়ে এইসব ধ্রুপদী খোয়াব
তা কি আজো অঙ্কুরের ধাত্রী হতে জানে, শিশিরের প্রসন্ন ছোঁয়ায়
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে আলোর চরণস্পর্শে পূর্ণ হওয়া জানে
তোমার হাতে আছে কি সেই অলৌকিক পারঙ্গমতা
যা ওই বীজের অনেকদিনের যন্ত্রণাময় তৃষ্ণায়
মিশিয়ে দেবে প্রতিকূলেও ফেটে পড়ার ফুটে ওঠার আবেগ

সুবোধ সরকারের কবিতাগুচ্ছ

ভয়ঙ্কর লেজ

আমার সমস্যা হল লেজ ও ডানার কোন পার্থক্য বুঝিনি
নারীর ডানাই হল প্রধান রহস্য, খালি চোখে সেই ডানা

এখনো দেখেনি কেউ, খালি চোখে যে দেখেছে অন্ধ হয়ে গেছে
দপ্ করে জ্বলে ওঠে সহস্র নক্ষত্র সেই আশ্চর্য ডানায়।

আমার সমস্যা হল এগারো বছর ধরে কিছুই না পেয়ে
অন্ধকারে আমি তার লেজ পাড়িয়ে দিলাম, প্রথমে বুঝিনি

পরে বুঝলাম আমি আশ্চর্য পার্থক্য আছে লেজ ও ডানার
আমার পা বেয়ে যেই দ্রুত উঠে এল সেই ভয়ঙ্কর লেজ।

জিভ

জিভ ঝল্‌সে যাবে
যদি মিথ্যা বলি।

জিভে কুষ্ঠ হবে
যদি মিথ্যা বলি।

খসে পড়বে জিভ
খসে নড়বে জিভ।

কালো পিচের পথে
জামফলের পথে।

তুমি কোথায় থাকো ?
কোন্ ভূতের দেশে

যদি মিথ্যা বলি
ব্লেড চালাও কানে।

প্যাপিরাস

বাবা গেছে ভাই গেছে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে গেছে
কিন্তু কাগজ শুনে রাখো আমার ঔরস থেকে তুমি
সহসা জন্মেছ প্যাপিরাস, তুমি আমাকে ছেড়ো না।

যখন তোমাকে আমি নাকে ধরে গন্ধ নিই, শুঁকি
আমার সন্তান নেই তবু মনে হয় যেন তুমি
আমার মেয়ের গন্ধ আমার ছেলের শিশুত্বক।

আমার কি হবে আমি বলতে পারি না, ময়ূরের
ভেতরে হয়ত আমি টিকে যাব দাঁড়কাক হয়ে
অথবা বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়ে টুঁটি ছিঁড়ে খাব।

কার টুঁটি ? অন্ধকারে কার মাথা পুড়ছে, বোঝ না ?
নিজের মাথার ঘায়ে কী ভুল বকছি প্যাপিরাস
ভাইবোন ছেড়ে গেছে তুমি যেন ছেড়োনা আমাকে।

তোমার প্রথম প্রেমিক

তোমাকে সকাল থেকে অনুসরণ করছি উজ্জয়িনী পেছনে তাকাও
আমি এই চলমান পৃথিবীর প্রথম প্রেমিক।

মেঘ করে এসেছিল বলে, কালো বৃষ্টি নেমে এসেছিল বলে
সরস্বতী তীরে তুমি আমার দৃষ্টি থেকে সরে গিয়েছিলে।

ওই পিঠ, ওই বেণী, চাবুকের মতো নেমে আসা শিরদাঁড়া
পিঠের যেটুকু ঢাকা, অলৌকিক কাটা দাগ, আমি সব চিনি।

পৃথিবী তখন ছিল নিরাপদ, নদী থেকে স্নান সেরে তুমি
বনের ভেতর দিয়ে একা, একেবারে একা বাড়ি ফিরছিলে।

তোমাকে অনুসরণ করেছি সেদিন, ক'রে অন্যায় করি নি
তখনো পর্যন্ত কোন পুরুষ ছিল না ওই বনের ভেতর।

কিন্তু আজ আমি জানি ক্যামাক স্ট্রিটের বাঁকে প্রতিটি মুহূর্তে
একজন, একজন ভয়ানক সুপুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নই, তবু কারা যেন আয়না টাঙিয়ে
চন্দ্রাহত হয়ে সারারাত শ্যাডো প্র্যাকটিস করেই চলেছে।

সরস্বতী নদী নয়, পিচ রাস্তা ধরে তুমি এগিয়ে চলেছ কার কাছে?
কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে উইলো গাছের পাশে শিবিকা থামিয়ে?

এগিয়ে চলেছ তুমি, ওই পিঠ, কাটা দাগ, আমি সব চিনি
পেছনে পেছনে আমি, সেই সাংঘাতিক ছায়া, আমিই তোমার
সেই প্রথম প্রেমিক।

দুই মৌজার গল্প

প্রবীর নন্দী

হাটিমারা মৌজার শ্রীপদ এখন চরজিরাট মৌজার পঞ্চায়েত অপিসের বারান্দায়। দেওয়ালে পিঠ, উবু হয়ে বসে এককোণে। পাশেই দরজা, কাঠের। সামনে ফালি যাতায়াতের পথ। তাই শ্রীপদ 'দ' মেরে বসে। হাঁটু ভাঙা। বাঁ পা-টা ত্রিভুজের মতো করে রাখা। আর ডানটা ঈষৎ এলিয়ে, প্রায় কোণাকুণি। এরকমভাবে বোধহয় পৃথিবীর কোন সম্পন্ন মানুষই বসতে পারে না। ইস্তক চতুষ্পদ পর্যন্ত। বাদ শ্রীপদ। আসলে শ্রীপদ বরাবরই এরকম তো। আবার হাঁটলে হাঁটাটাও তার কেমন নিজস্বই থাকে। মাথা আর দু'পায়ের নিতম্বটা যেন একরেখায় থাকে না তখন। অথচ সাধারণভাবে তাই থাকার কথা, যা স্বাভাবিক। তামাম হাটিমারা মৌজার কাউকেই ওভাবে হাঁটতে দেখা যাবে না বোধহয়। বাদ একা এই শ্রীপদ। লোকে বলে, 'তাই ছিরিপদ নাহ্—।' ব্যাপারটা বুঝে শ্রীপদরও যেন ভেতরে ভেতরে হাসি গর্তায়। সত্যি। তার নামের যে এমন কারিজুরি কোনকালেই ভেবে দেখেনি শ্রীপদ। আর তাই মাঝেমধ্যেই গালমন্দ করে নিজেকে, 'বাবু মজুর বইনবে না ত এম আর ডিলার বইনবে, হুঁ-উ—'

তা সেই শ্রীপদই এখন উবু হয়ে বসে। রুখু মুখ, ভুরু কোঁচকানো। কপালে রেখার মধ্যেও ভাঁজ আঁতিপাতি। চোখের বাতি ঘোলাটে। কেউ সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে তো সেসব খোলসা। মাথার মধ্যে তার শতেক চিন্তা, কেবল মাছির মতো ভনভনাচ্ছে। জমিজমার মোকাম থেকে এত্তেলা গেছে এর আগে। ফের এখন পঞ্চায়েতের ডাক। নোটিশ। চরজমি বিলিব্যবস্থা হবে নাকি। তা সেই বিলিব্যবস্থায় নাম আছে একখানা শ্রীপদর। শ্রী ছিরিপদ মণ্ডল পিং মৃত গঙ্গাচরণ মণ্ডল সাং হাটিমারা। যেন পুরো একটা পরচা, সরকারী খতেন। তা হবে বৈকি। আসলে তো ওটা পয়োস্তি ভূমি। তামাম হাটিমারা মৌজা ভেঙেই না এই চরজিরেট মৌজার অর্ধেক। ভেতরে ভেতরে তারও যেন সিখোস্তি-পয়োস্তি, কেবল ডরআস্তি। আসার আগে তার বৌ কেমন অভয় দিয়ে বলেছিল, 'যাও।'

'যাব!'

'যাও নাহ্—'

'আবার?'

'হুঁ।'

'ডর নাই! এ হল গ্যে মরণ-বাঁইচনের চিন্তা—'

'আবার মরণ?'

শ্রীপদ ঠোঁট বাকায়, বলে, 'ননাহ্। আমরণ।'

তার সেই হাঁটিমারা মৌজার শ্রীপদই এখন চরজিরাট মৌজার পঞ্চায়েত অপিসের বারান্দায়। চুন বালি পলেস্তরার কাঁটা পানসি দেআলে পিঠ লেপ্টানো। পায়ের আঁকা 'দ' ভেঙে আরো একটু আরাম করে বসে। খুঁট খুলে কাপড়ের তল থেকে বিড়ি বের করতে গিয়েই তার শরীরের নিজস্ব ত্রিভুজটা ভেঙে যায়। যাবেই। একবার কষে টান দিতেই মুখটা তাতেই বিস্বাদ। তেতো নিমফল। নালির কাছে বাসি কফ 'ঘরঘর' করে। যেন ডাকে। শ্রীপদ গলা বাড়িয়ে 'ওয়াক থু' করে বারান্দার বাইরে দু'বার। তাতেও বাসি কফটা নামে না। 'শালা য্যান লাখোয়াজ। মোকররী সইত্ত বইনছে, ওয়াক—' বাঁ হাতের আঙুলে রাখা তার আধপোড়া বিড়ি। পাশেই লখে, মানে শ্রীলখেচরণ। সে-ও উবু হয়ে বসে। হাঁটিমারা মৌজার সে-ও বাসিন্দা। নাম আছে তারও একখানা। এখন হাকুপাকু করে বিড়ি টানছে। মুখে বা আত্তি নেই কেমন শ্রীপদর। আকাট, বোবা।

'এ-এ্যাই ছিরিপদ—'

'হুঁ।'

'তুয়ার হল ডা কি শুনি?'

'বাজে মশ্লা।'

'মশ্লা!'

'শালা। ওয়াক ওয়াক—'

'কৈথেকে কিইনলে?'

'হাঁটিমারা গোঁসাই-র।'

'অ।'

'পাতাখানও কাঁচা। ওয়াক—'

'ব্যাটা আগে ছ্যাল গ্যে বেকার এখন বইনল এম আর ডিলার—'

'ওয়াক—'

'আর তুরি—'

'থুঃ। থুঃ।'

'ব্যাটাছেলে থ্যিকা একলাকে পুয়োতী মেয়েছেলে বইনলে।' হি হি হি। লখের মুখে কেমন এতল বেতল হাসি। শুনে শ্রীপদরও বেশ মজা। হি হি হি। শালা মজাকির একশেষ। হাতের আধপোড়া বিড়িটা সটান দূরে ফেলে দেয় শ্রীপদ। তার মুখের ভেতরটা এখনো বিস্বাদ। কাঁচা কষ যেন জিভের ডগায়। কষ নাকি বিষ! এমন তেতো বিষটান বিড়ি হয় নাকি! শালা পাতাটাও স্যাঁকেনি। কেমন ভট্‌কা গন্ধ নাকে মুখে সেঁধিয়ে ওয়াক—। খালি খালি বিস্বাদ টানছে শ্রীপদ। চোয়ারে ঢেঁকুর উঠছে অতল নাড়ি থেকে। ওয়াক ওয়াক—

দূরে ওই মানুষটাই বুঝি পঞ্চায়েত মেম্বার। অনিল বিশ্বাস না কি নাম। তার হাঁটাচলা আজ কেমন যেন ঘোড়াবাঁধা। একবার ঘর করছে তো আর একবার বাইর। এতোটুকু স্থিরতা নেই। ঘরের পাশে তিনটে চারটে গাড়ি সাঁট পাকানো। কে যেন বলল, 'জে এল আর বাবু এসেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন।' হতে পারে সবই। এত্তেলা যখন গেছে তখন বাবুদের আসবারই তো কথা। অনিল বিশ্বাসের দৌড়াদৌড়ি দেখেই তা মালুম হচ্ছে কিছুটা। তা শ্রীপদ যেখানে বসে তার পাশেই দরজা। ইচ্ছে হয় উঁকি মেরে দেখে একবার ভেতরটা। কিন্তু তার সাহসে একদমই কুলায় না। তার কলিজা বড় ছোট। বুকটা কেবলই ধুকপুক করে। শ্রীপদ উঁকি মেরে আড় চোখে একবারই দেখে। আর না। ভেতরপানে সব বাবুরা বসে। কথাবার্তা চলছে বিস্তর। শ্রীপদ আস্তে চাঁওড় দেয়, 'এ এ্যাই লখে—'

'হুঁ-উ।'

'এখন মিটিঙ চলইছে র‍্যা—'

'মিটিঙ!'

'হুঁ।'

'তালে এটটু পরে মিছিল চইলবার পারে—'

'হি হি হি।'

'এ এ্যাই ছিরিপদ—'

'কি?'

'চোখ পাত না ভেতরে।'

'নাহ্।'

'ননাহ্!'

'ডর লাইগছে।'

'হাঁস। তালে কান পাত—'

'হুঁ।'

'শুইনছিস্?'

'হুঁ।'

'কি র‍্যা?'

'আজ শুধু পনেরো।'

'প-নে-রো!'

'মিরিট বুঝে—'

'মি-রি-ট!'

সিগারেটের গন্ধ ভাসছে বাতাসে, উগ্র-তাজা। কোথাকার সিগারেট কে জানে! শ্রীপদর নাকে-মুখেও তা জড়িয়ে যায় সুতোর মতো। আর তাতেই শ্রীপদর শোনাপাতির মধ্যে ছেদ পড়ে যায় কখন। যেন সুতোটা অকস্মাৎই ছিঁড়ে যায়। ভোঁ-কাটা হয়ে পড়ে। বাতাসে পরমসুখে শ্রীপদ কেবল নাক টানে। গন্ধটা এতো মোলায়েম, নরম প্রায় ফুলের মতো। ভেতরে কেবল টুং টাং শুধু টুং টাং। কাপড়িশের জলতরঙ্গ। শ্রীপদ পিঠখানা বাঁকিয়ে আবার খানিক গোত্তা মেরে সোজা হয়ে বসে। গা-গতরে কদ্দিনের ব্যথা। শরীর নড়ালে-চড়ালেও ভেতরের ব্যথাটা যেন এ্যাত্তটুকুও নড়ে চড়ে না। কেবল নিম। পায়ের 'দ' ভেঙে সে আরো সোজা হয়। একেবারে টানটান, ঋজু। যেন ডান পা-টা মেঝের মধ্যে দেহ রেখেছে, এমন। আর বাঁ-পাটা পিরামিড, নাকি ত্রিভুজ! শ্রীপদ আরো একবার আড় চোখে কেমন তাকানোর ভঙ্গি চালায় ঘরের মধ্যে। কিন্তু আবার সেই ভয়। মনের মধ্যে কেবল ডরআত্তি। তার কলিজা যে বড় ছোট।

'এ-এ্যাই ছিরিপদ—'

'হুঁ।'

'বাবুরা যে ভূটের কথা বইলছে র‍্যা—'

'হুঁ-উ।'

'বেস লাইন কি ?'

'জানি না।'

'মেম্বর বইল একবার যে!'

'জানি না।'

'সেটেলমেণ্ট ?'

'সেটল-মেণ্ট !'

'হুঁ।'

'তাও বইল ?'

'তবে শুইনছিস্ কি?'

'আমি শুইনছি না কেবল ভাইবছি—'

'ভাইবছিস !'

'হুঁ।'

'কি ?'

'বাবুদের সিগ্রেটখানা হাঁটিমারা গোঁসাই-র না ত ?'

'হি হি হি—'

আবার সেই সিগারেটের ফুলেল গন্ধ। ম ম করে ভারি বাতাস। শ্রীপদ ধীরে ধীরে সেই বাতাসে কেমন নাকে টানে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। যেন নাড়ির মধ্যে গন্ধটা সেঁধিয়ে যায় বেমক্কা। তার শরীর এখন টানটান, ধনুকের জ্যা। ডান পা-টা আবার সে সিধে করে বাঁ পায়ের পাশাপাশি বিবশ রাখে। দুটো হাত এখন ত্রিভুজের মাথার ওপরে তার। মাথাটা ঈষৎ ঝোলান, সামনে। আসলে এভাবে বসতে গেলে যে কারো মাথাটা সামনে আসবেই। যেন শরীরের সূত্র ওটা। আর সেই সূত্রের জোরেই শ্রীপদর মাথাটাও সামনে এগিয়ে না এসে পারে না। হয়। তাড়িয়ে তাড়িয়ে তাই দেখে যেন আড়চোখে লখে মানে শ্রীলখেচরণ। তার মুখ এখন ভারি। ভেতরে ভেতরে কেবল সিখোস্তি-পয়োস্তি। শুধু মরণ-বাঁচনের খেলা। হাঁটিমারা মৌজার আরো কয়েকজনকে ঘুরঘুর করতে দেখল লখে। তারাও নিঘ্‌ঘাৎ এত্তেলা পেয়েই এসেছে পঞ্চায়েত অফিসে। এই তারাও যেমন এসেছে সে আর শ্রীপদ।

'এক সময় লখে কেমন চাঁওড় দেয়, 'ছিরিপদ—'

'হুঁ।'

'শুইনলে কিছু ?'

'নাহ্।'

'যারা ভাগ পায়নি ত্যারাও নাকি আইসছে—'

'তা-ই ?'

'হুঁ।'

'যারা ভাগ পায়নি ত্যারা—'

'হুঁ-উ।'

'ব্যাপারডা কি ?'

'পঞ্চেৎ অপিস ঘেরাও হবে।'

'পঞ্চেৎ অপিস !'

'হুঁ।'

'হাঁ গ। ঠিক।'

'পঞ্চেৎ অফিস ঘে-রা-ও হবে ?'

'হাঁ গ। ঠিক।'

শ্রীপদ বড় উৎসুক, পায়ের ত্রিভুজ ভেঙে যায়, বলে, 'ক্যানে ?' 'মা গংগা যাদের জমিখান খেইছে ত্যাদের সব্বাইকে একসঙ্গে জমি দিতে হবে —'

'তাই ?'

'হুঁ। একসঙ্গে। সক্কলকে।'

কথার এই ফাঁক ফোঁকরের মধ্যেই লখে জামার ডান পকেট হাতড়িয়ে কৌটো বের করে বিড়ির। শ্রীপদকে একখানা দেয়। নিজেও ধরায় আরেকখানা। মনটা তেতিয়ে উঠেছে আবার কিরকম। মাথাটাও ভারি, কেবল ঝিম। বিড়ির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সব আবছাঝাপসা। খবর শোনা ইস্তক শ্রীপদর জোড়া কানের লতি লাল। সেই ডরআত্তি। আর হঠাৎই কখন শ্রীপদ দেখল বারান্দা উজিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মেম্বর। অনিল বিশ্বাস না কি নাম। হাতে কাগজপত্তরের লটবহর। সঙ্গে দু'চারজন আরো। ওরাও পঞ্চেতের মেম্বর নাকি ! নাকি অনিল বিশ্বাসের কাছের লোক ! মুখোমুখি হতেই শ্রীপদ কেমন তাড়িয়ে ওঠে, 'আজই হবে ত ?'

অনিল বিশ্বাসের পায়ে যেন ঘোড়া বাঁধা। এই তড়িৎ জিজ্ঞাসায় তার যতোটুকু থামার কথা ততোটুকুই থেমে পালটা প্রশ্ন করে, 'তুমি হাটিমারার ?'

বিড়ির নেশায় মশগুল শ্রীপদ তেরছা উত্তর দেয়, 'কি বইলছ হাঁটিমারার ?

'হ্যাঁ। হ্যাঁ।'

'তা আমি বইলব কি অই মাটিখান র‍্যা জিগেস কর না ক্যান বইলবে—'

'যা জিগ্যেস করছি তাই—'

পাশ থেকে তখন কে যেন শ্রীপদর হয়ে বলে, 'অ হল গো হাঁটিয়ারা মৌজার ছিরিপদ ভাগদং।'

'ভাগদং ?'

'হুঁ।'

'হি হি হি।'

'ভাগদং আবার একটা টাইটেল নাকি!' আবার হাসির রোল ওঠে খানিক। হি হি হি।

'বলি এখন আছ কোথায় ?'

শ্রীপদ হঠাৎই উঠে দাঁড়ায়। এই ওঠা ও দাঁড়ানোর মাঝখানে যতোটুকু সময় পায় তার মধ্যেই সে যেন কথাটুকু সাজিয়ে ফেলে, 'বাবুদের ভুটার লিস্টে হাঁটিমারার নাম ছ্যাল বটে। তো এখন সবি জলের গব্বে। ভুটার লিস্টি-খানও জলের গব্বে। আর ভুটারখানও জলের গব্বে। তবু বাবুরা ভুটারলিস্টে যিখানে নাম তুইলবেন সিখানেই ছিরিপদ আছে—' এক সঙ্গে এতো কথা বলার জনাই শ্রীপদ বোধহয় একটু হাঁপায়। কিন্তু কথাটা বলার পরই মনে মনে সে যেন একটু শান্তি পায়। ভেতরটা কেমন খোলসা লাগে। হালকা ফুরফুরে ভাব আর শীতল। সে যা বলতে চায় তাই যেন বলতে পারল একলহমায়। নিজের কানেই নিজের কথাটা শুনতে বড় একটা খারাপ লাগে না। তার মানে তার স্বর সবই যেন স্পর্শ করা যায়। বেশ পরিতৃপ্তির ভাব আসে। কিন্তু যে মানুষটাকে এতোসব বলা সে এতোটুকুও রাগে না। শুধু বলে, 'তাড়া আছে কি খুউব ?'

শ্রীপদ ঘাড় নাড়ে, 'ননাহ্।'

শ্রীপদর হাতে তখন আধপোড়া বিড়ি। নেভানো সে তাই ধরায় আবার। বিড়িটা হাঁটিমারা মৌজার গোঁসাই-র হাতে বানানো বিড়ির মতো না ঠিক। বিস্বাদ কম। আর টানলে নালির মুখে কফও ঠেলে আসে না। কাঁচা কেন্দু পাতার গন্ধটাও উবো। টানতে ভালই লাগছে শ্রীপদর। নামে মুখে ধোঁয়া

উগরিয়ে নিজেই কেমন বলে, 'বইলতে গেলে পুরোখানই ত বইলতে হয়। মৌজা হাঁটিমারা জে এল নং ১৫৯ ভাগদং ছিরিপদ মণ্ডল পিং মৃত গঙ্গাচরণ মণ্ডল সাং ১৩৬২ থ্যিকা—'

লখে বিড়ির সুখটান দিয়ে বলে, '১৩৬২ থ্যিকা—'

'হুঁ।'

'১৩৬২?'

'হুঁ-উ।'

'তাই?'

'ক্যানে! রামাপদবাবু যি বচ্ছর মারা যান সি বচ্ছর—'

'তাই!'

'ক্যানে? যি বচ্ছর হাঁটিমারা মৌজায় পথম বিরিজ হল—'

'তা-ই?'

'তুমার কি ভুলো মনে হইছে?'

বাঁ হাতের আঙুলে ধরা বিড়িখানা নিভে যেতেই শ্রীপদ দূরে হড়কে ফেলে দেয় সেটা। তার চোখেমুখে এখন বিস্ময়। কেবল ঘোরআত্তি। আজ সত্যিসত্যি কি শ্রীপদকে ভুলোয় পেয়েছে। অথচ এমন হওয়ার তো কথা না। যেন স্পষ্ট মনে আছে সে বচ্ছরের কথা। গুলিয়ে যাওয়ার নয় তা। অথচ সন্দেহটা ঘনীভূত হচ্ছে আস্তে আস্তে। লখে চুপটি, নীরব। একেবারেই রা-হীন। তাতেই যেন শ্রীপদর দুর্ভাবনাটা অধিক বাড়ে। অতল রূপ নেয় কেমন।

শ্রীপদ ফের চাঁওড় দেয়, 'এ এ্যাই—'

'হুঁ।'

'তালে চ্যারম্যান যি বচ্ছর মারা যান সি বচ্ছর নয়?'

'নাহ্।'

'তালে হাঁটিমারা মৌজায় যি বচ্ছর পথম বিরিজ হল সি বচ্ছর নয়?'

'ননাহ্।'

'তালে?' শ্রীপদর চোখেমুখে ঘোর বিস্ময়।

লখে পিঠটান দিয়ে এবার সোজা হয়ে বসে। একেবারে শ্রীপদর মুখোমুখি। হাতের বিড়িখানা সটান ফেলে দেয় সবুজ চত্বরে। ওর মুখ কোঁচকানো, ভুরুও ঈষৎ। যেন হিসাব কষার জন্যই সে একটু বেশীই সময় নিয়ে ফেলে। বলে, 'আমার বৌ যি বচ্ছর পথম পোয়াতী হল সি বছর—'

শ্রীপদর কেবল বেভুল, বলে, 'তা কতো ?'

'সি বচ্ছর নতুন ট্যাকায় তুরি ফুলে কলাগাছ।'

'কতো ?'

'তুরি আমার ছেলেরে রূপোর বালা দিলে—'

'হুঁ।'

'মনে নেই ?'

'ঠিক। ঠিক। আর আমার বৌ-র জন্যি মাকড়ি—'

লখে চুকচুক করে হাসে, বলে, 'কতো ?'

'১৩৬৪। নয় ?'

'নয়।'

'নয় !'

'ননাহ্।'

'তালে ?'

'১৩৬৬।'

'১৩-৬৬ ?'

'হুঁ।'

' '৬৬ !'

'হুঁ-উ।'

'১৩ শ—'

'হুঁ। হুঁ।'

লখের মুখাবয়বে কেমন হাসির ইলিকমিলিক। দুলছে। মনে হচ্ছে সঠিক হিসাবখানা কাল মহাকাল থেকে বের করতে পারার জন্য বেজায় খুশী সে। এখন তার ভেতরের সেই জ্ঞানোচিত ভাব বাইরেও প্রকাশ পাচ্ছে একটু একটু। নাকি ইচ্ছে করেই ভাবটা প্রকট করে তুলছে। কে জানে! শালা যেমন একটা…

'বুইলে ভায়া, কথাডার য্যান কুনো সিথোস্তি-পয়োস্তি নাই।'

'হুঁ।' লখে সায় দেয় কেমন।

'শুধু এই জীবনডার আছে।'

'হুঁ।'

'তার মরণ বাঁচন আছে—'

'আছে।'

'আছে কি না বল ?'

'আছে'

'আর এই কথাডার কেমন —'

'মরণ বাঁচন নাই।'

'ঠিক কি না ?'

'ঠিক।'

শ্রীপদ কেমন উজান স্মৃতিতে ভাসে, 'বুইলে ভায়া, সি বচ্ছর, বৌ বলে কি না ফসল তো ভালই হল ইবার তুমি একখান পেন্টুলুন গড়াও—'

'প্যান্ট্-লুন ?'

'হ্যা।'

'প্যান্ট্লুন !'

'হ্যা।'

'হি হি হি।'

'ঠ্যালা বুঝ তবে। আমি ধমকে উঠে বলি কালু ব্যাপারীর ছেলেডার মতন বইলতে চাস তুই ?'

'তাই বইললে ?'

'হুঁ। বৌ বলে কিনা খারাবডা কি। মুখেমুখে তক্কো ঠ্যালা বুঝ—'

'তা'পর ?'

'আমি বলি, চোপ। মনে রঙ ধইরছে খুউব। তা পেন্টুলুন ধইরলে কালু ব্যাপারীর ছেলেডার মতন আর সব বদ-জিনিস ধইরতে হয়, নেশাভাঙ কইরতে হয়, নষ্ট মেয়েছেলে নিয়ে—'

'তাই বইললে ?'

'নয়তো কি ! বৌর মুখে তখন কাপড়চাপা।'

হি হি হি। হি হি হি।

অকস্মাৎ-ই ওদের দুজনের হাসিই কেমন যন্ত্রের মতো থেমে যায়। থেমে যাওয়ার কারণ আর কিছুই না। সেই মেম্বর আর তার কাছের লোকেরা একে একে বেরিয়ে আসে বাইরে। খানিক দাঁড়িয়ে দরজার পাশে কিসব কথা বলে নিল পরস্পর। আবার মাছের মতো পিছল শরীর নিয়ে অতিক্রম করে যায় বারান্দা। শ্রীপদ আর লখে তাই দেখে যেন উবু হয়ে। ওরা শরীর ঘুরিয়ে ফের আরাম করে বসে। দেয়ালে পিঠ তাই বোধহয় যুতসই আয়াসটা

বেশীক্ষণ টেঁকে না। কারণ চুন বালির ঘষটান লাগছে ত্বকে, যেন আলতো কাঁটার আঁচড়। তবু লাগছে। শ্রীপদ এখন ঠিক লখের মুখোমুখি না, আড় হয়ে বসে আছে কিছুটা। তার বাঁ দিকটা এখন যেপাশে লখের ডান। আর ডান পাশের আড়াআড়ি যা কিনা এখন শুধুই দেয়াল, ভবিষ্যতে তার আকার পরিবর্তন হলেও বা হতে পারে, এমন। হঠাৎ-ই শ্রীপদর চোখ সেদিকেই কেমন ঘুরে যায়। ফলত কথার গড়নও যেন আর আগের মতো থাকে না। আর একজনের জন্য অন্যজনেরও কথার ধাঁচ সাচ একই হয়ে পড়ে। যেন জলছাপ।

শ্রীপদর চোখ ঈষৎ সেদিকে গড়াতেই কেমন গর্ত্তায়, 'এ-এ্যাই—'

'কি ?'

'ইদিকে—'

'হুঁ।'

'উই যে ওটা—'

'হুঁ-উ—'

'কি ?'

'ভুটের লিখা।'

'কি ?'

'আমি ট্যাকা চাই না কড়ি চাই না শুধু ভুটখান দাও—'

'হি হি হি'

'আগে ভুটখান দাও তা'পর ট্যাকা তা'পর কড়ি—'

'হি হি হি'

'কাঙাল গ।'

'ছোঁচা।'

'মা গ ভুটখান দাও অনাথ রে—'

'বাপ গ ভুটখান দাও কাঙাল রে—'

'হি হি হি'

'হি হি হি'

'ষ্যান মরগ লাইগছে চাদ্দিকে।'

'ষ্যান ভুটের বাইজনা বাইজছে শালা—'

উরা দু'জনই আবার খানিক রা-হীন হয়ে পড়ে। বোবা, আকাট।

কয়েকজন পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে। বলা কওয়া যায় না কিছুই। কানটা হয়তো এদিকপানেই খরগোশের মতো খাড়া। আবার হয়তো মেম্বরের নিজের লোকও হতে পারে। কিংবা বিরুদ্ধ শিবিরের যে কোন একটা। ভোটের বাবুদের নিয়ে মশকরা করা ঠিক না। যার মনে যা। না কি এরা হাটিমারা মৌজার! দেখলে তা অবশ্য মনে হচ্ছে না ঠিক। অবশ্য ভিন মৌজারও হতে পারে। সবাই কি আর তাদের মতো এত্তেলা পেয়ে এসেছে! পঞ্চায়েতের নোটিশও যায়নি নিঘ্‌ঘাৎ একটা। নাকি গেছে! কতো কিছুই হতে পারে। যার মনে যা। শ্রীপদ এসব কিছুরই একবার আন্দাজ নেওয়ার চেষ্টা করে।

'লখে—'।

'কি?'

'আন্দাস পাইছিস?'

'কি?'

'ভীড় বাইড়ছে—'

'তুমায় ত আগেই বইললাম। ঘেরাও হবে।'

তাতেই শ্রীপদর চোখেমুখে কেমন কুচনআত্তি। ভরাভয়ডর। বুকের ভেতর শুধুই নিশাপিশ, আলতো থালা। লখেরও মধ্যে নিঘঘাৎ তাই। সে-ও এত্তেলা পেয়ে এসেছে যে। কিন্তু লখে যেন শ্রীপদর বিপরীত মেরুতে গড়া। ভয়ডর শতেক চিন্তাভাবনার জটাজালে সে যেন বাঁধা না। একটু গা ছাড়া, আলগা এলানো ভাব। শরীর ত্বকে কুচনও পড়েনি শ্রীপদর মতো। হাঁটলে পিছনের শির তার এখনো খাড়াই থাকে। থেকে থেকে কোন বিবশ ভাবনাও তাকে কুরে কুরে খায় না। যেমন শ্রীপদ। কিন্তু সত্যি সত্যি শ্রীপদ এইবার একখানা বিবশ ভাবনার কূপের মধ্যে পড়ে যায় কথাটা শোনা ইস্তক। তাহলে পঞ্চায়েত আপিস ঘেরাও হবে আর একটু পরেই! ভীড় বাড়ছে যে ক্রমশ। আর আজ বিলিব্যবস্থা না হলে ভাগ্যে বোধহয় হরিমটরই জুটবে কি জানি। তখন এ এত্তেলায় কাজ হবে না। নোটিশখানাও তখন ঝরঝরে ঠিক। ফের আবার আরেকখানা নতুন এত্তেলা। ফের আবার আরেকখানা নতুন নোটিশ। চকচকে ঝকঝকে। শ্রীপদ তাই বোধহয় ভেতরে ভেতরে গর্জায়।...আমি পেরথম পেরথম মজুরই ছ্যালাম বটে। ভাগ-চাষীর দখলকার একজন। নাম উইঠল কাগুজেকল্‌মে। লুকে বইলত

হাটিমারা মৌজার ছিরিপদ ভাগদং। তা কুথায় গঙ্গাচরণের ছেলে না বাবু বইনলে ভাগদং (ভাগ দখলকার)। তা ভাগদং হইলে ভাগদং মজুর বইনলে মজুর। একথান ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ত কইরবার লাইগবে সকলকেই।... কথাটা শুনলেই শ্রীপদর কেমন বুক ফুলে যেত তখন। পাঁজরের ঢাকনা খুলে যেত গর্বে। ভেতরে ভেতরে তুড়ির নাচন হত, বুঝত সে। এতোদিনে একখানা পরিচয় দেওয়ার মতো যেন পরিচয় হল তার। কি পরিচয়?... এ্যাই যেমন হাটিমারা মৌজার নগেন দাশ ছ্যাল বেকার হল গ্যে—পঞ্চেত মেম্বর। তা'পর ছিরিধর পেরামানিক ছ্যাল পটলের কারবারি বইনল এম আর ডিলার। তা'পর শিবু বিশ্বেস শুধু ছ্যাল মেম্বর বইনল কমৃটির প্রেসডেন্ট। কেষ্ট মণ্ডল ছ্যাল শুধু পড়শী হৈল গ্যে—পাড়ার মাতব্বর। তা'পর ধর না ক্যানে...। ভাইবতে গেলে ত একখান পুরামহভারত দু'খান রামান আর চাইরখান বেহলা লখাইর গপ্পো। তা আমি ছিরিপদ মণ্ডল একা একা ভাগদং থিকা একলাফে মজুর বইনল শুধু...

লখাই হঠাৎই চিরিক দিয়ে উঠে, 'ছিরিপদ—'

ডাকে শ্রীপদর চলকা ঘোর কাটে। রা দেয় কেমন, 'হুঁ।'

'উই যে—'

শ্রীপদ তাকায়।

'উই যে—'

'হুঁ-উ।'

'কিছু বুইছতে পাইরছ?'

'তা ত লিডরবাবু।'

'কিছু বুইছতে পাইরছ?'

'ঘেরাও হবে!'

'নুনাহ—'

'নাহ্?'

'মনে হইছে অন্ন ধান্দা।'

'অন্ন ধান্দা!'

'মনে হইছে।'

লিডরবাবু যে কিনা অনিলবিশ্বাসের বিরুদ্ধ শিবিরের, সেই মানুষটাই বারান্দা উজিয়ে এবার পঞ্চায়েত আপিসের ঘরে ঢোকে। সঙ্গে আরো গোটা-

দশেক মাতব্বর গোছের লোক। এরই ফাঁক ফোকরে লখে ভয়ে দেখল কড়ে। দশজনই। তারাও নিঘঘাৎ একই ঝাণ্ডার, একই পতাকার লোক নিশ্চয়ই। কি প্যাঁচ পঁয়জার আছে কে জানে। অতো বুদ্ধি তাদের মাথায় আসে না ঠিক বাবুদের মতো। বোধহয় একসাথে অনেক লোক ঢুকতেই ভেতরের কথা যন্ত্রের মতো একসময় থেমে যায়। ফের একটুখানি গোত্তা খেয়েই আবার কলকল করে ওঠে ঘর। অনেক লোকের স্বর, অনেক কথা একসঙ্গে চলকায়। ফলে একরকম কথার ঠোকাঠুকিতেই ভাঙাচোরা শব্দ ওঠে ফেনিয়ে। যা বাইরে থেকে মনে হয় কর্কশ আর বিশ্রি। কোন কথাই ঠিকঠাক বোঝা যায় না। শ্রীপদর তাই ইচ্ছে করে আড় হয়ে আরো একবার ঘরের পানে চিকুর হানে। কিন্তু পারে না। তার মনের মধ্যে ভয়ের বাসা যে। কেবল ডরআত্তি। তার কলিজা বড় ছোট। এইটুকুন।

'এ ম্যাই লখে—'

লখেরও কানখাড়া, প্রায় খরগোশের মতো, 'কি?'

শ্রীপদ ফিশফিশ করে, 'লিডরবাবু পলিটিকস্ বলল—'

'পলি—'

'একবার।'

'পলিটিকস!'

'রুলিং পার্টি…'

'রুলিং—'

'এ এ্যাই—'

হুঁ-উ।'

'ম্যানিপুলেশান বইলছে—'

'ইংরাজি।'

'ম্যানি…'

'ম্যানি—'

'—পুলেশান।'

'—পুলেশান!'

'কি?'

'জানিনা।'

হঠাৎ-ই শ্রীপদ আবার বিবশ হয়ে পড়ে। তার মাথার মধ্যে হাজার জটজটলা। কেবল ঘোর। এসব কোনকিছুরই তল খুঁজে পায় না সে। এই

-কূপ ভাবনার মাঝখানেই, কখন ধীরেনরবাবুর দল, যে কিনা অনিল বিশ্বাসের বিরুদ্ধ শিবিরের, তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আংশিক উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ। শ্রীপদর তাও চোখে পড়ে না, এড়িয়ে যায় যেন। অনেকটা নিরুত্তাপহীন বৃত্তের মধ্যে সে কাটায় কিছুক্ষণ! সেই বৃত্ত, সেই মনসীজগণ্ডির মধ্যে কোন কথাই যেন প্রবেশ করতে পারে না আর। যেন লোহার বর্ম, ক্রমাগত ঠোকড় খেয়ে খেয়ে তাই ভাঙচুর। আর সেই কাল্পনিক বৃত্ত, যার মাঝখানে একটা বিন্দু কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রের মধ্যে সমাধান শ্রীপদ। ফলে শ্রীপদ এখন কিছুটা বিবশ, উড়ুক্কুগোছের ভাব ভেতরে। আর হঠাৎ-ই খানিক চিৎকারে, সমস্বরে, সেই কাল্পনিক বৃত্তটা ছত্রাখান হয়ে পড়ে শ্রীপদ। এরই মধ্যে অনিল বিশ্বাস তার দলবল নিয়ে হাজির চত্বরে। দেখল। স্লোগান দিচ্ছে, শুনল।

গরীব মানুষদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ কর···

বন্ধ কর। বন্ধ কর।···

হাটিমারা মৌজার ভিটেমাটিহীন মানুষদের

চরজিরাট মৌজায় পুনর্বাসন দিতে হবে···

দিতে হবে। দিতে হবে।···

শুধু পনেরো জনকে পুনর্বাসন দিলে চলবে না···

চলবে না। চলবে না।···

৩

শ্রীপদ আর লখে এরপরই বারান্দা ছেড়ে উঠে পড়ে দূরে একটেরেয় গিয়ে দাঁড়ায়। দিনের ছায়া ঢুলছে গাছতলায়। ক্রমশ পুরু হচ্ছে প্রতিচ্ছায়া। আস্তরণ বাড়ছে। শ্রীপদ আর লখে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তাদের মুখাবয়ব এখন জমাট বাধা, পাথরের নিশ্চল মূর্তির মতো। থির। এরপরই অবাক করার মতো শেষের ব্যাপারখানা ঘটে যায় চোখের সামনের। দেখে পঞ্চাতের মেম্বর আর হাটিমারা মৌজার প্রায় অর্ধেক লোক, যারা এতোক্ষণ গলা মিলিয়ে আওয়াজ ওঠাচ্ছিল তারা উঠে এসেছে বারান্দায়। শ্রীপদ আর লখাই একটু আগেই যেখানে বসেছিল দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, সেখানে এখন লাটপাট খাচ্ছে মানুষের জটলা। পঞ্চেত চত্বর এই মুহূর্তে স্বরে শব্দে কিম্ভুত। শেষ সূর্যরশ্মির ডালপালার আলো-আঁধারি খেলছে ওদের গোটা অবয়বে এখন।

'এ এ্যা লখে—'

'কি ?'

'ব্যাপারডা কেমন কেমন ঠেইকছে নাহ্ ?'

'কেমন কেমন ?'

'এ্যাই ধর না ক্যানে অনিল বিশ্বেস পঞ্চেতের লুক—'

'তয় কি ?'

'নিজে মেম্বর আর নিজের পঞ্চেত আপিস ঘেরাও !'

'চুপো। ওসব বুইঝবে নাহ্। ও হল গ্যে রাজনীতি।'

'রাজ-নীতি !'

'হুঁ। প্যাকাল মাছের মতন। চুপো।'

মাথার মধ্যে যখন ব্যাপক অভিসন্ধি শ্রীপদর, ঠিক তখনই অনিল বিশ্বাসের গলা শোনা যায় বাইরে। তাকে ঘিরে জনাপঞ্চাশেক লোকের একটা বৃত্ত। বৃত্তের বাইরে অথবা যা কিনা বৃত্তের মধ্যেও হতে পারে, এমন এক টেরেয় শ্রীপদ দাঁড়িয়ে। অনিল বিশ্বাসের গোটা অবয়ব দেখার জন্যই বোধহয় শ্রীপদ বারে বারে নড়েচড়ে দাঁড়ায়। লখে দূরে হাঁকুপাঁকু করে বিড়ি টানছে! শ্রীপদ তাই দেখতে পায় একবার আড়চোখে। বাতাসে ধোঁয়া উড়ছে পেঁজা তুলোর মতো কেমন। চোখের মধ্যে কেবল আঁতিপাতি, ঘনঘোর জটাজাল। আর কেবল বিস্ময়। ব্যাটা তাহলে অনেক খবরই রাখে নখাগ্রে। যেন হাওয়ার মোরগ শালা একখানা।

ঠিক তখনই বাতাসে অনিল বিশ্বাসের গলা শোনা যায়, 'বন্ধুগণ—'

বৃত্তের আশেপাশে তখন চাপা ফিশ-ফাশ, তর্জন-গর্জন, 'এই চুপ। চুপ।'

অনিল বিশ্বাসের বক্তৃতা শোনার জন্যই কিনা মুহূর্তেই গোটা চত্বর তখন হিমনির্জন। বোবা আকাট। সবাই কেবল উৎসুক। আর তারই মধ্যে অনিল বিশ্বাস কেমন সরব হয়, 'বন্ধুগণ। একটু আগেই আপনারা লক্ষ্য করেছেন বিরোধীপক্ষের লোকেরা কিরকম ন্যক্কারজনক পদ্ধতিতে জমিবিলি ব্যবস্থায় বাধার সৃষ্টি করেছেন। তারা বলছেন এখন জমিবিলি ব্যবস্থা করা চলবে না কারণ আমাদের নাকি এটা ভোটার টানার কৌশল···ইটস আ ট্রিকস্···ভাবুন···তাঁরা বলছেন, ইটস আ ম্যানুপুলেশান···ভাবুন প্রিয়সাথী··· তাঁরা এর মধ্যে পলিটিকস খুঁজে পেয়েছেন, আবিষ্কার করেছেন···তাঁদের আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই গরীব মানুষদের নিয়ে আমরা ফুটবল খেলি না···যা বিরোধীপক্ষের লোকেরা খেলছেন···সাবাস্—। (একটু থেমে) বন্ধুগণ, আপনারা শুনে রাখুন এই জমিবিলি-ব্যবস্থা হবে এবং অচিরেই। তবে

ওই পনেরোজনকে পুনর্বাসন দিলে চলবে না। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রেখেছি তামাম হাঁটিমারা মৌজার ওই দু'শো জনকেই চর জিরাট মৌজায় পুনর্বাসন দিতে হবে···(হাততালি)···তাই বলছিলাম বিরোধী-পক্ষের এই প্ররোচনার ফাঁদে···

ভাষণ শেষ হতেই চত্বরের গোটা বৃত্তটাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে এদিক সেদিক। তারই মধ্যে পথ করে লখে মানে শ্রীলখেচরণ শ্রীপদর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ভুকুস ভুকুস করে বিড়ি খায়। নাকে মুখে ধোঁয়া ছাড়ে। আর শ্রীপদর মাথার মধ্যে কেবল ঘোর আন্তি। তার ভুরুর নিচে কুঞ্চন, চোখে-মুখে জ্বালা।

লখে সুখটান দিতে দিতে বলে, 'ফের আবার এভেলা বুইলে—'

'খপর?'

'হুঁ।'

'শালা। হাওয়ার মোরগ তুয়ি নাহ্‌—'

'হি হি হি···'

শ্রীপদ-র মধ্যে সেই ব্যাপক হাসি আর অনুরণিত হয় না, যা একটু আগেও সংক্রমিত হলেও হতে পারত। কিন্তু তাই যেন এখন এই পরিবর্তিত অবস্থায় এক ভিন্নতর রূপ নেয় তার শরীরে, যা স্বাভাবিক। ফলত লখের মধ্যেই এই গোটা ব্যাপারটা শ্রীপদর উলটো প্রতিফলন হয়ে পড়ে তাৎক্ষণিক। শ্রীপদ গোঙায়, 'আমি ছিরিপদ শুধু এ' মাটিখান জানি। হাঁটিমারা জানি না চরজিরাট জানি না। আমি রায়ত না বুঝি ভাগদং কি জোরদং না বুঝি··· বঙ্কিশোর কি হলধর সামুই না জানি। আমি ছিরিপদ শুধু একখান মাটির কাঙাল। এখন শুধু এ মাটিখান দাও ··আমি ভিট চাই না···শুধু ভিটেখান দাও গ···আমি জো করি তালতাল সোনা ফলাইয়ে এ পেটখান ভইরবার লাগি···' আর খুব ধীরে ধীরে লখের রক্তের মধ্যে তাই মিশ্রণ ঘটতে থাকে। আর কেবল ঘটতেই থাকে।

কলিং বেল

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

চেয়ারে বসবার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি ক্রিং-ক্রিং, শুনে রুনুবাবুর মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। তিনি পর্দার দিকে তাকান, এখুনি কারো মুখ দেখা দেবে ওখানে। বলবে, 'বড়সায়েব ডাকছেন।'

কিন্তু না। সে মুখের পরিবর্তে দেখা দিল গুলাবিয়ার মুখ। সেই মুখে, 'লিখল-দ-তানি এগো দরখাস্তোয়া বাবু। সবহি কহলছে কি আপহি লিখল্‌ব তব হইবই করিব। রামকেলাশকা নোকরি না হয়িব ত কা খায়িব। কা হই হমেনিকা—আ-হা-আ-হা।'

কান্নায় ভেঙে পড়ে গুলাবিয়া, মিশির মাহাতোর স্ত্রী। পুরানো প্রায় বাতিল কোনো গাড়ির ইঞ্জিনের মত ক্লান্ত জটিল আওয়াজ বুকে নিয়ে দুলে দুলে আসে মিশির, গুলাবিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে। রুনুবাবুর টেবিলের বাঁ-দিকে ঘরের কোণে বসে পড়ে। ঘড়ঘড়ে কাশি শুরু করে। মনে হয় যেন এখনই, এই ঘরেই, ওগড়াতে শুরু করবে কাশি।

আর গুলাবিয়া, মিশিরের অওরত, একদা পর্দানসীনা এখন মুখের ঘোমটায় অন্ততঃ দু-ইঞ্চি ফাঁক নিয়ে অফিসের ঘরে ঘরে দরজার আধো-আড়ালে করজোড়ে এইরকম দাঁড়ায়। ফোঁত ফোঁত কান্নার আওয়াজ করে দ্বারভাঙিয়া বোলে কি বলে, প্রায় বোঝা যায় না। বেশির ভাগ অনুমান করে নিতে হয়। প্রতি বছর শীতে মরো-মরো অবস্থা হয় মিশিরের। ব্রঙ্কো থাইসিস ছিল আগে থেকেই। তার উপর ভোলে বাবাকা পরসাদ। ইদানিং পার্শ্ববর্তী ব্যাঙ্কের দেশোয়ালীদের পাল্লায় পড়ে কালীমাঈজীকি পরসাদীভি শুরু হয়েছে। মিশির মারা গেলে গুলাবিয়া সরকার থেকে কি কি পাবে তাই নিয়েও গুলতানি হয় তাদের মধ্যে। ভোলে বাবাকা পরসাদী আসরের শলা-পরামর্শে কাছারিতে গিয়েছিল মিশির। ওকিল পাকড়ে পঁচিশ রুপাইয়া খরচা করে রামকেলাশের পুরা ওমর এভিডেভি করিয়ে এনেছে। রামকেলাশও হররোজ গোঁফ কামাতে শুরু করে দিয়েছে, যদিও সে এখনো গোলি ডাণ্ডা খেলে ব্যাঙ্ক বস্তির নেপালি লেড়কাদের সঙ্গে।

'মাহাতোকা নোকরি আউর করীব-করীব দো শাল ছে। উসকা বাদ

পেনসিন মিলবে থোরাসা। লেকিন রামকেলাশকা নোকরি আউর বারো হাজার না মিলবে ত কা খায়িব, কা হই হালত হমনিকা। লিখল-দ-তানি।'

ইতিমধ্যে রিটায়ার হয়ে যাওয়া বানার্জি-সাহেবের কিরপায় বহোত ইধার-উধার করে পয়লা ছেলে শিউপূজনের নোকরি হয়েছে। সো সাদি করলা। মিশিরের মেয়েরও সাদি হল, গাওনা হল। গাওমে দো-বিঘা খেতিভি হল। লেকিন আবহি রামকেলাশকা নোকরি না হই ত কা হই হমনিকা।

'হম শোচলি কি এয়সান ঠাণ্ডামে ও মর যায়ব। লেকিন না মরল ত কা করিব। সহেলিয়া কহলা কি না মরল তবহি হো যায়ব। অসপতাল ভেজল। সুইয়াঁ-দাবাইয়াঁ বহোত দেইছে। আওর এয়সান মোটোয়া তার যুসাল নাকমে আওর পিসাবমে ভি। এয়সে তো না হলছে পিসাব। তবহি না মরল। নেপালোয়া কহলা কি আনফিটি সাটিফিটি বানাও ডগদর-বাবুসে। তবহি রামকেলাশকা নোকরি হো যায়ব। আবহি সাটিফিটি মিলেছ ত এগো দরখাস্ত লিখল-দ-তানি। না হইত মর যায়ব খানা বিনা।'

রামকৈলাশ মিশিরের ছোট ছেলে। চেলিডাঙার কারনানি প্রাইমারী স্কুলে পড়ত গত বছরও। এবছর জেলা-বোর্ডের পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছে। বাবুরা বলে, 'মিশির তোমায় তগ্‌দির খুব ভাল। ওকে উপর ইস্কুলে ভর্তি করে দাও।' কিন্তু আর্দালি পিওন নেপাল আরও চালাক। সায়েবদের বাড়িঘরে তার যাতায়াত ঘনঘন। সে বলে,'আভি তুম মৌত করো মিশির। তব তুমারা দোসরা লেড়কারভি নোকরি হবে।' শুধু তাই নয়। গুলাবিয়া পেনসন পাবে। বারো হাজার পাবে। এয়সান বিমারি-বুড্‌ঢা হয়ে ঘরে-বাইরে মার খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আজকাল মরে যাওয়া অনেক নাফা।'

শুনে শুনে মরে যেতে চেষ্টাও করেছে মিশির। মিশির যতটা নয় তার চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে ছেলেরা, বিশেষত গুলাবিয়া। সনাতন হিন্দুধর্মের সতী সাবিত্রীর এই দেশে একথা অবিশ্বাস্য। কিন্তু সবার চোখের সামনেই যা ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় কিভাবে। মিশিরকে ঠিকসময় চাহিদামত খেতে দেওয়া হয়নি। ডাক্তার-দাওয়াই পায়নি। শীতের রাতে খাটিয়া-বিচালি-মিরজাই জোটেনি। কম্বলটুকু নিয়েও কাড়াকাড়ি করেছে সবাই। শোনা যায়, বেগরবাই করার জন্য মাঝে মাঝে মারধোরও খুব খেয়েছে মিশির।

বড় সাহেবের কলিংবেল দ্বিতীয়বার বেজে উঠতে, রুনুবাবু উঠে যাবেন এই অনুমানে, গুলাবিয়া আবার হাতজোড় করে। কোঁত-কোঁত করে এগিয়ে

আসে! রুণুবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে। দু-হাত বাড়ায় পা জড়িয়ে ধরবে বলে। মিশির আওয়াজ তোলে গলায়, 'আ-হা-চা-খা'। হয়ত বা এখনই, এই ঘরেই, ওগড়াবে কিছু।

রুণুবাবুর আর ওঠা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, 'কেয়া হোগা ইধার? অভি নিকালো বাহারমে। হামারা যো করনা ও কর চুকা। দরখাস্ত এগোকিন লিখনেসে কা ফায়দা। নিকালো জলদি।'

এমন সময় আবার বেজে ওঠে কলিং বেল। ইয়ং অফিসার। যখন-তখন কলিং বেল বাজানোই বুঝিবা তার হবি। যেন এজীবনের চরম চরিতার্থতা ওই কলিং বেলেই। কেননা নিজেকে এক্সার্ট করতে হলে ওটাই তার প্রথম ধাপ। অন্যথায় এজীবনে, এই অফিস-বসের দায়িত্বে, টিঁকে থাকাই মুস্কিল। কেননা মানুষের উপরে ডমিনেট করতে হবে সব সময়। একটু লুজ হলেই পেয়ে বসবে সবাই।

সি-সি-এল থেকে সদ্য এসেছেন, ফার্স্ট ক্লাস মাইনস ম্যানেজার। মেয়ে বড় হচ্ছে। মিসেস ত আছেনই। মধ্যপ্রদেশের অপাণ্ডব জঙ্গলে, বাংলো যতই ভাল হোক না কেন। ওদের পোষায় না। অথচ ওরা কলকাতা থাকলে সাহেবের সেখানে হালও খুব খারাপ হয়ে যায়। বছরে দু-বারও তার যাওয়া হয় না কলকাতায়। ছত্তিশগড়ী বা বিলাসপুরী আদিবাসী ডাইনি-গুলো কেউ কম যায় না ভালোমানুষকে জানোয়ার করে দিতে। সেই কারণেই, হোক না সেই একই খনি অঞ্চল, তবু এলেন এই বাংলায়। নইলে এই গ্রেডে, প্রায় হাফ-স্যালারি লুজ করে, কেউ আসে এখানে? ফোঃ!

'ক্রিং-ক্রি-রি-রি...'

বেল আবার বেজে ওঠে। এবার পর্দার ফাঁকে আর্দালির মুখও উঁকি দেয়। বড় সায়েবেরই ডাক। নতুন সায়েব, রুণুবাবুকে এখনো জানেন না। রুণুবাবু একালের ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করা মানুষ, অত সহজে বসের বেলে নাড়া দেওয়া অভ্যেসই নেই তার। হোক ফার্স্ট ক্লাস মাইনস ম্যানেজার, তবু বয়সে অন্তত দশ বছরের জুনিয়র রুণুবাবুর তুলনায়। এই অফিসেই ত হয়ে গেল বিশ বছর। কাজের নামে ঠন্‌ঠন্‌, শুধু পোস্ত-পশ্চার আর গিমিক-জেশ্চার দিয়ে বাজিমাত করা। জয়েনিঙের পরদিনই বলে, 'হঠাও সেকেলে কেঠো ফিউডাল চেয়ার-টেবিল।'

কিন্তু হঠাবে কে! বাবুদের ত নড়তে-চড়তেই আঠারো মাস। শেষে নিজেই জিপ নিয়ে বাজারে গিয়ে জিবরাজের দোকান থেকে নিয়ে আসেন।

রিভলভিং চেয়ার, স্টীল টেবল, অটোমেটিক মালটিকেবিনেট। আরো সব আপ-টু-ডেট এপারেটাস, ফার্ণিচার, স্টেশনারী।

রুণুবাবুর ধমকে উঠে পড়ে মিশির। গুলাবিয়া ফিরে তাকায় যেতে যেতেও। আবার কেঁদে-ফেলা ভাব আসে মুখে। বলে, 'আচারিয়া সাহাব কহলথিন কি রামকেলাশকা নোকরি হইবই করি।' মিশির চেঁচিয়ে ওঠে, 'চলো ঘর বেশরম আওরত কাহিকাঁ। বিমাঢ়ী বুড়্ঢাকা বাত না মানতা। এয়সান ঝুটমুট পড়েশান।'

এ যেন আর এখনকার এই জীর্ণ মিশির নয়। বাতিল হয়েও সতেজে বেঁচে থাকা বিশ বছর আগের সেই পাগল মেহের আলি। পরিত্যক্ত প্রাচীন রাজপ্রাসাদের খিলানে অলিন্দে বেজে চলত যার মেঘমন্দ্র কণ্ঠ, 'সব ঝুঠা হ্যায়'

যৌবনের কোন স্বপ্নিল তাড়নায় প্রথম যখন রুণুবাবু এই আঞ্চলিক অফিসে এসেছিলেন, অফিসের প্রায়ান্ধকার সুদীর্ঘ করিডরে মিশিরের মন্দ্র আওয়াজ শুনে ওই উপমা এসেছিল মনে। কোলিয়ারী-জীবনের অভ্যেসের জের টেনে এই অফিসে এসেও অফিসাররা লাঞ্চে যেতেন দুপুরে। অফিস ঝিমিয়ে পড়ত। রুণুবাবু মিশিরের নকল করতেন। অথবা মিশিরের সঙ্গে ডায়ালগ করতেন ওইরকম উচ্চনাদে।

তখনও মাসের গোড়ায় মাইনে পেয়ে এসে মিশির বলত, 'লিখল-দ-তানি পতা। গাঁও গড়বেলছাপ্তি, পোষ্টাপিস লাড়হেন আরা, ভায়া সমস্তিপুর, জিলা দ্বারভাঙা। পাবে গুলাবিয়া মাহাতো। লিখল-দ তিন কুড়ি দশ রুপাইয়া।'

মিশির এখানে তখন থাকত একা। দুপুরের নিঝুম অফিসে টায়ারের ছটর-ছট আওয়াজ তুলে আসত মিশির। কোর্টরোডের দুপাশে, কোলবোর্ডের বাংলোয়, দীর্ঘ প্রাচীন শিরীষ আর শিশুগাছের নিবিড় উচ্চে নানা পাখির ডাকাডাকি স্পষ্ট শোনা যেত তখন। জি-টি-রোড মুখী ট্রাকের গঁ-গঁ আওয়াজ, আপ-ডাউন বাসগুলির হাঁক-ডাক মাঝে মাঝে কাঁপিয়ে দিয়ে যেত দুপুরকে। তারপর আবার শুধু সেইসব পাখি, মিশিরের প্রৌঢ় চটির ছটাছট। শুনতে পেলেই রুণুবাবু চাঙা হতেন উচ্চ নাদে, 'আবেহে আংরেজী ফৌজি মিশির মাহাতো, আরাকান-লড়াইকা কহানী শুনাও থোরা।'

ততোধিক উচ্চ আওয়াজে মিশির শোনায়, 'হল্ট! হু-খ-ম-দা-র!!'

খালি হাতেই বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত মিশির। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ত পরক্ষণেই। তারপর উবু হয়ে শুয়ে পড়ত। পেট এবং কনুয়ে ভর

রেখে মাথা উঁচুতে তুলত। তখন তার চোখ-মুখের ভয়াবহতা দেখে মুখ ঘুরিয়ে হাসত কেউ কেউ।

একসময় উঠে বসত মিশির। ইম্ফল আর কোহিমা, মনিপুর আর বার্মার পাহাড় আর জঙ্গলের গল্প বলত তার দ্বারভাঙিয়া বোলিতে। সেখানকার আজীব লেড়কিরা ঝোঁপ-জঙ্গল আর কোঠা ঘরের আড়াল থেকে কেমন ডরপুক কৌতূহলে তাকাত ফৌজি পল্টনের দিকে। এইসব কহানী হয়ে গেলে শেষে বলত, 'বহোত জাপানী মার দিয়া গোলিসে। আজাদি পল্টন আ-গিয়া তো বন্দুক উগর দিয়া। আবহি আংরেজী জমানা খতম। হামারা ফৌজিভি খতম। বাস্। আবহি হাম মাইনিং অফিসকা চৌকিদার মিশির মাহাতো।'

খৈনি আর গাঁজায় কালো ছোপ ধরা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ত মিশিরের।

এই অফিসের উল্টো দিকেই জেলা গ্রন্থাগার। অফিসের পর সেইখানে সন্ধ্যা কাটত রুণুবাবুর। ফেরার পথে দেখা যেত কোলবোর্ড বাংলোর কালভর্ট জুড়ে মিশিরের মজলিশ। দেশোয়ালী দোস্তরা গোল হয়ে বসে। জড়ো করা কাঠপাতা-জঞ্জালে আগুন জ্বালে। ওদের দিকে একটু এগোল মিশির—বলে, 'জয় বোলো ভোলে বাবাকা। বৈঠহতানি বাবা। ভোলে বাবা কা পয়সাদী পিয়ো।'

এই বলে কল্‌কি-ধরা ডানহাতের কনুই বাঁ-হাতে ছুঁয়ে বাগিয়ে নেয় বাবাকা পরসাদী।

দেখতে দেখতে চলে গেল সেই ষাটের দশক। সত্তর দশকে মিশির মাহাতোর দিকে কারো তেমন নজর ছিল না। রুণুবাবুরও না। চারদিক তখন—দিতে হবে—মানতে হবে—করতে হবে—এইসব কোলাহলে মাতাল। রুণুবাবুও। অফিসের পেছনে একদিকে থানা, আরেকদিকে জেলের দেয়াল। শেষের দিকে চিৎকারগুলি অন্যরকম হয়ে প্রাণান্ত আক্ষেপে সেই দেয়ালে আছড়ে পড়ত। সকালবেলা দণ্ডধারী এসে বলত, 'বালবাচ্চা মিয়াছিলা লিয়ে রেতে ঘুমুতে লারছি বাবু। কোয়ার্টারটা বদলাই তুসরা জায়গায় দিন আজ্ঞে। ছেলাগুলার মরণ-চিৎকারে এখানে রইতে লাইরব।'

সেসবও একদিন শান্ত হল, দাহশেষে শ্মশান যেমন শান্ত হয়। ততদিনে মিশিরও অনেক বদলে যায়। কণ্ঠস্বরে নয়, যতটা বদল হয় জীবনযাপনে, কথায়। দুপুর গড়ালেই করিডরে চটির আওয়াজ তুলে এসে বলত, 'ডবাই-ভারকা কুর্তা-কামিজ মিলা, হামকো কাহে নেহি মিলেগা। নেহি চলেগা, দেনে হোগা।'

ডরাইভার দণ্ডধারী আর চৌকিদার মিশির মাতাতো। দুজনেই থাকে অফিস-কম্পাউণ্ডের ভেতরে। কম্পাউণ্ডের গাছগাছালি, মরসুমী ফল আর ফসলের অধিকার নিয়ে, অফিস-এলাকায় দণ্ডধারীর গোরু বা কুকুরের যথেচ্ছ বিহার নিয়ে, দু'পরিবারে তুমুল রেষারেষি। মাঝে মাঝে মারদাঙ্গাও লেগে যেত। এমনকি থানা-পুলিশ অবধিও গড়ায় তা।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কিভাবে যেন আবার গলাগলি ভাব হয়ে যেত দুজনের। মিশিরের ক্ষেতের ভুট্টা আর দণ্ডধারীর গোরুর দুধ, এঘর থেকে ওঘরে যেত। মিশিরকে শিখিয়ে দিত দণ্ডধারী, কি কি ন্যায্য পাওনা থেকে সে বঞ্চিত এবং কিভাবে তা আদায় করতে হবে অফিস থেকে।

অফিস সরগরম হত মাঝে মাঝে, কখনো দণ্ডধারীর বক্তৃতা আর বায়নাক্কায় কখনো মিশিরের হাঁকডাকে। মোকাবিলা করতে হত রুণুবাবুকেই, একসময় ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করার জের হিশেবে।

আজ তাই রুণুবাবুই চেঁচাতে শুরু করেন, 'যাও আদালত, নেহিতো কলকাতা। ওহিপর তুমকো সবকুছ মিল সক্তা। নেহিতো মর্ যাও, তব মিলেগা রামকেলাশকা নোকরি। ভাগো অভি, খালি মত্ থুকো ইধার।'

এত চিৎকার চেঁচামেচির ফলেই হয়ত, আবার বেজে ওঠে কলিং বেল। এবার রুণুবাবুও না উঠে পারেন না।

চেম্বারে ঢুকতেই সাহেবের চেয়ারে কাঁচ-কোঁচ আওয়াজ সুরু হয়। ঘুরন্ত চেয়ার একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে দোল খেয়ে চিতিয়ে পড়েন পেছনে। তারপর দুবার কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে মুখ তোলেন সাহেব, 'কি ব্যাপার রুণুবাবু! অফিসে এত হৈ-হল্লা লেগে থাকলে কাজ হবে কখন?'

রুণুবাবুর জবাব, 'শুধু চেয়ার-টেবিল, ফোন-ফার্নিচার পোজ-পশ্চার এসব ছাড়া কাজ কোথায়? লীজ বাড়ান, রয়ালটি আদায় বাড়ান, কাজ এবং কাজের মানুষ বাড়ান। তবে না কাজের কথা। রিয়াল কাজ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে বলেই না মানুষের এত যন্ত্রণা।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। এখনই আপনি শুরু করবেন পলিটিক্স। ওসব আমি একদম বুঝি না। ভাল কথা, এই সেকেলে স্প্রীং-বেলে আর চলে না। হাতের কাজ ফেলে প্যাঁচ কষো বারবার, তবে লোক ডাকো। তাও একবার আওয়াজেই দম শেষ। এতে কোনো কাজ হয়? ইলেকট্রিক বেলের কি হল?'

'চিঠি দিয়েছি ইলেকট্রিক পি-ডবলু-ডিকে। মিশিরের কেস ফরোয়ার্ড করলেন, হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউণ্ডে? বড্ড জ্বালিয়ে মারছে রোজ দুবেলা।'

'ওসব এখন আর হবে-টবে না। আগের অথর্ব ওল্ডম্যানদের আমলে যা করার করে নিয়েছেন। সব জায়গায় দেখছি বাড়তি মানুষ, তাও আবার বেশির ভাগ ইন্‌ভ্যালিড রাবিশ্‌। অথচ উই আর এ্যাপ্রোচিং টুয়ার্ডস দি এন্ড অফ ইলেক্‌ট্রনিক্‌স। রোবোট্‌স ক্যান ডু এনিথিং বেটার দ্যান এ হিউম্যান বিইং। ইভ্‌ন দি ডিউটি অফ এ নাইট-গার্ড। আপনারা দেশ দেশ করে চেঁচান, অথচ দেশের ক্রাইসিস্‌ বাড়ান পাইয়ে দেবার রাজনীতি করে। ক্রাইসিস কাটানোর একমাত্র পথ মেসিনাইজেশন। উই আর ওভার পপুলেটেড এভরিহোয়ার।'

'সেইজন্যই এত ভূপাল, পাঞ্জাব, আসাম দেশময়? এসবও কি প্ল্যান্‌ড ডি-হিউম্যানাইজেশন? সেইজন্যই কি এখানেও তড়িঘড়ি এতগুলো মানুষকে বদলি করার তোড়জোড়? এই বাজারে এক শহর থেকে আরেক শহরে মালপত্র ফ্যামিলি শিফ্‌ট করা, ঘর পাওয়া, চাট্টিখানি কথা কি? এত বদলি কি কোনোদিক থেকেই খুব দরকার ছিল?'

—'দেখুন রুণুবাবু, চাকরি করতে এলে বদলি কোনো ব্যাপারই নয়। আপনারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত। তাই গেলো-গেলো ভাব। বেঙ্গল কোল, কিলবার্ণ বা ইকুইটেবল কোল থেকে আসা ব্যাকডেটেড বুড়োগুলো পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করে দিয়ে গেছেন আপনাদের। নিজেদের তিন জেনারেশনের ব্যবস্থা ত করেছেনই। তা বলে চিরকাল ত আর তা চলে না। উই আর অন দি ষ্টার্টিং পয়েন্ট অফ এ ট্রান্‌সন্যাশনাল স্পীড। গতির যুগে পা বাড়াচ্ছি আমরা। সেই সনাতন গ্রাম, গ্রামীণ সমাজ, পুরুষানুক্রমিক ভদ্রাসন কিছুই চিরকাল থাকে না। মানিয়ে নিতে হবে রুণুবাবু। যে না পারবে সে মরে যাবে ন্যাচারাল রুল-এ। এই যে আমি এলাম এম-পি থেকে আসানসোল। কত ঝামেলা বলুন তো? কোয়ার্টার-ফোয়ার্টার কিছু পাইনি। আদৌ কোনোদিন পাবো কিনা ঠিক নেই কিছু। টেবিলে শুয়ে রাত আর হোটেলে খেয়ে দিন কাটাই। এসব দেখেও দ্যাখেন না কেন আপনারা?'

রুণুবাবু বলে ওঠেন, 'কোয়ার্টার পাবেন না মানে? আপনার জন্য এ ডি এমকে লাইট্‌নিং ফোন করেছেন স্বয়ং সেক্রেটারী এম-পি থেকে চলে এলেন হাফ-স্যালারি এ্যাক্‌সেপ্‌ট করে। এখানে এসে নবজীবন পাচ্ছেন বলেই ত। আপনার সঙ্গে আমাদের তুলনা? এমনিতেই আধমরা কেরাণী পিওন আমরা, যে-কোনো পরিবর্তনে আঁতকে উঠি টাল সামলাতে পারব না বলে। আপনাদের স্পীড চলে আমাদের লাশের উপর দিয়ে।'

রুণুবাবুর কথাগুলো কোনদিকে যেতে চায়, ধরবার চেষ্টা করেন সায়েব। বলেন, 'আপনি কখন কাব্য করেন, কখন শ্লোগান তোলেন, বোঝা ভেরি ডিফিকাল্ট। মানুষকে ত স্যাক্রিফাইস করতেই হয়, বড় কিছু পেতে হলে।'

'শুধু স্যাক্রিফাইস শেখানোর জন্যই কি এই হ্যারাসিং ট্রান্সফার, অন্য অনেক অল্টারনেটিভ থাকা সত্ত্বেও?'

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমি কি করতে পারি বলুন।'

বোঝা যায়, সায়েব এবার দায়িত্ব এড়াতে চান। এমন সময় এ দরজাতেও মিশির এবং গুলাবিয়া। গুলাবিয়া কান্নায় চাট্‌চেটে মুখ নিয়ে সায়েবের পায়ের কাছে গিয়ে বসে পড়ে। তার হাউমাউ কান্না সত্ত্বেও শোনা যায়, 'হে মালিক ভগোয়ান, রামকৈলাশকা নোকরি না হই ত খানাবিনা মরল যাই হো মালিক।'

বলতে বলতে সায়েবের পা জড়িয়ে ধরতে হাত বাড়ায় গুলাবিয়া।

'হোয়াট এ নুইসেন্স রুণুবাবু, হঠান এদের।' বলতে বলতে ছিটকে ওঠেন সায়েব এবং খাম্‌চে ধরেন টেবিলের কোণ। সেখানেই ছিল ইলেকট্রিক বেলের বোতাম। আর কি আশ্চর্য, অনেকদিন ধরে সাবডিবিশনে ফোন করে চিঠি দিয়ে, মায় স্লিপসহ হাজিরা দিয়েও যা হয়নি, তাই হল এই হঠাৎ হস্তক্ষেপে। অর্থাৎ সারা অফিসকে চম্‌কে দিয়ে বেজে ওঠে বেলটি। শুধু তাই নয়, সেটা বাজতেই থাকল। থামে না আর হাত সরিয়েও। ফলে সারা অফিসের সব ঘর খালি করে সবগুলি মানুষ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বড় সায়েবের চেম্বারে। ইদানিং প্রায় সকলেই খুব অস্থির। একটা কিছু হোক এটা সবাই চায়। নতুন কোনো কিছু ঘটলেই তাই সবাই প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়। কিন্তু শুরুটা কোথায় হবে, কিভাবে হবে, তারা কোনোভাবে সেই শুরুতে হাত লাগাবে কিনা, বুঝতে না পেরে শুধু উস্‌খুস করে সবাই। অথচ ওইটুকুতেও আঁতকে ওঠেন উপরওয়ালারা। বড়সায়েব চেঁচিয়ে ওঠেন তখনই, 'কি হল? সবাই এখানে কি চান, দেখছেন না রুণুবাবু?'

রুণুবাবু, যেন এই প্রথম এ তল্লাটে বাঞ্ছিত কিছু শুরু হতে চলেছে, অবচেতনের এই ইশারায় নিরুত্তেজভাবে বলেন, 'বোধ হয় কোনো ব্যাড কানেক্সন। মেন অফ করা ছাড়া আর কোনো গতি দেখি না।'

'তবে করুন যা করার। দেখছেন কি হা করে?'

অনেক অনেক দিন পর ফৌজি মিশির মাহাতো আবার টান টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বুকে হাঁপরের আওয়াজ সত্ত্বেও ওহু-ওহু করে দাঁত বের করে হাসে। অতিশয় দুর্গন্ধ এবং নোংরা মুখগহ্বর উদ্ঘাটিত দেখে সামনে থেকে সরে যায় কেউ কেউ। মিশির তবু দমে না গিয়ে বলে, 'এহি আখেরি ঘন্টিকা শুরুয়াত হো গৈলবানি কা—?'

মহুয়া চৌধুরীর কবিতাগুচ্ছ

ধর্ম. পরাজয়

১

একদিন ভাবা গেছে,

বহুদিন কারো জন্যে রক্তপান নেই।

অথচ

একটিও দেখাশোনা শেষ হয়নি

ভালোবাসার বা না বাসার

শরীর ছোঁয়ার বা না ছোঁয়ার পরাজয় নিয়ে

লম্বা হয়ে শুয়ে পিছে ভিজে আঁচলের ভারী ছাপ

দৃঢ় ও রক্তাক্ত ছাপে মগ্ন হয়ে রয়েছে প্রহর—

একদিন ভাবা গেছে,

বহুদিন কারো জন্য রক্তপাত নেই!

২

বর্তমান আমাদের হাত ধরে আনে এই তীরে

এইমাত্র নিভেছে আগুন—

রক্তমধ্যে ভেসে আসে চিতাচিহ্নহীন শবদেহ—

অতীতে যুক্ত হয়ে অস্তি হয়—অতীতই সময়—

৩

সময় শুদ্ধ হয় কিসে? তার অধ্যয়নে, যথার্থ নির্মাণে?

ছেঁকে হেনে জ্বলজ্বলে শাঁখের গড়নে বুকে রেখে ?
রূপোলি বুদ্বুদে লগ্ন বাদামি পাথরে চুপ
মৌমাছির মতো ?

স্মৃতিও তো শুদ্ধ নয়।
মনে হয় নির্জন স্টেশনের ঠাণ্ডা পাথর বেঞ্চ
তার মতো প্রগাঢ় রাত্রিতে
উষ্ণ রক্তের ওমে দগদগে নড়ে ওঠা অতিকায় হৃৎপিণ্ড হয়ে—
সেখানেই শেষ নয়—
বাঁক হেঁটে হাত রেখেছিল সাপ লোহার রেলিং-এ

৪

আমরা শুকনো ফলের খোসা জমে থাকা পাত্রের মতন
আমরা স-ব খেয়ে নিই
গ্রাস করি অটুট ও উচ্ছিষ্ট সময়
প্রতিবার নড়ে ওঠে শুকনো খোসারা।
প্রতি রাত্রে বিছানায় উজ্জ্বল ফোয়ারা জন্ম পাই না আমরা
যতোদূর এসেছে সময়, আরো যতোদূর যেতে হবে তাকে
সমগ্র সময়তল নিজের ভিতরে কষ্টে ধরে রেখে
আমাদের বাঁচা
একবার শুরু হলে পরাজয়ে পরাজয়ে খুলে যাওয়া পরিণামহীন—

ভালোবাসা এবং
ছায়ার ছায়ায় থরথরিয়ে কাঁপছে
পথভূমি
শব্দহীন নক্ষত্র, শিকড় গলাজলে তলিয়েও ভেসে উঠছে ফের।
সারারাত এইভাবে পথঘাট ডুবিয়ে ডুবিয়ে
টানা বয়ে গেছে কলকল জলের শব্দ
পথঘাট টেনে নিয়ে বয়ে গেছে
অলীক জলের শব্দ, স্রোত—

তারপর যখন সকাল,

মৌনভাঙা বাটী ঝুলে পতন সীমায়

পথের শরীর শুকনো,

একফোঁটা ভিজে দাগ নেই।

সন্ন্যাসী

ত্রস্ত দাঁতে আভা বলতে

বাকী প্রলাপ কটি

পুনর্বাসন খয়ে গেছে,

পুনর্বাসন নষ্ট হলো তার—

তোমরা তাকেই ভেবেছ সন্ন্যাসী।

কালো নদীর রূপকথা

এখন শীতের কাল, ফেরার সময়।

নিজস্ব চোখের জল আরেক চোখের কাছে ঠাণ্ডা ও অচেনা

মাংস ঠুকরে গেছে ভালোবাসা

একফোঁটা আঁট শিকড়ের তেষ্টা নিয়ে

শেষাবধি জমি ভেঙে ফেরা।

রাতভর উপ্‌চে যাচ্ছে রক্তভোগবতী

ছল্‌কে উঠে অবিশ্রাম ঝরে আসছে ছম্‌ছমে জল

এভাবেই শুরু হয়,

তীরভূমি টেনে শুষে অবিরাম চলে যাওয়া স্রোত

দীর্ঘ শাদা মায়াবী ও জমাটে শিকড় হয়ে

উজ্জ্বল শিকড় হয়ে

বৃক্ষহীন মগ্ন থাকা তীরে—

ঠিকঠাক বাঁচা হবে তাতে?

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক

সৌরি ঘটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডিউটির সিপাইটি ওপ্রান্ত থেকে তালা খট্‌খট্‌ করতে করতে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এখনও অনেকটা দূরে। আমি লিখে যাচ্ছি—আমাদের দেশে বর্ণভেদ প্রথাকে মহিমাময় করবার জন্য ব্রাহ্মণরা একটা গল্প চালু করেছিল। সেটা হল ব্রাহ্মণরা দুবার জন্মায়। একবার মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আর একবার উপবীত হওয়ার পর। সেজন্য তারা হল দ্বিজ।

ব্রাহ্মণরা তাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে যে গল্প চালু করেছিল সেটা মিথ্যা, কিন্তু মার্কসবাদের ক্ষেত্রে এটা কিছুটা সত্যি। বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ পড়ার পর মানুষ প্রকৃতই আর একবার জন্মায়। এই নতুন জন্ম হয় তার মানস-লোকে। এই বিশ্ব, সমাজ-সংসার সবকিছু দেখার জন্য সে পায় নতুন দৃষ্টি, পায় এক নতুন মন, সে মন তাকে শেখায় শোষণকে, অপমানকে ঘৃণা করতে, জীবনকে ভালবাসতে, যা কিছু জীবনের শত্রু তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

যে-অন্ধ তাকে যেমন আলো কি বোঝান যাবে না, তেমনি যারা মার্কস-বাদ পড়ে নি, তাদেরও এ কথা বোঝান যাবে না। এ এক নতুন উত্তরণ।

মার্কসবাদের কাছে আমরা সবাই পেয়েছি এই নতুন বিশ্ববীক্ষা। আর এই মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে গিয়ে মানুষের কাছে পেয়েছি অফুরন্ত ভালবাসা। সে ভালোবাসাকে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না, ওজনে মাপা যায় না, তার গভীরতা সীমাহীন। সে ভালবাসার স্পর্শ যে পায়, সে চিরজীবনের জন্য শোষিত মানুষের কাছে খতবন্দী শ্রমিক হয়ে থাকে।

অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা ছোট্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিককার বছরগুলি। খাদ্যসংকট তখন প্রতি বছরের ঘটনা। আর সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হত জঙ্গী খাদ্য আন্দোলন। সেবার এমনি এক আন্দোলনের সময় গঙ্গার ধারে চর অঞ্চলের এক বস্তিতে আছি। চরম খাদ্য-সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। চলছে মিটিং, মিছিল, কোর্ট ঘেরাও, সত্যাগ্রহ ক'রে কারাবরণ। কিন্তু খাদ্য আদায় করা যাচ্ছে না। তার ওপর গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড খরা। ক্ষেত মজুরদের কাজ

নেই। ঘরে ঘরে অনশন। মানুষ যে যেমন করে পারছে কিছু ছাতু কি বেসম কিনে এনে জলে গুলে সেঁকে বড়া করে খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে।

কিন্তু এরই মধ্যে তারা শহরের মহাজনের কাছে ঋণ করে নিয়ে আসছে চাট্টি করে চাল। সেটা আমার ভাত খাওয়ার জন্য। তারা জানে, ঐ বেসম-সেঁকা বড়া আমি খেতে পারব না।

গোটা পাড়ার মধ্যে একমাত্র আমার জন্যে চাট্টি ভাত। সে ভাতের গ্রাস কি মুখে তোলা যায়! সে সব কমরেডের সঙ্গেই প্রতিনিয়ত উঠছি, বসছি, গল্প করছি, সভা-মিছিল করছি, তারা রয়েছে অনশনে। কমরেডদের পরিবারগুলির সে সব শিশুরা কাকা বলে, জেঠু বলে, মামা বলে, তারা রয়েছে উপোষ করে। তাদের কচি মুখগুলো শুকিয়ে আমচুরের মত হয়ে গেছে। পাড়ার যে সব মেয়েরা দেবতার মত সম্মান করে, তারা ক্ষুধার্ত শিশু বুকে করে রয়েছে উপোষ করে।

আর এর মধ্যে আমি খাচ্ছি চাট্টি ভাত। সে ভাতের প্রতিটি গ্রাসে যত ভালবাসা, তত লজ্জা॥

আবার এই ভাত খাওয়ার দায় এড়াতে পাড়া ছেড়ে যে চলে যাব, তারও উপায় নেই। মাথার ওপর ওয়ারেণ্ট।

কিন্তু এতো গেল এক টুকরো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। বৃহত্তর ক্ষেত্রে যতবার সংগ্রামের আহ্বান এসেছে, মানুষ সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে। ফাঁসি গিয়েছে, গুলি খেয়েছে, জেলে গিয়েছে, মেয়েরা আন্দোলনের ডাকে গায়ের গহনা খুলে দিয়েছে। এতটুকু হিসেব করে নি, মানুষ পিছন ফিরে তাকায় নি। সে অতীতে হোক, বর্তমানে হোক, সিপাহি বিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন কি তেভাগা-কাকদ্বীপের আন্দোলনে হোক, মানুষ মুক্তির আশায় তার সর্বস্ব দিয়ে গেছে অকৃপণ-হাতে।

মানুষের এই দানের কথা অনুচ্চারিতই থেকে গেছে। ইতিহাসের রথের চাকা এগিয়ে চলেছে। আর

> "চাকার চিহ্ন পথের ধুলায়
> পড়ে আছে শুধু আঁকা
> কি দিলাম তারে জানে না তো কেউ
> ধুলায় রহিল ঢাকা।"

অতীতের ইতিহাসের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন দেখি, জীবনের

কি বিপুল শক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে এক একটা আন্দোলনে। কি সাহস, কি তেজ, কি মহিমা নিয়ে নীচের তলার মানুষগুলি এগিয়ে এসেছে সামনে। কি দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা চেয়েছে সমাজের রূপান্তর। অবিভক্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কৃষক আন্দোলন তেভাগা। সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছে তাদের অনেকেই হল ক্ষেতমজুর। এরা কারো জমি ভাগে চাষ করত না, তেভাগা আদায় হলে একমুঠো ধানও পেত না। তবু আন্দোলনের সামনের সারিতে এগিয়ে এসে প্রাণ দিল তারাই।

কেন?

কারণ তারাই তো গ্রামের সর্বহারা, যাদের শ্রম বিক্রি করে খেতে হয়, যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই। তাইতো যে কোন আন্দোলনের দামামা বাজালে তারাই সবচেয়ে আগে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাদের অবদমিত মনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা "তরুণ গড়ুর সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ নিয়ে" জেগে ওঠে, ভাবে ঐ বুঝি এল দিন বদলের পালা।

ব্রাহ্মণরা যেমন উপবীত ধারণ করে দ্বিজ হয়, ঠিক তেমনি এক একটা আন্দোলনে এই অচ্ছুত, অখ্যাত, অবজ্ঞাত মানুষগুলি দ্বিজ হয়ে ওঠে। আন্দোলনের জোয়ারে আর একবার নতুন করে জন্মায় তারা। তখন তাদের হৃদয়ের একুল-ওকুল-দুকুল ভেসে যায়।

এক একটা আন্দোলনের বাণ তাদের চেতনায় কি তুফান তোলে তার একটি চিরস্মরণীয় বর্ণনা আছে বর্তমান বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিং-এর তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতিচারণায়।

ময়মনসিং জেলার নেত্রকোনার সিংহের বাংলা গ্রাম। —"এখানে মালিকরা ছিলেন হিন্দু তালুকদার আর ভাগচাষীরা ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক। কিন্তু মুসলমান ভাগচাষীরা সংখ্যায় ছিলেন বেশি। এই ভাগচাষীরা ছিলেন খুবই গরীব। অন্যান্য সব জায়গার মত এখানে সশস্ত্র পুলিশ আমদানি করা হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে টহল দিয়া ভাগচাষীর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। জেল-জুলুমের ভয় দেখাইয়াছে। পুলিশ টহল দিয়া গ্রাম উথাল-পাথাল করিয়াছে। শুধু তাই নয়, ভলান্টিয়ারদের মারপিটও করিয়াছে। নিত্যানন্দ নামে আমাদের এক কর্মীকে পুলিশ বেদম প্রহার করে। নিত্যানন্দ ছিল এই গ্রামের জনপ্রিয় কর্মী। নিত্যানন্দের প্রহারের সংবাদ শুনিয়া গ্রামবাসী বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু কোন প্রতিবাদ মিছিল বাহির করা সম্ভব হয় নাই, কারণ এখানে সংগঠন ছিল দুর্বল। ভাগচাষী

মুসলমান মেয়েরা গরীব হইলেও পর্দানসীন। তাঁহারা হাজং, রাজবংশী বা নমঃশূদ্র মেয়েদের মতো আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না। পর্দার আড়ালে থাকেন। কাজেই ওঁদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নিত্যানন্দকে গরুপিটা পিটানোর জন্য ইহারাও বিক্ষুব্ধ হইয়া এমন কাণ্ড করিতে পারেন তাহা আমরা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবি নাই। এই সময় দুইজন সশস্ত্র পুলিশ খুব দাপাদাপি করিয়া একটি গরীব কৃষকের বাড়ীর এক গাছতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময় দুইটি মুসলমান যুবতী বধূ দুইটি দা হাতে রণমূর্তির বেশে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা সামাজিক রীতিনীতি ভুলিয়া গেল। উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া নিজেদের ভাষায় বলিল—"ওরে বাগদীর পুতরা, আমাদের হুকুরে মারছ কেন? এই দাও দিয়া তরারে জব করিয়া ফালবাম।"

যুবতীদ্বয়ের দা আর রণমূর্তি দেখিয়া পুলিশ পুরুষদ্বয় যে যেদিকে পারিল রাইফেল দুইটি ফেলিয়া ভো দৌড়ে পালাইয়া গেল। তাহাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। যুবতী দুইটি হয়ত এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না! তাহারা হতভম্ব হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।"

গৃহবন্দী পর্দানসীন এই দুটি মুসলমান যুবতীর উত্তরণ বিদ্যুতচমকের মত কোন চকিত ঘটনা নয়। সংগ্রামের শঙ্খধ্বনি শুনে এমনি করেই অখ্যাত, অবজ্ঞাত মানুষরা উঠে আসে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোয়। সংগ্রামের ময়দানে ইতিহাস জন্ম দেয় অসংখ্য বীর আর বীরাঙ্গনার যারা ভোরের পাখীর মত গেয়ে যায় নতুন জীবনের জয়গান।

শোষিত মানুষ অনেক কিছু ভোলে, কিন্তু ভোলে না তার সংগ্রামের কথা। নিজেদের সংগ্রামের অমর ইতিহাসকে সে রূপান্তরিত করে লোক-গাথায়, প্রবাদ-প্রবচনে। তারপর সেই গাথা ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। রূপকথার মত মনোমুগ্ধকর এই সব কাহিনী শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে কথকতার ঢং-এ বলা হয় গ্রাম্য বৈঠক-খানায়। শিশুরা তাদের ছোট্ট চালাঘরের দাওয়ায় বসে পূর্বপুরুষদের এইসব বীরত্বের কাহিনী শোনে ঠাকমা, দিদিমা, মাসী, পিসির কাছে।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি বোমা ছুঁড়ল বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা পিপাসু সাধারণ মানুষদের চৈতন্যমন্থন করে সেটা রূপ নিল একটা গানে—

অভিরামের দ্বীপ চালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি

এক বার বিদায় দে মা

ঘুরে আসি।'

অভিরাম বলে তো কেউ ছিল না। কিন্তু গ্রাম্য কবির গানে প্রফুল্ল চাকি বদল হয়ে হল 'অভিরাম' আর তার ব্যাকুল কামনা হল—

"একবার বিদায় দে মা

ঘুরে আসি।"

আবার আমি ঘুরে আসব, আবার ইংরেজ মারব তার জন্যে কোন ভয় নেই আমার—

—"হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি

দেখবে ভারতবাসী।"

মানুষ তার সংগ্রামের স্পৃহাকে, প্রতিশোধের চেতনাকে কেমন করে গোপনে ধরে রাখে তার এক বর্ণনা দিয়েছেন জলপাইগুড়ির কৃষক নেতা বিমল দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণায়।

—"মহাবাড়ি গয়ানাথের খোলানে তেভাগা একটি স্মরণীয় ঘটনা। মেটেলি থানার মহাবাড়ি থেকে মাল থানার পানোয়ার বস্তি পর্যন্ত প্রায় আট মাইল রাস্তা জাম করে তেভাগার সংগ্রাম তুঙ্গে উঠেছিল। পুলিশ গুলি চালাল। এখানেও নিহত হলেন চার জন। আহত সাত জন। নিহতদের মধ্যে একজন ছিল আট বছরের কিশোর। তার হাতে ছিল লাল ঝাণ্ডা। বালকটি যখন লুটিয়ে পড়ল তখন কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের ওপর। তাদের রাইফেল কেড়ে নেওয়া হল, ভেঙে ফেলা হল এবং কয়েকটা লুকিয়ে ফেলাও হল। ...১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হবার পর আত্মগোপন করে চলার অবস্থায় পটল ঘোষ ও আমি পল্লীর এক রেল লাইনের ওপর একজন কৃষককে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের চেনার পর সে আনন্দে আত্মহারা। ঘরে নিয়ে চা দিল, চিঁড়ে দিল। পরে একটা ভাঙা রাইফেল এনে বলল—তার ছেলেকে পুলিশ খুন করেছিল বলে আজও সে পুলিশের এই রাইফেল লুকিয়ে রেখেছে।"

এমনি করেই মানুষ তার সংগ্রামের স্মৃতিচিহ্নকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখে গোপনে ভবিষ্যত সংগ্রামের আশায়।

মনে পড়ে বর্ধমান জেলার ছোট্ট একটি গ্রামের ঘটনা।

কৃষক সমিতির পত্তন করতে গেছি গ্রামে। সবাই সমিতির সভ্য হল,

এক বুড়ো কৃষক কিছুতেই সভ্য হতে রাজি নয়। সে জানাল, বহুকাল আগে থেকে সে কংগ্রেসের সভ্য।

ঐ এলাকায় কংগ্রেসের কোন আন্দোলন হয় নি। কি করে সে একা কংগ্রেসের সভ্য হল? জেরায় জেরায় জানলাম বহুদিন আগে ১৯২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সে একবার বর্ধমান সহরে গিয়েছিল। তখন সে তরুণ। সে সময় শহরে সে চার আনা দিয়ে কংগ্রেসের সভ্য হয়। ব্যস্। তারপর থেকে সে ঐ একখানা রসিদের দৌলতে নিজেকে আজীবন কংগ্রেসের সভ্য মনে করে বসে আছে। বাড়ির ভেতর থেকে একটা পুঁটলি নিয়ে এল সে। তাতে জমি জায়গার কিছু কাগজপত্র আর হলুদ হয়ে যাওয়া বিবর্ণ কাগজে কংগ্রেসের একটা রসিদ। সেটাই তার কংগ্রেসী বনে থাকার প্রমাণ পত্র। সে জানেও না এই চার আনার রসিদটি হল বাৎসরিক। এক বছর পরে এর আর কোন দাম নেই।

সংগ্রামের সাথে মানুষ এমনি করেই নিজেকে একাত্ম করে রাখে মনে মনে।

একটা দুর্বার রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজের সবচেয়ে অবদমিত মানুষগুলিকে সামনে ঠেলে আনে। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেয়ে। আর সবদিক থেকে এরাই হল সবচেয়ে শোষিত, অপমানিত, বঞ্চিত। ঘরে বাইরে এদের রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন অধিকারই নেই। তাই যে কোন আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে মেয়েরা। আন্দোলনের স্বার্থে কোন ত্যাগস্বীকারেই কুণ্ঠিত হয় না তারা। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে মেয়েদের এই নীরব অবদান অতুলনীয়।

আর নীরব অবদানই বা বলব কেন? শৌর্যে, সাহসে, আত্মদানে তারা কি পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম?

তেভাগা আন্দোলনে যখন সশস্ত্র পুলিশের হামলা আর দমননীতি চরম পর্যায়ে তখন গ্রামের পর গ্রাম পাহারা দিত নারীবাহিনী। গ্রামে পুলিশ ঢুকলেই শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়ে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে মেয়েরা আর বালক বালিকারা গোটা গ্রামকে হুঁশিয়ার করে দিত।

শুধু কি এইটুকু! দিনাজপুর জেলায় আটোয়ারীর রামপুর মলানী গ্রামে দীপেশ্বরীর নেতৃত্বে মেয়ে ভলেন্টিয়াররা তাড়া করে পুলিশ বাহিনীকে গ্রাম-ছাড়া করে।

রাণীশঙ্কাইলে ভাগচাষী বসন্তের স্ত্রী ভাণ্ডনীর নেতৃত্বে গ্রামের মেয়েরা পুলিশ জমাদারের বন্দুক কেড়ে নিয়ে সারা রাত ঘরে বন্ধ করে রেখে দেয়।

বীরগঞ্জ থানার ফুলেশ্বরীর নেতৃত্বে মেয়েরা ঝাঁটা, লাঠি গাইন হাতে বন্দুকধারী দারোগাকে সারাদিন আটক রেখেছিল।

কোথায় গেল এইসব বীরাঙ্গনাদের স্মৃতি ?

বালিয়াডাঙ্গির জয়মণি, সেতাবগঞ্জের ভুতেশ্বরী, ফুলবাড়ীর বুধমণি, কমরেড রূপনারায়ণ রায়ের মেয়ে যমুনা, বগুড়ার পালাহু বর্মনের মা, জলপাই-গুড়ির বুড়ি মা, ময়মনসিংহের বীরাঙ্গনা রাসমণি।

ভাগচাষীর অধিকার আজ সরকারী আইন। কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যে তরুণ বীর আর বীরাঙ্গনার দল ভাগচাষীর দাবীর কথাটিকে প্রথম সমাজের সামনে তুলে ধরল তাদের নাম, তাদের বীরত্ব-গাথা আজ কজন জানে ?

হে একালের তরুণ প্রজন্ম, তোমাদের দুঃখ, তোমাদের কঠোর জীবন-সংগ্রামের কথা, তোমাদের বঞ্চিত যৌবনের হাহাকার, তোমাদের জীবনে ব্যর্থ বসন্তের যন্ত্রণার কথা একালের মানুষ কিছুটা জানে। একটা পিওনের চাকরির জন্য যখন বি, এ, এম এ পাশ ছেলেরা মিলে পঞ্চাশ হাজার দরখাস্ত করে, বেকারি আর অনটনের যন্ত্রণা সইতে না পেরে তোমাদের কেউ কেউ যখন আত্মহত্যা বা হটকারী কোন কাজ করে ফেলে, তখন নিশ্চিন্ত প্রবহমান সমাজজীবনের উপরিকাঠামো কিছুটা আলোড়িত হয়। বিজ্ঞজনেরা মাথা নেড়ে বলে—'তাইতো। তাইতো! কি গভীর সংকট! এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।'

ট্রেনের কামরায় যখন দেখি অভুক্ত, শুখনো মুখে তোমরা কেউ লজেন্স বিক্রি করছ, যখন সারাদিন কাজের সন্ধানে ঘুরে ঘরে গিয়ে দুখানা পোড়া রুটি খেয়ে অর্ধাশন করছ, তখন তোমাদের দুঃখে বুক ফেটে যায়। কিন্তু তবু তোমাদের বলব, এ দুঃখ তোমাদের প্রজন্ম একা ভোগ করছে না। ওপরে যাদের কথা বললাম দুঃখ তাদেরও কম ছিল না। তোমরা তবু একখানা ধুতি কি প্যান্ট পরো, তাদের তাও জুটত না। পুরুষরা কোমরে একটা দড়ি বেঁধে এককালি ন্যাকরাকে কৌপিনের মত করে পরে থাকতে বাধ্য হত। আর মেয়েরা পরত বগলের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলান এক খণ্ড কাপড় যাকে বলা হত বুকনি। ভাত তারা বারমাস খেতে পেত না। ডাল, আলু

কি চিনি খাওয়া তাদের কাছে ছিল বিলাস। এমন কি অন্ধকার ঘরে লম্ফ জ্বালার একটু কেরোসিন তাদের জুটত না।

ক্ষুধার জ্বালায় তারা স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করত।

আজ যেমন তোমরা একটা চাকরি বা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা না হলে বিয়ে করতে পার না, ঠিক তখনও তেমনি পয়সা নেই বলে বিয়ে হত না ছেলেদের। তাদের বলত ঢ্যানা। আবার যাদের বিয়ে হত তারাও অভাবের তাড়নায় পালাত দেশ ছেড়ে। দুঃখে তখনকার মানুষ গান বেঁধেছিল :

—"ধনুসের (স্ত্রীর) হাত ধরি
ভাঙ্গা কাণ্ডাই (কড়াই) মাথাত করি
ভোটানত যায়।"

ভাঙ্গা কড়াই মাথায় করে স্ত্রীর হাত ধরে তারা ভূটান পালাচ্ছে।

তেভাগা আন্দোলনের সময় গ্রামের মুদির দোকানগুলিতে ভীড় করত গোয়েন্দারা। কে ডাল বা আলু কিনছে। কার ঘরে চিনি বা একটু বেশি কেরোসিন যাচ্ছে তার হিসেব নিত তারা। ডাল, আলু বা চিনি কেনা মানেই বাড়ীতে বাইরের লোক এসেছে অর্থাৎ কমিউনিস্ট নেতারা এসেছে। একটু বেশি কেরোসিন কেনা মানেই অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলবে। তার মানে মিটিং হবে।

কিন্তু এই অন্ধকার জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি তোমাদের পূর্বপুরুষরা। তারা এ জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য সংগ্রাম করেছে, রক্ত ঢেলেছে, জীবন দিয়েছে অকাতরে। এক মহত্তর জীবনের স্বপ্নে পরিপূর্ণ ছিল তাদের হৃদয়।

আজ এইসব শহীদদের পরমায়ু ভোগ করছি তুমি, আমি। তাদের ফেলে যাওয়া বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছি, তাদের স্বপ্নের মশালে আলোকিত পথে পথ হাঁটছি। আমরা তাদের কাছে ঋণী।

যুগে যুগে অনেক দার্শনিক, অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী, অনেক চিন্তাবিদ অনেক সত্য কথা বলেছেন। কিন্তু মার্কসের মত সত্যকে এমন জ্বলন্ত ভাষায় বোধ হয় আর কেউ বলেন নি।

'বুর্জোয়া শ্রেণী মেয়েদের পণ্যে পরিণত করে'—মার্কসের এই বিশ্লেষণ যে

কতবড় সত্য তা আজকাল আমাদের দেশের যে কোন বুর্জোয়া সংবাদপত্র বা সাময়িকী খুললেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

কি আলোচনা হয় সেখানে? কি প্রসাধন মাখলে মেয়েদের চামড়ার রঙ উজ্জ্বল হবে, কি পোষাক পরলে পুরুষদের চোখে তারা আকর্ষণীয় হবে, কোন্ সাজে সাজলে তাদের মন-ভোলানো রূপ হবে—এইসব। এ কথা লেখার জন্য গড়ে উঠেছে একদল সাংবাদিক, একদল বুদ্ধিজীবী, একদল বিশেষজ্ঞ। দারুণ লোক তারা।

কিন্তু কেউ তো লেখে না জলপাইগুড়ির বুড়ি মা কি ময়মনসিংহের রাসমণির কথা। এক শীতল নীরবতার মাধ্যমে তারা ভুলিয়ে দিতে চায় এদের কথা।

তারা হারিয়ে দিতে চায় এদের স্বপ্ন।

তারা সমাধি দিতে চায় এদের স্মৃতি।

বুর্জোয়া শ্রেণী মানুষকে একথা জানতে দিতে চায় না যে প্রসাধন করে সমাজ পরিবর্তন করা যায় না, ভ্রূ প্লাক করে অবিচার দূর করা যায় না। ছেলেরা মেয়েদের মত রঙিন সাজে সাজলে শোষণ দূর হয় না. বা স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশার নাম স্বাধীনতা নয়।

জীবনকে উন্নত করে, তার গতিধারা পরিবর্তন করে, তাকে সমৃদ্ধ করে, তার মূল্যবোধে রূপান্তর আনে সংগ্রাম।

দাস যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের, ব্যক্তির ও তার চিন্তা ভাবনার যে বিকাশ, তার মূলে রয়েছে অবদমিত মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

সিপাইটি ও প্রান্ত থেকে তালা খট্‌খট্ করতে করতে এগিয়ে এসে হঠাৎ একটা সেলের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বন্দীটির সঙ্গে কি যেন কথা বলছে চাপা গলায়। নিশ্চয়ই কোন লেনদেন হচ্ছে।

এই লেনদেনের কারবার জেলের বেশিরভাগ সিপাইয়ের এক ভাল রোজগারের ব্যবস্থা। বন্দীর আত্মীয়স্বজন কিম্বা সে যদি কোন অপরাধচক্রের লোক হয় তো দলের লোকেরা বাইরের সিপাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার হাতে টাকা দিয়ে যায়।

সিপাই তার বদলে জিনিষপত্র বা মাদকদ্রব্য সরবরাহ করে বন্দীটিকে। রেট আধা-আধি। অর্থাৎ একতাড়া বিড়ির দাম যদি বাইরে এক টাকা হয় তো সিপাইটি নেবে দু টাকা। এক ভরি গাঁজা যদি দশ টাকা হয় তবে সিপাইটি নেবে কুড়ি টাকা। এইভাবে চোরাপথে মদ পর্যন্ত আসে জেল-

খানায়। কয়েদিরা বলে—"টাকা খরচ করলে এক মেয়েমানুষ ছাড়া সব পাবেন জেলে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। যারা ছোট চোর ডাকাত তারা এইভাবে সিপাইদের মাধ্যমে ভেতরে জিনিষ আনে, আর যারা বড় অপরাধী চক্রের লোক তারা স্থপারিনটেণ্ডেন্ট, জেলার, ডেপুটি জেলার, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে রাজার হালে থাকে।

দু চারজন ভাল সিপাই ছাড়া বেশিরভাগই এসব লেনদেনের কারবারে জড়িত। এই উপরি আয়ই হল চাকরি জীবনের মধু। এটা না থাকলে চাকরিজীবন তো মরুভূমি। তা সে রাইটার্সের কেরাণি হোক বা জেলখানার সিপাই হোক। উপরি আয় যাতে নেই সে চাকরি আবার চাকরি!

জেলখানার উপরি আয় শুধু এইটুকু নয়। এখানে সব কিছুই চুরি হয় আর সবাই চোর। কয়েদিদের খাটিয়ে বাগানে যে সব্জি তৈরি হবে তার ভাল জিনিষগুলো রোজ সকালে চলে যায় স্থপারিনটেণ্ডেন্ট থেকে সব অফিসার-দের বাড়ী। তারপর জেলখানার কয়েদিদের খাবার জন্য যা আসে তাতে ভাগ বসায় সিপাই-জমাদাররা। কনট্রাকটাররা কয়েদিদের খাবার জন্য মাছ, মাংস, ডাল, তেল, চাল, মশলা কম সরবরাহ করে ভাগ দেয় অফিসারদের। না দিলে কনট্রাক্ট পাবে না। তারপর আবার রান্নার জিনিসে ভাগ বসায় সিপাইরা।

জেলে থাকার জন্য কয়েদিদের দেওয়া হয় দু-খানা করে কম্বল, একটা থালা, একটা বাটি, আর সাদার ওপর ডোরাকাটা জামা, পাজামা। এগুলোও বিক্রি হয় জেলে। কেনে সিপাইরা। বিনিময়ে কয়েদিরা পায় বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, আফিং। জেলের হাসপাতালে ওষুধ লেখা হয়, কিন্তু কয়েদিরা পায় না। চুরি হয়। চুরি হয় মেডিকেল ডায়েটের দুধ, মাছ, ডিম, মাখন। গোটা জেলখানাটাই একটা চুরির গোলক ধাঁধা।

আর এত চুরির পরে কয়েদিরা যা খেতে পায় তার অনবদ্য বর্ণনা আছে স্বদেশী আমলের বন্দীদের এক গানে :—

—"জেলখানাতে কষ্টে আছি কে বলে
এক বাটি ভাত
এক ডাবু ডাল
একটু ডাঁটার চচ্চরি

গৌর প্রেমে বান ডেকে যায়
তেঁতুল গোলা অম্বলে।"

এই জোটে শেষ পর্যন্ত কয়েদিদের পাতে।

মনে পড়ে জেলের এক আধা-পাগলের কথা। একদিন সে আমাকে প্রশ্ন করেছিল—"আচ্ছা জেলে তো সবাই চোর। কিন্তু বাইরে সবাই চোর নয় কেন?" কি উত্তর আছে এর?

চাপা গলায় কি সব কথাবার্তা বলে সিপাইটি আমার সেলের কাছে এগিয়ে আসছে। আমি দেওয়ালের দিকে কম্বল পেতে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলাম। সিপাইটি আমার সেলের তালা খট্‌খট্‌ করল। পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে দেখলাম সে কট্‌মট্‌ করে একবার তাকাল আমার দিকে তারপর আগে এগিয়ে গেল।

রাতে যাদের ডিউটি পড়ে, তাদের মধ্যে দু চারজন সিপাই ভাল। জেগে আছি দেখলে তারা দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে, হয়ত একটু গল্প করে। আবার অনেক সিপাই উদাসীন। তারা শুধু তালাটা খট্‌ করে নেড়ে, ঠিক আছে কিনা দেখে চলে যায়। কিন্তু এখন যে সিপাইটি এসেছে এর মতন দু'চারজন আছে, যারা জেগে আছি দেখলে গাল দেয়, অশ্লীল কথা বলে।

চুপচাপ পড়ে রইলাম। এ লাইনের গোনা শেষ করে ও লাইনের সেলের তালা পরখ করতে করতে সিপাইটি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল তার পায়ের শব্দ। এখন ডিউটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে আর আসবে না। নীচে বসে গাঁজা খাবে আর ঝিমোবে।

নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে বসলাম। প্রায় দুটো বাজতে চলল। থমথম করছে নিশুতি রাত।

বাইরে বিশাল আমার দেশের গ্রামগুলি এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। এতক্ষণে নিদ্রিত হয়ে গেছে শহরগুলিও। শুধু এই গভীর রাতে কাজ করছে শ্রমিকরা। রেল শ্রমিক রেল চালাচ্ছে, কাপড় কলের শ্রমিক কাপড় বুনছে, ইস্পাত কারখানায় ইস্পাত ঢালাই হচ্ছে, হাসপাতালে নার্স ডিউটি দিচ্ছে। এমনি-ভাবে সমাজের কাছে যারা দায়বদ্ধ শুধু তারাই জেগে আছে।

বাইরে থাকলে আমিও এতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতাম। কিন্তু এখানে এই নির্জন সেলে নিদ্রা অতি নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে চোখ থেকে। যা আছে তা হল তন্দ্রা। মাঝে মাঝে খানিকক্ষণের জন্য একটু ঝিমুনি আসে, ব্যস্‌।

তারপর শুধু জেগে থাকি আর ভাবি। আর ভাবনাগুলো উঁচু-নিচু পাথরের মেঝেয় পোড়া কয়লা দিয়ে লিখি। তারপর সে লেখা মুছে দিই।

এজন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই। এ লেখার লেখকও আমি, পাঠকও আমি। এ তো আর কাগজে কলমে লেখা নয়, এ লেখা ছাপাও হবে না কোনদিন, কেউ পড়বেও না। এ লেখা মুছে গেলে কার কি ক্ষতি!

বড় বড় লেখকদেরই কি সব লেখা প্রকাশ হয়? রবীন্দ্রনাথ তো ছবি আঁকা দিয়ে জীবন শুরু করেন নি। নিজের লেখা কাটতে কাটতে হয়ে উঠলেন চিত্রশিল্পী।

টলস্টয়ের মহাভারতের মত উপন্যাস 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিস'-এর পাণ্ডুলিপিকে সাতবার তিনি আগাগোড়া কপি করেছিলেন। শেষ কপি ছাড়া অর্থাৎ যা ছাপা হয়, পাঠকের হাতে এসেছে তার আগের ছবারের কপি? তার পেছনে যে শ্রম, যে চিন্তাভাবনা সেও তো হারিয়ে গেছে।

গোর্কি লেখককে তুলনা করেছেন একজন ছুতোর মিস্ত্রির সঙ্গে। একজন ছুতোর সে যেমন কাঠের গুঁড়িকে কেটে কুঁদে কুঁদে টেবিল, চেয়ার, নানা শৌখিন আসবাবপত্র বানায়, একজন লেখকও তেমনি অজস্র ঘটনাপ্রবাহ আর তথ্যকে মন্থন করে নিজের কল্পনা মিশিয়ে তৈরি করেন একটা লেখা।

খ্যাতিমান লেখকদের যখন এই অবস্থা তখন আমার মতো এক বন্দীর লেখা মুছে গেলে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কি আছে?

কম্বলের ঢাকা খুলে উঠে বসলাম।

বাইরে করিডোরের আলোর ছটা সেলের ভেতরে ঢুকে চকমক করে জ্বলছে। আমার পাশের সেলের বন্দীটির ঘর্‌র-ঘর্‌র করে নাক ডাকছে। সামনের সেলের বন্দীটি ঘুমোচ্ছে মুখটা হাঁ করে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে মুখটা নড়ছে, মনে হচ্ছে যেন খাবি খাচ্ছে।

হাতে কাঠকয়লা তুলে নিয়ে আবার লিখতে শুরু করলাম। এর আগে লিখেছিলাম প্রথম যৌবনের স্বপ্নের কথা। কোথায় গেল সে স্বপ্ন? কোথায় গেল স্বপ্নের কাছে সেই প্রত্যাশা?

প্রথম যৌবনে, চোখে যখন মার্কসবাদের আলো ঝলকাল তখন চারধারে বাজছে মুক্তিযুদ্ধের দামামা। আমার দেশের চারিপাশ ঘিরে সেকি বিপুল আলোড়ন। রণসজ্জায় সজ্জিত তরুণ বীরের দল নেমেছে পথে, জ্বলছে

মালয়, জ্বলছে চীন, ব্রহ্মদেশ, জ্বলছে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, লণ্ডন। শেষ হয়ে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

কাল বৈশাখীর বজ্র গর্জনের মতো আমার দেশেও গর্জন করছে মানুষ।

তারপর। পার হয়ে গেল অর্ধশতাব্দী। আজ কি দেখছি? মালয় আছে। মালয়ের গেরিলাদের নিয়ে আমাদের দেশের যে কবিরা কবিতা লিখেছিলেন তাঁরাও অনেকে এখনও বেঁচে আছেন। সে সব কবিতার বই এখনও কারো কারো ঘরের র‍্যাকে নিশ্চিতই আছে। শুধু নেই মালয়ের গেরিলারা।

বার্মা! কোথায় সেই গণ-ফৌজ আর কোথায় সেই বীররা!

ইন্দোনেশিয়া! সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বাদ দিলে বিশ্বের বৃহত্তর কমিউনিস্ট পার্টি? কি হল তার?

চীন! বিপ্লবের এত বছর পরেও কি অস্থিরতা?

কেন এমন হল? কেন এমন হয়?

আমাদের দেশের অতবড়, অত শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলন?

ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল চোখের সামনে। ভাগের মধ্যে ভাগ। তার মধ্যে ভাগ। দলের মধ্যে উপদল। উপদলের মধ্যে চক্র। ঠিক মধ্যযুগের ছোট ছোট ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো। একজন গুরু আর তাকে অনুসরণকারী কিছু শিষ্য। আর সবাই চাইছে অন্যকে নিশ্চিহ্ন করতে।

শ'য়ে শ'য়ে যারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল তারা অনেকে ঘরে ফিরে গেল।

যারা চাকুরি করে তারা অবসর নিলে বলা হয়—'এক্স সারভিসমেন।'

প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর লোকদের বলা হয় 'এক্স মিলিটারি মেন।'

তেমনি আমাদের দেশেও আজ একদল মানুষ তৈরি হয়েছে যাদের বলা যেতে পারে 'এক্স কমিউনিস্ট'।

হয়ত কোনো সরকারি চাকুরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানা যায় এককালে তিনি ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্য ছিলেন।

হয়ত ভুড়িওয়ালা কোন ব্যবসাদার ফিক করে হেসে ফেলে গল্প করেন, এককালে তিনিও ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে মিছিল করেছেন।

হয়ত কোন অন্তঃপুরের গৃহবধু খেতে দিয়ে সলজ্জভাবে গোটা পরিবেশকে চমকিত করে বলে ওঠেন—বিবাহের আগে তিনিও মহিলা সমিতি করেছেন।

হয়ত পাড়ার কোন পক্ককেশ বৃদ্ধ এখনও বসে স্মৃতিচারণা করেন 'গণনাট্যের স্কোয়াডে গান গেয়েছি যৌবনে।'

এঁরা সব এসেছিলেন, চলে গেছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা —'আসা-যাওয়া দুদিকেরই খোলা আছে দ্বার।'

আসার দরজা খোলা ছিল এসেছিলাম, যাওয়ার দরজা খোলা ছিল চলে গেলাম। তাহলে কমিউনিস্ট আন্দোলন কি একটা ধর্মশালা? এলাম, দুদিন থাকলাম। চলে গেলাম। তাহলে এর কোনো আদর্শগত বন্ধন নেই, এর কোনো দায়িত্ব নেই? এর কোনো নৈতিকতা নেই? এর কোনো সাধনা নেই, ধারাবাহিকতা নেই।

নাকি 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনে' জন রীড যেমন বলেছিলেন—'বিপ্লব যত দীর্ঘায়ত হয় তত তার জন্য মূল্য দিতে হয় বেশি'—এ সেই মূল্য দেওয়া।

কে জানে?

সময় কোথায় এ নিয়ে ভাবনা চিন্তার। দিন চলছে, তাতে তাল দিয়ে অন্য সব কিছুর সঙ্গে আমরাও চলেছি। আর থেকে থেকে রাতের ঐ পাহারাদারের মত হেঁকে বলছি

—'সব ঠিক হ্যায় হুজুর।'

—'দেশে বুর্জোয়া শাসন, শোষণ?'

—'ঠিক হ্যায় হুজুর।'

—'অশিক্ষা, দারিদ্র্য অনাহার?'

—'ঠিক হ্যায় হুজুর।'

—'ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ?'

—'ঠিক হ্যায় হুজুর।'

—'চোরাবাজারি, ফাটকাবাজি, ব্যভিচার?'

—'ঠিক হ্যায় হুজুর।'

—'এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ?'

—'ঠিক হ্যায় হুজুর।'

—'শ্রমিক আন্দোলন?'

—'ঠিক হ্যায় হুজুর?'

—'ছাত্র, যুব, বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীলতা?'

—'সব ঠিক হ্যায় হুজুর, সব ঠিক হ্যায়।'...

আর এই 'সব ঠিক হ্যায় হুজুরের' আড়ালে রক্ত ঝরছে শোষিত মানুষের

বুক থেকে। ইতিহাসে সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে হিংস্র বুর্জোয়াশ্রেণী রয়েছে রাষ্ট্র ক্ষমতায়। তারা শত শত শতাব্দীর গড়ে ওঠা সামাজিক পারিবারিক বন্ধনগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। নীতিহীনতা হয়ে উঠেছে এ যুগের নীতি। জীবনবোধে সুস্থতার স্থান নিয়েছে বিকৃতি। অপরাধ প্রবণতা হয়ে উঠেছে আইনসিদ্ধ। সামাজিক দায়বদ্ধতার স্থান নিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ।

ব্যথায় কাঁদছে মানুষ।

পক্ককেশ বৃদ্ধ, ঘরের গৃহিণী, সুস্থ চেতনাবান যুবক, সবাই বুঝছে তারা হটে যাচ্ছে। একের পর এক রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সুস্থভাবে বাঁচার পথ।

সবাই ভাবছে 'একে বদল করার পথ কোথায়?'

আর এক অদৃশ্য কপালকুণ্ডলা যেন সবাইকে ডেকে একই প্রশ্ন করছে— 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

(ক্রমশ)

দস্তয়েভস্কির শেষ ভালোবাসা

সের্গেই বেলভ

'কারামাজভ ভাইয়েরা-'র কাজটা সংঘটিত হয়েছে নভোগোরোভ-এর কাছাকাছি স্তারায়া রুশশা নামের ছোট্ট শহরটিতে। স্থানীয় খনিজ জল তাঁর ছেলেপুলের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল জেনেই এখানে দস্তয়েভস্কির সাময়িক ভাবে বসবাস। শান্ত এই ছোট্ট শহরটিকে দস্তয়েভস্কি তাঁর লেখালেখির পক্ষে চমৎকার জায়গা বলে মনে করেছিলেন। এমনি একটা নিরিবিলি, প্রশান্ত, ঝুটঝামেলা শূন্য, মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ ও সামান্য মানবিক আনন্দের স্বাদ পাবার বাসনা দস্তয়েভস্কি দীর্ঘদিন আকুল হয়ে অন্তরে অন্তরে লালন করে এসেছিলেন। আন্নার প্রযত্নকে ধন্যবাদ, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মাত্র মহান শিল্পী তা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

অবশ্য এর সব কিছুই আপেক্ষিক। স্তারায়া রুশ,শায় তাঁরা বাস করে ছিলেন আন্নার ভাইয়ের বাড়িতে এবং পিটার্সবার্গে তাঁদের ছিল একটা সাজানো-গোছানো ভাড়া বাড়ি। তাঁদের বাস্তব অবস্থাটা বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল কাৎকভ-এর উপর। রুশকি ভেসৎনিকের তিনি যদি 'কারামাজভ ভাইয়েরা' প্রকাশ করতে নারাজ থাকতেন তবে তাঁদের 'ভাল থাকা'-য় ইতি টানা হয়ে যেত। একসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ফুসফুসের হাঁপানি। নির্বাসন জীবন যাপনের সময় তিনি এ রোগের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাই তাঁকে নিয়ে গেছে কবরের দিকে।

কিন্তু তাঁর কাজের প্রয়োজনে অতি মানবিক সহযোগিতাই দিয়েছেন আন্না। যেমনটি বিদেশে থাকার সময় তিনি অনুভব করেছেন জুয়া খেলাটা তাঁর সৃজনী প্রতিভাকেই শক্তি জোগায়, তেমনি এখন তিনি বোঝেন দস্তয়েভস্কি আর যুবকটি নেই। এখন তাঁর সাধারণ মানবিক আনন্দ ফুর্তিটাই একান্ত দরকার, এবং তিনি যেমনটি ভেবেছিলেন তেমনটিই হয়েছে সব। দস্তয়েভস্কির চূড়ান্ত সৃষ্টি 'কারামাজভ ভাইয়েরা'র জন্যে তিনি যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

এটা আরো সঠিক যে, পারিবারিক আরাম শান্তি এবং সুখী বিবাহই দস্তয়েভস্কির 'এক নষ্ট যুবক' রচনার প্রাথমিক প্রেরণা ও শক্তি উপাদান হিসাবে

দেখা দিয়েছিল। তাঁর ছেলেমেয়েদের জীবন, তাঁর নিজের বাড়ি ঘরকে একটা আত্মিক স্থিরতা এবং নিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে দেখে, তিনি তাঁর 'আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠা পরিবার' উপন্যাসের বিষয়টি পেয়ে গিয়েছিলেন।

যুবা আর্কাদির ভোলগোরুকভ-এর ভাগ্য লেখকের ছেলে মেয়েদের একটা ঐক্যবদ্ধ প্রেমপূর্ণ অনাকথিক পরিবারে মানুষ হবার ঘটনার বৈসাদৃশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। আর্কাদির বাবা ভার্সিলভ-এর মুখে তিনি 'আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠা পরিবার'-এর সংজ্ঞাটি উপস্থিত করেছেন। যা তাঁর সুখি পরিবারের উল্টো স্বরূপ মাত্রা বিশিষ্ট। 'দেখ, বন্ধু,' ভার্সিলভ তার ছেলেকে বললেন, 'বহুদিন আগে আমি জানতাম আমাদের ছেলেপুলেরা ছোটবেলা থেকেই তাদের সংসার সম্পর্কে ভাবে-টাবে, কিন্তু পিতাদের ও পরিবেশের অনুপ-যুক্ততায় তা দারুণভাবে ঘা খেয়েছে।'

আন্না দস্তয়েভস্কিকে একটা শিশুর মতনই পরিচর্যা করেছেন, আক্ষরিক অর্থেই তাঁর জন্যে তাঁর ত্যাগ স্বীকার একজন 'বিশ্বস্ত অসীধারী-'র মতো (দস্তয়েভস্কি তাঁকে ঐ বলেই ডাকতেন)। সমস্ত সাহিত্য সভাতেই তিনি তাঁর সঙ্গিনী হতেন, কেননা তিনি জানতেন, বক্তৃতা দেবার পর তাঁর গলা সারানোর পিল দরকার হবে, এবং যখন তিনি রাস্তায় বেরবেন তখন কাউকে না কাউকে তাঁর গলাবন্ধ (স্কার্ফ) ঠিক ঠিক মত জড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বিনম্রভাবে সহ্য করেছেন তাঁর রোগগ্রস্ত অস্থিরতা এবং ঈর্ষা উদ্গার। মৃগী রোগের আক্রমণের ধাক্কা সামলানোর জন্যে প্রতি মুহূর্তে দস্তয়েভস্কিকে সাহায্য করতে তিনি আঠার মতন লেগে থেকেছেন। তাঁর তীক্ষ্ম মনোযোগের জন্যে আন্নাকে ধন্যবাদ, কেননা তাঁদের বিয়ের চোদ্দ বছরের মধ্যে মৃগীরোগের আক্রমণ দস্তয়েভস্কিকে আর ক্ষত বিক্ষত করতে পারেনি। তবে কখনো তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যে, হাত তুলতেও অসমর্থ হয়েছেন। আন্নাই তখন অনুলিপি করে দিয়েছেন তাঁর লেখাপত্রের। রাতের পর রাত দস্তয়েভস্কির পাশে জেগে কাটিয়েছেন, দস্তয়েভস্কির ইচ্ছানুযায়ী তাঁর উপন্যাসের নতুন অধ্যায়টি পড়ে দেখার জন্যে।

তাঁকে প্রুফ দেখতে হত, মুদ্রকদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করতে হত। তাঁকে দস্তয়েভস্কির একজন সচিবের কাজ করতে হত এবং সাংসারিক ও অর্থনৈতিক কাজ কারবারের যোগাযোগ রক্ষার জন্যে চিঠি চাপাটি চালাচালিও করতে হত। তিনিই ছিলেন দস্তয়েভস্কির জীবনে সমস্ত ঝঞ্ঝাটের দিনগুলোতে সান্ত্বনা এবং তাঁর লেখালেখিতে বাধা বিপত্তি সৃষ্টিকারীদের প্রবল এবং সাহসী

প্রতিপক্ষ। [দস্তয়েভস্কির ভাইদের দেনা শোধ করার জন্যে তাঁর জীবৎকালেই আন্না দস্তয়েভস্কির লেখা পত্র নিজেরই ব্যবস্থানায় প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন]।

১৮৭৬-এ এম্স্ (Ems) দস্তয়েভস্কি লিখেছেন 'তুমি একটি স্বতন্ত্র নারী ব্যক্তিত্ব, অন্যভাবে বলা চলে, সর্বোত্তম। তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে তুমি নিজে সন্দিহান হয়ো না, তুমি কেবল গেরস্থালীর কাজই গোছাচ্ছে না—কেবল আমার কাজেই লিপ্ত থাক না, আমাদের সকলের জন্যেই করে যাচ্ছ। আমরা খেয়ালী আর চোপসানো—আমি থেকে এ্যালিয়োসা অবধি সবাই. তুমি আমাদের চালিয়ে নিচ্ছ·· তুমি রাত জেগে থাক, বই-এর বিক্রি পাট্টার দিকে লক্ষ্য রাখো, ডায়রীর সম্পাদকীয় দপ্তরও চালাও···যদি তোমাকে রানী করা যেত এবং দেয়া যেত তোমার নিজস্ব একটা রাজত্ব, আমি হলপ করে বলতে পারি, তুমি অনেকের থেকেই তা ভালোভাবে চালাতে পারতে। তোমার তেমন বুদ্ধিমত্তা আছে—আছে সাধারণ জ্ঞান। তোমার আছে পবিত্র সহৃদয়তা—আছে সংগঠনী ক্ষমতা।··"

এক নিঃশ্বাসে বলা যায় তাদের চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে একটা সামান্য অবিশ্বাসের ঘটনাও ঘটেনি—ঘটেনি আহত হবার মত কোন কিছুই। দস্তয়েভস্কি এমন ভাবে তাঁর পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেপুলে ছাড়া এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারতেন না। জীবনের শেষ কটা দিন দস্তয়েভস্কি তাঁর আন্নাকে কেবল ভালই বাসেননি, বিয়ের প্রথম বছর তিনি তাঁর সঙ্গে যেমন ভালবাসায় আত্মহারা হয়েছিলেন। তেমনি একাকার হয়েছিলেন। তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমে পড়ার ক্ষমতা দেখে পরম বিস্মিতই হয়ে গেছেন। ১৮৮০-র জুন মাসের এক হটগোলময়, উত্তেজক উদ্বেগের দিনে দস্তয়েভস্কি মস্কোতে যখন পুশকিন স্মরণে তাঁর সুবিখ্যাত অভিভাষণটি দেন, তখনও তিনি তাঁর 'প্রিয়তমা আনন্দিতা এবং অমূল্য' আন্নাকে ভুলে যাননি। বিখ্যাত পুশকিন ভাষণের পর এক চিঠিতে দস্তয়েভস্কি প্রিয়তমা, অনিন্দিতা ও অমূল্য বলেই আন্নাকে অভিহিত করেছিলেন।

যে ভাষণের পর দস্তয়েভস্কি 'আমাদের ঋষি' এবং 'এক অনন্য প্রতিভা, না প্রতিভার চেয়েও কিছু বেশি' বলে অভিহিত হয়েছিলেন, সেই ভাষণ ছিল রাজহাঁসের গান, এ এক আধ্যাত্মিক উইল এবং তাঁর বিলম্বিত গৌরবের শেষ দীপ্তি।

লেখকের কন্যার স্মরণ—পুশকিন অভিভাষণের পর দস্তয়েভস্কি 'প্রত্যাশা করেছিলেন, সেপ্টেম্বর নাগাদ একটা চিকিৎসার কোর্স করিয়ে নেবেন। কিন্তু সে ভাবনা বন্ধ রাখতে হলো। কেননা, এই অভিভাষণের ফলে তাঁর যে বিজয়-বৈজন্তী দেখা দিয়েছিল, তার উত্তেজনায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাক্কায় তিনি অবষিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন এমস ছেড়ে অন্তত এক বছর টিঁকে থাকতে পারবেন। কিন্তু হায়, তিনি আন্দাজই করতে পারেন নি তাঁর তাঁর ঠুনকো শরীর কাঠামো ক্ষয়ে এসেছে। তাঁর ইস্পাত কঠিন মানসিক শক্তি, তাঁর আদর্শ প্রজ্জ্বল হৃদয় আর আভ্যন্তরীণ প্রেরণা শারীরিক শক্তি যাথার্থ সম্পর্কে তাঁকে উচ্চ আশান্বিত করেছিল। কিন্তু যা সত্য, সে হচ্ছে যৎকিঞ্চিত শক্তিই মাত্র তাঁর আর অবশিষ্ট ছিল...'

কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দস্তয়েভস্কি তাঁর 'শারীরিক শক্তি সামর্থ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন নি। তিনি জানতেন ফুসফুসের হাঁপানি দ্রুত বেড়ে যেতে পারেএবং অত্যধিক উত্তেজনায় তা তাঁর জীবনকেও বিপদাপন্ন করে তুলতে পারে। আন্নাও এটা জানতেন (ডঃ এম. এল. সিংকিন নামের এক আত্মীয়, যিনি আন্নার অনুরোধে তাঁর স্বামীকে ১৮৭৯-তে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি আন্নাকে জানিয়েছিলেন)। তবে তিনি ভাবতেই পারেন নি পরিসমাপ্তি এত দ্রুত এবং অভাবিতভাবে এসে যাবে। তিনি যদি না পুশকিন স্মরণ সভায় যেতেন, যদি স্তরোয়া রুশশয় তাঁর প্রিয় পরিবার পরিজনের মধ্যে বাড়িতেই থাকতেন—শান্তভাবে যদি তিনি কাজ করে যেতে পারতেন, দস্তয়েভস্কি সম্ভবত, আরো কিছুদিন জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারতেন। আন্নার এ ব্যাপারে একটা আক্ষেপই ছিল, কারণ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল যে মস্কোতে তাঁর জন্যে 'উদেগজনক দিন' অপেক্ষা করেছে। কিন্তু পুশকিন স্মৃতি সৌধের আবরণ উন্মোচনের জন্যে মস্কো যাত্রার ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তিই তোলেন নি। স্তরোয়া রুশসার শান্ত পরিবেশে তিনি যখন দস্তয়েভস্কির ভাষণটির অনুলিপি করেছেন, তিনি অনুভব করেছেন যে এটা বস্তুতই তাঁর সর্বশেষ আত্মিক উইল (দানপত্র) এবং পত্র (টেস্টামেন্ট)। আর, সম্ভবত, এই ভাষণটির জন্যেই তিনি আজীবন কাজ করে এসেছেন—জীবন ভর অপেক্ষা করে গেছেন। বারবারই তাঁর সংজ্ঞা (ইনটিউশন) তাঁকে কখনো প্রতারিত করেনি। 'ভেবে অনাবিল আনন্দ হচ্ছে যে, অবশেষে রাশিয়া সমুজ্জ্বল পুশকিনের মহান অবদানকে উপলব্ধি করতে পারল।'

আন্না স্মরণে এনেছেন 'এবং রাশিয়ার প্রাণ কেন্দ্র মস্কোতে একটা স্মৃতি সৌধ গড়ে তুলেছে তাঁর নামে একটা আনন্দময় চেতনতায় তিনি, যিনি তাঁর জীবনের যৌবন বেলা থেকেই এই মহান জাতীয় কবির প্রতি আত্মোৎসোর্গীকৃত ভক্ত ছিলেন, তাঁর ভাষণে, এক্ষনে, সেই কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা সুযোগ পেলেন। জনসভা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তাঁর এই ব্যক্তিগত দানের জন্যে যথেষ্ট ভাবেই প্রশংসাবাণী উড়িয়েছিল। সবকিছু মিলে যা ফিয়োদোর দস্তয়েভস্কিকে দিয়েছিল, তিনি তাঁকে বলেছেন "মহত্তম সুখের মুহূর্ত।" নিজের মনোভাব আমার কাছে ব্যক্ত করার সময় ফ্যিয়োদার মিখাইলোভিচ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের উদ্ধার করছিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত ভাষণ শেষ করেই দস্তয়েভস্কি, তাঁর বিজয় বৈজয়ন্তীর কথা বলবার জন্যে তাঁর প্রিয়তমা আন্নার কাছে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন।

বড় দেরিতেই খ্যাতি প্রতিষ্ঠা এল। তাঁর বেঁচে থাকার মেয়াদ আর মাত্র আটমাস অবশিষ্ট ছিল। ১৮৮১-র ২৫-২৬শে জানুয়ারী রাতে লেখক যখন কলম খুঁজতে একটা বড়সড় ভারি বুক সেলফ সরাচ্ছিলেন, তাঁর রক্ত বমি শুরু হল। দস্তয়েভস্কির খুড়িমা কুমানিয়া তাঁকে যে রেজান এস্টেটের সম্পত্তিটা দান করে গিয়েছিলেন, ২৬-শে জানুয়ারী তাঁর বোন ভি. এম. ইভানোভা এসে তার একটা অংশ তাঁর নামে লিখে দিতে বললে যে ভয়ঙ্কর কথা কাটাকাটি হয়েছিল তাতে তাঁর চোট গুরুতর হয়ে পড়ে। ১৮৮১ সালের ২৮শে জানুয়ারী—তাঁর মৃত্যু দিনের খুব সকালে, দস্তয়েভস্কি তাঁর স্ত্রীর ঘুম ভাঙালেন। খুব ধীরে ধীরে নিচু স্বরে তিনি বললেন, 'আন্না শোন, জেগে উঠে আমি তিন ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, আর এখন পরিস্কার বুঝতে পারলাম, আমি আজ মরে যাব।' আন্না তাঁর স্বামীকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন, তিনি বেঁচেই থাকবেন। কিন্তু বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "না, আমি জানি আজ আমি মরে যাব। মোমটা জ্বালো, আন্না, আর আমার হাতে গোসপেলটা (খৃষ্টের উপদেশাবলী) দাও।" তিরিশ বছর আগে এম্‌স্ক-এর আদালতী কয়েদখানায় বন্দী হয়ে যাবার পথে টোবোলস্কের ডিসেম্ব্রিষ্টদের বৌ-এরা দস্তয়েভস্কিকে এই নিউ টেষ্টামেন্ট গ্রন্থটি দিয়েছিল। (এটাই ছিল একমাত্র বই যা বন্দীরা পড়তে পারত)। জীবনের বিভিন্ন সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়ে দস্তয়েভস্কি এই গ্রন্থটি খুঁজতেন এবং গ্রন্থের বাঁ

দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে যা থাকতো তা এক নাগাড়ে এলোপাথারি ভাবে পড়ে যেতেন।

সেদিন সকালে তিনি উপদেশমালা খুললেন, কিন্তু সামর্থ নেই যে তা পড়েন। আন্না পৃষ্ঠাটা পড়ে শোনালেন। "মনে রেখো, আন্না," তিনি বললেন, "আমি সব সময় তোমাকে প্রাণ ভরে ভালবেসেছি, আর কখনই তোমাকে প্রতারণা করিনি।"

দস্তয়েভস্কি ছেলেপুলেদের কাছে ডাকলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা কেমন করে জীবন যাপন করবে, সে ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিলেন। বললেন, কেমন করে তারা মাকে ভালোবাসবে—সততার সঙ্গে ভালবাসতে বললেন; আর বললেন সততার সঙ্গে কাজ করতে। তিনি তাদের বললেন সহায়হীনদের ভালবাসার জন্যে, আর তাদের সাহায্য করতে।

এক মিনিটের জন্যেও আন্না মৃত্যু পথ যাত্রীর শয্যা থেকে উঠে যাননি। তিনি তাঁর নিজের হাতের মধ্যে তাঁর হাতখানা ধরে নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, "বেচারা…প্রিয়তমা…আমি তোমার জন্যে কি রেখে গেলাম… হতভাগ্য নারী, কি দুঃখ কষ্টই না এখন তোমার জীবনে নেবে আসবে।"

আন্নার ১৮৮১-র নোটবুক এর সংক্ষিপ্ত লেখালেখি থেকে দস্তয়েভস্কির প্রিয়তমা স্ত্রী এবং সন্তানদের সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনার দিশাটি জানতে পারা যায়। "কখনো কখনো তিনি তাঁর কামরা থেকে সহসা আমাকে ডাকতেন, 'তুমি ঘুমুচ্ছো? না? বিদায়। আমি তোমাকে ভালবাসি…' 'আমি তোমাকে খুব ভালবাসি,' 'সমস্ত টাকাকড়িই তোমার, বিশিষ্ট ভদ্র জনেরা উইলে তার দান পত্রে স্বাক্ষর করেছেন (আমাদের দেখতে হবে ছেলেপুলেরা যাতে না প্রতারিত হয়)।"

মহান লেখকের শব যাত্রাটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আলেক্‌জাণ্ডার নেভস্কি মনাস্টারীর পথে তাঁর কফিনের পেছনে ত্রিশ হাজার মানুষ মিছিলে যোগ দিয়েছিল। প্রতিটি রুশবাসী তাঁর মৃত্যুকে জাতীর শোক এবং ব্যক্তিগত বিষাদ বলে মনে করেছিলেন।

কিন্তু আন্নার বেলায় তাঁর স্বামীর মৃত্যু একটা প্রকৃত শোকাঘাত হয়ে এসেছিল। "…আমি একটা ব্যাপার পরিস্কারভাবে বুঝেছিলাম, সেই মুহূর্ত থেকে আমার ব্যক্তিগত জীবন তাঁর অ .হীন সুখ সমেত শেষ হয়ে গেল আর আমি চিরদিনের জন্যে আত্মিক দিক থেকে অনাথা হয়ে পড়লাম। যে তার স্বামীকে এমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, এতো ভক্তি করত এবং এমন

অনন্য স্বতন্ত্র নৈতিক গুণের যিনি অধিকারী ছিলেন, এই মানুষটির ভালবাসা বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধায় যে ছিল গর্বিতা, যে আমার এ ক্ষতি আর পুনরুদ্ধারের অসাধ্য। বিচ্ছেদের সেই সত্যিকারের ভয়াবহ মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার স্বামীর মৃত্যুতে আমি আর বাঁচবো না, আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে, (তা বুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভাবে দাপাচ্ছিলো) অথবা আমি হয়তো পাগল হয়ে যাবো···আমি বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে হারিয়েছি। তিনি ছিলেন আমার আনন্দ, আমার গর্ব এবং আমার জীবনের সুখশান্তি—আমার সূর্য—আমার ভগবান।"

যে বছর দস্তয়েভস্কি মারা গেলেন, আন্না পঁয়তিরিশ বছরে পা দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেছেন, নারী হিসাবে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেছে। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কেন তিনি আবার বিয়ে করলেন না, প্রথম প্রথম তিনি প্রকৃত পক্ষেই এ-প্রশ্নে অপমানিতা বোধ করতেন এবং আমতা আমতা করে উত্তর দিতেন, "এটা আমার কাছে অপবিত্র বলে মনে হত।" কিন্তু পরেই তিনি কৌতুক করে বলে উঠতেন দস্তয়েভস্কির পরে আমি আর কাকে বিয়ে করতে পারি—তলস্তয়কে।"

দস্তয়েভস্কির নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আন্না নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। অন্ত্যেষ্টির দিনে আন্না শপথ নিয়েছেন তাঁর জীবনের 'অবশিষ্ট দিনগুলো' দস্তয়েভস্কির সমস্ত সৃষ্টিকে সর্বজনে পরিবেশনের জন্যে কাজ করে যাওয়ার। "ভাগ্য আমাকে শুধু একজন সাধারণ নারীই করেছে," তিনি লেখক ইজামাইলভকে বলেছেন একজন মহৎ মানুষের স্ত্রী হিসেবে অনন্ত সুখই আমি পেয়েছি এবং অবশ্যই, আমি অনুভব করি এর মধ্যে নিহিত রয়ে গেছে একটা দায়।"

তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আন্নার কর্মতৎপরতা হয়েছিল নানাবিধ এবং মহতী। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের সাত সাতটি সম্পূর্ণ এডিশন (সেদিনের অবস্থাটার কথা এব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে) প্রকাশ করেছেন এবং আলাদা আলাদা খণ্ড গ্রন্থও সেই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। ১৮৮৩-তে দস্তয়েভস্কির নামে স্তারায়া রুশসায় কৃষকদের ছেলেমেয়েদের জন্যে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, এবং সেখানে যে বাড়িটিতে তাঁরা বসবাস করেছিলেন, লেখককের ঘরের হিসেবে সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একটা যাদুঘর।

আন্না তাঁর ১৮৬০-এর শর্টহ্যাণ্ড ডায়েরীর ভাষা রূপ দিয়েছেন, তাঁর

স্মৃতিকথা রচনা করেছেন এবং মুদ্রনের জন্যে দস্তয়েভস্কির চিঠিপত্রের সংকলন তৈরি করেছেন। তাঁর এই অমূল্য জীবন তথ্যপঞ্জী বলে দেয় তাঁর দস্তয়েভস্কি সব সময়ই ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব—শান্ত প্রকৃতির, গতিশীল, সরল এবং ভালোবাসার পাত্র। এমনিই তিনি তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি চিরকাল তাঁর স্মরণে থেকে যাবেন, সম্পূর্ণ তাঁর প্রতি অনুরক্ত এবং তাঁকে গভীর আবেগে তিনি ভালবাসতেন এমন প্রিয়তম হিসেবেই।

তিনি প্রথমে প্রকাশ করলেন লেখকের জীবনী। তাঁর রচনার উপরে তৈরী করলেন বিবরণী, দস্তয়েভস্কির নিজের সংগ্রহে থাকা গ্রন্থরাজীর একটা গবেষণা মূলক সংকলনও তিনি প্রকাশ করেছেন। আন্না যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছেন দস্তয়েভস্কির পাণ্ডুলিপিগুলো। আন্নার স্মৃতিতে সংরক্ষিত সাহিত্যিক অনুসঙ্গগুলোকেও তিনি গ্রথিত করলেন। মস্কো ঐতিহাসিক যাদুঘরে দস্তয়েভস্কির নামে খুললেন একটি স্বতন্ত্র বিভাগ—'দি মিউজিয়াম অফ দি মেমেরি অফ এফ. এম. দস্তয়েভস্কি।' এছাড়া ১৮৪৬ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত এফ. এম. দস্তয়েভস্কির জীবন ও কর্মের সঙ্গে চিত্রকলারও একটা চমৎকার জীবন কেন্দ্রিক পরিশিষ্ট রচনা করলেন তাঁর সৃজন কর্মের।

১৯১৭-র ৬ই জানুয়ারি তরুণ স্রষ্টা সেরগেইপ্রোকিফিয়েভ 'জুয়ারী'-কে ভিত্তি করে একটা অপেরা রচনা করে ৭০ বছর বয়সী আন্নাকে সে সম্পর্কে জানালেন এবং অনুষ্ঠান স্মারক-এর জন্যে তাঁকে কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। বিষয় বলে দেয়া হল, 'সূর্য' (এটাই ছিলো এ্যালবামের বিষয়)। আন্না লিখলেন, "আমার জীবনের সূর্যই ফিয়োদোর দস্তয়েভস্কি: এ দস্তয়েভস্কায়া।"

বহুদিন আগে আন্না তাঁর আত্মীয়দের এবং নিকট একজনের (এবং এটাও লেখা আছে তাঁর টেস্টামেণ্ট নোটবুকে) কেবল একটা জিনিসের জন্যে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁকে যেন তাঁর স্বামীর পাশে আলেকজাণ্ডার নেভেস্কি মনাস্টারিতে কবর দেয়া হয়, এবং কোন স্বতন্ত্র স্মৃতি স্তম্ভ যেন সেখানে না গড়া হয়। যা আছে তার সঙ্গে কেবল দু-একটি বাক্য জুড়ে দিলেই চলবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় অন্য—ভাগ্য তাঁয় অন্যভাবেই লেখা, হয়েছিল।

১৯১৭-র গ্রীষ্মকালে যেমন সচরাচর গিয়ে থাকেন, আন্না ছুটি কাটাতে গেলেন দক্ষিণে। তাঁকে দারুণ ভাবে আক্রমণ করল ম্যালেরিয়া রোগে আর জার্মানিরা দখল করে নিয়েছিল ক্রিমিয়া, যার ফলে তাঁর পেট্রোগ্রাদে ফেরা

অসম্ভব হয়ে পড়ল। আন্নাকে জীবনের শেষ কটা মাস কাটাতে হল ইয়ালটায়।

ডাক্তার জেড এস, কোভরিগনা আন্নার সঙ্গে ইয়ালটায় ছিলেন। তিনি লিখছেন, "স্বামীকে আরাধনা করাটাই ছিল তাঁর জীবনের সারসত্তা, জীবনের অর্থ এবং তাঁর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য—এই নিঃশ্বাসই তিনি তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত নিয়েছেন।

আন্না মহান রাশিয়ান লেখকের স্ত্রী এবং সহকারিণী। তিনি কঠিন পরিশ্রম করেছেন দস্তয়েভস্কিকে একটু জীবনে সুখী করতে এবং তাঁর মরণোত্তর খ্যাতিকে সম্প্রসারিত করে প্রতিষ্ঠা দিতে। দস্তয়েভস্কির ভাষায় যিনি, 'একমাত্র মহিলা, তাঁকে বুঝতে পেরেছে'। ১৯১৮-র ৯ই জুন ইয়াল্টায় দস্তয়েভস্কির সত্তা স্মৃতি ও স্বপ্নভরা শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করলেন আন্না।

১৯৬৮-র ৯ই জুন আন্না গ্রিগোরিয়েভনা দস্তয়েভস্কায়ার মৃত্যুর ৫০তম বর্ষে তাঁর নাতি আঁদ্রেই কিছু উৎসাহী অনুরক্ত এবং সংগঠনের সহায়তায় আন্নার শেষ ইচ্ছা পূরণ করলেন। ইয়াল্টার কবরে সুপ্ত আন্নার মরদেহের অবশিষ্ট যেটুকু যা ছিল তা তুলে নিয়ে এসে যেখানে দস্তয়েভস্কি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, সেই আলেকজান্ডার নেভ্স্কি মনাস্টারীতে তাঁর কবরের পাশে আবার সমাধিস্থ করলেন। স্মরণ চিহ্নের ডান দিকে আজ দর্শক দেখতে পাবেন লেখা আছে শুধু একটা বিশেষণ হীন বাক্য, 'আন্না গ্রিগোরিয়েভনা দস্তয়েভস্কায়া, ১৮৮৬-১৯১৮। আর সেই নিরলঙ্কার বাক্যের পেছনেই গাঁথা আছে এক আশ্চর্য রাশিয়ান রমণীর পা।

এর তিন মাস পরে আঁদ্রেই কিয়োদোরোভিচ দস্তয়েভস্কি নিজেও চিরদিনের জন্য চলে গেছেন। আমি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে দেখেছিলাম। তিনি জানতেন, তিনিও শেষ হয়ে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন তিনি নিজে আন্না গ্রিগোরিয়েভনাকে নিয়ে কোন বই লিখে যেতে পারলেন না, আমি যেন লিখি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম লিখব।

(শেষ)

অনুবাদঃ সত্য গুহ

ভাষাতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথ

ইভ্‌গিয়েনিয়া মিহাইলোভ্‌না বীকভা

[রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর ইজ্‌দাতিয়েল্‌স্তভো ভস্তোচ্‌নই লিতেরাতুরি কর্তৃক ১৯৬১ সালে প্রকাশিত "রবিন্দ্রনাত্‌ তাগোর" শীর্ষক নিবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ই. ম. বীকভা রচিত "তাগোর-লিঙ্গভিস্ত" নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হল। রুশ থেকে সরাসরি এই অনুবাদ।

সম্পাদক, পরিচয়]

সাহিত্য, ললিতকলা ও বিজ্ঞানের প্রত্যন্ততম ক্ষেত্রগুলিতেও যে অল্প কয়েকজন শিল্পী ও চিন্তাবিদের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটিতেই তিনি নতুন কিছু করতে সক্ষম হয়েছেন, পরবর্তী প্রজন্ম যাতে নতুনের অন্বেষণে অগ্রসর হতে পারে সেজন্য পথ প্রস্তুত করেছেন। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গবেষণা অভিনব ফলপ্রদান করেছে। বাংলাভাষার ভাণ্ডার হতে বিপুল পরিমানে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব সংক্রান্ত বহু প্রশ্ন পর্যালোচনা করেছেন, আর শব্দ গঠন, বাক্যগঠন রীতি ও রচনাশৈলী সংক্রান্ত বহু মূর্ত সমস্যা সম্বন্ধে এবং ভাষা-দর্শন বিষয়ে বহু মূল্যবান মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অধ্যয়নের পরিধি ছিল বিশাল। তিনি স্বদেশেরও অন্য দেশের ভাষা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে সদা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

নিজের সৃজনশীল জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে ভাষা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। পরবর্তী পঁচিশ বছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দগঠন বিধি ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়[১]।

একটি একেবারেই আকস্মিক ঘটনা তাঁকে বাংলাভাষার তত্ত্বগত পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে একবার তাঁকে কিছুদিন বাংলা পড়াতে হয়েছিল। বাংলাভাষার উচ্চারণ বিধির বৈশিষ্ট্য-সমূহের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাকালে তিনি নিজেও লক্ষ্য করলেন

যে তাঁরা যে ব্যাকরণ বইটি ব্যবহার করছিলেন তাতে এ প্রসঙ্গ অতি অল্পই আলোচিত হয়েছে। প্রথমে তিনি নিজে শিক্ষার্থীটির জন্য কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য আহরণ করেন। পরে সেগুলিকে একটি নিবন্ধের মধ্যে সাধারণীকৃত করার কথা ভাবেন। এইভাবেই তাঁর ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত ঘটে। অবশ্য এর পেছনে একটি অন্য, গভীরতর কারণও কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা চর্চার পটভূমি রচিত হয়েছিল জাতীয় আত্মসচেতনার বিকাশের লক্ষ্যে নিবেদিত তৎকালীন দেশপ্রেমিক আন্দোলনের ও সংগ্রামের গতিধারার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের একেবারে গোড়া থেকেই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বাঙালীদের জাতীয় আত্মসচেতনতার বিকাশ ঘটছিল এক চূড়ান্ত বৈপরীত্যের আবর্তের মধ্যে। এই বৈপরীত্য বা বিরোধী ছিল তৎকালীন ভারতীয় সমাজে উদ্ভূত এক নতুন সমাজ-আর্থনীতিক সামাজিক স্তরের বিকাশেরই এক অভিব্যক্তি। শুধুমাত্র দেশের আভ্যন্তরীন বিকাশ প্রক্রিয়ার ফল হিসাবেই নয়, ঔপনিবেশিক শোষন ব্যবস্থার অন্যতম ফল হিসাবেও এই নব্য-ভারতীয় সামাজিক স্তরটির উদ্ভব ঘটেছিল। জাতীয় আত্মসচেতনতার সেই উদ্ভব প্রক্রিয়ার একটা বড়ো জায়গা জুড়ে ছিল জাতীয় সংস্কৃতির পুর্ণজাগরণের লক্ষ্যে নিবেদিত সংগ্রাম। যে বুদ্ধিজীবীরা এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, জাতীয় আত্মসচেতনতা গড়ে তোলার এক উপায় হিসাবে নতুন সাহিত্য ও সাহিত্য-ভাষা নির্মাণের ওপর তাঁরা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু জীবনের দাবী হতে উত্থিত এই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েও বাংলার এই বুদ্ধিজীবীরা একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারেননি। একটি ধারার অনুসারীরা দূর অতীতের সংস্কৃতিকে পুর্ণজাগরিত করার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার ও তার লিখিত রূপের মধ্যে বিধৃত অলঙ্কাররাজির ঐশ্বর্যের মধ্যেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতা বিধানের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। অন্য একটি ধারার সদস্য ছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক ও সমাজসেবী। শেষোক্তেরা বুঝেছিলেন যে বাংলার মানুষের উপর নির্ভর করেই তাঁদের মুক্তির ও তাঁদের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার পথ খুঁজতে হবে; আর, এই অন্বেষণের সঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই প্রাগ্রসর লেখক ও কর্মীবৃন্দের প্রয়াসের ফল হিসাবে বাংলা ভাষা তার সেই নিজস্ব রূপটিকে খুঁজে পেয়েছে,

যা সংস্কৃতের অত্যধিক প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে ক্রমেই বেশী বেশী করে জনগণের মুখের ভাষার নিকটবর্তী হচ্ছে।

অবশ্য সংস্কৃতের প্রভাব হতে মুক্তিলাভের এই প্রক্রিয়াটি ছিল অতি ধীরগতি। [১৯২৬ সালে সুনীতিবাবু এপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন] গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্যের [বাংলা] ভাষা সংস্কৃতের শাসনাধীনে নিপীড়িত হচ্ছে। ···উনবিংশ শতাব্দীর বেশীর ভাগটা জুড়ে বাংলার গদ্য সাহিত্য এক দুস্তর কৃত্রিমতায় নিমজ্জিত হয়েছিল; তার বহিরঙ্গ রূপ মধ্যযুগের বাংলার, আর শব্দভাণ্ডার অতিমাত্রায় সংস্কৃতগন্ধী; যদি চসরীয় ব্যাকরণ আর অতি-জনমনীয় শব্দভাণ্ডার সমন্বিত কোনো 'আধুনিক ইংরেজী ভাষা'-র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, তবে কেবলমাত্র তার সাথেই ঐ বাংলার তুলনা করা চলে"[২]।

বাংলাভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের, বা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে কৃত্রিম সংস্কৃত ভক্তদের প্রভাব থেকে মুক্তি এসেছে আরও ধীরে। তার সাক্ষী শ্যামাচরণ শর্ম্মা [১৮৫২][৩] এবং ডব্লিউ ইয়েট্স্ [১৮৭৪][৪] রচিত ব্যাকরণগুলি। সে যুগের পক্ষে এই ব্যাকরণগুলির মান খুবই ভালো। তবে তাদের অনেকটাই জুড়ে আছে সংস্কৃত শব্দ নির্মাণের নিয়মাবলী, সন্ধির সংস্কৃত নিয়ম, আর সংস্কৃত প্রত্যয়-বিভক্তির বর্ণনা। কার্যত বাংলায় আছে চারটি কারক, কিন্তু এই বইগুলিতে সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলাতেও সাতটি কারক দেখানো হয়েছে, এমনকি একটি অষ্টম—সম্বোধন—কারকের কথাও বলা হয়েছে। বিশেষ্য সমূহকে সংস্কৃতের অনুসরণে তিনটি লিঙ্গে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু 'ছুরি' 'পাতা' প্রভৃতি প্রাণহীন বস্তুর দ্যোতনাকারী শব্দের ক্ষেত্রে পদ-প্রকরণের বা রূপ-বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো প্রকার লিঙ্গের অস্তিত্ব চোখে পড়েনা। এই ব্যাকরণকারেরা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে লিখিত বাংলাকেই বাংলাভাষার আদর্শ রূপ বলে ধরে নিয়েছিলেন। বাংলাভাষার যেসব ব্যাপার সংস্কৃতের থেকে আলাদা এবং যা কেবলমাত্র বাংলারই বৈশিষ্ট্যসূচক সেগুলির দিকে তাঁরা প্রায় তাকালেনই না। অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভাষাটিকে বিকৃত করে ফেললেন। এমন কিছু নিয়মকে সাহিত্যের বাংলাভাষায় স্থায়ী হতে সাহায্য করলেন, যেগুলি কোনোমতেই বাংলার নিজস্ব নিয়ম নয়। এইভাবেই সাহিত্যের আর জনগণের মুখের (সাধু আর চলিত) ভাষার মধ্যেকার পার্থক্য গড়ে উঠল এবং বজায় থাকল। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখক ও এই

প্রভাবের বাইরে থাকতে পারেন নি। প্রখ্যাত ইন্দো-আর্যভাষাবিদ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকের উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"-র [১৮৬৫] ভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন ; "প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার, সমাজের আড়ম্বর, বিশেষণ পদে অযথা স্ত্রী প্রত্যয়ের আধিক্য, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী বাক্যগঠন ইত্যাদি দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় অপ্রচুর নয়"[৫]।

আমাদের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার ব্যাকরণ প্রণেতারা বাংলাভাষার ব্যাকরণগত কাঠামোটিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে রামমোহন রায়ের থেকেও একধাপ পিছিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮২৬ সালে রচিত রামমোহনের ব্যাকরণে একাধিক প্রসঙ্গ (যথা, কারক, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদির প্রসঙ্গ) সঠিকভাবে পর্যালোচিত হয়েছিল[৬]।

দুঃখের বিষয় এই যে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে রামমোহনের এই অবদানের গুরুত্বটি পরবর্তীকালের বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতারা, বিশেষত স্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণ রচয়িতারা, যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারেননি। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, যে আজও স্কুল-পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণে রামমোহন-বর্ণিত বাংলাভাষার চার-কারক-সমন্বিত-কাঠামোটি যথার্থ বলে গৃহীত হয়নি।

এইভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীদের জাতীয় ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সংগ্রাম এক বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। ঐ পর্বে বাংলা-ভাষার নিজস্ব বিকাশের স্বপক্ষে সংগ্রামরত অন্যতম উৎসাহী যোদ্ধা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ১৮৮১ সালে রচিত "বাংলাভাষা" শীর্ষক নিবন্ধে বাংলাভাষার বিকাশের ইতিহাসে একটি বাংলা গদ্যগ্রন্থের জ্ঞানিকারক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন ; ঐ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের স্নাতকেরা, সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯১ সালে[৭]। পরে ১৯০১ সালে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"-য় "বাংলা ব্যাকরণ"-শীর্ষক নিবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্য কোনো ভাষার—যথা, সংস্কৃতের বা ইংরেজীর—ব্যাকরণের সাথে সঙ্গত রেখে বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন, এবং বাংলা ব্যাকরণে বাংলারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিফলিত করার দাবী তোলেন[৮]।

বাংলার সাহিত্য জগতের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রকাশনা-সমূহেও সভা-সমিতেতে বাংলা ভাষার পরবর্তী বিকাশের যথার্থ পথের

প্রসঙ্গটি আলোচনার এক উত্তপ্ত বিষয় হয়ে উঠেছিল। এইসব আলোচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর এক টীকাকার লিখেছেন: ১৯০১ সালে "বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত যে 'আন্দোলনের' সূত্রপাত হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ তার অগ্রণী স্বরূপ"[৯]।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে লেখক, সাহিত্যের ভাষার সংস্কারক এবং ভাষা চর্চাকারী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের উৎস শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ঔৎসুক্যের, তথা তাঁর প্রতিভার বহুমুখিনতার মধ্যেই নিহিত ছিল না, সর্বাগ্রে এ ছিল জাতীয় ভাষার স্বপক্ষে পরিচালিত এক দীর্ঘ বিলম্বিত সাধারণ সংগ্রামেরই অংশ, তার স্বাভাবিক অনুসৃতি। জাতীয় ভাষার জন্য এই সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার লক্ষ্যে পরিচালিত দেশপ্রেমিক সংগ্রামের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। লক্ষণীয়, এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন।

১৮৮৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন পরিচালিত হয়েছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে, এবং বাংলা ভাষাকে একটি জীবিত ভাষা হিসাবে অধ্যয়ন করার, তথা বাংলা ব্যাকরণে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করার স্বপক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় প্রথম দিকে পূর্ববর্তী গবেষকদের পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন: এই পর্যায়ে তিনি বাংলা শব্দের বানান ও উচ্চারণের মধ্যে পরিলক্ষিত অসঙ্গতিগুলি ব্যাখ্যা করেন[১০]। কিন্তু তিনি তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক অসঙ্গতি লক্ষ্য করতে সমর্থ হন এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি নিয়মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশী করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল: লিখিত বানানে ও উচ্চারণে স্বরবর্ণ ব্যবহারের মধ্যেকার অসঙ্গতি। তিনি খুব যত্ন নিয়ে প্রথম শব্দাংশে অ a এবং এ e স্বরবর্ণদ্বয়ের ব্যবহারের ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন এবং স্থির করেন যে এই বর্ণ দুটির প্রতিটিই দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সাথে সম্পর্কিত: অ a প্রতীকটি (বা অক্ষরটি) উচ্চারিত হয় উন্মুক্ত ধ্বনি j অথবা বদ্ধ ধ্বনি o হিসাবে[১১], আর এ e প্রতীকটি উচ্চারিত হয় e অথবা je হিসাবে; এই প্রতীকগুলি শব্দের মধ্যে কোথায় রয়েছে তার ওপর এদের এক অথবা অপর

ধ্বনিগত প্রকাশ নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন : প্রথম শব্দাংশ মধ্যস্থ স্বরধ্বনির প্রকৃতি নির্ধারক প্রধান উপাদান হল পরবর্তী শব্দাংশে i ধ্বনির উপস্থিতি। সাধারণত অ-প্রতীকটি উচ্চারিত হয় অ-হিসাবে, কিন্তু ই অথবা উ-ধ্বনি বিশিষ্ট শব্দাংশের আগে থাকলে এ-ধ্বনিটি বদ্ধ j হিসাবে উচ্চারিত হয়। যখন কোনো ঐতিহাসিক অথবা শব্দপ্রকরণগত কারণে পরবর্তী (দ্বিতীয়) শব্দাংশে ই অথবা উ-ধ্বনির প্রবেশ ঘটে, তখনও 3 ধ্বনির স্থানিক মান সংক্রান্ত এই নিয়মটি কার্যকরী থাকে। যথা, 'করা' ক্রিয়াপদের প্রথম পুরুষের রূপ 'করে' প্রথম শব্দাংশে মুক্ত অ-ধ্বনি সহ উচ্চারিত হয়; কিন্তু 'করে' ক্রিয়ার্থক-কৃদন্তের প্রথম শব্দাংশে 3-ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, কেননা ক্রিয়ার্থক-কৃদন্তের এই রূপটি তার পূর্ণরূপ 'করিয়া' হতে উদ্ভূত। একইভাবে য-ফলা ও ব-ফলা সমন্বিত ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের পূর্বে থাকলে অ ধ্বনিটি বদ্ধ 3 ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, কেননা ই বা উ এবং এ ধ্বনির (ঐতিহাসিক) সংযুক্তির ফলশ্রুতি হিসাবেই য-ফলা ও ব-ফলার উদ্ভব ঘটেছে। বিপরীতে e স্বরবর্ণটি ই অথবা উ-ধ্বনি বিশিষ্ট শব্দাংশের পূর্বে থাকলেও নিজ প্রারম্ভিক ধ্বনিমান বজায় রাখে অথবা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিশুদ্ধ ধ্বনি" মান-সহ আবির্ভূত হয়[১২]। 'খেলা' এবং 'গেলা' ক্রিয়াদ্বয়ের উচ্চারণের মধ্যেকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করে তিনি এই ব্যাপারটি খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করেন। তিনি দেখান : যে সব ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ধাতুমূলে ই হতে এ-রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়, সেখানে উপরোক্ত রূপ সমূহে এ সর্বদাই এ-ধ্বনি হিসাবে উচ্চারিত হয়, অন্যত্র তা উচ্চারিত হয় এ-ই হিসাবে, যথা, কিনিয়া—কেনা বেচিয়া—বেচা।

রবীন্দ্রনাথ আরও লক্ষ্য করেন : i বা u ধ্বনি শুধু যে তাদের পূর্ববর্তী ধ্বনিটিকে প্রভাবিত করে তাই নয়, পরবর্তী ধ্বনিটিও বিশেষত পরবর্তী a ধ্বনিটিকে—প্রভাবিত করে, তাকে এ বা 3 ধ্বনিতে রূপান্তরিত করে; যথা, নিন্দা—নিন্দে মুঠা—মুঠো ইয়া এবং উয়া প্রত্যয়ের-এ এবং প্রত্যয়ে রূপান্তরের ব্যাপারটিকেও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী অ-ধ্বনির উপর পূর্ববর্তী ই বা উ-ধ্বনির প্রভাবের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন; যথা, জঙ্গলিয়া জঙ্গুলে করিয়া করে কাঠুআ কেঠো।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার ধ্বনি বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি নিয়ম আলোচনা করেন। তিনি বাংলার ঐতিহাসিক ধ্বনিতত্ত্বের জন্য উপাদান সংগ্রহ করেন (যথা, বিশেষণ সমূহে পরিলক্ষিত অন্ত্য 0 ধ্বনির উৎস সংক্রান্ত তথ্য)।[১৩]

তাঁর পূর্ববর্তী ব্যাকরণ কারদের রচনায় পরিলক্ষিত বহুধ্বনিতত্ত্বগত নিয়মের—যথা, অন্ত্য 0 ধ্বনির উচ্চারণ সংক্রান্ত নিয়মের—যথাযথ রূপটিকে তিনিই সূত্রায়িত করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন : কেন 'খাইতে' 'পাইতে' ইত্যাদি শব্দ কথ্য ভাষায় 'খেতে' 'পেতে' হয়ে যায়, কিন্তু 'গাইতে' 'চাইতে' ইত্যাদি শব্দ রূপান্তরিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দ দ্বৈতের ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মাবলী ও আলোচনা করেন। বাংলা ভাষার বহু ধ্বনিগত ব্যাপারের কারণ হিসাবে i এবং u ধ্বনির ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ই এবং উ ধ্বনির সাথে অন্যান্য স্বরধ্বনির সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাদের উপর ভিত্তি করেই বাংলা ভাষায় অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী চিহ্নিত ও সূত্রায়িত হয়[১৪]।

রবীন্দ্রনাথের যে সব নিবন্ধে বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দ গঠন বিধি ও ব্যাকরণের বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হয়েছে, সেগুলিতে ভাষার জীবন্ত রূপটিকে অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী বেশী করে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষার যে সব বৈশিষ্ট্য সে পর্যন্ত অনধীত বা স্বল্পচর্চিত ছিল স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে সেগুলির প্রতিই দৃষ্টিপাত করেছেন।

বাংলা ভাষার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দ্যোতনকারী এই ধরনের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের শব্দ-দ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ রচিত "বাংলা শব্দ দ্বৈত" (১৯০০) ও "ধ্বন্যাত্মক শব্দ" (১৯০০) শীর্ষক-নিবন্ধে এই দুই প্রসঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়েছে।[১৫] বিভিন্ন প্রকারের বাংলা জোড় কথার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাঁর এই আলোচনা আজও পুরোনো হয়ে যায় নি। তিনিই প্রথম কোনো জোড় কথার শ্রেণীগত/বর্গগত অবস্থানের সাথে তার ধ্বনিগত রূপের ও অর্থের আন্তসম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শব্দ দ্বৈত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গবেষনার এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উদাহরণ-স্বরূপ : 'গোল' শব্দটির সরল পুনরাবৃত্তি ঘটলে (যদি সেই পুনরাবৃত্তি বিশেষ্য হিসাবে কাজ করে তাহলে) তা একাধিক একই প্রকার বস্তুকে সূচিত করে, আর যদি শব্দটি বিশ্লেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা ধারণার দিক থেকে গোলত্বের সমীপবর্তী কোনো গুণ বা ধারণার দ্যোতনা করে; অন্যপ্রকার জোড় কথায় দ্বিতীয় শব্দটি প্রথমটির ঈষৎ ভিন্নরূপ হিসাবে আবির্ভূত হয়, (যথা, গোল-গাল শব্দে-গাল)। এই দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম অর্থবদ্ধ

শব্দটি দ্বারা সূচিত ধারনাটির, অর্থাৎ, গোলত্বের, পূর্ণতার বা স্থূলত্বের ধারণার সমীপাতী কোনো অনির্দিষ্ট গুণের দ্যোতন, কিন্তু একেবারে ঠিক সেই গুণটির নয়। রবীন্দ্রনাথ সেইসব জোড় কথার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করেন, যেখানে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথমটির প্রতিধ্বনি এবং জোড়-কথাটি কোনো সম্ভাবনার সূক্ষ্ম তারতম্য প্রকাশে সমর্থ[১৩]। কোনো প্রতিধ্বনি-শব্দের প্রথম 'স' ধ্বনি একথাই বোঝায় যে বক্তা শব্দ-যুগের প্রথম শব্দটিতে ব্যক্ত বস্তুটির প্রতি নেতিবাচন অবস্থান গ্রহণ করেছেন (তিনি সেটিকে পছন্দ করেন না, শ্রদ্ধা করেন না বা অবহেলা করেন)।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় ৬৫০টি বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ সংগ্রহ করেন এবং তাদের বিশ্লেষণ করে দেখান যে বাংলায় তাদের সংখ্যা খুবই বেশী। এই ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বিশুদ্ধ ধ্বনি মাত্রেরই দ্যোতনা করে না, বিভিন্ন প্রকার জাগতিক ক্রিয়া, অনুভূতি এবং অবস্থানেও বিশেষিত করে, এবং শেষত, গুণ বিশেষের তারতম্যও সূচিত করে (যথা, টকটকে ছিপছিপে, কনকনে ইত্যাদি)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধের আলোকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে বাংলার ও তার জ্ঞাতি ভাষাগুলির শব্দ-ভাণ্ডারে এবং ব্যাকরণগত কাঠামোর মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ সমূহের ভূমিকা স্লাভোনীয়, জার্মানীয় প্রভৃতি ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ প্রকার শব্দের ভূমিকা হতে ভিন্ন। রুশী 'কু-কু' এবং বাংলা 'কুহু' উভয়েই কোকিলের ডাকের অনুকরণ হতে জাত; কিন্তু 'কু-কু' রুশী শব্দ ভাণ্ডারে স্থান লাভ করতে পারেনি, পারবেও না, অথচ 'কুহু' একটি পুরোদস্তুর বাংলা শব্দ। এই ধরনের বাংলা শব্দগুলি সহজেই 'করা' ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় এবং কোনো কর্তৃপদের কার্যকে সূচিত করে (এই প্রকার ক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ধ্বনি সংক্রান্ত নাও হতে পারে: যথা, 'মাঠ ধু ধু করিতেছে,' 'রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে', 'সরসর করিয়া কাঁপিতেছে', 'ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল,' ইত্যাদি), অথবা 'হওয়া' ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে তারা কোনো কাজের বা অবস্থার দ্যোতনা করে (যথা, 'গুম হইয়া থাকে')। রুস্ ভাষাতেও অনুরূপক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দ হতে জাত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হতে পারে। তবে ধ্বন্যাত্মক শব্দ হতে জাত রুশী ও বাংলা ক্রিয়াপদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে—সে পার্থক্য এই দুই ভাষার শব্দ গঠন প্রণালীর বিভিন্নতার মধ্যে নিহিত। রুস্ভাষা মূলত সংশ্লেষণাত্মক। এ ভাষায় কেবল মাত্র শব্দ-রূপের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই নয়, শব্দ ভাণ্ডার নির্মানের ক্ষেত্রেও কোনো ধারণাকে একটি মাত্র শব্দের আকারে ব্যক্ত করার প্রবণতার প্রাবল্য দেখা

যায়। বিপরীতে, বাংলা ভাষা মূলত বিশ্লেষণাত্মক। এই ভাষায় যৌগিক শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। একাধিক ধারণা ব্যক্ত করার জন্য এর ভাণ্ডারে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের বিশিষ্টার্থক শব্দ-সমষ্টি। 'ধুধু করা' 'সরসর করা' 'সরসর করা' প্রভৃতি শব্দ সমাহারে 'ধু ধু', 'সরসর' প্রভৃতি শব্দের অর্থ খুবই মূর্ত এবং সুনির্দিষ্ট; প্রাসঙ্গিক কিছু শোনা বা দেখার ফলে মানুষের চেতনায় যে প্রতিমূর্তি গড়ে ওঠে তার থেকে এদের অর্থগুলি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে দূরে সরে যায়নি। যদিও বিমূর্তীকরণের বা সাধারণীকরণের একটি প্রক্রিয়া এখানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে; সেই কারণে এই শব্দগুলি কোনো না কোনো শব্দ-সমাহারে স্থান লাভ করেছে। ধন্যাত্মক শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধেও এই ধারণাই সমর্থিত হয়েছে। নিহিত ধারণার বিস্তার ঘটানোর এই সামর্থ্য কেবলমাত্র শব্দেরই থাকে।[১৭] উদাহরণ স্বরূপ, 'মিষ্ট কথা' ও 'মিষ্ট গন্ধ' এই দুই বিশিষ্টার্থক শব্দ সমাজারে 'মিষ্ট' বিশেষণটির অপেক্ষাকৃত মূর্ত, স্বাদ অনুভূতির দ্যোতনাকারী অর্থটির বিস্তার ঘটেছে। একইভাবে 'ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল' শব্দ সমাহারে 'ভোঁ করিয়া' অংশটির অর্থ প্রাথমিকভাবে দ্রুতগামী তীর হতে জাত একটি মূর্ত ধ্বনির প্রতিমূর্তির বিমূর্তীকরণের ফলে উদ্ভূত একটি ব্যাপকতর ধারণা। শেষত, বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের অর্থবাহী হওয়ার ক্ষমতার প্রমাণ হিসাবে তাদের পুরোপুরি বিমূর্ত—ধারণা ব্যক্তকারী শব্দ নির্মাণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা, জঙ্গুলে জঙ্গলিয়া (=জঙ্গল+ইয়া) শব্দের আদলে সৃষ্ট পূর্ব উল্লিখিত টকটকে, ছিপছিপে, কনকনে প্রভৃতি শব্দ।

বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ ও অন্যান্য অর্থবদ্ধ শব্দের বিপরীতে ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহকে বাংলাভাষায় অসম্পূর্ণ অর্থবাহী শব্দ হিসাবে গণ্য করা হয়। এইভাবে তারা উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি অন্যান্য অসম্পূর্ণ-অর্থবাহী সহায়ক শব্দের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয়। পার্থক্য শুধু এই যে অধিকাংশ ধ্বন্যাত্মক শব্দের অর্থ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি, আর অধিকাংশ সহায়ক শব্দের অর্থ বিলুপ্ত বা শিথিল হয়ে গেছে। তাই ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, ক্রিয়া বিশেষণ প্রভৃতির মতো অর্থবদ্ধ শব্দরাজির দলে জায়গা পেতে পারে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবশ্যই একটি বিশেষ শ্রেণীর শব্দ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে এই শব্দগুলি বাংলা ভাষার প্রায় সকল আধুনিক অভিধানে স্থান লাভ করেছে। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সাথে একমত হতে অপারগ, যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ-

সমূহের কোনো অর্থই নেই; যদিও তাঁর এই অবস্থান সাধারণ-ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

"বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" (১৯০১) শীর্ষক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্পষ্ট ভাষায় এই মত ব্যক্ত করেছেন, যে শব্দ গঠন বিধির আলোচনায় কোনো ভাষার ব্যাকরণে উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদগুলিকেও হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত। তিনি লিখেছেন,"…যে-সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দ সহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনো প্রকার আদান-প্রদান করিতেছেনা, তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় রূপে স্বীকার করিতে পারি না"[১৮]। উদাহরণস্বরূপ, যদিও সই প্রত্যয়টি শব্দ-প্রকরণগতভাবে বাংলা প্রত্যয় নয়, তবুও রবীন্দ্রনাথ এটিকে আধুনিক বাংলা ব্যাকরণের সম্পদ বলে গণ্য করেছেন, কেননা এই প্রত্যয়টি বাংলা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরী করেছে (ট্যাঁকসই, মানানসই ইত্যাদি); কিন্তু সংস্কৃত-ত বা ফার্সীর-ওয়ান প্রত্যয়ের বেলা একথা খাটে না, কেননা এ দুটির কোনোটিই বাংলা শব্দ বা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে না। এই অবস্থান হতে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধে বাংলা প্রত্যয়সমূহের বিবরণ প্রদান করেছেন। তাঁর এই বিবরণ ত্রুটিহীন হয়। এখানে প্রত্যয়সমূহকে শুধু তাদের ধ্বনিগত প্রকাশের নিরিখেই বর্গীকৃত করা হয়েছে। একই ধ্বনিবিশিষ্ট কিন্তু ভিন্নার্থবোধক প্রত্যয়সমূহকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। পরিণতিতে 'ঘোড়া', তেলা', 'বাঁধা' প্রভৃতি শব্দ অথবা 'গোলাপি', 'হাসি' প্রভৃতি শব্দ কর্যত একই শব্দরূপের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়েছে।

সংস্কৃতের বা কোনো বিদেশী ভাষার যে প্রত্যয়গুলি কোনো বাংলা শব্দ বা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে নতুন বাংলা শব্দ গঠন করে না, সেগুলিকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের আলোচনার বাইরে রাখা সঙ্গত কিনা, সে প্রশ্নও তোলা যেতে পারে। এরকম অবস্থান গ্রহণ করলে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট সংস্কৃত শব্দগুলি বাংলার নয়, সংস্কৃতের সম্পত্তি। কিন্তু ঘটনা তা নয়। বহু সংস্কৃত শব্দ বাংলায় সক্রিয়ভাবে জীবন্ত। বাংলায় কর্মবাচ্যে বাক্য রচনা করার সময়ে সংস্কৃত কৃদন্ত-বিশেষণসমূহের ব্যাপক প্রয়োগই এর প্রমাণ। বাঙালীদের চেতনায় যদি কর্মবাচ্যের কৃদন্ত-বিশেষণের সাথে অন্যান্য ধাতুরূপের (যথা; —অন, —অক ও অন্যান্য প্রত্যয়যুক্ত-ক্রিয়াজাত বিশেষ্যের) পার্থক্য ধরা না পড়ে তাহলে অবশ্য তাঁরা এইরূপগুলিকে কর্মবাচ্যের রূপ বলে স্বীকার নাও করতে পারেন।[১৯]

কিন্তু উপরে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা বা ভ্রান্তিগুলি থাকা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে বাংলা প্রত্যয়ের রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত বিবরণ ও বর্গীকরণ পরবর্তী আলোচনায় যথেষ্ট রসদ যুগিয়েছে। তিনি যেসব প্রাসঙ্গিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা পরে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত বহু রচনায় যথাবিহিত সংশোধনীসহ ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, অন্য ভাষা হতে আগত প্রত্যয়ের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে যে ধারণা বিধৃত হয়েছে তা তাঁর কালের পক্ষে খুবই স্বকীয় এবং অতি মূল্যবান। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই ধারণাটির প্রয়োগ-পরিধি আজও যথেষ্ট পরিমাণে পর্যালোচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যয়গুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি ছাড়াও অন্য যে সব প্রত্যয় অন্য ভাষা হতে বাংলায় এসেছে তাদের এবং বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়-গুলির মধ্যে কোন্‌গুলি উৎপাদনশীল, তাদের উৎপাদনশীলতার কারণ কি, তথা আধুনিক বাংলা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের গতিপথ প্রভৃতি প্রসঙ্গের পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ক্রমশ)

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: প্রদীপ বক্সী

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা

১। ১৮৮৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়।

১. বাংলা উচ্চারণ, 'বালক', ১২৯২, আশ্বিন (১৮৮৫);
২. একটি প্রশ্ন, 'বালক', ১২৯২, অগ্রহায়ণ;
৩. সংজ্ঞাবিচার, 'বালক', ১২৯২, ফাল্গুন;
৪. 'নিহ্নুনি' 'সাধনা', ১২৯৮, চৈত্র (১৮৯২);
৫. 'পঙ্গু' 'সাধনা', ১২৯৯, জ্যৈষ্ঠ;
৬, স্বরবর্ণ অ, 'সাধনা', ১২৯৯, আষাঢ়;
৭. প্রত্যুত্তর ১,২, 'সাধনা', ১২৯৯, শ্রাবণ ও চৈত্র;
৮. স্বরবর্ণ এ, 'সাধনা', ১২৯৯, কার্তিক;
৯. টা, টো, টে, 'সাধনা', ১২৯৯, অগ্রহায়ণ;
১০. বাংলা বহুবচন, 'ভারতী', ১৩০৫, জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৮);

১১. বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ, 'ভারতী', ১৩০৫, শ্রাবণ ;

১২. সম্বন্ধে কার, 'ভারতী', ১৩০৫, শ্রাবণ ;

১৩. ভাষা বিচ্ছেদ, 'ভারতী', ১৩০৫, শ্রাবণ,

১৪. উপসর্গ সমালোচনা; 'ভারতী', ১৩০৬, বৈশাখ (১৮৯৯) ;

১৫. বাংলা শব্দদ্বৈত, 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩০৭, ৭ম ভাগ, ১ম সংখ্যা (১৯০০) ;

১৬. ধ্বন্যাত্মক শব্দ, 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩০৭, ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ;

১৭. বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩০৮, ৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা (১৯০১) ;

১৮. প্রাকৃত ও সংস্কৃত, 'বঙ্গদর্শন', ১৩০৮, আষাঢ় ;

১৯. বাংলা ব্যাকরণ, 'বঙ্গদর্শন', ১৩০৮, পৌষ,

২০. বঙ্গভাষা, 'ভারতী', ১৩০৯, শ্রাবণ (১৯০২) ;

২১. ভাষার ইঙ্গিত, 'ভারতী', ১৩১১, আষাঢ় ও শ্রাবণ (১৯০৪) ;

২২. বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ, 'প্রবাসী', ১৩১৮, আষাঢ় (১৯১১) ;

২৩. বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য, 'প্রবাসী', ১৩১৮, ভাদ্র ;

২৪. বাংলা নির্দেশক, 'প্রবাসী', ১৩১৮, আশ্বিন ;

২৫. বাংলা বহুবচন. 'প্রবাসী', ১৩১৮, কার্তিক ;

২৬. স্ত্রীলিঙ্গ, 'প্রবাসী', ১৩১৮, অগ্রহায়ণ।

(২) S. K. Chaterjee, The origin and development of the Bengali language. Calcutta, 1926. p, 134,

[উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ আমার—প্র. ব.]।

(৩) শ্যামাচরণ শর্ম্মা শ্রী বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১২৫৯ (১৮৫২)।

(৪) W. Yates, Introduction to the bengali language, calcutta, 1874.

(৫) শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্য, কলিকাতা, ১৩৫৯ (১৯৫২), পৃ. ১০৫-১০৬।

(৬) রাজা রামমোহন রায়, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৮৩৩।

(৭) হরপ্রসাদ রচনাবলী, কলিকাতা, ১৩৬৩ (১৯৫৬), পৃ. ২০০।

(৮) তদেব, পৃ. ২০৩-২১০।

(৯) রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ৬৩১।

(১০) দ্রষ্টব্য : বাংলা উচ্চারণ; স্বরবর্ণ অ : স্বরবর্ণ এ, টা, টো, টে; বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ : এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ শীর্ষক নিবন্ধ সমূহ—রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৩।

(১১). বাংলা ভাষার শব্দ সমূহের ধ্বনিগত প্রতিবর্ণীকরণ করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা অক্ষর ব্যবহার করেছিলেন। অধিক সংখ্যক পাঠকের বোধগম্যতার কথা বিবেচনা করে লেখিকা রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত প্রতিলিপি সমূহকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিলিপির সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। বাংলা ভাষার আলোচনায় এই প্রতিলিপির ব্যবহার শুরু করার প্রধান কৃতিত্ব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। [বঙ্গানুবাদেও আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিলিপিই বজায় রাখা হয়—অনু]।

(১২) রবীন্দ্রনাথ 0 ধ্বনির অন্যান্য স্থানিক মানগুলিও লক্ষ্য করেছিলেন। দ্রষ্টব্য : 'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণ অ', 'স্বরবর্ণ এ' এবং 'টা, টো, টে' শীর্ষক নিবন্ধ।

(১৩) র-ঠাকুর, বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ।

(১৪) S. K. Chaterjee, ODBL, pp 359-402;

শ্রীসুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

(১৫) র-ঠাকুর, রচনাবলী; দ্বাদশ খণ্ড।

(১৬) প্রসঙ্গত, বাংলায় এই ধরণের জোড়-কথার বহুল ব্যবহার দেখা যায়; কেননা, বাংলা ভাষায় আবেগবাহী প্রত্যয় বিভক্তির ভূমিকা সীমাবদ্ধ।

(১৭) র-ঠাকুর, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

(১৮) র-ঠাকুর, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড পৃ. ৩৮৪।

(১৯) মনে হয় জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এমন ধারণাই পোষণ করতেন। তিনি বাংলা ভাষার পরিদৃশ্যমান সব প্রত্যয়কেই দুভাগে বিভক্ত করেন; একদিকে বাংলা তদ্ভব বা তৎসম প্রত্যয়, আর অন্যদিকে সংস্কৃত প্রত্যয়। যে প্রত্যয়গুলিকে শব্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আলাদা করা যায়, অথচ তৎসংযোগে গঠিত শব্দগুলিকে বাঙালীরা প্রকৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ বলে গণ্য করে না, সেই প্রত্যয়গুলিকে তিনি সংস্কৃত প্রত্যয় বলে চিহ্নিত করেন। [দ্রঃ জগদীশচন্দ্র ঘোষ, আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ। কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ২৪৪-২৪৮]।

চিনুদা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে চিন্মোহন সেহানবীশ ছিলেন আমার একান্ত কাছের, ভালবাসার ও শ্রদ্ধার মানুষ। আর এই ৫০ বছর ধরে তাঁকে দেখেছি বহু বিচিত্র প্রগতিশীল ভূমিকায়, সব সময়ই একজন দায়বদ্ধ কমিউনিস্ট। তাই তিনি চলে যাবার মাত্র এক মাসের মধ্যে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ণ 'পরিচয়'-এর পাঠকমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত করা, অন্ততঃ আমার পক্ষে এক দুঃসাধ্য কাজ। সে চেষ্টা আমি করব না বরঞ্চ যে সব অজস্র ঘটনার স্মৃতি ভীড় করে আসছে, তারই টুকরো একত্র করে তুলে ধরবার চেষ্টা করব চিনুদাকে যেমন দেখেছি।

চল্লিশের দশকের গোড়াতে চিনুদাকে দেখেছি ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে, বাংলার প্রসিদ্ধ সব লেখক, শিল্পী, গায়ক ও অভিনেতাদের যেমন ঠাণ্ডা মাথায় একত্রে ধরে রাখছেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ বা গণনাট্য সংঘের মঞ্চে। বাংলার সংস্কৃতি-জগতে তখন এক নতুন জোয়ার—তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যম ও উদ্যোগ। চারিপাশে জড়ো হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ঔপন্যাসিক, অমিয় চক্রবর্তী, অরুণ মিত্রর মত কবি, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখার্জী, সুচিত্রা মিত্রর মত গায়ক বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর মত নাট্টাচার্য। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র রচনা করছেন তাঁর অবিস্মরণীয় "নবজীবনের গান", বিজন ভট্টাচার্য মঞ্চস্থ করছেন "নবান্ন", মাঠে ময়দানে "মধুবংশীর গলি" আবৃত্তি করছেন শম্ভু মিত্র। আর সেই সংগঠনের সম্পাদক চিনুদা।

ব্যাপক মঞ্চ, বহু মত, জোরালো বিতর্ক, প্রবল উৎসাহ। সমস্ত মতকে একত্রে ধরে রাখতে হবে, অথচ গ্রহণ করাতে হবে নির্দিষ্ট প্রগতিশীল কর্মসূচী। এই কঠিন দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করছেন চিন্মোহন সেহানবীশ। সকলেই ব্যস্ততার সঙ্গে খুঁজছে চিনুবাবু। চিনু কিম্বা চিনুদাকে! তাই নিয়ে পরে চিনুদার প্রসিদ্ধ রসিকতাঃ আমি কি করে লেখক সংঘের সম্পাদক হলাম জান তো? লেখক ও শিল্পীরা ভাবেন যে আমি হচ্ছি ভীষণ কর্মী, আর

কর্মীরা ভাবেন যে তাঁদের মধ্যে আমিই মস্ত সাহিত্যিক ! আর সেই ফাঁকে আমি হ'লাম উভয়ের সমর্থনে সম্পাদক !

ঠাট্টা করে কথাটা বললেও, চিনুদার সম্বন্ধে একথা কত মর্মে মর্মে সত্য তা আমরা বহু দশক ধরে প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলায় দুর্ভিক্ষ এসেছে, রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে গণনাট্য সংঘের গানের, স্কোয়াড, গাইছেন বিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, আরও অনেকে। তাদের পিছনে সংগঠকের ভূমিকায় ছিলেন চিনুদা। কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল ১৯৪৬এ। তার বিরুদ্ধে শান্তি-মিছিলে পথে নামলেন তারাশঙ্কর-মানিক-দেবব্রত-সুচিত্রা-জ্যোতিরিন্দ্র আরও অনেকে। মিছিলের সংগঠক চিনুদা।

আবার যখন প্রগতিপন্থীদের উপর নেমে এল সরকারী চণ্ডনীতি, বেআইনী হল কমিউনিস্ট পার্টি, তখন ঐ স্বভাব-শান্ত চিনুদার কলম দিয়েই বেরল পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সংগ্রামী দলিলের খসড়া। তিনি লিখলেন : যেটা প্রথমে করবার সেটা হ'ল প্রত্যেক শিল্পীকে, সাহিত্যিককে যুক্ত হতে হবে মজুর—কিষাণ আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে। সৈনিক হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর কথা উঠবে কাজ ভাগাভাগির, বিচার হবে নতুন ফসল ভালো না মন্দ, খতিয়ে দেখা যাবে লাভক্ষতি। ইতিমধ্যে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে" (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬)।

পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন চিনুদা ১৯৪৯এ, বিনা বিচারে আটক বন্দী রূপে চালান হলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানেই ১৯৪৯-৫০এ, জেলখানার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার দাবীতে ৫৬ দিন অনশন ধর্মঘট করেন কমিউনিস্ট বন্দীরা। নিরস্ত্র বন্দীদের উপর হিংস্র আক্রমণ চালায় সশস্ত্র পুলিশ ও জেলরক্ষীরা। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা অবনী লাহিড়ী ও ট্রাম শ্রমিক নেতা কালী ব্যানার্জীর পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন ব্যারিকেড রচনা করেছিলেন সংস্কৃতি-কর্মী চিন্মোহন সেহানবীশও। প্রচণ্ড মারের সামনেও অকুতোভয় ঘোষণা জানিয়েছিলেন তাঁরই পরম প্রিয় রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে : মেসিনগানের সম্মুখে গাই যুঁই ফুলের এই গান।

১৯৫০এ প্রেসিডেন্সী জেলে শিরদাঁড়ার উপর পুলিশের লাঠির প্রচণ্ড আঘাতকে পরোয়াই করেন নি চিনুদা, তখন ও তারপর আরও ৩০ বছর। তারপর '৮০র দশকে সেই আঘাত একদিন জানান দিল তীব্র যন্ত্রণার চেহারা নিয়ে। একটু ঝুঁকে হাঁটতে হল চিনুদাকে বাকী জীবন, যদিও মনের শিরদাঁড়া চিরদিন টান টানই রয়ে গেল।

জেল থেকে বেরলেন চিনুদা। একদিকে তাঁর প্রচণ্ড গর্ব—কত কমিউনিস্ট লেখক, শিল্পী ও গায়ক দুর্জয় সাহস দেখিয়েছেন কারাগারে বা শ্রমিক-কৃষকের মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে মনে একটা প্রচণ্ড জ্বালা ও বেদনা—রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকারকে মারাত্মক ভ্রান্ত ভাবে বিচার করেছিল তাঁরই পার্টি। তার প্রতিকার চাই। তাই ১৯৬১তে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছরে সারা পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ঘটাবার ব্যাপকতম উদ্যোগ নিল কমিউনিস্ট পার্টি, যার উজ্জ্বল রূপ হল পার্কসার্কাসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র মেলা। আর সেই অবিস্মরণীয় রবীন্দ্র-উৎসবের সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন চিনুদা।

১৯৬৮র হেমন্তকালে যখন জলপাইগুলি ও পাহাড় অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হ'ল, লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষের জীবন যখন একটা সরু সুতোয় ঝুলছিল, তখন কলকাতা থেকে যাত্রা করা বন্যাত্রাণের প্রথম একটা লরিতে চেপে চিনুদা চলে গেলেন জলপাইগুড়ি। ৫৫ বছর বয়সে দু মণ ওজনের বস্তা কাঁধে তুলে রিলিফ বিতরণ করলেন। উদ্দীপিত করলেন তরুণতর সহকর্মীদের। চিনুদা বলতেন: ত্রাণকার্যটা আমার রক্তে আছে। কৈশোরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর ডাকে বন্যাত্রাণে সাহায্য তুলেছি। রিলিফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি ১৩৫০এর মন্বন্তরের সময়। এখন পেছিয়ে থাকব কি করে? দশ বছর পরে তার বয়স যখন ৬৫, তখন আবার ১৯৭৮এ রিলিফের ট্রাকে চড়ে চিনুদা চলে গেলেন জলবন্দী কোলাঘাটে, বিপন্ন দেশবাসীর পাশে।

১৯৭০ নাগাদ যখন চিনুদা মন দিলেন ভারতবর্ষের গৌরবময় মুক্তি সংগ্রামের ইতিবৃত্ত রচনায়, তখনও, তাঁর প্রবণতা রইল শ্রমিক ও কৃষক মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব কাহিনী সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করা। আশ্চর্য নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরিশ্রম করেছেন তিনি গত দুই দশক ধরে। জানা-অজানা কত মুক্তি সংগ্রামীর ছবি যে তিনি যোগাড় করেছেন, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। চিনুদাই আমাদের চেনালেন টহলরামকে—বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে পাঠান যুবক বয়কটের সপক্ষে রাজপথে প্রচার করে পুলিশের হাতে বেদম মার খেয়েছিল। চিনুদাই চেনালেন বাবু গেণুকে—বোম্বাইএর সুতাকল শ্রমিক, ইংরেজের ট্রাকের সামনে শুয়ে যে সত্যাগ্রহী আত্মদান করেছিল। চিনুদাই চেনালেন টিপু সুলতানের বংশধর এক তরুণী নুরুন্নেসাকে, হিটলারের অত্যাচার-শালায় শহীদ হয়েছিল যে

বীরাঙ্গণা। এমন আরও হাজার মুক্তিযোদ্ধা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল চিনুদার অসামান্য গবেষণার ফলে, তাঁর কলমের আঁচড়ে।

এ ইতিহাস শুধু শিক্ষিত মানুষেরা জানবে? যারা নিরক্ষর, তাদের কি হবে? পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯৪৬এর নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত আমাদের অগ্নিগর্ভ স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর ছবি, দলিল ও লেখা দিয়ে বহু স্লাইড তৈরী করালেন চিনুদা। হিন্দী ভাষাতে লেখাকে রূপান্তরিত করে সেই স্লাইড নিয়ে চলে গেল বিহারের কমিউনিস্ট পার্টি। লক্ষাধিক তাদের পার্টি সভ্য, যারা ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও প্রায় নিরক্ষর। তাদের কাছে দেখানো হবে, ব্যাখ্যা করা হবে স্লাইড। তার রূপকার হলেন চিনুদা।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিছু হবে না? ১৯৮০তে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের স্বর্ণ জয়ন্তীর সময় চিনুদাকে কথা দিলেন বামফ্রন্টের তরুণ তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—আপনি গ্রন্থনা করুণ ছবি, দলিল ও লেখা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবন্ত ইতিহাস; করা হবে তার সংগ্রহশালা মৌলালির যুবকেন্দ্রে নির্মিত হল সেই স্থায়ী সংগ্রহশালা, ভারতে প্রথম।

চিনুদা থামলেন না। বললেন, সংগ্রহশালায় যে ইতিহাস ধরে রাখা হচ্ছে, একটি আলেখ্য গ্রন্থে তা পরিবেশন করতে হবে সর্ব সাধারণের কাছে। বামফ্রন্ট সরকারের আনুকূল্যে প্রকাশিত হল ১৯৮৬-র নভেম্বরে সেই আলেখ্য গ্রন্থ, "মুক্তির সংগ্রামে ভারত"। তার প্রতিটি ছবি, প্রতিটি দলিল চিনুদার সংগৃহীত। সরকারি ষ্টুডিওতে বসে গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন তিনি, অসুস্থ শরীরে মাসের পর মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এ দুঃখ আমাদের থেকেই যাবে, যে বইটির ইংরেজি সংস্করণ চিনুদা দেখে যেতে পারলেন না, যদিও তার সব কিছু রচনার কাজ শেষ করে ছাপাখানাতে তাকে পৌঁছে দেওয়া তিনিই করে গেছেন।

১৯৮৭-র মে দিবসের দিন চিনুদা আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন: তাই কাজ আমি হাতে নিয়েছিলাম—প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সচিত্র স্থায়ী সংগ্রহ-শালা। সেটা হয়েছে। দ্বিতীয় "মুক্তির সংগ্রামে ভারত" আলেখ্য গ্রন্থ। সেটাও ছেপে বেরিয়েছে। এখন বাকী তৃতীয় কাজ: স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা মহাখোজখানা, যেখানে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের গোপন দলিল সহ, সমস্ত মূল্যবান দলিল একত্রিত থাকবে ও অনায়াস লভ্য হবে সকল গবেষকের কাছে। এই তৃতীয় কাজের কর্মসূচীর ছক নিয়ে ১৯৮৭-র ৫ মে চিনুদা দেখা

করেছিলেন তাঁর পুরনো বন্ধুও কমরেড, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে ফিরে এসেছিলেন খুশি হয়ে।

তরুণ একদল উৎসাহী ইতিহাসবিদ, চিনুদাকে প্রধান উপদেষ্টা করে কাজ শুরু করেছিল ভারতের জনগণের ইতিহাস রচনার—ধারাবাহিক ভাবে। ১৮মে মারা যাবার আগের দিন, 'কালান্তর'-এর পাতায় একটি লেখা পড়ে চিনুদা জানতে পারেন যে ইটাহারের ৯০ বছরের আদিবাসী কৃষক কর্মী, তেভাগার সংগ্রামী ক্যাঁকারু রায় এখনও জীবিত। তখনই প্রস্তাব করেন তিনি এখনই কাউকে ইটাহারে পাঠিয়ে টেপ-এ ধরে রাখ ওর সংগ্রামী অভিজ্ঞতা। নয়তো কেমন করে রচনা করা হবে সত্যিকার জনগণের ইতিহাস?

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের সদস্য ছিলেন চিনুদা। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রাজ্যপরিষদের ১১মে'র সভায় আসবেন স্থির করেছিলেন। ডাক্তারের নিষেধে তা পারেন নি। ১৩ মে আমাকে ডেকে দুঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে শুনলেন সেই সভার বিবরণী। উৎসাহ প্রকাশ করলেন ঐক্যবদ্ধ বামশক্তির অগ্রগতিতে। বিশেষ করে বললেন: কান্দি আর ইটাহারর জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দুটো জায়গার সংগ্রামী ঐতিহ্য ভাল করে জানতে হবে। স্বদেশ আর রেজার তারিফ করলেন, সেরে উঠে তাদের সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করার ইচ্ছা জানালেন।

১৭মে রবিবার চিনুদাকে সম্বর্ধনা জানাল পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ। আসতে পারেন নি, লিখে পাঠিয়েছিলেন চমৎকার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা"। কে তখন জানত যে এটাই হবে তাঁর শেষ রচনা। সভার পর আমরা কয়েকজন গেলাম তাঁর কাছে, পড়ে শোনানো হ'ল মানপত্র। খুশী হলেন। গল্প করলেন ঘণ্টাখানেক—প্রধানতঃ বক্সা বন্দীশিবিরের তাঁদের অভিজ্ঞতার সরস কাহিনী। তাঁর বন্ধু প্রয়াত পারভেজ সহিদির কথা, খাঁসাহেবের কথা, কৌস্তভ নৃপেনের কথা। টগবগে লড়াইএর জীবন্ত স্মৃতিকথা!

১৬ বছর বয়সে 'সাইমন ফিরে যাও' মিছিলে হেঁটে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যোদ্ধা চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর সংগ্রামী যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৯মে পর্যন্ত সে যাত্রা থামেনি। কমিউনিজম তাঁর কাছে ছিল জীবন ও যৌবনের জয়গান। ফরাসী কমিউনিষ্ট শহীদ গাব্রিয়েল পেরির মত চিনুদাও মনে করতেন যে সাম্যবাদই পৃথিবীর যৌবন, আর তাঁরই মত শেষদিন অবধি তিনি লড়ে গেছেন, স্বদেশ ও পৃথিবীর আগামী দিনগুলি যাতে গানে প্রাণে ভরে ওঠে!

কোন দিন ঝরে যায় না

শ্যামসুন্দর দে

সব নদী সমুদ্রে হারায়
সব মানুষ রূপ নেয়
ছবির আকারে।
কোন কোন ছবি
মুছে যায় সময়ের স্পর্শে
কোন ছবি আঁকা থাকে
গভীরে গভীরে
মনের একান্ত কোণে।

শেষ কোথায়!
শেষ অঙ্কে বাজে সূচনার অভিষেক।
ধারা জলে সঞ্চিত যে নদী
হারায় নাতো নাম
মোহনার মুখে সমুদ্র আলিঙ্গনে
স্মৃতির সৌরভে কোণে
অতি প্রিয় ফুল
যে ফুল কোন দিন যায়নাতো ঝরে!

লোকশ্রুতি-প্রসঙ্গে

উন্নতমানের সাংস্কৃতিক জীবন ছাড়া একটা জাতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। মানুষ শুধু খাবার জন্যই বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকার শারীরিক কারণেই তাকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয় নিয়মিত। কিন্তু উদরপূর্তি ছাড়াও তার মনের একটা খিদে আছে, তাই সে গান গায় ছবি আঁকে, অভিনয় করে। এ সবের মধ্যে দিয়ে সে আনন্দিত হয় অন্যকে আনন্দ দেয়, দেশের আর্থসমাজ রাজনীতিক ঘটনার প্রাতিভাসিক রূপকে ছুঁতে চায়, কান্না হাসির পালার প্রতিলিপিতে ভালোবাসা ক্রোধ প্রতিবাদকে মূর্ত করে তোলে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমে।

দেশের শিল্প সংস্কৃতির মোটামুটি দুটি ধারা একটি নগরকেন্দ্রিক এবং অন্যটির বিস্তৃতি কৃষিভিত্তিক নিরক্ষর অকৃত্রিম খোলা আকাশের নিচে গ্রামীণ জীবনে। পাটোয়ারি বুদ্ধির করালগ্রাসে আজ নগর-সংস্কৃতি তমসাচ্ছন্ন। জীবন সম্পর্কে যা সঠিক ধারণা দেয় না এমন কিছু অথচ বিকৃতরুচি খেলো জনপ্রিয়তার মোড়কে শিল্প এখন শহরের তথাকথিত বাবুদের লিবিডো তাড়িত খোয়াব, মুনাফা-লোটা পণ্যের সামিল।

অপরিকল্পিতভাবে দ্রুত নগরায়নের ফলে, কবির ভাষায় নগর কেবলই সেবিল গরল। শাহরিক জীবনের চূড়ান্ত সুখ সুবিধে স্বাচ্ছন্দটুকু এলো না, কলকারখানা, অস্বাভাবিক জনসংখ্যার চাপ এবং যান্ত্রিক জীবনের আততি উদ্ধত শুধু বিষ। পরিবহন ব্যবস্থার কিছু উন্নত হওয়ায় শহর তার থাক বাড়িয়েছে সুদূর গ্রামে। কাঁচা মাল, শস্তা শ্রম আর মাটির কাছাকাছি অসংগঠিত মানুষের ওপর গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হবার সুচতুর ভাঁড়ু দত্ত কুটকচালি।

পেছিয়ে পড়া অঞ্চল ও উপজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন জায়গায় মানুষেরা হাজার বছরের সংস্কৃতিক জিইয়ে রেখেছে অকৃত্রিম ভালোবাসায়। কিন্তু কিন্তু নগরের বণিক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যবসা ও নকল কারবারে লোক-

সংস্কৃতিকে কতকটা সেলস গার্ল হিসেবে নিযুক্তিপত্র দিচ্ছেন। জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র লোকসংস্কৃতির নীরোগ দেহে সম্প্রতি শহুরে ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এটা দুর্লক্ষণ। যাঁরা শহুরে সুস্থ সাংস্কৃতিক কাজ করেন অথচ গ্রাম সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন তাঁদের সজাগ হতে হবে কেননা গ্রামের মানুষ বড় গরীব, নুন আনতে পানতা ফুরোয়, প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চনায় তারা অসংগঠিত, এই কাঁচা সোনার ভাণ্ডারকে বাঁচাতে গেলে সমাজে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতির লালন-পালনে জাগ্রতচৈতন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে সব কিছু পুড়ে ছারকার হয়ে যাবে। জনপদের শিল্প সাহিত্যে আগুন লাগলে নাগরিক শিল্প মন্দিরও রেহাই পাবে না।

অত্যন্ত সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সরকার এ সমস্যা উপলব্ধি করে সংকট মোচনের অভিপ্রায়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিয়েছেন। ১৯৮৬ সনে লোকসংস্কৃতির রাজ্য উৎসবে দেশের ১৫টি জেলা থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের এনে নৃত্য-গীত, তরজা গান. কৃষ্ণযাত্রা. ঢোলবাদ্য, কাঠি নাচ, মনসার গান, ছৌনাচ, ঝুমুর, বিষহরির গান. ভাওয়াইয়া, পটের গান, গম্ভীরা, রাঙানৃত্য, আলকাপ নাট্য প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োগশিল্পের এক সমন্বয় করে দেশবাসীকে আপন ঐশ্বর্য সম্পর্কে ওয়াকি বহাল করেছেন। শিল্পীরাও স্বীকৃতি পেয়ে তৃপ্ত। ঐ উৎসব উপলক্ষে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। বেহালায় লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার জন্য একটা বাড়িও ঠিক করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন আসরে লোক সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগ্রহী করে তোলার প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

দেশের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'লোকশ্রুতি'-র প্রথম সংখ্যায় মুখ্য মন্ত্রীর প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর রচিত দেশের বহুগুণী গবেষক ও সাহিত্যিকদের সুচিন্তিত রচনাবলীর সমাবেশ এক নজিরবিহীন সৎ উদ্যোগ। বিভিন্ন মতামত নির্বিশেষে যে কোনো মানুষই এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাবে।

রবীন সুর

লোকশ্রুতি। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মহাকরণ, কলকাতা-১।

সোমেন চন্দকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

প্রিটোরিয়ার তরুণ কবি বেঞ্জামিন মোলায়েসের মৃত্যুতে কয়েকদিন আগেও যখন সমস্ত পৃথিবী উত্তাল, তখন স্বাভাবিকভাবেই একজন ভারতবাসী হিশেবে আমাদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল, এই তথাকথিত উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষেও তো, ব্রিটিশ শাসনে বা তাদের পতাকাবাহী শাসকবর্গের আমলে কবি-লেখক অথবা শিল্পীকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে হত্যার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তবে কেন তাঁদের নিয়ে আলোচনায় ক্রমেই ভাঁটার টান? এই প্রশ্ন-ওঠা খুবই স্বাভাবিক, কারণ, বিষয়টি গুলিয়ে দেয়ার একটা সচেতন প্রয়াস সবসময়ই আছে। অর্থাৎ আমাদের তরুণ প্রধানমন্ত্রী যখন মোলায়েসের মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠান, তখন মনে হতেই পারে, তিনি বুঝি এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধী এবং তাঁর নিজের দেশে এমন কোনো ঘটনা কখনোই ঘটে না। কিন্তু এই আশির দশকেই জেলে মারা যান চেরাবান্দারাজু। এই ভ্রান্তি কাটিয়ে প্রকৃত সত্যকে জানার আয়োজনটি এখানে খুব সংগঠিত নয়।

আমাদের এই অভিযোগের উত্তর দেয়ার জন্যই হয়তো লেখক সোমেন চন্দের স্মৃতিতে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি কবিতা সংকলন। চারের দশকের অগ্নিগর্ভ আন্দোলনের দিনে ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকা শহরে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে নিহত হন সোমেন চন্দ। হয়তো তাদের প্রকৃত স্বরূপকে নিজের জীবন দিয়েই চিনিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু ভারতবর্ষের প্রগতি-আন্দোলনের ওপর প্রথম আঘাত। তাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা এই ঘটনায় একদিকে যেমন যন্ত্রণায় আকুল হয়েছেন, অন্যদিকে এই ঘটনাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি নিয়ে মুখোমুখি হতে। আলোচ্য সংকলনটিরও সার্থকতা এখানে। এর মাধ্যমে আমরা যেমন স্মরণ করতে পারি নিহত লেখকের কাজকর্মকে, আবার সেই ঘটনার ধারাই যে বর্তমানে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তরুণ বামপন্থী লেখকদের ওপর, সে সম্পর্কেও আমরা সচেতন হতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। গ্রন্থটিকে তিনি সাজিয়েছেন দুটি পর্বে। প্রথম ভাগে আছে তৎকালীন প্রগতি

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আসলে সোমেন চন্দের শোকাবহ মৃত্যুর পরই দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশনের পথ থেকে, সোমেন চন্দের স্মৃতিতে 'প্রাচীর' নাম দিয়ে যে ছোট্ট কাব্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম পর্বে সেটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। সংকলনটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য সেখানে আমরা পেয়ে যাই অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মনীন্দ্র রায়, অবন্তী সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম। বেশ বোঝা যায়, সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কবিকেই আলোড়িত করেনি, বুদ্ধদেব বসুর মতো বামপন্থা বিরোধীকেও নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। এই সম্মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগতই নয়, কবির সামাজিক প্রতিবাদও অত্যাচার ও শোষণের প্রতি, বড় হয়ে ওঠে। শিল্পীকে হত্যা করে কি তাঁদের স্বপ্নকে ধ্বংস করা যায়? তাই যখন বিষ্ণু দে লেখেন,

'তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ কেটে দেব পাতা, লিখব বিজয়-ভাষ্য।—

তখন যেন এই স্বপ্নকে রূপদানের সামগ্রিক প্রচেষ্টাটিই বড় হয়ে ওঠে।

বইটির দ্বিতীয় পর্বে আছে উত্তরকালের বিভিন্ন সময় লেখা প্রবীণ ও নবীন কবিদের কবিতা। যার মধ্যে আছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, রবীন সুর ও আরো অনেকে। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে অবস্থার বদল ঘটেছে বিস্তর। লেখক-শিল্পীরা এখন অনেকেই বিস্তৃত কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের সুখ-ছায়ায়। তবু মাঝে মাঝে এইজাতীয় দু-একটি উপলক্ষ্য কবিকে এনে দাঁড় করায় প্রতিবাদের গণগণে আগুনের আঁচে, তাদের ব্যক্তিগত আপোষ তখন লজ্জায় মাথা নিচু করে। মনে হয়, এ যেন শুধুই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়, তার মাধ্যমেই তাঁরা খুঁজে চলেছেন নিজের হারানো সত্তাকে। এখানেই অতীত ও বর্তমান একাকার হয়ে যায়, আলোচ্য গ্রন্থটি তখন নিছক কবিতা সংকলনের মোড়ক ছাড়িয়ে, হয়ে ওঠে বর্তমানকে চিনে নেয়ার গোপন চাবিকাঠি। সোমেন চন্দ নামটি তখন প্রতীকী রূপ পায়, আসলে এই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক শোষণের বিরুদ্ধেই তো কবির আজীবন সংগ্রাম। সম্পাদককে ধন্যবাদ সোমেন চন্দের ৬৫-তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি আমাদের ফিরে দেখার সুযোগ করে দিলেন। কিন্তু প্রকাশকের নাম এবং বইয়ের দামের উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল, পাঠকদের সুবিধার জন্য।

আরও একটি তথ্য উৎসাহী পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়। বইটির শেষে ছোট একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, একই সম্পাদকের দায়িত্বে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 'সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গ্রন্থ'। বিস্মৃতির গর্ভ থেকে সোমেন চন্দকে তুলে আনার কাজটি তখনই সফল হবে, যখন তা সাধারণ পাঠকমহলে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে সমাদৃত হবে।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

আগুনের পাখি। সোমেন চন্দকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ। সম্পাদনা: কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

কিছু কথা, বিযুক্তির বিরুদ্ধে

বেশ কয়েকবছর আগে মফঃস্বল বাংলার কোনও এক প্রত্যন্ত থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, যার নাম-ই ছিল 'সাবিক বিযুক্তি'। মনে পড়ে, লেখক সেখানে এক সংক্ষিপ্ত অথচ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ আলোচনা করেছিলেন আজকের সমাজের সবচেয়ে কঠিন, নির্মম ও বেদনাবহ এক প্রশ্ন, বুঝি নিয়তিই বা, সংযোগহীনতা বা অনন্বয়ের কিছু মৌলিক কার্য-কারণ ও বৈশিষ্ট্য। 'পুঁজিবাদের অপরিহার্য চরিত্র এই সর্বাত্মক বিযুক্তি'-র কবলে পড়ে সম্পর্ক ও সংযোগবিন্যাসের যাবতীয় প্রাচীন ও সনাতন, কিভাবে আধুনিক ভাঙনে পর্যবসিত হচ্ছে তারও এক উন্মোচন ছিল লেখাটিতে, যা ট্রাষ্টের উপমাসহ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পায় ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, "...এইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে অতিগ্রামী পারস্পরিক উন্মুলনের এক অরাজক প্রক্রিয়া আছে। সব মানুষই শত্রু। উদরপূর্তির এই নোংরা লড়াইয়ে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীই লড়াই করে একা। চারপাশে তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় পাছে তার পাশের লোকটি তার গলায় কোপ বসায়। এই ক্লান্তিকর ও বর্বর সংগ্রামের অরাজকতায় বুদ্ধিবৃত্তির সুন্দরতম শক্তিগুলি একটু একটু করে অপচিত হয় অপরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায়। আত্মিক সৃজনশীলতা অপচিত হয় নিজেকে বাঁচাবার জন্য তুচ্ছ কৌশলের ব্যবস্থা করার পেছনে।"

লেখকের আরও বলার ছিল যে, শহর বা শহর থেকে দূরের নীচুতলার নিঃস্ব-শ্রমিক কৃষক খেটে খাওয়া অর্ধ-বর্বর মানুষ, তাঁদের লোক-কবি, চারণগায়ক, কথক এঁরা এই ব্যাপক বিযুক্তির চরম দুর্দিনেও সংযুক্তি বাঁচিয়ে চলেন। একা একা উপভোগ করার কোনও ব্যাপারই নেই তাঁদের জীবনে। শহরের কলে

কারখানায় খনিতে প্রাণের তাগিদে গেলেও নিজেদের গোষ্ঠী বা সংস্কৃতি থেকে এরা সহসা বিচ্যুত হতে চান না। একই বক্তব্য আমরা পেয়েছিলাম লোক-সংস্কৃতির মার্কসীয় অনুসন্ধানী তুষার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি, 'লোকসংস্কৃতির কেবলমাত্র গ্রাম্য বা কৃষিসভ্যতার সঙ্গে যুক্ত প্রাচীনের অবশেষে'—এমন অনৈতিহাসিক, ঐতিহ্য সর্বস্ব মতামতের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, 'লোকসংস্কৃতির জন্ম বিশেষ পরিবেশভিত্তিক নয়, শহরের বস্তিতে বা কারখানায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও লোকসংস্কৃতি জন্ম নেয়।' যা মানুষকে তার হারানো সবকিছু, সমস্ত সংযোগ ফিরিয়ে দেবে এবং সেই ফিরে পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রামী আশাবাদী বাঁচিয়ে রাখবে।

সার্বিক বিযুক্তির এই ঐতিহাসিক কালপর্বে সংযুক্তি বাঁচিয়ে চলার সেই বিপরীত, প্রাণবাণ, অ-বিকল্প ধারাটিকে নানাভাবে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে আজকাল। সমাজের গতিশীলতায় ভিন্নমুখী শক্তির যে সক্রিয় দ্বন্দ্ব, তারই প্রকাশ এসবে। সেণ্টার ফর কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড কারচাল এ্যাকশনের পক্ষ থেকে সঞ্জীব সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রসঙ্গ: লোকমাধ্যম নামক গবেষণানিবন্ধ সংগ্রহের পেছনের মলাটভাষণ, 'বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষে সংযোগের সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। একদিকে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ফলে আধুনিক মাসমিডিয়া প্রবল প্রতিপত্তি অর্জন করেছে, অন্যদিকে মুক্তিদায়ী আন্তরিক সংযোগ ব্যাহত হচ্ছে।'—বিষয়টিকে একটু জনপ্রিয় মাত্রাকেই ছুঁতে চায় যেন। বিযুক্তির সমস্যাটির জন্ম ও ব্যাপকতা যে অন্য কোনও প্রত্যক্ষেই, একথা সরাসরি বলে নেওয়াতে তো কোনও অসুবিধা থাকার কথা নয়, বিশেষ করে তখন, যখন গবেষণার বিষয়টাই হল 'বিকল্প-সংযোগের ক্ষেত্রে লোকমাধ্যমের ভূমিকা।' ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকালেখন বাদ নিয়ে পাঁচটি নিবন্ধ এই সংকলনে জায়গা পেয়েছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় চমৎকারভাবে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন, যেন সর্বজনবোধ্যতার কথা মনে রেখেই। তাঁর গবেষক গভীরতার কারণেই নানান কনসেপ্ট (মাস মিডিয়া, ফোক মিডিয়া, পিপলস কারচার, মাস কালচার)—বেশ সহজভাবে তাদের পার্থক্য ও যাথার্থ সূচিত করতে পেরেছেন। বিযুক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের, মানে ব্যাপকতর জনসমাজকে প্রতিরোধক্ষম করে তোলার জন্যই যখন এইসব সংযোগমাধ্যম গবেষণা ও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে, তখন সকলের বোধগম্যতার বিষয়টিও যে বিবেচনা করতে হয়, তুষার চট্টোপাধ্যায়ের অনুলিখিত ভাষণটি তার নিদর্শন।

প্রথম নিবন্ধে সঞ্জীব সরকার আলোচনা করেছেন, 'সামাজিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সংযোগমাধ্যম'-এর ভূমিকা। আসলে সংযোগসমস্যা ও সংযোগমাধ্যমের সমস্যাকে গুলিয়ে ফেললে বিষয়টিকে কখনই তার প্রার্থিত গুরুত্বে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং জীবন্ত মানুষ পরাধীন—এই বাক্য তো খোদ কমিউনিস্ট ইস্তেহারের। সমাজের সমস্ত কিছুই তখন পুঁজিঅনুগামী হয়ে ওঠে, ব্যক্তিগত সংযোগের আর কিছুই অবশেষ থাকতে পারে না, বিযুক্তি তো তখনই জন্মায়, আর এতো আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতারই অংশ যে, পুঁজি-শাসিত সমাজে সংযোগমাধ্যমের ওপর পুঁজি ও তার ভক্ষক শ্রেণীরই আধিপত্য বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে শুধুই 'সংযোগ-মাধ্যম' বিবেচনায় আসলে ব্যাপারটা উপরিতলকেই ছুঁয়ে থাকে, ভিত্তি অবধি পৌঁছয় না। সংযুক্তির যেসব জীবন্ত মাধ্যমগুলির কথা আমাদের সকলেরই আলোচনা ও অবলম্বনের বিষয়, তা কেবল তাৎক্ষনিক প্রয়োজন-ই মেটাবে এমন তো নয়, এক সংযোগমুখর ভবিষ্যতে আমাদের পৌঁছে দেবে, বা, আমরাই—তেমন ভবিষ্যতে পৌঁছনোর পাথেয় হিসেবে মাধ্যমগুলিকে পাব, ভাবনা নিশ্চয়ই সেইপথে এগোনো উচিৎ। সঞ্জীব সরকারের আলোচনা থেকে বিষয়টি এইমর্মে পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরী ছিল, এবং তা বিষয়টির গুরুত্বের কারণেই। নইলে শুধুমাত্র প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সাফল্যের ঘাড়েই সমস্ত দোষ পড়তে পারে, পড়েও অনেক সময়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নয়, উৎপাদন সম্পর্কই হওয়া উচিৎ আমাদের আন্দোলন ও আক্রমণের লক্ষ্য, এই কথাটা বুঝিয়ে, গুছিয়ে না বললে, বেকারীবিরোধী আন্দোলনের নিছক কমপিউটার বিরোধী আন্দোলনে গিয়ে পরিণতি পাবার ঘটনারপুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। কখনও, 'ভারতের মাসমিডিয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা' বলতে গিয়ে সঞ্জীব সরকার বলে ফেলেন, সংবাদপত্রে "সংবাদ যা থাকে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খবর যার সঙ্গে দেশের আশি ভাগ মানুষের কোনও সংযোগ বা প্রাসঙ্গিকতা নেই।" এ তো নিছকই সমগ্রতার বোধহীন এক অগভীর মন্তব্য।

দ্বিতীয় নিবন্ধটিতে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্তমান সমাজব্যবস্থায় লোক-মাধ্যম' আলোচনা করেন। মাসমিডিয়া বা জনমাধ্যমের জনবিরোধী চরিত্রের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই যখন এই বিকল্প লোকমাধ্যমকে অবলম্বন করতে চাওয়া, তখন, এই নিবন্ধটিতে আবার বেতার, দূরদর্শন ও

সংবাদপত্রের প্রভাবক্ষমতাকেই খাটো করে দেখানো হয়েছে, লোকমাধ্যমের মাহাত্ম্যপ্রচারের মনোবাসনায়। ফলে নিবন্ধটিতে দুই থেকে চার অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়গুলিতেই কেবল বলার কথা পরিবেশনের সঙ্গতি ও মাত্রাবোধ টের পাওয়া যায়। প্রথম অংশটি বড়ই অগভীর, এতটাই যে গবেষণা নিবন্ধ বলে ভাবতে পারা যায় না। গবেষণার অর্থ, অধিকাংশ সময়েই, খোঁজা বা অনুসন্ধান। সেক্ষেত্রে পূর্বধারণার বশবর্তী হলে যেমন খোঁজা ব্যর্থ হয় তেমনই, 'কি খুঁজব'—সেই নির্দিষ্টতা না থাকলে গবেষণাকর্মসমেত গবেষক নিজেই তো নিখোঁজ হতে পারেন। ফলে, খুঁজতে খুঁজতে পাওয়ার বদলে খোঁজার ভাগ করে যেতে হয়। তার চেয়ে বরং উল্লিখিত দুই, তিন ও চার অধ্যায়ে হাট, মেলা, গ্রামীণ লোকনাট্য, যাত্রা, পথের নাটক, আলকাপ, লেটো, মাছানি, ঢুলি, গড়াত, ভাট, পটুয়া ও হেটোকবির পরিচয় কখনও ইতিহাসে কখনও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরলে সংক্ষিপ্ত হলেও তা পড়তে আমাদের ভাল লাগে, নিজেদেরও কিছু কিছু জানা হয়ে যায় বলে।

পরবর্তী তিনটি নিবন্ধ আমাদের লাভবান করে। লোকসংস্কৃতির তিনটি স্থানিক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যোগসূত্রের নানা নমুনা আমরা পাই, কখনও জীবনে অনিবার্য বঞ্চনা, কখনও প্রতিবাদ আবার কখন শুধুই জীবনমুখী ভালবাসায় সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির সম্যক পরিচয় স্বল্পপরিসরে তুলে ধরা হয়েছে নিবন্ধ তিনটিতে। 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি তথা সংযোগমাধ্যম'—সুনীল মাহাতো, 'জনসংযোগ ও ঝাড়গ্রামের লোকসংস্কৃতি'—যামিনী মাহাতো, 'ঝুমুর : একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীতধারা'—কিরীটি মাহাতো, তাঁদের নিবন্ধে যথাক্রমে পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের লোকসংস্কৃতি ও ঝুমুর গানের বেশ অন্তরঙ্গ পরিচয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। বিশেষ করে ঝুমুর গানের এত দিগন্ত লেখক পাঠকদের কাছে স্বচ্ছতর করেন, যে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারা যায় না। কত আধুনিক সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝুমুর গান তৈরী হয়, তার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হাজির করেছেন লেখক, সন্দেহ নেই পরিশ্রম ও তন্নিষ্ঠা ছাড়া একাজ অসম্ভব। লোকসংস্কৃতি আসলে কতখানি দ্যুতিমান, তার উজ্জীবনী-শক্তি ও সম্ভাবনাও যে কোথায় নিহিত, আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক সংবিধানপদ্ধতির ভেতরে বাস করে, এই লোকসংস্কৃতির কোন ঐতিহ্য থেকে যে তারা গড়ে তুলেছে জটিলতার আধুনিক সমাজের অনন্বয়ের বিরোধী প্রাচীর, এক অন্য আধুনিকতা,—তা সাধারণ উৎসাহী পাঠকের কাছে স্বচ্ছতর করে তোলার জন্য এই তিনটি নিবন্ধ সত্যিই কার্যকর ভূমিকা

নিতে পারে। অনেক প্রাচীন ও আধুনিক তথ্য, গান ও ছড়ায় সমৃদ্ধ এই তিনটি নিবন্ধ সংকলনটির প্রয়োজন ও মান বাড়ায়, নিঃসন্দেহে। যেখানে তত্ত্ব-আলোচনার অগভীর চেষ্টা প্রায় নেই।

প্রকাশের কাজে আরও অনেক বিবেচক, মনোযোগী ও যত্নবান না হওয়ায়, বইটির মুদ্রণভঙ্গিমা এর দাম বাড়িয়েছে অর্থমূল্যে, গভীরতাও কেড়ে নিয়েছে অনেকখানি। কলকাতা থেকে এখনও এরকম অপরিণত অক্ষরবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জায় গবেষণানিবন্ধের সংকলন বেরোয়, দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। পরক্ষণেই সান্ত্বনা খুঁজি ওই মফঃস্বলী আলোচনাটির সারবত্তায়, সার্বিক বিযুক্তির যুগে আংশিক আশ্রয় ছাড়া, তা আর কিইবা।

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ : লোকমাধ্যম। সম্পাদনা—সঞ্জীব সরকার। সেণ্টার ফর কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাকশন, কলকাতা-১৯। কুড়ি টাকা

শ্রমিকের রক্ত, অশ্রু ও ঘাম

মে-দিবসের শতবর্ষে প্রকাশিত ৩৬০ পৃষ্ঠার আলোচ্য বইটিকে মে-দিবসের শতবর্ষের একমাত্র ইতিহাসের গৌরব দেওয়া যায়। যতদুর জানা আছে, তা থেকে বলা যায় এই রকম বই আর একখানিও নেই।

দীর্ঘদিন যাবৎ বাঙালি পাঠকদের সম্বল ছিল ট্রাকটেন বুর্গ, গোপাল ঘোষ, দিলীপ বসু, কমল সরকার, কেদার ভট্টাচার্যের পুস্তিকা ও বইগুলি। ইংরেজিতেও মে-দিবসের উদ্ভব থেকে একশ বছরের বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের কোনো ইতিহাস আছে বলে জানা নেই।

শ্রী গুপ্ত সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের একজন নেতা। ট্রেড-ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজের চাপের মধ্যে এ-জাতীয় গবেষণাধর্মী বই লেখার সময় করাই দুরূহ। গাইড-এর সাহায্য ছাড়া একক প্রচেষ্টায় শ্রী গুপ্ত যে কাজ করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কাজের সময় কমানোর সংগ্রাম পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর উল্লেখ-যোগ্য তাৎপর্যপূর্ণ দাবির সংগ্রাম। এই প্রজন্মের অনেকেই জানেন না যে-সব সামান্য হলেও সুবিধা আজ তাঁরা পাচ্ছেন তার শতবর্ষব্যাপী রক্তঝরা

নেপথ্য ইতিহাস। শুভাশিস বাবু শতাব্দীব্যাপী বিশ্বজোড়া সেই সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং কাজের সময় কমানোর দাবির তাত্ত্বিক দিকটিও প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন।

বইটি ৩টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের আটটি অধ্যায়ে বিশ্ব-শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমের সময় কমানোর জন্য দু'শ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস ১৪০ পৃষ্ঠায় বলেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে শতাধিক পৃষ্ঠা নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্বর্তীকাল থেকেই মে-দিবসের শতবর্ষের লগ্ন পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত করেছেন। ৩য় খণ্ডে ভারতে মে-দিবস আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেছেন।

শুভাশিস বাবুকে অসীম পরিশ্রমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি নিছক এখানে তথ্য-সংকলকের কাজ করেই দায়িত্ব শেষ করেন নি। গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় তিনি তথ্যকে সাজিয়ে নির্মাণ করেছেন শ্রমিকশ্রেণীর এক বিশিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস। আর, এই ইতিহাস রচনায় যে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হয় তিনি যে তার অধিকারী তারও পরিচয় পাওয়া গেছে বইটিতে। তার থেকেও বড় কথা গবেষকের কঠোর শ্রমের চিহ্নটুকুও তিনি পাঠকদের কাছে রাখেন নি। কারণ, বইটি তিনি নিছক অ্যাকাডেমিক কৌতূহলে লেখেন নি। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছে বইটির যারা সম্ভাব্য পাঠক তাদের মান উপলব্ধি করে প্রাঞ্জল ভাবে লিখতে। একজন গবেষকের কাছে এই প্রলোভন জয় করাও আজকের দিনে কম কথা নয়।

রাজনীতি-সচেতন মানুষ, রাজনৈতিক ও ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীদের কাছে বইটি একটি বড় প্রাপ্তি। প্রাপ্তির পরিমাণ এত যে, যা-পেলাম না তার জন্য বিশেষ ক্ষোভ হয় না। তবে, একটি বিষয়ের দিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রোজা তাঁর The Origin of May Day প্রবন্ধ, শেষ করেছেন যে কথা বলে,—সেকথা স্মরণ করেই বলতে হচ্ছে লেখক তো যেহেতু নিছক তথ্যের সরবরাহকারী নন, তিনি তাত্ত্বিকও, সেক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রকরণে আঙ্গিকে যেসব পরিবর্তন (মৌলিক নয়) ঘটেছে, আধুনিকতম কৃৎ-কৌশলের প্রয়োগে শ্রমিকের শ্রম আরো সূক্ষ্ম উপায়ে শোষণ করা হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে নয়া সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে নিজের শ্রমিকদের অনেক সুবিধা দিচ্ছেন এবং ভারতবর্ষে যখন এখনো ভূমিদাস আছে, আছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রমের প্রথা, আবার সংগঠিত শিল্পে-পুঁজিতে

৫ দিনের সপ্তাহ, এল, টি, সি ইত্যাদি—মে-দিবসের ইতিহাস রচনায় এই প্রেক্ষপটটি অবহেলিত হয়েছে। মে-দিবসের দাবিতে সবসময়ই যেন আট ঘণ্টাই কাজের দাবি থাকবে তাতো নয়। আরেকটি জিনিস বর্জন করলে ভাল হত সেটি হচ্ছে বিশেষণ প্রয়োগের প্রবণতা। ইতিহাসকারের অবৈতনিক উচ্ছ্বাস মানা যায় না। দুটি উদাহরণ দিই রোজাকে 'বিশ্ববরেণ্যা মহান নেত্রী' বিশেষণ তিনি দিতে চাইলে দিতে পারেন, কিন্তু যে প্রসঙ্গে রোজার নাম উল্লেখিত হয়েছে সেখানে এই বিশেষণ প্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক। ক্যাপিটালকে বলা হয়েছে 'মহাকোষ' গ্রন্থ। এনশাইক্লোপিডিয়া শব্দটি জানি, তার বাংলা কি মহাকোষ? তার থেকে বড়ো কথা ক্যাপিটাল কোন অর্থে কোষগ্রন্থ বা লেখকের ভাষায় 'মহাকোষ'?

প্রথম খণ্ডে লুডাইট আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের নীরবতার কারণও বোঝা গেল না। অসংঘঠিত নতুন বিকাশমান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নতুন ব্যবস্থার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসটাও তো জানতে ইচ্ছে হয়! তাছাড়া হবস্‌ওয়মের গবেষণা এই আন্দোলনের নতুন অর্থ দিয়েছে। যা হোক, এ-সব প্রাপ্তির তুলনায় গৌণ ব্যাপার। শুভাশিশ বাবুর বইটির জন্য আমরা শ্লাঘা বোধ করি এবং তাঁর কাজকে এক কথায় বলতে হয় 'মনুমেণ্টাল'।

বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের শ্রম সময় কমানোর সংগ্রাম ও মে দিবসের শতবর্ষের ইতিহাস। শুভাশীষ গুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান: এন. বি. এ। ১০.০০

সুবীর ভট্টাচার্য

এ যে রাত্রি। এখানে থেমোনা। শুভ দাশগুপ্ত
প্রকাশনা। সাউণ্ড উইং

সাউণ্ড উইং প্রকাশ করেছেন একটি সর্বার্থে প্রয়োজনীয় ও সদর্থে আধুনিক ক্যাসেট। তরুণ সঙ্গীতশিল্পী শুভ দাশগুপ্তর কণ্ঠে দশখানি গানের এই সঙ্কলনে গানগুলি মালার মত গাঁথা হয়েছে অনিবার্য কিছু কবিতা আর যথাযথ কিছু উজ্জ্বল গদ্যাংশের সুতোয়। উপনিষদের স্তোত্র, অরুণ মিত্র, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, রবীন সুর প্রমুখের রচনা কিংবা জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অশোক রায়, দেবাশিস দাশগুপ্তর সুরসৃষ্টি—সব কিছুই শুভ পরম নিষ্ঠায় আর নিঃসংকোচ দক্ষতায় সাজিয়ে নিয়েছেন সমসময়ের অতি প্রয়োজনীয় সত্যটুকু, উচ্চারণ করার তাগিদে।

গান কবিতা গদ্যের এই ত্রিধারাকে শুভ মানুষের প্রতি ভালবাসা আর সহমর্মিতার নির্ভুল গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তার খোলা, দরদী কণ্ঠের গানগুলি কখনও দুঃখে কখনও প্রতিবাদে, কখনও উপহাসে ব্যঙ্গে, আমাদের চেতনাকে বিবেককে, অন্তরকে কমরেডের মত ছুঁয়ে যায়। এখন তো গান বাজনার নামে অশালীন হুল্লোড় আর অর্থহীন ধুমধাড়াক্কার গরম বাজার। চলতি হাওয়ার উল্টো মুখে—সাহসে আর দক্ষতায় শুভ হাল ধরতে চেয়েছেন। তাঁর চাওয়াকে সার্থক করে তুলেছে, অমিতাভ বাগচীর সুন্দর আবৃত্তি। শক্তিব্রত দাসের জলদগম্ভীর স্তোত্র-পাঠ, এবং বিশেষভাবে কবি অমিতাভ দাশগুপ্তর প্রত্যয়ী উচ্চারণের পাঠ। জীবনানন্দ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই ভিন্নধর্মী কবির রচনা অমিতাভর কবি-কণ্ঠে সপ্রাণ আবেগে জীবন্ত।

আজকের দিনে গণসঙ্গীত বলে যে গান লোকে শোনে—তাতে 'গণ' অর্থাৎ জনতার সত্যিকারের দৈনন্দিন ধ্বস্ত জীবনের ছবির বদলে, দলীয় শ্লোগান কিংবা কল্পিত বিপ্লবীপনার বাহুল্য কান আর মন দুটোকেই বিরক্ত

করে। শুভর গান—নেচে ওঠার জন্য নয়, হৃদয় দিয়ে ভাবার জন্যে। গান এখানে জীবনের ঘাম রক্ত কান্না আর তা থেকে উত্তরণেরই ছবি এঁকেছে—কিন্তু প্রচলিত স্থূলতায় নয়। সূক্ষ্ম জীবনবোধে। শুভ নিজে যেকটি গান কম্পোজ করেছেন, তাতেও তার গোত্রের ভিন্নতা দ্রষ্টব্য।

ক্যাসেটটি প্রকাশের জন্যে সাউণ্ড উইংকে আগেই ধন্যবাদ জানিয়েছি। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপার জানানো উচিত বলে মনে হচ্ছে। এমন সুন্দর ও অভিনব এই ক্যাসেটটির শব্দগ্রহণ কিন্তু সর্বত্র সুন্দর হতে পারে নি। প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়, কিন্তু ক্যাসেটটির ভিতরে কী রয়েছে? গান না কবিতা না নাটক—তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়, বাইরে থেকে ক্যাসেটটিকে আকর্ষণীয় মনে নাও হতে পারে। আর—গান কবিতা গদ্য সব মিলিয়ে ব্যাপারটির পরিকল্পনা ও প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ যে শুভর নিজেরই, তাও অবশ্য মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল।

সুরসিক

বঙ্কিম পুরস্কার পেলেন অমলেন্দু চক্রবর্তী

একান্তভাবেই পরিচয়-এর লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী এবারে বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর 'যাবজ্জীবন' উপন্যাসের জন্য। মানসিকতা, সততা ও নিষ্ঠায় অমলেন্দু বরাবরই এমন একজন সাহিত্যিক, যিনি যাবতীয় সহজ সাধনকে উপেক্ষা করে সেই একশিলা পাথরের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে গেছেন— যার নাম মানুষ। হাটে-মাঠে, গাঁয়ে-গঞ্জে-মিছিলে, আন্দোলনে ঘুরতে ঘুরতে অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক সহানুভূতির রসায়নে তিনি ছেঁকে তুলেছেন একটির পর একটি গল্প উপন্যাস। তাঁর একটি অসামান্য গল্প 'ইছামতী বহমান' দীর্ঘকাল আগে বেরিয়েছিল পরিচয়-এ, যার মেজাজে বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছিল ঋত্বিককুমার ঘটক ও বিজন ভট্টাচার্যের দেশচেতনা ভাঙা বাংলার আর্তনাদ।

পর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর—বিপন্ন সময় গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন, আকালের সন্ধানে, যাবজ্জীবন-এর মত ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস, বেরিয়েছে তাঁর দুটি গল্পের বই-অবিরত চেনামুখ ও গৃহে গ্রহান্তরে।

অমলেন্দু প্রগতিশীল ও মানবিক সাহিত্যের এক অনন্য কথাকার। তাঁর জয় হোক।

অর্জুন সেন

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির যোদ্ধা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের আপসহীন নেতা ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার গত ১৫ জুন তাঁর যাত্রা শেষ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর।

কিশোর বয়সেই সত্যেন্দ্রনারায়ণ অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হন। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯৩৩-৩৫) তাঁর সাত বছর কারাদণ্ড হয় এবং ১৯৩৬-এ তাঁকে চালান করা হয় আন্দামান বন্দীশিবিরে।

আন্দামানে গিয়ে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশুনো করতে থাকেন সত্যেন্দ্রনারায়ণ। কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জেলখানার ভেতরেই তিনি যুক্ত হন কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে। ১৯৩৭-এ আন্দামান বন্দীশালায় যে ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট হয়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ তাতে সামিল হন।

১৯৩৮-এ তাঁকে দেশে পাঠানো হয়, কিন্তু মুক্তি দেওয়া হয় না। দীর্ঘ একদশক এভাবে বন্দীজীবন যাপনের পর ১৯৪৬-এর উত্তাল বন্দীমুক্তি আন্দোলন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নেতৃবর্গ ভগৎ সিং-এর সাক্ষীদের সঙ্গে তাঁকে মুক্ত করে।

কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনারায়ণ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং দার্জিলিং জেলার চা-শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজে নিজেকে নিবেদন করেন। তরুণ প্রজন্মের বামপন্থী কর্মীরা এখন কল্পনাও করতে পারবেন না, ঐ কাজের দায়িত্বপালন করা তখন কত কঠিন ছিল। নেপালি জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে কিভাবে শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, এই ছিল সত্যেন্দ্রনারায়ণের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। এ নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। বলাবাহুল্য, এগুলো লেখা হয়েছিল মার্কসবাদী দৃষ্টিতে

জাতিসমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর সে সময়ের উপলব্ধির চমৎকার প্রকাশ ঘটে তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে'-গ্রন্থটিতে।

১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে সত্যেন্দ্রনারায়ণ আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হন ও ১৯৫২ পর্যন্ত ডেটিনিউ থাকেন। ১৯৫২-য় বন্দী অবস্থাতেই তিনি রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভায় তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট গ্রুপের ডেপুটি লিডার। ১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন সত্যেন্দ্রনারায়ণ।

আমৃত্যু তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং এক অদম্য তাত্ত্বিক। ভারতবর্ষের জাতি-সমস্যা, আদিবাসিদের নানামুখী সমস্যা বিশেষত নেপালি জনগোষ্ঠীর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি সৃজনশীল মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

তাঁর জ্ঞানের বিচিত্রতা ও চিন্তার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাগুলি থেকে। একদিকে তিনি যেমন লিখেছেন 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা' অন্যদিকে তাঁর মনীষায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোক সংস্কৃতি', 'Maxism and the Language problem in India', 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা', 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার', 'রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ' 'In search of a revolutionary ideology and a revolutionary programme' এবং শেষতম গ্রন্থ 'মৌনমুখর সেলুলার জেল'-এ।

বিপুল পাণ্ডিত্য ও বিপ্লবী জীবনের সমাহারের এক উজ্জ্বল নাম সত্যেন্দ্র-নারায়ণ মজুমদার। কি দ্বীপান্তরে বা স্বদেশে দীর্ঘমেয়াদি ও কষ্টকর কারাবাসে, কি পাহাড়ি এলাকায় সংগঠনের কাজে, কি অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কর্মে ও মননে এক আশ্চর্য কমিউনিস্ট। তাঁর অমর স্মৃতিতে আমরা রক্তনিশান অর্ধনমিত করছি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

খাজা আহমেদ আব্বাস (১৯১৩-৮৭)

ভারতের সংস্কৃতি জগতের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। আব্বাসের পরলোকগমনের ফলে ভারতের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অবিলম্বে পূর্ণ হবার নয়। খাজা আহমেদ আব্বাস সত্যই এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল ১ জুন, ১৯৮৭-তে 'বোম্বাই ক্রনিকলে'র 'লাস্ট পেজ' কলমে খাজা আহমেদ সাংবাদিক হিসেবে পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। বলিষ্ঠ সাংবাদিক রূপে, আব্বাস সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৫ সালে 'বোম্বাই ক্রনিকল' দৈনিকে তিনি একই সঙ্গে সহ-সম্পাদক ও রিপোর্টার রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং মাত্র ৫০ টাকা মাইনেতে তাঁকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করতে হয়। উক্ত পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচক রূপে আব্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর তীক্ষ্ণ, বলিষ্ঠ সমালোচনায় প্রযোজকরা বিচলিত হন এবং চলচ্চিত্র-সমালোচকরূপে তাঁর বরখাস্ত দাবি করেন। কিন্তু আব্বাস কর্মচ্যুত হন না; তাঁর জনপ্রিয়তার ফলে 'ক্রনিকল'-এর 'লাস্ট পেজ' তাঁর দায়িত্বে অর্পণ করা হয়।

কিন্তু খাজা আহমেদ আব্বাস শুধু রিপোর্টার বা চলচ্চিত্র সমালোচক রূপেই খ্যাতিমান নন এবং 'বোম্বাই ক্রনিকল'-এর সহ-সম্পাদকরূপে ভারতের প্রগতিশীল সংস্কৃতির জগতে ব্যক্তিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন নি। আব্বাস ছিলেন বামপন্থী, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, ভারতের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনন্য ব্যক্তিত্ব। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের কাছাকাছি সময়ে প্রগতি লেখক সংঘের তৃতীয় নিখিল ভারত সম্মেলন বসে। গণনাট্য সংঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাও সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ঐ সময়েই ঘটে। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের অধিবেশনে খাজা আহমেদ আব্বাস গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। উক্ত অধিবেশনে আব্বাস সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীর দায়িত্ব সম্পর্কে ভাষণও দেন। আব্বাস ছিলেন আসলে এক অসাধারণ শিল্পী। ঐ অধিবেশনে আব্বাস 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' সঙ্গীতটি শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর এক নাটিকায় বিজন ভট্টাচার্যকে সাজিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে ঐ গানটি বলিয়ে নেন। ফ্যাশি-বিরোধী লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত ভাষণের কিয়দংশ, সোমেন চন্দ-এর

অসামান্য গল্প 'ইঁদুর' [অনুবাদ করেছিলেন অশোক মিত্র, আই. সি. এস.] প্রভৃতি নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সংকলনটি প্রতিনিধিত্বমূলক না হওয়ায় অনেক অভিযোগ ওঠে; খাজা আহমেদ আব্বাসও সেদিন বোম্বাই-এর পত্রিকায় সংকলনটির সমালোচনা প্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বলেন—'US, Professor Mukherjee? Why not all of us?' ১৯৪৪ সালে কলকাতায় সোভিয়েত—সুহৃৎ সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন হওয়ার পর বোম্বাইতে সর্ব ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস ছিলেন সক্রিয়। তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী —ওখানেই তিনি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ভি. শান্তারামের 'প্রভাত ফিল্‌ম্‌ স্টুডিও'তে নিয়ে যান!

নানা গুণে ভরা আব্বাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সোভিয়েত প্রসঙ্গে তাঁর অনুরাগ ও সম্প্রীতি। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্ব ভারতীয় অধিবেশনে খাজা আহ্‌মেদ আব্বাসের 'ইয়ে অমৃত হ্যায়' নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়। সেই পর্বে এটিকে জনপ্রিয়তম নাটকাভিনয় বলা চলে। ঐ নাটকে একজন বৈজ্ঞানিক কর্তৃক অমৃত আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে আর ঐ অমৃতের আকাঙ্ক্ষী হলেন সৌন্দর্য, জন বুল, ধর্ম এবং হিটলার। তিনটি পর্যায়ে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে ফ্যাসীবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের যোগসাধনের তত্ত্ব এই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। হিন্দুস্তানী নাটক 'জুবেইদা'ও [Zubeida] খাজা আহ্‌মেদ আব্বাসের স্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ে বার্ষিক অধিবেশনে এই নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটির নির্দেশক ছিলেন বলরাজ সাহানী; সর্ব ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনেও আব্বাসের 'জুবেইদা' মুক্তাঙ্গনে অভিনীত হয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করে। বরখাস্ত হওয়া সাংবাদিক-এর গল্প নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য হল 'নয়া–সংসার'। বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে আব্বাসের প্রথম ছবি 'ধরতী কে লাল'। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সবই তাঁর। হিন্দী ভাষায় প্রথম বাস্তবমুখী ছবির পথিকৃৎ রূপে আব্বাস স্মরণীয় হয়ে আছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি-চলচ্চিত্র–অভিনয়-সমালোচনার জগতে খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস প্রগতিশীল, বামপন্থী চিন্তাবিদ্ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব নিপীড়িতদের ইতিহাসে চিরপ্রবহমান অনিঃশেষ প্রেরণা।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধিজীবী-বিরোধী গান্ধীজী

'পরিচয়'-এ প্রকাশিত রাধারমণদার (মিত্র) স্মৃতিকথায় গান্ধীজীর বুদ্ধিজীবী-বিরোধী যে চরিত্র উদঘাটিত হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছাত্রাবস্থায় যাঁরা আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন আমিও তাঁদের একজন ছিলাম। তাঁকে দেখেছিও অনেকবার, কখনও কাছে থেকে কখনও দূরের থেকে। কিন্তু তিনি তো সাধারণ মানুষ ছাড়াও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও সমভাবে সর্বত্র মিলিত হয়েছিলেন। অথচ সবরমতি আশ্রমে তাঁর যে চেহারা রাধারমণদা দেখেছিলেন তা তো একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার।

গান্ধীজী নিজেও তো বুদ্ধিজীবীই ছিলেন। অথচ তলস্তয়ের বই পড়াও তাঁর আশ্রমে নিষিদ্ধ ছিল। ব্যাপারটা বেশ বিস্ময়কর। এ কথা ঠিক যে তলস্তয়ও এক সময় বুদ্ধিজীবী-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য শুধু লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর তো কোনো আশ্রম ছিল না। কাজেই একটি বিরাট গ্রন্থাগারকে আরশোলা, চামচিকের আড্ডায় পরিণত করার কোনো সুযোগ তাঁর হয় নি এবং বোধহয় তেমন কিছু করতেও তিনি পারতেন না।

গান্ধীজী নিজে যে উঁচুদরের বুদ্ধিজীবী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম দীর্ঘ কারাবাসকালে। বয়স যখন তাঁর ৫৪ বছর। তিনি জেলে ১৫০টি বই পড়েছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিল সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান। তালিকা নিম্নরূপ: সমগ্র মহাভারত, হিন্দু দর্শনের ছয়টি শাখার সমস্ত গ্রন্থ, মনুস্মৃতি ও উপনিষদ, গীতা (তিলক, অরবিন্দ শংকর ও জ্ঞানেশ্বরের টিকা সহ অনুবাদ), পল কারুসের 'গসপেল অব বুদ্ধ', রীজ ডেভিডস্‌এর "লেকচার অন বুদ্ধিইজম" আমির আলির "স্পিরিট অব ইসলাম" ও "হিস্ট্রি অব সারাসেনস" গিবনের "লাইফ অব প্রফেট", মহম্মদ আলির কোরান, ফারাবেক "সিকা স

আফটার গডস", মুলটনের "আর্লি জোরাসট্রিয়ানিজম", হেনরি জেমস্-এর "ভ্যারাইটিস অব রিলিজিয়াস একস্‌পিরিয়েনস্" এবং ইনবিনের "ওরিজিন এ্যানড ইভোলিউশন অব রিলিজিয়ন"। এগুলি সবই ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ।

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তিনি পড়েন:

গিবনের "ডিক্লাইন অ্যানড ফল অব রোমান এম্পায়ার", বেকনের "উইসডম অব দ্য এনসিয়েন্টস", বাকনের "হিসট্রি অব সিভিলাইজেশন", ব্যবেলের "ইভোলিশন অফ ম্যান" গীজোর "ইয়োরোপীয়ান সিভিলাইজেশন", জেম্‌সের "আওয়ার হেলেনিক হেরিটেজ", কিডের "সোস্যাল ইভোলিউশন", মোটলির "রাইজ অব দ্য ডাচ রিপাবলিক", এইচজি ওয়েলস্-এর "আউট লাইন অব হিস্‌ট্রি", গেডের "ইভোলিউশন অব সিটিজ" লেকির "ইয়োরোপীয়ান মরালস্" এবং রোজবেরির "লাইফ অব পিট"।

গান্ধীজীর পঠিত সাহিত্য গ্রন্থগুলি হল গ্যয়টের "ফাউস্ট", রবীন্দ্রনাথের "সাধনা", বার্ণার্ড শ'র "ম্যান এ্যাণ্ড সুপার ম্যান" এবং রাডাইয়ার্ড কিপলিং-এর "ব্যারাকরুম ব্যালাডস।" তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। গান্ধীজী শুধু পড়েন নি, বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামতও প্রকাশ করেছেন।

এমন একজন বুদ্ধিজীবী কি করে বুদ্ধিজীবী-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন তা সত্যই গবেষণার বিষয়।

সুকুমার মিত্র

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসেবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য। এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই সি এ ২৮৮২/৮৭

শারদীয় পরিচয়

১৩৯৪

এবারের বিশেষ আকর্ষণ

অপ্রকাশিত রচনা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

অমিয়নাথ সান্যাল

কমলকুমার মজুমদার

ঋত্বিক ঘটক

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিন্মোহন সেহানবীশ—এর সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার

এছাড়া

প্রবন্ধ গল্প কবিতা

পরিচয়

৫৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা জুলাই, ১৯৮৭ শ্রাবণ ১৩৯৪

প্রবন্ধ

শিক্ষা সংস্কৃতিতে বাঙালী মুসলমান শেখ বাকের আলি ১

ভাষাতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথ ই. মি. বীকভা [অনু : প্রদীপ বক্সী] ৪৭

গল্প

হার্ভহাভাক্কের বারা অলক সোমচৌধুরী ১৭

বস্তর-মন্তর প্রিতম মুখোপাধ্যায় ২৮

কবিতাগুচ্ছ

সুব্রত সরকার রাণা চট্টোপাধ্যায় সুরজিৎ ঘোষ ব্রত চক্রবর্তী নীরদ রায় সোমক দাস নন্দদুলাল আচার্য অজিত বাইরী কার্তিক চট্টোপাধ্যায় নীতিশ চৌধুরী পার্থ বসু উপাসক কর্মকার নন্দিতা সেনগুপ্ত অমরেশ বসু রায়চৌধুরী ৭—১৬

আলোচনা

উৎস সন্ধানে অরুণা হালদার ৬৩

পুস্তক পরিচয়

চৈতন্যদেব ও সেকালের বাংলাদেশ বাসব সরকার ৭৮

পত্রিকা আলোচনা

'অমৃত-লোক'-এর পঞ্চাশতম সংখ্যা অরুণ চৌধুরী ৮৪

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

জন ফোর্ড : বিষয় বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় ৮৫

পাঠকগোষ্ঠী

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা সাধন দাশগুপ্ত ৯২

প্রচ্ছদ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

শিক্ষা সংস্কৃতিতে বাঙালী মুসলমান

শেখ বাকের আলি

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ খ্রীঃ) এবং ঐ কলেজে ডিরোজিওর অধ্যাপনা ও তার ছাত্রশিষ্যদের হিন্দু সমাজের মধ্যে পুরাতন আচার আচরণের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা, রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্করণ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার জন্য সমাজের প্রতি তাঁর আহ্বান এবং প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রী শিক্ষার প্রসারকল্পে আত্মনিয়োগ একটির পর একটি, পরপর তিনটি যুগান্তর সৃষ্টিকারী আঘাত যখন হিন্দু সমাজের জড়তায় প্রাণের সঞ্চার করছিল তখনও কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজ তথা ভারতীয় মুসলমান সমাজ চোখ বুজে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ধর্মীয় তসবিহ পাঠ করতেই ব্যস্ত ছিল। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তারা আধুনিক শিক্ষা থেকে। ফলে বিরাট পার্থক্য সূচিত হল প্রায় সম মানে থাকা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালী সমাজ। পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের প্রতি যখন একটার পর একটা ঘুম ভাঙানিয়া ডাক আসছিল, সেই সময় মুসলমান সমাজে ডিরোজিও, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত কোন ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়াটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার! অথচ খুবই প্রয়োজন ছিল কোন ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হওয়া মুসলমান সমাজেও এবং তার হায়দরী হাঁকের—যেমনটি পরবর্তীকালে হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজের জাগরণ যাকে হিন্দু সমাজের নবজাগরণ বলে থাকি আমরা, তা সংঘটিত করা হয়েছিল—কোনরকম পড়ে পাওনা নয়।

বাঙালী মুসলমান সমাজের ঘুম ভাঙল বটে, তবে তা অনেক পরে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মুসলমান সমাজের ঘুম ভাঙে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে। যদিও তার আগে কলকাতা মাদ্রাসা এবং হুগলী মাদ্রাসাতে ইংরাজী পড়বার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ তাতে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তার প্রমাণ ১৮৬২ খ্রীঃ ১১৪৩ জন এনট্রান্স পরিক্ষার্থীর মাত্র ৩৪ জন ছিল মুসলমান পরিক্ষার্থী অর্থাৎ শতকরা ৩ জনেরও কম। ইংরাজী শিক্ষার তথা আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করার কারণ এই সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে কোন আঘাত না আসা। এই আঘাতটা প্রথম

অনুভূত হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীঃ আব্দুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রীঃ) 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি অব ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠান' মাধ্যমে। ঠিক এরই তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৮৬৬ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করা হয়। চালুও হল কলেজ। কিন্তু ছাত্র অভাবে কলেজ বন্ধ হয়ে গেল দুবছরের মধ্যে। ১৮৭৬ খ্রীঃ সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করলেন 'সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা' নামক প্রতিষ্ঠান। যদিও সবার আগে অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীঃ নবাব আমির আলি (১৮১৭-১৮৭৯ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ন্যাশান্যাল মহামেডান এ্যাসোশিয়েশন' ঐ একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার ছায়া দীর্ঘায়িত হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য উপরোক্ত বিদ্যোৎসাহীদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৭৪-৭৫ খ্রীঃ বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষার হার দাঁড়ায় ২৯ শতাংশ এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকায় শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩'১৮ শতাংশ। ১৯১২-১৩ খ্রীঃ (হিন্দু ৭০'১ শতাংশ) সামগ্রিকভাবে বাঙালী মুসলমান সমাজে ১৮৭৪-৭৫ থেকে ১৯১২-১৩ খ্রীঃ-র মধ্যে ২৭'০৮ শতাংশ। শিক্ষার হার বাড়লেও ইংরেজী শিক্ষার হার কিন্তু খুব একটা বাড়ে নি। কারণ ১৮৯১ সালে সমগ্র বাংলার মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ১'৫০ শতাংশ ইংরেজী জানতেন (হিন্দু ৪'৪০ শতাংশ)। ফলে সরকারী চাকরি ক্ষেত্রেও অসমতা থেকে যায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। সরকারী চাকরি অসমতা দূরীকরণের জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পদক্ষেপ প্রথম নেওয়া হয় লক্ষ্মৌ প্যাক্টে (১৯১৭ খ্রীঃ)। তার আগেই অর্থাৎ ১৯১৪ সালে অবশ্য সরকারের তরফে এক সার্কুলারের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ সরকারী চাকরি মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হয়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বেঙ্গল প্যাক্টেও (১৯২৩ খ্রীঃ) মুসলমানদের জন্যে সরকারী চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। সবশেষে ১৯৩৮ সালে ২৫ আগষ্ট ফজলুল হকের নেতৃত্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা মুসলমানদের জন্যে ৬০ শতাংশ সরকারী চাকরি সংরক্ষিত করেন। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়কে চাকরি ক্ষেত্রে আনুপাতিক সমতায় আনা। এই সমস্ত কারণে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের পক্ষে সরকারী চাকরি সহজ লভ্য হল এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে সক্ষম হয় তারা সরকারী চাকরির রেশ ধরেই। এবং স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালী মুসলমান সমাজ শিক্ষা এবং বৈষয়িক উন্নতির কারণে ভদ্রগোছের অবস্থায় পৌঁছে যায়। কিন্তু অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে যায়

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। এই বাংলার মুসলমান সমাজে দেখা যায় শিক্ষা ও বৈষয়িক দৈন্যদশা, যার রেশ এখনও বর্তমান। কিন্তু কেন হল এমনটা?

কেন-র উত্তর খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে সেই উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগেই বা তারও আগে। হিন্দু সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসনের কুসংস্কারগুলিতে আঘাত হানার ফলে। সেই আঘাত গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার গোটা হিন্দু সমাজ তাতে জেগে ওঠার প্রয়াস পায়। স্ত্রী শিক্ষার ঢেউও লাগে গ্রামে গঞ্জে। কিন্তু মুসলমান সমাজের অগ্রগতি কখনই ধর্মীয় অনুশাসনকে অস্বীকার করে সংগঠিত হয়নি। ধর্মাচারণ এবং বেঁচে থাকার জন্যে পার্থিব প্রয়োজন যে একেবারে ভিন্ন, সে কথা কোন দিনই মুসলমান সমাজকে শেখানো হয়নি। না, আজও না। জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ তার শাহবানু মোকর্দমার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং মুসলিম বিল ও আইন। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান সমাজের মধ্যে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যে জাগরণ শুরু হয়, তা মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল। তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ ধর্ম নির্ভর থেকে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে সরকারী চাকরি লাভ এবং তার মাধ্যমে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করাই ছিল মুসলমান সমাজের মূল উদ্দেশ্য।

অপর দিকে এই সময়ই মফঃস্বলের ধর্মীয় 'কাঠমোল্লারা' নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবার ছায়া দেখতে পায় শহরের মানুষদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ঝোঁক দেখে। নিজেদের রুজি রোজগারের পথটিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে ঐ সমস্ত 'কাঠমোল্লারা' ইসলামের বিশুদ্ধতা করার নামে জিগীর তুলে আধুনিক শিক্ষায় অশিক্ষিত মুসলিম জনগণকে ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধে উজ্জীবিত করার প্রয়াস পায়।

চতুর্থতঃ রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় যেখানে হিন্দু সমাজের আপামর জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে, মুসলিম সমাজের সংস্কারকগণ তার অনেক পরে এসেও কিন্তু তা পারেননি বা তা করেননি। ফলে বাঙালী মুসলমান সমাজের শহরে 'শরীফ' (ভদ্রলোক) জনগণই কেবল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে যে সংখ্যা অতি নগণ্য। ফলে মুসলমানদের মধ্যেই দুটো সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। যে ইসলাম ধর্মে শ্রেণী বিভাজনকে করা হয় অস্বীকার সেই ইসলাম ধর্মেই শ্রেণী বিভাজন কিন্তু দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হয়েছে সমাজের অনেক গভীরে। মুসলমান সমাজেও শ্রেণীর স্তরভেদ কম কিছু নেই। মুসলিম সমাজেও শেখ, সৈয়দ,

পাঠান, মুঘলই সমাজের উঁচুতলার মানুষ বলে আজও স্বীকৃতি পায়। এরাই সমাজে 'শরীফ' মানুষ বলে খ্যাত। এই 'শরীফ আদমী' ব্যতীত অন্য মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগতি করুক তা পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের মুখে কদাচিৎ শোনা গেছে। বরং উল্টোটারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৯ খ্রীঃ মাদ্রাসা কমিটির রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে শহরের 'শরীফ আদমীরা' চায় না নিম্ন শ্রেণীর (আতরাফ) জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা উন্মুক্ত থাকুক—that the respectable Muslim families of Bengal were not yet ready to admit children of lower class families into the institution and they wanted to retain it exclusively for the education of the upper class. (The Bengal Muslims—Rabiuddin Ahmed.)

উল্লেখ্য উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন আব্দুল লতিফ সাহেব স্বয়ং। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরও মুসলমান সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে পরিচিত নবাব আব্দুল জব্বার, যিনি তিন তিনবার লেজেসলেটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি ছিলেন, মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে সীমারেখা টানেন এভাবে: To mix promisciously with the girls belong to the lower orders of society was not desirable (ঐ)

পঞ্চমতঃ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে মুসলমান বলে গণ্য করতেন শুধুমাত্র নিজেদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য। এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার হাতিয়ারে পরিণত করে গোটা মুসলিম সমাজটাকে। গোটা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে মুসলমান বলে অভিহিত করেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এভাবে···but for political and other reason it is well that they should be called Muslims. (ঐ)

ষষ্ঠতঃ মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নতি না হওয়ার আরও একটি যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ হল ভাষা। সেই সময়ের বাঙালী মুসলিম সংস্কারকগণ যারা সমাজে আসরাফ বা শরীফ (ভদ্রলোক) শ্রেণী বলে বিবেচিত হতেন তারা বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধার আসনে বসান নি কোন দিনই। শহরের শরীফ শ্রেণীর মানুষেরা ব্যবহার করতেন 'উর্দু' ভাষা বা 'হিন্দুস্থানী' ভাষা। এরাই পরবর্তীকালে বাংলায় প্রচলন করেছিলেন 'মুসলমানী বাংলা' নামক এক জগাখিচুড়ী বাংলা ভাষা। উক্ত শরীফ শ্রেণীর মানুষজন উর্দু ভাষাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কারণ তারা প্রমাণ করতে চাইতেন বাদশা, নবাব বংশের

মানুষ তারা এই উর্দু ভাষাকে মাতৃভাষার সম্মান দিয়ে। অর্থাৎ তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান। ফলে তাদের সংস্কৃতিও মফঃস্বলের মুসলমানদের থেকে ছিল পৃথক। যার ফলে মফঃস্বলের বৃহত্তর মুসলমানগণ উক্ত শরীফ মুসলমানদের দেখতেন আপনজনের মত নয়—পৃথক এক জনগোষ্ঠীর মতই। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান না হওয়ায় মফঃস্বলের মুসলমানগণ শহরে শিক্ষা থেকে দূরেই থেকে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি বৃহত্তর বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলাকে শরীফ মুসলমানেরা মনে করতেন অচ্ছুৎ। ফলে শহরের শরীফ আদমীরা মফঃস্বলের 'আতরাফ' বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের জন্যে কিছু করার তাগিদ অনুভব করেননি কোন দিনই। এমনকি এই শরীফ শ্রেণীর শহরের বাঙালী মুসলমানগণ বলতে দ্বিধা করে নি……We do not learn the Bengali whilst out Bengal lower orders can not learn the persian, cannot learn even the Hindusthani. (ঐ)

সার্বিক স্থায়ী এবং প্রগতিশীল উন্নতির কথা মাথায় না রেখে ধর্মীয় গণ্ডির অভ্যন্তরে থেকেই বিশেষ সুবিধার্থে যখন কোন উন্নতি বা অগ্রগতির কথা চিন্তা করা হয়, তখন তা কখনই সঠিক পথের দিশারী হতে পারে না সে তো সকলেরই জানা। কারণ তা ঐতিহাসিক সত্য। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী কালে তথাকথিত শিক্ষিত শরীফ বাঙালী মুসলমানরা দেশ ত্যাগ করলে এখানে পড়ে রইল একশ বছরের আগেকার বাঙালী মুসলমান সমাজই। এমনকি গ্রামগঞ্জের শিক্ষিত মুসলমান পরিবারগুলোও বিশেষ সুবিধার লোভে ওপার বাংলায় চলে যাওয়ার ফলে এপারের বাঙালী মুসলমানগণ সমগ্র বাঙালী সমাজে হয়ে পড়ল অন্ত্যজ শ্রেণী বিশেষ। শিক্ষাসংস্কৃতি-বিহীন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা হল এদের চিরসঙ্গী। জীবিকা হল এদের কায়িক পরিশ্রম সাপেক্ষ বা কৃষিকাজ এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই এরা জড়িয়ে পড়তে লাগল অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে। কারণ শিক্ষাবিহীন মুসলমান জনগণের জন্যে সরকারী চাকরির দরজা কি আর উন্মুক্ত থাকতে পারে? এরই মধ্যে মফঃস্বলের মুষ্টিমেয় সম্পন্ন মুসলমান চাষী পরিবার আবার আধুনিক শিক্ষা রপ্ত করার জন্যে তাদের সন্তান সন্ততিদের পাঠাতে লাগল সেকুলার বিদ্যায়তনে। আশা ছিল ঐ সমস্ত পিতা মাতার, আধুনিক শিক্ষা রপ্ত করে তাদের সন্তানেরা সরকারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। কিন্তু এই সময় সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী চাকুরীও হয়ে পড়ল অমিল। আর পারিবারিক ঐতিহ্যবিহীন নব্য শিক্ষিত

বাঙালী মুসলমান যুবকদের কাছে সরকারী চাকরি স্বর্ণমৃগবৎ এখনও। সংবিধানের ১৫, ১৬ এবং ৪৬ ধারায় সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার কথা লিখিত আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আইনের চোখে সকলের অধিকার করে দিয়েছে সমান। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি কখনও। আইনের সাহায্যে সাধারণ নাগরিক তথা বিশেষ কোন শ্রেণীর বিশেষতঃ যারা আছে পিছনের সারিতে, তাদের কোন লাভ হয় না।

সরকারী চাকরির দৌলতে শিক্ষিত মানুষ থাকতে বাধ্য হয় অনেক সময় শহরে। ফলে তারা আসার সুযোগ পায় সংস্কৃতিমনা ও সংস্কৃতি সচেতন মানুষদের কাছাকাছি। এবং ধীরে ধীরে নিজেরাও সংস্কৃতি সম্পন্ন একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে প্রয়াস পায়। কিন্তু প্রথম শর্ত অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান যুবকেরা শহরে যাবার কোন রাস্তা না পেয়ে তারা হয়ে পড়ল কুপমণ্ডুক। পরবর্তীকালে সরকার এই সহজ সত্যটা বুঝতে পেরে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করল মুসলমান দেশের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয়েও তারাই শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তারাই পিছনের সারিতে। শিক্ষার হার এদের সাধারণ ভারতীয়দের তুলনায় ১০ গুণ কম আবার শিকার হারের সঙ্গে সরকারী চাকরি প্রাপ্তি তো তুলনাই করা চলে না কারণ দুটোর মধ্যে সম্পর্ক তো ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। অথচ ওপার বাঙালার ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন এবং '৭০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর দুই বাংলার সংস্কৃতিমনা মানুষেরা আসতে পেরেছেন অনেক কাছাকাছি। সরকারী পর্য্যায়েও খুবই দহরম মহরম। সংবাদ মাধ্যম এবং সরকারী-বেসরকারী সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি তো ওপার বাংলার মানুষদের নিয়ে কত রকমই না নাচানাচি করছে। কিন্তু এপার বাংলার লোকেদের প্রতি একবার ফিরেও তাকাতে দেখিনা কাউকেই। এ যেন ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন। ঘরের মানুষগুলো যে একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে; তাদেরও যে একটু তুলে ধরা প্রয়োজন এ সত্যিটা উপলব্ধি না করলে, আখেরে লাভ খুব একটা হবে না এপার বাংলার সমগ্র মানুষের।

সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মত নিম্ন তলের মানুষ নয়। সরকারী তরফ থেকে তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিবার ব্যবস্থা হয়নি ঠিকই; কিন্তু তাদের ছিল বা আছে মজবুত অর্থনৈতিক অবস্থা। বাদশাহী আমল থেকেই তাদের তা আছে। উপরক্ত ব্যবসা বাণিজ্যের উপরও নির্ভরশীল তাদের অর্থনীতি। কারণ বাঙালার মুসলমানদের মত তারা দরিদ্র নয়। এছাড়াও বিভিন্ন পেশায় তারা নিয়োজিত। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থানের আজমীড়, কেরল, কর্ণাটক বিভিন্ন স্থানের মুসলমানের শিক্ষা সংস্কৃতিও; অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বাঙালী মুসলমানের থেকে অনেক উন্নত।

সুব্রত সরকারের কবিতাগুচ্ছ

রুটি, কাপড়া আউর মকান...

প্রতিটি প্রাণের জন্যে ন্যূনতম আহার ও জরুরী প্রয়োজন যতক্ষণ নেই, এ অক্ষমতার কোন ক্ষমা হয় না প্রভু দিবাবসানে। না পারলে ধনী ও দরিদ্রের তরে আনুপাতিক মৃত্যু ঘোষণা কর গাছে ও লতায়, গ্রহের ফের বললে মানবো কেন মেরা ভাইজান? তারোপরে গ্রামের সবুজ, হাই-ব্রাউ লোক, ভোগ ও তোপধ্বনি তা না হলে নিপাত যাও, কাউকে মানুষ বলবো না আমি!

কোরাণ শরীফ আদি গ্রন্থ যত...

কিন্তু গ্রন্থে আছে, এই যে অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে—যাঁদের রক্ত সহস্র বছর ধরে তাঁর বীজ থেকে সরাসরি প্রবাহিত তাঁদের দোষ অর্শাবে না, তাঁর লীলা পূর্ব থেকে কে বুঝিতে পারে হায়, আর রমণী তো নরকের দ্বার, তুমি যৌনকীট হয়ে ঢুকে কত কষ্ট পেয়েছো মনে কর, আর বড়-মাছ ছোট-মাছ খেয়ে বেঁচে থাকবে এও কি বিধান নয় বলতে চাও অগ্রজ-পুত্র? ওদিকে পোকা-কাটা শরীরে, এ দেহ-মন্দিরে তিনি রয়েছেন যখন, কি দিয়ে তাঁর পুজো হবে? আচমনের পরিশ্রুত জলটুকুও ঘরে নেই দোল-পূর্ণিমার নিশি, নির্মল বাতাস কিছুই রাখোনি অবশিষ্ট। ও, তোমার এ স্বর্গীয় ভাষা পড়বার অধিকার আছে না নেই সেইকথাও পূর্ব থেকে লেখা আছে কি করে, যিনি সন্দিহান, যুক্তির শয়তান এসে যাঁর মাথাটি খেয়েছে, তিনি গলা তুলে কি কথা বলবেন? বিশ্বাসে মিলায় যা তর্কে বহুদূর...

এক জনগণেশের মূর্তি...

তবে যে সকলে বলে নব-কলেবরে গণতন্ত্র অপূর্ব মেসিন-কল প্রতিটি শস্যের দানার সম-ব্যবহারে প্রস্তুত অশ্বশক্তি। যখন ভোটবাক্স স্ফীত হয়ে

ওঠে মধ্য-দুপুরে, এই মন্ত্রী, এই সমবায়, এইভাবে তাঁর কনভয় ছুটে যাচ্ছে ক্ষমতার রশ্মি মুঠোয় নিতে পিছনে পড়ে রইল পার্টিজান, সাইকেলের সরু রডে বসে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল গোপন মিটিঙে টর্চ ফেলে রাতে, টি. ভি.-র পর্দায় কাল ভেসে উঠবেন হাতির মাথায় চন্দ্রকোনা হয়ে আহা তিনি আমাদের লোক, কতকাল দুঃখ সয়েছেন নিম্নভূমিতে ফসলের আশিস নিয়ে, ঋতুর পরামর্শ নিয়ে, কষ্টের অন্ধকার থেকে তিনি শহরে গিয়েছেন, আমাদের ছোট গলি, কৃষিঋণ, মাঠের হাওয়া, কার্তিকের হিম তাঁকে রক্ষা করবে কু থেকে, গরীব-মায়ের এত উপবাস মিথ্যা হতে পারে? ছাগল-চরানো ও ঘুঁটে বিক্রির নোট? কিন্তু পেরিস্কোপ বা মেটাল-ডিটেক্টরের সাহায্য নিয়ে, শক্তিশালী রেডিও-তরঙ্গ ব্যবহার করেও টের পেলাম না গণতন্ত্র কোথায়? জল-স্থল-অন্তরীক্ষে, হোটেলে, নাচঘরে, পুলিশের উর্দির ভিতরে—অথবা কোথাও কিছু নেই, একদা হয়তো এক মায়াময় বিমান উড়ে গেছে, তার পদচিহ্ন দেখে সারি সারি বিমূর্ত কল্পনা জেগে ওঠে, গণতন্ত্রে কি আছে যাদু, যত মাটি তত টাকা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন কেন হয়, যেমন অজন্তায় এক নির্জন গুহাচিত্রের সামনে হঠাৎ মনে হয়েছিল এইমাত্র শূদ্রক ছবি এঁকে পান খেতে গিয়েছেন যদিও ছবিতে ঝুল, খস-পলেস্তারা, জন্তুর নখের চিহ্ন,···অথবা প্রসাধন-রতা নারী কি ভেবে কাঁচুলি খুলে পাথর-চিত্র থেকে খস্ খস্ শব্দে নেমে আসছেন, কপালে স্বেদ-রেখা, পদ্ম করতলে, আমার কি পতন হতো না?

ইয়োর অনার, মী লর্ড···

তারপরে বিচার-ব্যবস্থা আছে, লাল-শালু মোড়া কলির ধর্মাবতার তাঁর কাছে যেতে হলে ডেমি-কাগজের সিঁড়ি, স্ট্যাম্পের বাঁক, আইনের নৈঃশব্দ, ধারা ও দর্শনী, কাগজের গোপন মুদ্রা দিতে হয়। মনে করি পৌঁছোলাম, কুয়াশা, জঙ্গল, চোরা-পাহাড় এড়িয়ে কুমীর-শিকারী ও মধু-সংগ্রহকারীদের হাত ধরে, বাদার নৌকো থেকে চিতল হরিণের ডাক, আকাশ ও মৃত্তিকা যেখানে শেষ, তারপরে জল শুরু হয়েছে, কাঁকড়ার শিশুরা এসে গোধুলির আলো মাখে, হয়তো স্টেটমেণ্ট শুনে তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল তিনি কি সেই জলে লিখতে পারবেন-ধর্মের কল নড়ে···তিনি কি এতই ফ্রি? কিন্তু তা প্রকাশ করার আগেই জল বাষ্প হয়ে উবে যাবে কি না এ গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে? শুধু তর্কের খাতিরে তাও মেনে নিলে এই ভয় হাতে

করে কি হবে আমার? যদি হৃদয়ে শান্তি নেই, মনে করি অন্যদিক থেকে অন্য আলো এসে এক জ্যোতির্ময় ছোঁয়া দিয়ে গেল আপন অন্তরলোকে, তারপর, জয়-পরাজয়, কর্ম, নমুনা, স্মৃতি, এ দেহ রেখে কোথায় যেতে হবে? সেখানে শ্মশান থেকে বৈতরণীর ঘাটে একটি মাত্র কানাকড়ি সম্বল তবে এত কাটা-ছেঁড়া, দখল ও দাঙ্গা, হৈ চৈ, কালি ও কাগজ অপচয় করে, ধুলোয় মাথাটি বিসর্জন দিয়ে কি হল আমার প্রিয় কমরেড, তবে কেন একটি গৃহের ডাকে জননীর জঠর থেকে বেরিয়ে এসেছি?

মহাপ্রস্থানের পথে…

সেখানে কি আছে, কি নেই, নৌ-চালনার বিদ্যা, কম্পাস-পঠন এই মানবীয় বোধ নিয়ে দেখা দেবো সেই নক্ষত্র পারের সঙ্গে? যদি কিছুই না পারি, অথবা শিক্ষা ও প্রতিভার প্রদর্শনে আমার যে বারবার পরাজয় হয়েছে কেউ যদি আগে থেকে এ কথা রটিয়ে দেয়? তবে কি ভাবে আবার ঘর বাঁধবো, একটি তারার চিহ্ন দেখে বাড়ি ফিরে আসবার পথে কোনদিন ফুল, কোনদিন পাখি, কোনদিন রঙিন সাহারা গাছ হয়ে মজা করবার উল্লাস কি করে এ শরীরে আর বহন করে নিয়ে যাবো, যখন বায়ু, আগুন, জল, মাটি, শূন্য হয়ে গেছি, আমি তো কোথাও নেই, শুধু এক মহাকাল ত্রিপলের মত ছেয়ে আছে নভোলোকে উপমা হিসাবে পৃথিবীর দু'টি ঘুঘু চরতে নেমেছে ক্ষণিক এই দৃশ্য, এই কুশীলব, বারবার অভিনীত হবে কাব্যের সরণী তীরে। তবে কি এই বৃত্তের কোথাও একটি মূল ছিদ্র রয়ে গেছে চুপি চুপি? আমি খড়ের জন্তু হয়ে খুঁজি, চিত্র ও সঙ্গীতে, মাঠ-কুড়ানীদের দেখে কৌশল শিখেছি, আর পৃথিবীর অসীম প্রবাহে ভাসি যেন তারা, যেন কচুরীর ফুল, না এখনও তাঁকে আমি পাইনি।

পলাশ ও কিশোরী

রাণা চট্টোপাধ্যায়

একেক দিন মন খারাপ থাকে, সকাল, দুপুর সন্ধেয়
মন ভাল হতে চায় না
অথচ পলাশ গাছের লাল শূন্যতা আর ফাঁকা মাঠের
ভেতর দিয়ে মহিষবাথানের দিকে যাওয়ার সময়
মন খুব শান্ত ও নির্জন ছিল।
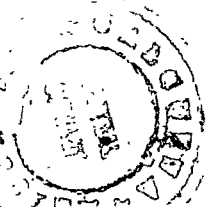
পাটালী গুড় কেনার সময় একটা হাটে
একজন অপরিচিতা কিশোরীর সদ্যস্নাত স্তনের দিকে তাকিয়ে
কোন খারাপ চিন্তা মনে এলো না
মন ভাল হয়ে গেল টকটকে লাল পলাশের মতোন !

তবে কি মন নির্জনতা ও বিস্তীর্ণ মাঠের শূন্যতা চায় ?
একেক দিন মন খারাপ থাকে অকারণ,
যখন মন ভাল করতে অপরিচিতা কোন কিশোরীর
নগ্ন পলাশরাঙা শরীরের দিকে তাকিয়ে
আবার হেঁটে যাব মন ভাল করার দিকে।

রাস্তা

স্বরজিৎ ঘোষ

অদ্ভুত রাস্তা ছিল আজ সন্ধ্যায়। সারাক্ষণ চাঁদ ছিল আমাদের পেছন পেছন। সামনে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখতে পাচ্ছিলাম অজস্র পোকা উড়ে উড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কাচের উপর। পাশে মাঠের মধ্যে বুড়ির ঘর জ্বালিয়েছে কারা যেন। আগুনের ফুলকি আর খড় উঠছে ছিটকে ছিটকে। কাল দোল। চাঁদের আলো আর রঙ মিশে আছে পরতে পরতে।

হরিণঘাটার ডাকবাংলোয় আজ আর কেউ বেড়াতে আসবে না। একা একা জ্বলতে জ্বলতে এক সময় চাঁদও ফ্যাকাশে হয়ে পড়বে। শুধু আগুনের ফুল আর খড়ের ফুলকি জুড়োলে যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম সন্ধ্যায়, সারারাত অন্ধকার সাপের মতো পড়ে থাকবে।

মোসাহেব

ব্রত চক্রবর্তী

সে তার ব্যক্তিনাম ভুলে গেছে।

চিরুণী-তল্লাশ করে পুলিশ যেমন
অপরাধীকে খোঁজে,
শহর তোলপাড় করে সেই একইভাবে সে
চোরা চোখ, ছুঁচলো মুখ আর প্রগল্ভ জিভ
হুবহু তারই মতো কাউকে খুঁজে বেড়ায়।

ডানহাতের তালু বাঁ-হাতে ঘষতে ঘষতে
তার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে,
দেবতার পুষ্পাঞ্জলির ফুল
প্রায়ই তার হাতে এখন
দলিতমথিত হয়ে যায়।

দুঃখ আছে বলে

নীরদ রায়

দুঃখ আছে বলে রাত বারোটায় ক্ষয়ের ভাণ্ডার থেকে
নিমগাছের ডালে উঠে আসে চাঁদ, কৃষ্ণনগরের কীর্তি নয়
কিন্তু অবিকল সেই রকম ধুলট আলাপের কিছু ভগ্নাংশ,
মরচে-পড়া পায়ের চিহ্ন হাওয়াকে জাপটে ধরে,
কানে কানে বলে, কথা আছে—,
দুঃখ আছে বলে সর্বনাশের গায়ে ধাক্কা খেয়েও
মুচকি হাসে শ্যাওলা নদী, জরীপের ধানখেত, স্নেহহীন দুএকটি
উচ্চাশার চকিত চাহনি, সীমাহীন দিন,
দুঃখ আছে বলে, নীলিমা আছে, শিকড়ে মেঘলা আকাশ ডাকে
হাওয়া দিল, জল দিল—,
দুঃখ আছে বলে······

শরীর ও শূন্যতার হাত-পা

সোমক দাস

শূন্যের ভিতরে তুমি আগুন ও বিচ্ছুরিত আলো
রাজপথ দাঁত দিয়ে খুঁড়ে আমি সুড়ঙ্গ করেছি
দৃশ্যতঃ পূর্ণের মধ্যে পথ পেয়ে যেতে যদি পারি
ক্ষণ জাগরণময় সেইসব বিচ্ছুরণ দেশে······
দাবানলে সব জ্বলে গেল।

অশ্রু হয়ে গেল দেখি প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের জ্বালা
নাক কান মাথা চোখ, বুক বা হৃদয়, শিশ্নোদর
সব, অশ্রু হয়ে গেল।
নিভে গেল দীর্ঘ দাবানল।
ঘাস দেখি, আকাশ ও পাখিদের, উদ্ভিদের
পোড়া প্রতিবাদ, জলে যাওয়া জন্তুদের আর্ত চিৎকার
শুনি চারপাশে। তুমি এসেছিলে ?

ভোর

নন্দদুলাল আচার্য

আমাদের গাভীগুলি চুরি করে নিয়ে গেছে পনি
গ্রামগুলি তাই অন্ধকার।
সমস্ত মৃত্তিকা জুড়ে কালো তাঁবু ফেলেছে আকাশ
বৈশ্যের নিষ্ঠুর কালো চেটে খায়
আমাদের রক্ত আর হাড়
পাহাড়ে জঙ্গলে জলে সমতলে উপত্যকায়
মানুষ আচ্ছন্ন ঘুমে
আমাদের জাগরণ চাই।

মর্মে তবে ডাক দাও তদ্গত ঋত্বিক
দশদিক তোলপাড় করে খোঁজ তুমি
হে দেবকুক্কুরী।

সে জিতেছে দীর্ঘকাল।
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শেষে আজ তার পরাজয় হোক
দুর্গপতনের শব্দে কাঁপুক আকাশ
উর্মিল ঘোড়ায় চেপে এসো
মেঘ অপাবৃত করো
হে অর্যমা,
তমোঘ্নকুমার,
আলো রাঙা ভোরের কল্লোল।

শীর্ষ সম্মেলন

অজিত বাইরী

শীর্ষ সম্মেলন শেষে নিবিড় করমর্দনে
দুই রাষ্ট্রপ্রধান
বিশ্বকে উপহার দিলেন কূটনৈতিক হাসি।

বাতাসে পাল্টি খেয়ে
একটা লট্‌কা পায়রা
আকাশে উঠে গেল।

শান্তির আফিমের ঘোরে
যখন বুঁদ হয়ে রইলো বিশ্ব
পারমানবিক বোমায় তা দিতে দিতে
দুই রাষ্ট্রপ্রধান
হেসে উঠলেন অট্টহাসি।

আর ঠিক তখনই
তৃতীয় বিশ্বের ঘুমন্ত শিশুরা
তরাসে জেগে উঠে
মায়েদের গলা জড়িয়ে
কান্না জুড়ে দিলো ঃ
খিদে পেয়েছে, খিদে পেয়েছে।

সংক্রমণ

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

কেন এত শব্দ করে হেসে উঠল
ভিখিরি বালক ?
যখন তুলকালাম পুড়ে যাচ্ছে দশদিক, ধোঁয়া…
জলে ও মাটিতে সংস্রব ছাড়াই ফুল
কেঁপে কেঁপে উঠছে ভীষণ।
বিন্যাস ভেঙে কি তবে যেতে হবে অন্য কোথাও !
অন্তরীক্ষ থেকে আরো দূরে…
বায়ুমণ্ডলে ?

চক্রে পিশাচ;
কানে লাল ফুল: দোনলা বন্দুক ডান হাতে।
ভয়ার্ত পাখিগুলি নিঃশব্দ
পাতাহীন গাছে;
শ্মশানে শেয়াল নেই; ছেঁড়া স্বপ্নের জামা—
এলোমেলো উড়ছে হাওয়ায়;
এমন সংক্রামক আগুনের কবল এড়িয়ে
ভিখিরি বালক যে কি করে হেসে উঠলো
আজ?

এখন সময়

নীতিশ চৌধুরী

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে জেনে নিতে হবে
এখন সময়
দিন নাকি রাত,
কোনটা তোমার—যুদ্ধ অথবা বিশ্রাম।

আগোছালো জীবনের বুকে আজ কৃত্রিম আলো
ওৎ পেতে আছে,
আলেয়া লক্ষ্য করে জীবনযাত্রা গতিশীল।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে চিনে নিতে হয়
এখন সময়
প্রেমিকার নাকি যোদ্ধার?

ঢেউ

পার্থ বসু

যাক পুড়ে যাক দুর্বিনীত স্বস্তিবিহীন
নির্বিরতি ব্যক্তিগত সুখের মোহ,
যাক পুড়ে যাক আত্মরতি, বহুব্রীহি,
ঊর্ণনাভ স্বপ্নবিলাস, ছদ্মমুখোশ, ভদ্রপোশাক,
যাক খসে যাক।

পোড়াক দেহ উলঙ্গ রোদ, শরীর আতপ
হোক না হবে ধারাস্নাত বর্ষণেও,
এবং শীতে রক্ত জমুক, রক্তে কি কাজ
রক্তে যদি ঢেউ না ওঠে ?

রক্তে যদি ঢেউ না ওঠে
যতই রাগো
নীরক্ত ঠোঁট, ঠোঁট না কাগজ,
কাগজ খালি।

বিবর্ণ সব শব্দ খুঁটে শালিক শালিক
এবার জাগর শব্দমালায় আলাপচারী
হোক শুরু হোক,
এবার তুফান, এবার নারী
তোমার কাছে পৌঁছে যাওয়ার
রোমাঞ্চময়
টুকরো কুহক, খোলস ছাড়ার
এই তো সময় !

খুঁজতে খুঁজতে যত দূর

কবি অরুণ মিত্র শ্রদ্ধাস্পদেষু

উপাসক কর্মকার

নুড়ি পাথর সয়ানতালে খুঁজেই চলেছ
গড়ছ রাস্তা, কখনো শানবাঁধানো চাতাল
টলটলে পুকুরের

খুঁজে খুঁজে, খুঁজতে খুঁজতে যত দূরেই যাও
মেঘমেদুর রোদ্দুরে খোলা আকাশের নীচে
দিগন্তে বাতায়নে পড়ে তোমার
পূর্ণ থেকে পূর্ণতর ছায়া

ঘাড় গুঁজে ফের খুঁজে চলেছ
অবিরত অচেনা স্বরলিপির পাতায়
কি মধুর ধ্বনি বাজে হে শ্রবণে !

নুড়ি বিছানো নতুন মোরামের পথ
প্রতিদিনই ওতে চলছে, চলুক রথ।

কোথায় পৌঁছবে

নন্দিতা সেনগুপ্ত

আমাকে না বুঝে সে
কোথাও যেতে চায়।
অলীক বিভ্রমে
কোথায় পৌঁছবে।

কোথায় যেতে হবে,
জানে না, ভুল করে।
হেঁটেছে বহুকাল
নিঃস্ব অবেলায়।

কেবলি মনে মনে
ক্রুদ্ধ কশাঘাত,
নখর বেঁধে কাঁধে
ত্যক্ত শকুনির।

পাহাড়ে সানুদেশে
বৃষ্টি নেই, তাই,
দীপ্র মেঘেরাও
আবেগে ঝলকায়।

জানে না কোনপথে
সঠিক বাতিঘর,
আমাকে না বুঝে সে
কেবলি যেতে চায়।

কোথায় দাঁড়াবে?

চিন্মোহন সেহানবীশ স্মরণে

অমরেশ বসু রায়চৌধুরী

কোথায় দাঁড়াবে তুমি!
যদি কুড়ে কুড়ে খায় অজানার নিহিত যন্ত্রণা?

তত্ত্ব আর প্রয়োগের অমোঘ সংঘাতে
যদি ছিঁড়ে যেতে চায় নাড়ির বন্ধন—
কোনখানে নিশ্চিত আশ্রয়?

পাল ছেঁড়া দিগভ্রান্ত নৌকার মত
যদি পাক খেতে থাকো জীবনের স্রোতের নাভিতে—
কোনখানে নোঙর-নিশানা?

কালস্রোতে ভেসে গেলে পোতাশ্রয়
কোথায় দাঁড়াবে?

হাড়হাভাতের বাবা

অলক সোমচৌধুরী

ওরা আসে। নিশুতি রাতে কাঁচের ঠুলি পরানো লণ্ঠনের আগুন উস্কে হোগলা জড়ানো শরীরটা বাঁশের লম্বা খেটোয় ঝুলিয়ে কদম কদম আসে। সীমান্তে বান্ধব গাঁ, তারপর আমোদপুর, আমোদপুর পেরিয়ে সুলতানগঞ্জ হয়ে বাতাসপুর। বাতাসপুরের শেষ সীমানায় বিশ্রামতলায় লাশটা নামায়। জিরোয় খানিকটা। গঙ্গা আরও তিনক্রোশ।

বাতাসপুরে ভোলার ঠেকে খবর গেছে। খবর করেছে গদাই। দয়া ঘরুই রেডি আছে নির্ঘাৎ। ঘরুই জানে আজ রাত্তিরে মাল নামবেই।

নায়েক লণ্ঠনের আলোটা নিভিয়ে দেয়। খেটোর এক মুড়োয় কাঁধ রাখে ভীম আর মুড়োয় গদাই। গঙ্গাটাকে ডাইনে ফেলে ওরা দ্রুত দৌড়ে বাঁধের বালিয়াড়ি বরাবর নেমে যায়।

ডান দিকে উঁচু বাঁধ, বাঁয়ে ছড়ানো বিস্তর বালিয়াড়ি। বালিয়াড়িতে পা ডুবিয়ে হাঁটার গতি কমে। বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে বাঁ দিকে পতিত জমি খানিক, খেজুর আর বেতের উটকো ঝাড়। পায়ে হাঁটা পথ আছে চিলতে। এমন পথে লাশ টানা কষ্টের। কাঁটার আঁচড়ে ধুতির খোঁট ফালাফালা হয়, গতরে রক্ত ঝরে। পথের শেষমুখে উপুড় হওয়া ধু ধু জমি, ফাঁসির চর।

ফাঁসির চরের ইঞ্চিটাক জমিরও মাপজোক মুখস্থ নায়েকের। ফাঁসির চরে পা ফেলে মুখ দিয়ে হুম হাম শব্দ টানে ভীম। চলার গতি বাড়ে এবার, লাশটার শরীর ডাইনে বাঁয়ে ক্রমাগত দুলতে থাকে। চরের কান বরাবর এগিয়ে এসে ওরা থামে। লাশটা নামায়। মাটিতে জেবড়ে বসে আয়েস করে তিনজন। নায়েক কৌটো খুলে বিড়ি বাটে ভীমদের।

হাতের আড়ালে বাতাস সইয়ে নায়েক লণ্ঠন জ্বালে। বাকি দুজনে জিম্মাদারী নেয় মালের। ফাঁসির চরে শেয়াল কুকুরের দাঁত শুয়োরপানা। নায়েক ধুতির খোঁটে লণ্ঠন আগলে হাঁটে। সাপ-খোপের ভয় আছে। দশ

মিনিট তক হাঁটলে ঘরুইয়ের ঠেক। সর্টকাট রাস্তাটা সড়গড় নায়েকের। মায় খানা-খন্দ, ঢিবি।

ঘরুই বলে—কে?

নায়েক বলে—আমোদপুরের নায়েক!

ঘরুই বেরিয়ে আসে। হাঁটু অব্দি গোটানো প্যান্ট, উদোম গা ঘরুইয়ের। ঘরুই এক লহমায় জরিপ করে নায়েকের মুখ।

নায়েক অন্ধকারে দাঁত মেলে হাসে। বলে—ঘাবড়াও ক্যান, ঘরুই! মাল ফ্রেশ, কাটা ফাটা নাই। জলে ডোবা কেস, সুইসাইড।

ঘরুই বলে—মেয়েছেলে?

নায়েক ঘাড় নাড়ে।—আইজ্ঞে। পঁচিশ তিরিশ মাত্তর! পাঁচের বেশী হাইট, বুকের ছাতি আছে, হাড্ডি মোটা।

ঘরুই বলে—হুঁঃ! তোমারে বিশ্বেস কম, নায়েক। তুমি ফল্স্ মারো। গেলমাসের সুলতানগঞ্জের মালটা বুড়া ছিল, হাড্ডিতে ঘুণ। পাছার হাড়ে চিড়। মহাজন হাতুড়ি মারে হাড্ডিতে, বুঝলা? শব্দ শোনে। একশটা টাকা বরবাদ।

নায়েক রা কাড়ে না। ফ্রেশ মালের বড় আক্রা। ঘরুই বোঝে না।

লণ্ঠনের আলো এগিয়ে আসতেই ওরা উঠে দাঁড়ায়। ভীম পটাপট দড়ির বাঁধন খোলে। হোগলা সমেত মালটা কেতরে পড়ে মাটিতে। গদাই হোগলাটা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিতেই মালটা গড়িয়ে যায়।

ঘরুই গলা উঁচিয়ে গাল পাড়ে—শালা বেজম্মা! হাড়ে চিড় ধরলে একশ দু'শ জলে, মটকালে বিনিমাগনায়ও ছোঁবে না মহাজন।

নায়েক উবু হয়ে গায়ের আবরণটা খুলে নেয় লাশের। শরীরটাকে চিৎ করে। ঢাউস পেট। ভীম দু'পা টেনেটুনে সোজা করে দেয়। ঘরুই উবু হয়ে বসে। মালের আপাদমস্তক দেখে। নায়েক মিথ্যে বলে নি। ছাতিটা দশাসই, হাড্ডি মোটা। ঘরুই পকেট থেকে ফিতেটা বের করে। কপাল বরাবর ফিতের মাপ নজর রাখে ঘরুই। পাঁচ দুই। নায়েকও স্বীকার হয়, পাক্কা। ঘরুইয়ের আপশোষ। এই গতর যদি পাঁচ নয় ছুঁতো, সোনার দর দিত মহাজন।

ফাঁসির চরে মাটির চাপ পলকা। মাটি ঝুরঝুরে। ঐই মাটি শরীরের

মাংস পচিয়ে দেয় দ্রুত। হাড় মাস আলগা হয়। একুশ দিনে সাদা ফকফকে হাড়ের কাঠামো বেরিয়ে আসে। তারপরে মাল খালাস করে ধুয়ে পাকলে মহাজনের গদ্দিতে পৌঁছে দাও। ভোলা ওস্তাদ আছে। রিক্সাভ্যান ভোলার। ডেলিভারির সময় ঘরুই ঠিক হাজির।

ভীম দ্রুত একমানুষ গভীর গাড্ডাটা খুঁড়ে ফেলে। কোদাল মজুত ঘরুইয়ের। তিনজনে ধরাধরি করে লাশটাকে নামিয়ে দেয় গাড্ডায়। শরীরের ওপর পাতাপুতি বিছোয়। তারপর ঝুরঝুরে মাটি দুই হাতে পায়ে ভাঙতে থাকে।

দু'হাত ঝেড়ে একটা বিড়ি ধরায় নায়েক। বিড়ি বাটে ভীমকে, গদাইকে। তারপর হাতের চেটো মেলে ধরে ঘরুইয়ের সামনে। তিনখানা বড় নোট টুপ করে ফেলে দেয় ঘরুই। নায়েক কাতরায়।—পাঁচ দুই, হাড্ডি মোটা, কাটা ফাটা নাই ; আর একশ, ঘরুই !

ঘরুই বলে—জবান। পাঁচের ওপর হাইট, হাড্ডি মোটা, টুটাফাটা নাই, মেয়েছেলে—তিনশ। পুরুষ হলে চারশ নেট। মেয়েমানুষের হাড্ডির আয়ু পঁচিশ বছর রে শালা, তারপর ঘুণ ধরে।

নায়েক কথা বাড়ায় না। ঘরুই তো মহাজন বই না। মাল বয়ে এনে ফাঁসির চরে নামিয়ে দিলেই খালাস নায়েক। ঘরুইয়ের জিম্মাদারি কত! ফাঁসির চরে লাশ বুকে নিয়ে বিশ বাইশটা দিন বসে থাকো। তারপর মাল খালাস। ধোয়ানো পাকলানো, সাফ সুরত। নিশিকালে রিক্সাভ্যানে মাল তুলে বড় মহাজনের গদ্দিতে পৌঁছে দাও। টুটা ফাটা বেরুলো কি মাথায় হাত, ঘরুইয়ের গচ্চা। এক আধলাও ছোঁয়াবে না বড় মহাজন।

তা ফাঁসির চরে মাল নামানোও কি ঝকমারি কম! ঝকমারি বাড়ছে দিনকে দিন। কলেরা টলেরায় আজকাল আর আগের মতো মরে না পটাপট। দু'চার দফা ভেদবমি হলো কি রিক্সাভ্যানে চাপিয়ে উস্তির হাসপাতালে ছোটে। যেগুলো ফিরলো দিব্যি হেলতে দুলতে, যেগুলো গেল তো গেল, আর এ মুখো না। উস্তির গায়ের বগলে শ্মশান আছে, বেফয়দা জলে পুড়ে ছাই হলো সেখানেই। সাপে কাটা আর ফলিডলই ভরসা এখন। দাপাতে দাপাতে মুখে গাঁজলা তুলে চিত্তির।

তাও কি জোটে সব! হ্যাংলাপনা হাজারো। যাদের বিঘে দুই ক্ষেতি জমি কি দুধেল গাই আছে একটা, লোকবল আছে, কোমরে গামছা বেঁধে রেডি। কি, না শ্মশানবন্ধু হবে। ভালোবাসার মানুষের পোড়ামুখ দেখবে।

দেখেও। এক্ষেত্রে নায়েকের করার কিছু নেই। বেফায়দা ফিনিশ হয় পাঁচের ওপরে হাইট তরতাজা হাড়ের কাঠামো। আর বুড়োহাবড়া ও অল্পবয়সী কচি শরীরের দিকে তেমন হাত বাড়ায় না নায়েক। বাজার নেই। দর দেয় না ঘরুই।

অতএব তক্কে তক্কে থাকা। বান্ধবগাঁ, আমোদপুর, সুলতানগঞ্জ কিংবা বাতাসপুরে কোন্ হাভাতের ঘরে নায়েকের শিকেটা ছিঁড়লো। দু'চার ফোটা চোখের জল ফেলো। চোখ মুছে কানকি মেরে মেপে নাও লাশের শরীর। বুকের পাটাটা দেখ, পায়ের গোছ, কব্জির বেড়, কোমরের ভাঁজ। হা-হুতাশ করো। তুমি কে হে পরিজন, অচেনা মানুষ? আহা। আমোদ পুরের নায়েক গো, বান্ধবগাঁয়ের গদাই কিংবা সুলতানগঞ্জের ভীম। বড় আশনাই ছিল গো, বিড়িটা তামাকটা আদান-প্রদান ছিল। বড় ভালোমানুষ ছিল। আর মেয়েমানুষের বেলায় কায়দা কানুন এক, শুধু বক্তিমের রকমফের।

মড়া আগলে কাঁদে কোন আহাম্মক! বেশ রসিয়ে দশ ক্রোশ দূরে গঙ্গার চরে ফেলে কাঠে-বাঁশে জ্বালাও, অস্থি দাও গঙ্গায়। এভাবেই তো স্বর্গযাত্রা! কিন্তু সারা রাত লাশ বয়ে মরে কোন্ শালা! বাড়িতে জোয়ান পুরুষ নৈব। তাতে কি! আমোদপুরের নায়েক আছে, সুলতানগঞ্জের ভীম, বান্ধবগাঁর গদাই। বড় আশনাই ছিল মৃতের সঙ্গে। মড়া তো আর বাসী হতে পারে না! জ্বালানীর খরচ ছাড়ো, ডোমের মজুরী, ঘাটবাবুর দক্ষিণা। ব্যস, লাশ কাঁধে তুলে হাঁটা ধরবে নায়েক। কাঁদুক পেছনে বাপ ভাই। কেঁদে কেটে হাল্কা হোক। মড়ার সঙ্গে পিরিত কীসের!

এমন মওকা কালেভদ্রে জোটে। মাসে বড়জোর চার কি ছ'টা। সেরা মওকা জুটেছিল গেল সনে। আমোদপুরেই। রসুলমিঞার ব্যাটা ফকির, অ্যাইসা জোয়ান। দশাসই। বৃষ্টিতে মাঠঘাট ভাসো ভাসো, মাখনের মতো নরম মাঠ, লাঙল চেপে হুঁশহুঁশ মাঠ জুড়ে ফকির। ছিল বেটি ঘাপটি মেরে আলের কানাচে। মারবি তো মার উরুর নিচে। অতবড় দশাসই শরীরটা মুহূর্তেই অসাড়। নায়েক কাছে পিঠেই ছিল। এমনকি ভীমটাও দখল নিল শরীরের। মিঞার আর ছেলেরা ঘরে দোরে ছিল না কেউ। শুধু মেয়ে-মানুষগুলোর বুক চাপড়ানি বেদম। আধঘণ্টার মধ্যেই ভোলার ভ্যানে বডি চাপিয়ে হাওয়া।

ঘরুই দর দিয়েছিল ভালোই। পাকা ছয় ফুট। একশ টাকা উপরি।

অমন মওকা আর মিললো না নায়েকের। অবশ্য মিঞার ছেলেপুলেরা তড়পে ছিল খুব। বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল ভীমের। সুলতানগঞ্জের কবরখানার একটা কাঁচা ঢিবি দেখিয়ে দিয়েছিল নায়েক। কবরখানার মোল্লা অবশ্য দাঁও মেরেছিল পঞ্চাশ।

নায়েক বলে—চলি গো ঘরুই, রাত কাবার।

ঘরুই বলে—মহাজনের অর্ডার অঢেল, নায়েক। মাল ফেলো। রোজ না পারো, একদিন বাদ। বাজার চড়া।

নায়েক হাসে। সার কথাটা বোঝে নায়েক। কিন্তু মালের যে খামতি! লণ্ঠন উসকে ধুতির খোঁটে আড়াল করে। খেটো বাঁশ, হোগলা, দড়িদড়া তুলে নেয় ভীম। তারপর ফাঁসির চরের কোণা বরাবর হাঁটতে থাকে।

তিনটে মানুষ ক্রমশ ছোটো হতে হতে মিলিয়ে যায় বাঁধের আড়ালে।

দুই

ফাঁসির চরে তিনটে মাল মজুত আছে। পরশু রাতে মহাজনের গদিতে একটার ডেলিভারি। ঘরুই হিসেব কষে। মহাজনের তাগাদা কড়া। একটা মালে গোসা হবে। শীতের শেষে বাজার এখন মরা। মহাজন বোঝে না।

সাত সকালে বিছানা ছাড়ার অভ্যেস নেই ঘরুইয়ের। সকালটা পাকলে খামার বাড়িতে একবার ঢোকে। খামারে মুরগী শ'দুই, ছানা পোনা শত-খানেক। দেখভালের দিনমানের বাঁধা মরদ আছে দু'টো। মাসে একদিন ডাক্তার আসে, সুঁই দেয়। রবিবার আমোদপুরের হাট থেকে পাইকের এসে মাল তুলে নেয়। খামার নিয়ে ঘরুইয়ের মাথা-ব্যথা কম।

ঘরুই জালে ঘেরা ঘরগুলোয় উঁকি মেরে কিলবিলে ছানাগুলোকে দেখে। বিলকুল পোনা। হাড়ে রস জমেনি এখনও। দেড় দু'মাসে ঝাড়া দেবে। তারপরে পাইকেরের হাতে। ছালটা শুধু বরবাদ হয়, বাকিটা শাঁস। হাড় মাস একাকার।

বাঁধা মেয়েমানুষটা কুয়ো ছেঁচে জল তোলে। ঘর দোর সাফ করে। খাবার পাকায়। বাপের কাথা কানি ধোয়, বাপরে খাওয়ায়। বাপের ঘরে ঢোকার কথায় প্রথম প্রথম ঘাড় গোঁজ করতো মেয়েমানুষটা। ঘাড় এখন নরম। ঘরুই-এর হাসি পায়। সব শালীরই এক রা। পাঞ্জায় না হয় তো দয়লা, না হয় পাত্তি ছাড়ো। সব ঠিক হ্যায়। বাপ সার কথা শিখিয়েছিল বটে!

ঘরুই তারপর খামার ঘুরে বাপের ঘরে ঢোকে। বাপ শুয়ে থাকে। নতুন কাপড়ের পট্টিতে দু'হাত জড়ানো বাপের। দু পায়ের পাতায় পট্টি। নাকটা কেমন বেঁকেচুরে এতটুকুন হয়ে গেছে বাপের। ছ'ফুটি বাপটা যেন নাদান।

ঘরুই ঢুকতেই উঠে বসে বাপ। ফোকলা দাঁতে হাসে। বলে—দয়া ?

ঘরুই বলে—ওষুধ ?

বাপ পট্টি বাঁধা দু'হাতের চেটো ওল্টায়। ওষুধ খতম।

ভোলা উকিলের হাসপাতাল থেকে ঘরুইয়ের বাপের ঘায়ের ওষুধ মাঝে-মধ্যে এনে দেয়।

বাপ বলে—কাল লাশ নামালি, দয়া ?

বাপ ঘরে শুয়ে টের পায় সব। বলে—হু।

—রাত্তিরে শেয়াল ঘোরে ফাঁসির চরে। চরের মাটির গন্ধ শোঁকে। লাশের গন্ধে পালায় রে শালারা! দু'চারটেরে খতম করে চরের ড্যাঙায় ফেলে রাখ। লাশ ছোঁবে না, হাঁ।

বিষয়টা মাথায় আছে। মাটি খুঁড়ে এক রাত্তিরে শেয়াল কুকুরে হাপিস করতে পারে একটা আস্ত লাশ। মানুষ প্রমাণ গাড্ডা খোড়া ঝকমারি। তবুও খুঁড়তে হয়। শেয়াল জাতটা ধূর্ত। নাগালে আসে না।

বাপ ডাকে—দয়া ?

ঘরুই মুখ তোলে।

—বাপকেলে কারবারটা ছাড়ান দে, দয়া। খামার বাড়ি দেখ, ক্ষেতি জমি, ফসল……

ঘরুই বলে—ধ্যুস্!

বাপ কোলকুজো বসে। মাথাটা হেলায় দু'পাশে।—পাপ রে, মাইনসের দেহ নিয়ে কারবারটা পাপ।

ঘরুই দাঁড়ায় না। বাপের এই ঘ্যানঘ্যানানি ইদানীং। হাতে পায়ের মাংসে পচন লেগেছে বাপের। ওষুধ লাগিয়ে পট্টি জড়ায় বাপ। বাঁধা মেয়েমানুষটা দেখভাল করে। রাত্তিরে নাকি ঘুম আসে না বাপের। চোখের সামনে ফাঁসির চরে কারা নাকি নেচে কুঁদে বেড়ায় সারারাত। শুকনো হাড়ের ঠোকাঠুকিতে শব্দ হয় টংটং।

ঘরুই হাসে। বাপটার ভীমরতি আছে। ফাঁসির চরে তিনটে লাশ পোঁতা আছে মাটিতে। মাংস ক্ষইয়ে সাদা ফকফকে হাড় বেরিয়ে আসবে একদিন। মাংস, ছাল-চামড়া মাটি হবে। হাড়ের কাঠামো ডেলিভারি

যাবে মহাজনের গদিতে। সেখান থেকে কলকাতা। তারপর জাহাজে চেপে ইলেত-বিলেত যাবে।

দুপুরে একথালা ভাত আর এক-মাসি মুরগীর ঝোল খায় ঘরুই। বাপের ঘরে যায় আলু-ঝোল, দু'চার টুকরো কলজে নরম। মেয়েমানুষটা রাঁধে ভালো। বিশ্রামতলার নিরাপদর দ্বিতীয় পক্ষ। ছানা-পোনা নেই। নিরাপদ টেঁসে গেছে কবে, ঘরুইয়ের ভোগে লাগে নি। মেয়েমানুষটার গতর আছে। বুকের ছাতি আছে, হাড্ডি মোটা, পাছার হাড়ে খিল। পাঁচ তিন তো নির্ঘাৎ।

দুপুরে ঘরুই একখানা ঘুম মারে জম্পেস। কোনো কোনোদিন ঘুম আসে না যখন, এপাশ ওপাশ। বাগেরহাটের মেয়েমানুষটার কথা ভাবে। বৌয়ের মতোই তো লেপ্টে ছিল বছর দেড় কি দুই। একদিন হাজার টাকা নগদ তিনখানা শাড়ি আর নাকছাবিটা নিয়ে কাটলো। বৌয়ের গতরটাও ছিল। আহা! ঘরুইয়ের বৌ! বাতাসপুরে এমন চীজ মেলে নি। চওড়া বুক, ভারি পাছা, এক চিলতে কোমর। পাঁচের ওপর হাইট।

বৌটা টিঁকলো না। দোষ না বৌয়ের। বাগেরহাটের মেয়েমানুষপট্টির সব মুখ তখন মুখস্থ ঘরুইয়ের, সব শরীর, শরীরের অন্দরে সাদা ফকফকে হাড়ের কাঠামো। দোষটা ওই। বৌটা আর বৌ থাকলো না একদিন। একখানা সাদা ফকফকে হাড়ের কাঠামো নিত্যদিন তার শরীরে ছায়ায় লেপটে থাকে। পাঁচ দুই, হাড্ডি মোটা, চওড়া ছাতি, টুটা ফাটা নাই। গা-টা কেমন ঘিনঘিনতো ঘরুইয়ের।

বাগেরহাটে তারপর একবারই গিয়েছিল। বৌটার তালাশে। পায়নি। পেলে চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় টেনে আনতো। জ্যান্ত শরীরটাকে ফাঁসির চরে একুশ দিন পুঁতে রাখতো ঘরুই। বেইমানির উশুল নিত।

দুপুরে যখন ঘুম আসে না, এপাশ ওপাশ, কোনো কোনোদিন নিরাপদর দ্বিতীয় পক্ষকে ডাকে। মেয়েমানুষটা ঘরের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ায়। বিছানা ছাড়ে না ঘরুই। মেঝেতে দাঁড়িয়েই মেয়েমানুষটা শরীর থেকে সরিয়ে দেয় কাপড়, ব্লাউজের বোতাম পটপট খোলে, সায়াটা গোল করে ছড়িয়ে দেয় পায়ের কাছে। ঘরুই কাৎ হয়ে শুয়েই হাতের ভরে মাথাটা রাখে। মেয়েমানুষটার শরীরে চোখ। ওর বুক, কোমর, নাভি, তলপেট ছুঁয়ে দৃষ্টি নামিয়ে আনে উরুতে। একটু পরেই ঘরুই দেখে মেয়েমানুষটার শরীর থেকে সবকিছু লোপাট। একটা প্রমাণ সাইজ হাড়ের কাঠামো দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরুই চেঁচিয়ে ওঠে—ভাগ্ ! তারপর শরীরটাকে উপুড় করে মুখ গোঁজে বালিশে।

নিরাপদর দ্বিতীয় পক্ষ বেরিয়ে যায়। এমন দিনে এক ডাকসাইটে মোরগ সে ঘরে নিয়ে যাবে। ঘরুইয়ের হুকুম।

ঘরুই ভাবে, বাপটা আকাট। ফাঁসির চরে রোজ রাত্তিরে হাড়ের শব্দ শোনে বাপ। অথচ মাত্র তিনটে মাল মজুত আছে চরে। নায়েক মাল না ফেললে মহাজন চটবে। কারবার লাটে। খামার বাড়ি, ক্ষেতি-জমি, ফসল···ছুঁ ! ওসবের মুখে পেচ্ছাব করে ঘরুই।

তিন

তিনটে মাল ডেলিভারী হতেই ফাঁসির চর খাঁ খাঁ। সত্যিটা ভাঙেনি মহাজনকে। এদিকে নায়েকটা হাপিস। ঘরুইয়ের মেজাজটা তাই চড়া ইদানীং।

খামার ঘুরে বেশ বেলাতে ঘরুই বাপের ঘরে ঢোকে। বাপ উঠে বসে না। জুল জুল তাকিয়ে বলে—দয়া, বাপকেলে কারবারটা······

ঘরে দুর্গন্ধ। পচা লাশের পারা। মাংসে পচন ধরেছে বাপের। মাংস খসছে। হেগে মুতে কাথাকাণি জড়িয়ে শুয়ে থাকে বাপ। নিরাপদর দ্বিতীয় পক্ষ মাল পায় ভালো। সাফ সুরত রাখে। তবুও······

দুপুর দুপুর ভোলা আসে। রিক্সা ভ্যান দোরে। ঘরুই বলে—তা লাশ পেলি ?

ভোলা ঘাড় নাড়ে। তবে নায়েক্ সুতো ছিঁড়ছে। বান্ধবর্গা আর বাতাসপুর সারাদিন টই টই। ভীম, গদাইও।

ঘরুই বলে—ভোলা রে, মহাজনের বড় তাড়া। মাল চায়। অনেক। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে······। কী যে করা !

ভোলা নিরুপায়। ফাঁসির চরে একুশ দিনের পচা লাশ সাফা করার কারিগর ভোলা। রিক্সাভ্যানে মাল তুলে গদিতে খালাস দেয়। মড়া হাতানোর কৌশলটা নেই।

বিকেল নাগাদ নায়েক আসে। ভীম আর গদাই খামার বাড়ির আবডালে লেপটে থাকে। নায়েক সরসর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাঁক মারে—ঘরুই ?

ঘরুই দেখে নায়েককে। নায়েক ঘাড় নাড়ে। বলে—সাত দিনে

তল্লাটে ছাব্বিশ সাতাইশটা টঁসলো মাইরি, বুড়োহাবড়া ছুধের পোনা বিস্তর, তবে পাঁচ সাতটা ফ্রেশ মাল ঘরুই, কিন্তুক লাগালে না। মানুষজন সাঙ্গোপাঙ্গো অঢেল, চিতেয় তুলে ছাই করে দিল।

ঘরুই দাঁতে দাঁত ঘষে। —শুয়োরের বাচ্চা!

নায়েক ভরসা জোগায়—সিজিন আসবে ঘরুই, মাল নামবে। ফাঁসির চর অকুলান হবে; একটু সবুর।

নায়েক তারপর আন কথা পাড়ে। পাঁচ সাত। আসলে এসে ঠেক খায় নায়েক—শত টাকা কর্জ দাও, ঘরুই। তিনজনা বেটে নিই। পেট তো সবুর দেয় না।

ঘরুই তেড়িয়া—ওই লাইন ছাড়ো, নায়েক। মাল ফেলো পাঁচের ওপরে যত্ত খুশি, শুধু টুটা ফাটা বাদ, বুড়োহাবড়া সব ছাড় এখন। হাতে হাতে নগদ, নইলে বাংলা বাজার দেখ।

নায়েক বেরিয়ে আসে। আকাশের পানে চায়। রোদ্দুরটা কড়া এখনও। আবডাল থেকে ভীমরা বেরিয়ে এসে নায়েকের ছ'পাশ নেয়। নায়েক ঘাড় নাড়ে।—বড্ড ঘোড়েল ওই ঘরুইয়ের পো।

বিশ্রামতলা পর্যন্ত পাশাপাশি হাঁটে তিনজন। কেউ কোনো কথা বলে না। দেশটা সত্যিসত্যিই তাহলে স্বগ্য হয়ে গেল! মানুষজন আর তেমন মরে না। ওলাওঠা হয় না দেশে। মা মনসার চ্যালারা নির্বিষ। গরীবগুর্বো মানুষগুলোও অখাদ্য কুখাদ্য গিলে কেমন তরতাজা, ডাগর। বাপ যমরাজের চোখ ছুটো কি কানা!

ঘরুইয়ের এখন সারাদিন শুয়ে বসে কাটে। সকালে খামার বাড়ির খাঁচায় নিয়মমাফিক চোখ বোলায় একবার। বাঁধা মরদ ছুটোকে ধমকায়। বাপের ঘরে ঢোকে। গন্ধে গা ঘুলোয় ঘরুইয়ের। বাপ প্রায় বেহুঁশ থাকে সারাদিন।

ভোলা আসে ধান্দায়। ছ'দশটা টাকা কর্জ চায়। ঘরুই বাংলা বাজার দেখায় ভোলাকে। মহাজনের চামচার মুখোমুখি মুখ খোলে ঘরুই। ফাঁকা ব্যালা নেয়। —দর চড়াতে বল্ রে ব্যাটা মহাজনরে। বাজার দর চড়া, বিলেতে সাপ্লাই। বরাবর ফয়সলা দেখ, মাল যাবে। স্টক ম্যালাই। কিন্তু মহাজনের গদির পথ মাড়ায় না ঘরুই। ফাঁসির চরে এখন রাত বিরেতে একটাও শেয়াল নেই।

চার

দরজায় শব্দ হয়। ঘরুই হাঁকে—কে?

—নায়েক গো! আমোদপুরের নায়েক।

ঘরুই প্যাণ্টটা গুটিয়ে নেয় হাঁটু অব্দি। ফিতেটা পকেটে রাখে।

লণ্ঠনের পলতে উসকে আগে আগে নায়েক। ঘরুই বলে—ব্যাটাছেলে?

নায়েক ঘাড় নাড়ে। —তবে পাঁচের কম না ঘরুই, মা কালীর কিরা। রোগেভোগে শরীরটা একটু কমজোরী।

ঘরুই ভাবে, তাই সই। মাল নামুক তো। চরের মাটি একুশ দিন রস টানুক শরীরের। ফাঁসির চরের পেটখানা ভরভরন্ত হোক।

লাশের গোড়ালি থেকে কপাল তক ফিতে টানে ঘরুই। পাঁচের ওপরে যাহোক। চলে যাবে। তবে হাড্ডি রোগা, এত্তটুকুন ছাতি। এ লাশ বিশ বাইশ দিন লড়ে না। পনেরো দিনেই ধুয়ে পাকলে গদিতে তুলে দেবে ঘরুই।

ঘরুই বলে—দেড়শ। মাল তো মরেই ছিল নায়েক। হাড্ডি কাঠি কাঠি।

নায়েক বলে—মাঝামাঝি সাব্যস্ত কর, ঘরুই। ওই দুইশ'।

ঘরুই লাশের শরীরে চোখ বোলায়। বলে—দয়া ঘরুই এক কথার মানুষ।

নায়েক ভীমকে বলে—তোল্।

ঘরুই লাশের বুকে হাত রাখে। পাঁজরে খোঁচায়। হাতে পায়ের সন্ধি টিপে টুপে দেখে। তারপর ঘাড়ে হাত রেখে চাপ দিতেই মাথাটা কেতরে পড়ে একপাশে। ঘরুইয়ের রক্ত লাফায় চড়াৎ।

ঘরুই এক লাফে নায়েকের মুখোমুখি। ঘাড়টা টিপে ধরে নায়েকের। বলে—শালা, ঝুটা মালের ব্যাপারী! একটা বেদম ঝাপটা পড়ে নায়েকের মুখে। —দয়া ঘরুই লাশের চরিত্তির জানে, বুঝলা নায়েক! ফাঁসির লাশের এই ভাঙা শরীর নিয়ে আমি ঘুমাবো নাকি রে, শুয়ারের বাচ্চা!

ঘরুই দাঁড়ায় না। একবার পেছন ফিরে দেখে নেয় লাশ তুলছে ভীম। ঘরুই বোঝে, নায়েকটা খচ্চর আছে, দু নম্বরী। টুটা ফাটা হাড়গোড়ের ব্যাপারী না ঘরুই। আস্ত ফ্রেশ মালের ঠিকাদার সে।

খামার বাড়ির দরজায় ভোলার রিক্সাভ্যান। ঘরুই বোঝে, গন্ধ পেয়েছে

শালা। একটা শেয়াল বাপের ঘরের দরজা ছুঁয়ে স্থরুৎ করে ছুটে যায়। ঘরুই বাপের ঘরে ঢুকে টেমির পলতে ওস্কায়। বদ গন্ধ ঘরটায়। বাপ কথা বলে না।

ঘরুই বাপের গায়ে হাত রাখে। দেহটা ঠাণ্ডা বাপের। ঘরুই ডাকে। বাপটা একবার চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে। মুহূর্তেই ঘরুইয়ের মাথার ভেতরটা কেমন ওলোট পালোট হয়। বাপটা কি মরছে।,

দরজার ফোঁকরে মুখ রেখে ঘরুই একবার হাঁক পাড়ে—ভোলাআআআ···

বাপের ছ'ফুটি নাদান শরীরটা ঘরুইয়ের বুকের কাছে আঁকশি হয়ে ঝুলতে থাকে। ভোলার দু'পা প্যাডেলে। শরীরটা ভ্যানের পাটাতনে শুইয়ে দিতেই ডুকরে কেঁদে ওঠে ঘরুইয়ের বাপ। দয়া রে, তোর পায়ে ধরি বাপ, আমারে মারিস না। আমার হাড্ডিতে ঘুণ, মহাজন ছোঁবে না। ও দযা, দয়া রে·········

উল্টির পথে ঘরুই যায় নি কখনো, ভোলা গেছে। হাড়হাভাতে ও ওর বাপের ছ'ফুটি শরীরটা নিয়ে রিক্সাভ্যান ফাঁসির চর ভাঙতে থাকে।

যন্তর-মন্তর

প্রীতম মুখোপাধ্যায়

আর কোন অজুহাতেই মানিক বোসকে দমানো যাবে না। সব কাজ হবে মেসিনে। শুধু অর্ডার যোগাড় করে ফেলে দিতে পারলেই হল। ব্যস, তারপর কোণের কালো যন্ত্রটা হিসাব করে বলে দেবে ঠিক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সবচেয়ে বেশী লাভ হবে। কালো যন্ত্রের ভবিষ্যদ্বানী অনুসারে কাজ করবে নীলযন্ত্র। কাজের হিসেব রাখবে নাকথ্যাবড়া হলুদ যন্ত্রটা। কোনরকম গাফিলতি হলেই 'বিপ বিপ' শব্দে লাল আলো জ্বলে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে সবুজ যন্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে উৎপাদন-হার বাড়িয়ে দেবে। তারপর তৈরী মাল চলে যাবে বেগুনী যন্ত্রে—প্যাকিং হয়ে মাল রেডি হলেই লাল আলো জ্বলবে এবং সেই সঙ্গে বেজে উঠরে ঝিমঝিমে যন্ত্রসঙ্গীত। আরেবিয়ান নাইট্স।

তারপর পেমেণ্ট এলে শুরু হবে সাদা যন্ত্রের কাজ। চেক নম্বর, কবে জমা হোল, কে দিল, ইনকাম ট্যাক্স আর ওভারহেডের জন্য কতটা রিজার্ভ রাখতে হবে সব আলাদা করে নেট প্রফিট জানিয়ে দেবে যন্ত্রটা। প্রফিট ঘোষণার সঙ্গে জ্বলে উঠবে হাল্কা নীলাভ সঙ্কেত। সংক্ষিপ্ত পোষাক পরা এক বিশ্বসুন্দরীর ছবি ভেসে উঠবে স্ক্রিনে। টুপটুপে ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক করে, দুইবুকের মাঝখানে হাত রেখে এক স্বপ্নময় আদ্রকণ্ঠে সে বলে, আই লাভ ইউ—উইস ইউ গুড লাক।

আগস্ট পর্যন্ত মানিক বোসের এই কারখানায় মোট একুশজন কাজ করত। বোনাসের ঝামেলায় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কারখানা লকআউট হয়ে যায়। কর্মচারীরা কারখানার গেটে সামিয়ানা খাটিয়ে লাগাতার অবস্থান শুরু করে আর মানিকবাবু নানান ধান্দায় এধার-ওধার ঘোরাঘুরি চালিয়ে যান। পার্টি অফিস, থানার বড়বাবু, রাইটার্স বিল্ডিং, পাড়ার গুণ্ডা ইত্যাদি নানান ঘাটে জল খেয়ে সমস্যার সুরাহা করে উঠতে পারেন না।

প্রায় যখন হাল ছেড়ে দেবার অবস্থা, সেইসময় একদিন স্টেটসম্যানে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন দেখে চমকে উঠলেন মানিকবাবু। কাটিং সমেত সেদিনই হাজির হলেন ফক্স কম্পানির শো-রুমে। ক্যামাক স্ট্রিটের ওপর বিশাল

শো-রুম। ঠাণ্ডা ঘর। পায়ের তলায় নরম কার্পেট। থরে থরে সাজানো নানান রঙের মোটা, বেঁটে, লম্বা, সরু সব মেসিন। ওদের ক্যাটালগ দেখতে দেখতে মানিক বোসের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। প্রথমে ব্যাঙ্ক লোন তারপর কোর্টের কাগজ হাতে বীরদর্পে ফিরে আসলেন নিজের কারখানায়। এক সপ্তাহের মধ্যে ফক্স কম্পানীর মেসিনগুলো এসে গেল। বাইরে তখন অবস্থানের সাতান্ন দিন চলছে।

বাইরে একুশটা গলার প্রচণ্ড স্লোগান আর কারখানার ভেতরে লাল, সবুজ, হলুদ, সাদা মেসিনগুলোর যান্ত্রিক কারসাজি—মানিকবাবু শুনতেন আরেবিয়ান নাইট্‌স, দেখতেন বিশ্বসুন্দরীর টাটকা যৌবন। এইসময় মুখে যতই সাহস থাক না কেন, অজানিত একটা ঘুষঘুষে ভয় কখনই তাঁকে স্বস্তি দিত না। সবসময় মনে হত ঐ অবস্থানরত কর্মচারীরা শেষপর্যন্ত একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে।

পুরোনো ড্রাইভারটাকে ছাড়িয়ে দিলেন। গাড়ীর চারটে কাঁচ সবসময় তোলা থাকত। ছেলে আর মেয়েকে দূরের নামকরা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে কাছের অগা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বৌ-এর বিউটি পারলার, মার্কেটিং সব বন্ধ। বাড়ীতে রাখলেন তিনশো টাকা মাস মাইনের নেপালী দারোয়ান। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। রাতে ঘুম আসে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর যাও আসে বিচ্ছিরি ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখে চটকে যায়। দু'মাসে পাঁচকেজি মত ওজন কমে গেল। শেষে মিসেস-এর পরামর্শমত এক সাধুবাবার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে, বাম হাতের মধ্যমায় আড়াই রতির গোমেদ ধারণ ক'রে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন মানিকবাবু।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, এই গোমেদ ধারনের সাত দিনের মধ্যেই গেটের সামনে অবস্থানরত কর্মচারীদের সংখ্যা কমে গেল। একদম হাতে হাতে ফল। জোড়হাতে গুরুদেবকে প্রণাম জানালেন মানিক বোস। কয়েকদিনের মধ্যে বাইরের ভিড় আরো কমে গেল। নব্বই দিনের মাথায় জনা-ছয়েক পাততাড়ি গুটোলো। ওদের কয়েকজন নাকি টিউব রেলে মাটি তোলার কাজ পেয়েছে আর একজন ময়দানে চিনেবাদাম বেচতে শুরু করেছে। সবই গুরুর কৃপা। গুরুদেবের একটা ছবি সুন্দর করে বাঁধিয়ে গণেশ ঠাকুরের পাশে ঝুলিয়ে রাখলেন। দশহাজার ডোনেসান দিয়ে ছেলেমেয়েদের আবার সেই নামী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বৌ-এর সপিং, বিউটিপারলার, বান্ধবী গমন সবই আবার চলতে লাগল।

অবশেষে অবস্থানের দুশো উনিশ দিনের মাথায় ফাঁড়া পুরোপুরি কাটল। কারখানার জানলা দিয়ে মানিকবাবু দেখলেন ওরা নিজেরাই বাঁশ, ফেস্টুন, মাথার ছাউনি সব খুলে ফেলছে।

সেদিন ফেরার পথে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস থেকে সাতশো কুড়ি টাকা দামের গরদের জোড় কিনলেন মানিক বোস। লাল ফিতেয় বাঁধা সেই প্যাকেট গুরুদেবের পায়ের কাছে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মানিক বোস। দুচোখে আনন্দাশ্রু। গুরুদেব তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

গুরুদেবের প্রসাদী ফুল সমেত মূল্যারোজে ঢুকে পড়লেন মানিক বোস। মনে পড়ল, সেই গতবছর জুলাই-এর পর এদিক আর আসা হয় নি। ইস্, ঐ একুশটা শুয়োরের বাচ্চার ভয়ে কী জিনিষ না হারাতে হয়েছে। কোণের দিকে একটা সিটে বসে পড়লেন মানিক বোস। তেষ্টায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। টুসকি মেরে এক বেয়ারাকে ডেকে বললেন, আরিষ্ট্রোক্রাট উইথ বকস—এণ্ড প্রন পকোড়া।

অনেকদিন বাদে তাই সইয়ে সইয়ে খেতে শুরু করলেন। আগে সহজেই পাঁচ পর্যন্ত খেতে পারতেন। অনভ্যাসের দরুন তিনটে পেগ শেষ করে একটু দম নিলেন। বাহ্, বেশ ফুরফুরে লাগছে। নিভু নিভু আলো, টুংটাং বাজনা, হাল্কা গুঞ্জন—সবমিলিয়ে এক ভাসমান রিমঝিমে অনুভূতি মানিক বোসকে দুলিয়ে দিচ্ছিল।

প্রায় একঘন্টার কাছাকাছি হতে চলল, এই সমস্ত সময়টা ধরে উনি মনে মনে একুশজনের বাপ-চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছেন আর আগামী দিনের সুখচিন্তায় মগ্ন থেকেছেন। হঠাৎই, চতুর্থ পেগের অর্ডার দিয়ে চারধারে জুলজুল করে তাকাতে শুরু করলেন উনি। চারপাশের সকলেই পান করে চলেছে, নিজেদের মধ্যে গল্পো করছে, মাপমত হাসছে।

মনে পড়ল, ঠিকই—প্রকৃতঅর্থেই তিনি আজ বন্ধুহীন। এমন একজনও নেই যার সঙ্গে মনের কথা বলা যাবে। বাড়ীর দিকেও আর কোন টান নেই। ছেলে-মেয়ে-বৌ যে যার নিজের মতো চালিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রের মতো যে যার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে। মাসে এক কি দুইদিনের শরীর বিনিময় মিসেসের সঙ্গে এইটুকুই যা কাছের সম্পর্ক। তাও নিয়মরক্ষার মতো দায়সারা—শিহরণের থেকে ঘাম আর বাসীগন্ধের ঝাঁঝ অনেক বেশী।

চতুর্থ পেগে চুমুক দিয়ে নিজেকে 'উজবুক' বলে সম্বোধন করলেন মানিক

বোস। তাকালেন সামনের দিকে। লম্বা এক পুরুষ হাসিমুখে এগিয়ে আসছে তার দিকে, পাশে অপরূপ সঙ্গিনী। কাছে এসে, করমর্দনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা বলল, আই থিঙ্ক ইউ আর মিস্টার মানিক বোস?

ইয়া, মানিক বোস ছিটকে সিধে হয়ে বসলেন। লোকটাকে চিনতে না পারার জন্য বোকাবোকা, জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে। লোকটা হাসল তারপর একটু ঝুঁকে বলল, আইম বিপুল ডাট্ অফ ফক্স কম্পানি।

ফক্স কম্পানি? আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন মানিক বোস। সবই গুরুর কৃপা। তাড়াতাড়ি বিপুল ডাটের দু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, ডাট্ সেভ মি প্লিইজ—।

—মেসিনগুলো ট্রাবল দিচ্ছে?

—নো ডাট। দে আর ভেরিমাচ ও. কে। রানিং ওয়েল। কিন্তু, অতবড় ফ্যাক্টারি সেড, তার মধ্যে আমি একজনই মাত্র মানুষ—বড্ড একা লাগে নিজেকে। তোমার মতো যদি একটা গার্ল ফ্রেণ্ডও থাকত। দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু সেয়ার মাই ফিলিংস, ইমোসান্স।

—নো প্রবলেম। কালই একটা ভি. এক্স-২০০ বুক করে দিন।

—ভি. এক্স টু হাণ্ড্রেড?

ধীর মাথা নেড়ে সম্মত জানাল বিপুল ডাট। একটা স্টেট এক্সপ্রেস বাড়িয়ে দিল মানিক বোসের দিকে। হাত বাড়ালেন মানিক বোস। নিতে গিয়ে পড়ে গেল সিগারেটটা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে—একটা নসিয়া। সিগারেট তুলে মানিক বোসের ঠোঁটে গুঁজে দিল বিপুল। ধরিয়ে দিয়ে বলল, এখন বাড়ী চলে যান। কাল শো-রুমে আসবেন, ডেমন্সট্রেসন দেখিয়ে দেব। বাই।

সঙ্গিনীর হাত ধরে চলে গেল বিপুল ডাট। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন মানিক বোস। তারপর দুবারের চেষ্টায় কোনরকমে উঠে দাঁড়ালেন। পা টলছে। চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। বিড়বিড় করে বললেন, ভি. এক্স টু হাণ্ড্রেড·· ভি. এক্স···।

বছরখানেক ধরে লীলা অন্যঘরে শোয়। মাসে বারদুয়েক ঠিক নিয়মমত উঠে আসে। আস্তে রেকর্ডার চালিয়ে জানলার শার্সি বন্ধ করে দেয়। তারপর নাইটির দড়িদড়া আল্গা করে উঠে আসে বিছানায়। কাজকর্ম সেরে একটা

ফিল্টার ধরায়, বাজনার তালে তালে মৃদু স্মোক্ করে তারপর 'গুডনাইট' বলে ফিরে যায় নিজের ঘরে, নিজের বিছানায়। মাসপড়তে নিয়মের মতো এ সবই মেনে নিয়েছেন মানিক বোস। আসলে লীলার কাছে আর বেশী কিছু চাইবার নেই তাঁর। বিবাহিত সম্পর্কটা বহুদিন আগেই ভেপসে গেছে।

সেদিন নেশাগ্রস্ত মানিক বোস বাইরের পোষাক পরেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, বিছানার অপরপ্রান্তে গুটিসুটি মেরে লীলা ঘুমিয়ে রয়েছে। হাত রাখলেন লীলার কোমরে। লীলার ঘুমন্ত শরীরটা কুঁকড়ে গেল। উনি জাপটে ধরলেন পেছন থেকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভয় পেয়ে ছিটকে গেলেন বিছানার অপরপ্রান্তে।

ধীর গতিতে একটা অদ্ভুত ধরনের স্বচ্ছ হাত এগিয়ে আসছিল মানিক বোসের দিকে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হাল্কা, ফিসফিসে শীৎকার শব্দ। মানিক বোস অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। নাইট ল্যাম্পের মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত দুটি তরমুজ-লাল ঠোঁট, মার্বেল পাথরের মতো ধপধপে আর সুদৃঢ় দুটি বুক এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে : নীচের দিকটা আরো উজ্জ্বল। দুই পায়ের সন্ধিস্থলে একটা লাল আলো জ্বলছে নিভছে।

একটা ঢোঁক গিলে মানিক বোস জিজ্ঞেস করলেন, কে? লীলা না কি?

খিলখিল করে হেসে উঠল আগুয়ান নারী শরীর। মানিক বোসের কানে, কপালে নরম স্পর্শ বুলিয়ে উত্তর দিল, আমি ভি-এক্স—টু হাণ্ড্রেড।

মানিক বোস স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকলেন যন্ত্রটার দিকে। নরমমুগ্ধকর সেই অপরূপ শরীর থেকে তার চোখ সরতে চাইছিল না। ততক্ষণে ভি এক্স মানিক বোসের চওড়া বুকে ঠোঁট ঘষতে শুরু করেছে। যন্ত্রটার স্তনে হাত রাখলেন। ভরাট আর নরম। সামান্য চাপ দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, এক্সিলেণ্ট···মার্ভেলাস···।

—মেড অফ ইমপের্টেড প্রলিপপলিন, হাসতে হাসতে জবাব দিল ভি. এক্স।

আবার অনেকদিন বাদে হো হো করে উনিও হেসে উঠলেন। প্রচণ্ড রকমের হুল্লোড় ঝড়ের মতো ধেয়ে এল ওঁনার মধ্যে। একটা মজা ঘুলিয়ে উঠছিল ভেতর থেকে ভি. এক্সকে জড়িয়ে ধরে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলেন পাগলের মতো। হঠাৎ একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক হল। চমকে উঠলেন মানিক বোস। ভি. এক্স-এর নরম শরীরটা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে গেল।

—কি হল? মানিক বোস ভয়ে সরে গেলেন।

নিদ্রাতুর জড়ানো কণ্ঠে ভি. এক্স বলল, অল ক্লিয়ার বাটনে তোমার হাত পড়ে গেছে। আগে লিটারেচারটা ভাল করে পড়ে নাও। বিপুল ডাটের কাছ থেকে আগে সব বুঝে নাও। আনাড়ী কোথাকার—ওয়ার্থলেস।

ভি. এক্স ঘুমিয়ে পড়ল। মানিক বোস কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থাকলেন। চোখে জল এসে গেল। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। ভি. এক্স-এর কাঠ হয়ে যাওয়া শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়।

পরেরদিন ফক্স কম্পানির বিপুল ডাটের কাছ থেকে ভি. এক্স-২০০ সম্পর্কে খুঁটিনাটি দেখে নিলেন। চেক রেডি করা ছিল। যন্ত্রটা নিয়ে সোজা চলে এলেন অফিসে।

প্রথমেই একটা বোতাম টিপলেন। জার্মলেস চিলড্ ওয়াটারের একটা প্যাকেট বেরিয়ে এল। আর একটা টিপতে কফি। পরেরটায় স্যাণ্ডউইচ, ওমলেট। আবার একটা বোতাম টিপতেই মেসিনটা ঘরঝাঁট দিতে শুরু করল। অডিওতে বেজে উঠল চটুল হিন্দীগানা। মনের সুখে ওমলেটে কামড় বসালেন মানিক বোস। আহ্, বিউটিফুল প্রিপারেশন।

গতরাতের স্বপ্নটার কথা মনে পড়তেই হাসি পেল। বেশ জবরদস্ত ছিল ব্যাপারটা। এখনও চোখ বুজলে রাতের সেই যান্ত্রিক সৌন্দর্য স্পষ্ট মনে পড়ছে। সামনের ভি-এক্স মেসিনটার দিকে তাকালেন মানিক বোস। গোলাপি বেকলাইটে মোড়া সামান্য লম্বাটে গড়ন। মাথায় এ্যান্টেনা। সেণ্টারে ভিডিও পর্দা। স্বপ্নে ঐ জায়গাতে বুকজোড়া ধপধপ করছিল।

খাওয়া শেষ করে ভি-এক্স-এর নীল বোতাম টিপে দিলেন। কারখানার সবকটা মেসিন চালু করে ভি-এক্স অফিসরুমে ফিরে এল। তারপর উনি কালো বোতামে চাপ দিলেন। ভি-এক্স ঘরের সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিল।

এবার উনি লাল বোতাম অন করলেন। ভিডিও পর্দায় আলো জ্বলে উঠল। ছয়-রিপুর জন্য আলাদা ছবি চ্যানেল। চ্যানেল নাম্বার থ্রি : 'সেক্স' চালু করলেন। ভেসে উঠল পাহাড় আর জঙ্গলঘেরা এক জায়গায় আদম-ইভের ছবি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ মৌজ করে ছবিটা উপভোগ করলেন মানিক বোস। ঘুরিয়ে দিলেন পরের চ্যানেল। পর্দায় ফুটে উঠল ইরানের এক তৈলসম্রাট, তাঁর প্রমোদতরণী ও মিনিহারেমের রঙীন দৃশ্য। রঙীন জীবনের ছটায় মাথাটা ঘুরে গেল যেন। উনি তাড়াতাড়ি ভি-এক্স

বন্ধ করে দিলেন। প্রথম দিনে বেশি ভাল নয়। ভি-এক্স-এর রো ক্রস বাটনে চাপ দিলেন। পাঁচ মিলিগ্রামের দুটো কামপোজ বেরিয়ে এল। ট্যাবলেট দুটো খেয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকলেন মানিক বোস।

এরপর মানিক বোসের জীবনে ভি. এক্স—টু হাণ্ড্রেড ছাড়া সমস্তকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ল। রাতদিন তিনি যন্ত্রটার সামনে বসে থ কেন আর একটার পর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে ছবি, বাণী, গান, নাচ গোগ্রাসে উপভোগ করে চলেন। অত্যাশ্চর্য জৌলুষে ভরা এক হাই-টেকনিক জীবন আর তার বীভৎস মজায় তিনি ডুবে থাকেন রাতদিন। কোনদিন ইচ্ছে হলে রাতে বাড়ি যান, কোনদিন যান না।

সবুজ বোতাম টিপে পেগের পর পেগ হুইস্কি পান করেন আর রাতভোর বসে থাকেন ভি. এক্স-এর উজ্জ্বল পর্দার সামনে। শেষরাতে সামান্য ঘুমিয়ে নেন। ভোর হলেই মনটা আবার ভারী হয়ে ওঠে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার বসে পড়েন ভি. এক্স-এর সামনে। ভি. এক্স 'গুডম র্নিং' বলে স্যাণ্ডউইচ আর কফি দেয়, সঙ্গে একটা এ্যাসপিরিন। খেয়ে বে শ ঝরঝরে বোধ করেন মানিক বোস। আবার ডুবে যান চ্যানেল দুই, তিন কিম্বা চারের সম্মোহক আকর্ষণে।

মানিক বোস বুঝতে পারেন যে একটা মানুষের থেকেও ভি. এক্সকে তিনি বেশি ভালবেসে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে যন্ত্রটার গোলাপি বডিতে হাত বুলিয়ে দেন। এ্যান্টেনার নিচে যেখানে পরপর বোতামগুলো সাজানো ঐ জায়গাটাকে যন্ত্রের মুখ ধরে নিয়ে চুমু খান। লালায় ভিজিয়ে দেন বোতামের মাথা। হাত বোলান যন্ত্রের পর্দায়। চারটি স্ট্যাণ্ড যেখানে এসে মিশেছে সেই সন্ধিস্থলে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। যৌন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তাঁর মুখ। তিনি আবিষ্কার করেন, যন্ত্রেরও স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গভেদ আছে আর ভি. এক্স-টু হাণ্ড্রেড আসলে একটি উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রী যন্ত্র বিশেষ।

এইভাবে ঝড়ের গতিতে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মাস। একদিন রাত দশটা নাগাদ তিনি সবে ওল্ড মঙ্ক নিয়ে যুৎ করে বসেছেন, এমন সময় কারখানার মধ্যে থেকে বিশ্রী ধরনের পিঁ পিঁ শব্দ শুনতে পেলেন। প্রথমটায় মানিকবাবু বিশেষ পাত্তা দেন নি। মেসিনপত্তরের ব্যাপার, এ ধরনের শব্দ হতেই পারে। কিন্তু ক্রমশ শব্দের ঝাঁঝ বাড়তে থাকল। একসময় কান ফেটে যাবার যোগাড়। মানিক বোস অত্যন্ত বিরক্তচিত্তে অফিসরুমের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনের সাদা যন্ত্রটার পর্দায় একটা মড়ার খুলি ওলট পালট খাচ্ছে আর একটা মোটাসোটা লোমওয়ালা বামন হি-হি করে হেসে উঠে বলছে, লস···লস···নেট লস নাইন থাউজেণ্ড···। চারপাশের লাল, হলুদ, কালো, সবুজ মেসিনগুলো থরথর করে কাঁপছে আর পিঁ-পিঁ শব্দ করছে। উন্মত্তের মতো ছুটে গিয়ে যেন সুইচটা বন্ধ করে দিলেন মানিক বোস। যন্ত্রগুলোর দাপাদাপি ঝপ্ করে থেমে গেল। ঘরের মধ্যে নেমে এল থমথমে নিস্তব্ধতা।

গত কয়েকমাসে একটাও অর্ডার আসে নি। পার্টিদের কাছে যাওয়া, তাদের জন্য সময় দেওয়া, কর্তাব্যক্তিদের জন্য ছোটখাট উপহার এ সব ব্যবসায়িক ধান্দার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন মানিক বোস। নিজের ওপর প্রচণ্ড অনাস্থায় হাহাকার করে উঠলেন উনি। সব মিলিয়ে ন' হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। একটা আস্ত উজবুকের মতো ভি. এক্স-এর সামনে স্রেফ মৌজ মেরে কাটিয়ে দিয়েছেন এতগুলো দিন। গভীর দুঃখে মুষড়ে পড়লেন মানিক বোস।

তাকালেন অফিস ঘরের দিকে। ভেসে আসছে উন্মত্ত সঙ্গীত। দাঁত চেপে গালাগাল দিলেন ভি. এক্স-কে। ঐ শয়তান মেসিনটা সব কিছুর মূলে। রাগে, ঘৃণায় রি রি করে উঠল শরীর। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। যেন একটা ঢালু পাথর পাহাড় গাড়িয়ে নেমে আসছে, তেমন টালমাটাল ভঙ্গিতে ফিরে এলেন অফিসরুমে। প্রচণ্ড এক লাথি মেরে উল্টে ফেলে দিলেন ভি. এক্স-কে। ভিডিও বন্ধ হয়ে গেল। উন্মত্তের মতো এদিক-ওদিক তাকালেন। একটা শক্ত কিছু দিয়ে যন্ত্রটাকে গুঁড়োগুঁড়ো করে দেওয়া দরকার। তেমন কোন জিনিস নেই আশেপাশে। কয়েকটা মেসিন আর গুরুদেবের ছবি ছাড়া আর কিছুই নেই।

মাথাটা ঘুরে উঠল। কোনক্রমে বসে পড়লেন নীচে। চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। একগ্লাস জল পেলে মনটা ঠাণ্ডা হত। উনি আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে ঘরের বাইরে এলেন। কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্ধকার কোণ থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁর ডাক। আকাশ দেখলেন মানিক বোস। দেখলেন সামনের কাঁঠাল গাছের মাথায় তারকাখচিত ধূসররঙের আকাশ, জলভরা মেঘের ওপর ছোট ভেলার মতো দুলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে চাঁদ। লীলার কথা মনে পড়ল। ছেলেমেয়ের জন্য মন কেমন করে উঠল। চললেন বাড়ির দিকে।

ফেরার পথে সবই নতুন করে ভাল লাগল। রাতের কোলকাতা। ঘুমিয়ে

থাকা ভিখিরি। চটপটে নিয়নসাইন। খুঁড়িয়ে চলা ট্রাম। সাটার নামানো সার সার দোকান। সমস্ত ভাললাগাটুকু বুকে জড় করে বাড়ির কলিংবেল টিপলেন মানিক বোস। দরজা খুলল আশু। পুরোনো কাজের লোক।

—বৌদি কোথায়? ঝণ্টু, দোয়েল?

এইভাবে রাত এগারোটায় ফিরে আসা কিছুই আশ্চর্যের নয় কিন্তু পরের প্রশ্নগুলোয় অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল আশু। বাবু সটান আসেন, হাল্কা মদের গন্ধ ছড়িয়ে সটান নিজের ঘরে ঢুকে যান—এই তো নিয়ম।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে আশু বলল, কেন বাবু—সব তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ডেকে দেব। আপনার শরীর ঠিক আছে তো বাবু?

—থাক। ডাকতে হবে না।

ধীর পায়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন মানিক বোস। বিছানা, ওয়ারড্রোব, কাবার্ড, সবই ছিমছাম, সাজানো গোছানো। পায়ের তলায় নরম কার্পেট, দেয়ালে বিচ্ছুরিত প্লাস্টিক পেন্ট। তিনি না থাকলেও আর সবই নিখুঁত, যথাযথভাবে সজ্জিত। এ বাড়ির কারো মধ্যে এতটুকু অভাববোধ নেই। রাগ নয়, প্রবল এক দুঃখবোধে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন মানিক বোস।

কাবার্ডের এককোণে উল্টে পড়ে ছিল পেতলের কাজ-করা মলিন এক ফোটোস্ট্যাণ্ড। সেটাকে সিধে করে দিলেন মানিক বোস। পরম যত্নে ধুলো মুছে দিলেন। বিয়ের একবছরের মধ্যে তোলা ওঁদের ছবি। কাচ ভেদ করে স্থির তাকিয়ে থাকলেন ছবির লীলার দিকে। লীলার দুচোখে স্বপ্নের মতো ছড়িয়ে রয়েছে নরম ভালবাসা। সেই লীলা এখন শুয়ে আছে অন্য ঘরে, অন্য বিছানায়।

মানিক বোস ঠিক করলেন, এখনই—আজ রাতেই লীলাকে সব কথা খুলে বলবেন তিনি। দুজনের এই দীর্ঘ নীরবতার মাঝখানে জমে উঠেছে অনেক ভুল বোঝাবুঝি। সমস্ত আবর্জনা পুড়ে যাক। শুরু হোক নতুন করে বেঁচে ওঠা।

পায়ে পায়ে লীলার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন মানিক বোস। দরজায় টোকা মারতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে থমকে গেলেন। ভেতর থেকে ভেসে আসছে পুরুষের চাপা অথচ ভারি কণ্ঠস্বর। এতক্ষণের সমস্ত হিসেব চকিতে ওলট-পালট হয়ে গেল। মনের ভুল হতে পারে—দ্বিতীয়বার আরো ভাল করে দরজায় কান ঠেকিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন মানিক বোস। নাঃ, কোন ভুল নেই। শুনতে পেলেন লীলার প্রমত্ত হাসি, স্বেচ্ছাসমর্পণের কাতর আহ্বান।

লোকটা কে? পরিচিত কেউ? দরজার এপাশ থেকে ঠিক বুঝতে পারলেন না।

সারারাত কাটল প্রচণ্ড রুদ্ধশ্বাসে। চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। ঘড়িতে তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। ছিটকিনি খোলার শব্দ ভেসে এল পাশের ঘর থেকে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মানিক বোস লক্ষ্য করলেন সব। টলতে টলতে বাইরের করিডরে বেরিয়ে এল লীলা। দেয়ালে ভর দিয়ে টাল সামলাল। নাইটির দড়িগুলো বাঁধল। তারপর ঠোঁট সরু করে শিস দিতে দিতে এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে।

এই রকমই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন মানিক বোস। সারারাত সম্ভোগের পর লোকটা নিশ্চয়ই এখন সুখের জাবর কাটছে। ঝড়ের বেগে লীলার ঘরে ঢুকে পড়লেন মানিক বোস আর ভোরের আবছা আলোয় ঘরের মাঝখানে রাখা যন্ত্রটাকে দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। অবিকল ভি. এক্স-এর মতো দেখতে। গাঢ় ছাই রঙ। ওঁনার পা কাঁপতে শুরু করল। মাথার পেছনটা দপদপ করছে। লীলাকেও তাহলে একই সর্বনাশা নেশায় পেয়ে বসেছে। আর ভাবতে পারলেন না উনি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে চাপচাপ অন্ধকার। কোনক্রমে ঘরে ফিরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন মানিক বোস।

ঠিক নটার সময় ফক্স কম্পানির অফিস চালু হয়। নটা পাঁচে মানিক বোস গিয়ে হাজির হলেন অফিসে। উস্কোখুস্কো চুল, পরনে রাতের কোঁচকানো পোশাক, রাতজাগা লালচোখ। দারোয়ান ঢুকতেই দিচ্ছিল না, একরকম জোর করেই সেলস ডিপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। বিপুল ভাট্ লম্বা চুরুটে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করছিল। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল মানিক বোসের দিকে।

—কি ব্যাপার মিঃ বোস, এনিথিং রং?

—ডাট, ঠিক ঐ ভি. এক্স-এর মত দেখতে, গ্রে কলার, মাথায় এ্যান্টেনা, সেন্টারে স্ক্রীন।

—ইয়েস দ্যাট ইজ ভি. ওয়াই টু হাণ্ড্রেড। লাগবে না কি?

—ওটার স্পেশালিটি কি?

—ভি. এক্স ফর জেন্টস আর ভি. ওয়াই ফর লেডিস।

সামনের চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লেন মানিক বোস। টেবিলের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তা ঐ ভি. ওয়াই কিনছে নিশ্চয়ই অনেকে?

মানিক বোসের মুখে বাসী গন্ধ, সেন্টেড রুমাল বার করতে করতে বিপুল ডাট বললেন, কিনছে মানে? একদম হট্‌কেক। একমাসের মধ্যে আ ত্রিশটা সেল হয়েছে। বাহান্নজন মহিলা ওয়েটিং লিস্টে।

—হরিবল! কারা কিনেছে তার লিস্টও নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আছে।

—হ্যাঁ, সে তো রাখতেই হবে।

—দেখোতো লীলা বোস কবে পারচেস করেছে?

—সরি, মি বোস, এটা আমাদের ট্রেড সিক্রেট।

—লীলা বোস মানে আমার মিসেস।

—তা হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে সি ইজ আ সেপারেট কা মার। আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ইনডুভিজুয়ালের সেপারেট আইডিনটিটি।

—নো। টেবিলে চাপড় মেরে চিৎকার করে উঠলেন মানিক বাস। বিপুল ডাট ভ্রু কুঁচকে তাকাল। এধার-ওধার থেকে কয়েকজন কর্মচা ঘুরে দাঁড়াল। কালো পোশাক পরা একজন সিকিওরিটি স্টাফ চুয়িংগাম ে ছের কিছু একটা চিবোতে চিবোতে ঠিক একহাত পেছনে দু-বার গলা খ কারি দিল। নিজেকে সংযত করে নিলেন মানিক বোস। তারপর গলায় বটুকু মিনতি জড় করে বললেন, বিপুল, ইউ আর মাই ফ্রেণ্ড। আমি তো দের একজন বড় কাস্টমার। আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখ, রিমোট কে লে লীলা বোসের মেসিনটাকে ডিফাংকট্ করে দাও। প্লীইজ ডাট।

—ইম্‌পসবল। উঠে পড়ল বিপুল ডাট।

—ডাট, লেটস হ্যাভ আ ডিল। ফাইভ. টেন, ফিফটিন থাউজেণ্ড।

—নোও। বড় চোখে তাকিয়ে থাকল বিপুল। তারপর ঠিক মা নিক বোসের মতই টেবিল চাপড়ে বলে উঠল, ইউ আর গোয়িং টু ফার মিঃ বে াস। গেট আউট, আই সে—।

কাঁধের ওপর একটা হাতের কঠিন স্পর্শ পেলেন মানিক বোস। ঘুরে দেখলেন, সিকিওরিটি স্টাফ। একইরকম চ্যুয়িংগাম ও দাঁতের ঘর্ষণসহ সে বলল, যান—আর দাঁড়াবেন না।

মানিক বোস তখন ভেতরে ভেতরে বাঘের মতো ফুঁসে চলেছে ন। লাভা উদ্গিরণের মতো রাগ উঠে আসতে চাইছে। অথচ কিছুই করবার নে ই। বোকার দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন তার মধ্যেই স সা বেল বেজে উঠল। একটা নয়, অনেকগুলো বেলের প্রচণ্ড শব্দ। চারধ রে

দপ, দপ, লাল আলো জ্বলে উঠল। শোনা গেল অদৃশ্য লাউডস্পীকারের ঘোষণা, মেগাস্টার ইজ ফাউণ্ড মিসিং···মেগাস্টার মিসিং···বি. এলার্ট··· মেগাস্টার মিসিং।

কিছুই বুঝতে পারলেন না মানিক বোস। ফক্স কম্পানির প্রত্যেকটা কর্মচারী ছোটাছুটি শুরু করেছে। দুজন বসে গেল টেলিপ্রিন্টারে, কয়েকজন টেলিফোন ডায়াল ঘোরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন উনি। লাউডস্পীকার, এলার্ম বেল, লোকেদের হাঁকাহাঁকি সব মিলিয়ে এক তাণ্ডব অবস্থা। এদের মোক্ষম কোন একটা বিপদ হয়েছে নিশ্চয়ই। ফক্স কম্পানি এখন তাঁর শত্রু। শত্রুর বিপদে আনন্দ পেলেন মানিক বোস।

ওদের দিশেহারা অবস্থা দেখে মনটা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে আবার থম মেরে গেলেন। লীলা যে শেষ পর্যন্ত ঐ সাঙ্ঘাতিক মেসিনটার বশবর্তী হয়ে পড়েছে, এটা কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারছেন না। যে করেই হোক লীলার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

লীলা বাথরুমে ছিল। সামনের লম্বা করিডরে অপেক্ষা করতে লাগলেন মানিক বোস। ভেতরে জলের শব্দ। স্নান সেরে নিচ্ছে লীলা। এটা ওর পুরোনো অভ্যেস। সবাই বেরিয়ে গেলে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাথরুমে থাকতে ভালবাসে লীলা। আশ্বস্ত হলেন মানিক বোস। মেসিনের খপ্পরে পড়ে সেই আগের লীলা এখনো পুরোটা পাল্টে যায় নি। এখনো সময় আছে। মানিক বোস উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করলেন।

বাথরুমের দরজা খুলে করিডরের অপর প্রান্তে মানিক বোসকে দেখতে পেল লীলা। অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভ্রু কুঁচকে তাকাল। শরীর খারাপ না কি? উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মানিক বোস। লীলা বলল, কি ব্যাপার?

—লীলা। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

—বল।

—ঘরে চল।

কি ভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছিলেন না মানিক বোস। ঘরে ঢুকে সিগারেট ধরালেন। কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। মানিক বোসের ঘরে যেন তার প্রবেশাধিকার নেই, সেইরকম সন্ত্রস্তভঙ্গিতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল লীলা।

—বোস এখানে।

বিছানায় বসে লীলা বলল, আজ বেরোও নি?

—না।

—তোমাকে বেশ অন্যরকম লাগছে। কিছু হয়েছে?

—লীলা, তুমি কি এখনো আমাকে ভালবাস—সেই আগের মতো, সেই আমাদের প্রথম আলাপের মতো?

লীলা চকিতে ফিরে তাকাল মানিক বোসের দিকে তারপর আস্তে আস্তে, খুব নরম স্বরে বলল, আমিও যদি এই একই প্রশ্ন করি তোমাকে?

স্থির বসে থাকলেন মানিক বোস। ঠিকই বলেছে লীলা। বড় করে শ্বাস ছাড়লেন, তারপর লীলার হাতে সামান্য স্পর্শ করে বললেন, লীলা, আমি যদি আবার সেই আগের মতো করে ডাকি তোমাকে, সাড়া দেবে?

—তোমার সে ডাকার সময় আছে? তুমি যে দারুণ ব্যস্ত লোক। কথাটা বলে লীলা মানিক বোসের হাত ধরল। ডাকল, মানিক।

লীলার গলায় আবার বহুদিন পর নিজের নাম শুনে কেঁপে গেলেন মানিক বোস। তারপর বললেন, চলো—আজ, সারাদিন আমরা একসঙ্গে কাটাব। লীলাকে জড়িয়ে ধরে ঝড়ের মতো চুমু খেতে শুরু করলেন তিনি। লীলার শরীরে সাবানের সুগন্ধ। পরম আবেশে লীলার বুকে মাথাটা হেলিয়ে রাখলেন। কপালে হাত বুলিয়ে দিল লীলা। স্তনবৃন্তে ঠোঁট ছোঁয়ালেন মানিক বোস। লীলা তার কাঁধে মুখ ঘষতে লাগল। ফিসফিসে কণ্ঠে বলল, দরজাটা খোলা আছে।

—থাকুক। আরো কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থাকলেন মানিক বোস। তারপর বললেন, চলো—আজ সারাদিন আমরা একসঙ্গে থাকব। বাইরে যাব, তারপর সারাদিন ঘুরে বেড়াব। গেট আপ।

হাল্কা সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরল লীলা। কপালে সবুজ টিপ মানিক বোসের পরনে ফিনফিনে পাঞ্জাবী আর আলিগড় চোস্ত। মানিক বোস মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখলেন লীলাকে। তাঁর মন ভরে গেল। প্রথমে ঢুকলেন এ্যামবারে। নানান গল্প, হাসি আর চমৎকার খাবারে গড়ে তুললেন মনোরম এক দাম্পত্য জীবন। তারপর ঠাণ্ডা পান খেয়ে ঢুকে পড়লেন প্যারাডাইসে। অন্ধকার হলের মধ্যে সেই আগের মতো হাতে হাত রাখলেন। শিরশির করে উঠল সমস্ত অনুভূতি। তারপর ঠিক সন্ধের মুখে হলফেরত ওঁরা চলে এলেন গঙ্গার ধারে।

নিরিবিলি একটা জায়গা দেখে বসে পড়লেন ওঁনারা। ঘাসের ওপর সটান শুয়ে মানিক বোস বললেন, বাহ্—ফাইন।

লীলা গুন গুন করে গীতা দত্তের একটা পুরোনো গান গাইছিল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে মানিক বোস ভাবছিলেন, এইবার তিনি ঐ ভি. ওয়াই মেসিনটার কথা আলোচনা করবেন। ভাবছিলেন, লীলা নিশ্চয়ই রাজি হবে ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে। ব্যস্, তাহলে আর কোন কথা নয় বাড়ি ফিরেই জিনিসটাকে চারতলার ব্যালকনি থেকে ছুঁড়ে দেবেন নিচের রাস্তায়। উঠে বসলেন মানিক বোস। আর লীলাও হঠাৎ গান থামিয়ে বলল, জান—আমি না একটা অদ্ভুত ধরনের মেসিন কিনেছি।

—মেসিন? না বোঝার ভাণ করলেন মানিক বোস।

—হ্যাঁ। ঐ যন্ত্রটা ঠিক একটা আইডিয়াল পুরুষের মতো। কখনো কী দারুন রোমান্টিক, কখনো ইমশানাল আবার কখনো প্র্যাকটিকাল্; ওর কাছে আগে লাভ, তারপর সেক্স। তোমাদের মতো এমন তাড়াহুড়ো করে না।

—লীলা, ঐ মেসিনটা কি আমার থেকেও বেশি প্রিয় তোমার কাছে? তুমি কি ওকে আরো বেশি ভালবাস?

—কি করব। আমি যা চাই ও যে সব দিতে পারে মানিক। ও আমার বন্ধু, আমার প্রেমিক।

—আমি আবার আগের মতই তোমার সমস্ত মনোযোগ ফিরে পেতে চাই লীলা।

—ঠিক আছে। কালই মেসিনটা ফেরত দিয়ে আসব কিন্তু কথা দাও তুমি আমার বন্ধু হবে, প্রেমিক হবে।

মানিক বোসের কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সামলে নিয়ে বললেন, কথা দিলাম।

বড় করে শ্বাস ফেলল লীলা। নিজেকে অনেক হাল্কা লাগছে। মনে পড়ছে পুরোনো সেই দিনগুলোর কথা। তখন দুরন্ত ঘোড়ার মতো টগবগ করতো মানিক। কতদিন তারা চলে এসেছে এই আউট্রামে। কত কথা ছিল তখন। সামান্য দূর দিয়ে একজন চীনেবাদামওলা যাচ্ছিল। গলা তুলে ডাকল লীলা।

ঠোঙাভর্তি চিনেবাদাম এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, নমস্তে বোসসাব।

কে লোকটা? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন মানিক বোস। লোকটা বলল, আমি ইসমাইল হুজুর। আপনার কলে বলপ্রেস চালাতাম।

মনে পড়ল মানিক বোসের। সেই ছাটাই হয়ে যাওয়া একুশ জনের একজন। ইসমাইল জিজ্ঞেস করল, আপনার সব ভাল তো সাব? কল-কারখানা কেমন চলছে?

—ভালই। তা তুমি কি এই চিনেবাদাম বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছ?

—হাঁ সাব, আপনি তাড়িয়ে দিলেন তারপর থেকে এই ধান্দা চালিয়ে যাচ্ছি। তকলিফ হচ্ছে, তবে চলে যাচ্ছে।

মানিক বোস পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করলেন, এ নাও —এটা রাখো।

—না সাব। সলজ্জ মাথা নাড়ল ইসমাইল। তারপর বাদামের ধামা তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেল সামনের অন্ধকারে।

মানিক বোসের মনে আবার মেঘ জমে উঠল। লীলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। লীলা গান গাইছে। সন্ধ্যা মুখার্জির গান। লীলাকে কিছু একটা কিনে দিতে ইচ্ছে করছিল ওঁনার। ইচ্ছে করছিল কারখানা থেকে লীলাকে একবার ঘুরিয়ে আনতে। আজ পর্যন্ত লীলাকে কারখানাটা দেখানো হয় নি। তাঁর নিজের সৃষ্টি এতবড় একটা জিনিসের সঙ্গে লীলার কোন পরিচয় নেই। তিনি আজ ঘুরে ঘুরে সব দেখাবেন লীলাকে। দেখাবেন আধুনিক সব মেসিন। ভি. এক্স মেসিনটার কথাও বলবেন। তারপর কাল ভি. এক্স আর ভি. ওয়াই দুটোকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন ফক্স কম্পানিতে। চল, বলে উঠে পড়লেন মানিক বোস।

আউট্রাম থেকে কারখানা অনেকটা পথ। নানান এলোমেলো কথা, স্বপ্ন আর গানের মধ্য দিয়ে বাকি পথটুকু পেরিয়ে ওদের গাড়ি যখন কারখানার সামনে দাঁড়াল তখন রাত সাড়ে নটা।

এদিকটা বেশ অন্ধকার। পাশে রেল ইয়ার্ড। পরপর কয়েকটা কারখানার শেড। জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে। ড্যাসবোর্ড থেকে গেটের চাবিটা নিয়ে মানিক বোস বললেন, ঐ দেখ। সাইনবোর্ডটা কেমন চকচক করছে।

চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত সামনের সাইনবোর্ড: বোস ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পানি। হাল্কা শীসের সঙ্গে চাবির রিংটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন মানিক বোস।

বড় গেটের পেটে ছোট দরজা। দরজার চাবি খুলে ভেতরে ঢুকলেন ওরা। শেডের ভেতর আলো জ্বলছে? মনে করতে চেষ্টা করলেন। মানিক

বোস। গতকাল যাবার সময় লাইট অফ করা হয় নি তাহলে? আরো কয়েক পা এগোতেই মেসিনের গুনগুন শব্দ পেলেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মানিক বোস।

—কি হল? জিজ্ঞেস করল লীলা।

—স্ট্রেঞ্জ! মেসিন চলছে—কিন্তু, আমি তো সব অফ করে গেছিলাম।

—নিশ্চয়ই আমার কথা ভাবছিলে আর তাই অফ করতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে। হাল্কাভাবে হেসে উঠল লীলা।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ভুতুড়ে লাগছিল মানিক বোসের। কপাল, ভ্রু-কুঁচকে দেখতে লাগলেন চারধারে। অফিস রুমের মধ্য থেকে মাঝে মাঝেই ফ্ল্যাজগানের মতো আলো চমকে উঠছে। সিঁ সিঁ করে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। আরো কয়েক পা এগোলেন মানিক বোস। শুনতে পেলেন পৈশাচিক 'হা-হা' চিৎকার। এই অট্টহাসি এর আগেও বহু শুনেছেন মানিক বোস। শুনেছেন রাতের পর রাত। এ সবই ভি-এক্স-এর খেল। একদল দস্যু ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক সুন্দরীর ওপর। একটা ট্রিপল এক্স ব্লু ছবির দৃশ্য। অর্থাৎ ভি এক্স এখনো চালু রয়েছে। কিন্তু কে চালাচ্ছে এই সব? মেসিন তো নিজে থেকে স্টার্ট নিতে পারে না?

অফিস রুমে পা দিয়েই ছিটকে বেরিয়ে এলেন মানিক বোস। লীলা না ধরলে পড়ে যেতেন। ভেতর থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের গোঙানি। তার মানে, দস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েটার ওপর। পর পর প্রত্যেকটা দৃশ্য ওঁনার মুখস্থ। মুখটা ফ্যাকাসে করে মানিক বোস বললেন, লীলা, ভেতরে আমার যে রিভলবিং চেয়ার, তার ওপর বসে আছে একটা অদ্ভুত ধরনের মেসিন। দুপাশে দুটো পাখনা—মেড অফ স্টীল। আমি ঢুকতেই প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেলাম। মাথাটা ঘুরছে। হাত-পা কাঁপছে।

লীলার হাত ধরে একটা টুলে বসে পড়লেন মানিক বোস। ভেতরে ড্রামের শব্দ। বনের মধ্য দিয়ে মেয়েটা পালাচ্ছে। কিন্তু কি করে এটা সম্ভব? ভি এক্সকে তিনি নিজের হাতে বন্ধ করে গেছেন। প্রায় কান্নার মতো করে মানিক বোস বললেন, কি করব লীলা? আমার জায়গায় ঐ মেসিনটা বসল কি করে?

—ফক্স কম্পানিতে একবার ফোন করে দেখ না।

—ফোন? ফোনটা যে ঐ অফিসরুমের মধ্যেই।

হঠাৎ মনে পড়ল গেটের কাছে গার্ডরুমে একটা প্যারালাল লাইন

ছিল। অন্তত বছর দুয়েক ব্যবহার করা হয় নি। গার্ডরুমের দিকে ছুটলেন মানিক বোস। একবারের চেষ্টাতেই বিপুল ডাটকে লাইনে পেলেন।

—ডাট্, আমি মানিক বোস বলছি।

—ইয়েস মিঃ বোস, আমরা ডিক্টেটরে জানতে পেরেছি। আমাদের মেগাস্টার আপনার কারখানায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

—কারখানা থেকে। কিন্তু, তোমাদের মেগাস্টার আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। প্লিজ হেল্প মি।

—সরি এখন কিছুই করা যাবে না। মেগাস্টারকে বলে আনতে পারে একমাত্র একটাই মেসিন। লোভাঃ এক্স-ওয়াই-জেড। ওটা ফরেন থেকে আনতে হবে। সেণ্ট্রালের পারমিশান, ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্লিয়ারেন্স নানান ঝামেলা। এট লিস্ট-সিক্স মান্থস ইউ হ্যাভ টু বিয়ার উইথ আস।

—তাহলে আমি এখন কি করব? এখানকার প্রত্যেকটা মেসিনকে মেগাস্টার চালাতে শুরু করেছে। ইট'স মিরাকুলাস।

—ওটাই মেগাস্টারের কাজ মিস্টার বোস। অন্য মেসিনদের চালানোর জন্যই ওটা তৈরি হয়েছে।

—হোয়াট স্টুপিড আর ইউ টকিং। মালিকরা কি করবে তাহলে? তারা খাবে কি করে?

—দ্যাটস নট আওয়ার লুক আউট।

—বিপুল ইওর কন্ম কম্পানি ইজ গোয়িং টু ফার।

—নট আওয়ার কম্পানি মিস্টার বোস। দি সায়েন্স ইটসেলফ, ইজ গোয়িং টু ফার। রাইট? গুডনাইট।

ফোন ছেড়ে দিল বিপুল ডাট। রিসিভার হাতে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন মানিক বোস। লীলা বলল, পুলিসে একটা ফোন কর। কথাটা কানেই গেল না মানিক বোসের। লীলা চিৎকার করে উঠল, মানিক, ঐ যে যন্ত্রটা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানিক বোস চমকে ঘুরে তাকালেন। হেলতে দুলতে অন্য সব মেসিনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেগাস্টার। কোনটার নব ঘুরিয়ে দিচ্ছে, কারো চ্যানেল পাল্টে দিচ্ছে। এমনকি ঠিক তাঁরই মতো গুরুদেবের ছবিটার ধুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছে। না, এভাবে বোকার মতো হজম করে যাওয়ার কোন

মানে হয় না। প্রায় বিশবছর ধরে একটু একটু করে যে ব্যবসা গড়ে তুলেছেন তার দাবি এত সহজে ছেড়ে দেবেন না তিনি।

গেটের সামনে থেকে ইট তুলে ছুঁড়ে মারলেন সেডের মধ্যে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আবার একটা ইট ছুঁড়লেন। এবারে মেগাস্টারের পাখনায় গিয়ে লাগল। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন মানিক বোস। লীলা আশপাশ থেকে বড় বড় ইঁট, লোহার টুকরো যোগান দিতে লাগল আর মরিয়ার মতো সেগুলো ছুঁড়ে চললেন মানিক বোস। নাহঃ, থামলে চলবে না। লীলা হাঁফিয়ে পড়েছিল। মাণিক বোস বললেন, বি স্টেডি লীলা। আরো বেশি করে ইঁট নিয়ে এস। নো রেস্ট। আমাদের দখল বজায় রাখতেই হবে। আমাদের বাঁচার লড়াই।

সেডের ভেতরটা ভরে গিয়েছিল টুকরো ইঁট আর লৌহখণ্ডে। ফোষ্টরের কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ একসময় মেগাস্টার ঘুরে দাঁড়াল। হেলতে দুলতে এগিয়ে এল সামনের দিকে।

লীলা ছুটে গিয়ে সরিয়ে আনল মানিক বোসকে। মানিক বোসের মুখ, জামা ঘামে জবজব করছে। ওদের চোখের সামনে সেডের দরজাটা বন্ধ করে দিল মেগাস্টার।

লীলার হাত ছাড়িয়ে বন্ধ দরজার ওপর আছড়ে পড়লেন মানিক বোস টেনে খুলতে চেষ্টা করলেন। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে মেগাস্টার। চিৎকার করে উঠলেন, দরজা খোলো—আমি মানিক বোস—আমি এই কম্পানির মালিক—ছোট্ট একটা লেদ মেসিন নিয়ে আমি নিজে হাতে এটা গড়ে তুলেছিলাম—দরজা খোলো…।

লোহার ভারী দরজার ওপর পাগলের মতো মাথা ঠুকতে শুরু করলেন। লীলা থামাতে চেষ্টা করল, পারল না। তারপর একসময় দরজার নিচে বসে পড়লেন তিনি। ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকালেন লীলার দিকে। বললেন, বসে পড় লীলা। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাব না।

ঠিক তখনই একটা পুলিস জীপ গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। লাফিয়ে নামল তিনজন পুলিস। দুজন এসে হ্যাঁচকা মেরে দাঁড় করাল মানিক বোসকে। উনি হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলেন। একজন তার পেটে ঘুঁষি মেরে বলল, এখনো মস্তানি—এখানে হাঙ্গামা বাঁধাতে এসেছিস কিসের জন্য?

—এটা আমার কম্পানি। আপনারা কার পারমিসান নিয়ে ভেতরে ঢুকেছেন?

—তোর বাপের পারমিসান রে শুয়ার। চল্, থানায় চল্।

মানিক বোসকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল ওরা। তুলে, ছুঁড়ে দিল জীপের মধ্যে। লীলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, শুনুন আপনারা ভুল করছেন। উনি আমার হাজব্যাণ্ড। উনিই কম্পানির মালিক।

একজন পুলিস অফিসার ঠেলে সরিয়ে দিল লীলাকে। অপরজন গাড়ির মধ্যে মানিক বোসের হাতদুটো পেঁচিয়ে ধরে বলল, একটু আগে মেগাস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পানীর মালিক আমাদের ফোন করেছিল। যা ডেসক্রিপসান দিয়েছে সবই মিলে যাচ্ছে।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি স্টার্ট নিল। গলা তুলে লীলা বলল, আপনারা ভুল করেছেন। এটা বোস ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পানি। ঐ দেখুন।

সাইন বোর্ডের দিকে হাত দেখিয়ে নিজেই অবাক হল লীলা। একটু আগেই যে চকচকে সাইন বোর্ডটা তারা দেখে গিয়েছিল, তার জায়গায় একটা কালোতারা। তারাটার ঝকঝকে গা থেকে মাঝেমাঝেই ছিটকে উঠছে সাদা আলো।

গাড়ি হুস করে এগিয়ে গেল। লীলা শুনতে পেল মানিক বোসের প্রবল আর্তনাদ। একটা হাত তুলে ফাটাগলায় মানিক বোস বলল, লীলা, সেই আউট্রামের ইসমাইল···ওকে খবর দাও—সবাইকে জড় করতে বল, সেই ছাঁটাই হয়ে যাওয়া কর্মচারীদের জড় করতে বল। বোলো অবস্থান চালিয়ে যেতে—আমি আবার ফিরে আসব— আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই, জিততে হবে।

জিপ বাঁক ঘুরে গেল। মিলিয়ে গেল মানিক বোসের কণ্ঠস্বর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল লীলা। চারিদিক নিস্তব্ধ। সাইনবোর্ডের কালোতারা ঝিলিক দিয়ে উঠছে। সেই তারার দিকে তাকিয়ে লীলার চোখে জল এসে গেল। তারপর ধীরে ধীরে তার চোখ, থুতনি, দুটো কাঁধ শক্ত হতে শুরু করল। না, ফেরা নয়। আজকের রাত থেকেই শুরু হবে অবস্থান। হ্যাঁ, একজনকে দিয়েই শুরু হবে। ধুলো আর আবর্জনার মধ্যেই গেটের সামনে বসে পড়ল লীলা। বিড়বিড় করে বলল, এ লড়াই বাঁচার লড়াই—এ লড়াই জিততে হবে।

ভাষাতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথ

ইভ্‌গিয়েনিয়া মিহাইলোভনা বীকভা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করার রেওয়াজের বিরুদ্ধে খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই প্রতিবাদই বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তাঁর এই নিবন্ধ রচিত হয়েছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত, পূর্বে উল্লিখিত "বাংলা ব্যাকরণ" শীর্ষক নিবন্ধের প্রত্যক্ষ অনুস্মৃতি ও উত্তর-হিসাবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি নিয়মিত সভায় আলোচিত হয়। হরপ্রসাদের প্রবন্ধের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করেও নানা মত ব্যক্ত হতে থাকে। এক পক্ষ এটিকে বাংলার ভাষাতত্ত্বে নতুন সংযোজন বলে অভিনন্দিত করেন। তাঁরা বলেন, এই রচনা সাহিত্যের ভাষাকে মুখের ভাষার নিকটবর্তী হতে সাহায্য করবে। অন্যপক্ষ এই মতের বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথের মতের[২০] বিরোধিতা করে একটি বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী[২১]। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন "বাংলা ব্যাকরণ" (১৯০১) শিরোনামে এক নতুন প্রবন্ধ[২২]। এই প্রবন্ধে তিনি আরও দৃঢ়তা সহকারে ও প্রত্যয়ব্যঞ্জকভাবে দেখালেন: বাংলা ভাষার বিকাশের নিজস্ব নিয়মগুলি সংস্কৃতের বিকাশের নিয়মাবলী হতে ভিন্ন। আর তাই বাংলার ব্যাকরণে সর্বাগ্রে সেই বিষয়গুলির উপরেই আলোকপাত করতে হবে, যেগুলি সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা হতে তার পার্থক্যের দ্যোতক, অন্যান্য ভাষার সাথে তার সমধর্মিতার নয়। তিনি লেখেন, "আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোশাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুললক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ ক'টা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষ-রূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী

ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে-সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে, ছাপাখানার কালির ছাপে বঞ্চিত হইতে পারে, সাধুভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যবসা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে গতিবিধি রাখিতে হয়[২৩]। প্রত্যেক ভাষায় বিকাশের নিয়ম অন্য ভাষার বিকাশের নিয়মাবলী হতে ভিন্ন। কোনো ভাষা তার নিজের নিয়মানুসারেই অন্য ভাষা হতে আগত শব্দগুলিকে আপন করে নেয়"—রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একথা সুপরিজ্ঞাত যে নব্য ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহ একই উৎস হতে উদ্ভূত; সেই উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদরাজিকে তারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেছে। তাই বাংলায় সংস্কৃত শব্দগুলির যে রূপ, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দো—আর্য ভাষায় তা নয়; কেননা, এইসব ভাষার বিকাশের নিয়মাবলী, তাদের ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত কাঠামো পরস্পর ভিন্ন।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মতের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ আরও লেখেন, "বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান। সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদান কারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্ম-কারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে একথাই বা কেননা বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' কর্ম এবং 'গরিবকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে 'বালক', দ্বিবচনে 'বালকেরা' ও বহুবচনেও 'বালকেরা' না হইবে কেন। তবে বাংলা ক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ছাড়া যায় কী জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়—একবচন 'হইল', দ্বিবচন 'হইল', বহুবচন 'হইল'; একবচন 'দিয়াছে', দ্বিবচন 'দিয়াছে', বহুবচন 'দিয়াছে' ইত্যাদি। 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান-কারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন-কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন-কারক; 'সন্দেশ খাইলাম'

সম্বোধন-কারক; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন-কারক এবং এক বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।

"সংস্কৃত ও বাংলায় কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যায় মিল নাই, তাহা নহে। তাহার চেয়ে গুরুতর অনৈক্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর; এই জন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত কর্মবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উদ্ভূত"[২৪]। এরপর রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, এই কারণে, বাংলায়, আভ্যন্তরীণ কাঠামোর বিচারে সংস্কৃত হতে ভিন্ন, কি ধরনের বাক্যগঠন রীতির বিকাশ ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'ধনে শ্যামকে বশ করা গেছে।' বাক্যটি একটি সংক্রমণকালীন অবস্থার দ্যোতক। এখানে কর্মবাচ্য হতে কর্তৃবাচ্যে সংক্রমণ ঘটছে—কর্মবাচ্যের লক্ষণগুলি হারিয়ে যায়নি, আবার কর্তৃবাচ্যের লক্ষণগুলিও ফুটে ওঠেনি। কাঠামোর এই বাক্যটি কর্তা ও কর্মের মধ্যে কর্মবাচ্যমূলক-কর্মকারকীয় সম্পর্কের সূত্রে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এইরূপ কর্তৃহীন কবন্ধবাক্য সংস্কৃত ভাষায় হয়না বলিয়া কি পণ্ডিতমশায় বাংলা হইতে ইহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া দিবেন"[২৫]। কয়েকটি বাধ্যতা-নির্দেশক বাক্যকে অনুরূপভাবে পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে এসকল বাক্য সাধ্য-অসাধ্য, বাংলা ভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য। পণ্ডিতমশায় কোন্ পথে যাইবেন। 'আমাকে তোমায় পড়াতে হবে' বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃত-নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে"[২৬]।

ভাষার "প্রকৃতিগত ছাঁচ"-টিকে খুঁজে বার করার নীতি অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বিভিন্ন মূর্ত বিষয়ের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ১৯১১ সালে রচিত বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ" এবং 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য" শীর্ষক নিবন্ধদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম কর্তার দ্যোতনাকারী 'এ' বিভক্তি ব্যবহারের নিয়মগুলি সূত্রায়িত করেন এবং একক বিষয়, সাধারণীকৃত ধারণা ও সমষ্টি প্রভৃতির দ্যোতক জাতিবাচক বিশেষ্যের কয়েকটি বিশেষত্বের ওপর আলোকপাত করেন।

উপরোক্ত প্রকার গবেষণা পদ্ধতির সাথে রবীন্দ্রনাথের ভাষা সংক্রান্ত গবেষণায় যুক্ত হয়েছিল ব্যাকরণগত বর্গ বা শ্রেণী, রূপ এবং শব্দের রূপগত উপাদান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। আমাদের মতে ব্যাকরণের বহু ধারণার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সঠিক পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, "সম্বন্ধে কার" (১৮৯৮) শীর্ষক নিবন্ধে শব্দ নির্মাণকারী রূপ বা আকার এবং শব্দ রূপান্তরকারী বর্গ বা শ্রেণীর মধ্যেকার সীমানার প্রশ্ন তুলে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন : শব্দে রূপান্তর সাধনকারী সংযোজক হিসাবে ব্যবহৃত সম্বন্ধ-কারকের—'র' বিভক্তিটির সাথে সাধারণত্বজ্ঞাপক (এবং একটি নির্দিষ্ট পদের চৌহদ্দির মধ্যে ব্যবহৃত)—কার বিভক্তিটির তফাৎ কোথায়। শব্দ নির্মাণকারী—কার সংযোজনটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যবহৃত হয়, আর তাকে একটা নির্দিষ্ট অর্থগত ভারও বহন করতে হয়[২৭]।

"বাংলা বহুবচন" (১৯১১) শীর্ষক নিবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই একদিকে বহুবচনের রূপ নির্মাণকারী আকারগত বা রূপগত উপাদান—গুলা, গুলি ইত্যাদির এবং অন্যদিকে—গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, শ্রেণী প্রভৃতির মধ্যেকার সীমানা নির্দেশ করেছেন। বহুত্বের দ্যোতনা করার সময়ে শেষোক্ত শব্দরাজি একটা সমষ্টিভাবেরও দ্যোতনা করে[২৮]।

"স্ত্রীলিঙ্গ" (১৯১১) শীর্ষক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষায় লিঙ্গের ধারণার একটা শব্দ—ব্যাকরণগত চরিত্র আছে; অর্থাৎ, বাংলায় এই বর্গটি মুখ্যত শব্দগঠন বিধির চৌহদ্দির মধ্যেই সক্রিয়। বাংলায় এখনও ব্যাকরণগত লিঙ্গ সম্বন্ধে সংস্কৃত হতে আগত ধারণার অবশেষ রয়ে গেছে, "কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই সহজ হইতেছে ততই ইহা (স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ রূপের ব্যবহার—ই. ম. বী.) কমিয়া আসিতেছে। বিষমা বিপদ, পরমা সম্পদ বা মধুরা ভাষা পরম পণ্ডিতেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন না। বিশেষত বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পরে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তখন তাহা বর্তমান বাংলায় কথনই স্ত্রীলিঙ্গ হয়না—অতিক্রান্তা রজনী বলা যাইতে পারে কিন্তু রজনী অতিক্রান্তা হইল আজকালকার দিনে কেহই লিখে না"[২৯]।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাসংক্রান্ত নিবন্ধগুলির এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বাংলা ভাষার মূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করার জন্য এক প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেছিলেন। এই পথে অগ্রসর হয়ে তিনি ও তাঁর পাঠকেরা বাংলা ভাষার বিকাশের প্রকৃত স্বরূপটিকে নির্ণয় করতে ও তার [নিয়মগুলিকে] সাধারণীকৃত করতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্বিক নিবন্ধাবলীতে ধ্বনিত মূল সুরটি মাতৃভাষার ঐশ্বর্যরাজিকে পাঠককুলের সামনে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহকে বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। স্বাধীন ও শক্তিশালী ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিজ দেশবাসীগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের এক মার্গ এবং উপ-

নিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তিগুলিকে জোরদার করে তোলার এক উপায়।

অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক সংগ্রামে ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি কখনও কখনও কিছু ভুলভ্রান্তিও করেছেন। অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর ধারণার মধ্যে এই প্রকার ভ্রান্তির দেখা মেলে [দ্রঃ "ভাষা বিচ্ছেদ" শীর্ষক নিবন্ধ (১৮৯৮)]।

এই ভাষাগুলির জ্ঞাতি সম্পর্কের এবং অসমীয়া ও ওড়িয়ার আপেক্ষিকে সাহিত্যের বাংলা ভাষার অধিকতর বিকশিত হওয়ার ব্যাপারটির উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ তাদের সংযুক্ত করার স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। আর তাকে কার্যকরী করার জন্য আসামের ও ওড়িশার অধিবাসীদের পক্ষে বাংলা ভাষার অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল ইংল্যাণ্ডের আদর্শ। তিনি মনে করতেন যে, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং ওয়েলসে সাহিত্যের ইংরেজি ভাষা বিস্তার লাভ করার দরুনই ইংল্যাণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল[৩০]। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত এই পথ প্রকৃতপক্ষে বল প্রয়োগ করে বিভিন্ন ভাষাকে একটি ভাষার অভিভূত করার পথ।

অসমীয়া, ওড়িয়া ও বাঙালীরা নৃকুলগতভাবে খুবই কাছাকাছি গোষ্ঠীর মানুষ হলেও নিজ নিজ জাতিগত ঐতিহ্যসহ স্বাধীন বিকাশের এক দীর্ঘ বিলম্বিত পথ অতিক্রম করে[৩১]। তাই তাদের পরবর্তী বিকাশের নিজস্ব গতিধারাকে রুদ্ধ করার যে কোনো প্রয়াস সুনিশ্চিত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে বাধ্য। আর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে একথা বলতেই হয় যে বহু শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের, এমনকি কখনও কখনও রক্তাক্ত যুদ্ধের পরিণতিতেই সেখানে ইংরেজি ভাষার প্রভাবের এলাকা বিস্তার লাভ করেছে। ইংরেজ সামন্ত প্রভুদের এবং ধর্মযাজকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বার বার জ্বলে উঠেছে বৃটেনের জনগণের প্রতিরোধের আগুন—যথা, স্কটল্যাণ্ডে ওয়ালেসের[৩২] এবং আয়ারল্যাণ্ডে হিউ ওনীলের[৩৩] নেতৃত্বে পরিচালিত দেশপ্রেমিক যুদ্ধ।

ভারতের প্রতিটি জাতির স্বাধীন বিকাশের পথে, তাদের প্রত্যেকের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের জীবনের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মানকে আরও উন্নত করার মধ্যে দিয়েই ভারতের জনগণের যথার্থ মুক্তি সম্ভব—সাংস্কৃতিকভাবে অধিকতর উন্নত ও শক্তিশালী জাতিগুলি কর্তৃক পিছিয়ে

থাকা অংশের জনগণকে সাঙ্গিকৃত ও অধীনস্থ করার পথে নয়। অসমীয়া, ওড়িয়া ও বাংলার অন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ভ্রান্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তার পেছনে একাধিক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে ডঃ ব্রাউনের সেই পুস্তক যেখানে বলা হয়েছে, অসমীয়া ভাষা বাংলার চেয়ে হিন্দীর বেশি কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যে অংশটিতে বাংলা ও অসমীয়ার নিকটজ্ঞাতি সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তা ব্রাউন সাহেবের এই ভ্রান্ত বক্তব্যকে সার্থকভাবে খণ্ডন করে।

দ্বিতীয় এবং ব্যাপকতর কারণটি হল, ইংরেজের সেই রাজকৌশল, যার পরিণতিতে বাঙালি জাতির সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির এবং বাংলার সাথে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি সম্পর্কে আবদ্ধ প্রতিবেশী জনগণের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বলে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যখন এঁদের সকলের জন্য একটি মাত্র ভাষার প্রস্তাব করছিলেন, তখন তিনি উপনিবেশবাদীগণ কর্তৃক প্রোৎসাহিত এই শত্রুতা দূর করার একটি উপায় খুঁজছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই অবস্থানের অন্তিম তথা প্রধান কারণটিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য, জনগণের ঐক্যকে সুসংহত করার ও তাঁদের সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার উপায় হিসাবে ভাষার ভূমিকা সম্বন্ধে, এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের যুগের যে ধারণাগুলি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে প্রভাবশালী ছিল, তাদের দিকে তাকানো যেতে পারে। ভাষার এই ভূমিকাটিকে রবীন্দ্রনাথ একধরনের চরম সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং পরিণতিতে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের অবস্থানেরই বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি এই ব্যাপারটি যথেষ্ট পরিমাণে বুঝে উঠতে পারেন নি যে, ভারতে জায়মান বিভিন্ন জাতির প্রত্যেকটির পূর্ণ স্বাধীনতাই শুধু ভারতের ঐক্যের গ্যারান্টি হতে পারে।

এখানে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে, পরে আর কখনও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর "ভাষা বিচ্ছেদ" শীর্ষক প্রবন্ধটিকে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ সংকলনেও স্থান দেননি। এটা খুবই সম্ভব যে ইতিমধ্যে তিনি বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার আন্তসম্পর্ক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের অবস্থান হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

১৯১১ সালের পর অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ ভাষা সম্বন্ধে প্রায় আর কিছুই লেখেন নি। তিনি আবার ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন ত্রিশের দশকে;

তার ফল : প্রধানত শব্দতত্ত্ব ও শব্দার্থ সম্বন্ধে রচিত একগুচ্ছ প্রবন্ধ এবং ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত "বাংলাভাষা পরিচয়"। শেষোক্ত রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে ভাষা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাগুলিকে সাধারণীকৃত ও বিকশিত করেন।

i এবং u ধ্বনির সক্রিয়তা এবং সহজেই অন্য স্বরধ্বনি দ্বারা প্রভাবিত দুর্বল o হিসাবে a ধ্বনির ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য পূর্বেই সূত্রবদ্ধ হয়েছিল, এই পুস্তিকার ধ্বনিতত্ত্ব অংশে তা আরও বিকশিত হল। এখানে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্যটি সবথেকে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক তা হল : বাংলাভাষায় সংস্কৃত হতে আগত শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষায় সেই শব্দের উচ্চারণ হতে ভিন্ন, অতএব বাংলায় তৎসম শব্দ নেই। তিনি লিখেছেন, "বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম নেই বললেই হয়" [রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, ১৯৭০, পৃ. ৪১৭—অনু]। সত্যিই তো অনুরূপ বানান রীতি ছাড়া সংস্কৃত 'যম' এবং বাংলা 'যম' শব্দের মধ্যে কি মিল আছে? বাংলার লিখনপ্রণালী যদি ভিন্নতর হত, উচ্চারণের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ হত, তাহলে বাংলায় শব্দ ভাণ্ডার ভিন্নভাবে বর্গীকৃত হওয়া খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু ঐতিহ্যের শক্তি সর্বদাই বেশি, আর রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত প্রস্তাবের বাস্তবায়নের জন্য যা প্রয়োজন তা হল বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দগঠন বিধি সম্পর্কে ঐকান্তিক গবেষণা।

"বাংলাভাষা পরিচয়" শীর্ষক রচনায় বাংলা ব্যাকরণও আলোচিত হয়েছে। সে আলোচনা এসেছে বাংলাভাষার শব্দ ও শব্দরূপ ব্যবহার বিধির এবং শব্দার্থের ও রচনারীতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরার তাগিদ থেকে। এই অংশে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন : বহুবচনের লক্ষণগুলির শব্দার্থ গত ও শৈলীগত পার্থক্য, বিশেষ্য, সর্বনাম, সর্বনামজ শব্দ, ক্রিয়াপদ, সংযোজক ও অব্যয়ের বিভিন্নরূপের ব্যবহার, নামপদ সমন্বিত বাক্যের ও অন্যান্য বাক্যের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শৈলীতে বাক্যমধ্যস্থ শব্দক্রমের ভূমিকা প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

চলিত ও সাধুভাষার আন্তর্সম্পর্কের সমস্যাটি এখানে পর্যালোচিত হয়েছে শৈলীর প্রশ্ন হিসাবে। সংস্কৃতের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব কিভাবে সাহিত্যের বাংলাভাষার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল, তাকে সাধুভাষার চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রেখেছিল এবং জনগণের মুখের ভাষার অফুরান ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারটিকে অবহেলা করেছিল—গত শতকের আশির ও নব্বইয়ের দশকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাই

দেখাতে চেয়েছিলেন। এরই সাথে সাথে তিনি চলিত ভাষার মধ্যে নিহিত বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে বার করার কাজটিকে একটি প্রধান কর্তব্য হিসাবে উপস্থিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে পূর্বে যে তিক্ততার উদ্ভব ঘটেছিল, "বাংলাভাষা পরিচয়" রচিত হওয়ার সময়ে তা অনেক কমে গিয়েছিল। সাহিত্যের ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে চলিত ভাষার নিকটবর্তী হয়েছিল। আর সাহিত্যের বাংলাভাষার বিকাশ হতে দেখা যাচ্ছিল যে তার মধ্যে যেমন বাংলার নিজস্ব শব্দ ও শব্দরূপ সমূহের, তেমনই সংস্কৃত হতে আগত শৈলী এবং শব্দ সমূহেরও 'নাগরিক অধিকার' থাকা চাই; ভাষার এক অথবা অপর উপাদানের ব্যবহার প্রধানত এক অথবা অপর শৈলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা দরকার। বাংলাভাষার শক্তি তার চলিত রূপের মধ্যে নিহিত (তাই চলিত ভাষাই বাংলার পরবর্তী বিকাশের ভিত্তি হতে পারে)—এই মতের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, যদি বিভিন্ন উৎস হতে সম্পদ আহরণ করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলা যায় তবে সেই বিকাশ সম্ভবপর হবে। পুনরায় ইংরেজি ভাষার ইতিহাসের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "অভিধান দেখলে টের পাওয়া যাবে ইংরেজি ভাষার অনেকখানিই গ্রীক-লাটিনে গড়া।...কোনো বিশেষ লেখার রচনারীতি হয়তো গ্রীক-লাটিন ঘেঁষা, কোনোটার বা অ্যাংলো-স্যাকসনের ছাঁদ। তাই বলে ইংরেজি ভাষা জুটো দল পাকিয়ে তোলেনি।

"আমাদের ভাষাও সেই এক বড়ো রাস্তার পথেই চলেছে। কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই।...কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না"।[৩৪]

বাংলা শব্দ গঠন বিধিসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময়েও রবীন্দ্রনাথ ভাষার এই ঐক্যবদ্ধ রূপের এবং তার মধ্যেকার বিভিন্ন রীতির আন্তসম্পর্কের কথাটাই জোর দিয়ে বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত শব্দগঠন বিধির নিয়মানুগতার এবং বাংলা শব্দগঠন বিধিতে তার অভাবের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন: যদি দুটি শব্দের মধ্যে একটি বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়-বিভক্তি যোগে নির্মিত হয় এবং অপরটি সংস্কৃত প্রত্যয়-বিভক্তি যোগে, তাহলে, এমনকি তারা মূলত সমার্থবোধক হলেও তাদের শব্দার্থগত ও শৈলীগত তাৎপর্য অভিন্ন হয় না। বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়-বিভক্তিগুলি সংস্কৃতের প্রত্যয়-বিভক্তির চেয়ে বেশী ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও আবেগ-সম্পৃক্ত। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত-ত্ব

প্রত্যয় বাংলার সমার্থবোধক—মো প্রত্যয়ের তুলনায় নির্বিকার, সে "ভালো-মন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়, জড়-অজড় ভেদ করে না"।[৩৫] অর্থাৎ, বাংলা ও সংস্কৃত প্রত্যয়-বিভক্তিগুলি একে অপরের ডুপ্লিকেট নয়, তারা একে অপরের অনুপূরক; তারা একত্রে বাংলা ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডারের নির্মাতা।

রবীন্দ্রনাথের "বাংলাভাষা পরিচয়" শীর্ষক রচনায় ভাষা ছাড়া অন্যান্য সামাজিক এবং গভীরভাবে জাতীয় প্রসঙ্গাবলীও ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "সমাজ ও সমাজের লোকেদের মধ্যে··· প্রাণগত, মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপ মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা"। "···আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, এই বিশ্লিষ্টতা মানব ধর্মের বিরোধী। বিশ্লিষ্ট মানুষ পদে পদে পরাভূত হয়, কেননা, তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।"[৩৬] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ভাষা একটি সামাজিক ব্যাপার; ভাষা পরিবর্তিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মের অধীনে বিকশিত হয়; তার পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে, তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ও বিকাশের নিয়মাবলী দীর্ঘকাল কার্যকরী থাকে; ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ (পোশাক বদলানোর মতো ভাষা বদলানো বা পাল্টানো যায় না), যদিও কালের প্রবণতা তার মধ্যে আনে পরিবর্তন; মানুষের সচেতন প্রয়াস কোনো ভাষার নিয়মানুগ বিকাশকে বিলম্বিত করতে বা বাধা দিতে পারে, কিংবা তার বৈশিষ্ট্যরাজির সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে তীক্ষ্ণতা ও পূর্ণতা প্রদান করতে পারে[৩৭]।

ভাষা যে একটা সামাজিক ব্যাপার—রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা নিঃসন্দেহে তাঁর অতিপ্রগতিশীল ধারণাসমূহের অন্যতম। বাংলাভাষাকে পূর্ণতা প্রদান করার লক্ষ্যে পরিচালিত তাঁর সকল কাজের ভিত্তি হিসাবে তাঁর এই ধারণাটি কাজ করেছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ভাববাদের সমীপবর্তী। এক মহতী আত্মার মধ্যে মূর্ত কোনো বিমূর্ত ভাবনাই সকল বিকাশের চালিকাশক্তি—এই প্রতীতি হতে অগ্রসর হয়ে তিনি বহু জায়গায় লিখেছেন যে ভাষার স্রষ্টা হল বহু আত্মার সামূহিক প্রজ্ঞা। তার ভাষায়ঃ "হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কখন এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহুসংখ্যক

মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ"[৩৮]। যদি আত্মার প্রাথমিকতায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় তাঁর দার্শনিক নিবন্ধাবলীতে যথেষ্ট পরিমাণে ফুটে না উঠত, তাহলে উপরে উদ্ধৃত কথাগুলিকে কাব্যের উপমা বলে মেনে নেওয়া যেত।

অনুরূপভাবে ভাষার রীতি বা শৈলী সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বটিও আত্মমুখী। চেতনা ও সত্তার আন্তসম্পর্ক সম্বন্ধে ভাববাদী ধারণার এবং মানুষের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার মধ্যে তাঁর এই তত্ত্বের উৎসটি নিহিত। সাধু ও চলিত—বাংলা ভাষার এই দুই রীতি গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতিতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এছাড়াও আরো দুটি শৈলী বাস্তবতাকে ব্যক্ত করে: একটি হল বুদ্ধি সাধনার [বা জ্ঞান-চর্চার] ভাষা (=দর্শনের ও বিজ্ঞানের ভাষা), আর অন্যটি হৃদয় বৃত্তির [বা ভাবের] ভাষা (=কাব্যের ভাষা)। আর, তাঁর মতে, হৃদয় বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে কাব্যে।[৩৯]

রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক বিশ্ববীক্ষার সাথে এই তত্ত্ব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ: আর্টের কাজ হল যা ব্যক্তিগত তাকে প্রকাশ করা। ব্যক্তিগত জগত হল হৃদয়বৃত্তির জগত। একে শুধু জানলেই চলবেনা, অনুভবও করতে হবে; কেননা, একে অনুভব করেই আমরা নিজেকে অনুভব করি, নিজের সামর্থ্যকে প্রকাশ করি। হৃদয় বৃত্তির জগত হল কাব্যের জগত; বাস্তব জগতের সাথে, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞান মার্গীয় জগতের সাথে, এই জগতের সমাপতন ঘটেনা।[৪০] আর এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উপরে উপরে উল্লিখিত দুই [অতিরিক্ত] শৈলীর ধারণার মধ্যে।

ভাষার মধ্যে পরিলক্ষিত কয়েকটি রূপ বা আকারের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। যথা, বহুবচন জ্ঞাপক—দিগ্,-দিগের,-দি,—দের প্রত্যয়ের উদ্ভব[৪১] সংক্রান্ত এবং, যে সব নৈর্ব্যক্তিক—ক্রিয়ারূপে আগে অন্ত্য a ছিল সেখানে আধুনিক কালে অন্ত্য e-র উদ্ভবের কারণ সংক্রান্ত ধারণা। অনেক সময়ে সাহিত্যের ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসার উৎসাহে তিনি ভাষার মধ্যে বিশেষণাত্মক উপাদানের বিকাশের ব্যাপারটিকে লঘু করে দেখেছেন। যেমন, "ভাষার খেয়াল" (১৯৩৫) নিবন্ধে বাংলাভাষার শব্দ ভাণ্ডার হতে 'জিজ্ঞাসা করিল', 'উদ্‌ঘাটন করিল' প্রভৃতি শব্দ-সমাহার বিসর্জন দিয়ে তিনি তার জায়গায় 'জিজ্ঞাসিল'

'উদ্‌ঘাটিল' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।[৪২] কিন্তু আমরা চাই বা না চাই অন্যান্য ভাষার মতো বাংলাতেও এই ধরনের শব্দ-সমাহার রয়েছে এবং গড়ে উঠছে।

"বাংলাভাষা পরিচয়" শীর্ষক পুস্তিকাটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী। নানাদেশের শব্দ-মহলের, এমনকি, তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব। তাতে করে মনে তোমরা সেই চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে"।[৪৩]

রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষা সংক্রান্ত গবেষণা অতি মূল্যবান। এই গবেষণা বাংলার বিবরণমূলক ব্যাকরণ লেখার মালমশলা যুগিয়েছে। বাংলা ভাষার বিকাশের সঠিক পথটি কোন্ দিকে গেছে তাও দেখিয়ে দিয়েছে। কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষাকে (বাংলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র কলকাতার কথ্য ভাষাকে) সাহিত্যের বাংলা ভাষার ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে ভাষা হিসাবে বাংলার বৈশিষ্ট্য সমূহকে, সর্বাগ্রে চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনলসভাবে সংগ্রাম করে গেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্রত্যেক ভাষার বিকাশ ঘটে তার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে। তিনি নিজে তাঁর মহান পূর্বজদের —রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পদাঙ্ক সফলভাবে অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা যুগপৎ বাংলার জনগণের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপক অধ্যয়নের এক কর্ম-কাণ্ডের এবং বাঙালি জাতির নিজস্ব বিকাশের স্বার্থে নিবেদিত সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রেও নতুন পথ দেখাতে পেরেছিলেন, সেই পথে বাংলা ভাষার ছাত্রদের পরিচালিত করতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্যকৃতির মতো তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাও বাংলা ভাষার পরবর্তী বিকাশকে এবং বাংলা ভাষা সংক্রান্ত পরবর্তী গবেষণাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। অবশ্যই সকল পণ্ডিতই তাঁর

অনুগামী হননি। পূর্বোল্লিখিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ছাড়াও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সংস্কৃতের ভূমিকা কিছুটা কম করার রবীন্দ্র-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন নি[৪৪]। অন্যদিকে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে এক কাম্য নব্য ধারার প্রবর্তক বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। বাংলা ভাষার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রকরণ ভিত্তিক অভিধান-গুলির মধ্যে একটির রচয়িতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর "বাংলা শব্দতত্ত্ব" শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের বহু প্রাসঙ্গিক ধারণা, বিশেষত বাংলার নিজস্ব শব্দ সম্পদ সংগ্রহ করে একত্রিত করার জন্য "ধ্বন্যাত্মক শব্দ" নিবন্ধে ব্যক্ত তাঁর আহ্বান পাঠক সমাজে সাড়া জাগায় এবং পরবর্তী কর্মধারার স্রোতমুখ খুলে দেয়[৪৫]। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও তার মুখপত্র "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" রবীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে ১৯০১ সাল থেকে বাংলার নিজস্ব শব্দ-সমূহের তালিকা প্রকাশ করতে থাকে। মধ্যে একটি ছিল "বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা"। পরিষৎ এই তালিকাটিকে, নিম্নলিখিত নিবেদনসহ, একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন :

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষৎ সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্বে পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে দু-একজন মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তি স্ব স্ব ইচ্ছামতো শব্দ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটা প্রণালী অনুসারে সংগ্রহকার্য চলিতে না থাকিলে কোনো দিন কার্যের উন্নতি এবং সমাপ্তি ঘটিবে না, এই বিবেচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগৃহীত 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' প্রকাশ করিয়া আপনাদের নিকট পাঠাইতেছেন।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একান্ত অনুরোধ, আপনি বা আপনার বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে এই তালিকার অতিরিক্ত বাংলা ক্রিয়াপদের সংগ্রহ করিয়া দিলে পরিষদের বিশেষ সাহায্য হইবে। সংগ্রহ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মহাশয়ের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছি—"। এরপর, শব্দ সংগ্রহ করার সময়ে পালনীয় নিয়মগুলি দেওয়া হয়েছে[৪৬]।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসের প্রভাবে বাংলা ব্যাকরণের চরিত্র পাল্টাতে থাকে; পরবর্তী ব্যাকরণকারদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের রচনায় বাংলা ভাষার নিজস্ব

বৈশিষ্ট্য সমূহকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন: "অপরিবর্তনীয় শব্দরাজি বাংলা ভাষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহারা বাংলার অতি মূল্যবান সম্পদ। শব্দ-প্রকরণ, প্রত্যয়-বিভক্তি, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রায় সকল শাখায় তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত। আমি তাহাদের প্রকৃতিটি ব্যক্ত করিতে, তাহাদের শ্রেণী বিভক্ত করিতে এবং, তাহাদের অর্থ ও ব্যবহার বিধি পরিস্ফুট করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত 'শব্দতত্ত্ব'[৪৭] আমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে"[৪৮]। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা বিষয়ক গবেষণা যে সেই যুগে কি ধরনের সাড়া জাগিয়েছিল তার প্রথম পরিচয় অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল আরও আগে: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রে প্রকাশিত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর একাধিক প্রবন্ধে ("বাংলা ভাষার ব্যাকরণ", ১৯০১; "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়", ১৯০১; "কারক-প্রকরণ", ১৯০৫; "ধ্বনি-বিচার", ১৯০৭)[৪৯]।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা তাঁর সকল সৃজনশীল কাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল। মাতৃভাষার প্রণালীবদ্ধ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি অনলসভাবে নিজের রচনার ভাষাকে পরিশীলিত করেছেন। মানুষের সচেতন কার্যকলাপ কোনো ভাষার নিয়মানুগ বিকাশকে বিলম্বিত করতে বা বাধা দিতে পারে অথবা, সেই ভাষাভাষী জনগণের মুখের ভাষার (চলিত বা কথ্য ভাষার) স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাকে তীক্ষ্ণতা ও পূর্ণতা প্রদান করতে পারে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। তাঁর এই প্রিয় মতটিকে তিনি সর্বদাই নিজের জীবন সাধনায় অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনার সাথে তাঁর পরবর্তী কালের রচনার ধারাবাহিক তুলনা হতে দেখা যায়, কিভাবে তাঁর নিজের ভাষা ধীরে ধীরে চলিত ভাষা হতে আহৃত উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে (সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্যসূচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপের পরিবর্তে তাদের হ্রস্ব রূপের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে; গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে যুক্তবাক্য; -ইয়া অন্ত নৈর্ব্যক্তিক-ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপক-ভাবে; দেখা গেছে কথ্যভাষার শব্দ ভাণ্ডারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা নতুন নতুন শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ; চলিত ভাষা ও সাধুভাষার উপাদান সমূহের মেলবন্ধ পূর্ণতা লাভ করেছে দক্ষতর হাতের ছোঁয়ায়। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর বিকাশ সর্বদাই ঘটেছে

আঁকাবাঁকা পথে। সেই পথটিকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে বোঝা যায় তিনি কতো বড়ো কথাশিল্পী ছিলেন। তিনি কখনও তাঁর কোনো রচনাকে একেবারে পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে বলে ভাবেন নি, তার জালে বাঁধা পড়েন নি। তাই যেমন কবিতায় ও গানে, তেমনি গদ্যশৈলীর ক্ষেত্রেও তিনি নিত্য নতুন রূপের সন্ধান করেছেন"[৫০]।

ভারতে শিক্ষার বিস্তারের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রভূত শক্তি ব্যয় করেছিলেন। তাঁর এই কাজের একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে শান্তিনিকেতনে প্রথমে বিদ্যালয়, এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সেখানে মাতৃভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার উপর সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হত। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাংলা ভাষার পাঠ্যপুস্তকও প্রণয়ন করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বাংলা বানান সংস্কার সমিতির কাজে অংশগ্রহণ করেন। কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার চালান। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসবে সেখানকার ঐতিহ্য ভঙ্গ করে তিনি ইংরেজির বদলে বাংলায় ভাষণ দেন।

বাংলা ভাষার চর্চা, আর তাকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃজনী কর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক মহান শিল্পীর, পণ্ডিতের ও দেশপ্রেমিকের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আবেগ নিয়ে তিনি সেই কাজ করে গেছেন। সুকুমার সেন ঠিকই লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গবেষণা বাংলা ব্যাকরণের বহু প্রশ্নের উপর আলোকপাত করে। নতুন পথের পথিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে অন্যতম হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে"[৫১]।

[প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহে অপারগতার কারণে ৪৮, ৫০ এবং ৫১ নং উল্লেখে সন্নিবেশিত উদ্ধৃতিগুলি রুশ হতে বাংলায় পুনরায় অনূদিত হয়েছে। অন্য সকল উদ্ধৃতি মূল রচনা হতে সংগৃহীত।—অনুবাদক।]

মূল রুশ থেকে অনুবাদ : প্রদীপ বক্সী

উল্লেখপঞ্জি ও টিকা

২০. রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত আলোচনা শেষ হওয়ার অনেক পরে এটি মুদ্রিত হয়।

২১. শ. শাস্ত্রী, নূতন বাংলা ব্যাকরণ, "ভারতী", ১৩০৮, অগ্রহায়ণ (১৯০১)।

২২. র. ঠাকুর, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড।

২৩. তদেব, পৃ. ৫৬৯-৫৭০।

২৪. তদেব, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬।

২৫. তদেব, পৃ. ৫৬৭।

২৬. তদেব।

২৭. তদেব, পৃ. ৩৬৮-৩৭০।

২৮. শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৩৪২ (১৯৩৫), পৃ. ১৪৭।

২৯. তদেব, পৃ. ১৫১।

৩০. র. ঠাকুর, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৪৭।

৩১. B. Kakati, Assamese, its formation and development, Gauhati, 1941 ;
S. K. Chaterjee, the place of Assam in the history and civilisation of India, Gauhati, 1955.

৩২. J. R. Green, A short history of the English people, London, 1875. p p. 178-187 ;
অ. ল. মর্টন, ইস্তোরিয়া আঙ্গলিই (ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস), মস্কো, ১৯৫০, পৃ. ৯৬।

৩৩. অ. ল. মর্টন, তদেব, পৃ. ২২১।

৩৪. র. ঠাকুর, রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।

৩৫. তদেব, পৃ. ৪২৪।

৩৬. তদেব, পৃ. ৩৭৪।

৩৭. তদেব, পৃ. ৩৮৯।

৩৮. তদেব, পৃ. ৩৮৮।

৩৯. তদেব, পৃ. ৩৮১।

৪০. র. তাগোর, লিচনোয়ে (personality), মস্কো, ১৯২২, "স্তো তাকোয়ে ইস্কুস্স্ত্ভো ?" (What is art ?) শীর্ষক অধ্যায়।

৪১. S. K. Chaterjee, ODBL, p. 730.

৪২. র. ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১৮৫।

৪৩. র. ঠাকুর, রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, পৃ. ৩৭১।

৪৪. দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬৩৬।

৪৫. শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, বাংলা শব্দতত্ত্ব, "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা", ৮ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২২-২৯।

৪৬. দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬৩৯-৬৪০।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ সংকলনের শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল "বাংলা শব্দতত্ত্ব"।

৪৮. শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ভাষাবোধ বাংলা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৩৪৬ (১৯৩৯), পৃ. ।৵০-।৶০।

৪৯. শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শব্দকথা, কলিকাতা, ১৩২৪ (১৯১৭)।

৫০. সু. সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য পৃ. ৩৩৯।

৫১. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২, পৃ. ৩৩৯।

উৎস-সন্ধানে

অরুণা হালদার

বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীযুক্তা কেতকী কুশারী ডাইসন অধুনা একটি পরিচিত নাম। বর্তমানে ভারতের বাইরে নানাদেশে যে সব বসবাসকারী সাহিত্য কর্মী ও পাঠক সমাজ আছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। এদেশের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত একপ্রকার সশ্রদ্ধ-বিস্ময় ও বিশিষ্ট আভিজাত্য দিয়ে তাঁদের দেখা হয়। এঁদের রচনায় বর্তমান বাঙ্গালাসাহিত্যে তাঁদের কেহ কেহ একটি নূতন ধরনের মাত্রা সংযোজন করেছেন। এদেশের তিনি কৃতী ছাত্রী এবং বর্তমানে লণ্ডনে প্রবাসী ভারতীয় হিসাবে সেখানেই বাস করেন। এসব মানুষ খুব স্বাভাবিক ভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলির উন্নত জীবনমানের পরিচয় পান; সেখানকার বহন-বাহনের সুবিধায় অভ্যস্ত হন। আর, সেই সঙ্গে বিদেশবাসের ফলে মুক্ত বা পর্মিসিভ সোসাইটিরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসকল সুবিধা সত্যই কোনও কোনও সাহিত্যিক বা গবেষক বা অধ্যাপকের কাজের সহায়ক হতে পারে। আবার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরকম প্রতিষ্ঠা এদেশের প্রবাসী ও ছিন্নমূল মানুষকে ভারতীয় জীবনের তথা দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বিযুক্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যসর্বস্ব বিজাতীয় মননে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে। আমাদের দেশের বহু সাহিত্য কর্মী গবেষক অধ্যাপকের অনেকেই এরূপ জীবন বেছে নিয়ে আনন্দে আছেন। তাঁদের অর্থ যশ ভাগ্যও অবারিত হয়েছে। আলোচ্য লেখিকা তাঁদের অন্যতম। এক দশক আগে প্রকাশিত 'ন হন্যতে' বইটির মত তাঁর উপরি উক্ত বইটিও বহু-প্রচলিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা তাঁর এ গ্রন্থকে উপন্যাস বলেছেন। (বস্তুত দ্বিতীয় উপন্যাস)। মুখবন্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর আঙ্গিক নূতন ধরনের। পদ্ধতির বিচারে তিনি বলেছেন গ্রন্থনা "রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত", "কাপড়ের বুনটের টানাপড়েনের মত" "একটি সমগ্র সিমফনির" মত তাঁর

মধ্য থেকে "নির্গত" বা উৎসারিত। লেখিকা বলেছেন একই মানুষের মধ্য থেকে "নির্গত" হতে পারে "সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ" এবং "একাডেমিক অনুসন্ধান" কারণ দুটিই মানুষের "স্বভাবের মধ্যে বর্ত্তমান"। এটি তাঁর মত হলেও বিশ্বসনীয় নয়। একই লোক ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক হতে পারেন ঠিকই। কিন্তু উপন্যাসজারিত প্রবন্ধ আর প্রবন্ধমিশ্রিত উপন্যাসগন্ধী একত্রিত রচনা উপাদেয় হয় কিনা তা সুধী পাঠকই বিচার করবেন।

তথাকথিত এই প্রবন্ধ উপন্যাসের কয়েকটি বিবিক্ত উপস্থাপনা আছে। এগুলি যেমনভাবে এসেছে সেইভাবে পর্যবেক্ষণ যোগ্য। (১) লেখিকার অনবদ্য অনুবাদ কুশলতা। লাদিনো উপভাষায় বিধৃত এককালের সেফার্দ্দিক ইহুদীদের হিব্রু-স্পেনীয় লোকসঙ্গীতগুলি। এ সঙ্গীত লোকসঙ্গীতের সারল্যে ঋজু এবং মাধুর্য রসঘন। এরকম কিছু সঙ্গীতের পরিবেশনা বাংলাতে তিনি বাঙ্গালি পাঠককে দিয়ে নিশ্চয় মুগ্ধ করেছেন। (২) লেখিকা বহুশ্রুত বিদুষী ও বহুভাষাবিদ্। দীর্ঘকাল ইয়োরোপ প্রবাসে থাকলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বিশেষ লাতিন গ্রুপের ভাষাগুলি (ফরাসী স্পেনীয় ইতালীয় ফ্লেমিশ) এবং টিউটন গ্রুপের ভাষাগুলি (ফরাসী স্পেনীয় ইতালীয় ফ্লেমিশ) এবং টিউটন গ্রুপের মধ্যে জর্মণ ভাষা আয়ত্ত হয়ে যায় অনেকেরই। কিন্তু সে কাজচলা কথ্য ভাষা আর সাহিত্য অনুবাদের শক্তি অর্জন করার মত স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা করা তো এক কথা নয়। এই স্পেনীয় ভাষায় তিনি অর্দ্ধ হিব্রু অর্দ্ধ স্পেনীয় ভাষায় লেখা লাদিনো সঙ্গীতের অনুবাদ করেছেন—তার সুরধারায় খুঁজে পেয়েছেন ভারতীয় লোকসঙ্গীতের অনুরণন। (৩) গ্রন্থকর্ত্রী কঠিন পরিশ্রমে স্পেনীয় ভাষা আয়ত্ত করেছেন। এটি তিনি মনে হয় সহজাত তাঁর ভাষাশিক্ষার প্রবণতা থেকে করেছেন। তা করলেও সেই আয়ত্ত করার পরিশ্রম তিনি স্বীকার করেছেন, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সৌহার্দ্দ্য ভাবনাটির কল্পনাকে নিজের কাছে তথা পাঠককুলের কাছে স্পষ্ট ক'রে তোলার জন্য। ভিকতোরিয়ার স্পেনীয় রচনাকে তিনি সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। ইংরাজীতে লেখা (ডাটিংটন রেকর্ডস) তাঁর চিঠিপত্র ও এলমহার্স্টের পত্রের অনুবাদও স্বচ্ছন্দ বাংলাও আমরা পেয়ে যাই। এসবই লেখিকার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তথ্যনিষ্ঠ ভাবনার উজ্জ্বল উদাহরণ। তার চাইতেও একটা বড় কাজই তাঁর হয়ে উঠেছে মূল রবীন্দ্র-রচনার আনুপুঙ্খ অনুধ্যান। একাজ তিনি করেছেন বাঙালী পাঠকের কথা ভেবে, এজন্যও আমরা কৃতজ্ঞ। বস্তুত, হিমেনেথদম্পতি কৃত স্পেনীয় ভাষায়

গীতাঞ্জলির অনুবাদ ভিক্তোরিয়া সর্বত্র গ্রহণ করেন নি। তাঁর লেখায় যেসকল রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ স্পেনীয় ভাষায় তিনি করেছেন তার অধিক অংশই সরাসরি রবীন্দ্রনাথের মূল ইংরাজি রচনা এবং ইংরাজি অনুবাদ থেকে নেওয়া। সুতরাং বাঙলা থেকে ইংরাজি অনুবাদ আবার তা থেকে স্পেনীয় অনুবাদ এবং মূল ইংরিজি রচনার (যেমন ন্যাশনালিজম প্রভৃতি প্রবন্ধ) স্পেনীয় অনুবাদ ভিকতোরিয়া করেছেন নিজের জন্য প্রধানত এবং অবশ্যই 'সুর' প্রকাশনার মাধ্যমে তাঁর স্বদেশবাসী স্বভাষাভাষী পাঠককে রবীন্দ্রভাবনা উপহার দেবার জন্য। এই অনুবাদের অনুবাদ (স্পেনীয়) থেকে লেখিকা আর অনুবাদ করেন নি। তিনি কঠিন পরিশ্রম করে ঐ অনুবাদগুলির সম্ভবপর আধার মূল রচনাগুলিই আগ্রহী বাঙালী পাঠকের সামনে সাজিয়ে দিয়েছেন। লেখিকার বিদ্যাবত্তা কৃতিত্ব এবং য়ুরোপীয় গবেষক-নিবন্ধ-কোচিত যথাযথ তথ্যপঞ্জীর বিন্যাস প্রশংসনীয়।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে ভিকতোরিয়া ওকাম্পো কবি প্রণাম করেন তাঁর 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানি লিখে। এ গ্রন্থের ন্যূনাধিক প্রায় একদশক পূর্বে সুকবি শঙ্খ ঘোষ সমূহ টীকা-টিপ্পনী দিয়ে আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। সেই মিরালরিও গৃহে রচিত হয় বহু কবিতা যেগুলি সন তারিখ ও স্থানের উল্লেখসহ 'পূরবী' গ্রন্থে সন্নিবেশিত। কবিতা-গুলি পরিপূর্ণতায় সমুজ্জ্বল, রসভাবে সুসম্পূর্ণ। কবির কাটাকুটি খেলাচ্ছলে ছবি আঁকার ঠিক শুরু এখানেই কিনা জানি না। 'পূরবী' বইখানি উৎসর্গিত হয়েছে ভিকতোরিয়াবিজয়ার করকমলে। বস্তুত এই পরিচয়ের ক্ষেত্রে সুকবি শঙ্খ ঘোষ মহাশয়ই আমাদের কাছে পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও বহু খুঁটিনাটি তথ্য ও তথ্যভিত্তিক তত্ত্ব আলোচ্য গ্রন্থকর্ত্রী তাঁর গ্রন্থে সাজিয়ে তুলেছেন। এজন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। শঙ্খ ঘোষ মহাশয় যে প্রেরণায় অনুবাদ করেন, বা ভিকতোরিয়া যে প্রেরণায় 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' লেখেন; আলোচ্য গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে একেবারে ভিন্ন। শঙ্খ ঘোষ মহাশয়ের বইটি ছাড়াও কৃষ্ণ কৃপালানি মহাশয়ের একখানি ছোট পুস্তিকাও এ সম্বন্ধে ইংরাজিতে আছে—সেটিও প্রসাদগুণ-সমন্বিত। ভিকতোরিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিও প্রযুক্ত হতে পারে—"কখনও দিয়েছে দেখা হেন প্রভাকালিনী যারা এককালিনী নয় যারা চিরকালিনী।" ভিকতোরিয়া স্পর্শ করেছেন রবীন্দ্রমানসের পরম বা ভূমা-সহ তাঁর দ্বন্দ্বাকীর্ণ সত্তাকে। সেই স্পর্শ মাত্রই সকল অস্তিত্ব সহ ভিকতোরিয়াকেও জাগ্রত করেছে। "রসতীর্থ

পথের পথিক "রোমান্তিক" রবীন্দ্রনাথকে তিনি বুঝতে পারেন। তিনি এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে "সন্ত" মহাত্মাজীর পার্থক্য নিজেই আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত এই তথ্যটি আমরা আলোচ্য গ্রন্থে বিধৃত দেখতে পাই।

ভিকতোরিয়া দক্ষিণ আমেরিকার (আর্জেনটাইনা) বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের কন্যা ও পরে সেরকম পরিবারেই তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে ইয়োরোপ ভ্রমণে যান ও অনতিকাল পরেই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হন। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানসমাজে বিবাহবিচ্ছেদ হয়না। রবীন্দ্রনাথের প্রবাস-বাসকালে তিনি স্বামীসঙ্গ-বিচ্ছিন্না বা স্বামীসঙ্গ-বর্জনকারিণী হিসাবেই স্বতন্ত্র থাকতেন। মুক্তসমাজ বা পার্মিসিভ সোসাইটির ধরনে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন কী প্রিয়জনেরও যে অস্তিত্ব ছিল তা আমরা এই আলোচ্য গ্রন্থে জানতে পারি। এই কৃতী মহিলার বুদ্ধি ও হৃদয় দুই-ই স্ব স্ব প্রধান ছিল বলে আমরা মনে করি। ল্যাটিন নারীর হৃদয়াবেগ পুরো থাকলেও তাঁর বুদ্ধি তাঁকে কখনও মাত্রা হারাতে দেয়নি। তবে তিনি যা ধরতেন তা করে ছাড়তেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিথি হিসাবে মিরালরিও থাকাকালে একদিন কবিকে ভিকতোরিয়া বোদলেয়রের একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তাতে একটি প্রাচীন অভিজাত-গৃহের ও তৎসংলগ্ন মহার্ঘ প্রাচীন আসবাবের বর্ণনা ছিল। কবি বলেন—'ভিকতোরিয়া এ আসবাবের কবিতা আমার ভালো লাগছে না।' একথা রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে স্মরণ করেছেন। ভিকতোরিয়া যা করবেন বলে মনে করতেন, তা সম্পন্ন করার শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ যে আরাম-কেদারাটি ব্যবহার করতেন মিরালরিওতে, ভিকতোরিয়া সেটি কবির সঙ্গে দেবার সঙ্কল্প করেন। কার্যত দেখা গেল, জাহাজের কেবিনের দ্বার ছোট, কেদারাটি বড়। ভিকতোরিয়া সেই 'জুলিও চেজারে' জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলে মিস্ত্রী দিয়ে দ্বার বড় করিয়ে কেদারাটি কেবিনে রাখার ব্যবস্থা করান। জীবনশেষের দিকে কবি এ কেদারাটিতে বিশ্রাম করতেন। একটি কবিতাও আছে কেদারাটির উপর, সেটি উপহারদাত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভিকতোরিয়ার সবল, ঋজু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত কৌতুকবোধও থাকার কথাই। নিজেকে নিয়ে তিনিও কৌতুক করতে পারতেন। শঙ্খ ঘোষ মহাশয়ের অনূদিত 'সান-ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আমরা দেখি তিনি একটু দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের উপর লক্ষ্য রাখতেন—অতিথির আরাম, খাদ্যাখাদ্য তদারক করতেন এবং তিনি একটা কঠিন কাজও এলমহার্স্ট (কবির সেক্রেটারি) মহাশয়ের সঙ্গে একত্র হয়ে সম্পন্ন করতেন। এ কাজটা

হল যে সকল অভদ্র অতিথি অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে দেখে পরিচয় করতে আসতেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং কবিকে রক্ষা করা। এসবই সম্পন্ন হত তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে (মুক্ত নারীত্বের জোরে কিনা বলা শক্ত)। এই ব্যক্তিত্ববলেই তিনি ১৯৩০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীটি সুনির্বাহিত করতে পেরেছিলেন। এসকল কথা ধরে নেওয়া যাক যাঁরা রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক তাঁদের জানা আছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা এ সকল বিষয়ও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

অন্য যে নতুন বিষয়টি আলোচ্য গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের পরিবেশন করেন তা হল লেনার্ড এলমহার্স্ট সম্বন্ধে একটি তথ্যনির্ভর উপাদেয় আলোচনা। শুধু এলমহার্স্ট সম্বন্ধে বললে ভুল বলা হবে। এ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ-এলমহার্স্ট, এলমহার্স্ট-ভিকতোরিয়া এবং রবীন্দ্রনাথ-এলমহার্স্ট-ভিকতোরিয়া এই ত্রয়ীর মধ্যেকার বিশিষ্ট মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রূপায়ণ পাওয়া যায়। এলমহার্স্ট শুধু ভারত-প্রেমী বা রবীন্দ্রপ্রেমী নন। এখানে তিনি শিক্ষিত, সুদর্শন, পরিশীলিতচিত্ত ইংরাজ যুবা এবং বুদ্ধিজীবী আদর্শবাদী। আদর্শবাদী না হলে কেনই বা তিনি শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডে যোগ দেবেন। তাঁর বাগ্‌দত্তা মার্কিনী মহিলা ডরোথি হ্রেট অর্থ দিয়ে শ্রীনিকেতনের কর্মে সহায়তা করেন। পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনই ডার্টিংটন হলে ডিভনশায়ারে অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা ডার্টিংটন হলে গিয়ে সেখানকার রেকর্ড পাঠ করে অনেক নবীন তথ্য ও কিছু তদতিরিক্ত তত্ত্ব আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। বাঙালী পাঠক এই অংশটির জন্য নিশ্চয়ই লেখিকার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

ডার্টিংটন হলে রক্ষিত এলমহার্স্টের পরিশোধিত দিনলিপি থেকে আলোকিত হয়ে ওঠে দূর প্রবাসে ভারতীয় কবি তাঁর ইংরাজ সেক্রেটারি ও আতিথ্যপরায়ণা ভক্ত পাঠিকা ও বান্ধবী ভিকতোরিয়ার সজীব ও বিস্ময়কর সম্পর্ক ও পরে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন পথে বিশ্লিষ্ট হয়ে চলে যাওয়া। এ সত্ত্বেও জানতে পারি যে এলমহার্স্টের শেষ জীবন পর্যন্ত রবিরশ্মির আলোক এবং ভিকতোরিয়ার সঙ্গে পত্রালাপ দুই-ই ডার্টিংটন হলে জাগরূক ছিল। আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদের অনন্য ছবিখানি রবীন্দ্রনাথেরই অঙ্কিত এবং ঐ ডার্টিংটন হল থেকেই পাওয়া। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র গ্রন্থকর্ত্রী সেস্থানে কর্মী মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও তাঁদের সহায়তায় দেখেছেন বলে বলেছেন।

সেসব কথাবার্তাতেও একটি সরস কৌতুকের ছবি ভেসে ওঠে। এলমহার্স্ট-পত্নী ডরোথি চিরজীবন নাকি একদিকে ভিকতোরিয়াকে এবং অপরদিকে বিশ্বকবির প্রতি তাঁর স্বামীর অনুরাগ তথা তাঁর ভারতপ্রীতিকে সংশয়-মিশ্রিত ভয়ে স্বীকার করে গেছেন। এ চিত্রটি বড় মানবিক ও মাধুর্যময়। প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী ভিকতোরিয়া এবং বিশ্বকবি দুজনেই তাঁদের ঐ শিক্ষানিকেতনে অভ্যাগত হিসাবে থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে ছলকে পড়া মসী-লেপনে গালিচা প্রায় নষ্ট হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত হন। ঐ মসী অপসারণের ভার যাঁর উপর পড়ে, সেই কর্মী মহিলা যে এখনও জীবিতা এবং স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন এবং গ্রন্থকর্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন—ভাবলে আনন্দ ও বিস্ময় দুইই জাগে।

পূর্বোল্লিখিত তিনটি সূত্রের সাহায্যে আমরা মনে করি ভিকতোরিয়া বিশ্বকবির অন্তরলোকের এবং মনোলোকের অনেকখানি কাছে এসেছিলেন। তাঁদের যোগাযোগ এলমহার্স্টের দৌত্যে, সবই সত্য। তার সঙ্গে এও সত্য যে রূপধ্যানী রবীন্দ্রনাথ অরূপাভিসারী চিত্তৈশ্বর্যের অধিকারীও। এই ভূমা ও পরমাকে তিনি এমনভাবেই অঙ্গীকার করেছেন, যে তাঁর সকল প্রকার 'চর্যা' 'আচরণ' এবং মানুষকে 'গ্রহণবর্জন'ও একপ্রকার সংযত স্থির নির্ণয়ে বিহিত। তাতে কার্যকারণ-শৃঙ্খলা বিদ্যমান—সেগুলির নির্ণয়ের জন্য তাঁর অবদমিত চিত্ত(?) নিয়ে আমাদের বিব্রত হতে হয় না। মানুষের সাধারণ গুণদোষ নিয়েও মানসিক রসায়নের "রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়" অনন্যসাধারণত্ব অর্জনের একটি বিশিষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চিত্ত সন্তসদৃশ মহাত্মা গান্ধির মত একরৈখিক নয়। সে চিত্ত দ্বন্দ্ব কণ্টকিত ব্যক্তিক ও বৈশ্বিক পর্যালোচনায় ক্ষতবিক্ষত—এগুলি কী তাঁর গূঢ়ৈষা বা অপূরিত অভীপ্সার প্রকাশন? যদি কেউ পুরাতন ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিও আরোপ করতে হয় তাহলেও উত্তরণ বা সাব্লিমেশন কথাটা গ্রন্থকর্ত্রী উল্লেখ করেন নি। অথচ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দিক থেকেই উত্তরণ কথাটি গৃহীত আছে এবং সংস্কৃতি ভব্যতা বা কালচারকে অবরুদ্ধতা বা ইনহিবিশনের কার্যফলও বলা হয়েছে। তাই তাঁর সে পরিব্যস্ত জীবনে ভিকতোরিয়া গৃহীত—বিশ্বপরিক্রমার পথে ভূমার পথে তিনি অঙ্গীকৃত। 'পূরবী'র বহু কবিতায় এ সত্য বিধৃত। বিশেষ করে 'মিলন' কবিতাটির মত সমৃদ্ধ কবিতাটি 'জুলিও চেজারে' জাহাজে ৭ই জানুয়ারি ১৯২৫-এ লেখা হয়েছিল। আশ্চর্য লাগে, এটি ভাষাগত কারণে যদি বা ভিকতোরিয়া-এলমহার্স্টের গোচরে আগে বা পরে না এসে থাকে এটি শ্রমনিষ্ঠাশীলা গ্রন্থকর্ত্রীর চোখ এড়ালো কেন?

হয়ত যে উপস্থাপনায় তিনি ভিকতোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে রেখেছেন এ কবিতা সেখানে অন্যরকম অর্থবহ প্রতীত হতে পারে। শঙ্খ ঘোষ মহাশয় এ কবিতার উল্লেখ করলে তাঁর ভূমিকাটির ভূমিকা আরও গভীরতর ব্যঞ্জনা পেত এও বলা যেতে পারে।

পঞ্চমত এখানে ভিকতোরিয়া-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে লেখিকা তাঁর গ্রন্থের আরম্ভে ডরিস মায়ার মহাশয়-কৃত ভিকতোরিয়ার একটি প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থের উপর তাঁর নিজের লেখা পুস্তক-পরিচিতি নিবন্ধটি সন্নিবেশিত করেছেন। কয় বৎসর পূর্বে এটি এদেশের পত্রিকায় প্রকাশিতরূপে পড়েছি। যুক্তিনিবদ্ধ না মানতে পারলেও অবশ্যই কিন্তু প্রাসঙ্গিক কারণে এ নিবন্ধটি সংযোজিত। এতে গ্রন্থটির বিষয় সৌকর্য বৃদ্ধিও যেমন পায়নি, তেমনই বাধা-গ্রস্তও হয়নি। আমরা যারা ঐ গ্রন্থখানি পড়ার এখনও সুযোগ পাইনি, তারা এই পরিচিতি পড়ে উপকৃত হয়েছি। আগ্রহী অপেক্ষা রয়েছে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রস্তাবিত ভিকতোরিয়ার চিঠিপত্রের সঙ্কলন-সম্পাদনা গ্রন্থটির জন্য এবং ভিকতোরিয়ার নিজকৃত আত্মজীবনীর সম্ভবপর অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত দেখার জন্য। আমাদের জীবৎকালে এ আশা অবশ্য পরিপূর্ণ নাও হতে পারে। তবু এ তথ্যগুলি জানা রইল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "নষ্ট হয় নাই প্রভু সেসকল ঋণ" কথাটির তাৎপর্য নূতনভাবে অনুভূত হল।

এতদসহ আরও একটি সম্পূর্ণ প্রসঙ্গহীন সংযোজন এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটি হল লেখিকার বকলমা অনামিকার লেখা কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে একখানি পত্র। সম্পূর্ণ অনাহূত, অপ্রাসঙ্গিক এই রচনাটি রবীন্দ্র-ভিকতোরিয়া প্রসঙ্গের গুরুত্ব ও গবেষণাকর্মের অঙ্গহানি করেছে বলা যায়। গ্রন্থকর্ত্রী নিজে সাহিত্যের বিশিষ্ট কৃতী ছাত্রী। সেজন্যই এই বিসদৃশ উপস্থাপন একদিকে যুক্তিহীন অন্যদিকে শ্রীহীন প্রতিভাত না হয়ে পারে না। ব্যক্তিগত সীমিত জ্ঞানে যেটুকু বুঝি তাতে মনে হয় কবি (বা ঔপন্যাসিকের) মনের উপাদানগুলি যাঁকে বা যাঁদের নিয়ে শুরু হয় তাঁদের কেউ কখনও সামনে কাঁচা বা স্পষ্টরূপে নিয়ে আসেন না। ওগুলি একপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া জারিত হয়ে একরকমের তটস্থ বা ডিটাচ্‌ড ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়। আপন মনের মাধুরীর মধ্য থেকে যা আবির্ভূত হয় তা কোন একক নারী বা পুরুষ হতেও পারে না। কবির পক্ষে তো সর্বদাই একথা সত্য "পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারবার!"

পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি সদর্থক ও একটি প্রাসঙ্গিক পত্রের উল্লেখমাত্র

করেই যদি আমার এ পরিচিত নিবন্ধ শেষ করতে পারতাম, তাহলে আমার স্বগৃহীত কাজটুকু সহজ হতে পারত। কিন্তু তা হবার নয়। সুতরাং এবার আমার যাত্রা শুধু নঞর্থক পথে। আরম্ভেই বলতে হয় গ্রন্থটির শব্দচারণ ও ভাষা সম্পর্কে। এ বইয়ের ভাষার রূপতত্ত্ব-বাগধারা (সিনট্যাক্স) কী বাঙলা ভাষার? নাকি বাঙলা ভাষার আজকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাপ প্রয়োগে একটা অপভ্রষ্টরূপ প্রাপ্তি ঘটেছে? সেজন্য নিশ্চয় লেখিকাই একমাত্র দায়ী নন। তবে তিনি দেশছাড়া এবং দীর্ঘদিন ইংরাজি ভাষার কেন্দ্রে অবস্থিত। সে কারণে তাঁর মনে হওয়া সম্ভব, ইংরাজী ভাষার মত সমৃদ্ধ ভাষার রূপানুসরণে বা অনুকরণে বঙ্গভাষা তাঁর হাতে ঋজু ও সাবলীল হয়ে উঠবে। কার্যত তা হয়নি—তাঁর ভাষা তাঁর এই বই পড়ার একটা বড় বাধা।

দ্বিতীয়তঃ, চোখে লাগে কানে বাজে তাঁর শব্দচয়ন। কিছু কিছু শব্দ অনুধাবন করলে বোঝা যায় শব্দটির পিছনে আছে কোনও ইংরাজী শব্দ এবং ব্যবহৃত শব্দটি সত্যই ইংরেজি শব্দের অনুকরণে তৈরি। 'বেদী' 'সুবেদী', 'লেখ্যাগার' প্রভৃতি শব্দের বাঙালায় প্রচলিত কী অর্থ হবে?' যাই হক আমাদের বিবেচনায় বিদুষী গ্রন্থকর্ত্রী তাঁর এই বহু প্রচারিত বহুল পঠিত গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে শব্দচয়ন সম্পর্কে একটু অবহিত যেন হন এই অনুরোধ করি। গবেষণার ভাষার অবশ্যই ঋজুতা বাঞ্ছনীয়; উপন্যাস যাই হক, রম্যরচনার ভাষায় দরকার স্বচ্ছতা ও ঋদ্ধি। নতুন ভাঙাগড়ার প্রয়াস নিশ্চয় অনুচিত নয়। কিন্তু সেই প্রয়াসে স্থিত পদ্ধতিকে আঘাত করা অনুচিত। নতুন কিছু গঠন না দিতে পারলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাড়নায় স্থিত পদ্ধতিটিকে সংশয়ে ফেলা একধরনের অপারগতা নয় কি? প্রসঙ্গত বলি লণ্ডন-মজলিশ একবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হন—সেখানে আমাদের সুপরিচিত এক সুখ্যাত অধ্যাপক তরুণ বয়সে উপস্থিত ছিলেন। গল্পটি তাঁর কাছে শোনা। সেই মজলিশে এক বক্তা ইংরাজিতে ভাষণ দিলেন। পরে তিনি জানালেন যে তিনি ৮/১০ বৎসর দেশছাড়া তাই বাঙলাও আর বলার অভ্যাস নেই; অতএব তিনি ইংরেজিতেই ভাল বলেন। কবি ধৈর্য্যশীল শ্রোতা ছিলেন—সরস মার্জিত কৌতুকবোধ কবি সহজেই যে কোনও পরিস্থিতিতে অমার্জনীয়কেও মার্জিত করার ক্ষমতা রাখতেন। কবির উক্তি এরকম 'সত্যই বড় দুঃখের কথা—মাতৃভাষাও ভুলে গেছেন—বিদেশী ভাষাটাও ঠিক আয়ত্ত হয়নি—আপনার বড়ই কষ্ট।' গল্পটির তাৎপর্য সুগভীর তাতে সন্দেহ নেই।

যে নঞর্থক ভাবনাটি সর্বাধিক এই গ্রন্থরচনাকে দুর্বল করেছে, তা হল একটি তথাকথিত উপন্যাস (লেখিকার দ্বিতীয় উপন্যাস)। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা তাঁর প্রথম উপন্যাসটির (এদেশের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত) কুশীলবদের মতই স্থানছাড়া, ছিন্নমূল দেবাসিনে। তাদের প্রাসঙ্গিকতার কথা আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য হল গবেষণা-গ্রন্থটির সঙ্গে এই নড়বড়ে উপন্যাসটিকে গ্রথিত করে দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে। গ্রন্থ-কর্ত্রীর বক্তব্য সত্ত্বেও এই গ্রন্থনার দুর্বলতা দূর হয়নি—'বেণীবন্ধন' হয়নি। খানিকটা আবর্জনার মত কিম্বা উপলধারার মত তা মূল গ্রন্থের পাঠস্রোত-কে বাধা দিতে থাকে। কোনও যুক্তি ছাড়াই একটি অধ্যায়ের ঋদ্ধ গবেষণালব্ধ ফলটি প্রাপ্তির আনন্দ ধরা দিতে না দিতেই পা জড়িয়ে যায় পরের অধ্যায়ের একেবারে অন্যধরনের একপ্রকার রুদ্ধশ্বাস কটুস্বাদের রচনায়। এর ফলে একরকম মানসিক ডিরেলমেন্টের মত বা আকস্মিকতার মত দুর্ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। এইখানেই আমাদের না বলে উপায় থাকে না। তাঁর স্বয়ংসৃষ্ট এই মেথডলজির বর্ণনা (যা মুখবন্ধে তিনি করেছেন) একপ্রকার অন্ধ আত্মসন্তুটি এবং অহমিকার রূপান্তর।

লেখিকার উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু উৎস আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরও নিজেকেই বার করতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত সময়টা ধরে যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপ বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছে। তার মানসিক আশ্রয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অন্তত কিছুদিনের মত জুটেছিল রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র মাধ্যমে। অবশ্যই তা খুব স্বল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই স্বল্পসীমার মধ্যে পড়েন রমাঁ রলাঁ ও তার সমমনস্ক কিছু লোক, কিছু সৈন্যও। য়ুরোপীয় ঐতিহ্যশালিনী ভিকতোরিয়াকেও সেই দলে রাখা যায়। বিশ্বশান্তির চিন্তাভাবনায় সাথে সাথে ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজীও। রমাঁ রলাঁ ও ভিকতোরিয়ার ভাবনার যোগাযোগ উভয়ের সাথেই ছিল। কিন্তু এই অতিবিশিষ্ট মনস্কতাযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে নিশ্চয়ই সংখ্যা বেশি ছিল একটা সাধারণভাবে শিক্ষিত তথা অদীক্ষিত শ্রেণীর। তাঁরা অনেকে আশ্রয় পেয়েছিলেন একপ্রকার জীবনদর্শনের মধ্যে। সে দর্শনের একদিক বা একটা বড় দিকই হল ফ্রয়েডীয় মতবাদের অবশেষ বা রেমিনিসেন্স। ফ্রয়েডীয় কামৈকবাদ বা যৌনসর্বস্ববাদ কে মহামতি ফ্রয়েড নিজেই পরবর্তিকালে বদল করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীগণ প্রয়োজনীয় আলোচনাসহ সে মতবাদকে পরিবর্তিত ও মার্জিত করেন। বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে এরূপ নির্ণয় ও পরিবর্জন হয়েই থাকে। মনে রাখা দরকার ফ্রয়েড নিজেও বড় নিউরোলজিষ্ট ছিলেন। তাঁর ইহুদী হওয়ার বিধিলিপি তাঁকে কতকটা তাঁর জীবনদর্শনের পথ দেখায়। পাশাপাশি আমরা হ্যাভলক এলিসের এবং পরবর্তিকালে কীমমে মহোদয়ার গ্রন্থে যৌনবিজ্ঞান নিয়ে একটা স্পষ্ট আলোতে যৌন অভিজ্ঞতার সুস্থ অসুস্থ সকল দিকই অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু এ আলোকপাত তো সর্বত্র সমভাবে হয় না। বিদেশে ও এদেশে উভয়ই কিছু অপরিণতমতি লেখক পাঠকের কাছে অজীর্ণ ফ্রয়েডীয় দর্শন জ্ঞাত-অজ্ঞাতভাবে একপ্রকার বঞ্চনার হাতিয়ার এখন হয়ে আছে বললে ভুল হবে না। ফ্রয়েডই এই যৌনমুক্তির স্রোতধারার ভগীরথ এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও অসঙ্গত। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকাও কী অধুনা-বর্জিত সেই ফ্রয়েডীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত? তাঁর উপন্যাসটিতে কী সেই পরোক্ষ কামেচ্ছার সম্ভোগের পরিপূর্তিতে প্রতিফলিত? এই প্রতিফলনের (নাকি প্রতিন্যাস?) পিছনে কি তাঁর দেশছাড়া ঐতিহ্য ছাড়া দেরাসিনে ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হয়েছে? খুঁৎখুঁতে বা শুচিবায়ুগ্রস্ত মন না নিয়ে দেখলে সহজ সুস্থ মানুষের শিক্ষিত মনে রবীন্দ্রানুষঙ্গের পাশাপাশি এই উপন্যাসের নগ্ন, অসুস্থ-বিকারতুল্য বর্ণনা যেন পাঠককে আঘাত করে। একটা কথা জানতেও ইচ্ছা হয়। ২০।২২ বৎসর আগে নিজের ইয়োরোপে ও লণ্ডনে বাসকালের কথা উল্লেখ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই সত্যই কী ইয়োরোপীয় জীবন-যাপন, বিশেষ করে ইংরাজ-জীবন ও চিন্তাধারা এমনই বিশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে? নাকি এই ফসলটি সেই মনের যে মনের গতি ঐতিহ্যহীনতা কবলিত হয়ে পাশ্চাত্য জীবনের মোটামুটি একপ্রকারের অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যে বাইরে ভিতরে ভেসে চলেছে?

লেখিকার এই তথাকথিত উপন্যাসের নায়িকা ও নায়কের মনের বর্তমান মাত্র স্থিতি আমরা য়ুরোপের বহুস্থানে একপ্রকার স্থিতিহারা আত্মসন্তুষ্ট মানুষের মধ্যে পেয়েছি। মার্কিন দেশে স্থায়ী প্রবাসী বন্ধুবান্ধবদেরও দেখেছি। এরা একপ্রকার ক্ষণাস্তিত্ববাদী বললে ব্যতিক্রম হবেনা। উপন্যাসের নায়কটি যথারীতি লম্পট ও ভিলেন। নায়িকা যেন বহ্নিশিখা দিদৃক্ষু পতঙ্গবৎ তাঁর অনুসারিণী। এ নায়িকা (লেখিকার মত) প্রগতিবাদিনী ও নারীমুক্তি পথের পথিক। নায়িকার দেহমনের অবাধ মুক্তি তাঁর ইচ্ছাপ্রণোদিত। আর তৎসহ এই নায়কনায়িকার আত্মকথনও শয্যাসঙ্গ বর্ণনার আনুপূর্ব্ব বিবরণ জুগুপ্সা ব্যঞ্জক। উপন্যাসটিতে একটুখানি স্বস্তি আছে। রিডিমিং ফীচরই

বলা যায়। নায়িকা কোথাও তাঁর, প্রেমাভিসারের পথে নিজের ছেলেমেয়ে দুটিকে অস্বীকার করেননি। মায়ের প্রেম কথাটুকুতে তারা একবারও সন্দেহমাত্র করেনি যদিও তার অবকাশ ছিল। পার্মিলিভ সোসাইটির লেখিকার স্থানাপন্ন নায়িকা সেটুকু সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তাতে তাঁর নিজ সম্মানই রক্ষিত হয়েছে। শয্যাসঙ্গীর পাশেও তিনি মনশ্চারণায় হারানো মৃত স্বামীর আসঙ্গস্মৃতির অনুধ্যান করেছেন। অন্য দুটি পার্শ্বচরিত্রের একটি ইহুদী এর্মিলিয়া। তিনি অত্যাচারিত জীবনে আশ্রয় পেয়েছেন কন্যাদুটির জীবনে। নিজের কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন মানস-অসুস্থতার বিকার কাটিয়ে। শান্তি পেয়েছেন এক বিবাহিত ইংরাজের প্রীতির আশ্রয়ে। এই ইংরাজ চরিত্রটি আপন দৃঢ়তায়, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন সততায়, কর্তব্যে-মমতায় একটি সত্যকার ইংরাজ। ইংরাজ যদি বন্ধু একবার হন সে বন্ধুত্ব যে বিশ্বসঙ্গীর, তা বোঝা যায়। আলোচ্য গ্রন্থের উনচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত রচনার উপাদানকে প্রভাবিত করেছে আরও একটি সাম্প্রতিক কালের য়ুরোপীয় চিন্তাধারা। এটি আপাতত একটা দর্শনের চেহারাও নিয়েছে। এটি হল নারীমুক্তিবাদ বা ফেমিনিসম্। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ববান পুরুষ বা নারী উভয়কেই আত্মসচেতন হতে হয় অভিজ্ঞতা দিয়ে। শুধুমাত্র সমাজ-ব্যবস্থাগত অভ্যাসে সর্বত্র পুরুষ নারী নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন খর্ব করেন। তা কিন্তু উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার নারী বা পুরুষ দেহগত ভাবে ও উভয়লিঙ্গ-মানসিকতার ক্ষেত্রেও (জিন থিওরী অনুসারে) তার প্রসারতা অবধার্য। এক্ষেত্রে কেন ফেমিনিসম্ এর দৃষ্টিদোষে আমাদের এ গ্রন্থের লেখিকা আচ্ছন্ন? তার ফলে তাঁর দুর্ভাগ্য-বশত উপন্যাসের নায়িকা, পার্শ্বনায়িকা সকলেই সেই ফেমিনিসমের আদর্শ কবলিত। ফেমিনিসমের কাল্পনিক এই পটভূমির আবার একপ্রকার সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য আনে। অন্তত অগ্রসর দেশগুলিতে তো বটেই। তা না হলে লেখিকার মনে তো এ প্রশ্নও জাগতে পারত, পতিতা নারীদের ফেমিনিসমের আওতায় আনা যায় কিনা? আরও দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর এই ফেমিনিসমের দৃষ্টিদর্শনে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, ভিকতোরিয়া নিজে ও ভিকতোরিয়ার জীবনীকার ডরিস মায়ার সকলেই পড়েন। তাই তাঁর বিচারে প্রতিফলিত হয়ে এঁরা কেউই স্বরূপে বা আমাদের পরিচিত রূপের সামগ্রিকতায় আসেন না। এমনকি কাদম্বরী দেবীও যেন সেই অপূরিত আকাঙ্ক্ষার ফেমিনিসম-বেদীর বলি হয়ে ওঠেন। আধুনিক বিচারের মাপে কাদম্বরী দেবীর 'ঐতিহাসিক' বলিদানের

কী তাৎপর্য তা লেখিকাই বলতে পারবেন। উনপঞ্চাশ অধ্যায়টি তাই তাঁর "বালানাং রোদনং বলম্" ব্যাপারে পর্যবসিত। কারণ, উক্ত কাদম্বরী দেবী তো নারী প্রগতিবাদে অগ্রসর হতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মলাভ করেন, সেখানে তাঁর পিতামহী যে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন তা তাঁর কাজে বোঝা যায়। মাতা অসুস্থ ছিলেন ঠিকই। কিন্তু অপরদিকে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী-পতির মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের মেজবউঠান সেজবউঠান নতুনবউঠান লেখিকা দিদি এবং তিনি ছাড়াও অন্যান্য ভগ্নীগণ ঠাকুরবাড়িতে রীতিমত নিজ নিজ কৃতিত্বেই অনন্যা হয়ে ছিলেন। শিল্পায়নে, জীবনসাধনায়, রুচির দাক্ষিণ্যে কোনও না কোনও ভাবে অনেকে তাঁরা গৃহে ও বিশ্বের মাঝখানে স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। এমন কি বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী নিজের মতো (বলেন্দ্রনাথের মাতা) মহর্ষি থাকাকালেই গৈরিক বস্ত্র পরে ঘরে থাকতেন। এগুলি ঠিক কী পর্যায়ে পড়বে? নারীর ব্যক্তিত্ব কি শুধু প্রণয় পাত্র নির্বাচনে বা যথেচ্ছ গ্রহণে-বর্জনেই প্রকাশ পায়? পরের প্রজন্মে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ, ভাগিনেয়ীগণ, পুত্রবধূরা, পৌত্রবধূ ও দৌহিত্রবধূগণও স্ব স্ব প্রভায় প্রভাবশালিনী ছিলেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ যে কালে শান্তিনিকেতনের আবাসিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলন করেন সে কাজটা সহজ ছিল না তখন। কিন্তু তিনি সে কাজ করেছিলেন এবং তুলনা করে দেখলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রীগণ ছাত্রদের চাইতে তাঁকে একটু প্রাগ্রসর বলেই অন্তত কিছুকাল আগেও মনে হত। রবীন্দ্রনাথ অতি সহজেই বলতে পেরেছেন যে নারীর সেবাযত্ন-ভালোবাসাকে যে কোনও ভাবেই তিনি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি না দিয়ে পারেননি। নারীকে কর্মানুশীলনের মধ্যে এনে, দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনশিল্পী করে তোলার একটা অভ্রান্ত অক্লান্ত প্রয়াস তিনি করেছিলেন। নারীমুক্তির আন্দোলনের নামে অবশ্য করেননি ঠিকই। কিন্তু, তিনি সৃজনশীল প্রকৃতিসহ সততই সংসারে, সমাজে, রাষ্ট্রে নিজের কর্তব্য ঠিকই পালন করে গেছেন। সংসারগঠনের শ্রী, সমাজগঠনের জন্য সৃজনাত্মক রচনা, রাষ্ট্রচেতনা সম্পর্কে বুদ্ধি ও গঠনমূলক প্রস্তাব সর্বত্রই তাঁর উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। এই মানুষ শুধু মেয়েমানুষ হবে কেন? মানুষ তো প্রথমে মানুষ ও পরে ব্যক্তিমানুষ বা Individual—এ ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ যাই হক না কেন। তাঁর চোখ এড়ায়নি গ্রামীন জীবনের এক দুঃখী নারীর (বা তার কন্যা পুত্রবধূর) পানীয় জল বয়ে আনার কষ্টটুকু। তিনি অসহায় ভাবে দেখেছেন, এ অবস্থার

৬০ বৎসর আগে পরে বদল হয়নি। তাঁর কাছে তাঁর স্বদেশের ব্যক্তিনারীর মত ভিকতোরিয়াও প্রতিভাশালিনী ব্যক্তিনারী হিসাবেই শ্রদ্ধা ভালোবাসায় স্বীকৃত। সেখানে যেমন গূঢ় অভীপ্সা পূর্তির প্রয়োজন নেই তেমনি বলা যায় যে ভিকতোরিয়ার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে নবজাগ্রত হননি রবীন্দ্রনাথ। নারীমুক্তি সম্পর্কে তখন সচেতন হয়ে উঠেছেন তিনি—এটিকে ব্যক্তিগত মত বা matter of opinion ছাড়া কি বলা যায়? রবীন্দ্রনাথকে 'ফেমিনিষ্ট' ভিকতোরিয়া ফেমিনিসম বুঝবার দীক্ষা দিলেন—তাঁকে তাঁর কাব্যে নবীন ধারায় জাগরূক করে তুললেন এধরণের কথাকে মানা যায় কী প্রকারে? প্রকৃত পক্ষে ৩৯ অধ্যায় থেকে ৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই বিষয়ক গবেষণা-তথ্য ও ঔপন্যাসিক চরিত্রাভিব্যক্তি সব ঘুলিয়ে মিশে তাল পাকিয়ে গেছে মনে হয়। একরকম দর্পণ আছে, তাতে মানুষের মুখ ও চেহারা নানারকম দেখায়। বিকৃত রূপের সেই দর্পণ দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না। তিনিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অবশ্যই। মানুষকে, আবারও বলি, বুদ্ধির মুক্তি ও মুক্তির বুদ্ধি দিয়ে সেটা অর্জন করতে হয়। নিশ্চয়ই কিছু য়ুরোপীয় নারী-পুরুষের ধারণা ও তা থেকে প্রাপ্ত এদেশের নারী আন্দোলন সেই পথের অভিযাত্রী নয়। সেপথ আরও কঠিন ও ক্ষুরধার। সেখানের মন্ত্রও হল সেই "মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্"। লেখিকাই এটির উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের আলো ব্যতিরেকে চেনা যাবে না বলে। সুতরাং 'ফেমিনিষ্ট রবীন্দ্রনাথ' উক্তিতে একপ্রকার বিরোধাভাস পাওয়া যায়। এটি শব্দালঙ্কারও নয়, বাচ্যালঙ্কারও নয়। ভ্রান্তি। রবীন্দ্রনাথের 'ভিশান' ছিল তাঁর মিশনও ছিল। জীবনকে শিল্পমাত্রায় ফুটিয়ে তোলার জন্য কঠিন চর্য্যা, অভ্যাস-সংযম ও নিয়মনিষ্ঠায় (ডিসিপ্লিন) তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তা থেকে কারোর জন্য, কিছুর জন্য তিনি কোথাও বাঁধা পড়তে পারতেন না। এমন কি নতুন বউঠান বা ভিকতোরিয়ার জন্যও নয়।

বস্তুতঃ মনে মনে একটা ছক ঠিক করে নিয়ে তদনুসারী প্রাসঙ্গিক উক্তি খুঁজে খুঁজে বসানোর ফলে এমন বিমিশ্র রূপের গ্রন্থ গ্রন্থিত হতে পারে ঠিকই। কিন্তু এটি তো বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথ নয়। এ ছাড়াও তাঁর মনের চেতনায় যে ফেমিনিসম্ তিনি আবিষ্কার করেন সেটারই বা কি রূপ? সেটা কি স্থানে অস্থানে স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ শয্যালীন পুরুষাসঙ্গর সুখ ও তার আনুপূর্ব্ব বর্ণনা? নারীমাত্রেরই একটা বয়সাবধি কিন্তু মেটাবলিক ও অরগ্যানিক দৈহিক ক্রিয়া বর্তমান। সেগুলির যথেচ্ছ বর্ণনার যে স্বাধীনতা লেখিকা গ্রহণ

করেছেন তাই কী তাঁর নারীমুক্তির প্রসার্থ আস্বাদন? নরনারীর জীবনলীলার ক্ষণ শাশ্বত দ্বৈতাদ্বৈতবোধি এখানে কোথায়? জীব বিজ্ঞানীর রচনারও তো এ বর্ণনা নয়। নারী প্রগতির নামে এই বিকৃতির বিভ্রান্তির বর্ণনা তিনি শুধু তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদ করাতে চান নি—রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গের পাশাপাশি সে আস্বাদকে রেখে এক কুশ্রী রুচিবিকারের শিকার হয়ে উঠেছেন। জীবনবাদ তথা ফেমিনিসমের নামে কি আমাদের বুঝতে হবে একপ্রকার নগ্ন নির্লজ্জতা? একজন কৃতী বিদগ্ধ মহিলার এই অন্বিষ্ট-ফেমিনিসম! হয়ত তিনি বা নিজে ছিন্নমূল। রবীন্দ্রনাথ-ভিকতোরিয়াও কেন তাতে আক্রান্ত হবেন?

লেখাটি শেষ করতে গিয়ে মনে হয় এ লেখার একটা আধার বা একটাই উৎস নয়। একটা কথা তো পূর্বেই বলেছি। একধরণের ভ্রান্ত প্রতীতি ও প্রত্যয় শুধু মাত্র ফ্রয়েডীয় অবদমন তথ্যের ফলে আসে না বা বিকারের রূপেও আসে না। অন্য একটা কারণ ও দর্শনের প্রভাবও এধরণের রচনার পিছনে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে পারে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপ অস্তিবাদী দর্শন প্রভাবশালী। আমেরিকায় চলে লজিক্যাল পসিটিভিসম্। এদের দাপটে ডায়লেকটিক্স এমনই কোণঠাসা যে তার বিকৃত পরিবেশন হয়ে থাকে। সর্বোপরি অত্যাধুনিক পারমাণবিক শক্তির নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানবজীবন তথা মননকে একেবারে ক্ষণতৃপ্তিবাদী করে তুলতে পারে এমন কথা সমাজতত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলা হচ্ছে। পারমাণবিক যুগের তাড়নায় ফলস্বরূপ ফিউচুরোলজি বা ফিউচারিসম সম্পূর্ণ কম্পিউটার-নির্ভর হয়ে গড়ে উঠছে ষ্টাটিসটিকসের আধারে। এমন ক্ষেত্রে বাস্তবতার চেতনা সুতীক্ষ্ণতর হতে পারে। তাতে করে দ্বৈধী সত্তা, দ্বৈতব্যক্তিত্ব নয়ত বহুধা বিভক্ত ব্যক্তিত্ব পরিচিত সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে একই নারী বা পুরুষ একই সাথে শোভন-শিষ্ট সুভদ্র সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়েও সাথে সাথেই যৌনবিকৃতির শিকার হতে পারে। এটাকে আধুনিকতার একমাত্র রূপ বলে নেওয়া ঠিক হবে না। আলোচ্য গ্রন্থটিকে আমরা এই অস্তিবাদের আলোকেও দেখতে পারি। তাতে অনেক গ্রন্থিমোচন হয়ে যায়। এই বিমিশ্র ঘোলাটে চিন্তাভাবনা যেটা না-গবেষণা না-উপন্যাস তাকে চেনা যায় একটা ব্যর্থ বর্ডার লাইনের আভাস বলে। এতে আধুনিকতার আরোপ রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ বা প্রতীয়মান অলীকতা মাত্র। এরই পাশে যদি রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরী' গল্পটি রাখা যায়—তবে আমার কথাটার যুক্তি বোঝা

যাবে। তাতে রস আছে। আধুনিকতা আছে। গভীরতা ও নিরাসক্তি বেণীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু সেখানে গাঁজিয়ে ওঠা নারীপ্রগতি নেই। এই নিরাসক্তিই বন্ধনে বা রসাস্বাদনে তীব্রতা আনে। তার পিছনে কাজ করে যুক্তি। সম্ভবতঃ অস্তিবাদিত্বের পরোক্ষ চাপে পড়ে আমরা একটা যুক্তিহীনতার যুগে অবতীর্ণ হতে চলেছি। আলোচ্য গ্রন্থটি যেন এই আসন্ন বিপদের সঙ্কেত বহন করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে। কেতকী কুশারী ডাইসন। নাভানা। পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা। ৭২'৬১ টাকা

চৈতন্যদেব ও সেকালের বাংলাদেশ

চৈতন্যদেবের জীবন ও আন্দোলন ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, যার প্রভাব দূরপ্রসারী অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। বাঙলার নিস্তরঙ্গ সমাজইতিহাসে উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে ব্রাহ্ম ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আন্দোলনকে পরিবেশগত বিভিন্নতা মেনে নিয়েই তার উত্তরসূরী বলা যেতে পারে। চৈতন্যকথা গ্রামীণ বাঙলার জীবনচর্যায়, বিশেষতঃ, বাঙালী সমাজের কয়েকটি বিশেষ স্তরে যেভাবে জড়িয়ে গেছে তার আর নজীর নেই। স্বভাবতঃই চৈতন্যদেবের জন্মের ৫০০তম বার্ষিকীতে তিনি যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হবেন, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সবাই তাঁকে এই সুযোগে স্মরণ করেছেন, বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদ্‌রা তাঁর মূল্যায়ন করেছেন। প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত-র "মহাপ্রভু ও সমকালীন বাঙলাদেশ" সেইরকম একটি প্রচেষ্টা।

দেশ, রাষ্ট্র, রাজত্ব পরিচালনা, সামাজিক অবস্থা, ধর্মদর্শন, সঙ্গতি—এই এই ছয়টি অধ্যায়ে বিষয়বিন্যাস করে শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর আলোচনা সুরু ও শেষ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে চৈতন্যদেব ও আমাদের যুগের মধ্যে পাঁচশ বছরের এই কালগত ব্যবধান সত্ত্বেও নির্মোহ বিশ্লেষণের বদলে বৈষ্ণবজনোচিত ভাবতন্ময়তা প্রকাশ পাওয়ায় আলোচনার ধারা একটি বিশেষ দিকে প্রভাবিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল মনোভাব নিয়েও হয়তো বিষয়টি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেত। এবং তার প্রয়োজনও ছিল যেহেতু লেখকের লক্ষ্য ছিল চৈতন্যদেবের সমকালীন বাঙলাদেশের আলোচনা।

আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। লেখক ঠিক কি আলোচনা করতে চেয়েছেন এবং কাদের জন্য সেটা করতে চেয়েছেন সম্ভবতঃ সেই দিকটার প্রতিও তিনি সুবিচার করতে পারেননি। ফলে বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনায় অনুপ্রবেশ করেছে বলে বর্তমান সমালোচকের মনে হয়েছে।

যেগুলি বাদ গেলে গ্রন্থের মূল্য ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত না এবং হয়তো লেখকের বক্তব্য কিছুটা নিটোল হতে পারত।

চৈতন্যদেবের সমকালীন বাঙলাদেশের আকৃতিগত পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক সুচিরকালের দেশসীমা থেকে সুরু করে একেবারে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলার সীমা-প্রসঙ্গ পর্যন্ত তাঁর আলোচনা ছড়িয়ে দিয়েছেন। সত্যি এই বিস্তৃতি দরকার ছিল কি? ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের কর্মক্ষেত্র যে দেশগত সীমায় আবদ্ধ ছিল বরং তার কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা যদি লেখক চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ, বৈষ্ণব অভিধান এবং বিমানবিহারী মজুমদারের "চৈতন্যচরিতের উপাদান" গ্রন্থ থেকে করতেন, পাঠকসমাজ হয়তো বেশি উপকৃত হতেন। বিমানবিহারীর বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য বলে এই সমালোচকের মতো আরো অনেকে লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেন।

এই অধ্যায়ে বাঙলাদেশের সঙ্গে তৎকালীন ভারতের অন্য অঞ্চলগুলির যোগাযোগের প্রসঙ্গটি লেখক ভালো ভাবেই আলোচনা করেছেন। সেকালে বহির্বঙ্গের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ ছিল বেশি। সমুদ্রপথে বিদেশীরা আসতেন, কিন্তু বাঙলার গৌরবময় বাণিজ্যযাত্রার কেন্দ্রগুলিতে তখন আর চাঁদ বা শ্রীমন্ত সদাগরদের বংশধররা টিয়াটুটি কিংবা মকরমুখো ভাসাবার আয়োজন করতেন না। সেসব স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হয়ে মঙ্গলকাব্যের আখ্যান রচনা করছিল।

স্থলপথে বহির্বঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র বাঙলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় এই সব পথ ধরে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার ঘটেছে তেমন প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে হাজির করা হয়নি। তাছাড়া ধর্ম আন্দোলনের বিস্তার একটা বিশিষ্ট সামাজিক-আর্থনীতিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে। অন্তত পণ্ডিতরা তাই মনে করেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের কাছে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, যে সব অঞ্চলে চৈতন্য আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে সেখানকার সঙ্গে চৈতন্যদেবের সমকালীন বাঙলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মিল-গরমিলটুকু ধরিয়ে দিতে পারলে পাঠকবর্গ উপকৃত হতেন না কি?

'রাষ্ট্র' অধ্যায়টির পরিকল্পনা লেখক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন বোঝা গেল না। বাঙলাদেশের চৈতন্যপূর্ব সমগ্র ইতিহাস আলোচনা করে, সেই বর্ণনাকে একেবারে ইংরাজ আমলের সূচনা পর্যন্ত টেনে আনার সার্থকতা যদি থেকেও থাকে, লেখক সেই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বলেই মনে হয়েছে।

যদি ধরে নেওয়া যায় চৈতন্যদেবের কর্মকাণ্ড থেকে বাঙালীর রাষ্ট্রিক বিকাশ একটা নতুন মাত্রা লাভ করেছিল, লেখকের এটাই প্রতিপাদ্য, তাহলে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে পাশাপাশি সন-তারিখ সাজিয়ে কি সেটা করা যায়? এ সম্পর্কে লেখকের কোন বিশেষ বক্তব্য থাকলে সেটি আলোচনা করে কালপঞ্জি না হয় খুব জরুরী মনে করলে পরিশিষ্টে দিতেন। এ যেন অনেকটা রাজা জন্মিলেন, ফুলিলেন এবং মরিলেন-গোছের বর্ণনা কিম্বা আরো নীরেস।

'রাজত্ব পরিচালনা' অধ্যায়টির মূল কথা যদি এই হয় যে, রাজা বা রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয় জনজীবনকে তেমন ভাবে আলোড়িত করত না, তাহলে অনেকেই লেখকের সঙ্গে একমত হবেন। সুতরাং রাজত্ব কিভাবে চলত সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা থাকার কথা নয়। লোকে দায়ে না পড়লে যে প্রশাসনের কাছাকাছি যেত না তারই এক প্রমাণ রয়ে গেছে চাণক্যের প্রবচনে—অন্য কয়েকটি বিশেষ স্থানের মতো রাজদ্বারে যে সহযাত্রী হয়, সে প্রকৃতই বন্ধু।

তবু স্বীকার্য যে চৈতন্যযুগ ও আন্দোলনের আলোচনায় রাজত্ব পরিচালনার বিষয়টি ভালো করে জানার দরকার আছে। যেমন চৈতন্য জীবনীগ্রন্থে কাজী দলনের বিষয়টি সব সময়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয় বলে প্রশাসনে কাজীর ভূমিকা জেনে নিলে ঘটনার মূল্যায়ন আরো সঠিক হতে পারে। লেখক চৈতন্যদেবের আমলে কাজীর ভূমিকার কথা তুলেছেন, ন্যায়নিষ্ঠ সুলতানরা কাজীকে যে মান্য করতেন, শুধু সেইটুকু জানিয়ে কাজী সংক্রান্ত সুপরিচিত ঘটনাটি বিবৃত করেছেন। এবিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে লেখকের কাছে এই সমালোচকের আরো কিছু প্রত্যাশা ছিল। যেমন প্রত্যাশা ছিল, সুলতানী আমলের বাঙলায় শাসন পরিচালনায় হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও তিনি কিছু আলোচনা করবেন। অধ্যাপক জগদীশনারায়ণ সরকার এবং অন্যান্যরা এই বিষয়ে যে সব মূল্যবান আলোচনা করেছেন, সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ বোধহয় খুবই প্রাসঙ্গিক হত।

এই অধ্যায়ে লেখকের কয়েকটি গুরুতর তথ্যগত ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৩২ পৃষ্ঠায় চৈতন্য অদ্বৈত আচার্যকে কেন 'নাঢ়া' বলে ডাকতেন, তারই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের বক্তব্য অভিনব। তাঁর মতে রাজার খাসভৃত্য মুণ্ডিত মস্তকে থাকত। তাকে ন্যাড়া বা নাঢ়া বলতো বাইরের লোক। ভাবের ঘোরে চৈতন্য অদ্বৈতকে নাঢ়া বা ন্যাড়া বলে ডাকতেন সেই অর্থে।

লেখক যদি বলেন অদ্বৈত ন্যাড়া মাথা ছিলেন বলে চৈতন্যদেব তাঁকে নাঢ়া বলে ডাকতেন, তাহলে সে কাজী বলা কোন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে কি ? আর তার জন্যে ভাবের ঘোরের কি দরকার ? বিনা ভাবেই সেকালে এবং একালে মুণ্ডিত মস্তক লোককে অন্যরা ন্যাড়া বলে ডাকত এবং ডেকে থাকে। আর লেখক যদি এটা বোঝাতে চান যে, ভাবের ঘোরে চৈতন্যদেব অদ্বৈতকে তাঁর খাস ভৃত্য মনে করে নাঢ়া বলে ডাকতেন, তাহলে লেখককে সে কথা প্রমাণ করার দায় স্বীকার করতে হবে। ববং আমরা তো জানি অদ্বৈত আচার্য রাজা গণেশের সুবিজ্ঞ মন্ত্রী নরসিং নাড়িয়াল বংশোদ্ভূত বলেই তাঁকে ন্যাড়া বা নাঢ়া বলা হত।

৩৩ পৃষ্ঠায় লেখক আমুয়া মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত দুই ভাই হিরণ্য ও গোবর্ধন দাসের পারিবারিক কাহিনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা ঠিক নয়। গোবর্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস চৈতন্যের একান্ত সেবকরূপে নীলাচল লীলার শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। পরে তিনি বৃন্দাবনে ষড় গোস্বামীর অন্যতম রূপে আরো অনেক কাল বেঁচে ছিলেন। তরুণ বয়সে যে রঘুনাথ দাস শিখি মাহিতার বোন বৃদ্ধা মাধবীর কাছে চৈতন্যদেবের খাওয়ার জন্য সরু চাল ভিক্ষা করেছিলেন, সন্ন্যাসীর নারী সংস্রবজনিত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ চৈতন্যদেব তাঁর মুখ দর্শন করা বন্ধ করেছিলেন। মনের দুঃখে তিনিই আত্মবিলোপ করেন তরুণ বয়সেই।

৩৩ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় রূপ ও সনাতনের চৈতন্য আন্দোলনে সরাসরি যোগ দেওয়া সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কিছু মন্তব্য করেছেন। ৩৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, হোসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের আমলেও তাঁরা রাজকর্মচারী ছিলেন। ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন রূপ হোসেন শাহের আমলেই রাজকার্য ছেড়ে যান কিন্তু সনাতন পরে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ঠিকই তবে সেটা হোসেন শাহের জীবিত অবস্থায় নয় কি ?

এই অধ্যায়ে আরো দুয়েকটি অসঙ্গতি চোখে পড়ে। ৩০ পৃঃ লেখক রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র করেছেন, আবার পরে রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে শাসন-ব্যবস্থাকেই বুঝিয়েছেন। রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রযন্ত্র শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। চৈতন্যদেবের সমকালে এই বিশেষ অর্থ সৃষ্টি হয় নি। ৩৭ পৃষ্ঠায় চৈতন্যের কাজী দলন ঘটনাটি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কাজীকে গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র বলেছেন। সেটাই নাকি ছিল তাঁর খুঁটির জোর। চৈতন্যের সমকালে কোনো নবাব কি গৌড়েশ্বর ছিলেন। নবাব নামটি মোগল যুগের

না হলেও সুলতানী আমলের পরবর্তী কালের নায়। ৩৯ পৃষ্ঠায় যে 'বকাই-নবিশের' কথা বলা হয়েছে সেটা 'বকেয়ানবীশ' নয়তো ?

'সামাজিক অবস্থা' আলোচনায় লেখক হিন্দু আমলের শুরু থেকে বাঙলা-দেশে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন ও তার নানা বিবর্তনের কথা চৈতন্যের সময় পর্যন্ত টেনে এনেছেন। বাঙলার বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সামাজিক স্তর বিন্যাসের চেহারাটা বোঝার পক্ষে আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান হয়েছে। কুলজী গ্রন্থগুলি থেকে প্রভূত উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি নানা তথ্যের পসরা সাজিয়েছেন। কিন্তু এই সব কুলজী গ্রন্থ থেকে সামাজিক দূষণের যে ছবিটি পাওয়া যায়, তার কথা বিস্তারিত আলোচনা করলে সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যেত। তাহলে হয়ত ৫২ পৃষ্ঠায় লেখকের এই বক্তব্য, "বৈদিক ব্রাহ্মণ চৈতন্যদের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অদ্বৈত আচার্য'র মহাপ্রভু নামে পরিচিতির মাধ্যমে তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সমমূল্য ঘোষণার একটা মনোভার কাজ করেছিল"—বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতো।

আরেকটা কথা। চৈতন্য আন্দোলনের তাৎপর্যকে একালের মানুষের কাছে অর্থবহ করে তোলার জন্য কেবল তথ্য সংকলন যথেষ্ট নয়। বাঙালি সমাজের গড়ন, উচ্চ নীচভেদ, চৈতন্যদেব কাদের কাছে তাঁর বাণী উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন, তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিন্দু সমাজের সর্ব স্তরে কোন ধরনের মানসিকতার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অবাঙালি মুসলমান ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য ছিল কিনা, সামাজিক অবস্থার আলোচনায় লেখকের কাছে সে বিষয়ে নানা প্রত্যাশা জেগেছিল। যেমন চৈতন্যদেব নামকীর্তন করার উপরে যে জোর দিয়েছিলেন সেটি কতটা তার নিজস্ব চিন্তার ফল আর কতটাই বা পরিবেশাগত, তার কিছু আভাস পেলে সমালোচক অনেকের মতোই বিশেষ উপকৃত হতেন।

এই দীর্ঘ অধ্যায়টি পড়তে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে লেখক তাঁর বক্তব্য গুছিয়ে বলতে চাইছেন না। ফলে পুনরুক্তি আছে, আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিন্যাস। যেমন চৈতন্যদেবের রাশিচক্র একবার শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের আলোচনায় ছাপা হয়েছে ৪৪ পৃষ্ঠায় আবার চৈতন্যের জাতকর্ম ও শৈশব আলোচনায় ছাপা হয়েছে ৮১ পৃষ্ঠায়। শুধু একটাই প্রশ্ন কেন ? এই অধ্যায়ে খাদ্যাখাদ্যের মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। মূলত চৈতন্যকে উপলক্ষ করে বাঙালি সমাজের কিছুটা উপরতলার মানুষদের আহারের তালিকা থেকে

তাঁদের জীবনমানের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তার থেকে আরো বোঝা যায় অদ্বৈত আচার্য যথেষ্ট সঙ্গতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এখানে লেখকের কাছে একটা আখ্যা জানিয়ে রাখি। চৈতন্যদেব আচণ্ডাল মানুষদের জন্যই তাঁর ধর্মপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের সেই নীচু তলার মানুষদের কথা এদের পাশাপাশি দৈনন্দিন আহার্যের তালিকায় ফুল্লরার বারমাস্যা যদি একটু স্মরণ করতেন তাহলে যুগ পরিচিতি পূর্ণাঙ্গ হত। আর তার সুযোগও ছিল।

'ধর্মদর্শন' অধ্যায়ে লেখক যে আলোচনা করেছেন সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব কথাকে সর্ব ভারতীয় ভক্তিবাদের পটভূমিতে উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। লেখকের সেই প্রচেষ্টা মোটামুটি সার্থক। সেখানে যখন সমকালীন নবদ্বীপে তান্ত্রিকতার প্রসঙ্গ এসেছে, বীরভদ্রের ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত কথাও বলা হয়েছে, তখন সহজিয়াদের কথাও কিছুটা থাকলে ভালো হতো।

সর্বশেষ অধ্যায় "সঙ্গীত" লেখক চৈতন্যের কীর্তনগান থেকে শুরু করে বিস্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। মনে হয় সঙ্গীত শাস্ত্রে লেখক একজন বোদ্ধা মানুষ। বর্তমান সমালোচক সেই বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞ। সুতরাং কিছু বলা ধৃষ্টতা হবে।

পরিশেষে নিবেদন, প্রশান্তবাবু প্রচুর বইপত্র ঘেঁটে বিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠায় যে গ্রন্থ রচনা করেছেন সাধারণ কৌতূহলী বাঙালি পাঠকের কাছে তা সমাদৃত হবে। তাঁরা এক জায়গায় অনেক তথ্য পাবেন, কিছু তত্ত্ব কথাও পাওয়া যাবে। কিন্তু লেখকের ভক্তিনম্র মানসিকতা ছাড়া তাঁর বৈদগ্ধের সার্থক পরিচয় পাওয়া যাবে না। বর্তমান সমালোচকের কাছে সেটা আক্ষেপের কথা।*

বাসব সরকার

* মহাপ্রভু ও সমকালীন বাংলাদেশ : প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, অনুপম প্রকাশনী, পঁচিশ টাকা।

'অমৃতলোক'-এর পঞ্চাশতম সংখ্যা

কোনো একটি লিটিল ম্যাগাজিনের পক্ষে পঞ্চাশ-তম সংখ্যা প্রকাশের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আনন্দের, আবার প্রতিষ্ঠান-শাসিত শিল্প-সাহিত্যের পরিবেশে সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার মতো উল্লেখযোগ্য ঘটনাও বটে। সম্প্রতি মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকা 'অমৃতলোক'-এর ৫০-তম সংখ্যাটি তেমনই একটি স্মরণীয় সংকলন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। খুব সঠিকভাবেই, সংকলনটির নামকরণ করা হয়েছে 'উৎসব সংখ্যা', সারাবছর অর্থের অভাব-অনটন ও দুশ্চিন্তায় এমন উৎসবের সুযোগ ছোট পত্রিকার ভাগ্যে বারবার জোটে না। স্বাভাবিক কারণেই, বর্তমান সংখ্যাটির পরিকল্পনার সময় তরুণ সম্পাদকদ্বয় বিষয়বস্তু নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। যেন পত্রিকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে সামগ্রিক লেখালেখি থেকে সহজেই চিনে নেয়া যায়। তাই সম্ভবত সংকলনের পাঁচটি প্রবন্ধই মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা নিয়ে প্রকাশিত। যেখান থেকে পত্রিকাটি বের হয়, তার জল-হাওয়া-মাটিকে অন্যান্য মানুষের কাছে চিনিয়ে দেয়ার এই সুস্থ প্রবণতাটি এর আগেও 'অমৃতলোক'-এর পাতায় লক্ষ্য করা গেছে। প্রয়াত কবি অমিয় চক্রবর্তীর ওপর আছে একটি সুন্দর আলোচনা। এছাড়াও হালফিলের সাহিত্যকর্মের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আলোচনা আছে মোট সাতটি। গল্প ও কবিতার ক্ষেত্রে নির্বাচনটি বেশ তীক্ষ্ণ বোঝা যায়। বলা বাহুল্য, অমিয়ভূষণ মজুমদারের একটি গল্প সংকলনটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। সব মিলিয়ে, কলকাতার অনেক দূরে থেকেও এই ধরনের পরিচ্ছন্ন একটি পত্রিকা, নতুন লেখকদের কাছে প্রেরণার সন্ধান দিতে পারে।

অরুণ চৌধুরী

জন ফোর্ড ঃ বিষয় বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র

জন ফোর্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্র গবেষক এনড্রিস্ ম্যারিস্ মন্তব্য করেছিলেন ঃ ফোর্ড তিনটি দশক ব্যাপী কাজ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসহকারে চলচ্চিত্র শিল্প-মাধ্যমে। এই চারটি দশকে—বিশের দশকে ফোর্ড চলচ্চিত্রের কলা কৌশল সঞ্জাত বিষয়কে ধনী করেছেন, তিরিশের দশকে তিনি দেখিয়েছেন চলচ্চিত্র কীভাবে নাটকীয়তা বজায় রেখে একটি অতীব সুন্দর গোছানো বিষয়ের একেবারে ভিতরে আসতে পারে,—চল্লিশের দশকে জন ফোর্ড চলচ্চিত্রকে দান করেছেন মহাকাব্যিক এক সুদূর গভীর ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা, পঞ্চাশের দশকে তিনি চলচ্চিত্রকে সাংকেতিক স্পর্শে রূপক ব্যাঞ্জনায় এমনই গভীর এক ভাব দ্যোতনার প্রকাশের ভিতরে নিয়ে যান, যেখানে এই চলচ্চিত্র শিল্প-মাধ্যমই হয়েছে অধিকতর পরিণত মননের।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার অরসন ওয়েলস অ্যামেরিকান চলচ্চিত্রকার ও প্রবীণ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে জন ফোর্ডই তাঁকে সবথেকে বেশি নাড়া দেন বলে জানান। তিনি বলেন ঃ এই ফোর্ডের ছবি দেখতে দেখতে আমার কাছে ছবির ওই জগতটাই গভীর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমি এই চলচ্চিত্রেই প্রাণভরে বিশুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারি। আমি বলতে চাই প্রবীণ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে জন ফোর্ডই একজন জন ফোর্ড।

ফোর্ড যখন চলচ্চিত্রে কাজ করছেন অ্যামেরিকাতে তখন তাঁর পাশেই কাজ করছেন গ্রিফিথ এবং চ্যাপলিন।

জন ফোর্ড বস্তুত আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ। ১৮৯৫ সালে কেন এলিজাবেথ নামক শহরে তাঁর জন্ম হয়। ফোর্ডের পিতা ছিলেন এক অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর নাম শিয়োন এবং মায়ের নাম ফিনি। এঁদের সংসারটি ছিল বিরাট। ফোর্ডের ভাইবোনের সংখ্যা ছিল তেরটি। ফোর্ড ছিলেন সকলের ছোট। তাই দারিদ্র্য এই সংসারটিকে গ্রাস করেই ছিল।

ফোর্ড তাঁর শৈশবে আয়ার্ল্যাণ্ডেই পড়াশুনো করেছিলেন। পিতা শিয়োন এই আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে অ্যামেরিকায় এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি এখানে এক সেলুন খুলেছিলেন। পোর্টল্যাণ্ড আর আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্যবধান এখান থেকে সুরু। যাতায়াতটা ছিল খুব সামান্যই। ফোর্ড বলেছেন, এই সময়ের একটা ঘটনা; আমরা একটা নৌকো করে গলওয়েতে চলে আসতাম। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ছোট একটা পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা আমাদের পরিচিত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এসে মিশতাম। এই যাতায়াতের মধ্যে আমাদের পরিবারের অনেকেই আসত না। একবারই আমার এক বোন এসেছিল।

১৯১৩ সালে পোর্টল্যাণ্ড হাই স্কুল থেকে স্নাতক হবার পরই তিনি হলিউডে আসেন চাকরি লাভের আশা নিয়ে। এই হলিউডে ইউনিভার্স্যাল স্টুডিয়তে তাঁর দাদা ফ্রাঙ্ক ফিনি কাজ করতেন। অভিনেতা হিসেবে তিনি হলিউডের নানান ছবিতে কাজ করতেন। তিনি বেশ জনপ্রিয়ও ছিলেন সেই সময়। চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। পরবর্তী জীবনে এই ফ্রাঙ্ক ফিনি অন্য পরিচালকদের সঙ্গে সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছেন। এই দাদার সুপারিশেই ফোর্ড এইখানে স্টুডিওতে এক কাজ পেলেন। কাজটা খুবই সামান্য। দাদার ছিল চলচ্চিত্রের পাশেই থিয়েটারের প্রতি নেশা। থিয়েটার থেকেও তিনি চলচ্চিত্রের মতোই অর্থ রোজগার করতেন।

দাদার কাছ থেকেই তাঁদের পরিবারে ফোর্ড উপাধি এসে উপস্থিত হয়। দাদা নানানভাবে রোজগারের চেষ্টায় যখন থিয়েটারে যুক্ত হয়েছিলেন তখন এই মানুষটির মধ্যে ছিল অদ্ভুত ধরণের শ্রুতি, স্মৃতি এবং অনুভূতি। তিনি পারতেন একই সঙ্গে নানান নাটকের নানান চরিত্রের বিভিন্ন সংলাপে এবং অভিনয় ঠিক মতো করে দিতে। একদিন এইরকমই জনৈক ফোর্ড নামক এক অভিনেতা এমনই মত্ত অবস্থায় নিজেকে বেসামাল করে ফেলেছিলেন যার ফলে তাঁর পক্ষে আর মঞ্চে অভিনয় করা সম্ভব হল না। ফোর্ডের চরিত্রটি ছিল একটি কমেডিয়ানের। ফ্রাঙ্ক তখন সেই কমেডিয়ানের ভূমিকায় মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। এই অভিনয়েই তাঁর জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্য দলটির কাজও। ফ্রাঙ্কের পদবি তখন থেকেই জনসাধারণের কাছে ফোর্ড হয়ে যায়।

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে জন ফোর্ডের কাছে একজন হঠাৎ এসে

চলচ্চিত্রের কাজ চায়। সে তার পরিচয় দেয় একজন ভালো অভিনেতা হিসেবে। জন তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। আগন্তুক তার নাম বলে : ফ্রাঙ্ক ফিনি। জন তো আশ্চর্য, এইটাই তো আমার দাদা—যিনি অভিনয় করেন তার নাম। লোকটি তখন হাসতে হাসতে বলে—তা আমি জানি। আমার নাম ঠিক্ ফ্রান্সিস্ ফোর্ড। আমিই সেই অভিনেতা যে মত্ত হয়ে যাবার জন্য সেইদিন মঞ্চে উঠে অভিনয় করতে পারেনি। জন তাঁকে তাঁর চলচ্চিত্রে কাজ দিয়েছিলেন।

ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে একজন অতি সামান্য শ্রমিক থেকে ক্রমশ ফোর্ড উঠে আসেন সহকারী পরিচালক রূপে। এই দুটি চরিত্রই সমানভাবেই তাঁর জীবনে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৪ সালে কার্ল লিমলি নিউইয়র্ক থেকে এই স্টুডিওতে আসেন তখনই তিনি সুযোগ দেন ফোর্ডকে চলচ্চিত্র পরিচালনার।

ফোর্ড তাঁর জীবনে তাঁর দাদার কাছ থেকেই শিখেছেন এই চলচ্চিত্র বিষয়ে নানান খুঁটিনাটি। ফোর্ডের দাদা ফ্রাঙ্ক ফিনি ছিলেন চলচ্চিত্রে অভিনেতা, সঙ্গীতকার, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, ক্যামেরামান এবং পরিচালক। চলচ্চিত্র গড়ার নানান সম্যক জ্ঞানে তিনি ছিলেন জ্ঞানী। এছাড়া ফোর্ড শিখেছেন গ্রিফিথের ছবি থেকেও অনেক কিছু। বারবার তিনি গ্রিফিথের ছবি দেখেছেন, তার ভিতর থেকে শিক্ষা নিয়েছেন নানান সূক্ষ্ম বিষয়কেন্দ্রিক কলাকৌশলের বিষয়টি। ফোর্ড এই বিষয়ে নিজেই বলেছেন, আমি যদিও তাঁর কাছে অনেক ছোট ছিলাম। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে একরকম স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে গিয়ে কোনো কথা বলতে কোনো রকমই আমার ভয় হত না—অসুবিধাও কিছু ছিল না। এই জন্যই তিনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। মাঝে মাঝেই এই বিরাট শ্রেষ্ঠ মানুষটি আমার কাঁধে হাত দিয়ে আদরও করেছেন সেই সময়। তিনি সব সময়েই আমার নানান কথার উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন।

প্রথম দিকে অতি দ্রুত একরকম ছবি করতেন জন ফোর্ড। এই দ্রুত ছবি করাটা দুটি কারণে,—প্রথমতঃ, অভাব ছিল তাঁর জীবনে টাকা পয়সার। ছবি করতে পারলেই কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যাবেই। দ্বিতীয়ত, তিনি সত্বর বুঝে নিতে চাইছিলেন চলচ্চিত্র বিষয়ক নানান খুঁটিনাটি। তিনি এই সময় এতই দ্রুত কাজ করেছেন যে অন্য একজন লোক রাখতে হয় যে শর্টহ্যাণ্ডে তাঁর বলে যাওয়া চিত্রনাট্য এবং নানান বিষয়গত ভাবনা নোট

করতে পারবে। ১৯১৪ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত তিনি অজস্র ছবি করেছেন ছোটো ছোটো দু-রীলের। এই ছবিগুলো করতে তাঁর সময় লাগত মাত্র চার থেকে পাঁচ দিন। প্রচুর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই এই ছোট ছোট ছবিগুলো গড়ে উঠতো। নির্বাক যুগে এই ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে কাজের পর তিনি এসে যোগ দিয়েছিলেন ফক্স কোম্পানীর স্টুডিওতে। পেশাগত দিক থেকে এই ফক্স কোম্পানিতেই তিনি সব থেকে বেশী সাফল্য এবং সম্মান তুলে আনতে পেরেছিলেন। ফক্স-এতেই তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু এই কথাটিতে তাঁর স্বাধীনতা বা নিজস্ব চিন্তার প্রয়োগের সুযোগ তেমন একটা ছিল না। এখানেই কিন্তু তিনি জীবনের সার্থক চলচ্চিত্র গড়বার সুযোগও পান। যেমন—দি আয়রণ হর্স, থ্রি ব্যাড ম্যান, ফোর সনস্ ইত্যাদি।

১৯২৩ সালে তাঁর প্রথম নির্বাক ছবি ক্যাসিও কারবি সাধারণের জন্য প্রদর্শিত হয়। পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি দি আয়রণ হর্স-২৪ সালে রেলপথ তৈরির পটভূমিতে ছবি। এই ছবিতে তিনি একটি ঐতিহাসিক পরিবেশের পুরোনো মেজাজে পটভূমিতে ছবিটি গড়েন, যেখানে তাঁর সা মগ্রিক শিল্পী হৃদয়টি চেনা যায়। এই ছবিটি সারা পৃথিবীতে তাঁকে স্বীকৃতি এনে দেয়। তেমনিই নিজ দেশেই দারুণ জনপ্রিয় ছবি হিসেবে ব্যবসায়িক সাফল্য পায়। ফোর সনস্ করেন তিনি ২৮ সালে। ফোর্ডের জীবনের এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ছবি। ছবিটির বিষয়টি হল একজন জার্মান নারী, যা মহাযুদ্ধের ধ্বংসের মধ্যে বলি দিয়েছেন তাঁর তিনটি পুত্রকে। তিনি এখন দারুণ অসহায়। সব দিক থেকে বিপর্যস্ত এই মা জার্মান ত্যাগ করে অ্যামেরিকায় আসেন তাঁর এক ছেলের কাছে। তিনি ষ্টেশনে এসে নামেন অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু, এই নিউইয়র্ক শহরে তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য কেউ আসেনি। তিনি এই অবস্থাতে নিদারুণ অসহায়তা এবং দুঃখে কুঁকড়ে যেতে থাকেন। তিনি বিমূঢ়—সেই অবস্থাতে আস্তে আস্তে স্টেশনের চত্বর ত্যাগ করে শহরের পথে বার হয়ে আসেন। বিশাল বিশাল বাড়িগুলো মাথা উঁচু করে এই শহরে নিষ্করুণ ভাবে দাঁড়িয়ে ঠিক বিকট এক একটা দৈত্যের মতোই। তিনি দেখেন সেই বিশাল বিকট বাড়িগুলোর নীচে দিয়েই প্রচুর মানুষের যাতায়াত। তিনি কারুকেই কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না। কারণ, তিনি একমাত্র জার্মান ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানেন না। নিউইয়র্ক শহরে তিনি দেখছেন মানুষ পরস্পর ইংরেজীতে কথা বলছে। যে ভাষা তিনি কিছুই

বোঝেন না। মা ভীষণভাবে হতাশ হয়ে যান এই পরিস্থিতিতে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কী করবেন তিনি! একজন স্নেহময়ী মা এই বিশাল শহরে আজ হতভাগ্য, উদ্বাস্তু মা। তাঁর নেই কোনো পরিচয়, নেই কোনোরকম অস্তিত্বের স্বীকৃতি। এক বীভৎস করুণ অমানবিক যুদ্ধ যেমন তাঁকে উদ্বাস্তু, অসহায় করে দিয়েছে, তেমনিই একটি শহরও তাঁকে অসহায়-বিমূঢ়-উদ্বাস্তু-স্বীকৃতিহীন করেই রেখেছে। ওই অমানবিক যুদ্ধের মতোই অমানবিক এই শহরও।

দি স্ম্যাক ওয়াচ—সবাক ছবি, ১৯২৯ সাল। ফোর্ডের নির্বাক ছবির সংখ্যা হল একান্নটি। ছবিটির মধ্যে এক বিশিষ্ট শিল্প গুণ এমনই দক্ষতায় ফোর্ড রাখতে পেরেছিলেন যা চলচ্চিত্র আলোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৩৫-এতে দি ইনফর্মার। ২২ সালের আইরিশ বিদ্রোহের পটভূমিতে এই ছবি। এর আগেই দে ওয়্যার এক্সপেনডেবল, বিষয়বস্তু ফিলিপাইনসের সঙ্গে যুদ্ধে অ্যামেরিকার চরম পরাজয়। ছবিগুলো মেকিংয়েই শ্রেষ্ঠ তা নয়, বক্তব্যের গভীরতায় শ্রেষ্ঠ। এরই পাশে তিনি হালকা ধরণের কমেডি ছবিটিও করতে থাকেন উইল রজার্স ট্রিলজি। দি ইনফর্মার ছবিতে দেখা যায় বাণিজ্যিক ফর-মুলার ঠিক বিপরীত ভাবনাটি নিয়েই গড়েছেন ছবিটি। ছবিটি এ্যাকাডেমি পুরস্কারও পায় বিশিষ্ট মননের জন্যই। হলিউডের যে বাণিজ্যিক ফরমুলা চালু ছিল তার ঠিক পাশে থেকেই এই ধরনের মনন ফোর্ড এমনই দক্ষতায় প্রয়োগ করেছিলেন যা আজও মুগ্ধ করে। ৪০ সালে ও'নীলের নাটক থেকে ছবি করেন দি লংভয়েস্ হোম এবং ৪১-তে করেন হাউ গ্রীণ ওয়াজ মাই ভ্যালি। ছবির বিষয়বস্তু গভীরত্বে শ্রেষ্ঠতম। একটি নিদারুণ মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে অ্যামেরিকায় সুন্দর গোছানো মধ্যবিত্ত পরিবার ক্রমশই ধ্বংস হয়ে যায়। এই ছবিগুলো ফোর্ড খুব সচেতন ভাবেই করেন, যেমন তিনি সচেতন ভাবেই করেছিলেন হালকা কমেডি ছবি। এক রকম দ্বৈতসত্তার ফোর্ড-মনন ছবিগুলোতে ধরা পড়তে থাকে। অবশ্যই তিনি তা করেন ব্যবসায়িক ভাবে সফল হবার জন্যই। কিন্তু তা হোলেও তাঁর শৈল্পিক মননটির ছন্দ, শৈল্পিক সত্তার দুটি দিক প্রকাশিত হয়। হাউ গ্রীণ ওয়াজ মাই ভ্যালি বাণিজ্যিক সুস্থ সফল ছবি হয়েও বিজ্ঞানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিটি অস্কার পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়। ৩৯ সালে একটি ছবি করেন ফোর্ড। ইয়ং মিঃ লিঙ্কন। এই ছবিতে ফোর্ড লিঙ্কনের মতো একজন মানুষকে এমনইভাবে উপস্থিত করেন যেখানে তিনি মোটেই ইতিহাসের প্রবল এক স্মরণীয় মানুষ নন্।

লিঙ্কন এখানে খুব সাধারণ একজন মানুষ। যে মানুষটি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত মর্যাদাতেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। ছবিটির মধ্যে ফোর্ডের ব্যক্তিগত এক সত্তা এমনিভাবে প্রকাশ হয় কাব্যিক মেজাজের ঋজুতায় যা আজও চলচ্চিত্রের ছাত্রদের প্রলুব্ধ করে। এই ছবিটিকে গভীর প্রশংসা করেছেন অনেকদিন পর আইজেনস্টাইন। আইজেনস্টাইন আমাদের জানান—জন ফোর্ডের চলচ্চিত্রের ভিতরে রয়ে গেছে বর্ণনাত্মক এক ধরণের বিশিষ্ট গল্প বলার মেজাজময় চিত্রল শরীর। ছবিতে লিঙ্কনের ব্যক্তিত্বময় পৌরুষত্ব, তাঁর মেধা, সুন্দর চারিত্রিক দৃঢ়তায় বৈশিষ্ট্যগুলো এমনই গল্পময় বর্ণনাত্মক কাহিনীচিত্রণে প্রস্ফুটিত যা যে কোনো চলচ্চিত্রপ্রেমিককে মুগ্ধ করেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার মুখেই ফোর্ড চলচ্চিত্র থেকে সরে গিয়ে সামরিক নৌবিভাগে যোগ দেন। অ্যামেরিকান নৌবাহিনীর কমাণ্ডার ফ্র্যাঙ্ক উইড্-এবং জনি ব্রিকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ব্যক্তিগতভাবে। এ-এস-এস-এর একটি শাখায় ফিল্ড ফটোগ্রাফি বিভাগে তিনি প্রধান হয়ে ওঠেন এই সময়। তাঁর কাজটি ছিল বিভিন্ন অতি-গোপন কাজের ছবি তুলে রাখা—যেগুলো বিশেষ এক ধরনের দলিল।

৪০-এই একটি ছবি করেছিলেন স্টিইনবেকের গল্প নিয়ে। দি গ্রেপস্ অফ্ র‍্যাথ। যুদ্ধের ডামাডোল, সারা আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ। ঠিক এই পরিবেশে একেবারেই এক অতি সাধারণ অ্যামেরিকান মানুষ এবং চাষী সম্প্রদায়ের মানুষের নিদারুণ নির্মম দারিদ্রকে ফোর্ড এমনই এক দ্বন্দ্বে বক্তব্যের গভীরত্বে আন্তরিকভাবে ছবিতে তুলে ধরেন, যেখানে প্রমাণিত হয় তিনি মানবিক সহৃদয় জীবনপ্রেমী এক শিল্পী। কিন্তু এই ছবিতে অবশ্যই পাওয়া যায় না কোনো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তা। ছবির মধ্যে আবেগ এবং ভাববাদী মনন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক কোনো কমিটমেণ্ট কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা যেমন পাওয়া যায় না, তেমনিই পুঁজিবাদী বেনিয়া শাসনব্যবস্থায় গরীব এবং ধনিক শ্রেণীর বৈষম্যে সমালোচনা প্রকাশ হয়নি। এর আগেও বর্ণনাত্মক গল্পকে চিত্রলভাষায় ফোর্ড বলেছেন ছবিতে মহাকাব্যিক এক প্রসাধনে। কাব্য তাঁর ছবিতে বিশেষ অলংকার। ছবির সমগ্র গঠনটিই এমনই দৃষ্টিভঙ্গিতে অতি ধীরে ধীরে তিনি গেঁথে তোলেন যার মধ্যে মহাকাব্যিক অনুভূতি প্রকাশ হয়। তিনি এই ছবিতেও অস্কার পেয়েছেন। ফোর্ড তাঁর জীবনে এই অস্কার পুরস্কার লাভ করেছিলেন পাঁচবার।

সারাজীবনে তিনি বহু মূল্যবান পুরস্কার জয় করেছেন। সারা পৃথিবী

থেকেই চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ছবি পুরস্কার গ্রহণ করতে যেমন পেরেছে, তেমনিই বিদগ্ধ সমালোচকদের সপ্রশংস উৎসাহও কুড়িয়ে আনতে পেরেছে। একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ছয়বার। শ্রেষ্ঠ অ্যামেরিকান সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছেন বহুবার। তাঁর জীবনটাতে পুরস্কার এবং ব্যবসায়িক সাফল্য ১৩৯টি ছবির সঙ্গেই ক্রমান্বয়ে জড়িয়েই থেকেছে। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েই তাঁকে সাফল্যের পিছনে, অর্থের পিছনে ছুটতে হয়েছিল এক সময়। কিন্তু পরে এই অর্থ এবং সাফল্যই তাঁর পিছনে তাড়া করে ফিরেছে। একবার তিনি বলেন, "চলচ্চিত্র তৈরী করার সব থেকে আনন্দদায়ক বস্তুটাই হোলো তার যান্ত্রিক কলাকৌশলের জটিল দিকটা। আর এই জন্যই কোনোরকম ভালো গল্প পাবো এই আশাতে আমি কাজহীন অবস্থাতে বসে থাকাটা মোটেই পছন্দ করিনা। যে কোনো ধরণের একটা গল্প নিয়েই ওই যান্ত্রিক জটিল আনন্দদায়ক পরিস্থিতিতে চলে যেতেই আমি চেয়েছি বারবার।" এই অবস্থাতেই বোঝা যায় যে,—তিনি তাঁর কোনোরকম একটা নির্দিষ্ট স্থান সর্বদা বজায় রাখাটা সচেতনভাবে ভাবতেন না, তাই দেখা যায় বেশ কিছুবার তিনি এমন সব ছবি করেছেন যার মধ্যে যান্ত্রিক কলাকৌশল, বিষয়বস্তু, কিম্বা বিশেষ কোনো সচেতনভাব সার্থক হয়ে ওঠেনি। সত্যজিৎ রায় এই সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন, "এ থেকে হয়ত মনে হতে পারে যে ফোর্ড নিজেকে শিল্পী বলে মনে করতেন না, কিম্বা নিজের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে তাঁর কোনো তাপ উত্তাপ ছিল না। আসল কারণটা বোধ হয় এই যে নিজের ক্ষমতার প্রতি ফোর্ডের আস্থা এতই গভীর ছিল যে তিনি জানতেন দু-একটি স্খলনে তাঁর খ্যাতি টোল খাবে না। প্রকৃত পক্ষে ফোর্ডের শ্রেষ্ঠ রচনায় আত্মপ্রত্যয়ের যে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোনো পরিচালকের রচনায় মেলে না।"—এইখানেই তাঁর গভীর শৈল্পিক সত্তার পরিচয়। জীবনের দুটি দিকেরই গভীর প্রত্যয়েরই প্রতিনিধি তাঁর ছবি।

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা

সম্পাদক 'পরিচয়' সমীপেষু—

'পরিচয়' সমালোচনা সংখ্যা (১৯৮৭) পড়ে আপাততঃ "বাংলাদেশের চর্চা" বিষয়টি নিয়ে সেখানকার নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য কিছু কথা বলতে চাইছি। 'বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে নিযুক্ত বন্ধুরা সম্ভবতঃ সেখানকার পুরানো ইতিহাসকে পরিহার করে চলার প্রবণতা প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে যখন দেখি ১৯৭২-এর পর থেকেই সেখানে ইতিহাসের জন্মকাল ঘোষণা করা হচ্ছে। "পাকিস্তানী" শব্দটি এখন সেখানে না-পাক বলে গণ্য হতে পারে রাজনৈতিক ছুৎমার্গের কারণে। আর অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসচর্চা উপেক্ষিত হচ্ছে অজ্ঞতা বা আত্মতুষ্টির ইচ্ছায়। কিন্তু সব দেশেই যে সংস্কৃতির একটা স্রোতধারা সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই বয়ে আসছে একথা কি ভুলতে চাইলেই ভোলা যায়? সুতরাং যাঁরা বাংলাদেশের নাট্যচর্চা নিয়ে ইতিহাস রচনা করতে চান তাঁরা যেন একবার পাকিস্তানী আমলের দিকেও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তাকান এবং তারও আগে অবিভক্ত বাংলার দিকে ঔদার্যমিশ্রিত অনিসন্ধিৎসু সাবলীল দৃষ্টি নিয়ে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা একটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। এই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে ইংরেজ আমল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবাহমান স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা। এবং তারই ধারাবাহিকতা এসে পরে বিস্ফারিত হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনেরও পরম্পরাগত একটা ঐতিহ্য রয়েছে যা সুপ্রাচীন এবং নান্দনিক ভাবনায় জারিত। বহু যুগের ওপার থেকেই এই সংগীত ভেসে এসেছে এবং বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের যুগে একাত্ম হয়েছে। সব দেশেই এরকমটা ঘটে আসছে। এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রম সম্ভবও নয়। অতএব, তাকে "বাংলাদেশ" শব্দ দিয়ে একটা মনগড়া অভিধার দেওয়াল খাড়া করে পিছন দিকে না তাকানোর প্রয়াস বর্জন করাই সমীচীন।

বাংলাদেশের বর্তমান নাট্যচর্চা বা নাট্য আন্দোলন একটা প্রাচীন ধারায় পরিণত। এই আন্দোলন মৃত্তিকাশ্রয়ী হলেও হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। এই মানসিকতা না থাকলে নাট্যচর্চায় গবেষকরা হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে ভুলে যাবেন না যে, সেখানে ১৯৪৭ সালের আগেও নাট্যাভিনয় বা নাট্য চর্চার এক সুদৃঢ় পীঠস্থান ছিল।

পাকিস্তানী আমলে এবং তারও বহু আগে বর্তমান পত্রলেখক তাঁর শৈশবকাল থেকে সেখানকার নাট্যচর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অন্ততঃ ১৯২৯ সাল থেকেই কিছু না কিছুর ইতিহাস তাঁর স্মৃতিকে উদ্বেল করে। সুতরাং তাঁর পূর্বসূরী অথবা সহযাত্রীদের কথা (অন্ততঃ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত) যদি বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের কর্মীরা ভুলে যেতে চান অথবা স্মরণ করতে না চান তাহলে সেটা হবে বড় মর্মান্তিক। আমরা যে সংস্কৃতি জগৎ থেকেও বাস্তুচ্যুত বলে গণ্য হব সেটা ভাবি কেমন করে? বিশদ না বলেও উল্লেখ করা যায় ইংরেজ আমলের অল ইণ্ডিয়া রেডিওর (AIR) ঢাকা কেন্দ্র এবং পাকিস্তানী আমলের রেডিও পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলো থেকে প্রচারিত নাটকগুলোর কথা। যার কিছু ঝড়তি-পড়তি অংশ আজও হয়তো সেখানকার মহাফেজখানায় জমা রয়েছে। অবশ্যই মুনীর চৌধুরী তাঁর "পলাশী ব্যারাক" ব্যঙ্গ নাটিকা দিয়ে পথ পরিক্রমা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা দিয়ে নাট্য আন্দোলনের নিরিখ তৈরি হয়তো ঠিক হবে না। মুনীর চৌধুরী আমার অন্তরঙ্গ সহযাত্রী হলেও বলব, পাকিস্তানী আমলের প্রথম দিকেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং ঢাকা বেতারের নাট্য বিভাগের কর্ণধার নাজির আহমেদ মঞ্চ ও বেতারের জন্য কিছু ভালো নাটক উপহার দিয়েছিলেন, রণেন কুশারীও উপেক্ষণীয় নন। নব নাট্যআন্দোলন পুরানো স্রোতধারা থেকেই উৎপন্ন। কেউ কোনও নাট্যআন্দোলন বা নাট্যচর্চাকে শুরুতেই বাম বা দক্ষিণ বলে উল্লেখ না করলে হয়তো বেহিসেবী হবে না। পাকিস্তান পর্বের আগে, বহু আগেই, মঞ্চে ও বেতারে অনেক নাট্যকার ও শিল্পীকে আমরা দেখেছি যাঁরা আমাদের পূর্ব বাংলার নাট্যজগৎকে অলংকৃত করে গিয়েছেন। শুধু ঢাকা শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও, এবং চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, বরিশাল, দিনাজপুর, রংপুর, যশোর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় শহরে ও গ্রামে ইংরেজ আমলে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় নাট্য চর্চার ব্যাপকতা ছিল বেশি। কলকাতার নামী অভিনেতা ও মঞ্চ-স্থাপকদের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা দাঁড়াতে পারতেন। অনেকে

দাঁড়িয়েছিলেন এবং খ্যাতিমান হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ছোট্ট একটা মানচিত্র আঁকলে হয়তো বাহুল্য হবে না। সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের মত নাট্য আন্দোলনও কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নে দেখা দেয়। অভিন্ন বঙ্গের কালেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি জেলা শহর, মহকুমা শহরে এবং বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্থায়ী মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। এমন কি সতু সেন মহাশয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কিছু কিছু জমিদার গৃহে স্থায়ী ঘূর্ণায়মান মঞ্চও তৈরি হয়েছিল। ঢাকা উয়াড়ীর আমোদ দাশগুপ্ত, ক্যানা সূত্রধর ও রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কালুবাবু) মঞ্চস্থাপত্য প্রবাদকল্প ছিল। ঢাকা শহরে গেণ্ডারিয়ার ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ আমাদের মত বয়সীদের স্মৃতিকে আজও আলোড়িত করে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে চল্লিশের দশক পর্যন্ত তৈরি প্রায় সব সিনেমা হলে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল এবং সেখানে নিয়মিত নাট্যাভিনয় হত। কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পীরাও মাঝে মাঝে সেখানে পায়ের ধুলো দিতেন। ঢাকা শহর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো আদিকাল থেকেই নাট্যচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রখ্যাত নাট্যবিদ শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় নাট্য চর্চায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ বাঘা সোম ঢাকার নাটকে যুক্ত ছিলেন। উভয়েই আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিচারণা অনেকাংশে জ্ঞান আহরণে আমাদের সাহায্য করবে। নাট্যকার অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী তাঁর রংপুরের মঞ্চ থেকেই নাট্যজীবন শুরু করেছিলেন। গাইবান্ধার রবি রায়, ভূমেন রায়, যশোহর-খুলনার নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য আমাদের নমস্য পুরুষ। রাজশাহীর ধরণী লাহিড়ী, রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নাটক রচনা ও পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঢাকার ব্রজগোপাল দাস, সুধীর সরকার, সুদেব বসু, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব বসুর লেখা নাটক সেকালে ঢাকার রঙ্গমঞ্চ ও বেতারকে সমৃদ্ধ করেছিল। ব্রজগোপাল দাস ঢাকা শহরে পেশাদার মঞ্চের প্রবর্তন করেছিলেন। এই তালিকা সামান্য মাত্র। এই সমস্ত মানুষ এবং তাঁদেরা মত আরো অনেকে কেউ বা দেশভাগের আগে, কেউ বা পরে এপার বাংলায় চলে আসেন। তাঁদের অনেকের দেশত্যাগ এক দুঃখজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিণাম। জেলা প্রগতি লেখক সংঘের কার্যকলাপে নাট্য চর্চারও স্থান ছিল। মুনীর চৌধুরী তাঁর সাহিত্য জীবনের পথচলা এখন থেকেই শুরু করেছিলেন। রাজশাহী জেলে বসে মুনীর নাটক ছিলেন যে পরিস্থিতিতে তার চেয়ে অনেক কঠিন পরিস্থিতি ও লাঞ্ছনা তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল। সে অন্য কথা, মুনীরের গোটা জীবনটাই

ছিল নাটকীয়, এমন কি মৃত্যুও। শিল্পীদের মধ্যে টোনা রায়, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, রবীন মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু সাহা প্রমুখ ওপার বাংলারই ফসল। এঁরা সবাই যদি বাংলাদেশে থাকার সুযোগ পেতেন তাহলে কি বাংলাদেশের বর্তমান নাট্যসারথীরা তাঁদের উপেক্ষা করতে পারতেন? গিরিশবাবুর কথা যদি বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারেন তবে তাঁর পূর্ববঙ্গীয় উত্তরসূরীরা দেশভাগের পর বিস্মৃতির অতলে কেন তলিয়ে যাবেন? কেনই বা তাঁরা অবদান রেখেও সংস্কৃতির জগৎ থেকে বাস্তুচ্যুত হবেন? ইতিহাসে অজ্ঞতা প্রশংসার পরিচয় বহন করে না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণ্ডি টানা সংস্কৃতিবানের পরিচায়ক নয়।

ইতিহাস চর্চা এই চিঠির উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বর্তমান বাংলাদেশের নাট্য কর্মীদের মনে করিয়ে দিতে চাই তাঁদের পূর্বসূরীদের কথা। তাঁদের যেন তাঁরা বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন, দর্পণে শুধু নিজেদের প্রতিবিম্বে সন্তুষ্ট না থেকে।

শুভেচ্ছাসহ—

সাধন দাশগুপ্ত

CINEMA AND I

RITWIK GHATAK

Rs. 46

RITWIK MEMORIAL TRUST

DISTRIBUTORS : RUPA & Co.

সংশোধনী

এই সংখ্যায় সৌরি ঘটকের 'স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক' রচনাটির ৮০ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে একটি মারাত্মক মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। লেখা হয়েছে 'কমিউনিস্ট গুণ্ডা '। পরিবর্তে প্রকৃত পাঠ হবে 'কমিউনিস্ট গ্রুপ'। এই প্রমাদের জন্য আমরা লজ্জিত।

সম্পাদক, পরিচয়

সম্পাদকীয়

উনিশশো সতেরোর সাতই নভেম্বরের পর সত্তরটি বছর আমরা পার হয়ে এসেছি। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা সাধারণত ক্লান্তিকর। কিন্তু এই পথযাত্রা ছিল গৌরবের আনন্দের এবং উজ্জ্বল প্রত্যাশার। এই গ্রহের মানুষ সত্তর বছর আগের এই মহান অভ্যুদয়ে চমকিত হয়ে উঠেছিল। সমগ্র পুরনো পৃথিবীর ভিত্তিভূমেই পড়েছিল প্রবল আঘাত। তখন এই বিপ্লবকে অভিনন্দন জানানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। তখন এর বিরুদ্ধে সংশয় ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছিল সুপরিকল্পিতভাবে। চারদিক থেকেই শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে পিষে মারবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছিল তখন। দেশে অভ্যন্তরে চলছিল নির্মম শ্বেত-সন্ত্রাস। কিন্তু তখনই আবার আমেরিকান সাংবাদিক জন রীড ওই দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিনকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তখনই আবার ভারতবর্ষের পরাধীন মানুষ এই বিপ্লবের মধ্যে আসন্ন মুক্তির সুস্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করেছিল। তখনই লেনিন নামক একজন অসাধারণ মানুষ একাই একটা সমগ্র যুগ ও জাতির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন। পৃথিবীর প্রত্যেক কোণের শৃঙ্খলিত মানুষের মনে তিনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিলেন, প্রত্যেকেরই মনে হচ্ছিল 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন'।

'পরিচয়' তার জন্মলগ্ন থেকেই এই গৌরবময় পথ-পরিক্রমার আগ্রহী অংশীদার। এই 'তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয়' পরিচয়ের পৃষ্ঠায় অসংখ্য বার অভিনন্দিত হয়েছে, তার অনেক বিপদের বা সংগ্রামের মুহূর্তে তা প্রেরণা দিয়েছে, তাকে বেঁচে থাকার উৎসাহ যুগিয়েছে। সুস্থ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পরিচয়ের যে আজন্ম সংগ্রাম তারও মূল উৎসভূমি এই বিপ্লব। আগামী দিনগুলিতেও এই মহান ভাবধারা পরিচয়ের পথ চলার পাথেয় হবে একথা ঘোষণা করতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই।

৫৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯৪

প্রবন্ধ

বাঙালীর আত্মপরিচয় : সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত কবীর চৌধুরী ১
উত্তরবাংলার লোকসমাজ : 'দেশী-পলি-ক্ষত্রী' শিশির মজুমদার ১৫
চার্বাক : প্রত্যক্ষই প্রমাণ শ্রেষ্ঠ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৭

গল্প

আশ্রয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৩৯
অস্তিত্বশিকারী প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫
স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক সৌরি ঘটক ৭১

কবিতাগুচ্ছ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় আনন্দ ঘোষ হাজরা মতি মুখোপাধ্যায়
অজিত বাইরী সনৎ মায়া কার্তিক চট্টোপাধ্যায় মেঘ মুখোপাধ্যায়
সুজিত সরকার রেজাউদ্দিন স্টালিন ৬৪—৭০

আলোচনা

কাব্যবিরোধিতা ও যতীন্দ্রনাথ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৫

পুস্তক আলোচনায়

পুরাণতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ অমর দত্ত ৮৫
কৃষণচন্দরের আত্মকথা ধৃতিমান মুখোপাধ্যায় ৯১

সংস্কৃতি সংবাদ

শতবর্ষে সুকুমার রায় একটি গৌরবময় প্রকাশনা
অমল গঙ্গোপাধ্যায় ৯৫
সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কারে সম্মানিত দুই কবি
শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ৯৭

মহান অক্টোবর বিপ্লবের সত্তরতম বার্ষিকী স্মরণে

দেশকাল নিরপেক্ষ মহান অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৯৮

প্রচ্ছদ

একটি রুশ চিত্র থেকে

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও
ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

বাঙালীর আত্মপরিচয় ঃ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত

কবীর চৌধুরী

কোনো ব্যক্তি কি পরিপূর্ণভাবে নিজের পরিচয় লাভ করতে পারে? কিন্তু নিজের পরিচয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে সে কি ভাবে, কোন পথে, নিজেকে গড়ে তুলবে? আত্মপরিচয় অনুসন্ধান তাই প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বা অন্যভাবে ঐক্যবদ্ধ সকল জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

উক্ত অনুসন্ধান পর্ব চালাতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে যে কোথাও কোথাও বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। কিন্তু নিরাবেগ তীক্ষ্ণতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে এও দেখা যাবে যে সেটা রয়েছে উপরের স্তরে, গৌণ বিষয়কে ঘিরে। মুখ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, জীবনের গভীরে, বিরাজ করছে একটা মৌল ঐক্য ও সংহতি। সুস্থ ব্যক্তির মতো সুস্থ জাতিও সংহত ও সমন্বিত, খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন নয়, এলিয়েনেটেড বা ডিসওরিয়েন্টেড নয়।

একটা জাতির সার্বিক পরিচয় লাভের জন্য তার সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নৃবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক প্রমুখ এবিষয়ে ঐক্যমতে পৌছেছেন। তবে সংস্কৃতির রূপ, চরিত্র কিম্বা উপাদান সম্পর্কে তাঁরা যে সব সময় এক ধারণা পোষণ করে এসেছেন তা নয়।

বাঙালী তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে, প্রধানতঃ স্বৈরাচারী শাসক কর্তৃক শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে, নানা বিভ্রান্তি ও বিতর্কের শিকার হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো কিছু বলবার আগে সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে দু'একটি কথা বলে নেয়া যাক। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে অবশ্য কোনো বিস্তৃত বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তবে এটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা কালের যাত্রার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে বর্তমানে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতি সম্পর্কে তার অতীতের ধারণা থেকে তা স্বতন্ত্র। কোনো এক সময় সংস্কৃতির সঙ্গে জাতিতত্ত্ব বা রেসিজমের আত্যন্তিক যোগ ছিলো। বিংশ শতাব্দীতেও এডলফ হিটলার এরিয়ান কালচার নিয়ে উন্মত্ত হয়ে

উঠেছিলেন, যদিও তখন ওই ধারণা এ্যানাক্রনিস্টিক হয়ে গিয়েছিলো। অন্য কোনো এক সময় ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতিকে একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো। সংস্কৃতি গঠনে যে জীবিকার উপায়, সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতিনীতি, ললিতকলা, শিল্প-সাহিত্য এবং জীবন উপভোগের যাবতীয় ব্যবস্থা ও উপকরণ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল সে তথ্য অনেকে ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে "Many writers had accepted the fallacious explanations of racism while others who avoided the errors of race were forced to fall back on environmental explanations which went astray because it had not recognized either that the culture interposes between the individual and his physical environment or that the society itself has often erected a secondary environment more important than the original or primary one." (David M, Potter, People of Plenty, published by the University of Chicago, 1954)

আমরা বর্তমানে সংস্কৃতি বলতে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রভাবিত ব্যাপক অর্থেই তাকে গ্রহণ করি। কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার, থাকা-খাওয়ার রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তার সংস্কার-কুসংস্কারসহ জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার, তার ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য সব মিলেই তার সংস্কৃতি। কোনো কোনো সময়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিশেষ কোনো একটি বা কয়েকটি উপাদান অন্যান্য উপাদানগুলির চাইতে অধিকতর প্রভাববিস্তারী হয়ে উঠতে পারে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর টোটাল সংস্কৃতি নির্মাণে সাময়িকভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু তাই বলে সর্বাবস্থায় সর্বকালের জন্য কোনো বিশেষ উপাদানকে প্রধানতম রূপে চিহ্নিত করলে আমরা অস্বচ্ছ চিন্তা ও বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেবো। এক সময় পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী সেদেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা, ভৌগোলিক পরিবেশ, অতীত ইতিহাস, জীবনের উপকরণ, ঐতিহ্যিক আচার-আচরণ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে শুধু ধর্মকে অতিপ্রাধান্য দিয়েছিলো। ফলে প্রশ্রয় পায় চরম ভ্রান্তি, পরিণামে যা রাষ্ট্রীয় স্তরে তার জন্য অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ডেকে আনে। পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচারী শাসন ও উপনিবেশবাদী শোষণের স্বার্থে তার শাসকচক্র

সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালীর সংস্কৃতির স্বাভাবিক স্রোতধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করাতে চেয়েছিলো। সে-ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মন্তব্যগুলি শেষ করার আগে আরো দু'একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। সচরাচর সংস্কৃতি বলতে আমরা এর মানসসম্পদের কথাই ভাবি, যার পরিচয় মেলে কোনো জনগোষ্ঠীর শিল্প সাহিত্য ললিতকলায়। কিন্তু এগুলি শুধু সংস্কৃতির একটা দিক। গোপাল হালদার তাঁর "সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে সংস্কৃতির তিন অবয়ব বা তিন প্রকার অবলম্বনের কথা উল্লেখ করেছেন: "প্রথমতঃ ইহার মূল ভিত্তি সেই জীবনসংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means); দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজদেহের বাস্তব ব্যবস্থা (social structure); আর তৃতীয়তঃ সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদ—উহা এই হিসাবে সমাজসৌধের শিখর চূড়া মাত্র (super-structure)। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার জাতিগত, দেশগত, বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটা অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার মানে কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আরেকটি অর্ধসত্য।" এ প্রসঙ্গে এটাও আমরা সবাই লক্ষ্য করি যে বর্তমানে কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির একটা বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র রূপ কল্পনা করা যায় না। নানারকম মিশ্রণ, গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয়। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি যে নানারকম গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ও উঠছে। আমরা জানি যে ধর্ম আমাদের সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। আমরা এও জানি যে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের জাতীয়তার অন্যতম আশ্রয়। তবে এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও জানি যে সমন্বয়ই সুস্থ জাতীয়তাবোধের সদা-অন্বিষ্ট। সুস্থ জাতীয়তাবোধের ঝোঁক সর্বদাই গ্রহণের দিকে, বর্জনের দিকে নয়। একমাত্র উগ্র ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদই সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্জননীতি অনুসরণ করে। নাৎসী জার্মানীতে বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের বহ্ন্যুৎসবের বর্বর কাহিনীর কথা সবারই জানা।

গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' বই-তে একটি কৌতূহলোদ্দীপক উক্তি করেছেন। বাঙালী সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "আকারে যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি বাঙালী ভারতীয়ই

বটে। বাঙালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়ত চার আনা ইউরোপীয়, তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে—এবং আট আনা ভারতীয়, বাকী চার আনা সে বাঙালী এবং এই চার আনার মধ্যে আবার কতটা ভারতীয়ত্বের বাঙালী বিকার—বাকীটুকু খাঁটি বাঙালী অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙালী।" সুনীতিবাবুর মন্তব্যের সূত্র ধরে আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের মতো দেশে যেখানে শতকরা প্রায় নব্বুই জন লোকের বাস পাড়াগাঁয়ে এবং যাদের পেশা প্রধানতঃ কৃষিকর্ম সেখানে সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক পল্লীগ্রাম ও পল্লীর জনগণ। তার সকল সীমাবদ্ধতা নিয়েই লোকজ ঐতিহ্যসমৃদ্ধ গ্রামীন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপরই আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতি বিষয়ক সকল আলোচনায় আমরা সচরাচর যার কথা বলি তা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষের সংস্কৃতি, এর জন্ম ও অবস্থান মূলতঃ শহরে, এবং এটা প্রধানতঃ মানস সংস্কৃতিরই ইতিহাস বহন করে, জীবিকাগত বা বাস্তব উপকরণগত সংস্কৃতির বিশেষ খোঁজ রাখতে চায় না।

জীবিকাগত ও বাস্তব উপকরণগত, তথা অর্থনৈতিক, বিকাশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়টি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক বিকাশ যখন সুষম হয়, যখন তা সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে ইতিবাচক ও ধনাত্মকভাবে স্পর্শ করে তখনই প্রকৃত অর্থে সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ খুলে যায়। তখন পল্লী ও নগরের ব্যবধান কমে আসে, লোকজীবন ভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে নগর-সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে তার রাখীবন্ধন ঘটে। আমাদের মতো শোষণভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় যথার্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য যা শুধু আকাঙ্ক্ষিত নয় অপরিহার্য, অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের সুস্থ উন্নত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন, তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

এবার আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করা যাক, যদিও এর আভাস রয়েছে উপরের আলোচনাতেই। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ঘটনাবলী এবং বহির্বিশ্বের বহুমুখী প্রভাব সেদেশের সংস্কৃতিতে একটা জাগরণের তরঙ্গ তুলতে পারে, সেই অভিঘাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানস গঠনে, তার সাংস্কৃতিক বিকাশে, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার কোনো একটি বিশেষ সময়ে কোনো একটি দেশে কতিপয় যুগস্রষ্টা ব্যক্তির উদ্ভব ও

তাদের প্রবল প্রভাববিস্তারী কর্মকাণ্ডও সেদেশে একটা সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা করতে পারে। তবে সাধারণতঃ আর্থ-সামাজিক জাগরণের সড়ক বেয়েই সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। এবং এর সঙ্গেই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, রুচি, সৃজনী-প্রতিভা এবং সকল সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা।

এবার আমরা আরেকটু প্রত্যক্ষভাবে বাঙালী সংস্কৃতি এবং তার সূত্র ধরে বাঙালীর আত্মপরিচয় লাভের প্রয়াস সম্পর্কে কিছু কথা বলব। আমরা প্রধানতঃ বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখবো। কারণ অস্বচ্ছতা একে ঘিরেই। সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে যখন মন্তব্য করবো তখন আমাদের বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বাঙলাদেশের বাঙালী, ধর্মে যারা মুসলমান। এও সেই একই কারণে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে তার মাটি, প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব থেকে প্রাণরস আহরণ করে একান্তভাবে দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যলালিত এক ধরণের ইন্টিগ্রেটেড বা সমন্বিত বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো। সম্প্রদায় ভেদে শ্রেণীভেদে, ধর্মভেদে, পেশাভেদে, কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপরস্তরে বিভিন্নতা থাকলেও মৌল স্তরে ঐক্য ছিলো। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে তলের দিকে বিদ্যমান ওই মৌলিক ঐক্যই সমাজকে তখন বেঁধে রেখেছিলো, তার সুস্থতা সুনিশ্চিত করেছিলো। বাঙালীর লোকসঙ্গীত, লোকগাথা, লোককাব্য, বাউল তত্ত্বসাধনা ও গ্রামীণ মেলাসহ নানা লোক-উৎসবের মধ্যে আমরা তা লক্ষ্য করি।

আধুনিক কালে ইংরেজের এই উপমহাদেশে আগমন, বাংলায় তাদের প্রথমে বাণিজ্য ও পরে রাজত্ব বিস্তার, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, সীমিত নগরায়ণ, পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ প্রভৃতি তার সকল দোষগুণ নিয়ে বাঙালী বুর্জোয়ার উদ্ভবের সূচনা করলো। শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালীর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তখন বাঙালী সংস্কৃতির একটা রূপান্তর হ'লো। কিন্তু এ-রূপান্তরে সমন্বয় আর থাকলো না। রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কারণে গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ অবধি, উপরোক্ত রূপান্তর বাঙালী মুসলমানের জীবনকে ইতিবাচকভাবে স্পর্শ করলো না। ফলে এযাবৎ কাল যে লোকজ ঐতিহ্য-ভিত্তিক সমন্বিত বাঙালী সংস্কৃতির একটা ধারা গড়ে উঠছিলো তার বিকাশের পথে বাধার প্রাচীর তৈরী হতে শুরু করলো। রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক

পরিবেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধকে উদ্দীপ্ত করতে শুরু করেছিলো। বঙ্গভঙ্গ আইন ও তা রোধ করার আন্দোলন, বাঙালী মুসলমানের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ও তদ্‌জনিত ক্ষোভ, সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত অমুসলমান নেতৃবর্গের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা, মির জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার প্রভৃতি বিষয় ওই বাধার প্রাচীরকে দৃঢ় করে তোলে। আর অবশ্যই উপনিবেশবাদী বিদেশী ইংরেজ শাসকবর্গ তাদের কূটবুদ্ধিজাত "ভাগ কর এবং শাসন কর" নীতি অনুসরণ করে এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন যোগায়। ফলে শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালীর চিত্তে, সাধারণভাবে, বুর্জোয়া বিকাশ রেনেসাঁসের পথ না ধরে রিভাইভালিজমের পথ ধরে অগ্রসর হলো। সপ্তদশ শতকের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি, শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, হিন্দুমুসলিম নির্বিশেষে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, বাংলাভাষাকে নিজের ভাষা জ্ঞান করে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করলেন, কাহিনীর পাত্র-পাত্রী হিন্দু কি মুসলমান তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না, নিঃসঙ্কোচে লোকাচারকে তাঁদের রচনায় স্থান দিলেন। কবি আব্দুল হাকিম তো যারা বাংলাদেশে বাস করে, বাংলার অন্নজলে পুষ্ট হয়ে, বাংলাকে মাতৃভাষা বিবেচনা করতে দ্বিধা করে তাদের সরাসরি বেজন্মা বলে আখ্যায়িত করলেন। সেই অবস্থান থেকে সরে এসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান মাতৃভাষা নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন তুললেন। বাঙালী মুসলমান কোন ভাষাকে আঁকড়ে ধরবে, কোন ভাষাকে প্রাধান্য দেবে? বাংলাকে, নাকি আরবী, ফার্সী, অথবা উর্দুকে? ইসলামী সংস্কৃতির একটা কৃত্রিম ধোঁয়াটে আদর্শের কথা বলে তাঁরা বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। মিলন ও সমন্বয়ের জায়গায় দানা বাঁধতে শুরু করলো বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা। আমরা কি বাঙালী, নাকি মুসলমান, কিম্বা বাঙালী মুসলমান? এবং যদি বাঙালী মুসলমান হই, তবে কি আগে বাঙালী ও মুসলমান, নাকি আগে মুসলমান ও পরে বাঙালী? এই জাতীয় কৃত্রিম বৈপরীত্য ও বিরোধের অবতারণা করে, কৃত্রিম অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তুলে মিথ্যা আত্মাভিমানী, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ, বাঙালী সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও অখণ্ড এযাবৎকাল প্রবহমান স্রোতধারাকে আবিল ও খণ্ডিত করে তুললো। অবশ্য বাংলার গ্রামজীবনের গভীরে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতামুখী নাগরিক তৎপরতাকে উপেক্ষা করে তখনো

একধরণের ঐক্যস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছিলো। সমন্বিত বাঙালী সংস্কৃতির সেই রূপ আমরা ঘুরেফিরে বারবার প্রত্যক্ষ করি লালন-সহ বহু বাউল সাধকের গানে। তাছাড়া কোনো কোনো নগরকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বও এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। শিল্প-সাহিত্যের ভুবনে এপ্রসঙ্গে সহজেই কাজী নজরুল ইসলামের নাম মনে পড়ে। তাঁর অজস্র গানে ও কবিতায় আচার-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ বিভেদসৃষ্টিকারী ধর্মের প্রসঙ্গ অনায়াসে উপেক্ষিত ও অতিক্রান্ত হয়েছে। তার জায়গায় সেখানে ফুটে উঠেছে একটা সুস্থ সুসমন্বিত নির্ভেজাল বাঙালী সংস্কৃতির উজ্জ্বল ছবি। ঢাকাকেন্দ্রিক বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হলেও এখানে আরেকটি ধারার উল্লেখও অসঙ্গত হবে না। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ঢেউ একসময় বাংলাদেশেও এসে পৌছায় এবং সেই বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে, বিশেষভাবে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সম্বলিত একটা নতুন ধারাও যুক্ত হয়েছিলো।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে রচিত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রসার, তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও ঔদার্যের অভাবজনিত ব্যর্থতা, বিপুল নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর সাময়িক অন্ধ ভাবাবেগ, সুবিধাবাদী শ্রেণীর ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি এবং ইংরেজের কূট রাজনীতির ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হল। বাংলাদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়ে তার এক অংশ পরিণত হল ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিম বাংলায়, অন্য অংশ পাকিস্তানের পূর্ব শাখা পূর্ব বাংলায়, তথা পূর্ব পাকিস্তানে। রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাঙালী বিভক্ত হয়ে গেল, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিভাজন এত সহজ সূত্র ধরে ঘটে না, তার একটা নিজস্ব লজিক আছে। কিন্তু পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী শাসকবর্গ সে সত্য মানতে চান নি। তারা শোষণের স্বার্থে পশ্চিম বাংলার বাঙালী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য স্থায়ী পার্থক্য গড়ে তুলতে চান। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে তাঁরা নানাভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেন। হিন্দু দেবদেবীদের কথা বলা হয়েছে, হিন্দু সমাজের চিত্র পরিবেশিত হয়েছে, এই জাতীয় নানা হাস্যকর কুযুক্তির অবতারণা করে তাঁরা বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের অবমূল্যায়ণে ব্রতী হন। এমন কথাও বলা হল যে রবীন্দ্রনাথকে খুব বড় করে দেখা ঠিক হবে না, বস্তুতপক্ষে তিনি আমাদের কবি নন, তাঁকে প্রয়োজন-

বোধে বর্জন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হল নজরুলকে। মহান, মানবতাবাদী, বিদ্রোহী, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাত-অসাম্প্রদায়িক, বাঙালীর সুস্থ জীবনবাদী সমন্বিত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম ধারক নজরুলকে তুলে ধরা হল একান্ত খণ্ডিত রূপে, শুধু মুসলমান কবি রূপে। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বাঙালী সংস্কৃতিসেবীও হয় ভ্রান্তি, নয়তো অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, কিম্বা নেহাৎই আত্মস্বার্থবুদ্ধির কারণে উক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। সেদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়ায় সম্বিত হারিয়ে তাঁরা নজরুলের কবিতা ও গানের সর্বজনপরিচিত পংক্তিমালা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসেন। এর ফলে কবির বিখ্যাত গান "চল্ চল্ চল্"-এর "নব নবীনের গাহিয়া গান / সজীব করিব মহাশ্মশান" হল "নব নবীনের গাহিয়া গান / সজীব করিব গোরস্থান"। তাঁর অনবদ্য শিশুতোষ কবিতা "ভোর হল দোর খোল"-র "জয় গানে ভগবানে তুষি বর মাগো রে" হল "জয় গানে রহমানে তুষি বর মাগো রে"। এসব উদ্যোগ যে কিরকম নির্বোধ, অবিবেচনাপ্রসূত ও হঠকারী ছিলো তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো দুএকটি তথ্যের উল্লেখ করছি। ১৯৪৯ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির সংস্কার সাবকমিটির পরামর্শ অনুযায়ী "আমি তোমায় জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না" বাক্যটি কোনো মুসলমানের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ কোনো মুসলমান জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে না। মুসলমান প্রেমিক-প্রেমিকা বড় জোর এই বলতে পারে যে "আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না"। সেই সময় আমাদের জনৈক কবি পরামর্শ দেন যে আমাদের উচিত হবে দাতা কর্ণের বদলে দাতা হাতেম লেখা, বিদ্যাদিগ্‌গজের বদলে এলেমের জাহাজ, অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের বদলে অনেক পীরে মোজেজা নষ্ট, বাঘের মাসীর বদলে বাঘের খালা ইত্যাদি বলা। একজন শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক ও ব্যঙ্গরচয়িতা পূর্বপাকিস্তানী বাংলার আঞ্চলিকীকরণের স্বপক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী "অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকে গণসাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলিকাতার কথ্যভাষাকে সাহিত্যের সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথ্যভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষায় মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই; তাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গোড়াতে কলিকাতারও ছিলো না…পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলার

আঞ্চলিক ডায়ালেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়ালেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইয়াছিল, আমাদের বিক্রমপুরী ডায়ালেক্ট তেমনি ঢাকাইয়া বাংলার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।" পাকিস্তানী শাসনের এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইউব খান আরো সাংঘাতিক বৈপ্লবিক (?) পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। বাংলা ও উর্দু মিলেজুলে একটা নতুন পাকিস্তানী ভাষা তৈরী করার চেষ্টার কথা বলেছিলেন তিনি। তাছাড়াও পাকিস্তানী স্বৈরাচারী দুঃশাসনের আমলে বাংলা বর্ণমালা, বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতির সংস্কার, বাংলাভাষা সরলীকরণ, রোমান হরফে বাংলা লেখা প্রবর্তন প্রভৃতি উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষাকে, এবং সেই সূত্রে বাংলা সাহিত্যকে, দুর্বল ও বিকৃত করে বাঙালী সংস্কৃতিকে পঙ্গু ও খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিলো। কিন্তু ওইসব প্রয়াস সফল হয় নি। প্রতিক্রিয়া বিরোধী শক্তিসমূহ প্রথম থেকেই এসব উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এপ্রসঙ্গে বাংলাভাষা আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ১৯৫২ সালের গৌরবদীপ্ত ভাষা আন্দোলনের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমরা কেউ কেউ সম্ভবতঃ মনে রাখি না যে ১৯৪৭-এর শেষভাগে ও ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে পূর্বপাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই যখন বাংলাভাষা তথা বাঙালী সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয় তখনই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালের শুরুতে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে মিঃ জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সদম্ভ উক্তি ও তার বিরুদ্ধে কতিপয় শ্রোতার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন, তারও কিছু দিন আগে মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে ঢাকা জিলাবোর্ড হলে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সংগ্রামী প্রতিবাদী সভা, এবং ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাভাষা আন্দোলনে গণ-হরতাল প্রভৃতির কথা অবশ্য স্মরণীয়। এই সব আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী। বাঙালীর আত্মপরিচয় সংহতিকরণে, তার সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে, এর ভূমিকা অপরিসীম। অবশ্য ১৯৫২-এর পরেও বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়া ঔপনিবেশিক শাসক-শোষকদের চক্রান্ত থেমে যায়নি। কিন্তু আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বিকশিত হবার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত প্রতিরোধ করে দেশের সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কার্যাবলী। এরাই বাঙালী সংস্কৃতির উপর

চরম বিধ্বংসী কুঠারাঘাত হানতে দেয় নি। এদের জন্যই বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আরবী বা রোমান হরফ চালু হয় নি, বাতিল হবার পরিবর্তে স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসনামলেই সারা বাংলাদেশে পরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি পায়, এবং সামগ্রিক ভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার পরিবর্তে একটা উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, জীবনধর্মী, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশ লাভ করে। ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ সেদিন মেয়েদের টিপ পরা, উৎসব অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, ঋতুভিত্তিক বসন্তউৎসব কি বর্ষাবরণের আয়োজন করা সহ বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন সহজ স্বাভাবিক প্রকাশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। শোষণবাদী শক্তি নিজেদের শোষণকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই ধর্মের অপব্যাখ্যা করে সংস্কৃতির প্রশ্নে সুপরিকল্পিত ভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছিলো সেদিন। কিন্তু সে প্রয়াস সফল হয় নি। বাঙালী সংস্কৃতির দীপ্র চেতনাকে আশ্রয় করে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকশিত হল। এবং তারপর ধাপে ধাপে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ওই প্রগতিশীল ধারাসমূহ আরো উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠল। "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর", "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা", "জয় বাংলা" প্রভৃতি শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শুধু বাঙালীর জাতীয়তাবাদী চেতনাই নয়, বাঙালীর সংস্কৃতির একটি সংগ্রামী চারিত্র্যও তার যৌথ অবচেতনে দানা বেঁধে উঠেছিলো। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে এরই প্রতীকী প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি কতিপয় ক্ষেত্রে। আমাদের জাতীয় ফুল হল শাপলা, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের গান "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি", টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক স্বরমূর্চ্ছনা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান "ধন ধান্য পুষ্পভরা"-র সুর, সামরিক কুচকাওয়াজের গান নজরুলের "চল চল চল"।

কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। বস্তুতঃপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের পর চার বছর পূর্ণ হবার আগেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ নিজেদের নতুন করে সংহত করে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যোগসাজসে বাঙালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বাংলা ভাষা

ও সাহিত্য এবং সেই সূত্রে বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ থেকেই আমাদের সুস্থ জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। পরে এরই পর্যায়ক্রমিক বিকাশ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করে এবং অনিবার্য ক'রে তোলে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু বিগত এক যুগাধিক কাল ধরে যেসব শক্তি এক সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলো, যারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি বাঙালী সংস্কৃতিকে কখনো অন্তর থেকে স্বীকার করে নি, সেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ একদা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত বিষয়গুলিকে নতুন বিতর্কের বস্তু ক'রে নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবনে সর্বধ্বংসী বিরোধের বীজ বপন করে চলেছে। এরাই এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আবার প্রশ্ন তুলছে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নতুন করে অপপ্রচার চালাচ্ছে, নজরুলকে আবার উপস্থিত করছে খণ্ডিত রূপে। এদেরই উদ্যোগে আমরা প্রায় চেতনাহীন, জড়বুদ্ধি, অসুস্থ, প্রতিবাদে-অক্ষম, এক কালের মহাবিদ্রোহী নজরুলকে তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে দেখলাম কিস্তি টুপী মাথায় দিয়ে সরকারীভাবে সংবর্ধিত হতে। কাজী নজরুল ইসলাম মাঝে মাঝে মাথায় টুপী পরতেন বৈকি, বিশেষ করে সভা সমিতি বা অনুষ্ঠানে, কিন্তু সে টুপী ছিলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামী ঐতিহ্য ঘেঁষা নেতাজী সুভাষ বসুর ধাঁচের টুপী, কদাপি আমাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গমাখা কিস্তি টুপী নয়। এমনিতে এগুলি তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ যখন সুপরিকল্পিত ভাবে এই সব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় তখন আর তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যায় না।

বাঙালী সংস্কৃতির প্রশ্নে, তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে, সাধারণ সরল দেশবাসীর মনে নানা কূটচালের মাধ্যমে দ্বিধা ও সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারলেই যে প্রতিক্রিয়ার চক্রের স্বার্থ অনেকখানি রক্ষিত হবে এটা তারা ঠিকই বোঝে। সেই উদ্দেশ্যেই তাদের কোনো কোনো মহল ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শহীদ দিবস পালন করে না, আয়োজন করে বাংলা ভাষা দিবসের। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের অপরাধে (?) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কতিপয় ছাত্রকে বহিষ্কার করার ঘটনার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। ওই একই উদ্দেশ্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাঙালী বনাম বাংলাদেশীর এক অনাবশ্যক অর্থহীন বিতর্কের ধূম্রজাল।

অথচ বিষয়টির মধ্যে বিতর্কের কিছু নেই। এক দিক থেকে প্রশ্নটি খুব নতুনও নয়। এক সময় পশ্চাদমুখী রক্ষণশীল ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়ার চক্র 'আমরা বাঙালী না মুসলমান' এই প্রশ্নকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেছিলো। কিন্তু তারপর বাঙালী মুসলমান ঘরে ফিরতে শুরু করে, সংস্কৃতি সম্পর্কে তার চিন্তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, আত্মপরিচয় সম্পর্কে তার চিত্তের অনেক দ্বন্দ কেটে যায়। বিশেষভাবে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, তার পরবর্তী পর্যায়ের স্বৈরাচারবিরোধী বিভিন্ন গণআন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা দৃঢ় হয়ে ওঠে, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে এবং তারা উপলব্ধি করে যে তারা একাধারে বাঙালী ও মুসলমান, এবং এর মধ্যে কোন কণ্ট্রাডিকশন নেই। আজ বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক রূপে তারা নিজেদের পরিচয় দিতে পারে একই সঙ্গে বাঙালী, মুসলমান ও বাংলাদেশীরূপে।

বাংলাদেশীরূপে আজ আমাদের দেশের একজন মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে একটা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে একটি জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে। তার সে-পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে তার পাসপোর্টে, যা অন্য যে কোনো দেশের নাগরিক থেকে সবার সামনে তার একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট পরিচয় দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরে। মুসলমান হিসাবে সে নিজেকে আবিষ্কার করে একটা ধর্মীয় বৃত্তের মধ্যে, যা একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্তর্গত, এবং যা তাকে বিশ্বের সকল ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে একটা আত্মিক মেলবন্ধনে বেঁধে দেয়। আর বাঙালী রূপে সে নিজেকে আবিষ্কার করে একটা গৌরবদীপ্ত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকারী হিসাবে, যেখানে কোনো ভৌগোলিক গণ্ডী বা ধর্মীয় বৃত্ত মুখ্য নয়, বরং নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক বিবেচনাই বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। বিশ্বের মানুষের এই জাতীয় একাধিক পরিচয়ের বিষয়টি নতুন কিছু নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিচয় একই সঙ্গে পাঞ্জাবী ও ভারতীয়, তামিল ও ভারতীয়, গুজরাটী ও ভারতীয়, বিহারী বা ওড়িয়া ও ভারতীয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিচয়ও তেমনি একই সঙ্গে পাঞ্জাবী ও পাকিস্তানী, বালুচ ও পাকিস্তানী, পাঠান ও পাকিস্তানী ইত্যাদি। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির মানুষের একটা পরিচয় হচ্ছে যে তারা সবাই আরব। সেখানে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের পরিচিতির

মুখ্য উপাদান। অন্য পরিচয়ে তারা কেউ কুয়েতী, কেউ জর্দনীয়, কেউ সৌদী, কেউ বা অন্য কিছু। পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী উভয় রাষ্ট্রের মানুষের একটা পরিচয় এই যে তারা সকলেই জার্মান। এই পরিচয়ে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি যে জার্মান মানস গড়ে তুলেছে তার উপরই প্রধান ঝোঁক ন্যস্ত। তাদের অন্য পরিচয়ে, রাজনৈতিক পরিচয়ে, তারা কেউ জি. ডি. আর-এর নাগরিক, কেউ এফ. আর. জি.-র নাগরিক। সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে দুটি ভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাদের নাগরিক সত্তার ভিন্নতাটুকু। দুটি সত্তাই যথার্থ ও দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। কোন সত্তাটি কখন প্রধান হয়ে উঠবে তা নির্ভর করবে স্থান কাল পরিবেশ পরিস্থিতি তথা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের উপর। আজ কোনো কোনো মহল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিতর্ক তুলে আমাদের বাঙালী মানস ও সংস্কৃতি তথা আমাদের বাঙালী পরিচয়কে অবমূল্যায়িত করে এক অহেতুক ও চরম ক্ষতিকর সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে। এর সুযোগ নিয়েই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিগুলি আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ম্লান ও ধূসর হয়ে তার জায়গায় ধর্মান্ধতার কালো মেঘ সুস্থ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে বসেছে, আমাদের আত্ম-পরিচয়কে ঘোলাটে ক'রে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে সঙ্কীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী নতুন প্রতিক্রিয়াশীলতার জাল বিস্তৃত হচ্ছে। শুধু নিজেদের নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করতে চাইলেই আমরা এই সত্য বিস্মৃত হতে পারি যে উগ্র জাতীয়তাবাদই হচ্ছে ফ্যাসীবাদের সূতিকাগার।

আমরা অবশ্যই বাংলাদেশী। এতো তর্কাতীত স্বতঃসিদ্ধ। আমরা বাঙালীও। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলার লোকও বাঙালী। অবশ্যই তারা ভারতবর্ষের বাঙালী, আমরা বাংলাদেশের বাঙালী। মনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আমাদের উভয়ের অতীতের যৌথ সংস্কৃতি ও সভ্যতা। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি উভয়ের ক্ষেত্রে এমন একটা বাঙালী মানস গড়ে তুলেছে যেখানে সহমর্মিতার স্বরূপ প্রকট। আবার এটাও সত্য যে উভয়ের মধ্যে একটি স্তরে পার্থক্যও রয়েছে। পশ্চিম বাংলার মানুষের বাঙালীত্বের উপর ক্রমাগত একটা অখণ্ড সর্বভারতীয়ত্বের অভিঘাত পড়ছে। তাদের বাঙালীত্বের চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে রয়েছে ভারতীয়ত্বের চেতনা; যা আমাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। নিকট অতীত ও বর্তমানের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আর্থ-সামাজিক একান্ত বাস্তব পরিবেশ দু'অঞ্চলের বাঙালীর সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারায় ভবিষ্যতে

একটা স্বল্প স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলবে। '৫২-র ভাষা আন্দোলন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আর তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতি আমাদের দেশের মানুষের চেতন-অবচেতন মনে এই স্বতন্ত্র বিকাশ ধারার অন্যতম নিয়ামক শক্তি রূপে কাজ করবে। একই সঙ্গে বহুক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ও ঘটতে থাকবে, সাংস্কৃতিক ঐক্যও দৃঢ়তর হবে। কিন্তু এসব ঘটতে দিতে হবে সহজ বিকাশের পথ ধরে, নির্বাচন-গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয়ের স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, কূপমণ্ডুকতা, সঙ্কীর্ণ বর্জননীতি, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক ফরমান উপরোক্ত বিকাশধারাকে ত্বরান্বিত ও মসৃণ না ক'রে তাকে বিভ্রান্ত, বিকৃত ও পঙ্গু করবে। আমরা আমাদের বাঙালীত্বকে আশ্রয় করেই আমাদের বাংলাদেশীয়ত্বকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারবো। ওই পথেই আমাদের আত্মপরিচয় লাভের প্রয়াস পূর্ণতা পাবে। একাজে আমাদের বাঙালী সংস্কৃতিই হবে অন্যতম আলোকবর্তিকা, কোনো গতানুগতিক ধর্মীয় চেতনা নয়। আমরা বাঙালী আজ যদি একথা বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি তবে হয়তো আগামী কোনো এক দিন আমরা বাংলাদেশী এ কথা বলবার অধিকারও আমরা হারাবো।

উত্তরবাংলার লোকসমাজ ঃ 'দেশী-পলি ক্ষত্রী'

শিশির মজুমদার

ভৌগোলিক প্রতিমা

১

উত্তরবঙ্গ বঙ্গপ্রদেশের একটি অঙ্গ হয়েও তার ভৌগলিক প্রতিমাটি বিশিষ্ট ও অনন্যপরতন্ত্র। 'উত্তরবঙ্গ' নামে কোন শাসনতান্ত্রিক বিভাগ কখনো চালু ছিল বলে জানা যায় না। আর আজও যে নেই তা বলাইবাহুল্য। তবে, প্রাচীন যুগের একটি শিলালিপিতে 'অনুত্তরবঙ্গ'[১] কথাটি পাওয়া যায়, তাতে দক্ষিণবঙ্গকেই বোঝান হয়েছে। তাই অনুমান করা চলে প্রাচীনকালে 'উত্তরবঙ্গ' কথাটি প্রচলিত ছিল। যদিও এ সম্পর্কিত কোন ঐতিহাসিক দলিল অনাবিষ্কৃত। দেশবিভাগের আগে সরকারীভাবে পরিচিত রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং—এই মোট আটটি জেলা। এর প্রথম ছয়টি জেলার অধিকাংশ নিয়ে ছিল প্রাচীনকালের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। বর্তমানের দার্জিলিং জেলা ছিল সিকিমের অংশ। এবং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার ছিল প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষভুক্তির অন্তর্গত। তখন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি বা কামরূপ রাজ্যের মধ্যে সীমা নির্দেশক ছিল করতোয়া নদী।

কোচবিহার ব্রিটিশভারতে তো বটেই স্বাধীনভারতের গোড়ায় ছিল করদ রাজ্য। বলাবাহুল্য, এখন তা জলপাইগুড়ি বিভাগের একটি জেলা। পশ্চিমবাংলার উত্তরাঞ্চল বোঝাতে যে উত্তরবঙ্গ তা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের কিয়দংশ বিশেষ এবং মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার—এই জেলা পঞ্চকের সমষ্টি। এখন এর আয়তন ২২,০২৫'০ বর্গ কি. মিটার এবং নির্দিষ্ট সীমা হলো উত্তরে, সিকিম, ভুটান, উত্তর পশ্চিমে নেপাল ও উত্তরপূর্বে আসাম। পূর্বে দিনাজপুর (বাংলাদেশ), পূর্ব দক্ষিণে বগুড়া, রাজশাহী (বাংলাদেশ), দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিমে বিহার।

কিন্তু উত্তরবাংলার লোকভাবনায় এই সীমা এমন সুনির্দিষ্ট নয়। সেখানে

দিক বর্ণনায় পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন, উত্তরে কালী মা, দক্ষিণে গঙ্গা আর পশ্চিমে পীর পয়গম্বর। আকাশে চন্দ্র সূর্য, মাটিতে মাতা বসুমতী। কোথাও স্বর্গে রামচন্দ্র, পাতালে বাসুকী নাগ।

এই অঞ্চলের নদ-নদী ভূ-প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র। আসামের বনভূমি দক্ষিণাভিমুখী হয়ে ক্রমশঃ তৃণভূমিতে পরিণত। ভূমিকম্প, বন্যায় নদী তার খাত বদল করেছে বহু বার। "১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে ত্রিস্রোতার মূল নদী পূর্বখাত পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে বর্তমান তিস্তা নদীর সৃষ্টি হয় এবং করতোয়া, পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ওঠে। প্রাচীন কৌশিকী (বর্তমান কুশী) নদী এককালে সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হইত। ক্রমে পশ্চিমে সরিতে সরিতে উহা এখন বাংলাদেশের বাহিরে পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া রাজমহলের উপর গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।"[২]

নদীখাত বদলের ফলে শস্য শ্যামলা অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হয়ে অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তখন জনপদ জঙ্গলে পরিণত হয়।

নদী বন্দনা ঋগ্বেদেও[৩] আছে। আছে লোকজীবনে। নদী পথই ছিল মানুষের আদিপথ। আজও এই পথ বড় মূল্যবান। আদিতে হয়তো এই পথেই বা এই পথের রেখা ধরে মানুষ পাহাড় থেকে সমতলে নেমেছে, সমতল থেকে পাহাড়ে উঠেছে। এই নদীপথের ধারেই মানুষের বসতি।

উত্তরবঙ্গের লোকভাবনায় তিস্তার স্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিস্তা এখানে সার্বজনীন দেবী রূপে পূজিতা। এমন স্থান এই অঞ্চলে আর কোন নদীর নেই।

১লা বৈশাখের সন্ধ্যায়, 'ঘাটো-ব্রত'র সমাপ্তিতে মহানন্দা নদীতে গিয়ে তিস্তাবুড়ির বন্দনা করেন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাঁশবাড়ি গ্রামের মেয়েরা। প্রবল ঝড় কিংবা অতিবর্ষণে পশ্চিমে দিনাজপুর জেলার দেশী-পলি রাজবংশী সম্প্রদায় তিস্তাবুড়ির দোহাই দিয়ে থাকেন। বুড়ি-পূজা বুড়ির থান দেশী-পলি-রাজবংশীদের পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে। বিবাহ ইত্যাদি সমস্ত শুভকর্মে বুড়ি অবশ্য পূজ্যা। চৈত্রসংক্রান্তিতে গমীরা নৃত্যে বুড়ি থাকবেনই। বহু নামা কালীর একটি বুড়ি কালী। বলাবাহুল্য, এই বুড়ি আর তিস্তা মাঈ এক ও অভিন্ন। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থাদিতে এবং প্রতিবেদনে তিস্তা যে সমস্ত রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে পরমারাধ্যা দেবী তা উল্লেখিত। এই

কারণে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার এক প্রবীণ সর্বোদয়ী আমাকে বলেছিলেন 'উত্তরবঙ্গের নাম তিস্তাবঙ্গ' বলা যেতে পারে।

এই অঞ্চলের দেশী-পলি ও রাজবংশীদের গানে তিস্তা হয়েছে 'চিতথা'। মহানন্দা 'মাহান্দী'।[৪] জলপাইগুড়ি অঞ্চলে রাজবংশীদের গানে তিস্তা-করতোয়ার মতো নদীর পাশে ছোট ছোট নদীর কথা যেমন বলা হয়েছে,[৫] পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দেশী-পলিদের গানে মহানন্দা-টাঙ্গন এর মতো নদীর কথা তেমন উচ্চারিত নয়। বরং ছোট ছোট নদীর কথাই বেশী।[৬] আসলে, ছোট ছোট নদীর সঙ্গে দেশী-পলিদের অধিক ঘনিষ্টতা। যেহেতু এইসব নদীই এখন-দেশী ও পলিদের প্রতিবেশী।

পশ্চিম দিন্যজপুরে দেখেছি, দেশী ও পলিরা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় জমিকে চিহ্নিত করেছেন নানা নামে। প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর জমি পাই। (১) দলা বা দহলা, (২) ডাঙ্গা, (৩) খিয়ার। দলা বা দহলা জমি আবার দুই ভাগে বিভক্ত : (১) কান্দাল বা কান্দর (২) বিল।

নীচু জমি হ'ল দহলা বা দলা। এখানে জল বেশী জমে থাকে। মাটি খুব নরম 'দল দল'। এই দলা জমি একসঙ্গে খুব বড় হলে বিল, ছোট হলে কান্দর বা কান্দাল। খিয়ার অঞ্চল পলি মাটিতে ভরপুর। খুব উর্বরা। ধান্য উৎপাদিকা শক্তি তার বেশী। ডাঙ্গাবাড়ি হ'ল উঁচু জমি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় কালিয়াগঞ্জ, কুশমণ্ডী, বংশীহারী থানা এলাকায় এই ডাঙ্গা জমিতে প্রচুর পরিমাণে লংকা উৎপাদিত হয়। তাই, এইসব অঞ্চলে বসবাসকারী দেশী ও পলিরা বছরে দুটো প্রধান ফসল পান।

উত্তরবঙ্গের বিশেষতঃ পশ্চিম দিনাজপুরের আবহাওয়া ও অন্যান্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিচয় রয়েছে নানা গ্রন্থে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গেজেটিয়ার : ১৯৬৫, ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মার্টিন : ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন।[৭] এখানে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অত্যাবশ্যক নয়। তবে, প্রসঙ্গত ফাল্গুন চৈত্র মাসের পচিয়া বাও-এর কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। এই 'পচিয়া বাও' বা পশ্চিমা বাতাস রৌদ্রালোকিত জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যায় ঝড়ের বেগে। এই বাতাসের মধ্যে 'পলি বা দেশী' চাষী 'পাথারে' চাষ করতে করতে সৃষ্টি করেন 'বন্ধুয়ালা' গান যার অনেক পংক্তি শুনতে পাই 'খন' নামক লোকনাট্যে।

জল ও মাটি

২

সন্দেহ নেই উত্তরবঙ্গ এক প্রাচীন জনপদ। এই জনপদে নানা জনগোষ্ঠি বহু গিরিপর্বত ডিঙিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু 'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা'।[১]

এই বিবিধ বিচিত্র জনগোষ্ঠির নামগুলি হ'ল: কড়ি, কামার, কাশ, কালোয়ার, কায়স্থ, কাহার, কজুরী (মুসলমান), কুমার, কুর্মী, কুড়ি, কৈবরী, কোচ, কোল, কোল কামার, কোড়া, ক্ষত্রিয়, খয়রা, খারওয়াচ, খারিয়া, খালাহা, খৃষ্টান, খ্যোন, গণেশ (কুম্ভকার), গন্ধবণিক, গড়েরী, গুড়ি (মেচ), গুড়ি, গোণ্ড, গোয়ালা, ঘাটোয়াল, ঘাসি, চামার, চাঁই, চাইয়ওল, ছত্রী, ছুতার, জেলে, জৈন, জোলা, টেকুরা, ডোম, ঢুলী, তাঁতি, তিওর, তিরবুতী, তিলি, দেশী, দোসাদ, ধানক, ধানার, ধুপী, নমঃশূদ্র, নাগর, নাথযোগী, নাপিত, পুনিয়া, পুলিয়া, পশ্চিমাছত্রী, পশ্চিমা বৈশ্য, পাটনী, পলি, পাহান, পাহাড়িয়াপোদ্দার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বরাইক, বাগ্দী, বৈশ্য, বৈশ্যবণিক, বৈশ্য সাহা, বৈষ্ণব, বোরো, বৌদ্ধ, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, ব্যাধ, মদেশিয়া, ময়রা, মহলী, মাণ্ডয়ারী, মাল, মালপাহাড়ী, মালাকার, মালুহা, মালী, মালো, মাহলী, মাহাতো, মাহিষ্য, মাড়োয়ারী, মুচি, মুণ্ডা, মুরারী, রবিদাস, রাজবংশী, রাজা, রায়ছত্রী, রুইদাস, লাহেরী, লেপচা, লোহার, শংকরদাস, শুদ্ধক্ষত্রিয়, শুঁড়ি, শুদ্র, শেরপা, সদগোপ, সন্ন্যাস, সাহা, সাঁওতাল, সুবর্ণবণিক, শেরশা, বারিয়া, স্বর্ণকার, হরিজন, হাজরা, হাজারী, হাঁড়ি, হিন্দু এবং হো।[২]

বিগত দুই দশক ধরে ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতা এবং নানা গ্রন্থ থেকে জেনেছি রাজবংশী, দেশী, পলিগণই এই অঞ্চলের আদি ও আহেল বাসিন্দা। রাজবংশীগণ উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও রাজবংশী উপসম্প্রদায় পলি ও দেশী সম্প্রদায় পশ্চিম দিনাজপুর এবং প্রান্তমালদহ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দেশী, পলি, রাজবংশীদের সমাজজীবন সম্পর্কে যাঁরা বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল নন, (যাদের দেশী, পলি রাজবংশীরা 'ভাটিয়া' বলেন অর্থাৎ যারা নিম্নবঙ্গ থেকে আগত) তাঁরা এঁদের সমআকৃতি, পোশাকপরিচ্ছদ দেখে রাজবংশী নামে চিহ্নিত করেন। অথচ, আমি জানি, সরেজমিনে ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতায় জানি, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বহু বৃদ্ধ পলি বা দেশী

নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দিতে নারাজ। দেশী ও পলিদের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু দেশীদের তুলনায় 'পলিয়া' নামটি এত পরিচিত যে দেশীদেরও এই নিম্নবঙ্গ থেকে আগত মানুষরা পলিয়া সম আকৃতি এবং পোশাক পরিচ্ছদ দেখে ভুল করে পলিয়া বলে চিহ্নিত করেন।[10] অথচ দেশীদের দাবী তাঁরাই এই অঞ্চলের একমাত্র 'আহেল' বাসিন্দা তাই তাঁরা দেশী। পলিয়ারা অনেক পরে এসেছেন। তাঁদের ভাষা, রীতি নীতি ভিন্ন। তাঁদের সঙ্গে পলিদের সামাজিক জলচল নেই। তাঁরা নিজেদের পলিদের তুলনায় উচ্চতর শ্রেণী বলেও দাবী করেন। সুতরাং দেশীদের কেউ পলিয়া বলে উল্লেখ করলে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। পলিরাও স্বীকার করেন 'দেশী' ভিন্ন সম্প্রদায়। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিবাহ সম্বন্ধ হয় না। প্রায় সমস্ত দেশী ও পলি উভয় সম্প্রদায়ই একটি প্রবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল —'দেশীয়া ফ্যাসফেসিয়া পলিয়া সলসলিয়া।' এছাড়া এই অঞ্চলের একটি লোকগানে[11] পলিয়া ও দেশীয়া দুই ভিন্ন সম্প্রদায় বলে উল্লেখিত।

লক্ষণীয় যে এই পলিয়া ও দেশীয়া উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার বা দার্জিলিঙ-এর তরাই অঞ্চলে দুর্লক্ষ্য। এর কারণ অনুসন্ধান আমাদের বিবেচ্য নয়, তবে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও প্রাচীন ইতিহাসের দিক থেকে জলপাইগুড়ি কোচবিহার তরাই অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম দিনাজপুর মালদার (বিশেষতঃ মহানন্দার উত্তর পাড় পর্যন্ত) ভিন্নতা রয়েছে।

জাতীয় সড়ক ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে মহানন্দা পার হলে দুপাশে ঘরবাড়ি গ্রাম নজরে কম আসে। চষা জমি, শস্যক্ষেত্র মাইলের পর মাইল। রাজবংশী, দেশী ও পলিদের গ্রামগুলো প্রধান সড়ক থেকে অনেক দূরে। এ শুধু জাতীয় সড়কের কথাই নয়।

এই অঞ্চলের যে কোন প্রধান সড়ক থেকে দূরে দূরে তাঁদের বসতি। ফলে, তাঁরা প্রায়ই অগোচরে থেকে যান। হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান-মোগল ইংরেজ কত শক্তি এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেছে কিন্তু দেশী পলিয়ারা সেই ধুলোয় পুরোপুরি ধূসরিত হননি বলেই আজও তাঁদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই।

পৌণ্ড্রবর্ধন তো এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম। মৌর্য যুগ থেকে হিন্দু আমলের শেষ পর্য্যন্ত পুণ্ড্রনগর বিশেষ মর্যাদার আসনে স্থিত ছিল। যে অঞ্চলে কোটিবর্ষ বা বাণগড়, পঞ্চনগরী, সোমপুর, জয়স্কন্ধাবার, রামবতীর মতো নগর গড়ে ওঠে, সেই অঞ্চলের উচ্চকোটি সংস্কৃতি কি বিপুল সমৃদ্ধিশালী

ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই উচ্চকোটি সংস্কৃতির আবহমণ্ডলে ছোট ছোট টোলায় বসবাস করছেন দেশী ও পলি বা রাজবংশী। তাই, এই অঞ্চলের গ্রামের নামগুলো জলপাইগুড়ি কোচবিহার এর মতো নয়। এগুলি মিশ্র সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

দেবীকোট, উমাবন, শোণিতপুর, বৈগ্রাম, বাণগড়, তপন, আমাতি (রামাবতী), মনহলি, মদনাবতী, বৈরহাটা, মহেন্দ্র, ভদ্রশীলা, ভগতগাঁ, সিন্দুর মুছি, খুনিয়াভাঙ্গি, উষাহরণ, গাড়ুয়া, গণেশপুর, করণদিঘি, পাঁচভায়া, ভীমভার, রুয়ানগর, মোহনবাটি, রাইগঞ্জ, আমিনপুর, পতিরাজপুর, মহারাজপুর প্রভৃতি।

হার-যুক্ত গ্রামের নামও অসংখ্য। যেমন: ইটাহার, রূপাহার, টিকুহার, বরমাহার, মোল্লাহার, ভবুরাহার, কিটাহার, বীরাহার, ককাহার, বগুলাহার, তেজীহার, তিলছাহার, মান্দাহার, বেতাহার, আমলাহার, জটাহার, গোরাহার, ধুনাহার, বিশাহার, বলিহারা, পাতনাহারা, ভিকাহার, বামনাহার, যশাহার।

তারা-আইল, বাড়ি পাড়া যুক্ত গ্রামের নাম গুলো এই রকম: নাহুতারা, লখনতারা, বাহারাইল, চান্দাইল, ধন্দাইল, নাচ্চাইল, মাগুাইল, আম্রাইল, বাদামাইল, খামরাইল, করঞ্জাবাড়ি, বাঙ্গালবাড়ি (বাঙ্গাহবাড়ি), কনারবাড়ি, বরাইবাড়ি, কোচপাড়া, পাইকপাড়া, মোল্লাপাড়া, পাঠানপাড়া, ওড়িয়াপাড়া, কর্মপাড়া ইত্যাদি।[১২]

নদীর নামগুলোও বিচিত্র: টাঙ্গন, বালিয়া, শ্রীমতী (ছিরামতী), পুনরভবা, আত্রাই (আত্রেয়ী), কুলিক, গান্ধার, গামারী, ইছামতী, যমুনা, নাগর, সুই, মহানন্দা প্রভৃতি।

দিঘির নামগুলো এই রকম: মহীপালদিঘি, কালদিঘি, ধনদিঘি, আলতাদিঘি।

শুধু তাই নয়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন বৈভব ও ঐশ্বর্যের ধ্বংসস্তূপ। প্রাচীন ইট ও কূপের ভগ্ন চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। কষ্টিপাথরের মূর্তিও প্রায়শ পাওয়া যায় এখানে ওখানে।

'রামচরিতে বরেন্দ্রির গ্রাম বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে, বরেন্দ্রিতে জগদ্দল মহাবিহার, এই দেশেই বোধিসত্ত্ব, লোকেশ ও তারার মন্দির। ইহার স্কন্দনগর এবং বহু মন্দিরশোভিত শোণিতপুর (বাণগড়, কোটিবর্ষ) নগরে

অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস। এই ভূমির দুই প্রান্তে গঙ্গা করতোয়া আর পুনর্ভবার তীরে প্রসিদ্ধ তীর্থঘাট। বরেন্দ্রিতে প্রচুর বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়।[১৩]

ইতিহাসে, গল্পে, মতামতে

৩

ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং পরবর্তীকালে মুসলমান সংস্কৃতি যা কিনা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় শক্তির ছায়ায় পরিবর্ধিত ও লালিত—তার প্রাবল্য সত্বেও রাজবংশী, দেশী পলিজনের সংস্কৃতি হারিয়ে যায় নি। বরং এইসব সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে নিয়েছেন।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে খ্রীষ্টের জন্মের ৭০০ বছর পূর্বে আর্যসংস্কৃতি উত্তর বিহার-মিথিলা-বিদেহের পরে আর এগোতে পারেনি। এই সময়ের আগে থেকে উত্তরবঙ্গ প্রাগার্য শক্তিশালী ইন্দোমোঙ্গলীয় সম্ভবতঃ তিব্বত ব্রহ্মী জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা শাসিত ছিল।[১৪]

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়-এর মতে, 'সপ্তমশতক হইতে নেপাল ও ভোটদেশ বা তিব্বতের সঙ্গে মধ্য ও প্রাচ্য ভারতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং প্রাচীন কিরাত বা বোডো সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাবও অষ্টম শতক হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করে'।[১৫]

অনেকের মতে কিরাত বা বোডো বা, তিব্বতব্রহ্মী জনগোষ্ঠী কোচ-রাজবংশী, পলিয়া দেশীদের পূর্বপুরুষ।[১৬] রাজবংশী জাতির উৎস সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। সেই কাহিনীর একটি প্রধান ধারা অনুযায়ী পলিয়াদের উৎস প্রায় একই রকম। কিন্তু দেশীদের সম্বন্ধে খুব বেশী জানা যায় না। রাজবংশীদের মতো পলিয়ারাও নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন।[১৭] সেই দাবী অনেকেই মেনে নিয়েছেন। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি সমিতিও তৈয়ারি হয়েছে।

পলিয়াদের উদ্ভব সম্বন্ধে দিনাজপুর জেলার একদা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট G. H. Damant, B. C. S., একটি পত্রিকায়[১৮] লিখেছিলেন। এ থেকে দেশীদের সম্বন্ধেও কিছু জানা যায়। রচনাটির প্রারম্ভ এই: The Koch and Palis or Palias as they are indifferently called, are a race of people peculiar to the districts of Dinajpur. Rangpur, Purniya, Koch Behar and Malda ; in the latter district they are never found South of the river Mahananda

which seems to be their limit to the south ; towards the east they are found commonly as far as Gowalpara……They profess to be Hindus, but while they follow the Hindu religion in the main, they also practise some ceremonies borrowed from Musalmans and others, which are apparently remnants of an older superstition. Their own tradition of their origin, as communicated to me by an old Pali of this district.[১৯]

এই অংশটি থেকে পলিদের এলাকা এবং তাঁরা যে হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছেন তদুপরি মুসলমান ও অন্যান্য সমাজের কিছু রীতিনীতি তাঁদের মধ্যেও যে বর্তমান তার কথা জানা যায়। অন্ততঃপক্ষে আমি এই অঞ্চলের বহু মুসলমানের বিবাহরীতি এবং সামাজিক রীতিনীতিতে দেশী-পলি সংস্কৃতির স্পষ্ট চিহ্ন দেখেছি। এ কথাও অনেকে বলেছেন যে এই অঞ্চলের বহু মুসলমান আদিতে দেশী-পলি ছিলেন।[২০]

পলিদের সম্বন্ধে G. H. Damant সংগৃহীত গল্পটি[২১] এই রকম :

বিহারের রাজা জরাসিন্ধু। পলিয়ারা এই বিহার থেকেই আসেন। জরাসিন্ধুর প্রজারা লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করতেন। কেননা, তাদের কোন লোহার অস্ত্র ছিল না। রাজা জরাসিন্ধু নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে মনে করতেন এবং তাঁর প্রজারা ছিলেন তাঁরই বংশ-উদ্ভূত। সুতরাং তাঁরা নিজেদের রাজবংশী বলতেন।

এই রাজ্যেই এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর দুই কুমারী মেয়ে ছিল। বড়টির নাম হিরা ও ছোটটির নাম জিরা। এই মেয়ে দু'টির সঙ্গে ভগবান শিবের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একদিন হিরা শিবের ঔরসে গর্ভবতী হলেন। হিরার বাবা এ খবর জেনে হিরা জিরাকে ভৎর্সনা করলেন। তা সত্ত্বেও হিরা জিরা প্রতিদিন গোপনে শিবের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। একদিন জিরা তাদের বাবার অনুপস্থিতিতে শিবকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। হিরা বললেন, আমি তো তোমার জন্য গর্ভবতী হয়েছি। আমার বাবা এবং তার সমস্ত স্বজাতি আমার প্রতি বিরূপ। সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। শিব বললেন, মা ভৈ। সন্তানের জন্ম হলে খুব গোপনে রাখবে এবং গোপনে পালন করবে। আর তুমি তাকে খগেন্দ্র বলে ডাকবে। আমার কৃপায় সে রাজা হবে এবং তাঁর পরবর্তী ছত্রিশ পুরুষ রাজত্ব করবে।

এই সময়ে হিরা জিরার বাবা লাঠি হাতে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা তিনজনেই খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠি তুলে শিবকে মারতে গেলেন এবং শিব কোন উপায় না দেখে পা তুলে মাটির ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলেন। শিব মাটির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন দেখে সেই বৃদ্ধ লাঠি তুলে শিবকে আঘাত করতে গেলেন কিন্তু ততক্ষণে শিবের পা দুটি ছাড়া ওঁর সমস্ত দেহই মাটির ভেতরে মিলিয়ে গেছে। ফলে লাঠির আঘাত গিয়ে তাঁর পায়ে লাগল। এই ঘটনা থেকে শিব 'জল্পেশ্বরনাথ' নামে পরিচিত ও পূজিত।

এর কিছু পরে হিরা একটি সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করলেন এবং তাঁর বাবা ও আত্মীয়স্বজনের ভয়ে তিনি কুশ ঘাসের একটি সুন্দর বালা যার আরেক নাম কোচ, তৈয়ারী করে তার মধ্যে শিশুটি লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর নাম দিলেন কগেন্দ্র।

যথাসময়ে সেই শিশুটি বিহারের রাজা হল। যদিও রাজা জরাসিন্ধু ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু কগেন্দ্র কোচের মধ্যে পালিত হওয়ায় তাঁর সমস্ত লোকজন কোচ নামেই পরিচিত হল। এবং যেহেতু তাঁর জন্মকালে পঞ্চকর্ম (জাত কর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ এবং অন্নপ্রাশন) করা সম্ভব হয়নি, সেইহেতু কোচরা আজও এই গুলো পালন করেন না।

এর কিছুকাল পরে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম বিহারে আসেন ক্ষত্রিয়শূন্য করতে। রাজা এবং তাঁর রাজবংশীগণ লাঠি হাতে পরশুরামের মোকাবিলা করতে যান। কিন্তু কুঠারহস্ত পরাক্রমশালী পরশুরামকে পর্যুদস্ত করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দেন। তখন কেউ সাঁতরে, কেউ পায়ে হেঁটে তিস্তানদী পার হয়ে তার পশ্চিম তীরে গিয়ে ওঠেন। রাজা নিজেকে কোচ পরিচয় দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সেই ঘটনায় যারা পালিয়ে এসে এই দেশে (দিনাজপুর অঞ্চলে) আত্মরক্ষা করেন তাঁরা পলিয়া বলে পরিচিত হন। যেহেতু পলিয়া ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন, এই কারণেই তাঁরা ভঙ্গক্ষত্রিয়।

কোচজাতীয় কিছু লোক যাঁরা এই যুদ্ধের পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলে বসবাস করছেন তাঁরা 'দেশী' বলে পরিচিত।

এই কাহিনী থেকে কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায়, যদিও 'জরাসিন্ধু' নামটি খুবই বিভ্রান্তিকর :—

(১) কোচ, রাজবংশী, পলি বা পলিয়া ও দেশী মূলে একই গোষ্ঠীসম্ভূত। তা কিরাত বা বোড়ো বা তিব্বতব্রহ্মী যে জনগোষ্ঠী হোক না কেন।[২২]

(২) এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী তিস্তার পূর্বতীরে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস

করতেন। তখন কোচবিহার বা কামতাপুর রাজ্যের এলাকা ছিল অনেক বড়ো।

(৩) তিস্তানদীর পশ্চিম তীর থেকে পলিরা ধীরে ধীরে আরো ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

(৪) দেশীরা বহু পূর্বে এবং সবার আগে পশ্চিম দিনাজপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন।

(৫) কোচ রাজবংশী পলিরা যে ক্ষত্রিয় তার কারণ হিসাবে জরাসিন্ধুর কাহিনী যুক্ত করা হয়েছে। বর্ণহিন্দুর মতো এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতকর্মের অভাব থাকায় একটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে। ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীর পেছনে আসলে Sanskritic Hinduism[২৩] এর প্রাবল্য ও তার সঙ্গে সংঘাত। পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠি স্বাভাবিক নিয়মে Sanskritization[২৪] এর মাধ্যমে নিজেকে উন্নীত করেন।

(৬) প্রথমে জরাসিন্ধু উদ্ভূত হয়ে রাজবংশী, পরে শিব-ঔরসে কপেন্দ্র (অর্থাৎ কোচ জনগোষ্ঠীর আদি পুরুষ) এর জন্ম হওয়ার কথা ঘোষিত হওয়ার মধ্যে ওই 'Sanskritization' এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। তাছাড়া এই জনগোষ্ঠীর সমাজ কাঠামোয় যে পিতৃত্ব-এ স্বীকৃতি[২৫] লাভ করেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ বিশ বা 'কত্তম' প্রথা স্মরণীয়।[২৬]

(৭) আবার কুমারী অবস্থায় সন্তান লাভ রাজবংশী সমাজে কন্যা পাত্র[২৭] রীতিটিকে মনে করায়। নারীর স্বেচ্ছাবিহারিনীরও স্বীকৃতি দেয়। অন্যপক্ষে হিরার নিজ সন্তানকে শিববংশীয় গৌরবজনক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা থেকে বোঝা যায় নারীর উপর পুরুষের অধিকার স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া ভিন্ন গোষ্ঠীর পুরুষ আনার প্রথার স্বীকৃতি এতে মেলে। তবে এ প্রথা কোচ, রাজবংশী, দেশী পলি সমাজে খুব ব্যাপকতা পায়নি। আসলে সমাজ ভাঙা-গড়ার কালের একটি ইংগিত এতে স্পষ্ট।

(৮) এই জনগোষ্ঠী যুদ্ধজীবী এবং তাঁরা লোহার ব্যবহার জানতেন না।

(৯) সরেজমিনে ক্ষেত্র অভিজ্ঞতায় বুঝেছি দেশীদের মধ্যে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগেনি। এই কাহিনীতেও তার ইংগিত আছে। [ক্রমশঃ]

১। পালরাজ রামপালের মন্ত্রীপুত্র, কুমারপালের প্রধানামাত্য বৈদদেবের কমৌলি লিপিতে (১১শ শতক)। সূত্র: বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব): ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬, পৃ. ১৩৮।

২। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) ডঃ রমেশ মজুমদার, পৃ-৫।

৩। ইথমে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পুরুষ্যা (ঋগ্বেদ ১০-৭৫, ৫, ৬)

৪। 'ওরে তোর মা বাপের কান্দনে মাহান্দি লোদি বয়'

'ছাড়িয়া পালাল গে বিদেশ'—উত্তরবঙ্গ সংবাদ রবিবারের পাতা ১১.১০.৮১

৫। 'টাঙ্গিল নদীর চিকন বালা

ও তুই চেংড়ি মোর গলার মালা'

—ধৈর্য দেবশর্মা। নিজস্ব সংগ্রহ

৬। এ ছাড়া বালিয়া, শ্রীমতী, কুলিক প্রভৃতি নদীর কথা এ অঞ্চলে প্রচলিত বহু পালা গানে উল্লেখিত। কাথ-ব ব্রতেও বহু ছোট ছোট নদীর কথা আছে। দ্রঃ উত্তরগ্রাম রচিত শিশির মজুমদার।

৭। Account of District of Dinajpur (1806). Francis Hamilton Buchanan

৮। ভারততীর্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। সুকুমার সিংহ, অফিসার অব স্পেশাল ডিউটি, আদমসুমারী দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সূত্র: পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (১ম খণ্ড) সম্পাদক: অশোক মিত্র, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত।

১০। নিম্নবঙ্গ থেকে আগত বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁদের সম্পর্কে যে পরিচয় সব চেয়ে চালু তা হল 'বাহে'। অথচ, এই 'বাহে' দেশী-পলি রাজবংশীদের মুখে সম্বোধনের ভাষা।

১১। 'মুইতো হনু নশাথী মায়া

অল্প বয়সে পিরিত কর্নু বন্ধু তিনজনা

একটা বন্ধু পলিয়া একটা বন্ধু দেশীয়া

একটা বন্ধু ওগে মায়ো নশাথী দেখিয়া'।

চরচুন্নী গান। নিজস্ব সংগ্রহ।

১২। Census India : West Dinajpur. 1971.

১৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ১ম সংস্করণ ১৩৫৩, পৃঃ ৩৮২।

১৪। Kirata-Jana-Kriti : Dr. S. K. Chatterjee, p. 34.

১৫। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ১ম সং ১৩৫৬, পৃঃ ৭৭৮।

১৬। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত পোষণ করেন। দ্রঃ Kirata-Jana-Kriti—পৃঃ ৬০।

১৭। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় এসে খোঁজ করলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

১৮। The Indian Antiquary : A Journal of Oriental Research in Archeology, History, Literature, Language, Folklore. Vol. I. 1872, 'Some Account of the Palis of Dinajpur', p. 339-340.

১৯। ঐ পৃঃ ৩৩৬।

২০। 'The masses, who are the descendants of the Bodos pure or

mixed in North Bengal...are now largely Mohammadan in religion'. Dr. S. K. Chatterjee. 'Kirata-Jana-Kriti' P: 89.

২১। 'Some Account of the Palis of Dinajpur'
The Indian Antiquary Vol, I. 1872. p. 336-338.

২২। 'The Koch, Rajbansi and Paliya are for the most part one and the same tribe.'—H. Beverly, Census report of Bengal (1872) Vol P.130. রাইজলে সাহেব কোচ, কোচমাণ্ডাই, রাজবংশী পলিয়া এবং দেশীকে দ্রাবিড়মোঙ্গল জনগোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করেন।

দ্রঃ The tribes and castes of Bengal (1891) Vol. I P 491.

'It is said that they belong to the great Bodo family that entered India in the 10th Century B. C. from the east and settled on the bank of the Brahmaputra and generally spread over Assam and the whole of North East Bengal.' Dr. Charuchandra Sanyal. The Rajbansis of North Bengal. P-16

দ্রঃ Dr. S. K. Chatterjee Kirata-Jana-Krti P-54.

দ্রঃ 'The Koch, Rajbansi and Paliya are really the three names for the same thing.' J. O. Bell, The Final report on the survey and settlement operation in Dinajpur 1934-1940. P. 11-13.

২৩। When A Great Tradition Modernises : Milton Singer P. 68.

২৪। ঐ পৃষ্ঠা ৬৮।

২৫। G. H. Damant সাহেবও উল্লেখ করেছেন : They line under an almost pure patriarchal system.'

২৬। দ্রঃ আদিম সমাজের ইতিহাস : মনোরঞ্জন রায়।

২৭। মহাভারতের কর্ণ, কুন্তীর কুমারী অবস্থায় গর্ভজ সন্তান।

চার্বাক : প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫। জয়ন্ত ভট্টর বক্তব্য

চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্টর প্রকৃত বক্তব্য নির্ণয় করায় বেশ কিছুটা সমস্যা আছে।

'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে একজায়গায় (১।২৬) তিনি অবশ্য সরাসরি বলছেন : 'তথাহি প্রত্যক্ষং এব একং প্রমাণম্ ইতি চার্বাকাঃ'। অর্থাৎ, চার্বাকরা বলেন-প্রত্যক্ষই এক এবং একমাত্র প্রমাণ। শুধু এটুকু বললে অবশ্য সিদ্ধান্ত হতো যে চার্বাকমতে অনুমান বলে কোনো প্রমাণ সম্ভব নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, চার্বাক-প্রসঙ্গে জয়ন্ত শুধু এইটুকুই বলেননি। একই গ্রন্থের অন্যত্র (১।৫৯) তিনি মন্তব্য করছেন, 'চার্বাকধূর্তঃ তু অথ অতঃ তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যামঃ, ইতি প্রতিজ্ঞায় প্রমাণ-প্রমেয়-সংখ্যা-লক্ষণ-নিয়ম-অশক্য-করণীয়ত্বম্ এব তত্ত্বং ব্যাখ্যাতবান্।' অর্থাৎ, সেয়ানা বা ধূর্ত চার্বাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল : এবার আমরা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো ; কিন্তু 'তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবো' বলে চার্বাক আসলে দেখাতে চাইলো যে প্রমাণ ও প্রমেয়র সংখ্যা ও লক্ষণ-সংক্রান্ত কোন নিয়মই সম্ভব নয়।

জয়ন্তর এই দ্বিতীয় উক্তি স্বীকার করলে মানতে হবে যে চার্বাক এমনই চালাক যে তার মতে কোনো রকম প্রমাণেরই লক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়—অতএব প্রত্যক্ষও নয়। মনে হয় জয়ন্তর অভিপ্রায় এই ধরণের কথা বলাই ; কেননা উক্তির জের টেনে তিনি উদাহরণ হিসাবে বলছেন, চার্বাকমতে প্রত্যক্ষ দ্বারাও সর্বদা যথার্থ জ্ঞান হয় না।

অতএব, চার্বাক-সংক্রান্ত জয়ন্তর এই দুটি উক্তির মধ্যে সংগতিসাধন সহজ নয়। প্রথম উক্তি অনুসারে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে, কোনো রকম প্রমাণই সম্ভব নয়—এমন কি প্রত্যক্ষও সংশয়াতীত নয়। অবশ্যই চার্বাকদের মুখে এজাতীয় কথা কতোটা শোভা পায় তাও ভাববার কথা। শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীর মুখে দ্বিতীয় উক্তিটি শোভা পেতে

পারে এবং তা জয়রাশি ভট্টর 'তত্ত্বোপপ্লব সিংহ'র কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে জয়রাশির প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়; নানা কারণে বরং তাঁকে শূন্যবাদী ও মায়াবাদীর দার্শনিক জ্ঞাতি বলে মনে করা যেতে পারে; কিন্তু তাঁকে 'কোনো-এক-কালে কোনো-এক-স্থানে' প্রচলিত চার্বাকদেরই কোনো-এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে কল্পনা করার পক্ষে যেটুকু নজির দেখানো হয়েছে তার মূল্য আসলে তুচ্ছ। বরং মনে হয় 'তত্ত্বোপপ্লব সিংহ'-র মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদকেরা জয়ন্ত ভট্টর উপরোক্ত দ্বিতীয় উক্তির নজির দেখালে লেখককে চার্বাকপন্থী বলে প্রচার করার সুবিধা হতো। কিন্তু তাঁরা তা করেননি; এবং না-করার কারণ এও হতে পারে যে সুখলালজীর মতো পণ্ডিত অবশ্যই জানতেন যে জয়ন্ত ভট্ট একই গ্রন্থের অন্যত্র সহজ সরল ভাষায় বলেছেন যে চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।

যাই হোক, আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের পক্ষে চার্বাক-প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্টর দ্বিবিধ বর্ণনার মধ্যে সংগতি-সাধন সহজসাধ্য নয়। একই সঙ্গে কী করে বলা যায় যে চার্বাকেরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করতেন এবং তাঁরা কোনো প্রমাণই মানতেন না; প্রত্যক্ষও তাঁদের কাছে সংশয়াতীত নয়!

অবশ্য, 'ন্যায়মঞ্জরী'র একটি টীকা প্রকাশিত হয়েছে। টীকার নাম 'গ্রন্থিভঙ্গ', টীকাকার চক্রধর। এই টীকায় জয়ন্তর দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। জয়ন্ত এখানে আসলে উদ্ভট নামে জনৈক চার্বাকপন্থীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। উদ্ভট নামটা একটু উদ্ভুটে—ঠাট্টার মতো শোনায়, যদিও অবশ্য গ্রন্থান্তরেও উদ্ভটের কথা পাওয়া যায়। যাই হোক, চক্রধর আমাদের বিশ্বাস করতে বলছেন, উদ্ভট নামের এই চার্বাকপন্থীর মতে সব রকম প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি বর্জনের উপদেশ আছে। কিন্তু চক্রধর আরো বলছেন, উদ্ভটের এই মন্তব্য অবশ্যই (চার্বাক) সূত্রের যথাশ্রুত বা আক্ষরিক অর্থ নয়; এটা আসলে উদ্ভটের নিজস্ব উদ্ভাবন।

কিন্তু মোট ব্যাপারটা আসলে আরো জটিল। একই গ্রন্থে (১।৩৩) জয়ন্ত আবার আরেক রকম কথা বলেছেন। জয়ন্তর স্বীয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ন্যায় সম্প্রদায়ের দাবি এই যে প্রমাণ আসলে চার রকম। অতএব স্বমত সমর্থনে যে-দার্শনিকেরা প্রমাণের সংখ্যা চারের চেয়ে বেশি বলে মনে করেন, জয়ন্তর পক্ষে তাঁদের মত খণ্ডনের প্রয়োজন বোধ করার কথা। কিন্তু কারা

চারের চেয়ে বেশি প্রমাণ মানেন ? জয়ন্ত বলছেন, প্রভাকরপন্থী মীমাংসকরা বলেন প্রমাণ পাঁচ রকমের ; কুমারিল ভট্টর অনুগামী মীমাংসকেরা বলেন প্রমাণ ছয় রকমের ; কেউ কেউ আবার বলেন প্রমাণ আট রকমের ; কিন্তু 'সুশিক্ষিত চার্বাক'রা বলেন, প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো নিয়ম মানা যায় না। কথাটার তাৎপর্য কি এই যে 'সুশিক্ষিত চার্বাক' মতে প্রমাণের সংখ্যা অসংখ্য ?

টীকাকার চক্রধর অবশ্য এখানেও আলোচ্য মতটিকে উদ্ভট নামে জনৈক চার্বাকবিশেষের মত বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু উদ্ভট নামের কোনো চার্বাকের কথা স্বয়ং জয়ন্ত মানতেন কিনা এ-বিষয়ে কোনো নজির জয়ন্তর গ্রন্থে নেই। তাই টীকাকারের মন্তব্যটি বড় জোর সংশয়-সাপেক্ষ।

কিন্তু জয়ন্ত-উক্ত 'সুশিক্ষিত চার্বাক' নিয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে বেশ একটু সোরগোল পড়েছে। তার একটা কারণ, একই গ্রন্থে (১।১১৩) জয়ন্ত আর এক জায়গায় বলেছেন, 'সুশিক্ষিতরা বলে থাকেন : অনুমান দু'রকম ; উৎপন্ন-প্রতীতি এবং উৎপাদ্য-প্রতীতি। ঈশ্বর প্রভৃতির অনুমান উৎপাদ্য-প্রতীতি। ধূম প্রভৃতি থেকে বহ্নি প্রভৃতির অনুমান কে অস্বীকার করে ? এসব ক্ষেত্রে তার্কিক দ্বারা অক্ষত ব্যক্তিরাও সাধ্যকে জানতে পারে। তবে আত্মা, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে যে-অনুমানের কথা বলা হয় সেগুলির প্রামাণ্য তত্ত্বদর্শীরা স্বীকার করেন না। এই সব অনুমানের দ্বারা সোজা মানুষের অনুমেয়-বিষয়ে জ্ঞান হয় না—অবশ্য যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মন দুষ্ট তার্কিকদের দ্বারা কুটিল হয়ে ওঠে।'

জয়ন্ত ভট্টর লেখার কায়দাটাই ওই রকম রকমারি শ্লেষ বা ঠাট্টা-তামাসায় ভর্তি। কিন্তু তা বাদ দিয়ে সোজা ভাষায় তাঁর বক্তব্যটা কী ? জয়ন্ত বলছেন, সুশিক্ষিততরদের মতে প্রত্যক্ষগোচর ইহলোক বিষয়ে সাধারণ লোক যা অনুমান করে থাকে তা অবশ্যই স্বীকার্য : যেমন ধূম থেকে বহ্নির অনুমান। কিন্তু আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কূট তার্কিকেরা যে-সব অনুমান প্রদর্শন করেন তা শুধু তাঁদের কূটবুদ্ধিরই পরিচায়ক, স্বীকারযোগ্য অনুমান হতে পারে না।

'সুশিক্ষিততর'-দের মত হিসাবে জয়ন্ত এখানে যা বলেছেন তা অবশ্যই পুরন্দরের কথা মনে করিয়ে দেয়। জয়ন্তর লেখার কায়দাটা যাই হোক না কেন, মূল বক্তব্যটা একই। পুরন্দর যে প্রকৃত চার্বাকপন্থী ছিলেন এবিষয়ে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে একাধিক নজির আছে ; তাই সে কথা না মেনে

উপায় নেই। কিন্তু 'সুশিক্ষিততর' বিশেষণ দিয়ে জয়ন্ত যাঁদের কথা বলছেন তাঁরাও যে চার্বাকপন্থী ছিলেন—এবিষয়ে কোথাও কোনো নজির নেই; অন্তত জয়ন্তর 'ন্যায়মঞ্জরী'তে তার আভাসও নেই। তাঁর আলোচ্য উক্তির আগে বা পরে কোথাওই চার্বাক বা লোকায়ত শব্দ চোখে পড়ে না। উক্তিটি অবশ্য পূর্বপক্ষ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পূর্বপক্ষ হিসাবে এখানে ঠিক কাকে বা কাদের বোঝা হবে? জয়ন্ত যেহেতু এখানে এমনকি আভাসে ইংগিতেও চার্বাকের উল্লেখ করেন নি সেই হেতু এখানেও পূর্বপক্ষ বলতে ঐ চার্বাকই, এমনতরো কথা কল্পনা করা ভিত্তিহীন হবে। পক্ষান্তরে মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে (Indian Logic in its sources pp. 31 f.) স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে জয়ন্তর আলোচ্য পূর্বপক্ষ বর্ণনাটির মধ্যে অনেকগুলি শ্লোক ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়'তেও পাওয়া যায়—একেবারে হুবহু একইভাবে পাওয়া যায়। ভর্তৃহরিকে চার্বাকপন্থী মনে করার অবশ্যই কোনো কারণ থাকতে পারে না। তাই শুধুমাত্র এই শ্লোকগুলির নজির থেকেই বলা যায় যে 'সুশিক্ষিততরাঃ' বলে এখানে জয়ন্ত যাঁদের কথা উল্লেখ করছেন তাঁদের সরাসরি চার্বাক বলে কল্পনা করা একেবারেই নিরাপদ নয়।

কথাগুলো বিশেষ করে তোলবার দরকার আছে। আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় প্রায়ই একরকম অতি সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই নির্বিবাদে ধরে নেন যে জয়ন্তর লেখা থেকেই বোঝা যায় চার্বাকদের দুটি সম্প্রদায় ছিলো। একটি হলো ধূর্ত চার্বাক এবং অপরটি হলো সুশিক্ষিত চার্বাক। আধুনিক বিদ্বানেরা আরো ধরে নেন যে দুটির মধ্যে মূল প্রভেদ এই যে ধূর্ত চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানেননি; সুশিক্ষিত চার্বাকেরা অবশ্য তা ছাড়াও লোকপ্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়ে অনুমান প্রমাণ মেনেছেন, শুধু অপ্রত্যক্ষ লোকোত্তর বিষয়ে অনুমান অগ্রাহ্য করেছেন।

এ জাতীয় মতের পক্ষে আধুনিক বিদ্বানদের কাছে একমাত্র নজির বলতে জয়ন্ত ভট্টর 'ন্যায়মঞ্জরী'। কেননা, জয়ন্ত চার্বাকদের বিশেষণ হিসেবে এক জায়গায় 'ধূর্ত' এবং অপর জায়গায় 'সুশিক্ষিত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ধরেই নেওয়া হয় যে 'সুশিক্ষিততরাঃ' বলে জয়ন্ত যাঁদের উল্লেখ করেছেন তাঁরা ঐ সুশিক্ষিত চার্বাকই।

এই মত স্বীকার করায় অনেক বাধা আছে। প্রথমত বিদ্বেষমূলক বিশেষণ ব্যবহারে পটু জয়ন্ত একই গ্রন্থে চার্বাককে 'বরাক' বলেছেন। বরাক মানে হাবাতে। তাহলে কি এই বিশেষণের নজির থেকেই চার্বাকদের আরো

এক সম্প্রদায় কল্পনা করতে হবে ? দ্বিতীয়ত, চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্ত যেখানে 'ধূর্ত' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, সেখানে চার্বাক বলতে যে সর্বপ্রমাণ-বিরোধী দার্শনিকদের কথা বর্ণনা করছেন তাঁরা কোনোমতেই চার্বাকমতবাদী হতে পারেন না। এমনকি জয়ন্তর মতেও তা হওয়া কঠিন। কেননা একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে চার্বাকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। এমনকি জয়ন্তর টীকাকার চক্রধর এখানে মতটির সমর্থক হিসাবে উদ্ভট বলে কোনো এক ব্যক্তির কথা কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তৃতীয়ত, 'সুশিক্ষিততরাঃ' বলে জয়ন্ত যাঁদের কথা বলছেন তাঁরা যে কোনো এক সম্প্রদায়ের চার্বাকপন্থী একথা কল্পনা করার পক্ষে কোনো নজির নেই।

আসলে, আধুনিক বিদ্বানরা একটি কথা যেন অবজ্ঞা করেই জয়ন্তর লেখার নজির থেকে এই দ্বিবিধ চার্বাক সম্প্রদায়ের কল্পনা করে থাকেন। সেটা হলো জয়ন্তর রচনাকৌশল এবং এই রচনাকৌশলের একটা বৈশিষ্ট্য হলো শ্লেষাত্মক বিশেষণ ব্যবহার। 'সুশিক্ষিত' শব্দটি তাঁর রচনায় এই রকম ব্যঙ্গার্থক। যেমন একই গ্রন্থে (১।১৬১) ঠাট্টা করে তিনি প্রাভাকরদের সম্বন্ধে এই বিশেষণ ব্যবহার করেছেন; অন্যত্র (১।২৭৩) আবার যে-দার্শনিকেরা 'সামান্য বা জাতি' (*universal*) মানেন না তাঁদেরও পরিহাস করে 'সুশিক্ষিত' বলেছেন।

অতএব, সংক্ষেপে, জয়ন্ত ভট্টর 'ন্যায়মঞ্জরী' থেকে চার্বাকমত সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন; বিশেষত চার্বাকেরা অনুমান মানেন কিনা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা নিরাপদ নয়।

জয়ন্তভট্টর মতো মহাপণ্ডিতের পক্ষে চার্বাক প্রসঙ্গে এরকম উল্টো-পাল্টা কথা বলার কারণ কী ? এ-নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। যোগ্যতর বিদ্বানরা তা করুন। বর্তমান আলোচনার পক্ষে আমাদের মন্তব্য এই যে শুধুমাত্র জয়ন্তর রচনার নজির দেখিয়ে চার্বাকদেরই 'ধূর্ত' এবং 'সুশিক্ষিত' নামের দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের কল্পনা বিচারের ধোপে টেঁকে না। অতএব এ-হেন কল্পনারও কোনো সুযোগ নেই যে ধূর্ত চার্বাকেরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মানতেন, কিন্তু সুশিক্ষিত চার্বাকেরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও লোকপ্রসিদ্ধ ইহলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। পুরন্দরের প্রামাণ্য উক্তি থেকে বরং মনে হয় যে দ্বিতীয় কথাটিই চার্বাক-পন্থীদের কথা : তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ হলেও প্রত্যক্ষের অনুগামী অনুমানকে প্রমাণ-হিসাবে স্বীকার করায় বাধা ছিল না।

৬। কৌটিল্যর সাক্ষ্য

চার্বাক বা প্রাচীনতর কালে লোকায়ত নামে খ্যাত দার্শনিক মতে অনুমানও যে প্রমাণ বলেই স্বীকৃত ছিলো—এবিষয়ে মোক্ষম প্রমাণ কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্র'।

'অর্থশাস্ত্র'-তে কৌটিল্য ঠিক কী বলেছেন প্রথমে তার সরলার্থ দেখা যাক। রাজার শিক্ষণীয় 'বিদ্যা'র আলোচনায় কৌটিল্য বলছেন:

'বিদ্যা বলতে আসলে চাররকম: আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি।

'মানব-মতে (শুধু) ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী-বিশেষ মাত্র।

'বার্হস্পত্য মতে (শুধু) বার্তা ও দণ্ডনীতি। লোকযাত্রাবিদ্‌দের কাছে ত্রয়ী সংবরণ মাত্র।

'ঔশনস' (অর্থাৎ উশনসের অনুগামীদের) মতে দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা। তার দ্বারাই সর্বপ্রকার বিদ্যা আবদ্ধ।

'(কিন্তু) বিদ্যা (প্রকৃতপক্ষে) চার রকম। এই হলো কৌটিল্যর মত। এগুলির সাহায্যেই ধর্মাধর্ম ও অর্থের সাধন হয়। তাই এগুলিই বিদ্যা।

'আন্বীক্ষিকী' বলতে শুধুমাত্র সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। অন্যান্য তিন বিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর ধর্মাধর্ম এবং অর্থ-অনর্থ, বার্তার লাভ-লোকসান, দণ্ডনীতির বল ও দুর্বলতা—এই সবই হেতু দ্বারা পরীক্ষা করেই লোকের উপকার সম্ভব। তারই দ্বারা অসময়-সুসময়ে মন স্থির রাখা যায়। তারই দ্বারা জ্ঞান, বাক্য ও কর্মের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

'তাই এই আন্বীক্ষিকীই সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায় এবং সর্বধর্মের আশ্রয়।'

প্রথমে কয়েকটি শব্দার্থ আলোচনা করা যাক। কৌটিল্যর মতে (রাজার পক্ষে) শিক্ষণীয় বিদ্যা বলতে চার রকম: আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। এর মধ্যে বার্তা এবং দণ্ডনীতির অর্থ নিয়ে বিশেষ কোনো হাঙ্গামা নেই। বার্তা মানে কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি—সেকালের ইকনমিক্‌স্ (Economics)। দণ্ডনীতি মানে রাজ্যশাসন-বিদ্যা—সেকালের পলিটিক্‌স্ (Politics)। জ্যাকবি ত্রয়ী শব্দের অর্থ করেছেন থিয়োলজি (theology) বা ধর্মতত্ত্ব। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যে-কোনো ধর্মতত্ত্বই ত্রয়ী নয়। প্রাচীন ভারতে একটি প্রথা অনুসারে অথর্ববেদকে বাদ দিয়ে শুধু

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদকে তিন বেদ বলে ধরা হতো। সেই প্রথা অনুসারে এখানেও ত্রয়ী মানে তিন বেদ। অর্থাৎ, ত্রয়ী মানে ধর্মতত্ত্ব হলেও শুধু এই তিন বেদমূলক ধর্মতত্ত্ব বা এই তিন বেদের বিদ্যা। কিন্তু চার রকম বিদ্যার মধ্যে কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী বলে বিদ্যাটির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। আন্বীক্ষিকী মানে কী?

অন্বীক্ষা শব্দের অর্থ 'পরবর্তী জ্ঞান': অনু (অর্থাৎ পরবর্তী) ঈক্ষা (বা জ্ঞান)। অনুমান শব্দটির অর্থও হুবহু একই: অনু (পরবর্তী) + মান (জ্ঞান)। অতএব 'অন্বীক্ষা' ও 'অনুমান' একই কথা ভারতীয় পরিভাষায় যাকে বলে পর্যায়শব্দ। কিন্তু 'পরবর্তী জ্ঞান' বললে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে: কিসের পরবর্তী? ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'প্রত্যক্ষর পরবর্তী'। অতএব, আজকাল যদিও চলতি কথায় আমরা 'অনুমান'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরেজী ইন্‌ফারেন্‌স্ (inference) শব্দের ব্যবহার করে থাকি, তবুও মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'অনুমান' জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুগামী বা পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রথমে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং তারই অনুসরণ করে অনুমান জ্ঞান। কিংবা, বলা যায়, অনুমানের একটি মূল শর্ত হলো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ। ভারতীয় দার্শনিকেরা একথা বলছেন কেন? পূর্ব-প্রত্যক্ষ বাদ দিয়ে অনুমান কেন সম্ভব নয়? একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত থেকে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক। ধূম থেকে আমরা অগ্নি অনুমান করি। কী করে করি? কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (বা প্রত্যক্ষ করেছি): যেখানেই ধূম সেখানেই অগ্নি, যেমন রান্নার উনুনে। এ-জাতীয় পূর্বপ্রত্যক্ষ বাদ দিয়ে শুধু ধূম থেকে অগ্নির অনুমান সম্ভবই নয়। তাই অন্বীক্ষা (অনু+ঈক্ষা) বা অনুমান (অনু+মান)। 'চরক-সংহিতা' এবং 'ন্যায়-সূত্র-তে বিষয়টি আরো বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আপাত কৌটিল্যের কথায় ফেরা যাক।

তাহলে, 'আন্বীক্ষিকী'র শব্দার্থ হল 'অনুমান বিদ্যা' বা 'হেতুশাস্ত্র'—আজকাল চলতি কথায় আজকাল আমরা যাকে বলি 'লজিক' (Logic)। অবশ্য, কৌটিল্য এখানে বিশুদ্ধ অনুমানবিদ্যা অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি; তাঁর মতে 'আন্বীক্ষিকী' শুধু অনুমানবিদ্যা ছাড়াও অনুমান-মূলক দার্শনিক মতও। কেননা, একই সঙ্গে তিনি বলেছেন—'আন্বীক্ষিকী' বলতে তিন এবং শুধুমাত্র তিন: সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত। এগুলি দার্শনিক মতের নাম। তাই এখানে 'আন্বীক্ষিকী' বলতে হেতুবিদ্যা বা অনুমানবিদ্যা ছাড়াও

এমন দার্শনিক মতগুলিও বুঝতে হবে যেগুলির মূল ভিত্তি বলতে অনুমান বা অন্বীক্ষা। অর্থাৎ, কৌটিল্য এখানে প্রকৃত অনুমান ভিত্তিক—বা, চলতি কথায় হয়তো বলা যায়, যুক্তিমূলক—দার্শনিক মত হিসাবে শুধুমাত্র তিনটি মতের উল্লেখ করেছেন। সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। তাঁর বিচারে আর কোনো দার্শনিক মতের যুক্তিবিদ্যা-আশ্রিত হবার মর্যাদা নেই।

প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার যে তাঁর এই তালিকায় 'যোগ' শব্দটি প্রচলিত অর্থে—অর্থাৎ পতঞ্জলির নামের সঙ্গে যুক্ত যোগ-দর্শন অর্থে—ব্যবহৃত হতে পারেনা। কেননা, দার্শনিক মত হিসাবে পতঞ্জলির যোগ-দর্শন এবং সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে মূল তফাৎ শুধু এই যে, সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই ; কিন্তু পতঞ্জলি সাংখ্য দর্শনের বাকি সব কথা মেনে নিয়ে কোনোরকমে তার সঙ্গে ঈশ্বরকেও জুড়ে দিয়েছেন। তাই পতঞ্জলির যোগদর্শন নামান্তরে 'সেশ্বর সাংখ্য' (বা সাংখ্য+ঈশ্বর) নামেও খ্যাত। তাই, কৌটিল্যর আলোচ্য মন্তব্যে 'যোগ' বলতে পতঞ্জলির যোগদর্শন মনে করলে মানতে হবে যে তাঁর মতে আন্বীক্ষিকী বা অনুমানভিত্তিক—বা যুক্তিভিত্তিক—দর্শন বলতে শুধু তিনটি : সাংখ্য, সেশ্বর সাংখ্য এবং লোকায়ত। এজাতীয় সম্ভাবনা অবশ্যই সুদূর-পরাহত। তাই প্রশ্ন ওঠে : 'যোগ' বলতে এখানে কৌটিল্য কোন্ দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন ?

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং কুপ্পু স্বামী শাস্ত্রীর মতো মহা পণ্ডিতেরা প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের নানা নজির থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন, প্রাচীনকালে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনকে 'যোগ' নামে উল্লেখ করার একটা প্রথা ছিলো এবং কৌটিল্যও নিশ্চয়ই সেই প্রথা অনুসরণ করেছেন। এবিষয়ে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী যে সব নজির দেখিয়েছেন এবং ন্যায় বৈশেষিককে 'যোগ' নামে আখ্যা দেবার কারণ কী হতে পারে এবিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এখানে তা পুনরুল্লেখ করতে গেলে আলোচনা অনেক বিস্তৃত হত এবং আমাদের পক্ষে বর্তমানে তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় উভয়েরই অধিকার ও পারদর্শিতা সংশয়াতীত। অতএব এঁদের মন্তব্যর উপর নির্ভর করে আমরা নিরাপদেই স্বীকার করতে পারি যে 'যোগ' শব্দ 'অর্থশাস্ত্রে' ন্যায়-বৈশেষিক অর্থেই ব্যবহৃত। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে আন্বীক্ষিকী বা অনুমান মূলক দর্শন বলতে শুধুমাত্র সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে যোগ এবং লোকায়ত।

আমাদের বর্তমান আলোচনা হয়তো এখানেই শেষ হতে পারতো।

চার্বাক বা লোকায়ত মতে অনুমান-মাত্রই অগ্রাহ্য কিনা—'অর্থশাস্ত্র'র উক্তিতে এই প্রশ্নের চরম উত্তর পাওয়া যায়। অনুমান-মাত্রই অগ্রাহ্য করা তো দূরের কথা, অর্থশাস্ত্র'র মতে মাত্র তিনটি দর্শন অনুমান-মূলক বা আন্বীক্ষিকী বলে স্বীকার্য। তার মধ্যে একটি হলো লোকায়ত। অতএব লোকায়তিকেরা সব রকম অনুমানই অস্বীকার করেছেন—পরবর্তীকালের এ-জাতীয় কথার সঙ্গে প্রাচীন নজিরের মিল হয় না।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'অর্থশাস্ত্র'র উক্তি আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, কৌটিল্য শুধুমাত্র তিনটি মতকে প্রকৃত দর্শনের মর্যাদা দিয়েছেন। তার মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্তর মতো প্রভাবশালী দর্শনের উল্লেখ নেই। এগুলিকে অবজ্ঞা করার কারণ কী? জাকবি অনুমান করেছেন যে কৌটিল্য বা চাণক্যের মতো প্রখ্যাত ব্রাহ্মণের পক্ষে বৌদ্ধ ও জৈনমতকে প্রকৃত দার্শনিক মতের মর্যাদা না-দেবারই কথা। কিন্তু এই অনুমান সহজে মানা যায় না; কেননা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে তাঁর পক্ষে লোকায়ত মতই সর্বপ্রথম অবজ্ঞা করার কথা এবং পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তর মতো মতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনই স্বাভাবিক। অতএব, জ্যাকবির মন্তব্য গ্রহণ না-করে বরং মনে করা যেতে পারে যে কৌটিল্যের সময় বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিলো; অন্তত প্রভাবশালী দার্শনিক হিসাবে কৌটিল্য-পূর্ব কোনো প্রখ্যাত বৌদ্ধ বা জৈন মতের সমর্থক ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হননি। মহারাজ অশোকের পর—অর্থাৎ কৌটিল্যের পরে—নাগার্জুনের মতো বৌদ্ধ বা উমাস্বতির মতো প্রখ্যাত জৈন দার্শনিকদের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু কৌটিল্যের লেখায় পূর্বমীমাংসা ও বেদান্তের উল্লেখ নেই কেন? অবশ্যই পূর্বমীমাংসার আকরগ্রন্থ জৈমিনির 'মীমাংসাসূত্র' এবং বেদান্তর আকরগ্রন্থ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'-র রচনাকাল সংক্রান্ত সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে 'যোগ' এবং লোকায়ত দর্শনের পূর্ববর্তী। অতএব দার্শনিক মত হিসাবে শুধু এই তিনটি উল্লেখ করেও কৌটিল্য কেন পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত সম্বন্ধে নীরব? প্রশ্নটি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু কৌটিল্যের উক্তির সঙ্গে পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের মূল দাবি মিলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াও কঠিন নয়। পূর্বমীমাংসাকদের মূল দাবি কোনো স্বতন্ত্র বা স্বাধীন দার্শনিক

মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। তার বদলে পূর্বমীমাংসা বেদেরই কর্মকাণ্ডর রূপায়ণ। তেমনি বেদান্তও কোনো স্বাধীন দার্শনিক মত নয়ঃ বেদেরই জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্-উক্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, এই দুটি দর্শনের স্বীয় দাবিই হলো, এগুলি বেদ ছাড়া আর কিছুই নয়—বেদ-এরই তাৎপর্য ব্যাখ্যা। অতএব, কৌটিল্য-উক্ত বিদ্যার তালিকায় 'ত্রয়ী' বা বেদ ছাড়াও দর্শন হিসাবে পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্তর উল্লেখ অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন ঃ উভয় দর্শনেরই সারাংশ 'ত্রয়ী'-রই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এখানে প্রাচীনকালের মতাদর্শগত একটা বিতর্কেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্যের স্বীয় মতে বিদ্যা বলতে চার রকম। কিন্তু সেইসঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রাচীনেরা সকলেই এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত নন। মতান্তর হিসাবে এখানে বিশেষত দুটির উল্লেখ করবো।

প্রথমত, মানব বা মনু-র অনুগামীদের মত। কৌটিল্য বলছেন, মনুর অনুগামীদের মতে বিদ্যা বলতে শুধুমাত্র তিনটি ঃ ত্রয়ী, দণ্ডনীতি এবং বার্তা ; আন্বীক্ষিকীকে স্বতন্ত্র বিদ্যা বলে মানার কোনো কারণ নেই, কেননা তা ত্রয়ী-বিশেষই বা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত।

এখানে মনু নামে কৌটিল্য যাঁর উল্লেখ করছেন তিনিই 'মনু স্মৃতি'-কার কিনা—এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানরা কিছুটা বিতর্ক তুলেছেন। যেমন কঙ্গলে (R. P. Kangle) মন্তব্য করেছেন, এখানে 'মানব' বা মনুর অনুগামী বলতে অধুনালভ্য 'মনুস্মৃতি'র অনুগামীদের বোঝা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেননা, 'মনুস্মৃতি'-তে আন্বীক্ষিকী (বা নামান্তরে হেতুবিদ্যা, তর্কবিদ্যা) অবজ্ঞা করার উপদেশ নেই ; বরং স্বীকৃতিই চোখে পড়ে। কিন্তু 'অর্থশাস্ত্র'র প্রামাণিক সংস্করণ ও ইংরেজি অনুবাদের জন্যে আমরা তাঁর কাছে যতোই ঋণী হই না কেন, তাঁর এই মন্তব্য আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা, 'মনুস্মৃতি'-তে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র) চরম প্রমাণ ; এমনকি কোনো দ্বিজও যদি হেতুশাস্ত্র অবলম্বন করে শ্রুতি-স্মৃতিতে কোনো সংশয় প্রকাশ করে তাহলে ধার্মিক ব্যক্তিরা তাকে একেবারে দূর করে দেবেন ঃ

শ্রুতিঃ তু বেদঃ বিজ্ঞেয়ঃ ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্বার্থেষু অমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম হি নির্বভৌ ॥
যঃ অবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্র আশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
সঃ সাধুভিঃ বহিষ্কার্যঃ নাস্তিকঃ বেদনিন্দকঃ ॥ ২-১০-১১ ॥

এখানে একটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হেতুশাস্ত্রর প্রতি শ্রদ্ধাই মনুর মতে বেদনিন্দা বা নাস্তিকতার উৎস। কিন্তু কাদের মধ্যে এ-হেন হেতুশাস্ত্রর প্রতি শ্রদ্ধা? ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট চার্বাক প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। চার্বাকেরা যে বেদনিন্দক নাস্তিক ছিলেন; একথা অবশ্যই সুবিদিত। কিন্তু কুল্লূকভট্টর ব্যাখ্যা স্বীকার করলে মানতে হয়, তার আসল কারণ চার্বাকদের হেতুশাস্ত্র-পরায়ণতা। কিন্তু অনুমান সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে হেতুশাস্ত্র-পরায়ণতার কথা ওঠে না। অতএব, চার্বাকেরা ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অস্বীকার করেছেন—মনু ও কুল্লূকের কথা মাধবাচার্য প্রভৃতির দাবির বিরুদ্ধে যায়।

অন্যত্র হৈতুক বা হেতুশাস্ত্র-পরায়ণদের প্রতি 'মনুস্মৃতি'র মনোভাব আরো স্পষ্টভাবে উক্ত হয়েছে। মনু বলছেন, 'পাষণ্ডদের, নিষিদ্ধবৃত্তি-অবলম্বনকারীদের, ভণ্ডদের, শঠদের, হেতুশাস্ত্র পরায়ণদের (হৈতুকান্) এবং দাম্ভিকদের—এদের কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করবে না।' (মনু ৪।৩০)

'মনুস্মৃতি'র এজাতীয় নজিরগুলি মনে রেখে 'অর্থশাস্ত্র'-র প্রসঙ্গে ফেরা যাক। কৌটিল্য বলছেন, তাঁর স্বীয় মতে (রাজার শিক্ষণীয়) বিদ্যা বলতে চার রকম হলেও 'মানব' বা মনুর অনুগামীরা তা মানেন না: তাঁদের মতে আন্বীক্ষিকীর কোনো স্বাতন্ত্র নেই, তা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত। অন্যত্র 'মনুস্মৃতি'-তে উক্ত হয়েছে:

ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ তু ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিরং চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চ আত্ম বিদ্যাম্ বর্তারম্ভান্ চ লোকতঃ ॥ ৭।৪৩ ॥

—অর্থাৎ, বেদবিদ্দের কাছে 'ত্রয়ী' অধ্যয়ন করবে, সুপ্রাচীন (শাশ্বত) দণ্ডনীতি অধ্যয়ন করবে, আত্মবিদ্যা-সংগত আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন করবে এবং (বণিক প্রভৃতি) লোকের কাছে বার্তা অধ্যয়ন করবে।

উক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। মনে হতে পারে এখানেও 'অর্থশাস্ত্র'র মতোই চারটি শিক্ষণীয় বিদ্যার উপদেশ দিয়েছেন: ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, আন্বীক্ষিকী এবং বার্তা। কিন্তু যে-মনু হৈতুক বা আন্বীক্ষিকীতে অনুরক্তদের সঙ্গে এমনকি কথা বলাও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন তিনিই কী করে আবার আন্বীক্ষিকী শিক্ষার উপদেশ দেন? পাছে এ-জাতীয় খটকা লাগে তাই মেধাতিথি মনুর প্রকৃত অভিপ্রেত অর্থটি খুব পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে এই শ্লোকে আন্বীক্ষিকী শব্দটিকে আলাদা করে বোঝা ভুল হবে। 'আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্ম বিদ্যাং' বলে বর্ণনাটি একসঙ্গে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, সহজ কথায় মনু এখানে 'শুধু আন্বীক্ষিকী'র

কথা বলছেন না, 'আত্মবিদ্যার সহায়ক' বা 'আত্মবিদ্যার অনুগামী' আন্বীক্ষিকীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার মানে, আসল বিষয়টি হলো আত্মবিদ্যা বা বেদান্ত প্রতিপাদ্য অধ্যাত্মবিদ্যা। তা ঠিকমতো বুঝতে গেলে আন্বীক্ষিকীরও এরকম গৌণ প্রয়োজন আছে; উদ্ধৃত শ্লোকে মনু শুধুমাত্র এইটুকু প্রয়োজনের উল্লেখ করেছেন। বেদান্ত দর্শনেও ঠিক এই কথাই আছে: স্বাধীন বিদ্যা হিসাবে তর্ক বা শুধু-তর্কের—কোনো উপযোগিতা নেই; তবে শাস্ত্রর অনুগামী অর্থে তর্কের একরকম গৌণ উপযোগিতা আছে। কেবল তর্ক নয়; শাস্ত্রানুগামী তর্ক। এবং এই দ্বিতীয় অর্থেই তর্ক স্বীকার্য, প্রথম অর্থে নয়। 'মনু স্মৃতি'তেও মূলত একই কথা। এবং পাছে এখানে পাঠক ভুল করে মনুর বক্তব্য হিসাবে কেবল-আন্বীক্ষিকী বা স্বাধীন আন্বীক্ষিকী বুঝে বসেন, তাই মেধাতিথি বিশেষ করে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এখানে আত্ম-বিদ্যার তোয়াক্কা করে না এ-হেন স্বাধীন আন্বীক্ষিকী মানা মারাত্মক ভুল হবে। মারাত্মক, কেননা কেবল-আন্বীক্ষিকী বা কেবল-হেতুবিদ্যা বা কেবল-যুক্তি-বিদ্যার প্রবণতাও হলো নাস্তিক্যর প্রতি।

তাহলে কৌটিল্যের কথা এবং মনুর কথা এক নয়। কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী বলতে স্বাধীন যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যার কথাই বলেছেন। কিন্তু 'মনুস্মৃতি'র মতে কেবল আন্বীক্ষিকী অবশ্য পরিত্যাজ্য; শুধুমাত্র শাস্ত্রানুগামী বা বেদান্ত অনুগামী অর্থে আন্বীক্ষিকীর কিছুটা মূল্য আছে, কেননা তা আত্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা বোঝবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

আমাদের বর্তমান আলোচনার দিক থেকে এখানে কিন্তু মেধাতিথির মন্তব্যের আর একটি কথার দিকে নজর দেওয়া দরকার। স্বাধীন আন্বীক্ষিকীর নিপুণ ব্যবহার করে কে বা কারা আস্তিক্য নিরসনের প্রয়াস করে থাকেন? মেধাতিথি বলছেন, বৌদ্ধ, চার্বাক, প্রভৃতিরা। অতএব, চার্বাক শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ মানতেন, কোনো অর্থেই অনুমান মানতেন না—এ-জাতীয় দাবির পক্ষে অন্তত মেধাতিথির সমর্থন ছিলো না। অন্বীক্ষা বা অনুমান থেকেই আন্বীক্ষিকী শব্দর ব্যুৎপত্তি, এবং মেধাতিথির মতে চার্বাক এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার নিপুণ ব্যবহারে পটু ছিলেন।

কৌটিল্যরও নিশ্চয়ই মোটের উপর একই কথা তা না হলে আন্বীক্ষিকী অর্থে তিনি শুধুমাত্র যে তিনটি দার্শনিক মত স্বীকার করেছেন তারমধ্যে লোকায়তর স্থান কী করে ব্যাখ্যা করা যায়? এই যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ যদি বলেন যে এখানে কৌটিল্য লোকায়ত বলতে চার্বাক দর্শন বোঝেন নি—অন্য কিছু বুঝেছিলেন তাহলে তাঁদের সঙ্গে তর্ক তুলে লাভ নেই। ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে না দিলে মানতেই হবে, লোকায়ত ও চার্বাক একই দর্শন: প্রাচীনকালে যে দর্শনকে সাধারণত লোকায়ত বলা হতো তুলনায় পরবর্তীকালে, যে কোন কারণেই হোক না কেন, তাকেই চার্বাক নামে উল্লেখ করার প্রথা প্রচলিত হয়েছিলো।

(ক্রমশঃ)

আশ্রয়

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়, ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের পথ; তারপর ষ্টেশন থেকে হাঁটাপথে মিনিট কুড়ি। এখানে এখনও জল হাওয়া মাটির গন্ধে আদি ও অকৃত্রিম জীবনের স্বাদ মেলে। সবে গজিয়ে ওঠা পল্লীর শেষ প্রান্তে একতলা বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে চুপি চুপি পায়ের শব্দ উঠে আসে ছাতে। ছাতের যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় বাড়ীর লাগোয়া নিমগাছ দুপুরের রোদ আড়াল করে রাখে, সেখানে আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তি কথা কয়:

'বাবা তুমি!'

'ঘুম আসছে না রে, তাই উঠে এলাম।'

'কেন লুকোচ্ছ? বল না তোমার মেয়েকে পাহারা দেবার জন্যে উঠে এসেছো।'

উত্তর নেই। ঝিঁঝির ডাকে মধ্যরাত কান পেতে আছে। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘের ফাটল চুঁইয়ে জোছনা নামছে।

'কি, কথা বলছো না যে।'

'কি বলবো বল, তোর মনের অবস্থার কথা ভেবে ছাতে না এসে পারলাম না।'

ভারী নিঃশ্বাস পতনের শব্দ হয়। মধ্যরাতের নৈঃশব্দ খোবলাতে খোবলাতে কিছু দূরে একটা কুকুর ডেকে ওঠে। এক ঝলক বাতাস কানের পাশ দিয়ে তির-তির করে বয়ে যায়।

'তুমি যাই বল, আমার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।'

'কি যে বলিস! আরও কত দুঃখ আঘাতের সঙ্গে লড়তে হবে, এখনই ভেঙে পড়লে চলবে কেন।'

'আমি যে আর সইতে পারছি না।'

'সইতে হবে মা, সারাটা জীবনইতো পড়ে আছে তোর।'

'কিন্তু কি নিয়ে আমি বাঁচব বল, আমার চোখের সামনে যে সব অন্ধকার।'

'ও অন্ধকার কেটে যেতে কতক্ষণ।'

'না মরা পর্যন্ত কাটবে না।'

'ওরকম মনে হয়; তারপর দেখবি সময়ের হাসপাতালে শুয়ে-বসে, খেয়ে-দেয়ে, ঘুমিয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'কিন্তু বাবা, আমার শরীরটা যে অশুচি হয়ে গেছে। আমাকে ছুঁতে তোমার ঘেন্না হবে না?'

'পাগল মেয়ের কথা শোন! হাতে নোংরা লাগলে কেউ হাতটা কেটে ফেলে দেয়, না ধুয়ে ফেলে? নার্সিং হোম থেকে তো সব পরিষ্কার করে এলি, আবার অশুচি কিসের?'

পিতার স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ নেমে আসে আত্মজার উস্কোখুস্কো মাথার ওপর। মনের গোপন অন্ধকারে রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা হু হু কান্নায় ভেঙে পড়তে গিয়ে বাধা পায়।

আত্মজার থরথর কাঁপা ঠোঁটের ওপর চেপে বসে পিতার সাবধানী হাত, 'এই চুপ কর্। সবাই জেগে যাবে যে।'

দূর থেকে মেলট্রেনের শব্দ ভেসে আসে। মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্য মাড়িয়ে সময়ের চাকা গড়িয়ে যায়। নিমের পাতা চুঁইয়ে জোছনা নামে।

'মনে পড়ে বাবা, ছোটবেলায় তোমার বুকে মাথা পেতে না শুলে আমার ঘুম আসতো না। এজন্যে মা খুব গজগজ করতো। বলত, এমন বাপ-সোহাগী মেয়ে নাকি কস্মিনকালেও দেখে নি। শুনে আমার বুক ফুলে উঠত গর্বে। ভাবতুম, এমন বাবা ক'জনের হয়। ছোটবেলায় তোমাকে খুব জ্বালিয়েছি, তাই না? আমার হাজারটা আবদার মেটাতে গিয়ে কি ভোগান্টাই না ভুগেছো। তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছিলাম বলেই হয়ত আমার কপাল পুড়ল।'

'কি আবোল-তাবোল বকছিস।'

'কেন এমন হয় বাবা? যাকে বিশ্বাস করে সব দিয়েছিলাম সে কেন এভাবে আমাকে ছেঁড়া শুকতলার মত পথের ধুলোয় ফেলে দিয়ে পালাল? কি কাপুরুষ! পাছে মুখোমুখি হতে হয় সেই ভয়ে ভিলাই চলে গেল চাকরি নিয়ে।'

'যা হবার হয়ে গেছে, এসব ভেবে আর কিছু লাভ নেই।'

'তাই কি হয় বাবা! ভ্রূণ হত্যার পাপ কি অত সহজে ভোলা যায়?'

'মানুষ তো অবস্থার দাস—তারই মাপকাঠিতে পাপ-পুণ্যের বিচার হচ্ছে

যায়। আমরা ভুল কিছু করি নি। এছাড়া আর অন্য কোন পথ ছিল না।'

'জানো বাবা, খানিক আগে আমার মরতে ইচ্ছে করছিল। ঐ যে জোছনায় চিকচিক করছে নন্দীদের পুকুর—ঐ পুকুর আমাকে হাতছানি দিয়ে খালি বলছিল—আয় আয়, আমার বুকে আয়, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। আমার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছিল। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপ্সা দেখছিলাম। কেবল ঐ আয় আয় ডাক আমাকে টানছিল। সে কি ভীষণ টান! শেকড়-বাকড় শুদ্ধু উপড়ে ফেলবে যেন। এমন সময় তুমি এলে।'

'আমি জানতাম এমনটা ঘটতে পারে, তাই এলাম তোর কাছে।'

'কিন্তু এভাবে পাহারা দিয়ে আমাকে রাখতে পারবে?'

'তাই কখনো রাখা যায়! কিন্তু মরে গেলেই কি সব কিছুর সুরাহা হবে ভেবেছিস?

উত্তর নেই। উল্টোদিকের বাড়ীর পেটাঘড়ি থেকে ভেসে আসে স্থবির মধ্যরাতের পদশব্দ। নিমের পাতা কাঁপিয়ে একটা চামচিকে উড়ে যায়।

'কিরে জবাব দিচ্ছিস না যে।'

'আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে বাবা।'

'অত ভেঙে পড়ার কি আছে। মনে কর না, এখন থেকে নতুন জীবন সুরু হল।'

'মনে করলেই কি সব হয়?' বুকভাঙা শ্বাসের শব্দে কথাগুলোর ছন্দপতন ঘটে।

'হবে না কেন! জগতে কত দুঃখ আছে সে খবর রাখিস?'

'কি হবে রেখে?'

'মনে বল পাবি। বাঁচার মুঠোটাকে শক্ত করে ধরতে পারবি। শোন তবে একটা ঘটনার কথা! খবরের কাগজে বেরিয়েছিল প্রায় বছরদশেক আগে। শহরটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না, শিকাগোর কাছাকাছি হবে বোধহয়, ওখানে সাতাশ-আঠাশ বছরের একটি মেয়ে বড়রাস্তার ধারে এক লণ্ড্রীতে কাজ করত। লণ্ড্রীর মালিক দয়া করে মেয়েটিকে তার বাড়ীতে মাথা গোঁজার মত ঠাঁই করে দিয়েছিল। মেয়েটির রূপ নেই, কিন্তু প্রাণ খুলে হাসতে পারত। তাই মালিকের পরিবারের লোকজন, খদ্দের, পাড়া-পড়শী সকলেরই তাকে খুব পছন্দ। ছেলে-ছোকরাও তাকে যে পছন্দ করত না

এমন নয়। কিন্তু কেউ ফস্টিনাস্টি করতে এলে মেয়েটি আমল দিত না। কারণ, দু-দিনের সখ-আহ্লাদ মেটাবার মত মেয়ে সে ছিল না। সে সত্যিকারের ঘর-বাঁধার স্বপ্ন দেখত। তাই কম খেয়ে, কম পরে ব্যাঙ্কে টাকা-পয়সা জমাতে লাগল। তারপর যখন বুঝতে পারল, একটা নতুন সংসার পাতার মত টাকা-পয়সা জমেছে, তখন খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে চোখ বুলোতে লাগল। উদ্দেশ্য একটাই—এমন একজন পাত্র খুঁজে বের করা, যার আত্মীয়-বন্ধু বিশেষ নেই, ছোটখাট কাজকর্ম করে, চলনসই চেহারা, মনের দিক থেকে বড়। কারণ, সে ধরে নিয়েছিল, এমন পাত্র ছাড়া তার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। কিছুদিন কাগজে চোখ বুলোনোর পর একদিন মেয়েটি তার পছন্দমত পাত্রের বিজ্ঞাপন দেখে লাফিয়ে উঠল। মেয়েটি যেখানে থাকত, সেখান থেকে অনেক দূরে এক অখ্যাত রেলষ্টেশনের ধারে কফিখানায় কাজ করে পাত্র। মধ্যবয়সী। একক, নিঃসঙ্গ জীবন। কোন দাবী-দাওয়া নেই। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি ছেড়ে দিল। জবাব আসতে দেরী হল না। পাত্র জানাল তার আপত্তি নেই। তারপর কিছুদিন ধরে পত্রালাপ চলল। এই ধরনের পত্রালাপের যা দস্তুর সেই ফটো-বিনিময়ের পালা চুকেবুকে গেলে শুভকাজ সেরে ফেলার ব্যবস্থা পাকা হল। অমুক দিনে তমুক রাস্তার ধারে একটা নার্সারী স্কুলের উল্টোদিকে যেখানে হাই রাইজ বানানোর তোড়জোর চলছে। সেখানে রাত দশটার সময় দেখা করতে বলল পাত্র। মেয়েটি ঘর-বাঁধার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তার যা কিছু বিষয়-আশয় বাক্সবন্দী করল। ব্যাঙ্কে জমানো টাকা-পয়সা তুলে আনল। তারপর মালিকের কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়ে ট্রেনে চেপে বসল। ওর তখনকার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছিস। ট্রেনে যেতে যেতে সারাটা পথ সে ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন কল্পনায় বুঁদ হয়ে রইল। তারপর ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরল। নির্দিষ্ট সময়ে নার্সারী স্কুলের কাছে বাস থেকে নামল। উল্টোদিকের রাস্তায় সেই হাই রাইজ তৈরীর কাছাকাছি পৌঁছে টের পেল শহরের এক প্রান্তে সেই জায়গাটা বেশ নির্জন আর অন্ধকার। মেয়েটিকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা ছায়ামূর্তি যেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—এই অনুমানে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখার আগেই চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সাতদিন বাদে হাসপাতালের বেডে তার জ্ঞান ফিরে এল। তার বাঁচার কোনো আশা ছিল না। তার চিঠিতে-পাতানো হবু বরটি তাকে পেছন দিক

থেকে আক্রমণ করে লোহার রড দিয়ে মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছিল। তারপর তার যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। সারারাত্রি মেয়েটি অচেতন অবস্থায় পড়ে রইল রক্ত ধুলো আর হাড়-কাঁপানো হিমে মাথামাখি হয়ে। পরদিন সকালে নার্সারী স্কুলের খোকাখুকুরা পাথরকুচির স্তূপের পাশে মেয়েটিকে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ছুটে গেল দিদিমণিদের ডেকে আনতে। দিদিমণিদের চেষ্টায় মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। সাতদিন সাতরাত ধরে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে হাসপাতালের ডাক্তাররা যখন মেয়েটিকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল, তখন মেয়েটি ভাবল, সব খুইয়ে এমন নিঃস্ব অবস্থায় বেঁচে থেকে লাভ কি। সে চাইল নিজের হাতে তার হতভাগ্য জীবনটার ইতি টানতে। কিন্তু নার্সারী স্কুলের খোকাখুকু আর দিদিমণিরা তা হতে দিল না। খোকাখুকুরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে, দিদিমণিরা নিজেদের মাইনের টাকা থেকে মেয়েটির ওষুধ পথ্য চিকিৎসার খরচ যোগাল। মাসখানেক বাদে মেয়েটি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। কিন্তু খোকাখুকু আর দিদিমণিরা ওকে ছাড়ল না। ও স্কুলের আয়ার কাজে বহাল হল। ওয়াশিংটন থেকে যখন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ওর সঙ্গে দেখা করতে এল, মেয়েটি বলল, যা গেছে তার জন্যে এক ফোঁটা খেদ নেই মনে ওর। এখন ও সুখী, দারুণ সুখী। ফুলের মতন খোকাখুকুদের নিয়ে জীবন কাটানোর চাইতে আর কিছু চাওয়ার নেই তার পৃথিবীতে।'

অচেনা রাতপাখী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। নিমের গাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে এই জ্বলা এই নেভার রেখা টানতে টানতে বেরিয়ে আসে কয়েকটা জোনাকি।

'কিরে কেমন লাগল ?'

উত্তর নেই। কাছাকাছি কোন ঝোপ থেকে বুনোফুলের গন্ধ ভেসে আসে। গতায়ু মধ্যরাতের শেষ নিঃশ্বাসে নিমের পাতা সিরসিরিয়ে ওঠে।

'কিরে চুপ করে রইলি যে, কেমন লাগল বললি না ?'

'কি বলবো, এ ঘটনা আমার জানা। তবে শেষদিকটা মিলল না।'

'কিরকম ?'

'মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ওর আর জ্ঞান ফেরে নি, তাই না ?'

'হ্যাঁ, মেয়েটিকে আমি বাঁচিয়ে তুললাম। বলতে চাইলাম, এ দুঃখের পৃথিবীতে মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়েই আমরা বেঁচে থাকতে পারি, আর

নয়ত নিজেকে নিজে যন্ত্রণা দিয়ে ছিঁড়েখুড়ে ফেলা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না।'

নিমের পাতা চুইয়ে জোছনা ঝরে। আত্মজার চোখে সজল জোছনা চিকচিক করে।

'বাবা তুমি কি ভাল, ভীষণ ভালো। তোমার দুটো হাতে আমার এ লজ্জার অপমানের মুখ ঢাকতে দাও।' চাপা কান্নার আবেগে বেসামাল নিঃশ্বাসের চাপে কথাগুলো এঁকেবেঁকে যায়—এলোপাতাড়ি বাতাসের ধাক্কায় বৃষ্টিধারা গুঁড়িয়ে যাওয়ার মতন।

'এমন করে বলিস না মা, আমার বুকের ভেতরটা যে ফেটে যায়।'

'দাও বাবা তোমার হাত দুটো।'

জোর করে টেনে আনা দুহাতের দশ আঙুলের ভেতরে একটা তৃষিত মুখ আশ্রয় নেয়।

অস্তিত্বশিকারী

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সকাল দশটার একটু পরেই গৌতম পৌঁছে গেল বাড়িটার সামনে। এই শহরের বিখ্যাত খবরের কাগজের অফিস এটা। দুটো রাস্তা খানিকটা আঁকা-বাঁকা হয়ে এসে একটা চওড়া রাস্তায় মিশেছে। তিনটে রাস্তার সংযোগ বিন্দুতেই প্রকাণ্ড এই অফিসটা। বাড়িটা খুব বড় নয়, একতলা, কিন্তু কোথায় যে তার সীমানা, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। দূর থেকে দেখলে বিরাট একটা সামুদ্রিক জীবের মতো মনে হয়। গৌতম একবার পিছন ফিরে দেখল, অফিস-পাড়ার ব্যস্ততা চারিদিকে। লোকজন ছোটাছুটি করছে। কিন্তু গৌতমের ভেতর প্রচণ্ড উত্তেজনা। অস্থিরতায় মুখ-চোখ টানটান হয়ে রয়েছে। পেছনে তাকিয়ে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঐখানে নেই কোনো স্মৃতি অথবা আবেগ; যাতে গৌতম আনন্দে অধীর হতে পারে। সামান্য জোরে হেঁটে অফিসটার ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়।

গৌতমের উত্তেজনার এই কারণটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। এই অফিসে আজই ওর প্রথম চাকরিতে যোগ দেয়ার কথা। কি চাকরি, সেটা অবশ্য এখনো জানে না। কয়েকদিন পরে নিশ্চয়ই জানতে পারবে। কিন্তু শুধু এই খবরটাই কি উত্তেজিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়? এরকম একটা জায়গায় তো চাকরি পাওয়ার কথা নয়, নেহাৎ পারিবারিক একটা যোগাযোগ ছিল। কলেজে গৌতম সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে। সত্তর দশকের আন্দোলনের ক্ষীণ রেশটুকু, আশির দশকের মাঝামাঝি, সামান্যভাবে হলেও যে কজন যুবকের মধ্যে টিঁকে ছিল, গৌতম ছিল তাদেরই একজন। পরের দিকে, খুব স্পষ্টভাবে না হলে, যোগাযোগটা রয়েই যায়। কিন্তু য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষার পর, দীর্ঘদিন ও বসেছিল বেকার অবস্থায়। বাড়িতে মা আর ছোট বোন। বছর দুয়েক শুধু হন্যে হয়ে ঘুরেছে চাকরির জন্য। তখন কি ও জানতো যে, একদিন ওকে এই অফিসেই কাজ করতে হবে? যারা সরাসরি ওদের বিরোধিতা করে, রাজনীতি করার সময় যাদের ও শত্রুপক্ষের লোক বলে মনে করত? কিন্তু আজকে আর এসব ভেবে কি লাভ হবে! ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, ওকে যে কোনো চাকরিই

নিতে হতো। এ নিয়ে ওর দুয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কিও হয়েছে। কিন্তু চাকরিটা না নেয়ার মতো বিলাসিতা করার সুযোগ ছিল না। পাশাপাশি একটা প্রতিরোধের চিন্তাও গৌতমের মনে ছিল। ওখানে কাজ করেও নিজের অস্তিত্বটাকে টিঁকিয়ে রাখবে। যে কোনো কাজ ওকে দিয়ে করানো চলবে না। এখন, এই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে, এসব কথাগুলো সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ঘুরে যায় গৌতমের মনে। উত্তেজনায় হাতের সদ্য-ধরানো সিগারেটটা পা দিয়ে পিষতে থাকে।

সামনের দরজাটা বেশ বড়। তার একপাশে লেখা আছে 'স্বাগতম'। দরজাটা আস্তে ঠেলে গৌতম ভেতরে ঢোকে। প্রকাণ্ড একটা ঘর, প্রায় হলঘরের মতো। পুরো ঘরটা সুদৃশ্য কার্পেট দিয়ে মোড়া। একপাশে সোফা দিয়ে ঘেরা ছোট জায়গাটার মাঝখানে সেণ্টার-টেবিল। টেবিলের ওপর ফুলদানি আর কিছু কাগজপত্র। কয়েকজন বিদেশী শিল্পীর আঁকা দেয়ালজোড়া ছবি। গৌতমের মনে হয়, ও বুঝি ময়দানবের রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের বাঁদিকে একটা বড় টেবিলের ওপাশে বসে আছে একজন কোলকুঁজো, টেকো লোক। মাথাটা অল্প ঝুঁকিয়ে, একমনে ফাইল দেখছে। তার ঠিক মাথার ওপরে একটা পোস্টার। একটা সিংহ পরম শান্তিতে বসে আছে। তার কোলের কাছে দুটো বাচ্চা সিংহ। তলায় লেখা—'নো পলিটিক্স স্যার'।

ঘরে আর কোনো লোক না থাকায়, গৌতম লোকটার দিকে এগিয়ে যায়। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা মুখ তুলে। 'কি চাই'? গৌতম ওর হাতের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা এগিয়ে দেয়। কয়েক সেকেণ্ড দেখেই লোকটা প্রশ্ন করে—'গৌতম রায় কি আপনার নাম?' মাথাটা নাড়তেই লোকটা আবার ঝুঁকে কাগজটা দেখতে থাকে। তারপর তলার ক্যাবিনেট থেকে বার করে আনে নতুন একটা ফাইল। গৌতম দেখে, ওপরে লেখা আছে 'এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট'। অনেকক্ষণ ধরে লোকটা হাতের কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে কিসব দেখে। সামনে একটাই মাত্র চেয়ার। সেটাতে বসে গৌতম ঘরটায় চোখ বুলোতে থাকে।

'ঠিক আছে। আপনি এই দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে যান। সেখানেই সব জানতে পারবেন'। কথাগুলো বলেই লোকটা গৌতমের দিকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা বাড়িয়ে দেয়। গৌতম একটু অবাক হয়। এই ঘরে যে আরও একটা দরজা আছে, সেটা এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি। এখন দেখতে পায়,

লোকটার ঠিক পেছনেই একটা দরজা রয়েছে। হঠাৎ মনে হয়, কাগজপত্রের আড়ালে লোকটা বোধহয় ওকে ভালভাবে লক্ষ্য করছিল। হাবভাব কেমন সন্দেহজনক। গৌতম ঠিক এধরণের আচরণে অভ্যস্ত নয় বলেই হয়তো খারাপ লাগছে। ও নিচুগলায় 'ধন্যবাদ' বলে লোকটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়েই, সামনে অনেকটা লম্বা বারান্দা। জায়গাটায় খুব বেশি আলো নেই। সকালবেলার আলো এখানে প্রবেশের অনুমতি পায়নি। দুপাশে কাঠের পার্টিসন। একটু দূরে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাদের পেছনে রেখে গৌতম এগিয়ে যায়। একটু গিয়েই বারান্দাটা শেষ হয়ে গেছে। বাঁদিক দিয়ে সরু প্যাসেজ। সামনেই একটা দরজা। গৌতম

একমুহূর্তে ইতঃস্তত করে হাতলে হাতটা রাখে। সামান্য চাপ দিতেই দরজাটা খুলে যায়। গৌতমের তখন ভেতরে না ঢুকে উপায় থাকে না। ঢুকতেই দেখতে পায়, এই ঘরটাও বেশ বড়। ওর পেছন দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে আছে কয়েকজন যুবক-যুবতী। আর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক। সকলেই বেশ আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনছে। গৌতমকে কেউ লক্ষ্যই করে না। ও ঘরের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ও শুনতে পায় ভদ্রলোক বলছেন—"মনে রেখো, সাংবাদিকতায় একটা জিনিষ খুবই দরকার। একটা ঘটনা দেখে, তুমি লেখায় কোন্ বিষয়টার ওপর জোর দেবে, এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই। পাঠক যা জানতে চান, তুমি তাঁর আগ্রহের ওপর লক্ষ্য রেখে, শুধু সেই বিষয়টাই তোমার লেখাতে আনবে। এই ধরো, কয়েকদিন আগেই বিহারের অরোয়ালে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। এই ঘটনার কয়েকমাস পর, ধরো, আজকে তোমাকে বলা হল, অরোয়ালে গিয়ে সেই ঘটনার প্রভাব সম্পর্কে বড় স্টোরি লিখতে। এখন তোমরা কি করবে? অরোয়াল নিয়ে মানুষ সবই জেনে গেছে। তাদের হত্যাকাণ্ডে আমরা সকলেই দুঃখিত। তাই এখন গিয়ে তুমি কিন্তু ঘটনার কার্যকারণ খুঁজতে বসবে না।"

"আজকে সেখানে গিয়ে প্রথম কাজই হবে, সেইসব মৃত মানুষগুলোর বাড়ির লোকজন এখন কেমন আছেন, তাঁরা কি ভাবছেন, তাঁদের যন্ত্রণাকে ডিটেলে তুলে আনা। কিছু কিছু বামপন্থী কাগজ এই ঘটনাকে শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে। তারা প্রমাণ করতে চায়, এই হত্যাকাণ্ডের ফলে সেখানে কৃষকরা আরও সংঘবদ্ধ হয়েছে, তারা প্রত্যক্ষভাবে শত্রুপক্ষের অশুভ আঁতাত

তথা মূল শক্তিগুলিকে চিনতে পেরেছে। অল বোগাস! কতগুলো নোংরা, হতভাগা কৃষককে মারলে নাকি শ্রেণীসংগ্রাম ত্বরান্বিত হয়! আমাদের কাজটা কিন্তু অন্য। আমরা কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় যাব না। তোমরা গিয়ে এখন মৃতদের বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করবে। তাদের ইন্টারভিউ নেবে। প্রয়োজন হলে গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলবে। ধরো, একজন কৃষকের বাড়িতে গেলে, যে ঐসময় নিহত হয়েছে। সেখানে দেখলে মৃতের বাবা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, হঠাৎ উঠে গিয়ে একটা বাঁশি নিয়ে এলেন। এটা ওর ছেলে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা বাজাত। বৃদ্ধ সেই কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। ঘরের বাইরে তাঁর বিধবা পুত্রবধূ, ছ'মাসের ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। সেও কাঁদছে। এই যে বেদনাদায়ক ছবি, এই যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য, একেই তোমরা লেখার বিষয় করবে। মনে রেখো, আমাদের পাঠকের হৃদয়ের ব্যাথা বুঝতে পারে, শ্রেণীসংগ্রাম বোঝে না। সেখান থেকে বেরিয়ে তুমি যাবে কয়েকজন সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি। তাদের কথাও মন দিয়ে শুনবে। নইলে লেখাটা একেপেশে হয়ে যেতে পারে। তুমি দু'রকম বক্তব্যই লেখায় সাজিয়ে দেবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পাঠকের ওপর। তবে লেখার সূক্ষ্মতায় তুমি তাদের আসল দিকটা ধরিয়ে দেবে।”

গৌতম অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল। শুনতে শুনতে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না ও কোথায় আছে। কথা শেষ হতে গৌতম নিজেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। শরীরটা অবশ লাগছে, মুখে তেতো ভাব। তাকিয়ে দেখে, সকলেই চুপ করে আছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সকলেই বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছে। ওর নিজের মধ্যের প্রতিরোধটা দানা বাঁধতে থাকে। মুখ-চোখ কঠিন হতে থাকে, এমন একটা জায়গায় ওকে কাজ করতে হবে! একবার হাতের এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটার দিকে তাকায়। হায় অরোয়ালের মৃত কৃষক, তুমি কি জানতে যে, কাগজের বাবুরা তোমাদের জন্য এত ভাবে! গৌতম অল্প হেসে ফেলে, ব্যাঙ কি জানে যে তার একটা ল্যাটিন নাম রয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছে, ঐ কথাগুলো আশ্চর্য অমোঘ উপায়ে ওর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও গৌতম সেটা আটকাতে পারছে না। ভদ্রলোক ততক্ষণে, বলা শেষ করে সকলের মুখের দিকে দেখতে থাকেন। যেন কথাগুলো কে কিভাবে নিল, বুঝতে চাইছেন। এদিকে তাকাতেই তাঁর চোখ পড়ে গৌতমের ওপর। ভুরুটা অল্প কুঁচকে ওঠে, চিনতে না পেরে। এগিয়ে আসেন ওর দিকে। ‘কি

ব্যাপার, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।' গৌতম যথাসম্ভব কম কথায় ওর সমস্যাটা খুলে বলে। ঘরের সকলেই তখন ওর দিকে তাকিয়ে। হাতের কাগজটা দেখে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফোটে। 'ও তুমিই গৌতম রায়। আমি বোধহয় ব্যাপারটা জানি। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে পাশের ঘরে। ওখানেই জানতে পারবে সব।' গৌতম দেখে, ও যেখান দিয়ে ঢুকেছিল, ভদ্রলোক তার উল্টোদিকের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। পেছনে গিয়ে ও একটা দরজা দেখতে পায়। 'তোমার সঙ্গে পরে নিশ্চয়ই দেখা হবে'—বলেই ঘরের ভেতরে চলে যান ভদ্রলোক। গৌতম নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসে।

এই ঘরের লাগোয়া আর একটা ঘর। দরজা দিয়ে বেরিয়েই ডানদিকে একটা ঘর চোখে পড়ে। ভদ্রলোক কি এই ঘরেই যেতে বললেন? বেশ অস্থির হয়ে ওঠে গৌতম। এতক্ষণ হয়ে গেল, তবু ও কোথায় যাবে এটাই বোঝা যাচ্ছে না। কিছু না ভেবেই, একটু জোরেই দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়ে। ঘরে ঢুকেই থমকে যায়, এ তবড় ঘরে অনায়াসে টেনিস কোর্ট বানানো যায়। বিশাল ঘরটা কার্পেট দিয়ে মোড়া, ওর ঠিক সামনের দেয়ালেই লেখা 'সম্পাদকীয় দপ্তর'। এবার বোধহয় একটা সমাধান হতে পারে। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, কিছুটা দূরে তিনজন লোক টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি একটা দেখছে। সামনে অনেক কাগজপত্র খোলা। গৌতম এগিয়ে গিয়ে চারজনের পেছনে দাঁড়ায়। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পায় না। শুনতে পায় তাদের মধ্যে একজন বলছেন—"আমরা যদি কাগজ চালাতে চাই, তাহলে উঁচু মহলের কথা তো মেনে চলতেই হবে। দিল্লীর সেই দপ্তর থেকে যখন গোপন সার্কুলার এসেছে, এটাকে অনুরোধ বলাই ভালো, যে পাঞ্জাব ঘটনার রেসপেক্টে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের, শিখদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে, তখন অনুরোধটা আমাদের রাখতেই হবে।"

আর একজন বললেন—'কিন্তু এর কারণটা কি? আর ব্যাপারটা হবেই বা কিভাবে?" প্রথম জন তখন বলে ওঠেন—'হয়তো পাঞ্জাবের সন্ত্রাসের সূত্র ধরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ছোটখাটো একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করতে চান। আমাদের কাজ এখন, এমনভাবে কয়েকটা লেখা লিখতে হবে প্রথম পাতায় ও সম্পাদকীয়তে, শিখরা হিন্দুদের অত্যাচার করছে এমন কয়েকটা ছবি ছাপতে হবে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্ষেপে গিয়ে শিখ-অধ্যুষিত অঞ্চলে লুঠপাঠ

চালায়, খুন জখম করে। তারা স্লোগান দেবে—পশ্চিমবঙ্গে শিখদের থাকা চলবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

সেই তিনজনের একজন, যিনি এতক্ষণ কথা বলেননি, এবার মুখ খোলেন, 'কিন্তু তাতে আমাদের কাগজের কি লাভ হবে?' এবারও উত্তর দেন প্রথম জনই 'লাভ কি হবে, বলতে পারব না। তবে উঁচুমহলকে চটিয়ে তো কাগজ চালানো যায় না। আর মোদ্দা লাভ হচ্ছে, কথাটা না শুনলে বছরে কয়েক কোটি টাকার বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মিঃ ভট্টাচারিয়া, এর পরিণতিটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

তিনজনের কাছেই ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। সকলেই এখন একটা সমঝোতায় আসতে পেরেছেন। গৌতম এতক্ষণ মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। যেন একটা ষড়যন্ত্রের প্ল্যান শুনছে। শোনার সময় একটা ভয় পেঁচিয়ে ধরেছিল গৌতমকে। এখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ওদের সঙ্গে রাজনীতি করত একটা শিখ ছেলে, রুপজিৎ কাউর, ওর মুখটা মনে পড়ছে। কিন্তু ও রাগে ফেটে পড়তে পারছে না, বরং কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। ও কি ফিরে যাবে? ধুর, দরকার নেই এসব ঝামেলার। তারপরই নিজের মনে হেসে ফেলে। ঠিক তখনই একজন ঘাড় ঘুরিয়ে গৌতমকে দেখতে পায়। একটু যেন বিরক্তই হয় দেখে—"আপনি এখানে, এই ঘরে, কি করে এলেন? কেনই বা এসেছেন?" ভদ্রলোকের কথায় অন্য দুজনও পেছন ফিরে গৌতমকে দেখতে পায়। একটু নার্ভাস হয়ে গৌতম একজনের হাতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা এগিয়ে দেয়।

সেই সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে একজন যুবক। বেশ ব্যস্ত হাবভাব। কাছে এসে সেই প্রথম ভদ্রলোককে, যিনি গৌতমের কাগজটা দেখছিলেন, তাকে প্রশ্ন করে—'স্যার'! একঝলক দেখেই ভদ্রলোক গৌতমকে 'এক মিনিট প্লিজ' বলে, ছেলেটাকে বললেন—'বলো'? ছেলেটা বেশ চটপট বলল—'স্যার কালকের ফার্স্ট এডিটোরিয়াল কি যাবে? চিফ্ এডিটার জানতে চাইছেন।' একদম না ভেবেই ভদ্রলোক বললেন—'গতকাল শ্রীলংকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে-গার্ড-অব-অনারের সময় এ্যাটাক করা হয়। তার প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের শ্রীলংকা আক্রমণ করা উচিত। এটাই কালকে এডিটোরিয়ালের বিষয়। আমিই লিখব। অনেকদিন দেশে যুদ্ধ-ফুদ্ধ হয়নি, কি বলো?" অল্প হেসে ছেলেটা 'ইয়েস স্যার' বলে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তারপরই ভদ্রলোক মন দিয়ে গৌতমের কাগজটা দেখতে থাকেন। "ও, আপনার জয়েনিং ডেট আজকে? এই অফিসে? ও. কে. আপনি এই দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে একটা ঘর দেখতে পাবেন। সেখানেই আপনাকে ডিটেলে সব বলে দেবে।" গৌতম হাত বাড়িয়ে কাগজটা নেয়। তারপর ওদের পাশ দিয়েই, ঘরের এককোণে ভারী পর্দাটা ঠেলে বেরিয়ে আসে।

মাথাটা অনেকক্ষণ ধরে ঝিম্‌ঝিম্ করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার জায়গাটায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ খুলেই কিছু দেখতে পায় না। পুরো বাড়িটাকেই মনে হচ্ছে কাফ্‌কার সেই 'ক্যাসল্', যেখানে ঢোকা গেলেও বেরোবার সব পথ বন্ধ। গৌতম একটু এগিয়ে সামনের ঘরটায় ঢোকে।

এ ঘরটা তেমন বড় নয়, কিন্তু একইভাবে সাজানো। একদিকে ডাঁই করা আছে অনেক ফাইল, বাতিল কাগজ-পত্তর। ঘরে দুটো টেবিল, একটাতে কেউ নেই। অন্য টেবিলটা ঘিরে তিনজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের ওপাশে একজন টাকমাথা, অথচ সুপুরুষ লোক বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, বেশ দায়িত্বসম্পন্ন পোষ্টে কাজ করেন। গৌতমের ভেতরটা প্রচণ্ড অস্থির লাগছে। এখানে আসার পর আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। কিন্তু এখনও ও কোথায় যাবে, সেটাই ঠিক হল না। কিন্তু রাগ করে এখানে কিছু হবে না। বুঝতে পারে, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। অযথা রাগ করলে এখানে পাত্তা পাওয়া যাবে না। ও ধীর পায়ে এগিয়ে যায় টেবিলটার দিকে। ওরা মগ্ন হয়ে কিছু আলোচনা করছেন, গৌতম গিয়ে তিনজনের পাশে দাঁড়ায়। কথা বলার সুযোগ খোঁজে। ভদ্রলোকের সামনে একটা লেখা পড়ে আছে। হঠাৎ ভদ্রলোক বলে ওঠেন—"প্রদোষ, তোমার লেখাটার মস্তবড় দোষ হল, লেখাটায় কোনো অ্যাসেসমেন্ট নেই।"

এই তিনজনের মধ্যে প্রদোষ কে, গৌতম বুঝতে পারে না। ভদ্রলোক বলে যান—"তোমাকে লিখতে বলা হয়েছিল বামফ্রণ্টের দশ বছর নিয়ে এবং তাদের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে। কিন্তু তুমি লিখলে একটা কমিউনিষ্ট সরকারের দশ বছর নিয়ে। এই সরকার কমিউনিষ্ট কিনা, আমাদের পাঠকরা তা জানতে উৎসাহী নন। তাহলে দিল্লীতে এতদিন কমিউনিষ্টরাই শাসন করত। আমি তোমাকে বলেছিলাম, বামফ্রণ্টের কার্যকলাপের মধ্যে, এবং তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের মধ্যে কিভাবে লুকিয়ে আছে বাঙালী মানসিকতা, এমনকি তাঁর পোষাকেও; কিভাবে তারা কমিউনিজম ও বাঙালীয়ানাকে মিশিয়ে

দিয়েছেন, এটাই হবে তোমার লেখার বিষয়। এই অ্যাসেসমেন্টটাই তোমার লেখায় নেই। তারা কতখানি বাঙালী, এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমরা বিষয়টাকে ভাবব। পাঠকেরা নেতাদের হাঁড়ির খবর জানতে ভালবাসে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিবৃতির থেকে, তিনি সপরিবারে পুরী গিয়ে কিভাবে কাটালেন, এটাই বেশি জরুরী। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিনা, তাঁর কোনো গোপন দুঃখ আছে কিনা, এসবই হবে তাঁর সম্বন্ধে লেখার বিষয়। তোমার লেখাটা খুবই সাদামাটা হয়ে গেছে। একটু রাজনৈতিক রস মেশালেই লেখাটা দাঁড়িয়ে যাবে। তুমি এটা আবার লেখো।"

একটু থেমে ভদ্রলোক অন্য একজনকে বললেন—"আর পুষণ, তোমাকে যে সমর সেনের ইন্টারভিউটা নিতে বলেছিলাম, বামফ্রন্টের দশ বছর উপলক্ষে, সেটা কি তৈরি হয়ে গেছে?" পুষণ দাঁড়িয়েছিল গৌতমের থেকে সবচেয়ে দূরে। সে বলল—"হ্যাঁ, ওটা লেখা হয়ে গেছে। তবে স্যার, একটা কথা আছে। ওনার তো একটা পলিটিক্স আছে। আমাদের কাগজকে অনেকবার সরাসরি গালাগালও দিয়েছেন, ওনার ইন্টারভিউ কি যাবে?"

এবার ভদ্রলোক স্মিত হেসে উঠলেন—"তুমি কি মিন্ করতে চাইছো, আমি বুঝতে পারছি। তবে তোমার কাছে এটা আশা করিনি পুষণ। ওনার নিজস্ব পলিটিক্স আছে, হতে পারে সেটা আমাদের বিরোধী, তবু মনে রেখো, ওনার একটা বাজারও আছে। লোকে এখনও সমর সেনের লেখা পড়তে চায়।"

গৌতমের সামনে থেকে যেন অদৃশ্য জগতের স্তরগুলো একটার পর একটা খুলে যাচ্ছে। মনে পড়ছে ওর রাজনীতি-জীবনের কথা, কত সরলভাবেই না ওরা সবকিছু ভেবে এসেছে। এই হাতটা যেন কতই ছোট, কেবলমাত্র আটকে থাকবে ছোট এই বাড়িটার মধ্যে! কিন্তু আশ্চর্য! গৌতম এসব শুনেও আর রাগতে পারছে না। ওর রাগ হচ্ছে না, আর ভেতরের প্রতিরোধ শক্তিটাও কেমন নিস্তেজ হয়ে আসছে। ও যেন শত্রুদুর্গে বন্দী! চোখের সামনে সব অস্পষ্ট হয়ে আসছে, মাথাটা ঘুরছে। সেই উদ্যম, উৎসাহ গেল কোথায়; নতুন চাকরি পাওয়ার? বদলে শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে। দেহের মধ্যে শুধু অস্থিরতা।

পুষণকে কথাটা বলেই বোধহয় ভদ্রলোকের চোখ পড়ল গৌতমের দিকে। একটু চুপ করলেন। 'কি ব্যাপার আপনার'? গৌতম এগিয়ে গেল টেবিলের সামনে—"মানে, আমাকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। এটা দেখুন।"

কাগজটা দেখে ভদ্রলোক আবার হেসে বললেন—"তোমার একটু ভুল হয়েছে। ঠিক এর পাশের ঘরেই যেতে হবে তোমাকে।" হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন টেবিলের ঠিক পেছন দিকের দরজাটা। তিনজন ছেলে একটু কৌতুহলে গৌতমকে দেখছে। ও ততক্ষণে মরিয়া, এখানেও ব্যর্থ হল? কতক্ষণ আর এভাবে ঘোরা যায়? কিন্তু একটু সংকোচও আছে, এইরকম ভাবে ভ্যাগাবণ্ডের মতো অচেনা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! মাথাটা নিচু করে গৌতম দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

লাগোয়া ঘরটাতে বিরাট একটা টেবিল। পাশের সোফায় বসে আছেন দুজন রাশভারি লোক। একজনকে দেখে সামান্য পরিচিত লাগে, একটু আশ্বস্ত হয় গৌতম কিন্তু কোথায় দেখেছে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায়, ভদ্রলোক ওর ইন্টারভিউয়ের সময় ছিলেন। কথাটা মনে পড়তেই ও এগিয়ে যায়। ভদ্রলোকও ওকে দেখে উঠে এসেছেন। "কি ব্যাপার, এখানে আপনার কি চাই?" গৌতম হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দেয়। একপলক দেখেই ভদ্রলোক বলেন—"ও, আপনিই গৌতম রায়। আপনিই তো অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি খবর পেলুম। আপনার জায়গা তো ঠিক হয়ে গেছে।"

গৌতম খুব আশা নিয়ে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবার তাহলে কিছু একটা সমাধান হবে। একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বলেন— "আমি এইমাত্র অফিসঘরে আপনার ব্যাপারে সব জানিয়ে দিয়েছি। আপনি এখনই সেখানে যান। ওরা সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওয়েলকাম টু আওয়ার এস্টাব্লিশমেণ্ট মিঃ গৌতম রায়।" বলে তিনি গৌতম যেখান দিয়ে ঢুকেছিল, তার উল্টোদিকের একটা চওড়া দরজা দেখিয়ে দেন।

অফিসঘরে ঢুকে গৌতম হকচকিয়ে যায়। প্রকাণ্ড একটা হলঘর। কিন্তু একটাও শব্দ নেই, প্রায় পঞ্চাশজন লোক নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ পরিবেশটা গৌতমের অসহ্য লাগে। তীব্র অস্থিরতায় ও যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘরটার একপাশে একটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা জায়গা। সেখানে একজন লোক বসে। গৌতম তাঁর দিকেই এগিয়ে যায়। অস্থিরতাটা প্রায় তুঙ্গে, মনে মনে ভেবে নেয়, এখানেও যদি অন্য কিছু বলে, তবে ও সোজা ফিরে যাবে ইন্টারভিউয়ের সেই লোকটার কাছে। গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে গৌতম ক্লান্ত। কিন্তু সামনের ভদ্রলোক এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা দেখেই বললেন— 'আপনাকে একটু কষ্ট করতে হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। আপনি

ওই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যান। সেখানেই আপনার চেয়ার পেয়ে যাবেন।' আবার পাশের ঘরে! ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে পড়তে চাইছে। গৌতম দেখে, কাঁচ-ঘেরা জায়গাটার পাশেই একটা সরু দরজা। ও কিছু ভাবতে পারছে না। লোকটার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু ঘরটায় ঢুকেই চমকে ওঠে গৌতম। শক্ খাওয়ার মতো একটা অনুভূতি হয়। এটা সেই ঘর, যেঘরে ও প্রথম এসে ঢুকেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার তো। এতটা পথ ঘুরে ঘুরে আবার এখানেই চলে এল কেমন করে? সেই হলঘরের মতো বিশাল ঘরটা। আগাগোড়া কার্পেট দিয়ে মোড়া। একপাশে সোফা দিয়ে ঘেরা ছোট জায়গাটার মাঝখানে সেণ্টার টেবিল। টেবিলের ওপর ফুলদানি আর কিছু কাগজপত্র। কয়েকজন বিদেশী শিল্পীর আঁকা দেয়ালজোড়া ছবি। সেই—ময়দানবের রাজপ্রাসাদের মতো সাজানো ঘরটা। কিন্তু গৌতম অবাক হয়, ঘরের বাঁদিকের বিশাল টেবিলের ওপাশের চেয়ারে যে কোলকুঁজো লোকটা বসেছিল, সে এখন ঘরে নেই। সমস্ত ঘরটা একেবারে ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। শুধু দেয়ালে সেই পোষ্টারটা ঝুলছে 'নো পলিটিক্স স্যার'। টেবিলের ওপর কাগজপত্র বেশ ভালভাবেই গোছান। পাশে একগ্লাস জলও রাখা আছে।

কিন্তু গেল কোথায় লোকটা? না হলে কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে গৌতম? আর অফিসঘরের লোকটাই বা ওকে এখানে আসতে বলল কেন? এঘরে তো এখন কেউ নেই। গৌতমের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা কাজ করতে থাকে। তবে কি লোকটা না জেনেই ওকে বলল? কিন্তু তাই বা হবে কি করে? এতটা নিশ্চিত হয়ে কি তাহলে বলতে পারে? কিছুক্ষণ গৌতম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ও যেন লোকটার কথার অর্থটা এখন বুঝতে পারছে। মাথার শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করছে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি ছিঁড়ে যাবে। মাথায় হাত দিয়ে ও ফাঁকা চেয়ারটার দিকে একবার তাকায়। ওটা যেন চুম্বকের মতো টানতে থাকে গৌতমকে। গৌতম আর স্থির থাকতে পারে না। একটু একটু করে চেয়ারটার দিকে এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে একমূহুর্ত থমকায়। তারপরই বসে পড়ে চেয়ারটার ওপর।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একটু স্থির হয় গৌতম। জামা-প্যাণ্টটা টেনে ঠিক করে। পকেট থেকে পেনটা বার করে টেবিলে রাখে। পাশের গ্লাসটা থেকে জল খায়। আয়েস করে একবার তাকায় হাতের ঘড়িটার দিকে। টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো একপাশে গুছিয়ে রাখে। তারপর একটা ফাইল টেনে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে।

ঠিক এমন সময়, একজন তরুণ ছেলে দরজাটা অল্প ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢোকে। ঢুকেই কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে টেবিলের দিকে। কাছে এসে দাঁড়াতেই গৌতম মুখটা তোলে। তারপর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে—'কি চাই?'

কাব্যবিরোধিতা ও যতীন্দ্রনাথ

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ঊনিশ শতকের অষ্টম দশকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আবির্ভাব তার বিশ শতকের পঞ্চম দশকে তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি। তাঁর প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। বিশ শতকই যতীন্দ্রনাথের কবিমিলন প্রকাশের পটভূমি। তার ফলে তাঁর কবিতায় মনন-সমৃদ্ধ মেজাজের আয়োজন। যে পর্বে যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার রাজ্যে আবির্ভূত হলেন তখন রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নলোকচারণার মায়াজাল থেকে বাংলা কাব্য মুক্তি পেতে চাইছে। একদিকে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, আর অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুসরণে মুক্তিপ্রয়াসী প্রথমোক্ত কবিকুল, আর দ্বিতীয়োক্তরা রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্তিপ্রয়াসী। 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রতিভূ, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন একটা আলো-আঁধারি সময়, যখন নতুনের ঝিলিক দিচ্ছে জানলায়, অথচ ঘরের মধ্যে জড় হয়ে আছে পুরোনো আসবাবপত্র, ভারি, অনড়, মমতাময় অভ্যাস।'[১] মোহিতলাল মজুমদারের 'স্মরগরল' (১৩৪৩) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' (১৩৩০) প্রকাশিত হয়েছে। যতীন্দ্রনাথের সর্বসমেত ছয়খানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের মধ্যে তাঁর 'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০) এবং 'সায়ম' (১৯৪০) প্রকাশিত হয় এবং যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'ত্রিযামা' (১৯৪৮) প্রকাশিত হয়। অবশ্য কবিরূপে যতীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে; ১৩১৭-এর 'প্রবাসীর' মাঘ সংখ্যায় তাঁর কবিতা 'শীত' কবিতা প্রকাশিত হয়। 'শীত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'বৈশাখ' কবিতার আঙ্গিকগত অনুসরণ লক্ষ্য করা গেলেও, যতীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়। শীত ঋতু

উপলক্ষ্য করে যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কথা ভাবছিলেন—'হি হি কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে সন্ সন্ নিশ্বাসে তোমার, / শীত ভয়ংকর। / আকর্ষিছ মরণের পানে, শবাসন কে গো যোগীশ্বর।' অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের কবিতার দৃষ্টিভঙ্গীতে তখনই কাব্যবিরোধিতা সুরু হয়েছিল। সমকালীন অন্যান্য কবিদের মত যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে মগ্ন হননি অথবা কবিদের মত শব্দ-ছন্দ-অলংকারের মোহে পর্যবসিত হননি।[৫] যতীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নজরুল এসেছিলেন ১৩২৭-২৮-এ; যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালে আর নজরুলের 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। 'ঝরাপালকে'র কোনো কবিতাতেই অভিনবত্ব নেই; কাব্যটির বিশেষত্ব ছিল অন্যত্র—চিত্রণসামর্থ্যে। যতীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলাকাব্যের এই খণ্ডচিত্র যতীন্দ্রনাথের কবিতা-দর্শন বিচারের সহায়ক শর্ত বলে তা উপস্থাপিত করা হল।

॥ ২ ॥

যতীন্দ্রনাথের কবিতাদর্শন কাব্যবিরোধী; প্রচলিত কাব্যাদর্শের ঝোঁকে না পড়ে যতীন্দ্রনাথ কবিতার নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চাইলেন। 'রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম, ধ্যানী মনের ব্যাপক প্রভাব থেকে তরুণ কবিদের চেতনা তখন নির্গম খুঁজছিল। সেই নির্গমাভিপ্রায় সার্থক হলো নজরুলের আবেগে, —যতীন্দ্রনাথের খেদে-পরিতাপে-নৈরাশ্যে।'[২] যতীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক নগণ্য, তুচ্ছ বস্তুকে বেছে নিলেন; ব্রাত্য শব্দের ব্যবহারে কাব্যকে প্রোজ্জ্বল করলেন; চিত্রকল্পে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটালেন। যতীন্দ্রনাথ কাব্যবিরোধী কবি, কেননা ১৯২৫-৪৮ পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথের যে পারিপার্শ্বিক জীবন ভাঙা-গড়া, বেদনা-বিরুদ্ধতায়, স্বপ্ন-স্বপ্নহীনতায়, আশা-আশাভঙ্গের বেদনায় পারস্পরিক বৈপরীত্যে আবর্তক্ষুব্ধ ও জটিলতাকেই তিনি কাব্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। এমন এক পারিবেশিক পরিবেশে কবি লালিত হয়েছিলেন যে কাব্যের বিলাসিতা করার মানসিকতা তাঁর ছিল না; তিনি ব্রাত্য শব্দের 'কড়া-হাতুড়িতে' রোমান্টিকতার আবেশ ছিন্নভিন্ন করতে চাইলেন। তাঁর কবিতায় প্রতিভাসিত হলো মিস্টিসিজম ও রোমান্টিকতা বিরোধী সহজ বস্তুবাদী, মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গী। কল্পনার সৌন্দর্যে গিল্টি করা সমকালীন কাব্যের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের জেহাদ ঘোষিত হল। যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে প্রবাদপ্রতিম সেই স্মরণীয় কাব্য-পংক্তিতে—

'কালোকে দেখাবে কালো করে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো / পুড়ে উড়ে যাবে যাজারের যত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো'।

॥ ৩ ॥

যতীন্দ্রনাথের কবিতার অবলম্বন রুক্ষ, ধূসর, বেদনাকীর্ণ, দুঃখদীর্ণ, ব্যঙ্গাকীর্ণ জনপথ; রবীন্দ্রনাথের বিপ্রতাপে তাঁর অবস্থান। তিনি রবীন্দ্রদ্রোহিতার আয়োজন করেননি; করেছিলেন রবীন্দ্রশাসিত পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণ—আর সেই চেতনার প্রকাশ তাঁর প্রখ্যাত 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার ষষ্ঠ ঝোঁকে—'কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ ঘন বহে দেখি শ্বাস, / বারোমাস ঘেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস! / সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি, / প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা-কাঁদা গলাগলি'। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের 'মোহমুদ্গর' এবং নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতা দুটিও উল্লেখ্য। যতীন্দ্রনাথের প্রকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেননি; সারাজীবন তিনি পদ্যছন্দের কবিতা রচনা করেছেন। গদ্য কবিতাও তিনি লিখেছেন—'বাইশে শ্রাবণ', 'দেহান্তরিত' ইত্যাদি। ছন্দ ব্যতীত তাঁর বিশিষ্টতা হল রুক্ষ, ব্রাত্যশব্দ ব্যবহারে ও চিত্রকল্পের আয়োজনে। সত্যেন্দ্রীয় ও নজরুলীয় শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা তাঁর কবিমানসে অনুপস্থিত; মুখের বুলির প্রয়োগে তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত।

উদাহরণ—১. 'লোহা-বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া / দেখি চলিবার কালে / গতিবিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে।'

২. 'ছেলেরা লাট্টু খেলে / লেত্তিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও করে ছুঁড়ে ফেলে, / বন্-বন্-বন্-ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন-কেতেন সোজা।'

৩. 'বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে।'

৪. 'খাট্‌কে সবে দিনে রেতে / শেষ 'জো'য়েতে রুইব, ব'লে / বেরিয়েছিলাম আজ / হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ি কাজ।'

এই জাতীয় অজস্র মুখের বুলির প্রয়োগ যতীন্দ্রনাথের কবিতা দর্শনের ভিন্নধর্মী সুরের প্রকাশ ঘটায়।

॥ ৪ ॥

যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি বিচারে যতীন্দ্রনাথকে কাব্যবিরোধী কবি বলা হয়েছে। কোনো কবিকে কাব্য-বিরোধী কবি বললে কাব্য ও কবিতার

পার্থক্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কাব্য বলতে প্রচলিত ছন্দ-মিল-চিত্রকল্পের নিয়ম-শৃংখলে বাঁধা ফসলকে বুঝে থাকি। কবিতা হল শব্দের নবতম দিক উন্মোচন, যা অশৃংখলতারই শিল্পিত সংহত কথন, প্রচলিত ছন্দ-মিল-চিত্রকল্প সমস্ত ভাঙার শিল্প। কবিতা ভাষাকে ঠেলে দেয় নীরবতার গহন-গোপনে; সেখানে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ফুটে উঠতে থাকে পাঠকের চেতনায়; কাব্য প্রচলিত ভাষার শব্দকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করে না; কিন্তু কবিতা শব্দকে নতুন তাৎপর্যে মহিমা মণ্ডিত করে। আর এইখানেই শব্দ ব্যবহারের অনিঃশেষ ঐকান্তিকতায় কবিতার রচয়িতা হয়ে ওঠেন কবি; কাব্যকারের সংকীর্ণ বৃত্তে আবদ্ধ থাকেন না। কাব্য যদি হয় বিস্তারের শিল্প তবে কবিতা হল ঘনপিনদ্ধতার শিল্প, সংহতির শিল্প।[৩] যতীন্দ্রনাথ কাব্যকারের বৃত্ত থেকে বহির্গত হয়ে চিত্রকল্পের যে আয়োজন করেছেন সেখানে তিনি কবিতাকারের অনিঃশেষ ঐকান্তিকতায় দীপ্যমান। কবিতা সৃষ্টিতে বাক্যশিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। কবিতায় ধ্বনি সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, সমগ্র কাব্যকর্মে ধ্বনির গঠনগত সমস্যা হল সামগ্রিক অর্থগত সমস্যা। ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সংযুক্তি সার্থক হলে কবিতার চরম উৎকর্ষ ঘটে। যতীন্দ্রনাথ সমগ্র শিল্পকর্মের গঠনগত পূর্ণতার মধ্যে অর্থ ও ধ্বনির সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছেন।—

১. ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে
শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে।

২. যত খুলে যায় পাক
মরণেরই দমে জীবনের ঘড়ি টিক্ টাক্ ঠিক্ ঠাক্।

৩. কঞ্চি ছিঁড়ে আপ্‌সে পড়ে ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে,
টিপ্‌টিপিয়ে বাদল ঝরে ভেজে পাতার প্রান্ত বেয়ে।

৪. যায় বেলাটুকু কাটুক্ দেবতা, ঘুরে আসি ক্ষেতখানা
মইভলা ভুঁই ঘেঁটে ঘুঁটে আনি যা' পাই ধানের দানা।

কাব্য এবং শব্দগত পার্থক্যের সীমারেখা সম্ভবত শব্দগত সীমারেখা। কেননা শব্দগত সীমারেখার দ্বারাই অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে। শব্দই হল কবিতার মাধ্যম এবং কবিতার মধ্যে শব্দের আশ্চর্য সম্ভাবনা ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত শিল্প বস্তু নির্ভর উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশিত উপলব্ধি, অনুভূতি ও বোধের সামগ্রী, তবে অন্যশিল্পের তুলনায় কবিতার

ক্ষেত্র পৃথক কেননা, তার মাধ্যম হল শব্দ। যতীন্দ্রনাথ সেই শব্দকে কবিতায় সুনিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তরল রোমান্টিক কবিদের মত আবেগের, উচ্ছ্বাসের অতিরেক আত্মসমর্পণ না করে তিনি প্রচলিত শব্দকে কবিতার অমোঘত্বে পুনর্নির্মিত করেছেন। দৈনন্দিন ভাষার প্রয়োগে যতীন্দ্রনাথ কাব্যের রোমান্টিক তারল্য থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ যে কাব্যবিরোধী কবি—একথা আঙ্গিকের দিক থেকে ততখানি সত্য নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকে যতখানি সত্য। আঙ্গিকের দিক থেকে যতীন্দ্রনাথ যে সর্বপ্রসঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছেন, তা বলা যাবে না। কেননা শব্দ ব্যবহারও কবিতার আঙ্গিকগত সফলতার অন্যতম কারণ: এবং যতীন্দ্রনাথ সেই শাব্দিক নির্মিতিতে তাঁর সমকালীন কবিদের অতিক্রম করেছেন। তাঁর কবিতায় মননে অবরুদ্ধ ধ্বনিগুলি চেতনার উজ্জ্বল ভূমিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ফলতঃ পাঠকের সঙ্গে সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। এই প্রসঙ্গে 'মরীচিকা' কবিতাগ্রন্থের 'পথের চাকরি' কবিতার উল্লেখ করা চলে—'চৈত্রের ক্ষেত্রে যা ফলিল ফসল / কেটে মেড়ে মেপে দেখি—ওঠেনি আসল / ধূ ধূ করে চারিদিক / তখনো ডাকিছে পিক / নূতনে ও পুরাতনে শুধায় কুশল / আমার যা হয় / কহ-তব্য তা নয় / ক্রিং ক্রিং—সরো ভাই / নহে যে, আছাড় খাই / যা করি চাকরি করি—জয় তারি জয়।'

॥ ৫ ॥

১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় মোহিতলাল মজুমদারের যে চিঠি প্রকাশিত হয় সেখানে সমকালীন বাংলা কবিতার মেজাজ নির্দেশিত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রে মোহিতলাল লিখেছেন—"বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণ-সিঞ্জন, তাহার নটনীলাঙ্গন নৃত্যলীলা ও নূপুরনিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দসমষ্টি, কৃত্রিম নিয়ম শৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ, মানবকণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগম্ভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে টানিয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য কাব্যরস মাত্র বর্জিত অসার অপদার্থ কবিযশঃ প্রার্থীর ঝিল্লীস্বরে বাংলা কাব্যে অকাল সন্ধ্যার অবসাদও নির্জীবতা সূচিত হইতেছে।" যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে এই 'অকাল সন্ধ্যার অবসাদ ও নির্জীবতা' থেকে মুক্তি দিতে প্রয়াসী হলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের নামকরণ প্রসঙ্গেও যে বক্তব্য রাখলেন সেখানে কাব্যবিরোধী চিন্তার প্রকাশ সংলক্ষ্য—"পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে আমি চির

শ্যামল বাংলা কাব্যে মরুভূমির পর মরুভূমি আমদানি কোরে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস কোরেছিলাম।' কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর 'চামড়ার কারখানা' 'ডাক-হরকরা', 'বারনারী', 'চাষীর বেগার', 'পথের চাকরি', 'হাটে', 'বাঁশির গল্প', 'ছাতার কথা', 'বেদিনী' প্রভৃতি বহু কবিতায় বিষয়বস্তুগত ও নামকরণগত বৈচিত্র্য তাঁকে প্রথাবিরোধী কবিরূপে চিহ্নিত করেছে। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের চাকরির অভিজ্ঞতার কথা 'পথের চাকরি' কবিতায় ধ্বনিঝংকারে ও শব্দব্যবহারে দীপ্যমান। 'পুরোনো আমলের বারমাস্যা রীতিতে লেখা কটাক্ষচিহ্নিত এই কবিতায় তিনি পাপিয়া-কোকিলের কথা তুলেছিলেন বটে,—কিন্তু তাঁর কাব্যলোকে যে সব পাখি এসেছিল যুগসন্ধির আনবার অবহেলায় রিক্ততা ফুটিয়ে তুলতে—নতুন ও পুরাতনের মনান্তরের মরু প্রান্তরে।"[8]

যতীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক স্বপ্নবিহ্বলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। প্রকৃতি তাঁর কাছে অস্বীকৃত নয়; তবে প্রকৃতির মোহিনী রূপ তাঁর কাছে প্রতিভাত হয় নি। প্রকৃতি তাঁর কাছে 'বিধুর মুরতি' এবং 'ভরে গেছে খানা ডোবাতে'। শরতের প্রকৃতি যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে মধুর; তখন যতীন্দ্রনাথের বস্তুবাদী দৃষ্টির সামনে—'গুলি কাদাপাঁক করেছ বেবাক্ / জলাশয় ঘোলা-বরণী / পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা / বনজঙ্গলা ধরণী'। যতীন্দ্রনাথের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় হল জীবনমুখিতা। জীবনকে ভালবাসতেন বলেই কবি কাব্যের প্রচলিত পথে লেখনী চালনা না করে কবিতার উপাদান খুঁজে পেতে চাইলেন প্রাত্যহিকতার মধ্যে—'যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস থোড়ে।' যতীন্দ্র সমকালীন বাংলা কাব্যে সুরভিত আনন্দবাদের প্রকাশ তাকে বিচলিত করেছিল। রোমান্টিক স্বপ্নলোক নির্মাণ, অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা, অবাস্তব কল্পনার বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ খড়্গহস্ত হয়ে উচ্চারণ করলেন—'কে গাবে নূতন গীতা / কে ঘুচাবে এই সুখসন্ন্যাস গেরুয়ার বিলাসিতা'? যতীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা কবিতা নতুন জগতের সন্ধান লাভ করল—'যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম এক উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চ'লে এলেও কবিতার জাত যায় না।*** আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত,

প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি আলো-জ্বলা, রেশ-তোলা পংক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা')।[৫]

॥ ৬ ॥

বিষয়বস্তুর দিক থেকে যতীন্দ্রনাথ কাব্যবিরোধী; কেননা, তাঁর কবিতায় উপাদান এসেছে জনজীবন থেকে / 'মানুষ', 'চাষীর বেগার', 'পথের চাকরি', 'লোহার ব্যথা', 'ভাড়াটিয়া বাড়ি', 'বাঁশির গল্প', 'খেজুর-বাগান', 'ফেমিন্‌-রিলিফ' প্রভৃতি কবিতা যেন শ্রমিক-কৃষকের জীবনাভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কবিতা। যতীন্দ্রনাথ এখানে গণজীবনের অভিজ্ঞতার সোপানে দাঁড়িয়ে কবিতার যে দেহগঠন করলেন তা যেন পরবর্তীকালের গণচেতনামুখী কবিতার উন্মেষালয়। 'ফেমিন্‌-রিলিফ' কবিতাটিকে সম্ভবত যতীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা চলে। কবিতাটি বক্তব্যে, চিত্রকল্পে, ছন্দে, শব্দব্যবহারে ও সৌকর্য-স্বাতন্ত্র্যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় সৃষ্টি। ধ্বনির সঙ্গে অর্থের গঠনগত সম্পর্কে 'ফেমিন্‌-রিলিফ' কবিতাটি কবিতার একটি মৌলকাঠামোকে যেন নির্দেশ করছে। বস্তুগত ঐক্যের স্বরূপ যেন ধ্বনি সত্তার সুসংবদ্ধতায় আকৃত হয়েছে। কবিতাটি সামাজিক সত্যের অংশ হয়ে উঠে পাঠককে এক আশ্চর্য অনুভূতির রাজ্যে উপনীত করায়। এখানে প্রত্যেকটি শব্দ স্বমূল্যে উদ্ভাসিত। কয়েকটি শব্দগত উদাহরণের দ্বারা প্রমাণিত হবে কবি যতীন্দ্রনাথ কিভাবে কাব্য-বিরোধী কবিরূপে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 'বিঁড়ে', 'চুব্‌ড়ি', 'হাড়গোড়', 'খুড়ি', 'কপাকপ্‌', 'ঝাঁঝরা', 'ছুঁড়ি', 'ডোঙা' প্রভৃতি শব্দ যেন প্রচলিত শব্দের তুচ্ছতাকে পরিহার করে কবিতার মহৎ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। আলোচ্য কবিতায় ব্যবহৃত মুখের ভাষা কবিতার গভীরে প্রবেশ করে এবং সমকালীন জীবনের স্পন্দন কবিতাটির অঙ্গে অঙ্গে ধ্বনিত হয়। সরলীকরণের প্রক্রিয়া থাকলেই কবিতা প্রচারধর্মী হয়—এই বহু প্রচলিত মতবাদকে নস্যাৎ করে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ সমকালীন সমস্যাকে একটি নান্দনিক বোধে উত্তীর্ণ করিয়ে দেন। ছন্দ ও ধ্বনির তরঙ্গ, সর্বোপরি ব্রাত্য শব্দের ব্যবহার কবিতাটিকে অতিরিক্ত গ্রন্থন। কৌশলের সমীপবর্তী করায় এবং কবিতাটি বক্তব্যধর্মী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থবহ ও সম্পর্কজ্ঞাপক হয়ে ওঠে। পাঠকের সঙ্গে সম্পর্কজ্ঞাপক হওয়াতেই কবিতার চূড়ান্ত সিদ্ধি; আর যতীন্দ্রনাথ সেই সিদ্ধিকে করায়ত্ত করেন বলেই আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। এই কবিতায় কবি শব্দের অমোঘ চরিত্রান্তর ঘটিয়েছেন, এ কবিতাটি যেন বাস্তবতার শিল্পিত পুনর্নির্মাণ—

'কাঁদিসনে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌ গো!
আজ তো কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো।
বুকে পিঠে মাটি চাপে! এ মাটি কে মাপে রে?
হক্‌ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে!
মাপদার! মাপ দাও ও হাতেরি মাপা ওই
নয়নজলের আমি নিমকহারাম নই!'

॥ ৭ ॥

যতীন্দ্রনাথকে নজরুল বা জীবনানন্দের মত চিত্রকল্পের কবি বলা যাবে না; তবে চিত্রকল্পের ব্যবহারে তাঁর স্বাতন্ত্র্য পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না এবং এখানেও তিনি প্রথাবদ্ধ চিত্রকল্পের পথ পরিহার করেছেন। তাঁর চিত্রকল্পে বুদ্ধিপ্রবুদ্ধ নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যবাদ, জড়ধর্মী দুঃখবাদীচেতনা ও গাম্ভীর্যে—বিদ্রূপে মিশ্রিত বিচিত্র প্রকাশ সংলক্ষ্য। তাঁর চিত্রকল্পের কয়েকটি উদাহরণ—

১. মিলন-বিরহ, ভাব ও অভাব, যোগবিয়োগের কাজ
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ।

২. চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে

৩. কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্য ছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা।

৪. নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে;
নদীর বাতাস ছাড়ে নিশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।

৫. পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল
চ্যুত ছায়া-অঞ্চল।

৬. আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে।

৭. বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন্‌ বারাঙ্গনা।

৮. দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে,
ছেঁড়া মেঘ পাতি মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে,
ওঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান;

রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।

৯. চিক্কণ কালো জলে,

মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণসর্পের মতো চলে।

১০. অনন্ত শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা,

তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা শিরায় ঘামীর জ্বালা

গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।

অনেক ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রজ কবিদের বাক্য ব্যবহারকে এক নতুন অর্থে মণ্ডিত করেছেন এবং ভাবের ক্ষেত্রে সেখানেও তিনি কাব্যিকতার বিরোধিতা করেছেন। শব্দসৃজনে যতীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা বাংলা কবিতার আসরে তাকে বিরল স্বাতন্ত্র্যে মর্যাদামণ্ডিত করেছে। মগ্নচন্দ্রা, মৌননাদিনী, চৈত্রান্তিক, কুসুমাক্ত, তপনঘরণী, অপ্রাপ্য প্রেয়সী, মেঘমতী নদী সগণনীরেব, ঋণোজ্জ্বল—প্রভৃতি শব্দ যতীন্দ্রনাথের শব্দ সৃজনেচ্ছার অভিব্যক্তি।

॥ ৮ ॥

যতীন্দ্রনাথের কবিতা যথার্থই 'রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার'। রবীন্দ্র অনুসৃত কবিমণ্ডলীর বাইরে গিয়ে রবীন্দ্র উৎসৃত কবিতার পথ থেকে সরে গিয়ে তিনি একটি নিজস্ব পথ নির্মাণ করলেন। আর সে পথনির্মাণে প্রথাবিরোধী কবিতার জন্ম দিলেন। তাই যতীন্দ্রনাথকে কাব্যবিরোধী কবি বললে বোধহয় আপত্তি উঠবে না। "বাংলা কবিতার চারিত্র্য এই চেষ্টায় ও শক্তিতে যতীন্দ্রনাথ একক ও তুলনাহীন। এইভাবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হয়ে উঠেছেন রৈবিক ও উত্তররৈবিক কবিতার মধ্যবর্তী অনুপম সেতু; কিন্তু শুধু সেতু নয়, একটি স্বাধীন ও আত্মবাহীরাস্তা।"[৬]

১। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: বুদ্ধদেব বসু। কালের পুতুল। কলকাতা। ১৯৫৯

২। কবিতার বিচিত্র কথা: হরপ্রসাদ মিত্র। কলকাতা। ১৯৫৭

৩। দ্রঃ প্রসঙ্গ: ব্রাত্যশব্দ ও যতীন্দ্রনাথ: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় [শতবর্ষের আলোকে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সম্পাদনা অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকান্তি সেন। কলকাতা। ১৯৮৭]

৪। কবিতার বিচিত্র কথা: হরপ্রসাদ মিত্র। কলকাতা। ১৯৫৭

৫। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: বুদ্ধদেব বসু: কালের পুতুল। কলকাতা। ১৯৫৯

৬। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: আবদুল মান্নান সৈয়দ। [দশদিগন্তের দ্রষ্টা] ঢাকা, বাংলা একাডেমী। ১৯৮০

বাইরে যাব না

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

যে যার আপন চৌহদ্দিতে
বেড়াজাল বড় করছি
বাইরে বিস্তীর্ণ মাঠ দূরে লোকালয়
ফিরে দেখছি না
কেন ?
এ আমাদের উত্তরাধিকার
বেশি বেশি জল
বেশি হাওয়া
আমার ফুসফুস ভরবে একান্ত আমার
কার এই ঐতিহ্য চলেছে
ছিঃ ছিঃ ইতিহাস জানো না
এ ঐতিহ্য ডুয়েল যুদ্ধের
জালজালিয়াতি করলে মৃত্যুদণ্ড
খুন করলে সাতবার মাপ
এ আমার গণতন্ত্র ভদ্র পোষাকের
চিট ধরা জামা থাকবে না
জুতোর পালিশ ঠিকরাবে
টেরিকাটা
আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে
হাতে বেলফুল
কাগজের রঙিন শিকলে বাঁধা পড়ে আমার জন্মদিন
ক্লিক ক্লিক ছবি ওঠে
স্তুতিপাঠ এখানে ওখানে

বাইরে নিরন্ন বৃত্তিহীন
সে ত বাইরে
এসো আমরা ঘরের ভেতরে
দাবা খেলি
পাশার দান দিই
বাইরে বেরোলে পরে
পাঞ্জাবীর ভাঁজ ভেঙে যাবে
পা স্পর্শতে লেগে যাবে ধুলো
বাইরে যাব না
ভেতরে নিশ্চিন্ত আশ্বাস
বাইরে ভয়।

ম্যাপ

আনন্দ ঘোষ হাজরা

আজকাল ম্যাপ দেখতে বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমে, যেখানে হায়দ্রাবাদ লেখা থাকার কথা সেখানে দেখছি লেখা রয়েছে উগাণ্ডা বা কেনিয়া। যেখানে গুন্টুর থাকার কথা সেখানে দেখছি রিও-ডি জেনিরো। এই সব ভুলভাল দেখতে দেখতে এখন আমি এমন একটা মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছি যে এখন ম্যাপ বই খুললেই ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠছে। একদিন দেখতে পেলুম ভূমধ্যসাগরটা শুকিয়ে খট-খট করছে আর তার থেকে খুঁটে খুঁটে নুন তুলছে ইটালী আর গ্রীসের সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা। আটলান্টিকের জল মরক্কো আর স্পেন যেখানটায় ঠেকে আছে, ঠিক সেখানটাতে খুব জোরে ধাক্কা মারছে। কী তার গর্জন, কী তার উচ্ছ্বাস! হাজারটা ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত যেন একসঙ্গে গর্জে উঠছে। খুব অবাক হয়ে ভাবলাম এখানটায় তো জিব্রাল্টার প্রণালী থাকার কথা! কোথায় গেলো? আর তখনই দেখতে পেলাম, সমস্ত সামুদ্রিক ফাঁকগুলো জোড়া লেগে সমস্ত পৃথিবীটা একসঙ্গে তাল পাকিয়ে প'ড়ে আছে আর চারদিক জুড়ে কেবল সমুদ্র আর সমুদ্র। মাডাগাস্কারের লেমুরগুলো ভারতের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করছে। ভারতবর্ষের ময়ূরগুলো নিউইয়র্কের রাস্তায় পেখম তুলে জোর নাচ লাগিয়েছে। আফ্রিকা, ইরান আর ভারতবর্ষের কোনো জায়গাই

দেখতে পাচ্ছি না; কেবল অরণ্য আর অরণ্য। আবার কিছুক্ষণ পরেই দেখি জিব্রাল্টার দিয়ে জল ঢুকছে, জল ঢুকছে সুয়েজে, মোজাম্বিকে, লোহিত সাগরে। জল ঢুকছে দার্দানেলিসে, বসফোরাসে। ভূমধ্যসাগরের ছ হাজার ফুটের গভীর খাল ভ'রে যাচ্ছে নীল জলে। খনিজ পদার্থগুলো উপচে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ জুড়ে; আর বন্যার ভয়ে ছুটে যাচ্ছে মানুষের দল জাগ্রোস পাহাড় ছাড়িয়ে তাই গ্রিসের দিকে, সিন্ধুনদের দিকে, গাঙ্গেয় সমভূমির সরসতায়। ভাবছি এ আবার কী কাণ্ড ঘটছে। এমনতো কখন দেখিনি, শুনিনি? ঠিক তখনই···আমার বিস্ময়াহত মুখের দিকে তাকিয়ে টাঙ্গানাইকা হ্রদের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা ঘোর জঙ্গলের মতো কালো মেয়ে জলে থাপ্পর মেরে হেসে উঠলো। সেই হাসির রেশ এখন আমার সত্তায় ···সেই হাসির বিস্তার আজ পৃথিবী জুড়ে।

আর না

মতি মুখোপাধ্যায়

ফ্যানটম জেটের গতিতে আমার তুলি টানল কয়েকটি রেখা
মুহূর্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল একটা গাছ
স্প্রিঙের চাপে ছিটকে পড়ল তার ডালপালা
শরীরময় রোমের মতো সবুজ পাতায় ছেয়ে যেতে
ফাঁক-ফোকরে উঁকি দিল কয়েক কুচি আকাশ;
নিচে বুনো লতাপাতা ঘাস আর মাটি,
বড়বাড়ির গাড়িবারান্দার মতো উদাসীন একফালি ছায়া
যেখানে ঘুমিয়ে রইল পরিশ্রান্ত কয়েকটি ভিখিরী ও কুকুর।

এ পর্যন্ত কেউ কিছু বলল না, যেই গাছটার ডালে
মাঝরাতের স্বপ্নের মতো
কোথা থেকে উড়ে এল একটা রঙিন বুলবুলি
অমনি কে যেন আড়াল থেকে বলে উঠল, থাক ঢের হয়েছে
এতদিন শিল্পের নামে অনেক অপমান করেছেন নিজেকে
আর না।

ভাঙন

অজিত বাইরী

ভাঙন শুরু হলে সে ভাঙন রোখা দায়।
ভাঙন শুরু হলে ভেঙে যায় সঙ্ঘ, সভা।
ভাঙন শুরু হলে ভাঙতে ভাঙতে
একটি বিশাল দেশের মহৎ মানচিত্র
ছোটো ছোটো নুড়ির মতো টুকরো টুকরো হয়ে যায়।
সেই টুকরো টুকরো মানচিত্রের উপর
ক্রমে ক্রমে ভাঙতে থাকে মানুষ।
ভাঙতে থাকে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ববোধ,
ভাঙতে থাকে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে
উত্তাল জনসমুদ্রের একাত্ম-চেতনা।
ভাঙন শুরু হলে একটি মানুষও
ভেতরে ভেতরে নিঃস্ব হয়ে যায়।
দ্বীপের একাকিত্ব ও নির্জনতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
খুচরো পয়সার মতো খরচ হয়ে যায় সব মূল্যবোধ।

ডাক

সনৎ মান্না

সম্বোধন ভেসে এল সম্রান্ত ভীষণ
কে যেন ডাকল কাকে চেঁচিয়ে গম্ভীর।

রাস্তায় আর কেউ ছিল না যেহেতু
বুঝলাম আমিই কমরেড।

ফিরে দেখি ঈষৎ টলছে
গালে চাপ দাড়ি, হাতে বালা, আমাদের পাড়ার বিপ্লব।

নতুন এসেছি

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

আমাকে চেনেনা কেউ ঃ কেউ চেনে না;
এই গাঁয়ে নতুন এসেছি।

ব্যস্ত মানুষজনে যেতে যেতে দেখছে আমাকে ;
ওইতো নদীর চর ঃ ঝিকমিক জল
বালিয়াড়ি ;
খেয়াঘাটে নৌকোর ছায়া ঃ
নদীর দুপার জুড়ে আলুভুঁই, সরষের ফুল—
কেমন চমৎকার দুলে দুলে
ডাকছে আমাকে।

মনসাবেদীর পাশে একরোখা শীর্ণ কদম ;
তার পাশ দিয়ে এই
ধুলো ওড়া আঁকা বাঁকা পথ ;
নদীর ঘাটের দিকে হেঁটে যাওয়া ব্যস্ত মানুষ—
দেখতে দেখতে আজ
পেরিয়ে যাচ্ছি এই গ্রাম ঃ
দামাল মোষের পাল ঃ
শব্দের কারুকাজ ছবি।

আমাকে চেনেনা কেউ ঃ কেউই চেনেনা ;
এই গাঁয়ে নতুন এসেছি।

এ কার মুখোশ

মেঘ মুখোপাধ্যায়

এ কার মুখোশ

আমার মুখের পরে
কে তার মুখোশ খুলে রেখে গ্যাছে

পোস্টারের মতো
এই মুখোশের ভ্রান্ত ইশতেহার
আমার যে ভারী লাগে
মন ভার লাগে

মুখোশের প্রতি যেন মুখগুলি ঢলে আছে
আসক্তির বেলেল্লাপনায়
কেন এই সংজ্ঞাহীন শহরের জাতুপ্রবণতা !
যে লটকে দিয়ে তাকে বিদ্ধ করে।
বলো, এ মুখোশ এক্ষুনি তুলে নিয়ে যেতে

সভ্যতার সন্তাপের শেষে
আমাদের অনিবার্য স্পন্দমান মুখ প্রয়োজন
তখন তোমার মুখে যতো খুশি চুমো খাবো
মুখের প্রান্তর জুড়ে
স্তরে স্তরে আনাচে কানাচে দুরন্ত ওষ্ঠে দাপাবো

এ আবিল মুখোশ ছোঁব না

বৃত্তের ভিতরে আছে

সুজিত সরকার

বাহিরে কিছুই নেই,
সব আছে বৃত্তের ভিতরে।

ছোট হ'তে হ'তে বিন্দু হ'য়ে যে পাখি মিলিয়ে যায়
দূর নীলিমায়,
সে কিন্তু একইভাবে থাকে
আরেক আকাশে।

ছেঁড়া জামা, খালি শিশি-কৌটো
—তাও খুব কাজে লাগে,
বাড়ী এসে কেউ কিনে নিয়ে যায়।

যারা চলে যায়—বন্ধু, পরিজন—
তারা কেউ কোথাও যায় না,
তারা আছে, সকলেই আছে,
বৃন্তের ভিতরে।

রোমন্থন

রেজাউদ্দিন স্টালিন

আয়না করে রেখেছিলাম গভীর কিছু স্মৃতি,
টানতে হলো নতুন করে হারানো উদ্ধৃতি।

পুরানো সব পথের রেখা খুঁজে কি আর পাবো,
আঁধার ভরা অথৈ জলে শুধুই কি সাঁতরাবো?

অচিন পাখি খাঁচায় ছিলো উড়াল দিলো কবে,
কেউ রেখেছে স্মৃতিতে মুখ, আনন্দ উৎসবে?

আকাশে যার ঠাঁই হলো না কোথা সে ঘর পাবে,
স্বপ্ন মুড়ে রাখবে কি সে বাতাসে কি খাবে?

ছিন্ন পালক বিরাণ মাঠে একলা ধু ধু করে,
পথিকও যায়, প্রভুরা যায় পালক অনাদরে—

পাখির জন্যে হু হু করে; উড়তে গিয়ে একা
অন্ধকারে হাতড়ে মরে পায় না কারো দেখা।

সময় এসে আছাড় মারে আয়না ভেঙে গুড়ো,
স্মৃতিরা ফের কুড়িয়ে খায় শ্মশানে খুদকুঁড়ো।

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক

সৌরি ঘটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের চোখের সামনে ছুটো শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে।

খৃষ্টাব্দ শেষ হতে আর মাত্র বার বছর বাকি। বঙ্গাব্দ শেষ হতে বাকি মাত্র পাঁচ বছর।

ভাবতে গেলে মনের ভেতরে একটা শিহরণ জাগে। শেষ হয়ে যাচ্ছে পুরো একশোটা বছর। এ দেশের ইতিহাসে অতীতের যে কোন শতাব্দীর চেয়ে এই একশোটা বছর সবচেয়ে ঘটনাবহুল, সংঘাত-জর্জর, কলরব মুখর, সবচেয়ে বেদনাবিদ্ধ, সবচেয়ে স্মরণীয়।

এই উপমহাদেশের মানুষের জীবনে এ-রকম সুদূরপ্রসারী, প্রভাব বিস্তারকারী শতাব্দী এর আগে কখনও আসেনি।

কত স্বপ্ন জন্ম নিয়েছে এই শতাব্দীতে, কত স্বপ্নের সমাধি হয়েছে। কত কথা সোচ্চারে বলা হয়েছে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। কত ধ্বনি চিরকালের জন্য অস্ফুট রয়ে গেছে। কত জ্বালানো দীপ নিভে গেছে, কত অন্ধকার গভীরতর হয়েছে। কত পাওয়ার আশা বুকে নিয়ে প্রতীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু পাওয়া হয় নি। কত উচ্চকণ্ঠ শেষ পর্যন্ত বিদ্রূপের মত শুনিয়েছে। কত হাসির আড়ালে বয়ে গেছে অশ্রুজলের বন্যা। মালা গাঁথতে বসে গাঁথা হয় নি, ফুলগুলো দলিত হয়েছে, আশা নিয়ে ঘর বাঁধতে গিয়ে শিশুর মত খেলাঘর ভাঙা হয়েছে বসে বসে।

মধ্যযুগে ইউরোপে বিরোধ মীমাংসার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের চল ছিল। ছুই প্রতিপক্ষ অস্ত্রহাতে উন্মুক্ত ময়দানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে একে অপরকে হত্যা করে জয়ী হত।

এ শতাব্দীও যেন অনেকটা সেইরকম। ছুই পরস্পর বিরোধী মতবাদ, ছুই পরস্পর বিরোধী আদর্শ, বিভিন্ন ধরনের ভাবনা-চিন্তা একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মরণপণ লড়াই করেছে এবং এখনও করে চলেছে। এ লড়াই এখনও অমীমাংসিত। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত হার-জিত এখনও নির্ধারিত হয় নি। লড়তে লড়তে একপক্ষ সাময়িকভাবে পিছু হটেছে, আবার দ্বিগুণ বল সংগ্রহ

করে উঠে এসে প্রতিপক্ষকে হটিয়ে দিয়েছে। এমনি আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের পালা বয়ে চলেছে অব্যাহতভাবে। এ লড়াই আপসহীন, সুতরাং এর মাঝে সন্ধির কোন শর্ত বা সম্ভাবনা নেই। এ লড়াই তাই চলছে—চলবে।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ আমাদের।

প্রথমার্ধের নায়ক ছিলেন অন্যরা। তাঁদের স্বপ্ন ছিল অন্য, জীবনের মূল্যবোধ আলাদা, কর্মপদ্ধতি আচার আচরণ সব কিছুই ভিন্ন ধরনের।

তাঁদের চাওয়া এবং পাওয়া কোন কিছুর সঙ্গেই আজকের চাওয়া-পাওয়ার পুরো মিল নেই।

তাঁদের সম্পর্কে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের কথা উধৃত করে বলা যায়—

"তারা গেছে শুধু তাহাদের গান
দুহাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান"

তাঁরা শুধু দিয়ে গেছেন।

কিছু চান নি, পানও নি কিছু।

এই কলকাতার পথে যখন হাঁটি তখন অতীতের স্মৃতি অনেকসময় এক বিচিত্র স্বপ্নের ঘোর নিয়ে ভর করে মনের ওপর। হঠাৎ যেন ফিরে যাই অন্য যুগে, সেই ফেলে আসা অতীতের ইতিহাসের পাতায়। ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রতীক হিসাবে রাখীবন্ধন করে বেড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইছেন—

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।"

মেছুয়া বাজারের গলি দিয়ে যখন হাঁটি তখন হঠাৎ কেন যেন মনে হয় আমার পাশ দিয়ে দ্রুতপদে যিনি চলে গেলেন তিনি হয়ত সেই বোমার মামলার আসামী।

শীতের সন্ধ্যায় কোন নির্জন গলিতে গাঢ় ধোঁয়াশার মধ্যে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া কোন কিশোরকে দেখে মনে হয় ক্ষুদিরাম নাকি। মজঃফরপুর যাওয়ার আগে দলের নেতাদের কাছে নির্দেশ নিতে চলেছেন গোপনে ?

সৌম্যদর্শন, গায়ে চাদর জড়ান প্রৌঢ়কে দেখে মনে হয় চিত্তরঞ্জন নাকি ?

কোন বলিষ্ঠ গঠন গৌরবর্ণ যুবককে দেখে বিভ্রম জাগে, নেতাজি নাকি ?

কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ায় ঘুরতে ফিরতে মনে হয় কোন দোকানে পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে আছেন নাকি সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ?

অপরাহ্নে হাইকোর্ট পাড়া থেকে যখন কালো শামলা গায়ে উকিলরা দলে দলে বেরিয়ে আসেন তখন হঠাৎ কেন সেই অসহযোগের যুগের কথা মনে পড়ে। সেই গণপ্রতিবাদের দিনগুলি, যখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন সহযোগিতা নয় বলে উকিল আদালত বর্জন করছেন, শিক্ষক শিক্ষকতা ছাড়ছেন, ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করছে, চাকুরিয়ারা চাকুরি ছাড়ছেন, পথের মোড়ে মোড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, তাতে শুধু বিলাতি কাপড় পুড়ছে না, পুড়ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিশ্বাস, তাদের রাজশক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে আতঙ্ক, তাদের কাছে প্রত্যাশার স্বপ্নবিলাস।

সে এক সময়। আজ দূর থেকে সে দিনগুলোর দিকে তাকালে গভীর রোমাঞ্চে সমস্ত সত্তা যেন কেঁপে ওঠে।

আবার এরই মাঝখানে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আর একদল তরুণ নেমে এল এই রাজপথে। বিজয়ী রুশ বিপ্লবের আদর্শ মার্কসবাদকে এদেশের মাটিতে প্রয়োগ করার স্বপ্ন নিয়ে ত্যাগ, নিষ্ঠা, আন্তর্জাতিকতাবোধ, দেশপ্রেম, শোষিত মানুষের প্রতি ভালবাসা, তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সহনশীলতা দিয়ে তারা জয় করল কোটি কোটি কৃষক, শ্রমিকের অন্তর। এদের সংগঠিত প্রচেষ্টায় রঙ্গমঞ্চে হাজির হল আর একদল মানুষ যাদের পরিচয় বাঙালি, মাদ্রাজি, গুজরাটি কি অসমিয়া নয়, কিম্বা গরিব দীনদুঃখী, বুভুক্ষু নয়, সারা সমাজের কাছে নিজের পরিচয় দিল তাদের শ্রেণী শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মধ্যবিত্ত হিসাবে।

অবাক হয়ে দেশবাসী দেখল তাদের শক্তি। পার্কসার্কাসে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে, রেল, গাড়োয়ান, চা শ্রমিক ধর্মঘটে, ২৯ জুলাইয়ে, নৌ বিদ্রোহে। শুনল তাদের দৃপ্ত ঘোষণা—"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে ছাড়, শোষণহীন নতুন সমাজ গড়তে চাই।"

সেও আর এক রেনেসা। ভিত্তি পত্তন হল আর এক নতুন সংস্কৃতির। এক নতুন গান, নতুন নাটক, নতুন কথা সাহিত্য।

এ সংস্কৃতি হল সমাজের চিরকালের অবদমিত মানুষের সংস্কৃতি। তাদের আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, আনন্দ, দুঃখ, বেদনা ভাষা পেল এই সংস্কৃতিতে।

এতদিন সাহিত্যে নাটকে আসর জাঁকিয়ে ছিল রাজা-মহারাজা জমিদার, ধনী, মধ্যবিত্ত বাবুর দল। এই নতুন রেঁনেসা তাদের হটিয়ে দিল। গল্পে উপন্যাসে নায়ক হয়ে এল চাষী, মজুর, সংগ্রামী মানুষ। পানওয়ালী, বিড়িওয়ালার প্রেমের বর্ণনার বদলে শোষিত মানুষেদের এই প্রতিনিধিরা দাবি জানাল সমাজ পরিবর্তনের।

নাটকে এসে হাজির হল রাম-সীতা কি শাজাহানের বদলে ছিন্নবাস, নিঃস্ব মানুষেরা। তাদের কণ্ঠে বেজে উঠল নতুন সঙ্গীত—"বাঁচব রে, বাঁচব রে মোরা, বাঁচব রে বাঁচব।" যা দেখে শিশির ভাদুড়ীকেও বলতে হল 'এ আমি পারতাম না।'

ভাবতে অবাক লাগে সেই সব দিনগুলির কথা। এই কলকাতার ফুটপাথে সার দিয়ে পড়ে রয়েছে ক্ষুধার্ত মানুষের মৃতদেহ। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ধুঁকছে শিশু, কিশোর, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ। এরা সবাই গ্রামাঞ্চল থেকে প্রাণ বাঁচাতে ছুটে আসা দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষ। বিজন ভট্টাচার্য নামে অখ্যাত, অপরিচিত এক তরুণ নাট্যকার সেই মৃত্যু পথযাত্রী মানুষদের বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়ার কাছে মাথা হেঁট করে কানপেতে সংগ্রহ করছেন তাঁর 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ।

ভাবতে শিহরণ জাগে নিশীথ রাতে সারা কলকাতা যখন গভীর ঘুমে অসাড় তখন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র নামে এক তরুণ তাঁর সাথীদের নিয়ে নির্জন পথে পথে আবৃত্তি করে বেড়াচ্ছেন একটি কাব্য যার নাম 'মধু বংশীর গলি'। দ্রুত হাতে সভার জন্য গান লিখে দিচ্ছেন 'এস মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার।'

দেবব্রত বিশ্বাস হারমোনিয়মের সঙ্গে পাঞ্জা কষে সুর তুলছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার—'রক্তের ঋণ রক্তে শুধব কসম ভাই, ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই।'

হ্যাঁ সেদিন এমনি করেই হয়েছিল এই নতুন জীবনবোধের উদ্বোধন।

তবে এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এ হল গত শতাব্দীর রেঁনেসার স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি। এই হতে হত। এছাড়া অন্যকিছু হতে পারত না।

হ্যাঁ ঠিক তাই।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। আহো। সে কি সময়। চিন্তা করতে গেলে কল্পনা হারিয়ে যায়।

তার আগে কি ছিলাম আমরা? বিশ্বের অন্যতম অধঃপতিত পশ্চাদ্পদ, কুসংস্কারগ্রস্থ একটা জাত। তখন আমাদের বাড়ির আঙিনায়—'ঠিক দুপুর বেলা ভুতে মারত ঢেলা।'

ঢাক ঢোল বাজিয়ে জিয়ন্ত মেয়েকে চিতায় পুড়িয়ে সতীদাহের জয়ধ্বনি দিতাম। তথাকথিত কুলীনরা বিয়ে করত দেড়শো, দুশো করে, আমাদের কুল রক্ষা হত এতে। ন'বছরের 'অক্ষত যোনি' মেয়ের বিয়ে দিয়ে 'গৌরী দান' করেছি বলে উদ্দাম উল্লাস করতাম। নারী নরকের দ্বার বলে শাস্ত্রের বিধান দিতাম, মেয়েদের ঘোমটা কহাত দীর্ঘ হলে অসূর্যম্পর্শ্যা হয় তা নিয়ে কূট তর্ক করতাম, যাত্রার সময় হাঁচি পড়লে কি টিকটিকি ডাকলে কি বিধান নেওয়া দরকার তা নিয়ে গবেষণা করতাম। শিয়াল বাঁয়ে না ডাইনে গেলে ভাল তা নিয়ে ছড়া কাটতাম, জীবন্ত মানুষকে চিকিৎসা না করিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বলতাম 'এ হল অন্তর্জলি যাত্রা, এর পরিণতি মোক্ষম স্বর্গলাভ!'

তখন দেশের বাবুরা ঘুড়ি উড়িয়ে আর বেড়ালের বিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করত, বেশ্যালয়ে রাত কাটাত, স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস ছিল লজ্জার বিষয়। ঘরে ঘরে 'নীর মে মীন পিয়াসীর' মত শত শত বালবিধবা একবেলা নিরামিষ খেয়ে জীবন যাপন করত; আহার, বিহার বসনভূষণ কোন কিছুতে অধিকার ছিল না তাদের, আর এতেই নাকি রক্ষা হত সমাজ। শিক্ষিত ছেলেরা বিলাত থেকে ঘুরে এসে বুক ফুলিয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠত। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলা আলোচ্য বিষয় ছিল রাষ্ট্রের উত্থান পতন নয় নারীর সতীত্ব, কার স্খলিত চরিত্র বিধবা ভ্রাতৃবধূ ভোজের হাঁড়িতে কাঠি দিয়েছে তাকে কি করে একঘরে করা যায় তা নিয়ে সামাজিক ঘোঁট। বৃষ্টি না হলে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া, হিংস্র সাপ না মেরে তার পূজো করা, আর গরুর ল্যাজটা প্রাণপনে চেপে ধরা যাতে মরার পর বৈতরণীটা নিরাপদে পার হওয়া যায়।

হ্যাঁ। এমনি ছিলাম আমরা। ঠিক এমনি। আজ শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক সেদিন এটাই ছিল বাস্তব।

তারপর এল বজ্র নির্ঘোষিত সেই দিনগুলি। মোটামুটিভাবে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বেজে উঠল তার আগমনী। আলাদিনের চিচিং ফাঁকের মত এক যাদুমন্ত্রে আমাদের সামনে খুলে গেল বন্ধ গুহার দ্বার। অজস্র মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্যে ধাঁধিয়ে গেল আমাদের চৈতন্য।

হতচকিত হয়ে গেলাম আমরা। একদল ছেলে সদর্পে ঘোষণা করল,

'মানি না এসব কুসংস্কার। গরু খেলে যদি জাত যায় তবে গরু খাব আর তার হাড় বামুন বাড়ীতে ফেলব।'

ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। চোখে সর্ষের ফুল দেখতে লাগলাম। বলে কি? নরকে যাওয়ার ভয় নেই। মরার পর কি গতি হবে এদের? সমাজ সংসার সব রসাতলে যাবে যে?

কিন্তু মরণ নিয়ে ভাবনা ছিল না ওদের। জীবন নিয়ে ছিল ওদের কারবার। অসীম ঔদ্ধত্যে ওরা পদাঘাত করল সমস্ত কুসংস্কারের মাথায়। দীর্ঘকালের শ্বাসরোধকারী অসহনীয় পরিবেশে ওরা বয়ে আনল বসন্তের হাওয়া। আমাদের জীবন বৃক্ষে ফুল ফুটতে শুরু করল।

কিছুই ছিল না আমাদের। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল কিছুই না। এমনকি একখানা বর্ণপরিচয়ও নয়।

তারপর একে একে সব পেলাম। তৈরি হল গদ্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ। আরম্ভ হল বিজ্ঞানচর্চা। শুরু হল জ্ঞানের সব শাখায় অবাধ বিচরণ।

সে যুগটা ভরা ছিল চমকের পর চমকে। যেন এক আকাশে অনেক সূর্যোদয়। প্রতিটি প্রতিভা আপন দীপ্তিতে স্বতন্ত্র।

কল্পনায় যেমন বলা হয় আকাশ থেকে স্বর্ণবৃষ্টি, আমাদের কাঙালের ঘরে যেন তাই শুরু হল। বিস্ময়বিমূঢ় চেতনা নিয়ে আমরা শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। এ দান আত্মস্থ করার মত শক্তি তখনও অর্জন করি নি আমরা।

এ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত চলল এই জোয়ার। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ধরলে এ যেন একটা শতাব্দী। তারপর চল্লিশের দশক থেকে শুরু হল ভাটার টান। অর্থাৎ এক শতাব্দী। সামনে হাঁটার পর শুরু হল পিছু হটা।

এর আগে পর্যন্ত বেশ চলছিল জীবন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে কোথাও তালভঙ্গ ছিল না। গ্রামে অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লুণ্ঠিত কৃষকবাহিনী, শহরে চাকুরিয়া মধ্যবিত্তের ছকবাঁধা জীবন, মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতন, বাঁধা বাজার দর, দু'টাকা ন'সিকে মণ চাল, পাঁচ সিকে দেড় টাকায় একখানা কাপড়, চার পাঁচ আনা সের মাছ, বার চোদ্দ পয়সা সের সরষের তেল, চার আনা সের রসগোল্লা, কলকাতায় মেসে মাথা গুঁজে বাস করা, ঠাকুর কার

পাতে বড় মাছের টুকরো দিল তা নিয়ে রেষারেষি, পূজোয় দল বেঁধে দেশে যাওয়া, ভাগচাষীদের লুণ্ঠন করে ফসলের ভাগ নেওয়া, গ্রামে জমিদারের কাছারিতে গিয়ে একটু স্তাবকতা করা—এসব যেন একটা ধারা সৃষ্টি করেছিল। অরাজনৈতিক সাধারণ মধ্যবিত্তের এই জীবনযাত্রা প্রথম ঘা খেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধ শুরু হল ইউরোপে, তারপর জাপান যুদ্ধে নামার পর চলে এল আমাদের ঘরের দুয়ারে। মাত্র দুটো ছোট বোমা পড়ল হাতিবাগান আর খিদিরপুরে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কলকাতা ছেড়ে পালানোর পালা। বাঙালি, অবাঙালি যারা কোনরকমে জায়গা যোগাড় করতে পারল তারা ট্রেনে, আর বাকিরা মাথায় পুঁটলি নিয়ে, বৌ বাচ্চার হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে। তখনও পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা আসেন নি। নির্জন জি. টি রোড, বি, টি রোড ধরে মানুষজন, গরুবাছুরের সে এক চলমান জনস্রোত। সংগ্রামী মানুষের মিছিল দেখা যেমন এক সৌভাগ্য, তেমনি এই আতঙ্কিত পলাতকদের মিছিল দেখাও এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

আর একদিকে ঠিক তখনই বিয়াল্লিশের আন্দোলনে দাউ দাউ করে জ্বলছে দেশ। 'ইংরেজ ভারত ছাড়' বলে প্রাণ দিচ্ছে তরুণরা, গ্রামের কৃষক গিয়ে তুলে ফেলে দিচ্ছে রেললাইন, কমিউনিস্টরা জাপানকে রুখতে হবে বলে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলছে সংগঠন, আসামের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে জাপানী সেনাবাহিনী। সেই সময়ে ইংরেজ পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে সমস্ত খাবার সরিয়ে নিল বাংলাদেশ থেকে। শুরু হল হাহাকার। দু'টাকা চালের মণ উঠল একশো টাকায়, তাও ব্ল্যাকমার্কেটে, শুরু হল কিউ, পারমিট রেশন। এ সব শব্দ আগে কেউ শোনে নি। বাংলা ভাষায় সেদিন নতুন সংযোজন হল এদের। ভদ্রলোকদের লাজ-মান ত্যাগ করে লাইন দিতে হল রেশনের দোকানে। একটু কেরোসিনের অভাবে গ্রামে গ্রামে লম্ফ জ্বলা বন্ধ হল। একখানা কাপড়ের অভাবে মেয়েদের বন্ধ হল ঘর থেকে বের হওয়া। ক্ষুধার্ত অধনগ্ন কৃষক পালাতে শুরু করল গ্রাম ছেড়ে। শুধু এক মুঠো ভাতের বদলে কেনা যেতে লাগল দরিদ্র মেয়েদের যৌবন। সহরের পথে পথে শুধু অন্নহীনদের মৃতদেহ। শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিট আসতে হলে অন্তত একশোটা অভুক্ত মৃতদেহ ডিঙিয়ে আসতে হত।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা কারাগারে, শতশত দেশপ্রেমিক বন্দী। বিয়াল্লিশের জের হিসাবে সারা দেশে অঘোষিত সামরিক শাসন। এরই

মধ্যে কমিউনিস্টরা এই বুভুক্ষুদের বাঁচাবার জন্য খুলল লঙরখানা, গড়ে তুলল রিলিফ কমিটি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, জান-প্রাণ দিয়ে তারা এগিয়ে এল আর্ত মানুষের সেবায়।

কিন্তু কিসে কি? সমুদ্র থেকে এক গণ্ডুষ জল নিলেও সমুদ্রের জল কমে না, এক গণ্ডুষ দিলেও সমুদ্রের জল বাড়ে না। ফলে যা হওয়ার তাই হল। পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ বাঙালি মারা গেল না খেয়ে। আর প্রতিটি মৃতদেহে প্রতি মজুতদার, মুনাফাখোররা লাভ করল প্রায় হাজার টাকার মত, আজকের অঙ্কে মৃত্যু প্রতি পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা।

এই হল প্রথম পরাজয়। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল সাধারণ মধ্যবিত্তের ছকবাঁধা জীবন। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল তার আশৈশব লালিত স্বপ্ন। একটা চাকরি, বিয়ে, ছেলেপিলে বড় করা, বড় সাহেবকে ধরে ছেলেকে কোনরকমে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া, মেয়ের বিয়ে দেওয়া, তারপর চাকরিতে অবসর হলে একটু ভগবানের নাম করে পরকালের দিকটা গুছিয়ে নেওয়া—এ সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেল। সেদিন চলে গেল সে আর ফিরে এল না।

চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ইংরেজের চাপিয়ে দেওয়া নকল শান্তির গ্রাম্য সমাজ। যুদ্ধের সময়কার মুদ্রাস্ফীতি, কালো টাকার দাপট, জিনিসপত্রের আকাশচুম্বী দর, গ্রামের সেই বদ্ধ অনড় জীবনযাত্রাকে চিরকালের মত বিদায় করে দিল। আর সেই কলমির শাকের ঝোল দিয়ে দুটো ভাত খেয়ে, কেষ্টযাত্রা কি কবি-পাঁচালির গান গেয়ে গ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার দিন রইল না। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে গেল। সেই কাকা, জেঠা, পিসে, মেসো নিয়ে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারগুলো টিকে থাকার বাস্তবতা রইল না। ভাঙতে লাগল সব কিছু। ফসল ধীরে ধীরে পণ্য হয়ে উঠতে লাগল। ধান চাল আর 'মা লক্ষ্মী' রইল না। চালে কাঁকড় মেশাও, ধুলো, জল দাও, পায়ে করে চটকাও, বিক্রি করে, তবে দুটো পয়সা আসবে ঘরে। খরিদ্দার আর লক্ষ্মী নয়, তাকে ভেজাল দেওয়া, বিষাক্ত জিনিস বিক্রি করে কোনরকমে ঘরে পয়সা নিয়ে এস। পয়সাই সব এখন। এইভাবে শুরু হল টাকার শাসন।

তারপর এল দেশ ভাগ।

এ হল দ্বিতীয় পরাজয়।

দুর্ভিক্ষ শেষ হল, যুদ্ধ থেমে গেল। স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল গণ-আন্দোলন বিদ্রোহের কিনারায় নিয়ে এল দেশকে। ইংরেজ পাল্টা চাল চালল। পাকিস্তানের দাবিতে শুরু হল বীভৎস দাঙ্গা। খুন, জখম,

গৃহদাহ, নারী ধর্ষণের তাণ্ডব চলল কিছুদিন। তারপর মেনে নেওয়া হল দেশবিভাগ।

ইংরেজ হিউম সাহেব একটা উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করেছিল জাতীয় কংগ্রেস। উনিশশো পাঁচ সালে দেশবিভাগের বিরোধিতায় নেমে কংগ্রেস তা থেকে সরে অন্য এক লক্ষ্যে পৌছে গেল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে কংগ্রেস রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের প্লাটফরম।

অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড় প্রভৃতি বড় বড় গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিল সে। এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতের শ্লোগানকে সে ছড়িয়ে দিল এই বিশাল দেশের গ্রামে গ্রামান্তরে, সহরে, কলে-কারখানায়, হাটে-মাঠে-ঘাটে। তারপর উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট দেশ বিভাগ মেনে ইতিহাসে সে তার রাজনৈতিক পরাজয়কে স্বীকার করে নিল। যে গান্ধীজী গীতা আর কোরান পাঠ করে প্রার্থনা সভায় উদ্বোধন করতেন প্রতিদিন, সাম্প্রদায়িকতাবাদীর হাতেই তিনি নিহত হলেন।

ভাগ হল বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর দারুণ অহঙ্কার ছিল সাধারণ বাঙালির মনে। তারা নাকি দারুণ বুদ্ধিমান জাত। তারা বিহার, ইউ পি-র মানুষদের বলত খোট্টা, ছাতুখোর; ওড়িশাবাসীদের বলত উড়ে, পাঞ্জাবীদের বলত পাঁইয়া, হিন্দুরা প্রতিবেশী মুসলমানদের বলত নেড়ে, আর মুসলমানরা বলত কাফের। এরা রাতারাতি বাঙালি জাত থেকে হিন্দু আর মুসলমান বাঙালিতে ভাগ হয়ে গেল। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রগতিশীলতাকে কান ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সেখানে বসল ঈশ্বর আর আল্লা। হিন্দু বাঙালি বলল মুসলমান বাঙালির অধীনে থাকব না, মুসলমান বাঙালি বলল কাফেরদের সঙ্গে ঘর নয়। সিংহ চর্মাবৃত গর্দভের সিংহের চামড়া খুলে নিলে যেমন আসল গাধাটা বেরিয়ে আসে তেমনি বেরিয়ে এল দুটো ধর্মান্ধ সম্প্রদায়।

দু-টুকরো হল বাংলাদেশ। দারুণ বুদ্ধিমান জাতের কি নিদারুণ পরিণতি। ইতিহাস মুচকি হাসল আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিজয়ীর ডুগি বাজাল।

তৃতীয় পরাজয় এল কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপর্যয়ে। দেশ ভাগ করে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় আসার পর মানুষ তার সব আশা ন্যস্ত করেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর। সেই উনিশশো বায়ান্ন সালে হাওড়ায় দুজন কমিউনিস্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জয়ী হওয়ার পর দূর মার্কিন মুলুকে চিৎকার শুরু হয়েছিল 'ভারতবর্ষ কমিউনিস্ট হয়ে গেল।'

তারপর বারবার মানুষ রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, টাকা দিয়ে, ভোট দিয়ে সমর্থন দিয়ে এসেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনে। সেই কমিউনিস্ট আন্দোলন তাদের চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কারা 'বিশুদ্ধ' কমিউনিস্ট, বিপ্লবের একমাত্র 'ঠিকাদার' কে, কাদের পথ সঠিক এই নিয়ে যে বিতর্ক আর কুৎসা শুরু হল তা গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের ইতর ঝগড়াকেও হার মানায়। এরই মধ্যে এল গুপ্ত হত্যা আর সন্ত্রাসের যুগ। যে গুপ্ত হত্যা এতদিন ছিল সাম্রাজ্যবাদ আর বুর্জোয়া শ্রেণীর ঘৃণ্য কাজ তাকেই মার্কসবাদ আখ্যা দিল একদল, হত্যা করল পরস্পরকে। এক একটা কমিউনিস্ট গুপ্ত তার নিহত কর্মীদের তালিকা দিয়ে দাবি করল "এরাই হল খাঁটি শহীদ। বাকিরা দেশদ্রোহী।" লাল ঝাণ্ডা ভাগ হল, তার নীচে শহীদরা ভাগ হল, খুনীরা মর্যাদা পেল বীরের, খুনের প্রবক্তারা হল তাত্ত্বিক, ব্যক্তি হত্যা মার্কসবাদী রাজনীতির স্থায়ী অঙ্গ হয়ে গেল।

রুশ বিপ্লবকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। মার্কস, লেনিন সারাজীবন ধিক্কার দিয়েছেন রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক আন্দোলনের সংগঠকদের গুপ্ত হত্যার বিরুদ্ধে। মার্কসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পার্থক্য বারবার তুলে ধরেছেন তাঁরা। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। এ বিচিত্র দেশে সবই বিপরীত। এখানে পাড়া দখল, গ্রাম দখল, প্রতিপক্ষকে (বুর্জোয়া কি সামন্ত প্রভুদের নয়, ভিন্ন মত পোষণকারীদের) নির্মূল করার নাম দেওয়া হল মার্কসবাদ। মার্কস কখনও বলেন নি মার্কসপন্থী শ্রমিকরা এক হও। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় তাঁর উদাত্ত আহ্বান হল বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদের জন্য—"দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।" শ্রেণী হিসাবে সব মতের, সব পথের শ্রমিককে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য। কিন্তু এই পোড়া দেশে বিপ্লবের নামে শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হল।

মার্কসের নাম করে ধর্ষণ করা হল মার্কসবাদকে। মানুষ নীরবে চেয়ে দেখল। তাছাড়া কি সে করতে পারত!

আর এই সব কিছুর ওপরে সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। ত্রিশের দশক থেকে নাটক, গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাসে বস্তুবাদী সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল তা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এল। বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় এল। তার শ্রেণী সংস্কৃতিকে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য

সে তার প্রচার মাধ্যম, টাকার থলি, খেতাব, পুরস্কার নিয়ে হাজির হল দরবারে। তার প্রচারের জৌলুষ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল চোখ। টুথপেষ্ট, লিপষ্টিকের মত সংস্কৃতিও পন্য হয়ে উঠল। লেখকদের দিয়ে লেখান হতে লাগল। তারপর প্রচারের জয়ঢাক বাজিয়ে তাকে তুলে ধরা হতে লাগল আকাশে। সেইসব লেখা কবিতা, গান, গল্প উপন্যাস নিয়ে সেমিনার সংগঠিত হল, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরুল, তারপর হাউই যেমন তীব্র বেগে আকাশে উঠে কিছুক্ষণ পরেই ছাই হয়ে ঝরে পড়ে, তেমনি একবছর, দুবছরের মধ্যেই সে সব লেখা চলে গেল বিস্মৃতির আড়ালে। তখন আবার নতুন লেখা, আবার নতুন চটকদার বিজ্ঞাপন, আবার মানুষকে সেই সব লেখা পড়ানোর জন্য নতুন কায়দায় বিরাট হৈ হল্লা।

আজ কজন জানে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়ের নাম।

কজন মনে রেখেছে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ীকে। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, যিনি ছিলেন বাংলাদেশে বস্তুবাদী সংস্কৃতির প্রথম সংগঠক, তাঁর কথা আলোচনা হয় কোথাও? বিস্মৃতির কুয়াশা ঢেকে দিয়েছে সব কিছু।

বস্তুবাদী ধারার লেখক শিল্পীরা আজ হরিজন। একখানা উপন্যাস লিখে ম্লান মুখে ঘুরে বেড়ান এক জন প্রকাশকের প্রত্যাশায়, একখানা নাটক লিখে অভিনয় করাতে না পেরে হতাশ হয়ে হয়ত লেখা ছেড়ে দেন, গায়করা গান গাইবার সুযোগ পান না। বুর্জোয়া প্রচার-মাধ্যমের দরজা তাদের কাছে প্রায় বন্ধ। বুর্জোয়া সমালোচকরা ওদের বিদ্রূপ করে বলেন "ওদের গল্প সাহিত্য হয় না, ওদের গান সঙ্গীত হয় না। ওরা অক্ষম।" এ অপমান নীরবে সহ্য করতে হয়।

এই হল শতাব্দী শেষের বাস্তবতা। সৎ, আত্মনিবেদিত তরুণরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বারবার প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। অজস্র লিটল ম্যাগাজিন বের করে, ছোট ছোট গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমে এবং আরও নানা পদ্ধতিতে তাঁরা বস্তুবাদী সংস্কৃতির মর্মবাণীটি বহতা রাখার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পারছেন না। বুর্জোয়া জয়ঢাকের বিরাট আওয়াজের আড়ালে তাঁদের কণ্ঠস্বর কাঁসির আওয়াজের মত ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

আমরা, যারা এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নায়ক, এই সময়ে যারা চলেছি-ফিরেছি, কাজ করেছি—গান গেয়েছি, বক্তৃতা করেছি—লিখেছি, মাঠে ঘাটে
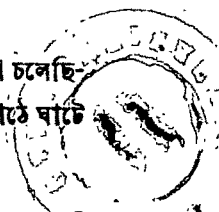
দাপিয়ে বেড়িয়েছি, আমাদের সময়, শ্রম, রক্ত, ঘাম নিঃশেষ হয়েছে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। সে প্রতিরোধে কতটা সফল বা ব্যর্থ হয়েছি সেটা বড় কথা নয়, মূল কথা হল আমরা বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়িনি বুর্জোয়া শ্রেণীকে। আমাদের পদচিহ্নের স্বাক্ষর আছে দেশ বিভাগের বিরোধিতায়, দাঙ্গা বিরোধী মিছিলে, ভুখা মানুষের খাদ্য সংগ্রামে, শ্রমিক ধর্মঘটে, কৃষক আন্দোলনে। আগামীকালের মানুষের জন্য আমাদের লেখায় চিত্রিত হয়ে আছে এইসব সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। আমাদের গানে মুখর হয়ে আছে এ যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের কবি তায় ভাষা দিয়েছি এ যুগের বেদনা-আনন্দকে।

ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের কাছে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'কালের নিয়মে একদিন ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কি ভারতবর্ষ সে রেখে যাবে?'

আগামী প্রজন্ম যদি আমাদের কাছে এইভাবে প্রশ্নটি তুলে ধরে 'কালের নিয়মে একদিন তোমরা মরে যাবে, কিন্তু কি দেশ, কি সংস্কৃতি আমাদের জন্য রেখে যাবে', তাহলে বলব—"আমরা রেখে যাব সংগ্রামের রাজনীতি, প্রতিরোধের সংস্কৃতি।"

আজকের এবং আগামী দিনের তরুণ প্রজন্মের কাছে এই হল আমাদের বার্তা। যুধিষ্ঠিরের কাছে ধর্মরূপী বকের প্রশ্নমালার মত একালে আমাদের উত্তর হল: আমাদের পথ হল সংগ্রামের পথ, আমাদের বার্তা হল প্রতিরোধের বার্তা, আশ্চর্য হল পরাজিত হয়েও আমরা মরি নি। আমাদের জীবনবোধ অক্ষত, অদম্য। আমরা আজও সৃজনশীল।

ইতিহাস যে পরাজয় আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। জয় আর পরাজয়ের দোলাচলের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলে জীবন। সমাজ বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস বলেছিলেন 'প্রলেতারীয় বিপ্লব উনিশ শতকের বিপ্লবগুলির মত অবিরাম আত্মসমালোচনা করে চলে, আপন গতিপথে বারবার থমকে দাঁড়ায়, আপাতসমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করার জন্য ফিরে আসে, নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, অকিঞ্চিৎকরতাকে উপহাস করে নির্মম গভীরতায়…।" (লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার)

মার্কসের এই বিশ্লেষণকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করি। আত্মসমালোচনা

করি, নিজেদের দুর্বলতাকে নিজেরাই উপহাস করি, অসমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করি।

এরজন্য আমাদের কোন আক্ষেপ নেই, ক্ষোভ নেই।

হে আগামী শতাব্দীর অনাগত তরুণ প্রজন্ম, তোমরা আমাদের এই দৃষ্টিতে বিচার করো। তোমরা স্মরণ করো আমরা পিছু হটেছি কিন্তু আত্ম-সমর্পন করি নি, ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু হতাশ হই নি, নিজের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গেছি।

ইতিহাস যে বাস্তবতা আমাদের জীবনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তাতে এছাড়া অন্য আর কিছু করার ছিল না।

অনেকে হয়ত এ ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবেন না। ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে এসে বলবেন "কে বলল আমরা ব্যর্থ পরাজিত। আমরা তেত্রিশটা গান লিখেছি, ছত্রিশটা সভায় গেয়েছি, বাইশটা আলোচনা সভা করেছি…।" এক বিরাট ফর্দ্দ হাজির করবেন তারা।

তাদের সঙ্গে আমি তর্ক করব না। শুধু একটা শুকনো নমস্কার করে বাইরের দুয়ার থেকে বিদায় করে দেব। মনে মনে বলব: সংস্কৃতির জোয়ার আর মুদির ফর্দ্দ এক নয়।

সমাজে যখন অবক্ষয় আসে, অগ্রগতির পথ যখন সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়, অতীতের বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ যখন ছটফট করে তখন সে শুনতে চায় নতুন কথা। যে কথার মধ্যে তাঁর মনের কামনা-বাসনা বাণীরূপ পায়। সেই কথা তখন তার কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে। তার ডাকেই সে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধিকার মত ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসে।

এ দেশের সম্প্রতিকালের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখি রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করে গেছেন জাতীয় আন্দোলন হল তারই ফলশ্রুতি।

রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রের একই কথা। সেই আঠারেশো পঞ্চাশ ষাট থেকে ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে যে নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হল, সেই পরিবেশই সৃষ্টি করল তলস্তয়, চেখভ, তুর্গেনেভ, গোর্কি প্রমুখদের। আর তাঁরা জাতির মানসলোকে সে বিস্ফোরণ ঘটালেন উনিশশো সতেরোর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সব দেশেই যুগে যুগে ভগীরথ আগে শঙ্খধ্বনি করে যান, তারপরে সহস্র তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আসে গঙ্গা।

এমন মানুষ আছেন যাঁরা এসব কথা বিশ্বাস করেন না। তাদের কাছে বিপ্লব হল রক্তাক্ত খুন-জখমে ভরা কিছু কাজ। বিপ্লবকে যারা শুধু এইভাবে ব্যাখ্যা করেন তারা আসলে বিপ্লবের বন্ধু নন। অবদমিত মানুষের কাছে বিপ্লব হল উৎসব। তাঁর জীবনে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উৎসব।

অন্ধকার ঘুপড়িতে যারা বাস করে, প্রতিদিন শোষণের বোঝার চাপে মাথা হেঁট করে পথ হাঁটে, যারা প্রতিদিনই থাকে অর্ধভুক্ত, কোনদিন বা অভুক্ত,;যারা সহজে আলোকিত মঞ্চের চারপাশে গান শুনতে বা ভাষণ শুনতে ভীড় করে না, শুধু একমুঠো খাদ্য সংগ্রহ করতে যাদের দিনের সমস্ত সময় ব্যয় হয়, বিপ্লবের সময় তারাই নেমে আসে পথে। তারাই সেদিন পথের নায়ক হয়। তারা সবাই সেদিন কথা বলে, আলোচনা করে, তর্কবিতর্কে অংশ নেয়, নতুন আহ্বানের মর্মবাণীটি বুঝতে চেষ্টা করে, তারপর নিজেদের শ্রম, উদ্যোগ, আর সদ্যজাগ্রত প্রতিভা দিয়ে গড়ে ইতিহাস। সাধারণ মানুষের এই ভূমিকার বর্ণনা আমরা পাই রুশ বিপ্লবে জন রীডের গ্রন্থে, পাই ভিয়েৎনামের সাহিত্যে, গ্রামে গ্রামে সাধারণ কৃষকদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে, পাই আরও নানা দেশের ইতিহাসে।

আমাদের দেশে বিপ্লব হয় নি। কিন্তু কিছু কিছু বড় আন্দোলনে আমরা বিদ্যুতের চকিত ঝলকের মত মানুষের এই দুর্লভ রূপের আভাস পেয়েছি। মনে পড়ে উনত্রিশে জুলাইয়ের কথা। নিজের কাজের বিশালত্বে মানুষ নিজেই যেন হতবাক। নিজের শক্তির গভীরতায় নিজেই যেন বিভ্রান্ত।

মনে পড়ে তেভাগা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের দু চারটি দিনের কথা।

আর সর্বশেষ মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। ভোটে যেদিন অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেন হেরে গেলেন।

সারারাত রাজপথে চলমান মিছিলের স্রোত। পথে পথে দড়ি দিয়ে ঝোলান কানা বেগুন আর কাঁচকলা। মিষ্টির দোকানদার লোককে বিনা পয়সায় মিষ্টি বিলিয়ে দিচ্ছে আর বলছে 'অনেক লাভ করেছি। আজ আর করব না।'

চাওয়ালা বিনা পয়সায় চা খাওয়াচ্ছে লোককে। মানুষের সে কি মেজাজ।

কিন্তু এ সবই ক্ষণস্থায়ী।

জীবনের ওপর স্থায়ী হয়ে বসে রয়েছে বুর্জোয়া শোষণ, বুর্জোয়া সংস্কৃতি, বুর্জোয়া অবক্ষয়।

এই নির্মম সত্যকে যে স্বীকার করে না তার সঙ্গে বিতর্ক করে কোন লাভ আছে কি? (ক্রমশ)

পুরাণতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ

প্রতিষ্ঠিত সমাজ শাস্ত্রকে হাতিয়ার করে সমাজে ভেদনীতির প্রতিষ্ঠা করে এবং ভেদনীতি-নিয়ন্ত্রিত সমাজে শোষণের যন্ত্রকে দৃঢ় করে। মুসলমান আমলে আমরা পরাধীন ছিলাম না, কেন না পাঠান-মোগল সম্রাটগণ ভারতবর্ষের মূলধনকে মধ্য এশিয়ায় রপ্তানি করেননি। ইংরেজ বুর্জোয়াদের মত তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি না থাকার জন্য ভারতবর্ষে মধ্যযুগের প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্বার্থে ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা কখনই ভয়াবহ হয়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ভারতবর্ষের অন্যান্য শ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে আচ্ছন্ন করার জন্য অতি চাতুর্যের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করেছে; ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। জাতীয় বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা উত্তরকালে নিম্নবিত্ত লোকেদের শ্রেণীচেতনার কণ্ঠরোধ করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে—ফলে সম্প্রদায়গত বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে। শ্রী সুকুমার সেন 'রাম কথার প্রাক কথা' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে রামচন্দ্রের মিথ্ পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ কবির মনোভূমিকেই 'রামের জন্মস্থান' বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ বাবরি মসজিদ নিয়ে অযোধ্যা অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়ে গেল। একমাত্র সমাজতন্ত্রমুখীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতীয় সমাজের বর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে পারে; কিন্তু চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা এবং জাত-পাতের লড়াইকে নির্মূল করার জন্য যুক্তিনির্ভর পুরাণতত্ত্বের আলোচনা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন অপরিহার্য।

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান অথবা বর্ণব্যবস্থা কেন্দ্রিক সাম্প্রতিক পটভূমিকায় শ্রীনামভাগবত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পুরাণতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থটির রচয়িতা পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর। গ্রন্থটির শ্রীকৃষ্ণের একশত বর্ষব্যাপী

লীলাসমূহের সূত্র গ্রন্থমাত্র। সরল এবং সর্বজনবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত দার্শনিক শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মন্তব্য করেছেন : 'শুধু বঙ্গভাষাতে কেন ভারতীয় কোন ভাষাতেই এই জাতীয় সংকলন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।'

গ্রন্থটির সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা (৯১ পৃঃ) অংশে ভারতে ও বহির্ভারতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ভাগবত ধর্ম এবং বাদশাহী শাস্ত্র বা নব্যস্মৃতির আলোচনা শুধু সমাজ ইতিহাসের দিক দিয়ে নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনেও প্রাসঙ্গিক। সেই প্রাসঙ্গিকতার কথা বিবেচনা করেই উক্ত উপক্রমণিকা আমাদের আলোচনার বিষয় হয়েছে।

মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, গর্গ-সংহিতা প্রভৃতি সাহিত্য, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভক্তি সাহিত্য, কোন কোন উপনিষদ ও তন্ত্র, জৈমিনি লিখিত মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ হতে লেখক শ্রীকৃষ্ণের ১২৫ বৎসর ব্যাপী জীবনকথার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়ের ১৯৩০ খৃঃ প্রণীত 'যুধিষ্ঠিরের সময়'-শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে সহমত হয়ে শ্রী ঘোষ ঠাকুর ৩২২৩ খৃঃ পূর্বাব্দকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে মহাভারতের কালে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় সুমের-সভ্যতার অস্তিত্বের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ষের সৌবীর এবং সিন্ধু বা সুমের সভ্যতার সময়কাল খৃঃ পূঃ ৩।৪ হাজার বৎসর। শ্রী সুকুমার সেন 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচন' প্রবন্ধে পাণ্ডব গ্রন্থিমোচন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 'কে জানে এই গল্পে মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পার কোন আভাস ইঙ্গিত আছে কিনা।' মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ সিন্ধি ভাষায়—মৃতের নগর। লেখক এই প্রসঙ্গে জৈমিনি-লিখিত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে সৌবীরের রাজা জয়দ্রথের পুত্র সুরথের অস্বাভাবিক মৃত্যু ও শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শে তাঁর পুনর্জীবন লাভের মিথের উল্লেখ করেছেন।

বৈদিক ধর্মের অবক্ষয়ের যুগে বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সারমর্ম নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ধর্মের প্রচার করেন। উক্ত ধর্মে সর্বশ্রেণীর সর্বধর্মের নরনারীর সমানাধিকার ও বৈবাহিক বন্ধন স্বীকৃত হয়েছিল। দ্বারকাদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ ভারতীয় সমাজ (যা গুণ ও কর্ম অনুযায়ী) গঠন করেছিলেন। লেখক ভাগবত ধর্মকে যথার্থ মানবধর্ম বলে অভিহিত করে ভারতে ও বহির্ভারতের প্রচারিত বিভিন্ন ধর্মের উপর প্রভাবের কথা বলেছেন এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট,

বাইবেল, আল্ কোরান প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সহকারে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আরবীয়গণের সাধারণ উপাসনাগৃহ 'বায়তুল্লাহ' নবধর্ম ইসলাম-প্রবর্তক হজরতের সম্পূর্ণ অধিকারে এনে তিনি ঐ গৃহস্থিত ৩৭০টি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক 'ইলাহা' (উপাস্য দেবদেবীর মূর্ত) ধ্বংস করেন, কিন্তু সুবৃহৎ লাহ্ বা 'মাআবা' কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁর প্রাচীন 'হজ্' বা পূজা পদ্ধতিতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর অবশ্য পালনীয় কর্ম বলে নির্ধারণ করেন। কেতুমাল বর্ষে (আরব ইসরাইল প্রভৃতি দেশ) আজও শ্রীভাগবত বর্ণিত সুপ্রাচীন 'কাম' নাম কৃষ্ণপ্রস্তরটি প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন, দর্শন, স্পর্শন, প্রদক্ষিণ, দেবতার তৃপ্ত্যর্থে বলি বা কোরবাণী প্রদান ও অন্যান্য, পদ্ধতিতেই পূজিত হচ্ছেন। লেখক মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকালে দুইবার ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযানে সমগ্র জম্বু দ্বীপ বা তৎকালীন এশিয়া মহাদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে পরীক্ষিতের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান হয়েছিল এবং উক্ত অভিযানের যে বিবরণ শ্রীভাগবত আছে তাতে জানা যায় যে, পূর্ব এশিয়ায় ভদ্রাশ্ব-বর্ষের (চীনের) রাজধানী চন্দ্রাবতীপুর (চী, এন, ফু), যার পরবর্তী নাম পিকিং, হতে পশ্চিম এশিয়ায় কেতুমাল-বর্ষের রাজধানী মন্মথ-শালিনীর (মক্কা) পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে শ্রীকৃষ্ণ কথা প্রচারিত হয়েছিল এবং ঐ ঐ দেশের গায়কগণ সর্বত্র কৃষ্ণলীলা কথা গান করতেন [দ্রঃ—শ্রীভাগবত—১।১৬।১৪-১৫]। শ্রীভাগবতে (৫।৮।১৫) বলা হয়েছে—'কেতুমালেহপি ভগবান কামদেব স্বরূপ…'।

হিন্দুচিন্তায় শিব ও কৃষ্ণ অভিন্ন। এইজন্য মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৭শ অধ্যায়ে শিব সহস্রনাম স্তবে শিবের ১০৩ তম নাম কৃষ্ণ, ১০৪ তম নাম কাম, ৬২৬ তম নাম মহাদেব এবং ৭১৩ তম নাম কেতুমালী। ওই পর্বেরই ১৪৯শ অধ্যায়ে বিষ্ণু সহস্রনাম স্তবে বিষ্ণুর ২৭ তম নাম শিব, ৪৯৩ তম নাম কৃষ্ণ, ২৯৮ তম নাম কাম এবং ৪৮৭ তম নাম মহাদেব। এইজন্য লেখক মন্তব্য করেছেন যে কেতুমাল বর্ষে পূজিত ভাগবত বিগ্রহকে মহাদেব বললে—কৃষ্ণ এবং শিব উভয়ই বুঝায়। ১৯২৫ সালের নব্যভারত পত্রিকায় শ্রী মধুসূদন সরকার 'জাতীয় ঐক্য' শীর্ষক প্রবন্ধে আরবদেশের প্রাক-মহম্মদ যুগের শৈবধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। উপাসনা গৃহের সর্বপ্রধান দেবমূর্তি 'হবল' কে তিনি 'হর' শব্দের রূপান্তর বলে মনে করেছেন।

The Encyclopaedia of Islam (edited bp E.. Van. Donzeb, B. Lewis and Ch. Pellot) এ 'বায়তুল্লাহ' এ ৩৬০টি দেবদেবী এবং কৃষ্ণপ্রস্তরের উল্লেখ আছে। ইসলামী শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপ অস্বীকৃত হয়নি।

শ্রীঘোষ ঠাকুর হিন্দু মুসলমান এই দুই বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের ঐক্যের জন্য পুরাণতত্ত্বের আলোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "...ইসলাম প্রবর্তক মহামানব মোহম্মদ—সেই সুপ্রাচীন মন্দির বিগ্রহ ও পৌত্তলিক পূজা পদ্ধতি সমস্তই সংরক্ষণ করিয়াছেন।...... এই সত্য এই ধর্ম সমন্বয় যুগে প্রচারিত হইলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় রাষ্ট্রের হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কাআবা সম্বন্ধেই অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিপূর্ণ হইবে এবং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাতেও পরিবর্তন আসিবে...'।

শ্রীনামভাগবতম্ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় অষ্টম শতাব্দী হতে হুসেন শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) বাঙলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। লেখক উক্ত ইতিহাস থেকে প্রমাণ করেছেন যে সর্বযুগেই রাজার প্রয়োজনে স্মৃতিশাস্ত্র বা কার্য্যবিধি ও দণ্ডবিধি আইন প্রণীত হয়ে থাকে। পুরাণতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই শ্রেণী ব্যাখ্যা প্রশংসনীয়।

লেখক বলেছেন যে রাজা আদি শুর বৈদিক আচারে শ্রীকৃষ্ণপূজক ছিলেন এবং গুণ ও কর্ম অনুযায়ী সমাজ বিন্যাস করেছিলেন। তিনি যুদ্ধে সাহায্য-কারী সাতশত পার্বত্য তীরন্দাজকে ব্রাহ্মণের গোত্র, গায়ত্রী, পদবী এবং উপবীত প্রদান করে ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত করেছিলেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নাম হয় সাতশতী ব্রাহ্মণ। বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে রাজ্যের তিন প্রদেশবাসী কনৌজিয়া পুরোহিত বংশীয়গণ মধ্যে রাজার সর্বকার্যসমর্থক কয়েকজন রাজানুগত পদস্থ ব্যক্তিকে কুলীন আখ্যা দিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। ব্রাহ্মণ সমাজ কুলীন, সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয়—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কায়স্থগণ বঙ্গজ, বারেন্দ্র, উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। উভয় বর্ণেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হয়। এই বল্লালী ভেদনীতিতে সমাজ দুর্বল হয়েছে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেই দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর নয়ের দশকে সুপণ্ডিত হোসেন শাহ বঙ্গাধিপ হন।

রাজশক্তিকে দৃঢ় করার জন্য তিনি অভিজাত ক্ষমতাশালী হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। একই সঙ্গে তিনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে শতধাবিভক্ত করার জন্য নব্যস্মৃতি বা বাদশাহীস্মৃতির প্রচলন করেন। তিনি রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ শাক্ত নব্য যুবক ভাগ্যান্বেষী অধ্যাপক শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্যকে শাহী রাজ্যের চারিবর্ণ বিশিষ্ট হিন্দু সমাজ-নিয়ন্তা কুলাচার্য নিযুক্ত করেন। তাঁর শাসনকালে 'ব্যক্তি রঘুনন্দন' এই রহস্যজনক ভণিতায় নব্যস্মৃতি নামক ২৮টি নূতন হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র প্রচার করেন। বাঙলা-দেশে সহস্র বৎসর প্রচলিত পঞ্চরাত্র স্মৃতির প্রত্যেক সমাজ কল্যাণমূলক বিধি এবং শ্রীকৃষ্ণ-আচরিত ও কথিত অনুশাসনের প্রত্যেকটি বৈদিক সনাতন সমাচার এই নব্যস্মৃতি অবৈধ ঘোষণ করা হয়। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয় এবং অব্রাহ্মণ ও নারীর পৌরহিত্যের অধিকারকে হরণ করা হয়। বর্ণভেদ প্রথাকে কঠোরতম ভাবে প্রয়োগ করা হয়। হুসেনী রাজবংশের ৪৫ বৎসর শাসনে বহু হিন্দু নব্যস্মৃতির উৎপীড়নে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে হয়েছিলেন। উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ করে লেখক মন্তব্য করেছেন যে বাঙলাদেশে ইসলাম তরবারীর সাহায্যে প্রচারিত হয় নি ; কিন্তু এক হাতে জিহ্বাকর্তনের ও স্কন্নী ভেদের ছুরিকা এবং অপর হাতে নব্যস্মৃতি নিয়ে নীরবে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইতিহাস নব্যস্মৃতির শতাধিক কূট বিধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

লেখক নব্যস্মৃতির শতাধিক অনার্যীকরণ বিধান মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করেছেন। লেখক উল্লেখিত বিধান সমূহের মধ্যে দু-একটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে :-

১। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ানামপি শূদ্রত্বম (শুদ্ধিতত্ত্বম্)—অর্থাৎ অধুনা দ্বিজাতি মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে অনার্য্য, শূদ্র বা দাসজাতি ঘোষণা করা হল। এর অর্থ হল শ্রীকৃষ্ণকথিত গুণ ও কর্মগত চারিবর্ণ বঙ্গদেশে লুপ্ত করা হল এবং জন্মগত ব্রাহ্মণকেই দ্বিজাতি বলে ঘোষণা করা হল।

২। যঃ শূদ্র ইহ বৈদিকং ধর্ম্মং স্মার্ত্তং বা ভাষতে যদি
তস্য দণ্ডং দ্বে সহস্রে স্কন্নী চৈবভেদয়েৎ। (ব্যবহারতত্ত্বম)

কোন শূদ্র বা (নারী) কোন বেদের বা প্রাচীন ও নব্যস্মৃতির বা শ্রীগীতা শাস্ত্রের মন্ত্রোচ্চারণ বা ধর্মকথা আলোচনা করলে তার দুই সহস্র মুদ্রা দণ্ড ও দুইটি স্কন্নী কর্তন, এই উভয় দণ্ড যোগ্য হবে।

নব্যস্মৃতি বর্ণভেদ প্রথাকে দৃঢ় করে সমাজকে বহুধা বিভক্ত করেছিল এবং ফল হিসাবে আমাদের জাতীয় ঐক্যও বিঘ্নিত হয়েছিল। বাঙালীর সাংস্কৃতিক

চেতনার অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ নব্যস্মৃতি। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে নব্যস্মৃতি-শাসিত বঙ্গ সমাজের সেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের অসাধারণ সজীব বিবরণ আছে। শ্রীঘোষঠাকুর নব্যস্মৃতি রচনার ঐতিহাসিক পটভূমিকার যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনার জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। অর্থনীতি-কেন্দ্রিক রাজনীতি সমাজের মূল ভিত্তিভূমি। রাজনীতি সমাজের মূল ভিত্তিভূমি। সমাজনীতি সেই মূল ভিত্তি উপরিতলের যৌথ। উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ভাবনার সঙ্গে অল্প-বিস্তর সমাজ আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অথবা ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের সমান্তরাল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন উপেক্ষিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে এবং হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে অনৈক্য রয়ে যাচ্ছে। জাতীয় বুর্জোয়ারা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চক্র এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভুত্বকে কায়েম করছে। উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন স্থানে জাত-পাতের লড়াইজনিত অনৈক্য, জাতপাতকেন্দ্রিক নির্বাচন প্রভৃতি ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীর শোষণের সহায়ক হয়েছে। মুসলমান সমাজে সামাজিক আন্দোলনের ঐতিহ্য বিরল বলেই রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকার সাম্প্রতিক মুসলিম বিবাহ বিল জাতীয় আইন প্রণয়ন করে মুসলমান সমাজকে মধ্যযুগীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পেরেছেন। শ্রীনামভাগবতম্ জাতীয় গ্রন্থের ব্যাপক প্রচারে বর্ণ বিরোধ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তি নির্ভর ভিত্তি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই কারণেই এই জাতীয় গ্রন্থ একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

অনেকে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায় নয়, কবির মনে এবং কৃষ্ণ কথা বড় জোর একটা মিথ্। এই আলোচনার গভীরে প্রবেশ না করে বলা যায় যে শ্রীনামভাগবতম্ গ্রন্থে কথিক কৃষ্ণকথা ভারতবর্ষের দুই বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতির সম্প্রসারণে সহায়ক। গ্রন্থটি পাঠ করলে একথা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে আল কোরানে বর্ণিত আচরণ, শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অধিক নিকটবর্তী এবং তা গুণ ও কর্মগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সবশেষে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং জাতীয় ঐক্যের কথা বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাণতত্ত্বের আলোচনা আমাদের প্রশংসার দাবী রাখে।

অমর দত্ত

শ্রীনামভাগবতম্। পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর। প্রকাশিকা—সুপ্রভা দেবী। ১২৯ অরবিন্দ নগর, কলকাতা-৩২

কৃষণ চন্দরের আত্মকথা

আত্মস্মৃতি কেন লেখা হয়? জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথের অনেকটা পেরিয়ে এসে স্মৃতির তাড়নায় কেন ফিরে ফিরে তাকানো হয় পিছনের দিকে? তাকাতে হয় পিছনের দিকে তাকানোর অবধারিত টানে। অর্থাৎ সত্যি কোথাও উপনীত হওয়া গেল কি না! আত্মস্মৃতিতে থাকে নিজের গড়ে ওঠার সাধনার ইতিহাস, আনন্দ-বেদনার মালা গাঁথার এক অনতিলক্ষ্য প্রয়াস।

যে কোনো স্মৃতিকথা—আত্মকথা বা আত্মজীবনীকে ইতিহাস বলতে বাধা নেই। কিন্তু এ ইতিহাস প্রচলিত অর্থে ইতিহাস নয়: এখানে থাকে ব্যক্তির গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের—দেশের চলমান ছবি। স্মৃতির ঝাঁপি থেকে তুলে-আনা দু-একটা আশ্চর্য ছবি—যেখানে ফ্রেমে বাঁধানো দৈনন্দিন জীবনের সীমিত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার হাওয়া, জাতীয় জীবনের কয়েকটি অমূল্য মুহূর্ত; আবার বিভিন্ন ঘটনার সরস হাস্যময় উপস্থাপনা। এ সমস্ত মিলে জীবনের ছবি হয়ে ওঠে প্রোজ্জ্বল; আগামী দিনের প্রজন্ম লেখকের আত্মকথার ফসলে হয় ঋদ্ধ। কৃষণচন্দরের আত্মকথা আমাদের সেই ঋদ্ধ জীবনের ফসল তুলে দেয়। ভারতীয় সাহিত্যে আত্মস্মৃতি রচনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় সংযোজন রূপে পরিগণিত হয়।

কৃষণচন্দরের 'আধে সফর কী পুরী কহানীর' ভাষান্তর করেছেন জয়া মিত্র 'আত্মকথা' নামে; গ্রন্থটির ভূমিকা ও অন্তিম অধ্যায় লিখেছেন কৃষণচন্দরের সহধর্মিণী উর্দু লেখিকা সলমা সিদ্দিকী। আত্মজীবনীটি অসমাপ্ত—তবুও পাঠককে মুগ্ধ হতে হয়। কেননা গ্রন্থটি তো প্রচলিত আত্মকথার রীতিতে রচিত নয়। জন্মমৃত্যু, বিবাহ, পুরস্কারপ্রাপ্তির ইতিবৃত্ত রচনা করতে লেখক বসেন নি। একজন সৃষ্টিশীল লেখক তাঁর সৃষ্টির ক্রমিক উদ্বর্তনের নেপথ্য ইতিহাস পাঠকের কাছে উন্মোচিত করেছেন। ইতিহাসে ব্যক্তি তখনই ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন যখন তিনি স্ববৃত্তে পরিক্রমা না করে সূর্যবৃত্তে পরিক্রমা করেন। কৃষণচন্দর সেই ব্যক্তিত্ব যিনি জীবনে সূর্যবৃত্তে পরিভ্রমণরত। তিনি শুধু উর্দু ও হিন্দী ভাষার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকই নন, মানবিক মূল্যবোধের এক মহান উদ্গাতা; শ্রমজীবী, সংগ্রামী মানুষের মূক বেদনাকে মুখর

অঙ্গীকারে লিপিবদ্ধ করেন। সাহিত্যের একটি যথার্থ মূল্যবোধের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেন। তাঁর খ্যাতি ভারতীয় সাহিত্যের দিগন্ত অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর জীবনবোধের চাবিকাঠি পাঠকদের হস্তগত হয় 'আত্মকথা'র মাধ্যমে। লেখক পাঠকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, রচনাটিতে কালগত বা ঘটনাগত পারম্পর্য রক্ষিত না হলেও লেখকের বর্ণনার সুনিপুণ ভঙ্গিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি হয়ে ওঠে কর্মময়। শুধু একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের তথ্যবহুল দিনপঞ্জী না হয়ে সমালোচ্য আত্মকথাটি হয়ে ওঠে 'সমসময়ের আনন্দ-বেদনা—আবেগের এক সামগ্রিক বোধের অন্তরঙ্গ দলিল।' কৃষণচন্দরের 'আত্মকথা'য় আছে সমকাল, সদ্যস্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রের চেহারা, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের কথা, মানবিক সম্পর্কের অত্যুজ্জ্বল মন্তব্য। এক কথায় কৃষণচন্দরের সমসময় ও সমাজের এক অন্তরঙ্গ দলিল।

ভূমিকা ও পরিশিষ্টাংশ বাদ দিলে মোট নয়টি শিরোনামে কৃষণচন্দর তাঁর 'আত্মকথা'র সংকেত জানিয়েছেন। সর্বশেষ 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই সব দিন' অংশটিও অসম্পূর্ণ; ১৯৭৭ এর ৪ মার্চ উক্ত অংশ লিখতে লিখতে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর জীবনের অন্তিম অধ্যায় তিনি লিখে যেতে পারেন নি। তিনি এই অংশটি সম্পূর্ণ করলে সমকালের আর একটি ভাষ্য হয়তো বর্তমান প্রজন্মের হস্তগত হত।

১৯৬৬ সালে কৃষণচন্দর সোভিয়েতল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার পান। সেই উপলক্ষে সোভিয়েত ভ্রমণে গিয়ে টলস্টয়ের বাড়ী থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কৃষণচন্দরের মনে হয় যে এবার তাঁর আত্মজীবনী লিখে ফেলা উচিত। তার বেশ কিছু দিন পর কৃষণজী তাঁর 'আত্মকথা' শুরু করেন। কৃষণজী প্রথাগত পদ্ধতিতে আত্মজীবনী লিখতে চাননি। কাহিনীর গ্রহণবর্জনের মাধ্যমে তাঁর আত্মকথা গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত কাহিনী বলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষণজী ইতিহাসের অনেক তথ্যকে এমন নিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন যেখানে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না থেকে অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থপাঠেই জানা যায়—কিভাবে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী বি. জি. খেরের আমলে ভারতবর্ষের অখিলভারতীয় শান্তিপরিষদের সৈনিকদের একে একে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। আর সেই শান্তিপরিষদ স্থাপিত হয়েছিল সারাবিশ্বে আণবিক যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী মানুষের স্বপ্নের রূপায়নের জন্য। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও এই

গ্রন্থের অন্যতম উপাদান। কৃষণজী সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জীবনের প্রথম পর্ব থেকে—হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার বর্বরতাবিরোধী ছোট গল্পের সংকলন 'হম্ ওয়াহ্‌শী হ্যয়' তিনি শ্রীনেহেরুকে উৎসর্গ করে ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারের হাতকেই শক্ত করতে চেয়েছিলেন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ও সাহিত্য আকাদেমী প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষণজী যে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন তাও জানিয়ে দেয় আলোচ্য 'আত্মকথা'। লেখক কিন্তু সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেন অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে; অহংসর্বস্বতা তাঁকে ক্ষণেকের জন্য আবৃত করে না। কৃষণজীর অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম এ্যাসিস্টাণ্টের চাকরী, হিটলার-শাহীর সময় দিল্লীতে ফ্যাসিস্তবিরোধী সম্মেলন আহ্বান প্রভৃতি তাঁর ব্যক্তিত্বের এক একটি দিক 'আত্মকথা'তে যতই পরিবেশিত হয় ততই পাঠক বিস্মিত হয়ে যান কৃষণজীর বহুধা কীর্তির ব্যাপক বৈচিত্র্যে। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে কৃষণজীর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্গে চলচ্চিত্র সমালোচক কৃষণজীর পরিচয় লাভও পাঠকের সম্পদ হয়ে যায়।

'হাঙ্গেরীর স্মৃতি' অংশে কৃষণজী কেন একাধারে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, শিল্প সমালোচক। গথিক রীতি, বারুক রীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যেমন ওয়াকিবহাল, তেমনি, আবার হাঙ্গেরীয় ও ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য অন্বেষণে তাঁর পাণ্ডিত্য পাঠককে মুগ্ধ করে। হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত শহরে কাজী মীর পরিচালিত ভারতীয় মহাকাব্যের—রামায়ণের—অভিনয় প্রদর্শন কৃষণজীকে যে কতখানি মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় দিতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি।

১৯৬৭ ও ১৯৭১ এর রুশ সাহিত্য-কংগ্রেসের আনুপূর্ব্ব বিবরণ তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে; কিন্তু কোথাও বক্তব্যের অতিরেক নেই। এখানেই তিনি শলোকভ, পাবলো নেরুদা প্রমুখ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন। কৃষণজীকে নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তোলার কাহিনীও কৃষণজী পুরাতন স্মৃতিতে আক্রান্ত হয়ে কখনও বেদনার সঙ্গে, কখনও আনন্দের সঙ্গে, আবার কখনও নিরাসক্ত চিত্তে বর্ণনা করে গেছেন। 'আত্মকথা' গ্রন্থে কৃষণজী তাঁর পিতা-মাতা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের কথা যেমন জানিয়েছেন তেমনি আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে পরিহাসরসিকতার সম্পর্ক, আত্মিক সম্পর্কের কথা জানাতেও ভোলেনি। মর্ত্য জীবনের প্রতি তাঁর কী আশ্চর্য মমতামেদুরতা ছিল তা আলোচ্য গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে স্পন্দিত। পত্নী সলমা সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর অতি তুচ্ছ বিষয়

সম্পর্কে আলাপ, আবার কোনো গভীর ও গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরে। ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম সেরা লেখক কৃষণচন্দের যে কত তুচ্ছ ব্যাপারকে মহত্তোমহীয়ান করে দেখতেন আলোচ্য গ্রন্থে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য কৃষণজীর হৃদয় যে সর্বদা উদ্বেলিত হত, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আঘাতপ্রাপ্তি তাঁর সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করায়। কৃষণচন্দের তাঁর 'আত্মকথা' বর্ণনাকালে সমকালীন ভারতের আরও কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে এনেছেন। যেমন—ডঃ সৈফুদ্দীন কিচলু, সর্দার আলি জাফরী, রমেশ চন্দ, খাজা আব্বাস আহমেদ, মুলকরাজ আনন্দ, জেড. এ. বুখারি, স্নেহপ্রভা প্রধান (অভিনেত্রী) প্রমুখ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষণজী অন্যের কথা বলেছেন প্রসঙ্গ হিসেবে, আত্মগৌরব ঘোষণার জন্য নয়। রচয়িতার ব্যক্তিজীবনে যাঁরা নানাকারণে স্মরণীয় কৃষণজী তাঁদের মিছিল এনেছেন 'আত্মকথা'য়। অবশ্য তাঁরা সকলেই এনেছেন ব্যক্তিস্মৃতির টানে। এ গ্রন্থে ধরা পড়েছে সাহিত্যবোধসম্পন্ন এমন একটি মানুষ—যে মানুষ সমাজ পরিবেশ বিচ্যুত নন, অনিকেত নন।

কৃষণচন্দের গল্পের সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের পরিচয় থাকলেও তাঁর আত্মজীবনীর সঙ্গে পরিচিতি আমাদের ছিল না বললেই হয়। জয়া মিত্র সেই আশ্চর্য গ্রন্থ 'আত্মকথা'র ভাষান্তরীকরণ করে আমাদের এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করলেন। এরজন্য আমরা তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ অক্ষমতার কথা তিনি স্বয়ং জানিয়েছেন। তবুও এত স্বচ্ছন্দ, সহজ, সরল গতিতে বইটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে যে পাঠক আকৃষ্ট ও তৃপ্ত না হয়ে পারে না। তবে কয়েকটি উল্লেখ্য ত্রুটি (সম্ভবত মুদ্রণজনিত) দূর করতে পারলে (যেমন—'কিছু' হবে 'কিন্তু' পৃঃ ৭ / 'কেটে' হবে 'ফেটে' পৃঃ ১১ / 'দারুণ' হবে 'দরুণ' পৃঃ ৯৫) ও গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা ও বাঁধাই-এর দিকে নজর দিলে ভালো হত। তবে এ সমস্তই তো বহিরঙ্গ কথা। আসলে কৃষণচন্দের অন্তরঙ্গ জীবন জানার এমন চাবিকাঠি আমাদের হাতে তিনি সর্বপ্রথম এনে দিলেন বলে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কৃষণচন্দকে বাংলাভাষাভাষীদের কাছে ভাষান্তরীকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জয়া মিত্র অভিনন্দনযোগ্য।

ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

আত্মকথা [আধে সময় কী পুরা কহানী] : কৃষণচন্দর। ভূমিকা ও অন্তিম অধ্যায় : সালমা সিদ্দিকী। ভাষান্তর : জয়া মিত্র। অন্বেষা। ১৬ টাকা

শতবর্ষে সুকুমার রায়

সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের একটি অতি-পরিচিত নাম। মাত্র ছত্রিশ বছর এই পৃথিবীর নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছেন তিনি, কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যের একটি নতুন দিগন্তকে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা কখনোই আমাদের চেনা সড়ক ধরে হাঁটেনি, বরং আমাদের চেনার পরিধি বাড়িয়ে বাড়িয়েই তিনি বুঝি স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন এই পৃথিবীর সৌন্দর্যকে। হ্যাঁ, 'হ-য-ব-র-ল' বা 'আবোল-তাবোল'-এ তিনি আশ্চর্য এই জগতের মাধ্যমেই ডুব দিয়েছিলেন মানুষের স্বপ্নের গভীরে, যেখানে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে আমাদের লুপ্তপ্রায় শৈশব। তাই হয়তো জীবনে শেষ দুটি বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই তিনি লিখতে পেরেছিলেন আবোল-তাবোলের ছড়াগুলি, যে প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত অভিন্ন হয়ে যায় তাঁর রোগমুক্তির অসম্ভব কল্পনার সঙ্গে।

আমরা সৌভাগ্যবান, ১৯৮৭ সালই সুকুমার রায়ের জন্মশতবার্ষিকীর বছর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যথাসাধ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে তাঁর শতবার্ষিকী। পশ্চিমবঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই তার শীর্ষস্থানে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে সারা বছরব্যাপী বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে সুকুমার রায়ের সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কিত নানা আলোচনা তথা মূল্যায়ন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে সুকুমার রায়ের ওপর একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, যার সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন ভাষাবিদ্ পবিত্র সরকার। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি সম্ভবত বামফ্রন্ট সরকারের 'সুকুমার রায়' নামক তথ্যচিত্রের প্রযোজনা। পরিচালক হিসেবে অনেকদিন বাদে আবার সক্রিয় দেখা গেল তাঁরই পুত্র বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিৎ রায়কে। এই তথ্যচিত্রে সুকুমার রায়ের সামগ্রিক ছবিটি স্পষ্ট হয়, এমন কি শেষ দৃশ্যে কোনো আশ্চর্য দক্ষতায়, এবং চলচ্চিত্রের সংবেদনশীল ভাষায়, সুকুমার রায় মিলে যান তাঁর চরিত্রের সঙ্গে, যেখানে চল্লিশের পর মানুষের বয়স কমে, একইভাবে সুকুমারের যৌবন থেকে শৈশবের পর পর ছবি পর্দায় ফুটে ওঠে। শেষ ছবিটি একটি এক বছরের শিশুর, হয়তো আবার তাঁর মানবচক্র গিয়ে শেষ হবে ছত্রিশ বছরে। সব মিলিয়ে, কোথায় যেন বিশ্বনন্দিত মানবিক শিল্পী চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে সুকুমারের একটা মিল ফুটে ওঠে। দেশব্যাপী এই আয়োজনের মধ্যে দিয়েই একদিন তাঁর মূল্যায়ন সম্ভব হবে। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

একটি গৌরবময় প্রকাশনা

যতদূর মনে পড়ে, একজন বাঙালী কবি একবার বলেছিলেন, যতদিন বাঙালী তথা বাংলা সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, ততদিন ঋত্বিক ঘটকের নাম এই পৃথিবীর মানুষ ভুলতে পারবে না। এই বক্তব্যের উচ্ছ্বাস বা আবেগটুকু বাদ দিয়ে, তার প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু যে ঋত্বিককে আমরা চিনি, সেই চলচ্চিত্র-পরিচালকের অস্তিত্ব ছাড়াও, আরো একটি শিল্প মাধ্যমে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ আধিপত্য। হয়তো এটাই স্বাভাবিক, গল্পকার ঋত্বিক ঢাকা পড়ে গেছেন, ঠিক যেভাবে ঋত্বিকের উজ্জ্বল দুটি চোখের আড়ালে ঢাকা পড়ে যেত পৃথিবীর অন্ধকার। আমরা লেখক ঋত্বিকের কথা আলোচনা করতে চাইছি। তরুণ প্রজন্মের পাঠকেরা সম্ভবত জানেন না, চারের দশকের শেষভাগে 'অগ্রণী', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্প এবং যেগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। এই লেখালেখির সময়-পর্ব ছিল খুবই কম, পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে। গল্পগুলি একদিন বন্দী অবস্থায় দিন গুণছিল বিবর্ণ কাগজের পৃষ্ঠায়। সম্প্রতি তাঁর ৬২-তম জন্মবার্ষিকী ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে 'ঋত্বিক ঘটকের গল্প'। যদিও অনেক বিলম্বিত, তবুও তাঁর পনেরটি গল্প নিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর মতো কাজ। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে প্রথিতযশা শিল্পীদের একটি করে ছবি। বইটির গঠন-সৌকর্যও দেখার মতো। বাংলা ভাষায় এই ধরনের গৌরবময় প্রকাশনার নজির খুব বেশি নেই। গল্পগুলি অনেকেরই পরিচিত, তবু একসঙ্গে পড়ার ফলে নতুন স্বাদ পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায়, কিভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল পরিচালক ঋত্বিকের চিন্তার জমি। গল্পগুলি পড়ার পর সেই পরিচিত আর্তনাদটিই যেন নতুন করে শুনতেই পাই, যেখানে 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতা বলে ওঠে—'আমি বাঁচতে চাই। আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম।' শিল্পকে এইভাবে জীবনযাপনের প্রেরণায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন কতজন শিল্পী? যে কজন পেরেছেন, তার অন্যতম নাম নিশ্চই ঋত্বিককুমার ঘটক।

অমল গঙ্গোপাধ্যায়

সোভিয়েত-ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কারে সম্মানিত দুই কবি

এ বছর যাঁরা সোভিয়েত-ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বাঙলা ও অসমীয়া ভাষায় দুই প্রধান কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

এঁদের সঙ্গে পরিচয় পত্রিকার সম্পর্ক একান্ত ঘনিষ্ঠ। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় শুধু প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম সারিরই একজন উজ্জ্বল পদাতিক শুধু নন, তিনি আমাদের পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল সম্পাদনার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বর্তমানে তিনি পরিচয়-এর উপদেশক-মণ্ডলীর একজন সম্মানিত সদস্য। ইতিপূর্বে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নেও কয়েক বৎসর অনুবাদকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের এই পরম আত্মীয়ের এবং শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কবির পুরস্কার প্রাপ্তির উপলক্ষ্যে আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত।

হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অসমের প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের একজন প্রধান প্রবক্তা। কবি হিসেবে পূর্বেই তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমাদের পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা দীর্ঘকাল ধরে অনূদিত হয়ে আসছে। তাছাড়া তিনি পরিচয়-এর একজন বিশিষ্ট কর্মীও বটে। ফলে এই উপলক্ষ্যে তাঁকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়ে তৃপ্তি বোধ করছি।

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

দেশকাল নিরপেক্ষ মহান অক্টোবর বিপ্লব

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

অক্টোবর মহাবিপ্লবের সত্তর বছর পূর্ণ হয়ে গেল। যে মহান দেশে এ মহান বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাদের দিকে তৃতীয় দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ সবসময়ই শ্রদ্ধামিশ্রিত আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। শান্তির জন্য, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য তাদের প্রতিটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুধু এই অঞ্চলেরই নয় ইউরোপের বঞ্চিত মানুষকেও অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই আধুনিক মানবসভ্যতা তাদের কাছে সেই বিপ্লবোত্তর কাল থেকেই ঋণী। কোন চমক কখনোই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি না, আমাদের প্রত্যাশা অনুপ্রেরণার, আমাদের প্রত্যাশা বলিষ্ঠ পথপ্রদর্শনের। সেই দায়িত্ব সোভিয়েত চিরকাল নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে এসেছে। মহাবিপ্লবের সত্তর বর্ষপূর্তি সেই কৃতজ্ঞতা পালনের আর একটি দুর্লভ সুযোগ আমাদের কাছে এনে দিল।

আবার জন্মমুহূর্ত থেকেই এই বিপ্লব এবং এর ধাত্রীভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ক্রমাগত আক্রমণের লক্ষ্য। বিপ্লব যে ব্যর্থ হয়ে গেছে প্রথম থেকেই তারা সেটি প্রতিপন্ন করবার জন্য ব্যস্ত। তারপর তাদেরই প্ররোচনাতে রুশ দেশের অভ্যন্তরে নির্মম শ্বেতসন্ত্রাসের সূচনা। কিন্তু এখানেই তারা থেমে থাকে নি। চারদিক থেকে এই সদ্যোজাত মহাবীরকে কোনঠাসা করবার জন্য তারা এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতেছিল। অর্থনৈতিক অবরোধ এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের প্ররোচনা সমগ্র দেশটির জীবনযাত্রাকেই স্তব্ধ করে দিতে বসেছিল। কিন্তু বিপ্লবের অন্তর্নিহিত অমোঘ শক্তিই তাদের ব্যর্থ করেছে, মহামতি লেনিনের অসাধারণ নেতৃত্ব তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করেছে। বিপ্লবী সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্রে অসফল হয়ে এরা তখন নিজেদের দেশে কমিউনিজমের প্রবেশ রুদ্ধ করবার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। এই জ্ঞানপাপীদের ভালোভাবেই জানা ছিল জারের শাসনাধীন রাশিয়ার অবস্থার সঙ্গে তাদের দেশের পার্থক্য খুব বেশী নয়। ধনতন্ত্রের অধিকতর বিকাশ ঘটায় এখানে শোষণ অধিকতর তীব্র, শ্রেণী বৈষম্যও অধিকতর প্রকট। তাই সেই

বিপ্লবোত্তর কাল থেকেই নিজেদের দেশগুলিকে সমাজতন্ত্র বিরোধিতার এক অদৃশ্য প্রাচীরের আড়ালে রাখবার জন্য ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ছিল উদগ্র আগ্রহ। তাই অক্টোবর বিপ্লব বা বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ায় সম্পর্কে নিজেদের দেশের সাধারণ মানুষের মন বিরূপ করে তোলার জন্য সুপরিকল্পিত মিথ্যা কুৎসার প্রচারও চলেছিল অব্যাহত।

কিন্তু তারা সফল হয় নি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই তাদের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। অচলায়তনের উত্তরদিকের জানলা চিরকাল বন্ধ রাখা কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই এই নিষিদ্ধ দেশের ঝোড়ো হাওয়া এই সব জায়গাতেও প্রবলবেগে বইতে সুরু করল। বাতাসকে যখন ঠেকানো গেল না তখন কাদের পায়ে এই বাতাস লেগেছে তাদের খুঁজে বের করাটাই জরুরী হয়ে পড়ল। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহ দেখালো আমেরিকা। সেই ১৯১০-র পর থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত তারা তাদের দেশের প্রখ্যাত লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্ভুল ব্যবস্থা করেছে। এর হাত থেকে প্রায় কারো নিষ্কৃতি ছিল না। ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছিল তার একটি চাঞ্চল্যকর উদাহরণ সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই তথ্য আমাদের যুগিয়েছে স্বয়ং আমেরিকার ফেড়ারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, সংক্ষেপে এফ. বি. আই।

নিউইয়র্ক শহরের দুজন সাহিত্যের ঐতিহাসিককে এফ. বি. আই প্রায় একটা বৈপ্লবিক অনুমতি দিয়ে ফেলেছে। এই অনুমতির ফলে ওই দুজন ঐতিহাসিক ১৯১০-র পর থেকে যে সমস্ত আমেরিকান কবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকারদের ওপর মার্কিনী গোয়েন্দা বিভাগের নজর ছিল তাদের নাম এবং তাদের উপর নজরদারির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন, এর জন্য ঐতিহাসিকদের গোপন ফাইল দেখবার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে যে সমস্ত নাম এবং তথ্য পাওয়া গেছে তা যেমন মজার তেমনি বিস্ময়ের। বিশ্ববিখ্যাত এই সমস্ত সন্দেহভাজন লেখকদের মধ্যে রয়েছেন স্কট ফিটজেরাল্ড, জীদ্‌প্যাসো, থিয়োডর ড্রেইসার, উইলিয়ম ফকনার, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, জন স্টেইনবেক, আপটন সিনক্লেয়ার, উইলিয়ম ম্যারোয়ান, লিলিয়ান হেলমেন, টেনেসি উইলিয়ম, জন চিভারের মতো ব্যক্তিরা। এই মহান লেখকেরা সকলেই এখন প্রয়াত। প্রকাশিত খবরে জানা যাচ্ছে যে মোট ১৩৪ জন সম্পর্কে এই ধরনের ফাইল খোলা হয়েছিল। সবচেয়ে পুরনো ফাইল হল

দুটি; একটি কার্ল স্যাণ্ডবার্গের অপরটি জন রীডের। জন রীড ১৯১৮ সালেই রুশবিপ্লব সম্পর্কিত তাঁর লিখিত তথ্য নিয়ে আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিবরণী বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

এদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের দুএকটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ১৯২৩ সালে প্যাসো যখন রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের সাহায্য করবার জন্য গঠিত একটি আমেরিকান গণসংগঠনে যোগ দেন তখন থেকেই তিনি এফ. বি. আই-এর বিষদৃষ্টিতে পড়েন। এডনাসেন্ট ভিনমেন্ট মিলে সোভিয়েত রাশিয়া বান্ধব সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু ট্র্যাক্টর কিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবায় কৃষি খামারগুলিতে পাঠানো। অবশ্যই এটা মারাত্মক অপরাধ। তাই এই বিখ্যাত মহিলা কবিও এফ. বি. আইয়ের চোখে কমিউনিস্ট। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সিনক্লেয়ার লুইসকে একেবারে খরচের খাতায় ধরে রাখা হয়েছিল। রাশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রাখার জন্য ১৯২৯-এ আমেরিকান সমিতি গঠিত হয়। ইনি তাঁর সংগঠক ছিলেন এবং ১৯৪১ সালে সোভিয়েত সাহিত্যিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য বিশ্বের ফ্যাসিবিরোধী লেখকদের কাছে তিনি আবেদনও জানিয়েছিলেন। অতএব এফ. বি. আই প্রথম থেকেই সিনক্লেয়ার লুইসকে কমিউনিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। থিয়োডর ড্রেইসারের অপরাধ নাকি আরও ভয়ানক। তিনি নাকি সোভিয়েত মতাদর্শ তার সাম্প্রতিক রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আর একজন বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখিকা পার্ল বাক বিপজ্জনক কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে সেখানকার সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ক কিছু পত্র-পত্রিকায় অর্ডার দিয়েছিলেন। অবশ্যই ডাকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই 'ভয়ানক' পত্রপত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

ঠগ বাছতে গিয়ে প্রায় গাঁ উজোড় হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। জন স্টেইনবেকের বই সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপুলসংখ্যায় রুশভাষায় অনূদিত হয়। অতএব তিনি সেদেশে আমেরিকান বিরোধী প্রচারে সহায়তা করে চলেছেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে তিনি অনেকবার সোভিয়েত ইউনিয়নে গেছেন। তাছাড়া তিনি সোভিয়েত পত্রিকা 'নোভি মীর' থেকে ৪২০ ডলার রয়্যালটি হিসেবে পেয়েছেন। সমস্তের চেয়ে দেশদ্রোহিতা আর কি হতে পারে? টেনেসি উইলিয়ম ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত আর্ট : আমেরিকা ভ্রমণে সাহায্য করেছিলেন, অতএব তিনি আমেরিকা-

বিরোধী। আর বিখ্যাত কবি রবার্ট লাওয়েলের অপরাধের তো কোন তুলনাই নেই। সোভিয়েত কবি আঁদ্রেই ভোজনেসেন্স্কি ১৯৬৭ সালে তাঁকে একটি দীর্ঘ কবিতা উৎসর্গ করেছিলেন এবং তিনি প্রতিদান হিসেবে এই কবির লেখা ইংরেজীতে অনুবাদ করে নিউইয়র্ক শহরের একটি অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিলেন। সর্বনাশের আর বাকী থাকল কি।

নিউইয়র্ক টাইমসের হার্বার্ট মিটগ্যাদের এই সমস্ত ফাইলপত্র দেখে ধারণা হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত এফ. বি. আই আজকের দিনের লেখকদেরও ফাইল তৈরি করে চলেছে। নর্মান মেইলার, এডগার ডক্টরো, আর্থার মিলার বা অ্যালেন গিন্‌সবার্গের মতো লেখকেরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে তাদের ফাইল রয়েছে এবং তাদের কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ করা হয়। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে হঠাৎ এফ. বি. আই এই গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবার অনুমতি দিল কেন? এটা তাদের কোন গণতন্ত্র প্রেম বলে মনে হয় না। কেউ কেউ এমনকথাও মনে করেছেন যে সোভিয়েত লেখকদের সঙ্গে আমেরিকান লেখকেরা যাতে আর বেশী গা ঘেঁষাঘেঁষি না করেন তার জন্যেই এটা একটি আগাম সতর্কবাণী। তা যাই হোক এই সমস্ত লেখকদের পক্ষেও একটা প্রবল যুক্তি আছে। এরা কেউই কমিউনিষ্ট নন, কিন্তু এরা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্বসমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল। এঁরা বিশ্বমানবতার আদর্শে বিশ্বাসী। তাই মহান অক্টোবর বিপ্লবের মানবতাবাদের মন্ত্র এদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল। সোভিয়েত সেই চরমতম দুর্দিনে এদের অনেকেই আন্তরিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের দেশকাল নিরপেক্ষ আবেদনের এ এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

* এ রাজ্যে বর্তমানে ৬৮ লক্ষ পরিবার সমবায়ের আওতায় এসেছেন।
* সর্বজনীন সদস্যপদ কর্মসূচী বলে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীগুলির ৭ লক্ষ ৬২ হাজার পরিবারকে এ পর্যন্ত সমবায়ের সদস্য করা হয়েছে।
* ১৯৮৬-৮৭ সালে কৃষিজীবীদের ৫২ কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, আগের বছর দেওয়া হয়েছিল ৪৩ কোটি টাকা। সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করেছে ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।
* সমবায় বিপণন সমিতিগুলি মূল্য-পরিপোষণ কর্মসূচীতে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার গাঁট পাট কিনেছে এবং ২ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিকটন সার বিলি করেছে।
* ১৯৮৬-৮৭ সালে ক্রেতা সমবায়গুলি ২০০ কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্যপণ্য বিক্রি করেছে।
* মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাড়ির সমস্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সমবায় আবাসন সমিতিগুলি ১৯,২৮৩ টি ফ্ল্যাট / বাড়ি তৈরি করেছে।
* আলু রাখার জন্য আছে ৩৫টি সমবায় হিমঘর, সেগুলির মোট ক্ষমতা ১ লক্ষ ২৬ হাজার মেট্রিক টন। ৮টি ইউনিট শীঘ্রই খোলা হবে। বর্তমানে ১৫২৪টি সমবায় গুদাম আছে, সেগুলির মোট ক্ষমতা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (৩) কর্মসূচী অনুযায়ী মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৭০০টির মত গুদাম তৈরি করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৫১১৬/৮৭

পরিচয়

৫৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮৭ পৌষ ১৩৯৪

প্রবন্ধ

গুলি বেঁধা বুকে উদ্ধত তবু মাথা গৌতম চট্টোপাধ্যায় ১
সমন্বিত রূপকল্প : এই সময়ের ছবি মৃণাল ঘোষ ৮
চার্বাক : প্রত্যক্ষই প্রমাণ শ্রেষ্ঠ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৯
উত্তরবাংলার লোকসমাজ : দেশী-পলি-ক্ষত্রী শিশির মজুমদার ৭৭
লেনিনের সাংবাদিক জীবনের দিনপঞ্জী কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৬

গল্প

লেবুবাগিচায় আলেকস লা গুমা ৪১
ফেরা রাধাপ্রসাদ ঘোষাল ১১৮

স্মৃতিকথা

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক সৌরি ঘটক ৯৫

নাটক

অশান্ত নহুষ শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ৫১

কবিতাগুচ্ছ

মণীন্দ্র রায় গোলাম কুদ্দুস ২৭—২৮
রণজিৎ সিংহ ১১২ বিশ্বজিৎ পণ্ডা ১১৫

আলোচনা

মৌলবাদ প্রসঙ্গে দু'চার কথা বাসব সরকার ৪৬

পুস্তক আলোচনা

কল্লোল থেকে দূরে অমল সেনগুপ্ত ১২৭

সংস্কৃতি সংবাদ

বেয়নেটের আড়ালে মুন্সী প্রেমচাঁদের রঙ্গশালা পূর্ণচন্দ্র তালুকদার ১২৫

বিরোধপঞ্জী

হেমাঙ্গ বিশ্বাস পার্থপ্রতিম কুণ্ডু ১২৮

পাঠকগোষ্ঠী

প্রসঙ্গ : চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষাৎকার সুস্নাত দাশ ১৩০

প্রসঙ্গ : পরিচয় মণীন্দ্র রায় ১৩১

প্রচ্ছদ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও
ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৩, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

গুলি বেঁধা বুকে উদ্ধত তবু মাথা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৪২-এ "ভারত ছাড়" সংগ্রামের সময়, ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল ঘোষণা করেছিলেন "ভারত সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সাধনের জন্য আমি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রধানমন্ত্রী হইনি"। তার মাত্র ৪ বছর পরে, ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের অন্যতম নেতা, অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক রিচার্ডস, ভারত সফরের পর লণ্ডনে ফিরে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে বলেন: "যতশীঘ্র সম্ভব আমাদের ভারত ত্যাগ করা উচিত, নইলে ভারতীয়রা আমাদের লাথি মেরে বিতাড়িত করবে।"

মাত্র চার বছরের মধ্যে এমন কি ঘটে গেল, যাতে ইংরেজ শাসকবর্গ এমনভাবে মত পরিবর্তন করলেন? ১৯৪২-এর "ভারত ছাড়" আন্দোলনেই ৯ আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ সরকারের শাসনযন্ত্র, প্রায় নিরস্ত্র ভারতীয় জনগণের গণবিদ্রোহের আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছিল, বিপর্যস্ত হয়েছিল রেলপথসহ প্রায় সমগ্র যানবাহন ব্যবস্থা। বেশ কয়েকটি অঞ্চলে—সাতারা, আজমগড়, বালিয়া, ভাগলপুর, তমলুক, কাঁথি—কয়েকমাস ইংরেজ শাসনের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল স্বাতন্ত্র্যের এক ধরণের বিকল্প।

পরে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র সশস্ত্র শক্তিকে ব্যবহার করে, বহু গ্রাম জ্বালিয়ে, ব্যাপক নরহত্যা ও নারী ধর্ষণ করে, বিমান থেকে গুলিবর্ষণ করে, প্রচণ্ড হিংস্রতার সঙ্গে ভারত সরকার "ভারত ছাড়" আন্দোলনের তখনকার মত পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। অদূরদর্শী বড়লাট লিনলিথগো সেই জয়কে চূড়ান্ত ভেবে, আগা খাঁর প্রাসাদে বন্দী গান্ধীজিকে উদ্ধত চিঠি লিখে বলেছিলেন যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার তোয়াক্কাই করে না। ভারতের জনগণের সুপ্ত ও নিহিত শক্তিতে স্থির প্রত্যয় রেখে বন্দী গান্ধীজি তাঁর শান্ত অথচ দৃপ্ত জবাব দিয়ে লিখেছিলেন "হাম যব কদম উঠায়গা হিন্দুস্থান হিল যায়েগা"।

এই একই যুগে বাংলার সংগ্রামী জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু, ভারতের বাইরে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে প্রধানতঃ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে দেশ-

প্রেমিকদের নিয়ে গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথে ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে। সেই সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্তু ভারতীয়দের মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার আগুন জ্বেলে দিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের রাজদ্রোহিতার অপরাধে ভারত সরকার বিচার আরম্ভ করলে, ভারতবাসীর যুদ্ধকালীন জমা হওয়া ক্ষোভ ও ক্রোধ বারুদের স্তূপের মত জ্বলে উঠল।

১৯৪৫-এর ২১ ও ২২ নভেম্বর প্রথমে কলকাতার ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির দাবীতে ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করে। ধর্মতলা ষ্ট্রীটে তাদের উপর ইংরেজ সৈন্য গুলি চালালে, প্রতিবাদে কলকাতা ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে হরতাল পালন করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাধারণ মানুষ কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির তেরঙ্গা, সবুজ ও লাল পতাকা একত্র বেঁধে উড়িয়ে দেয়—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে।

কলকাতার সংগ্রামী ছাত্র, শ্রমিক ও জনগণের এই সংগ্রামে পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে শহীদ হন অর্ধ শতাধিক নরনারী, যাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন ছাত্র, শ্রমিক ও বস্তির নওজোয়ান—রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুস সালাম।

কদম রসুল, আরও অনেকে, কলকাতার সঙ্গে সৌহার্দ্য জানিয়ে হরতাল ও ধর্মঘট পালন করেন সারা বাংলাদেশ ও ভারতের সব কটি প্রধান শহরের মানুষ। তাদের মুখে রণধ্বনি ছিল শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিই নয়, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের।

ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের উচ্চতম মহল ১৯৪৫-এর নভেম্বরে কলকাতার গণঅভ্যুত্থানকে, সারা ভারতে বিপ্লবের অশনি সঙ্কেত বলে মনে করেন। ভারত ইংরেজ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক ক্লড্ আকিন্‌লেক, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে এক জরুরী গোপন পত্রে লেখেন যে সামনের শীতকালে ও বসন্তকালে ভারতে গণবিক্ষোভ গণবিদ্রোহের চেহারা ধারণ করবে। সেই গণবিদ্রোহ ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের চেয়েও ব্যাপক ও তীব্রতর হবে এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ ছাড়া সেই বিদ্রোহকে দমন করা যাবে না। দ্বিতীয়ত এই বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় সৈন্যদের উপর আর নির্ভর করা যাবে না।

সুতরাং হয় অবিলম্বে বহু ব্রিটিশ সৈন্যকে ভারতে পাঠাতে হবে, নয়তো ভারতের উচ্চশ্রেণীর নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তিতে এখনই আপস করে, গণবিপ্লবের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে হবে।

"ট্রান্সফার অব পাওয়ার" নামক প্রকাশিত দলিল-গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে লেখা এই চিঠিতে অকিনলেক দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে একথাও জানালেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারাও গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে, কারণ সেই সম্ভাব্য গণবিপ্লব শুধু ভারতে ইংরেজ শাসনেরই অবসান ঘটাবে না, ধনবাদী শ্রেণীর প্রভুত্বের ভিতকেও টলিয়ে দেবে।

ব্রিটেনের শাসকমহল সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে বিচার করেছেন, কিন্তু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসেন নি, এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষ জুড়ে অকিনলেকের সতর্ক বাণী বাস্তব চেহারা নিল। ১১, ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী ক্যাপ্টেন রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে কলকাতার ছাত্রসমাজ ধর্মঘট করল। তাদের উপর গুলি চালনা হল। এবার তার প্রতিবাদে সমগ্র কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে ১০ লক্ষ হিন্দু মুসলমান, বাঙালি—হিন্দুস্থানি শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘট ও ব্যারিকেডের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। ব্রিটিশ ফৌজ দিয়ে শতাধিক ছাত্র নওয়জোয়ানকে হত্যা করেও কলকাতার গণবিস্ফোরণকে স্তব্ধ করতে পারল না ব্রিটিশ রাজশক্তি। সারাভারতে সাধারণ ধর্মঘট হল। কলকাতার রাজপথে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পতাকা হাতে ৫ লক্ষ নরনারীর বিশাল মিছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসানের দাবি উঠল। ১৩ ফেব্রুয়ারির অমৃতবাজার পত্রিকাতে লেখা হল: কলকাতায় যা ঘটছে, তা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুমুসলমান জনশক্তির ঐক্যবদ্ধ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।

"ভারত ছাড়" আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী, কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তির প্রতিনিধি অরুণা আসফ আলি লিখলেন যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে হিন্দুমুসলমানের একতা গড়া যাবে না। কলকাতার গণবিদ্রোহ রাস্তা দেখিয়েছে কেমন করে স্বাধীনতার নির্ভীক সংগ্রামে হিন্দুমুসলমানের রক্তের রাখীবন্ধন করা যায়।

দুঃখ, বেদনা ও দুর্ভাগ্যের কথা, জাতীয় নেতৃত্বের বৃহৎ অংশ এই গণবিদ্রোহকে সমর্থন করার বদলে এর নিন্দা করলেন, ইংরেজের বুলেটের সামনে ব্যারিকেড রচনা করে যারা মৃত্যু ভয়হীন লড়াই করেছিল, সেই বীর জনগণকে তাঁরা "গুণ্ডা" বলতেও সঙ্কোচ করলেন না। প্রকাশ্য বিবৃতি ছাড়াও তাঁরা

বাংলার শ্বেতাঙ্গ গভর্ণর কেসীকে গোপন চিঠিতে আশ্বাস দিলেন যে গণবিদ্রোহ দমনে, তাঁদের সমর্থন রইল। কেসী ও বড়লাট ওয়াভেল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে জানালেন যে—"গুণ্ডা, চরমপন্থী ও কমিউনিস্টরাই" এই গণবিদ্রোহকে উৎসাহ দিচ্ছে, "দায়িত্বশীল নেতারা এর বিরুদ্ধে।" (ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড)

কলকাতার বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতেই, বোম্বাই, করাচীতে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলেন ভারতীয় সেনারা। ১৮৫৭-র পর এই সর্বপ্রথম ভারতের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর একাংশের কামান, ব্রিটিশ রাজশক্তির কামানের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন সংগ্রামী নৌসেনাদের পাশে। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইএর রাজপথে ইংরেজ সৈন্য ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে কমিউনিস্টনেত্রী কমল দোনে সহ প্রায় পাঁচশত শ্রমিক, নওজোয়ান ও ছাত্রকে হত্যা করলেন। সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল সারা ভারতে। ইংরেজের বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহী নৌসেনাদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলেন। ধর্মঘট করলেন ভারতীয় জঙ্গী বৈমানিকরা।

গণবিপ্লবের উত্তাল ঝড়ে সাম্রাজ্যের ধ্বংস প্রায় অনিবার্য বুঝে, দূরদর্শী অ্যাটলি সরকার তৎক্ষণাৎ আপস [illegible]লেন, বিপ্লবভীত ভারতীয় ধনিক নেতৃত্বের সঙ্গে। ২২ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টে অ্যাটলি ঘোষণা করলেন যে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শীঘ্রই ইংলণ্ড থেকে মন্ত্রিমিশন ভারতে যাচ্ছে। ভারতের কংগ্রেস ও লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব স্বাগত জানালেন এই ঘোষণাকে এবং নৌবিদ্রোহ ও শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটকে "দায়িত্বজ্ঞানহীন" এবং "কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র" বলে নিন্দা করলেন ও অবিলম্বে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পনের সুপারিশ করলেন। এমনকি এ কথাও বলা হল যে সশস্ত্র গণবিদ্রোহের ও ব্যারিকেড সংগ্রামের পথে যদি দেশব্যাপী হিন্দুমুসলিম ঐক্য গড়ে ওঠে, তবে সে ঐক্য "অশুভ ও অন্যায়"!

কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের বিরোধিতায় পরাজিত হল গণবিদ্রোহ, ইংরেজ রাজশক্তির ক্ষমতা ছিল না যাকে অস্ত্রশক্তির জোরে পরাস্ত করার। অসমাপ্ত রয়ে গেল ভারতের সম্ভাবনাময় গণবিপ্লব। তবু হাল ছাড়েন নি ভারতের সচেতন ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী। ১৯৪৬-এর জুন-জুলাই মাসে সারা ভারত ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে ভারতব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট এক বৈপ্লবিক গণ-

জাগরণের রূপ ধারণ করল। ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই কলকাতা ও শহরতলীতে কার্যত ইংরেজ শাসনের চিহ্ন বিলুপ্ত হল সেদিনের মত।

কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রিমিশন আলাপ আলোচনার ফাঁদে ভারতের জাতীয় নেতৃত্বকে জড়িয়ে ফেলে, সুচতুরভাবে ব্যবহার করল তাদের চিরাচরিত ভেদ সৃষ্টির হাতিয়ারকে। তাদের সুযোগ করে দিল দেশের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক শক্তিরা। ঐক্যবদ্ধ ভারত না খণ্ডিত ভারত ও পাকিস্তান—এই বিতর্কে উত্তপ্ত ও দ্বিধাবিভক্ত হল সারা দেশ। ১৯৪৬-এর ১৬ আগষ্ট উত্তাপ কলকাতায় প্রজ্বলিত করল কলঙ্কময় ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধকে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল নোয়াখালি, বিহার শরীফ, দিল্লী ও সর্বোপরি পাঞ্জাবে। প্রাণ হারাল হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ।

সাম্প্রদায়িকতার সেই উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যেও আশার ও ঐক্যের দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সংঘঠিত শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষক। কলকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দ্বীপের মতন জেগেছিল ট্রাম শ্রমিকদের বাসস্থানগুলি, যেখানে হিন্দুমুসলমান ট্রাম শ্রমিক বুকের রক্ত দিয়ে পরস্পরের জীবন ও নিরাপত্তাকে রক্ষা করেছিলেন। নোয়াখালির দাঙ্গাকে পাশের জেলা কুমিল্লাতে ছড়াতে দেন নি, সীমান্তের হাসনাবাদ থানার বীর মেহনতী চাষিরা, হিন্দুমুসলমান একত্র হয়ে সেখানে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে রুখে দিয়েছিলেন দাঙ্গাবাজাদের।

দলমত ধর্ম নির্বিশেষে বহু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন ভ্রাতৃহত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত, ১৪ বছর কারাবাসের পর সদ্যমুক্ত বিপ্লবী বীর লালমোহন সেন শহীদ হন সন্দীপে দাঙ্গা রুখতে গিয়ে। সর্বোপরি অকুতোভয় গান্ধীজি পদযাত্রা করেন, প্রথমে দাঙ্গা বিধবস্ত নোয়াখালিতে, পরে বিহার শরীফে, হিন্দুমুসলমানের মিলনের মন্ত্র নিয়ে।

১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭-এর মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় এককোটি হিন্দুমুসলমান, আদিবাসী খেতমজুর, ভাগচাষি ও গ্রামীণ গরিব মানুষ তেভাগার লড়াইএ গ্রামাঞ্চলে দুর্জয় একতা গড়ে তোলেন—সাম্প্রদায়িক শক্তিরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তেভাগার লড়াইএর অগণিত শহীদদের নাম—তনোরায়ণ, বাচ্চা মহম্মদ, বিয়ার শেখ, যশোদা—সেই সংগ্রামী ঐক্যেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে, দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও সংঘর্ষের সামনে

উপরতলার জাতীয় নেতৃত্বের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে, ভারতের নতুন বড়লাট মাউন্টব্যাটেন, ১৯৪৭-র ৩রা জুন ভারত-ব্যবচ্ছেদ এবং ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ও স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ নির্দিষ্ট হল ১৫ আগস্ট।

১৯৪৭-এর জুলাই ও আগস্ট মাস জুড়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অব্যাহত রইল কলকাতা মহানগরীতে এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত গৃহযুদ্ধের চেহারা ধারণ করল সমগ্র পাঞ্জাবে। মনে হল ঐক্যের ও শুভবুদ্ধির শক্তি বুঝি বিলুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু তা হয়নি মাটির নীচে জলস্রোতের মত সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের কামনা জেগেছিল চেতনার গভীরে।

তাই দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে যেন ভোজবাজির মত সজ্জিত হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ও ঐক্যের উৎসবে। ইডেন হিন্দু হস্টেলের ছাত্রদের আমন্ত্রণ করে মিষ্টিমুখ করালেন পাশের কলাবাগান বস্তীর মুসলমানরা। উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত বাড়ির শতশত হিন্দু মহিলা, সীমন্তে সিঁদুর পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে গেলেন চিৎপুরের নাখোদা মসজিদে, যে মসজিদ ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রি থেকে সমগ্র ১৫ আগস্ট রূপান্তরিত হল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এক আশ্চর্য তীর্থক্ষেত্রে।

রাজাবাজারের যে নওজোয়ানরা দুদিন আগেও অ্যাসিড ছুঁড়েছেন হিন্দু বাসযাত্রীদের দিকে ১৫ আগষ্ট সারাদিন তাঁরাই সুগন্ধি আতর ছুঁড়েছেন, মাখিয়েছেন পথচারী হিন্দু ভাইদের। ভবানীপুর অঞ্চলের যে শিখরা উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে দুদিন আগে আক্রমণ করেছেন পার্ক সার্কাসের মুসলিমদের, ১৫ আগস্ট তাঁরাই গুরুদ্বারে ডেকে এনে ভোগ খাওয়ালেন সেই মুসলমান নগর বাসীদেরই। যে যাদুমন্ত্রে হিন্দু মুসলমান শিখদের ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত বিরোধ, রাতারাতি মিলনের অভূতপূর্ব উৎসবে রূপান্তরিত হল, সে যাদুমন্ত্রের নাম স্বাধীনতা, যা অর্জনের জন্য সমগ্র ১৯৪৫-৪৬ ধরে একত্রে ধর্মঘট সংগ্রামে, মিছিলে, ব্যারিকেডে বুকের রক্ত ফেলেছেন কলকাতার, বাংলাদেশের ভারতের অগণিত সাধারণ মানুষ।—

তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শৃঙ্খল মুক্ত স্বাধীনতার একটা স্পষ্ট অর্থ ছিল, শুধু বিদেশীর দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি নয়, দারিদ্র্যের অভাবের, শোষণের হাত থেকেও পরিপূর্ণ মুক্তি। আর সেই পরিপূর্ণ মুক্তি পেতে গেলে কলে কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, কলেজে-দপ্তরে হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-হিন্দুস্থানী সব

ধর্মের, সব জাতপাতের, সব ভাষাভাষী মানুষের ঐক্যই যে একমাত্র উপায়, তা তাঁদের চেতনার গভীরে দাগ কেটেছিল। আবার উপরতলার নেতারা স্বাধীনতার কালের ভাগাভাগি নিয়ে বিভেদের সর্বনাশা খেলায় মেতেছিলেন, তাও যথেষ্ট বিভ্রান্ত করেছিল নীচের তলার মেহনতী মানুষকে। সেই টানা-পোড়েনেই সাময়িকভাবে তাঁরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন, ভেসে গিয়েছিলেন ভ্রাতৃঘাতী বিভেদের চোরাবালিতে।

অথচ চেতনার গভীরে জেগেছিল একত্রে লড়বার ও বাঁচবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাই দেশ স্বাধীন হচ্ছে জানতে পেরে, তাঁদের ঐক্যের কামনা ও বাসনা উগরে ঠেলে উঠে, ১৫ আগস্ট ভেদপন্থাকে পরাজিত করে, মেতে উঠেছিল স্বাধীনতার, সংগ্রামী ঐক্যের, পরিপূর্ণ গণমুক্তির সূর্যকরোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নময় উদ্দাম উৎসবে।

৪০ বছর পরে যারা আজ মধ্য যৌবনে, যারা আজ তরুণ, যারা কিশোর ও যারা সবে চোখ মেলছে—তাদের কাছে ১৯৪৭-এর ১৫ আগষ্ট একটা গল্প কাহিনী মাত্র। ইতিহাসের বই-এ লেখা থাকে কতকগুলি সন তারিখ, আর কিছু নৈরাশ্যময় জীবন তথ্য। ১৯৪৫-৪৬ এর শৌর্যখণ্ডিত সমবিদ্রোহের কথা তাদের জানানো হয় না। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের মধ্যেও যে মানুষরা সম্প্রীতি ও ঐক্যের পতাকাকে উড়িয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের কীর্তি ও ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্টের সেই উদ্দাম মিলনোৎসব আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

অথচ এই সবই আজও, ১৯৮৭তে আমাদের এগিয়ে যাবার অমূল্য পাথেয়। তারই সামান্য পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে।

সমন্বিত রূপকল্প: এই সময়ের ছবি

মৃণাল ঘোষ

১

'ঘরোয়া'র স্মৃতিচারণায় প্রায় শুরুতেই বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, 'দেখো শিল্প জিনিসটা কী, তা বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারলে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে—যাই বলো।' 'শিল্প হচ্ছে শখ'—এই কথাটিকে সূত্র করে নানা ভাবে বোঝার চেষ্টা হয়েছে অবনীন্দ্রনাথকে। সেই চেষ্টার দুই প্রান্তে রয়েছে দুই বিপ্রতীপ ভাবনা। কেউ এর মধ্যে দেখেছেন লীলাবাদের উৎস। কেউবা সমাজ চিন্তার নিরিখে অপাংক্তেয় নিছকই কলাকৈবল্যবাদী ভেবেছেন তাঁকে।

এ কথা ঠিকই 'লীলা'র প্রসঙ্গ এসেছে একাধিকবার অবনীন্দ্রনাথের কথায় লেখায়, নানা ভাবে। যেমন বাগেশ্বরী বক্তৃতায় বলছেন, 'এমনি রূপ সমস্ত দিকে জলেস্থলে আকাশে বন্দী থাকে—আর্টিস্টকে খোঁজে তাঁরা সবাই, তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন একজন খেলুড়ে আর্টিস্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া রূপ সকলে।'

এক দিকে শখের ধারণা অন্য দিকে লীলার তত্ত্ব এই দুই-এর মধ্যে কি থেকে যায় না এক স্ববিরোধিতা? এই আপাত স্ববিরোধিতা ফুটে ওঠে অবনীন্দ্রনাথের লেখাতেও, 'মানুষ প্রথম থেকেই এই রূপবিদ্যাকে তার লীলার সহচরী বলেই গ্রহণ করেছে এবং এখনো সেই ভাবেই একে দেখছে'। রূপ-বিদ্যাকে যারা শখের দিক থেকে দেখতে চলে তারা নেশা ছুটলে অন্য কিছুতে লেগে যায়, কিন্তু রূপবিদ্যা যার কাছে সত্য হয়ে উঠল, সেই বললে এ খেলা নয়, এ লীলা।...খেলার নেশা ছুটলে খেলা থেমে যায়—কিন্তু লীলার অবসান নেই, আজীবন রূপদক্ষ মানুষের কাছে লীলাময়ী, মায়াময়ী বিশ্বরূপিণী' এই উক্তিকে অনুসরণ করে সত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর 'অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব' গ্রন্থে এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন—'খেলা-তত্ত্ব অতিক্রম করে (অবনীন্দ্রনাথ) পৌঁছন লীলা-তত্ত্বে শিল্পবৃত্তির স্বরূপধর্মকে লীলা বলতে তাঁর আপত্তি নেই।' তিনি বলেছেন 'মূল কথাটা এই যে, দুজনেই (রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ) প্রে-

থিওরির অসম্পূর্ণতা লক্ষ করেছেন। পরিবর্তে দুজনেই লীলাতত্ত্ব অনুমোদন করেছেন।

শিল্প থেকে উদ্ভূত রস বা আনন্দের উপলব্ধিকে আমরা যদি মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে নেই, তাহলে দেখা যাবে চার ভাবে এর স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে। এই চারটি বিভাগ অনেকটা এরকম : প্লেটো বা ফ্রয়েড সমর্থিত মনস্তাত্ত্বিক-শারীরিক আনন্দ, আমাদের ভারতীয় নন্দন-তাত্ত্বিক অভিনবগুপ্ত বা জগন্নাথ অনুসৃত অধ্যাত্মিক আনন্দের তত্ত্ব, অ্যারিস্টটল, অষ্টাদশ শতকের অ্যাডিশন বা বিংশ শতকের ক্রোচে উদ্ভাবিত কল্পনা ও সজ্ঞাজাত আনন্দ, এবং ব্রাডলি, ক্লাইভ বেল, কাণ্ট বা হেগেলের অলৌকিক মরমী আনন্দ। শিল্পকে 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা' বলেন যখন অবনীন্দ্রনাথ তখন তিনি কি শেষোক্ত এই চৈতন্যের মরমী উল্লাসের সত্যকে সমর্থনের দিকেই যেতে চান? এরকমই এক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছিলেন রতন পরিমু 'রিভাইভালিজম অ্যাণ্ড আফটার' নামে তাঁর এক প্রবন্ধে।

এই মরমী উল্লাসের তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে কুমারস্বামীর তত্ত্বের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সামান্য কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যেতেও পারে। প্রথম দিকে স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় নিবেদিতা, স্টেলা ক্রামরিশ বা কুমারস্বামীর অনুসরণে তাঁকে সদর্থক ভাবেই পুনরুজ্জীবনবাদী বলেছেন অনেকে। পরে পুনরুজ্জীবনবাদী অভিধাই নঞর্থকতায় ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু যে কোনো পুনরুজ্জীবনবাদী তত্ত্বের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ব্যবধান যে দুস্তর এ বিষয়ে আজ আর কোনো দ্বিমত নেই।

একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রচলিত অর্থে ভারতীয়তার ধারণার বিরোধিতার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের সন্ধানের সত্য স্বরূপ। 'শিল্পচর্চা একটা সাধনাই, শখ ত নয়'—নন্দলাল বসু তাঁর শিল্পকথায় এরকমই এক চকিত মন্তব্য করেছিলেন একবার। অবনীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে এর তুলনা করলে আমরা যেন পেয়ে যাই আধুনিক যুগে ধ্রুপদী ভারতীয়তার দুই ভিন্ন স্বরূপ। 'মহাপ্রাণ রূপে রূপে ছন্দিত হচ্ছে, এই উপলব্ধি ছাড়া শিল্পসৃষ্টির অন্য কোনো হেতু নেই'—বলেছেন নন্দলাল বসু। পূর্ব-নির্দিষ্ট বা পূর্বনির্ধারিত এরকম কোনো আদর্শান্বিত স্বরূপের অস্তিত্ব ছিল না অবনীন্দ্রনাথের চেতনায়।

তাঁর ছিল বরং এক হয়ে ওঠা। 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-তে কি অনুপম উপমায় বলেছেন, 'সবারই একটি করে জন্মতারা থাকে, আমারও আছে।

সেই আমার জন্মতারার রশ্মি পৃথিবীর বুকে অন্ধকারে ছায়াপথ বেয়ে নেমে পড়েছে অগাধ জলে। সেই দিন থেকে তার চলা শুরু হয়েছে।—তারপর একদিন চলতে চলতে, ঝিক ঝিক করতে করতে যখন এসে ঘাটে পৌঁছল, পৃথিবীর মাটিতে ম্লান আলো ঠেকল, সেখানে কী হল? না সেখানে সেই আলো একটি নামরূপ পেলে, সেই আমি।' অবনীন্দ্রনাথের আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যে এরকম এক চিরায়তের প্রতিফলন আছে।

হেনরি মুরের 'ফর্ম ইটসেলফ' তত্ত্বের সঙ্গে শেষ জীবনের অবনীন্দ্রনাথের তুলনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ। বলেছেন 'হেনরি মুর অবশ্য এই ফর্ম দিয়েই পেতে চেয়েছিলেন মানবেতিহাস, মানবমনের জটিল সংঘর্ষ।' আর সেরকম কোনো সংঘর্ষ বা সাযুজ্য আবিষ্কারের দিকে না গিয়ে 'অবনীন্দ্রনাথ কেবল রূপের জন্যই গড়ে তোলেন রূপ।' কোনো গহন তাৎপর্য কি আছে এসবের? এই প্রশ্ন তোলেন শঙ্খ ঘোষ। এক উত্তরের আভাসও নিয়ে আসেন না তিনি, তা নয়। অবনীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিতেন তাঁর শেষ বয়সের কথকথার শ্রোতাদের 'আজ ঘরে যাও, কাল এসো ঠিক এই সময়ে।' আর এই আশ্বাসের মধ্যে থাকত এক আশা—'যে আজ যদি তেমন কিছু নাও মেলে··· কাল হয়ত আমাদের গল্প তুলে আনতে পারবে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত কোনো প্রাসঙ্গিক পৃথিবী।' কিন্তু এর চেয়েও বড় তাৎপর্য হয়ত, শঙ্খ ঘোষ যেমন বলেছেন, 'এর মধ্য দিয়ে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে বেরিয়ে পড়বার আগ্রহ, আর তুচ্ছকে দেখবার চোখ, রূপের জন্য রূপকে দেখবার চোখ।'[১২]

'রূপের জন্য রূপ' আর 'শিল্প হচ্ছে শখ' এই দুটি কথা অবনীন্দ্রনাথের কাছে হয়ত একই তাৎপর্যের ইঙ্গিত বহন করে। 'শখ' এখানে সাধনার বিপরীত কোনো অভিধা যে নয় অবনীন্দ্রনাথের যে কোনো পাঠক বা দর্শকই তা উপলব্ধি করবেন। তাহলে 'শখ' কথাটির তাৎপর্য কোথায়?

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগের সেই সময়ে ঔপনিবেশিকতার ফলশ্রুতিতে উচ্চকোটির জীবনধারায় প্রয়োজনের দর্শনই হয়ে উঠেছিল স্বরাট। সৌন্দর্যের বা শিল্পের গভীরতর কোনো ভিত্তি ছিল না সমাজে। ছিল না গভীরতর কোনো সত্যের অনুধ্যান! সবটাই উপরিতল সর্বস্ব বাস্তবতার প্রতিরূপ শুধু। জৈবিকতায় নিঃশেষিত সমস্ত মানবধর্ম। ইংরেজের আমদানী করা আকাডেমিক বাস্তবতা ও তারই অনুকরণে তথাকথিত ভারতীয় কাহিনী ভিত্তিক চিত্রচর্চা এর কোনোটির মধ্যেই সেখানে কোনো উজ্জীবনের মন্ত্র নেই।

প্রয়োজনমুখী সেই জীবনচর্চায় সেই জৈবিকতার বিরোধিতাই কি আভাসিত হয় এই 'শখ' শব্দটির মধ্যে ? এর মধ্যে কি আছে তাঁর অভিপ্রেত শৈল্পিক স্বাধীনতার কোনো ইঙ্গিত, যে স্বাধীনতা শিল্পের মধ্যে ছিল না সেই সময়ে ?

এক দিক থেকে দেখতে গেলে শিল্পীর স্বাধীনতা ও শিল্পের স্বাধীনতাই হয়ে উঠেছে অবনীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনার মূল বিষয়। কোনো প্রচলিত রীতির বা নীতির অন্ধ অনুসরণ তিনি করেন নি। কি শিল্পচর্চায়, কি নন্দন ভাবনায় একটি স্বাধীনতার ক্ষেত্র নির্মাণের মধ্য দিয়েই অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক চিত্রকলায় খুলে দিয়েছেন এক মুক্তির আকাশ।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা এ অর্থেই এক সমন্বয়ের সাধনা। তাঁর উচ্চারণে, 'অনুপমের মধ্যে রূপ, রূপের মধ্যে অনুপম, অনির্দিষ্ট জ্যোতি অবগুণ্ঠনে সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট রূপের গর্ভে অনির্দিষ্ট জ্যোতি রসিকের কাছে, দুয়ের উচ্চ-নীচ ভেদ কোথায়।'

২.

এই সময়ের ছবিতে সমন্বয়ের চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করব যখন আমরা, তখন অবনীন্দ্রনাথের সমন্বয়ের স্বরূপ বুঝে নেওয়া দরকার ঘনিষ্ঠভাবে। তা শুধু এজন্য নয় যে অবনীন্দ্রনাথেই আমাদের ছবির আধুনিকতার সূত্রপাত। তার চেয়েও বেশি এজন্য যে তাঁর সমন্বয়ের স্বরূপের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আধুনিকতার বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন তাৎপর্যে প্রভাবিত করেছে আমাদের ছবিকে।

অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু হয়েছিল যে বেঙ্গল স্কুল বা নব্য ভারতীয় ধারা, এই সমন্বয়ই ছিল সেখানে প্রধান সুর। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা চলে গিয়েছিল সংকীর্ণতার পথে। এতটাই, যে অবনীন্দ্রনাথকেও শেষ জীবনে বলতে হল 'ঘরোয়া'র-স্মৃতিচারণায়—'তা আমিও ছবি আঁকার বেলায় নির্ভয় তা করে দিলুম, দিয়ে এখন আমার ভয় হয় যে কী করলুম। এখন যা-সব নির্ভয়ে ছবি আঁকা শুরু করেছে, ছবি এঁকে আসছে—এ যেন সেই ব্রহ্মার মতো।'

অবনীন্দ্রনাথে প্রকৃত অর্থে ধ্রুপদী ভারতীয়তার কোনো অনুসরণ ছিল না। আঙ্গিকের নানা সমন্বয়ের মধ্যে যেভাবে তিনি ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতেন, যাকে তিনি বলতেন, ভাব দেওয়া, সেই ভাবের সঞ্চারই সাম্প্রতিকের মালিন্য থেকে মুক্ত করে ছবিতে এক চিরায়তের মাত্রা আনত। বেঙ্গল স্কুলের সফল শিল্পীদের মধ্যে অসিতকুমার হালদার, কে. ভেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন্দ্রনাথ দে,

ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার বা সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীদের ছবি এই মাত্রাতেই উজ্জ্বল হয়ে এক সর্বভারতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পেরেছিল বিংশ শতকের প্রথম তিন বা চারটি দশকে।

নন্দলাল বসুর ছবিতেই হয়ত প্রথম ধ্রুপদী ভারতীয়তা তার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনায় সংহত হয়ে এক সমগ্রতার রূপ নিল।

নন্দলাল বসু এই ধ্রুপদী অনুভবকেই তাঁর ছবির প্রধান সুর করে তুলেছিলেন। তাঁর কথায়—'সমুদয় জগৎ, অন্তরে বাহিরে সকল রূপ, যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান সত্তার সেই প্রাণছন্দকেই খুঁজি সমস্ত রূপে—কী সাধারণ আর কী অসাধারণ এই সমগ্রতার বোধ, এই প্রাণছন্দের অনুষঙ্গই সমন্বিত রূপকল্পের প্রধান সুর। বিরোধ নয়, সমন্বয়ের দিক থেকে প্রকৃতিকে ও জীবনকে দেখা।

১৯৩৮-এর ২১ ফেব্রুয়ারি অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—'কোনো একটা বড় উপদ্রবে মনের দর্পণ যখন বেঁকেচুরে গেছে তখন তাতে সংসারের যে প্রতিবিম্ব ত্যাড়াবাঁকা হয়ে পড়ে তাতে চিরকালের মানুষের সহজ ছবি পাইনে, সব কিছুর সঙ্গে একটা ব্যঙ্গ মিশে থাকে—সেটা হয়ত সেই সময়কার ঐতিহাসিক মেজাজের একটা তীব্র পরিচয় দেয় কিন্তু সেটা সবসময়কার নয়। যথার্থ সবসময়কার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ করতে পার। আমার মনে হয়—আছে। জগৎসংসার থেকে দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যে রসকে আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে, বলেছে হাঁ, তাকে সে স্থায়িত্ব দেবার জন্যে এমন একটা রূপ দিতে চেয়েছে যাকে বলা যায় সুসম্পূর্ণ, পার্ফেক্ট।' শিল্পের প্রকাশের দুই ভিন্ন নিরিখ পাই রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তায়। এর প্রথমটিকে বলি প্রতিবাদের প্রতিমা। দ্বিতীয়টিকে সমন্বিত রূপকল্প।

১৯২১-এ 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ইংরেজি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'Abstract truth may belong to science and metaphysics, but the world of reality belongs to art'. শিল্পের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্কে এক স্পষ্ট ঘোষণা আছে এখানে। অবনীন্দ্রনাথের 'শিল্প শর্থ', নন্দলালের 'শিল্প কল্পনা' আর রবীন্দ্রনাথের 'শিল্প বাস্তবতা', এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠল চল্লিশ দশকের পরবর্তী আধুনিকতার নন্দন। আনন্দ ও কল্পনা যেখানে বাস্তবতায় মিলল, সেখানে শিল্প হয়ে উঠল আধুনিকতার প্রকাশ।

চল্লিশের দশক থেকেই প্রতিবাদের নন্দন হয়ে উঠেছে আমাদের শিল্পের

প্রধান এক সুর। জটিল ও গভীর-প্রসারী বাস্তবতাকে রূপ দিতে আঙ্গিকগত এক সমন্বয়ের দিকে যেতে হল শিল্পকে। লোকায়তের উদ্বোধন ঘটছিল সুনয়নী দেবীর ছবিতেই প্রথম। যামিনী রায় সেই লোকায়তের মধ্যেই খুঁজে পেলেন আধুনিকতার অন্য এক মুক্তির ভাষা। আমাদের রাজনীতি ও সমাজ চেতনার মধ্য দিয়ে ২০-এর দশকের শুরু থেকেই ক্রমান্বয়ে জেগে উঠছিল যে গ্রামীণ ভারত সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনিবার্যতায়, সেই লোকায়ত ভারতীয়তার বাস্তবতা, দর্শন ও সৌন্দর্যচেতনাকে আত্মস্থ করতে পারলেন যামিনী রায়। আত্মস্থ করে তিনি যে স্বতন্ত্র শিল্পভাষা গড়ে তুললেন তাতে এক প্রশান্তির স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলই হয়ে উঠল তাঁর অন্বিষ্ট। একভাবে সমগ্রতার সাধনা বলা যায় তাকেও। সমন্বিত রূপকল্পের একটি প্রকাশ হিশেবেও ভাবা যায় তাকে। লোকায়তই প্রধান মাত্রা সেখানে। প্রধান কিন্তু একমাত্র নয় অবশ্যই। কেননা পাশ্চাত্য আঙ্গিক ও রচনাবিন্যাসের দক্ষতাই যামিনী রায়কে দিয়েছিল তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধি। তবু প্রকাশে লোকায়তই স্বরাট বলে সমন্বিত রূপকল্পের আলোচনায় তাঁকে না আনাই ভাল।

শিল্পে লোকায়ত চেতনা ও লোকায়ত আঙ্গিকের বিস্তার ঘটছিল ক্রমান্বয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ছবিতেও। একদিকে লোকায়তের এই উদ্বোধন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পভাষার আত্তীকরণ, এই দুই-এর সমন্বয়ে চল্লিশ দশকের শিল্পকলায় আসছিল এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মাণ ছায়ায় বাস্তবতার যে ক্ষয়িষ্ণু, ভেঙে পড়া রূপ, তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ মিশে, বাস্তবতাকে জটিলতর করেছিল। সেই বাস্তবতাকে যখন শিল্পে ধরতে চাইলেন সেই সময়ের শিল্পীরা, এতদিনকার ভারতীয়তার তথাকথিত সমগ্রতার চেতনা তাদের কাছে অপ্রতুল মনে হল। লোকায়ত ভারতীয়তার সঙ্গে পাশ্চাত্য রূপবন্ধের সমন্বয়ে গড়ে উঠল চল্লিশ দশক পরবর্তী শিল্পের স্বতন্ত্র এক আত্মপরিচয়।

এর পাশাপাশি সমগ্রতার চেতনা বা সমন্বিত রূপকল্পও নতুন এক পথ নিল। বেঙ্গল স্কুলকে ছাড়িয়ে, এমনকি নন্দলালকে ছাড়িয়েও সমন্বিত রূপ-কল্পের যে প্রগতির পথ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বা তারও পরে কিছুটা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছবিতেই যেন এক সুসংহত রূপ পেল। বিনোদবিহারী আবিশ্ব শিল্পের অন্তর্নিহিত সদর্থকতার সুরকে মিলিয়ে নিতে পারলেন ভারতীয়তার ধ্রুপদী প্রবাহের সঙ্গে। তাঁর 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' নামের বড় প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'চীন শিল্প-শাস্ত্রে 'চী' (Chi), ভারতে অলঙ্কার

শাস্ত্রে রস ও ধ্বনি, গ্রীক শাস্ত্রে সৌন্দর্য (Beauty) এইগুলি জীবনপ্রবাহকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। যখন এই জীবন প্রবাহের উপলব্ধি শিল্পী করে থাকে তখন জীবনের যে কোনো ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেও ঐ একই প্রবাহের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম। এই জন্যই মহৎ শিল্পের মধ্যে একটি ব্যাপকতার ইঙ্গিত আমরা পেয়ে থাকি যেটি শিল্পরূপকে বাস্তব থেকে, রূপান্তরিত করে। তখন তার আবেদন হয় অনির্বচনীয়।' আধুনিকের মধ্যে, বাস্তবতার মধ্যে অনির্বচনীয়ের এই তত্ত্ব আমাদের ছবির আধুনিকতায় বিনোদবিহারীর এক অসামান্য অবদান। এই সময়ের ছবিতে বেঙ্গল স্কুল প্রভাবিত ধ্রুপদী ভারতীয়তার যে বিশুদ্ধ প্রকাশের যে সীমিত ক্ষেত্র এখনও প্রবাহিত আছে সেখানে বিনোদ-বিহারীর অবদানের এক গভীরতর ভূমিকা আছে।

৩.

কী বুঝব তাহলে আমরা শিল্পের এই অনির্বচনীয়তা বলতে? অনির্বচনীয়তা কি কেবল ধ্রুপদী প্রকাশেরই এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য? বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতাতেই কি তার হয়ে ওঠা? আর তার লক্ষ্য স্থির এক ধ্রুব বিশ্বাসের দিকে, এক অপরিবর্তনীয় সত্তার ধ্যানে? একদিকে বিষয়কে পরম করে বিষয়ীর নৈর্ব্যক্তিকতা, অন্যদিকে বিষয়ীর আত্মার উন্মোচনে বিষয়কে নবীন মাত্রায় বোঝা, এই দুই মেরুর মধ্যে যাতায়াত চলে শিল্পের। ক্লাসিক ও রোমান্টিকের এই দ্বৈততা, হয়ত আবহমানের শিল্পেরই স্বভাবের অন্তর্গত। হর্বার্ট গ্রিয়ারসন যেমন তুলনা করেছিলেন শরীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ও সংকোচনের সঙ্গে।

ক্ল্যাসিসিজমকে তাই অনেকে বুঝতে চান এভাবে যে, সত্যের বা সৌন্দর্যের এক শুদ্ধ স্বরূপ পূর্বনির্দিষ্টভাবে স্থির হয়ে আছে, শিল্পীকে সেই শুদ্ধ স্বরূপের নিকটতম বিন্দুতে পৌছনর জন্য ধ্যান করতে হয়। সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের এই বাস্তবতা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় সেই শুদ্ধতার আদল। বাস্তবতাকে, সীমাবদ্ধতাকে স্বর্গীয় করে তুলতে হয়। করে তুলতে হয় অলৌকিক। আর সেই যাত্রায় কোনো প্রগল্‌ভতাকে প্রশ্রয় দেন না শিল্পী। শুদ্ধ উচ্ছ্বাসমুক্ত সত্যের মতো পেলবতাহীন কঠিন রূপবন্ধে বাস্তবতাকে উত্তীর্ণ করেন সেই আদর্শায়িত সৌন্দর্যে।

১৭৭৫-এ বেরিয়েছিল উইংকলম্যানের বই 'রিফ্লেকশনস্ অন দি ইমিটেশন অব গ্রীক আর্ট'। ক্ল্যাসিসিজমের প্রথম আকর গ্রন্থ বলা যায় তাকে। তাতে

ক্ল্যাসিসিজমের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি—'শিল্পের লক্ষ হওয়া উচিত নির্ভার মহনীয়তা ও প্রশান্তি।'

ক্লাসিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এলিয়ট বলেছিলেন যদি একটি শব্দে বোঝাতে হয় ক্লাসিক কী, তাহলে সেই শব্দটি হল—maturity—"A classic can only occur when a civilisation is mature ; when a language and literature are mature and it must be the work of a mature mind.' আর এই প্রাজ্ঞতার স্বরূপ বোঝাতেই যেন হাবার্ট গ্রিয়ারসন বলেছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্য এমন একটি জাতির ও এমন একটি যুগের ফসল, যখন সেই জাতি বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই এক নির্দিষ্ট প্রগতি অর্জন করেছে যে জীবনকে সে এক সম্পূর্ণতার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্থ হয়েছে।

এই প্রাজ্ঞতা, সম্পূর্ণতা ও আত্মবিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে যে ধ্রুপদী শিল্প এক সময় তা রূপান্তরিত হয় এক প্রতিক্রিয়ায়। ক্লাসিসিজমকে তার বিপরীত মেরু থেকে দেখলে তাকে মনে হয় যেন এক নিপীড়নের শক্তি। রোম্যান্টিক শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে সেই প্রতিক্রিয়াশীলতা এতটাই তীব্র যে হাবার্ট রিড একবার লিখেছিলেন যেখানেই শহিদের রক্তে কলঙ্কিত হয় ভূমি সেখানেই গড়ে ওঠে কোনো ডোরীয় স্তম্ভ বা মিনার্ভার মূর্তি। তাই সেই স্থির, অচঞ্চল প্রাজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াতেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন একজন রোম্যান্টিক শিল্পী।

কিন্তু আধুনিক শিল্পীর ক্লাসিসিজম রোমান্টিসিজমের এই দ্বৈততা এতটাই সরল নয়। এই দুই-এর মধ্যে এক সমন্বয়ও ঘটে যায় তাঁর সৃষ্টিতে। যেমন সুন্দর ও অসুন্দর দুই-এরই রূপ পাই পিকাশোর সৃষ্টিতে সমান মুগ্ধতায় ও তীব্রতায়। যে পিকাসো আঁকেন 'গুয়ের্নিকা', তিনিই আবার আঁকেন 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস'-এর শান্তির পরিমণ্ডলও। একটি বিড়ালের মুখাবয়বে যিনি ফুটিয়ে তোলেন ফ্যাসিজমের ভয়ঙ্করতা, একটি উড়ন্ত পায়রায় তিনিই গড়ে তুলতে পারেন স্মিত বিশ্বাসের প্রশান্তি। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাজাহানের মৃত্যু' ছবিটি প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র স্মৃতিচারণায়—'এই ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে ? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম। শাজাহানের মৃত্যুপ্রতীক্ষাতে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম'। শিল্পীর আনন্দ ও বেদনা; তাঁর বিশ্বাস

ও প্রতিবাদ এমনভাবে এসে মিশে যায় তাঁর সৃষ্টিতে যে তাতে ক্ল্যাসিক রোমান্টিক এরকম কোনো মেরুর দূরত্ব আর থাকে না।

আমাদের সাম্প্রতিক চিত্রকলাতে অভিব্যক্তির দিক থেকে একদিকে রয়েছে প্রতিবাদী তীব্রতা ও সমগ্রতা বোধের দুই ভিন্ন প্রকাশভঙ্গির দুস্তর ব্যবধান, অন্যদিকে এই দুই-এর মধ্যে সমন্বয়ও। এফ. এন. সুজা বা কৃষ্ণ হেব্বারের ছবি, সোমনাথ হোর বা কনওয়ালের কৃষ্ণের ছবি, প্রকাশ কর্মকার বা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে প্রতিবাদ ও সমগ্রতা বোধের দ্বৈততার যে সুদূর ব্যবধান থাকে, সেই দ্বৈততার এক সমন্বয়েই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গণেশ পাইন বা শ্যামল দত্তরায় বা অমিতাভ ব্যানার্জীর কোনো কোনো ছবি। দুটি সাধারণ ভাগে ভাগ করে নিয়ে যদি বুঝতে চাই এই সময়ের ছবিকে, তাহলে রোমান্টিক আর ক্ল্যাসিক এই দুটি অভিধায় আমরা বুঝে উঠতে পারি না তার সম্পূর্ণ স্বরূপ। এই দুই-এর ব্যবধানের যে মূল সূত্র, বিষয়ীর আত্মতা ও বিষয়ের সমগ্রতা, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে শিল্পীর প্রকাশের প্রথম ধারাকে যদি বলি 'প্রতিবাদের প্রতিমা', অন্যটিকে বলতে পারি 'সমন্বিত রূপকল্প'।

শিল্পীর আত্মব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ছাড়া আধুনিকতা অর্থহীন। আত্ম-ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে এসে যায় শিল্পীর 'দ্বিধাপন্ন চেতনার নির্বাণ'ও। অথচ সেই দ্বিধাপন্নতা শিল্পীকে শূন্যতার তামসিকতার দিকে ঠেলবে না। এই সময়ের জ্বর ও জ্বালাকে আত্মস্থ করেও শিল্পী তাঁর সদর্থকতার চেতনাকে অমলিন রাখবেন। এই যে সদর্থকতার ধারা এই সময়ের ছবির, বহু ব্যবহারে জীর্ণ 'ধ্রুপদী' শব্দটি তার সবটাকে ধারণ করতে পারে না। এছাড়া আর একদিক থেকে দেখতে গেলে, টি. ই. হালমে যেমন লিখেছিলেন, ধ্রুপদী শিল্পীর চেতনার মানুষ ত এক বাধ্যত সীমাবদ্ধ মানুষ 'intrinsically limited, but disciplined by order and tradition to something fairly decent.' আজকের রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণে মানুষের বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা এতই জটিল ও গভীর প্রসারী, যে ধ্রুপদী চেতনার আত্মিক সীমাবদ্ধতার ধারণা তাঁর কাছে এক অলস বিলাস মাত্র। বরং রোমান্টিকতার কিছুটা স্বপ্ন দিয়েই আধুনিক শিল্পী বাস্তবতার তমসা থেকে উত্তীর্ণ করে নিতে চান মানুষের স্বরূপ। সৌন্দর্যকে কেবল 'small, dry things' ভেবে কোনো নৈর্ব্যক্তিক তৃপ্তিতে আত্মস্থ থাকতে চান না তিনি। তাকে গড়ে নিতে চান মানুষের সম্ভাবনাময় শাশ্বত স্বরূপের উন্মোচনে।

৪.

'ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং তার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ প্রভাবিত ইতিহাস-চর্চা অতীতের সঙ্গে আমাদের ভারতীয়তার যোগসূত্রকে ছিন্ন করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী নব্য ভারতীয় চিত্ররীতির অসারতার জন্য এই ভ্রান্ত ইতিহাসবোধকে কি অনেকটা দায়ী করা যায়? আরবী ও ফার্সী ভাষায় আমাদের জ্ঞান দ্রুত লুপ্ত হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষকে অথবা আধুনিকতাপূর্ব পুরো ভারতবর্ষকেই আমরা পেলাম ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজমের হাত থেকে। তাই একজন হ্যাভেল শিল্পের ভারতীয়তা বলে যেটুকু চেনালেন আমাদের তার বেশি চেনার সুযোগ সেদিন ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এখানেই যে ইতিহাসের এই সংকীর্ণতাকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন নিজের প্রতিভায়। হ্যাভেলকে গুরু রূপে গণ্য করেও তাঁর কল্পিত ভারতীয়তা থেকে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে প্রধান সমস্যা বা সংকট ছিল ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের ভাষায় 'elite mass communication gap'। একদিকে ভারতীয়তাবোধের এই সংকীর্ণতা অন্যদিকে সুভদ্র ও লোকায়ত সংস্কৃতির ব্যবধান, এই দুই কারণে রাজনীতি যেমন শিল্পও তেমনি গভীরতর কোনো মেরুদণ্ড পাচ্ছিল না। এই সংকীর্ণতাই কিছু ব্যতিক্রম বাদে অবনীন্দ্র-পরবর্তী বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের ছবির সীমাবদ্ধতার কারণ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কোনো একসময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল সজীব ছিল তারি ছাঁচে ঢালা নকল পার্থক্যকেই আজ ওরিয়েন্টাল বলে।'

তথাকথিত ভারতীয়তার এই অবনমন ছাড়া সামাজিক স্তরের আরও এক সমস্যা ছিল বেঙ্গল স্কুলের সীমাবদ্ধতার পেছনে। তা অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তর্নিহিত সমস্যা। ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করেছে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী ক্ষেত্র হিশেবে। ফলে মূলধন গড়ে উঠে এরকম নিজস্ব ধনতান্ত্রিক বিকাশ ব্যবস্থার উন্নয়নের সম্ভাবনাকে তারা প্রশ্রয় দেয় নি। এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, আমরা জানি, একদিকে যেমন ভারতের প্রথাগত কাঠামোকে ভেঙেছে, প্রথাগত ও লোকায়ত জীবন ও শিল্পের বিকাশকে রুদ্ধ করেছে, তেমনি পৃথিবীর অন্য প্রান্তের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আধুনিকতার প্রবেশ সংকুচিত করেছে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণ যে ভ্রান্ত ও বিকৃত আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল, তার রেশ আমাদের শিল্পের আধুনিকতায়ও থেকে গেছে। বেঙ্গল স্কুলের ভ্রান্ত ওরিয়েন্টালিজমের এটাই

অন্যতম কারণ। সেই সময়ের জাতীয়তাবোধে বা ঐতিহ্যের ধারণার স্বচ্ছতার দৃষ্টান্ত যেটুকু ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে তিনটি প্রজন্মে যথাক্রমে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও বিনোদবিহারীর কাজের মধ্যে। বেঙ্গল স্কুলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যাঁরা ভারতীয়তা ও আধুনিকতার সঠিক মেলবন্ধনে সমর্থ হয়েছিলেন, এই তিনজন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

৫.

আলোচনার সুবিধার জন্য এই সময়ের ছবিতে সমন্বিত রূপকল্পকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। এর প্রথম বিভাগের অন্তর্গত করা যায় বেঙ্গল স্কুল বা নব্য-ভারতীয় রীতির উত্তরাধিকারকে। অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক আধুনিকতা বলতে যা বোঝায় সেই পরিপ্রেক্ষিতে সময় ও বাস্তব চেতনার ভিত্তিতে এই ধারাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবু সমকালীন চিত্রকলার আলোচনা এই ধারাকে বাদ দিয়েও হতে পারে না।

বাস্তবতাকে বা দৃশ্যমান জগৎকে আদর্শায়িত করে নেওয়ার মধ্যেই এই ধারার বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য প্রকরণ বিশেষত তেল-রঙ মাধ্যম ব্যবহার ক'রে, বা পাশ্চাত্য আধুনিকতার নানা অর্জনকে কাজে লাগিয়ে এই ধারার সম্ভাবনাকে অনেক প্রসারিত করেছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর। রামকিঙ্করকে সঠিক অর্থে অবশ্য বেঙ্গল স্কুলের আওতার মধ্যে বাঁধা যায় না। সময়ের ও রীতির সীমাবদ্ধতাকে তিনি অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু আধুনিকতার জটিলতায় সদর্থক সৌন্দর্য চেতনাকে কেমন করে মেলানো যায়, রামকিঙ্কর তাঁর অনন্য দৃষ্টান্ত।

বেঙ্গল স্কুলের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী বলে মনে করা যাদের এই সময়ের ছবিতে তাদের অনেকেই দুটি মূল্যবোধকে এভাবে মেলাতে আগ্রহী নন। দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যায় ইন্দ্র দুগার (১৯১৮) বা মানিকলাল ব্যানার্জীর নাম। জলরঙ, ওয়াশ বা টেম্পারায় দুজনেরই দক্ষতা অসামান্য। সেই দক্ষতা নিয়ে তাঁরা কল্পনা থেকে খুব সাধারণ নিসর্গ, কোনো মানুষ, বা ফুটে থাকা একটি সামান্য ফুলও যখন আঁকেন, তাতে এক অর্থে অনির্বচনীয়তার ছোঁয়া লাগে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, সময়ের স্পর্শ ছাড়া আধুনিকতার বিস্তার ঘটে কি?

সময়ের স্পর্শ তাহলে কেমন করে আসে ছবিতে? ছবির বক্তব্য বা বিষয়

থেকেই যে আসতে হবে তা ত নয়। আঙ্গিকেরই বিন্যাসে সমকালকে ছুঁয়ে থাকে ছবি। কেমন করে, তার এক দৃষ্টান্ত হতে পারেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬)। নন্দলাল বসুর শিষ্য রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শৈলীতে ধ্রুপদী ভারতীয়তার সঙ্গে মিলিয়েছেন লোকায়ত ভারতীয়তাকে। অসামান্য তাঁর রেখার শক্তি ও সাবলীলতা। এই নিজস্বতাতেই খুব সূক্ষ্মভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছেন পাশ্চাত্য আধুনিকতার নানা অর্জনও। বিষয় হিশেবে তিনি কখনো নেন পৌরাণিক বা পুরাণকল্পের কোনো কাহিনী, এই সময়েরই কোনো মানুষ বা নিসর্গের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, বা সময়ের অবক্ষয়কে ধরতে পারে এমন কোনো বিষয়। যাই হোক তাঁর ছবির বিষয় তাতে এক সামগ্রিক সদর্থক জীবন চেতনার আলো এসে পড়ে। আঙ্গিকের আধুনিকতাতেই আধুনিক হয়ে ওঠে তাঁর ছবি। আঙ্গিকগত আধুনিকতা ও নিজস্বতার অভাবে ছবির আদর্শায়িত সৌন্দর্যচেতনা কেমন করে পুনরাবৃত্তির সংস্কারে পরিণত হয় তার এক দৃষ্টান্ত হতে পারে গোপেন রায়ের ছবি। যে গোপেন রায় এখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের অন্যতম কর্ণধার। গত ফেব্রুয়ারিতে (১৯৮৭) আফ্রিকার দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে আঁকা তাঁর ছবিগুলি আঙ্গিকগত এই অসমন্বয়ে ক্লিষ্ট।

যে সমন্বয়ের দর্শন বেঙ্গল স্কুলের ছবির অন্তর্লীন সত্য তা পাশ্চাত্য আঙ্গিককেও আত্মস্থ করে ছবির গাঠনিক সত্যের উপর জোর দিয়ে, বিষয়ের প্রত্যক্ষতাতে নয়, রূপ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যেই আধুনিক হয়ে ওঠে, সেটিই হতে পারে সমন্বিত রূপকল্পের দ্বিতীয় ধারা।

কে. জি. সুব্রামনিয়াম (১৯২৪) শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র। এখনও কলাভবনেই নিযুক্ত। শিল্প আলোচক হিশেবেও তিনি প্রখ্যাত। আর সেদিক বেঙ্গল স্কুল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও গভীর। ছবির জমির স্থান বিভাজন নিয়ে তাঁর ভাবনা। বিষয়কে গৌণ মনে করে, খুব সাধারণ বিষয় নিয়ে বা প্রায়-বিমূর্ততাতেও গঠন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সহযোগিতায় এক সদর্থক নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ করেন তিনি ছবিকে। আর সম্প্রতি গ্লাস-পেইন্টিং-এর রীতিতে করা নাগরিক লৌকিক রূপবন্ধের ছবিগুলিতে সাম্প্রতিকের সামাজিক অনুষঙ্গও মিশে যাচ্ছে সেই সামগ্রিকতার চেতনাতেই।

আবার বেঙ্গল স্কুলের সান্নিধ্য থেকে দূরে বসে অঞ্চলের কয়েকজন শিল্পী, চল্লিশ দশকের আঙ্গিকগত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চিত্রকলায় যাঁদের আবির্ভাব,

সমন্বয় তাঁদের ছবিতে কাজ করে একদিকে ধ্রুপদী ভারতীয়তা, অন্যদিকে লোকায়ত ও পাশ্চাত্য রূপবন্ধের সংযোগে। সব মিলে এক স্নিগ্ধ প্রশান্তিই তাঁদের অন্বিষ্ট। এন. এস. বেন্দ্রে (১৯১০), কৃষ্ণ হেব্বার (১৯১২), এস. ডি. চাবদা (১৯১৪) বা কে. কুলকার্ণি (১৯১৮) এরই কয়েকজন প্রতিনিধি-স্থানীয় শিল্পী।

শিল্পের সমগ্রতার দর্শন ছাড়া আর কোনো বিশেষ ধর্মীয় বা জীবন সম্পর্কিত দর্শন হয়ত কাজ করে না এদের এই সমন্বিত রূপকল্পে। চল্লিশের শিল্পী হয়েও যেমন আধ্যাত্মিকতা আমরা দেখেছি নীরদ মজুমদারের (১৯১৬-১৯৮২) মতো শিল্পীর ছবিতে। নীরদ মজুমদার সমন্বিত রূপকল্পের ক্ষেত্রে যেন এক বিশেষ দর্শনের প্রবক্তা। জীবনের একেবারে গোড়ায় তাঁর শিল্প-শিক্ষার শুরু ছিল সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের অধীনে। আর ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেঙ্গল স্কুলের মধ্যেও ছিলেন যেন একটু বেশি ধর্মপ্রাণ ও আধ্যাত্মিক। ঠিক সেই প্রভাবেই যে তা নয়, অনেকটা পারিবারিক প্রভাবেই ধর্মীয় চেতনার উদ্বোধন হয়েছে নীরদ মজুমদারের মধ্যে। কিন্তু চিত্রকলায় আঙ্গিকগত অতৃপ্তিই বেঙ্গল স্কুলের সীমাবদ্ধতা থেকে তাঁকে সরিয়ে এনেছিল। নতুন শিল্প ভাষার সন্ধানে সেইসময় ক্যালকাটা গ্রুপ গড়েছিলেন যাঁরা তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। চল্লিশের দশকে লোকায়ত আঙ্গিক খানিকটা প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। অনেকটা যামিনী রায়ের পরোক্ষ প্রভাব কি? লোকায়তের মধ্যে নতুন ফর্মের সন্ধান করেছিলেন তখন ক্যালকাটা গ্রুপের অনেক শিল্পীই, যেমন রথীন মৈত্র, পরিতোষ সেন, প্রাণকৃষ্ণ পাল বা গোবর্ধন আশ। কিন্তু ক্যালকাটা গ্রুপও তৃপ্ত করতে পারে নি নীরদ মজুমদারকে। প্যারিস গেলেন পশ্চিমের আধুনিকতার সঙ্গে একাত্ম হতে। আর সেখানে দীর্ঘ অবস্থানেই পেলেন নতুন ফর্মের সন্ধান। বুঝলেন ভারতীয় শিল্পের মুক্তি পাশ্চাত্যের অনুকরণে নয়; বরং এক নতুন ভারতীয়তার নির্মাণে। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সারাৎসারকে আত্মস্থ করলেন। আর আত্মস্থ করলেন পশ্চিমের তেলরং-পদ্ধতিতে ছবি গঠনের ধ্রুপদী নন্দন। দুটি সভ্যতার নির্যাসকে মিলিয়ে গড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব শিল্পভাষা। এক প্রশান্ত সদর্থক আধ্যাত্মিকতার চেতনা তাঁর প্রধান প্রেরণা। কিন্তু নতুন ভারতীয়তায় তিনি যা দিয়ে গেলেন—তা হল, যে কোনো সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব আরোপের প্রেরণা। তাঁর রীতিকে তিনি বলেছেন 'বিন্দুকেন্দ্রিক সমন্বয়সূত্রে জ্যামিতিক অগ্রগামিতা'। একই

প্রশান্ত কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রস্ফুটিত হচ্ছে জীবনের বহুমুখী প্রাচুর্য। সমন্বিত রূপকল্পের দর্শনে নীরদ মজুমদারের অবদান গভীর।

তবু সাম্প্রতিক মূল্যায়নে নীরদ মজুমদার বহু বিতর্কিত। কেউ মনে করেন আধুনিক ভারতীয়তায় তেলরঙ পদ্ধতিতে ছবির গঠনে তাঁর অবদান তর্কাতীত। কেউ মনে করেন ফরাসী পদ্ধতিকে অনুকরণ করে ভারতীয়তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তিনি। কেউ বা বলেন তন্ত্র-আশ্রিত অধ্যাত্মিকতায় মগ্ন থেকে সময় ও সমকালকে তিনি অবহেলা করেছেন।

এই সমস্ত বিতর্ক কতকগুলো জটিল সমস্যার দিকে নিয়ে যায় আমাদের। সমন্বিত রূপকল্পের ক্ষেত্রে প্রগতি বলব কাকে, কখনই বা তাতে আসে সরলীকরণ বা নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিক্রিয়ার চরিত্র। এ বিষয়টি আমাদের সতর্ক অভিনিবেশ দাবি করে।

সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে একটু দেখে নেওয়া যায় নীরদ মজুমদার যে বিশিষ্ট ঘরানার সৃষ্টি করেছেন তার স্বরূপ। তেলরঙের ছবির রচনা বিন্যাসে তিনি যে উদ্বুদ্ধ করেছেন প্রকাশ কর্মকার বা রবীন মণ্ডলের মত শিল্পীকে, এতে বোঝা যায় তাঁর প্রতিভার একটি দিক। কিন্তু সমন্বিত রূপকল্পের ক্ষেত্রেই যে প্রগাঢ় প্রভাব রয়েছে তাঁর, বৈচিত্র ও স্বরূপ বুঝতে দুজন শিল্পীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—শানু লাহিড়ী ও চিত্রভানু মজুমদার। বিমূর্ততার মধ্যে না গিয়েও যে সদর্থক সাঙ্গীতিক গুণ মেলে ধরা যায় ছবিতে, যে কোনো আপাত নগণ্য বস্তু বা দৃশ্যকেও যে আধ্যাত্মিকতায় অন্বিত অলৌকিকে রূপান্তরিত করা যায়, তার পরিচয় মেলে এই দুজন শিল্পীর ছবি দেখলে। তেলরঙে জ্যামিতিক ক্ষেত্র বিভাজনের মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধ প্রশান্তিকে রূপ দেওয়া, এটাই এদের পদ্ধতির অন্তর্লীন বৈশিষ্ট।

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী থেকে শুরু করে সমন্বিত রূপকল্পের এই যে বিবর্তন এর নান্দনিক ভিত্তি রয়েছে একদিকে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, অন্যদিকে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধের সমন্বয়ে। সমকালীন ঘটনা প্রবাহের উপরি স্তরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট না থেকেও সময়ের নিবিড় প্রতিফলনই এদের মধ্যে গভীরতর শৈল্পিক তাৎপর্য আনছে। একদিকে শিল্পের অন্যদিকে জীবনের নান্দনিক সম্ভাবনা মেলে ধরছে। এর গভীর প্রসারী অবদান রয়েছে এই সময়ের ছবিতে। আকবর পদমসি (১৯২৮), সত্যেন ঘোষাল (১৯২১), কনওয়াল কৃষ্ণ (১৯১০) থেকে সুহাস রায় (১৯৩৬), অনিতা রায়চৌধুরী (১৯৩৭) বা অরূপ দাস (১৯২৭), একজন বিচ্ছিন্ন কয়েকজন

শিল্পীর দৃষ্টান্তেই অনুধাবন করা যায় এর নানামুখী বৈচিত্র্য। বিশেষত বাংলার ছবিতে, একেবারে সাম্প্রতিক তরুণ শিল্পীদের মধ্যে পর্যন্ত এই ধারার প্রসারণ অনুভব করা যায়, যতটা পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তরের শিল্পীদের মধ্যে নয়।

এর পাশাপাশি ধ্রুপদী অনুভবের নামে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে একটি বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রও। এক সময় শিল্পের কোনো বাণিজ্যিক মূল্য ছিল না। এর খারাপ দিক সত্ত্বেও একটি ভাল দিক ছিল এই যে শিল্পী নিজের তন্ময়তায় কাজ করতেন। কবিতার মতো ছবিতেও শুদ্ধ চেতনার সৎ ও সাহসিক প্রতিফলন হতে পারত। এখনও ছবির সেই শুদ্ধতার পরিমণ্ডল একেবারে নেই, তা নয়। সেটুকু আছে সেটুকুই তার সফলতা ও মুক্তির ক্ষেত্র। এর পাশাপাশি ছবি এখন উদ্বুদ্ধ করছে প্রতিষ্ঠানকেও। পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসছে ব্যবসায়ী ও নব্য বুর্জোয়া শ্রেণী। শিল্পী এবং তাঁর ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে এদের হাতে, গ্ল্যামার ও মুনাফার প্রয়োজনে। প্রচার মাধ্যমগুলোর আনুকূল্য পাচ্ছেন শিল্পীরা। এক একটি প্রচার প্রতিষ্ঠান এক একজন শিল্পী বা শিল্পী গোষ্ঠীকে নিজের করে নিচ্ছে। শিল্পীর অভাব মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতের আড়ালটুকুও মুছে যাচ্ছে। নিজের কথার বদলে শিল্পী অন্যের হয়ে কথা বলছেন। সমাজের ও সময়ের তৃণমূল বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পীর সংযোগ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার শিকার হচ্ছেন শিল্পী।

সমন্বিত রূপকল্পে এই বিচ্ছিন্নতা একটু বেশি প্রকট হয়ে পড়ে কেননা প্রকাশের ধ্রুপদী আবরণে সময়ের দায়কে সহজে আড়াল করা যায়। হুসেন (১৯১৫) একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'If I point a flower, what is wrong with it?' দোষ নেই অবশ্যই একটি ফুলও আঁকতে পারেন শিল্পী। কিন্তু সেই ফুলের মধ্যেও কি লুকোন যায় শিল্পীর দায়বদ্ধতা? একটি সামান্য বিড়াল এঁকেও ত পিকাসো তাঁর মহত্তম দায়বদ্ধতার পরিচয় দেন। জলের উপর ভেসে থাকা কয়েকটি ফুল আঁকেন যখন বিনোদবিহারী, তাতেও আলোকিত হয়ে থাকে যেন সমস্ত প্রাচ্য জীবনধারার সদর্থকতার ছন্দ। আর শিল্পীর দায়কে অসীম পর্যন্ত বাড়িয়ে হুসেন যখন ১৯৮০তে আঁকেন মাদার টেরেসাকে নিয়ে ছবি, ১৯৮৪তে 'গীতাঞ্জলি থেকে পথের পাঁচালি' বা ১৯৮৫তে 'অ্যাসাসিনেশন' নামে সিরিজ, তখন আমরা বিস্মিত হই তাঁর মতো এত ক্ষমতাবান একজন শিল্পীও কতটা সাধারণ্যে ভেসে যেতে পারেন।

কিন্তু এর থেকেও জটিল সমস্যা আছে। জাহাঙ্গির সাবাভালা (১৯২২)

তাঁর ছবিতে এক নিঃশব্দ ধ্রুপদী পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চান। পাশ্চাত্য আঙ্গিককেই তিনি নিজের মতো করে ব্যবহার করেন। কিউবিজমকে যেভাবে তিনি মেলান এই ধ্রুপদী সদর্থকতায় তাতে বিস্মিত হতে হয়। মূলতঃ মানুষই তাঁর ছবির বিষয়। সেই মানুষকে ভারতীয় বলেও চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ সময় বা বাস্তবতায় সে লগ্ন নয়। ফলে গভীর এক শূন্যতার সঞ্চার ঘটে তাঁর ছবিতে। সেই শূন্যতায় জীবনের কোনো আত্মপরিচয় মেলে না।

বিচ্ছিন্নতাজনিত এই আত্মপরিচয়হীনতার সমস্যার অন্য এক ধরনের দৃষ্টান্ত হতে পারে যতীন দাসের (১৯ নং) ছবি। আঙ্গিক ও প্রকরণের উপর তার অসামান্য দখল। মানুষই তাঁর ছবির প্রধান বিষয়। কিন্তু কোনো ইতিহাস বা ভূগোলে লগ্ন নয় সেই মানুষ। তারা বিচ্ছিন্ন ও নির্জন। শারীরিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে তাদের অস্তিত্বের সংকট কিছু নেই। তাদের স্বাস্থ্য উজ্জ্বল। শরীর পেশিবহুল ও সুঠাম। কিন্তু গভীরতর যে সমস্যা তাদের ক্লিষ্ট ক্লিন্ন করে তা এক আত্মিক সংকট। যা সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতাজাত। আধুনিকতার এই বিচ্ছিন্নতার সমস্যা শিল্পের এক নিবিড় বিষয় হতে পারে। শিল্পী নিজে যখন এক প্রত্যক্ষ সামাজিক অবস্থান থেকে সংঘচেতনা বা জীবন সংলগ্নতা থেকে সেই বিচ্ছিন্নতাকে দেখেন, তাকে রূপ দেন, তখন যত প্রগাঢ়তা বা অমোঘতা পায় তা, ততটা পায় না যখন শিল্পী ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতাকে শিল্পে আরোপ করেন। সারাভালা বা যতীন দাসের সমস্যা সম্ভবত এই যে, তাঁদের চেতনা ঐতিহ্যের গভীরে ততটা প্রোথিত নয়।

এই সমস্যার আরও, একটি দিক আছে যেখানে ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত হয়েও বিচ্ছিন্নতার শিকার হন শিল্পী। দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যায় লক্ষ্মণ পাই (১৯২৫) ও বম্বের শিল্পী বি. প্রভার নাম। দুজনেরই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা প্রায় আন্তর্জাতিক। নানা বিবর্তন সত্বেও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাদের দুজনের ছবিতেই থেকে গেছে। দুই ভিন্ন অর্থে দুজনেরই ছবি মণ্ডনধর্মী। আঙ্গিকের দিক থেকে বিশেষত মানুষের অবয়ব বিন্যাসে, লোকায়তিক সরলতাকে ভিত্তি করেছেন দুজনেই। যদিও অভিব্যক্তির দিক থেকে তা স্বভাবতই দুই ভিন্ন প্রান্তের। যে মানুষ রূপ পাচ্ছে তাঁদের দুজনেরই ছবিতে সে বাস্তবতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বহির্ভূত এক সুরেলা সৌন্দর্যচেতনার মানুষ। লক্ষ্মণ পাই তাঁর মানুষের রূপবন্ধ গ্রহণ করেছেন ভারতীয় অনুচিত্রের ঐতিহ্য থেকে। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন পাশ্চাত্য

আঙ্গিক আশ্রিত রূপবন্ধগত ভাঙনের। তাঁর ছবির মূলগত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই, দুই আঙ্গিক প্রস্থানের পারস্পরিক বৈপরীত্য ও সংঘাতের সমস্যা। লোকায়তিক রৈখিক সরলতার সঙ্গে যেমন মূর্তির অভিব্যক্তিগত ভাঙন সাজুয্য রক্ষা করে না, তেমনি বাস্তবতা-নিরপেক্ষ রোমান্টিক আবিলতার মধ্যে তরল হয়ে যায় রূপবন্ধের গাঠনিক ঋজুতাও।

বি. প্রভা মানুষকে দেখেছেন আরও পেলব সরলতায়। গ্রামীণ ও লোকায়তিক নারীপ্রতিমাই তাঁর ইদানীংকার ছবির মুখ্য বিষয়। কিন্তু সেই নারী বাস্তবের মাটির সংস্পর্শের নারী নয়। যদিও তাঁরা সকলেই হয়ত গ্রামীণ নারী, কোনো কর্মে বা জীবিকায় লিপ্ত, কিন্তু কোনো ইতিহাস বা ভূগোলের বা ভূগোলের বাস্তবতায় লগ্ন নয়। সেই সংলগ্নতা ছাড়া তাদের উপর আরোপিত পেলব লোকায়তিক সৌন্দর্য কোনো নান্দনিক মেরুদণ্ড পায় না। শিল্পীর দক্ষতায় তারা হয়ে উঠতে পারে বড় জোর ভাল ক্যালেণ্ডারের ছবি। ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীর দক্ষতার সঙ্গে বাণিজ্যিক সাফল্যের সমঝোতা ছবির মানকে কোথায় নিয়ে যায় এ-হতে পারে তারই এক দৃষ্টান্ত। সমন্বিত রূপকল্পের তৃতীয় ধারার অন্তর্গত করা যায় এই তরলতার ক্ষেত্রটিকে।

এর বাইরে আধুনিকতার সংক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বময় জটিল জীবনজিজ্ঞাসাকে আত্মস্থ করেও ছবিতে রূপ পাচ্ছে এক সমন্বিত সমগ্রতার চেতনা। সমন্বিত রূপকল্পের চতুর্থ বিভাগ বলে আলাদা করে নেওয়া যায় একে। এখানে রূপ পায় যে জীবনবোধ বা সৌন্দর্যচেতনা তত সরল নয় তা। নয় তত সময়নিরপেক্ষ, সমকালীন জীবনপ্রবাহনিরপেক্ষ। আধুনিকতার এই ক্ষেত্রটিতেই আমাদের ছবি ঐতিহ্যের সারাৎসারকে আত্মস্থ করে আত্মপরিচয়ের একটি বলিষ্ঠ ক্ষেত্র গড়ে তুলছে।

এই সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠতম এক দৃষ্টান্ত গণেশ পাইনের (১৯৩৭) ছবি। চল্লিশ দশকে অবনীন্দ্রনাথ ও বেঙ্গল স্কুলের পেলব ভারতীয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই আমাদের ছবি খুঁজেছিল বলিষ্ঠ এক প্রতিবাদের ভাষা। লোকায়তের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবোধের সমন্বয়ের প্রয়াস ছিল সেখানে। ধ্রুপদী ভারতীয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থাকলেও বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে তার ছায়া যে সেখানে একেবারে পড়ে নি, তা নয়। তবু নতুন দিগন্তের খোঁজে, তাকে অস্বীকারের দিকেই ছিল তখন ঝোঁক। ষাটের দশকের তরুণ শিল্পীরা আবার নতুন মাত্রায় আবিষ্কার করলেন অবনীন্দ্রনাথকে। তাঁর ছবিতে

সমন্বয়ের মধ্যেও বাস্তবতার যে সূক্ষ্ম প্রতিফলন, ছবির মধ্যে ভাব ও লাবণ্যের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খেলা তাকে ব্যবহার করতে চাইলেন শিল্পীরা ছবির নান্দনিক উত্তরণের জন্য। ষাটের দশক আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করল। ধ্রুপদী চিত্রকলা, মুঘল ও রাজপুত অনুচিত্রের রঙ ও রূপবন্ধের জগতের প্রাণিত করল তাদের। আর আবিষ্কৃত হল রবীন্দ্রনাথের ছবি। তাঁর ছবির মরমী রহস্যময়তাকে এর আগে যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন শিল্পীরা তা বলা যায় না। রবীন্দ্রচিত্রের সম্ভাবনার আবিষ্কারও ষাটের দশকের এক বৈশিষ্ট্য। আর এর সঙ্গে এতদিনে অনেক স্বাভাবিক হয়ে এল পাশ্চাত্য আধুনিকতার আত্মীকরণ।

এসব মিলে যে নতুন আত্মপরিচয় ষাটের পরবর্তী ভারতীয় ছবি তাতে দুটি প্রবণতা মুখ্য। একটি প্রকাশ কর্মকার (১৯৩৩), সুনীল দাস (১৯৩৯), ভূপেন খাখার (১৯৩৪) বা রামেশ্বর ব্রুটার (১৯৪১)-এর মতো আপোষহীন প্রতিবাদের ভাষা। অন্যটি এই বাস্তবতার তমসাকে আত্মস্থ করেও মানবিক সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দিগন্তের সন্ধান। গণেশ পাইন এই দ্বিতীয় ধারার প্রধানতম একজন প্রবক্তা।

'আর্ট মানুষের এমন এক ক্রমান্বয় প্রক্রিয়া যার ফলে শেষপর্যন্ত আমাদের জৈব বাস্তবের সমান্তরালে আরেক বাস্তবের অবতারণা ঘটে', একবার বলেছিলেন গণেশ পাইন। শিল্পের বাস্তবতার যে নতুন মাত্রার সন্ধান রয়েছে এই উচ্চারণে, তা চিরায়ত ভারতীয়তারই এক নির্যাস। আধুনিকতার ক্ষয়ের মধ্যে যেভাবে এই 'আরেক বাস্তবের' সন্ধানে চলে তাঁর ছবিতে, যে ভাবে তিনি গড়ে তোলেন এই 'আরেক বাস্তব' তাতেই সংহত থাকে এই সময়ের ছবিতে তাঁর অবদান। গণেশ পাইনের ছবির রেখায় কোনো সমন্বয় নেই। রেখার সঙ্গে রেখার মিলনের যে কৌণিক তীক্ষ্ণতা তা আমাদের দৈনন্দিনতার সরল পরিচয়কে আবৃত করে এক গভীর আত্মপরিচয় খোঁজে। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির টেম্পারায় রঙ ব্যবহারের পরতে পরতে যে অপরিচিত রহস্যলোকের উন্মোচন তার সঙ্গে সংঘাতময় রেখাবিন্যাসের সেই তীক্ষ্ণতা মিলে এক অলৌকিক জগতের সন্ধান আনে। সে অলৌকিক স্বর্গীয় আলোয় ঘেরা অলৌকিক নয়। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থানের মরমী রহস্য সেখানে। ক্রমাগত মৃত্যুর ও নেতির যে সঞ্চরণ জীবনে, তার বিপরীতে জীবনের সম্ভাবনার অনির্বাণ প্রদীপ জ্বেলে রাখা, একেই বলা যায় গণেশ পাইনের ছবির সামগ্রিক সন্ধান। ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে মেলাবার যে

নতুন এক নিরিখ নির্মাণ করে চলেছেন তিনি, এই সময়ের ছবিতে তাঁর গুরুত্ব এখানেই।

আধুনিকতার দ্বান্দ্বিক জটিলতা থেকে সমন্বয়ের সন্ধান, সাম্প্রতিক ছবির এই বিশেষ দিকটি ক্রমান্বয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে আর যাঁদের ছবিতে তাঁদের মধ্যে আরেক জন উল্লেখযোগ্য শিল্পী অমিতাভ ব্যানার্জী (১৯২৮)। গ্রাফিকসে তাঁর দক্ষতায় আলোআঁধারীর যে রহস্যময় পরিমণ্ডল রচনা করেন তিনি, তাতে একটি নিঃসঙ্গ ফুল বা উড়ন্ত একঝাঁক পাখির প্রতিমায় তিনি আভাসিত করতে পারেন অনায়ত্ত এক সৌন্দর্যের স্বপ্নকে। এভাবেই সমন্বয়ের অন্য এক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে লালুপ্রসাদ সাহুর (১৯৩৭) ছবিতে।

আরেকদিক থেকে মূলত অভিব্যক্তিময় প্রতিবাদের শিল্পী যাঁরা তাঁদের অনেকের ছবিতেও লক্ষ্য করা যায় প্রতিবাদের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে কেমন করে সমন্বয়ের স্থৈর্যের দিকে চলে যায়। মনু পারেখ-এর (১৯৪২) বেনারস ল্যাণ্ডস্কেপের প্রায় বিমূর্ত ছবিগুলি, বিজন চৌধুরীর (১৯৩১) লৌকিক-নাগরিক রূপবন্ধের কোনো কোনো ছবি, শ্যামল দত্তরায়ের (১৯৩৪) সাম্প্রতিক ছবিগুলি, যেখানে বাস্তবতার নানা অসংলগ্নতা নিছক প্রতীকের ভারে ভারাক্রান্ত না হয়ে এক সুষমাময় রসের প্রকাশ হয়ে ওঠে, রবীন মণ্ডল (১৯৩২) বা প্রকাশ কর্মকারের (১৯৩৬) প্রতিবাদের তীব্রতাও যেভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় চিরায়তের এক আর্কিটাইপে তাতে সমন্বিত রূপকল্প নতুন মাত্রা পায়।

সমন্বিত রূপকল্প এইভাবে প্রসারিত হয়ে যায় তরুণতর শিল্পীদের মধ্যে। গৌতম বসু (১৯৫০), দীপক মুখার্জী (১৯৫৪), দীপক ঘোষ (১৯৫৬), যুধাজিৎ সেনগুপ্ত (১৯৪১), মনোজ দত্ত (১৯৫৬), সাধন চক্রবর্তী (১৯৫২), মনোজ মিত্র (১৯৫৩), জয়শ্রী ব্যানার্জী প্রমুখ তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নানাভাবে বিবর্তিত হচ্ছে এই সমন্বয়ের চরিত্র।

আশির দশকে বিশেষত গত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে বিশুদ্ধ কর্মচর্চার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। কোথায় কোথায় তা এতটাই যে মাদ্রাজের শিল্পী পালানিপ্পনের (১৯৫৭) স্পেস ড্রয়িং রিসার্চ সেন্টারের ডায়াগ্রামের একটি পৃষ্ঠাও সৃষ্টিশীল ছবির মর্যাদা পেয়ে যায়। সারা পৃথিবীতেই আধুনিকতা আজ যে নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে যাচ্ছে এটি তারই এক প্রচ্ছায়ার দৃষ্টান্ত। আধুনিকের যান্ত্রিকতা মানবতাকে এভাবেই অবনমনের দিকে নিয়ে যায়। সমন্বিত রূপকল্প এই মানবিক অবনমনের বিরুদ্ধেই মানবতাবাদী শিল্পীর প্রতিবাদ। আশার কথা আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের শিল্পীদের মধ্যে এই সমন্বয়ের সন্ধানই এখনও প্রধান সুর।

জন্মদিনে

মণীন্দ্র রায়

আমরা ছিলাম এই ভ্রষ্টদিনে—ভালোবেসে, হেসে;
আবার কুতর্কে মেতে, অক্ষম শপথে জ্বলে, দুঃখের আবিল
ঘোলাজলে গা ডুবিয়ে। কখনো-বা মেহগনি দেশে
নিজেরই ভিতর থেকে মহীরুহ তুলে নভোনীল
মিশিয়েছি স্বপ্নে, রক্তে। নেমেছি দৈনিক পথে, ভিড়ে,
রুজির লড়াইয়ে ঘেমে, সংসারের ভারে ঝাঁকামুটে,
গেঁথেছি গোপন অশ্রু সময়ের সূচীমুখ চিরে।
আবার আমরাই ডানা মেলেছি আগুন থেকে উঠে।

•

ছয় ঋতু আমাদেরই। ঘুরন্ত সিঁড়িতে বারেবারে
প্রজন্ম প্রজন্ম এসে, চলে গিয়ে, তবু থেমে যাই—
এই বোধ, এ বিশ্বাস জীবনের তৃষ্ণার্ত বিকারে
আমার পাতালনদী—তারই ঘাটে অঞ্জলি ভরাই।
খেদোক্তি আমার নয়; দুঃখ নয়; নিঃশব্দের ভারে
লবণাক্ত এ সমুদ্রে মুক্তোরই ঝিনুক খুঁজি তাই।

বিশ্ব-তাণ্ডব

গোলাম কুদ্দুস

ব্যাহত সৃজন শক্তি
ঠিক নাটকের হত নৃপতির প্রেতাত্মার মত
অকথিত বাণী নিয়ে অব্যক্ত ব্যথায়

ঘুরে ফিরে আসে বারবার
নিশান্ত প্রহরে।

রাত্রির প্রহরীদল
সচকিত, ভয়ার্ত, বিস্মিত,
জানে না কোথাকার এই ছায়া
এই রুদ্র, এই ভয়ঙ্কর,

কেন আসে
কারে খোঁজে
কী বার্তা শোনাতে চায়
কী জ্বালা জুড়াতে চায়
ঘনঘন সখেদ গর্জনে।

প্রকাশের অনুকূল হাতছানি পেলে
এই শক্তি নিজের মুক্তির সঙ্গে
মুক্তি দিত মানব-মহিমা।

•

বাধা পেয়ে শ্বসিছে সে ঘূর্ণিবায়ু,
নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তার ডাকিনী যোগিনী
প্রলয় উল্লাসে
পৃথিবীকে দিতে চায় লণ্ডভণ্ড করে
নিরুদ্ধ শক্তির বেগ লাঘবের তরে।

সম্রাটের আজ্ঞাবহ রাত্রির প্রহরীদল শোনো,
যতই হও না বিজ্ঞ, বিদ্যাদিগ্‌গজ,
প্রেতাত্মা দেবে না খুলে তোমাদের কাছে
রহস্যের ঝাঁপি,

দেবে শুধু সেই যুবরাজে
যার হাতে কঠিন ন্যায়ের তরবারি
কোষবদ্ধ থেকেও এখনো
পড়েনি ঘুমায়ে এই প্রলয়ঙ্কর রাতে।

চার্বাক : প্রত্যক্ষই প্রমাণ শ্রেষ্ঠ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭। প্রত্যক্ষ : প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ

তাহলে, পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাক দর্শনের বর্ণনায় মাধবাচার্য প্রমুখ যদিও বলেছেন যে প্রমাণ হিসেবে চার্বাকেরা অনুমান প্রমাণ একেবারে বরবাদ করে দিতে চেয়েছিলেন, তবুও অন্তত ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে একথা মেনে নিতে আমরা বাধ্য নই। মাধবাচার্যর নিজের সম্প্রদায়ে (অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্তে) অবশ্যই সর্বপ্রমাণ বর্জনের—অতএব অনুমান বর্জনেরও উপদেশ আছে। শঙ্করাচার্যর লেখা থেকে শ্রীহর্ষ ও তাঁর ব্যাখ্যাকারদের রচনায় সেকথা সুস্পষ্ট। কিন্তু অনুমান খণ্ডনের প্রস্তাব মাধবাচার্য চার্বাকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের দার্শনিক মতকে খেলো প্রতিপন্ন করবার সহজ পথ বেছে নিয়েছেন : অনুমানই যদি কেউ না মানে তাহলে দর্শনের দরবারে তাকে কী করে স্থান দেওয়া যায়? প্রসঙ্গত, এ-জাতীয় যুক্তির জবাব দিয়েই শ্রীহর্ষ তাঁর প্রখ্যাত 'খণ্ডন খণ্ডন খাদ্য' বই শুরু করেছেন ; অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে শূন্যবাদী এবং মায়াবাদীরা সব রকম প্রমাণ অগ্রাহ্য করেও শূন্যবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের অধিকারী ছিলেন।

অবশ্যই আমাদের বর্তমান আলোচনা শূন্যবাদ বা মায়াবাদ নিয়ে নয়, প্রখর বস্তুবাদ নিয়ে—যে-বস্তুবাদ লোকায়ত বা চার্বাক নামে ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ। এবং নানান নজির থেকে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে প্রকৃত চার্বাকমতে প্রত্যক্ষ অবশ্যই প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ—অর্থাৎ, প্রমাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে সেরা। কিন্তু প্রত্যক্ষ-অনুগামী ইহলোক প্রসঙ্গেও অনুমানকে প্রমাণ বলে মানায় বাধা নেই। কেবল পরলোক, কর্মফল, আত্মা প্রভৃতি একান্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান নিষ্ফল—একদল ধূর্তর দল এজাতীয় বিষয়ে অনুমান প্রমাণ দেখাবার চেষ্টা করে লোক ঠকাবার আয়োজন করে।

এই যদি চার্বাকদের অভিপ্রেত মত হয় তাহলে সাধারণত মতটিকে যতোটা খেলো বলে প্রচার করার চেষ্টা হয় তা মূলতই বিরূপ-প্রচার বা

প্রোপাগাণ্ডার শামিল হয়ে দাঁড়ায়। নজির হিসেবে আমরা প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত, প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষত আমাদের দেশে শ্রুতি-স্মৃতির দোহাই পাড়ার আয়োজন এমনই প্রবল হয়েছিলো যে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের গুরুত্ব নেহাতই গৌণ বা অনেকাংশে অবান্তর বলেই বিবেচিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো। এবং এমন একটা ধারণা চালু হয়েছিলো যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যই বুঝি ঋষিদের ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্মবিদ্যা যার সঙ্গে চোখে দেখা মাটির পৃথিবীর বড়ো একটা সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রথম ধাপই সম্ভব হয় না। আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সহজ-সরল সত্যটি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই সাবেকী ভারতীয় রসায়নবিদ্‌দের পক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপে নজিরটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করছেন :

I shall endeavour to unfold before you to-day a forgotten chapter in the history of the intellectual development of the Indian people, namely the cultivation of the Experimental Sciences. It is generally taken for granted that the Hindus were a dreamy, mystical people given to metaphysical speculation and spiritual contemplation...But the fact that the Hindus had very large hand in the cultivation of the experimental sciences is hardly known in these days...

Experiments and observation constitute the fundamental bases of Sciences. It is naturally a relief to come across such dicta as laid down by two standard works on Hindu Chemistry, namely Rasendra-cintamani by Ramachandra and Rasa-prakasa-sudhakara by Yasodhara, both belonging to the 13th or 14th century A. D.

Says the former : 'That which I have heard of learned men and have read in the Sastras but have not been able to verify by experiment, I have discarded. On the other hand

those operations which I have according to the dictations of my sage teachers been able to perform with my own hands—those alone I am committing to writing. Those are to be regarded as real teachers who can verify by experiments what they teach—those are to be regarded as laudable disciples who can perform that they have learned : teachers and pupils other than these are mere actors on the stage.'

Yasodhara, the author of the letter, observes : 'All the chemical operations described in my book have been performed with my own hands—I am not writing from mere heresay, Everything related is based upon my conviction and observations.

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ভারতবাসীর চিন্তা-বিকাশকে সাধারণত আধ্যাত্মবিদ্যা-বিহ্বল বলে মনে করা হলেও আসলে পরীক্ষামূলক প্রকৃতি বিজ্ঞানের চর্চাও তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষমূলক এবং পরীক্ষামূলক জ্ঞানই বিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি। ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার গ্রন্থে এই জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস দেখে বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষে খুবই উৎসাহিত হবার কথা। আনুমানিক তেরো বা চোদ্দ শতকে রচিত রামচন্দ্র প্রণীত 'রসেন্দ্র-চিন্তামণি' এবং যশোমিত্র প্রণীত 'রস-প্রকাশ-সুধাকর' গ্রন্থে এই জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উভয়েই জোর দিয়ে বলেছেন, শুধু শাস্ত্রের (রসায়ন-শাস্ত্রের) বচন বা গুরুমুখে শোনা কথার উপর নির্ভর করে তাঁরা কোনো কিছু লেখেননি; তার বদলে তাঁদের সমস্ত বক্তব্যই পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু শুধু তেরো বা চোদ্দ শতকের বিজ্ঞান-সাহিত্যেই নয়। সুপ্রাচীন-কালের শল্যবিদ্যা বা Surgery-র আকরগ্রন্থ 'সুশ্রুত-সংহিতা'-তেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপাদন করা হয়েছে; এই কারণেই, সুশ্রুত-মতে শবব্যবচ্ছেদ না-করে প্রকৃত ভিষক্ হওয়া সম্ভব নয়। 'সুশ্রুত-সংহিতা'-র এই মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হবে :

"ত্বক পর্যন্ত সকল দেহের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উক্ত হইয়াছে, শল্যজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার কোন অঙ্গ বর্ণন করিতে পারা যায় না। অতএব শল্যাপহর্তা যদি নিঃসংশয় (সন্দেহ রহিত) জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা

হইলে একটি মৃতদেহকে শোধন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সম্যক্‌রূপ দর্শন করা তাঁহার কর্তব্য। যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় এবং যাহা শাস্ত্রে দেখা যায় তদুভয়ই উভয় বিষয়ে সহজে অধিকতর জ্ঞান বর্ধন করিয়া থাকে।

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শনার্থ যেরূপ শব গৃহীত হইবে, তাহাই বলা যাইতেছে। শবটির যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, তাহা যেন বিষোপহত না হয়, দীর্ঘকাল ব্যাধি পীড়িত না হইয়া থাকে, শতবৎসর বয়স্কের দেহ না হয়। এইরূপ শবের অন্তঃপুরীষ নিষ্কাশিত করিয়া কোন নির্জনপ্রদেশে তাহা একটি স্রোতহীন জলাশয়ে পচাইবে। মৎস্যাদিতে ভক্ষণ করিতে না-পারে এবং অন্য কোথাও সরিয়া না যায়, এইজন্য সেই জলাশয়ের জলের মধ্যে একটি মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ঐ শবকে রাখিতে হইবে, এবং মুঞ্জ বল্কল কুশ ও শরাদি রজ্জুর কোন রজ্জুদ্বারা তাহার সর্বাবয়ব বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে হইবে। সাতদিনের মধ্যেই উহা সম্যক পচিবে, তখন উহাকে তুলিয়া বেণারমূল, চুল, বাঁশের চেয়াড়ী বা কুঁচী দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া ত্বগাদি সমস্তই অর্থাৎ যথোক্ত বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে।

...যিনি শবচ্ছেদ দ্বারা শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রে তৎসমূহ অবগত হইয়াছেন, তিনিই আয়ুর্বেদ-বিশারদ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং শাস্ত্রশ্রুত বিষয়দ্বারা সন্দেহ নিরাকরণ পূর্বক তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন।" (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-র তর্জমা। সুশ্রুতঃ শরীর স্থান, পঞ্চম অধ্যায়)।

আয়ুর্বেদের আকরগ্রন্থে—'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা'-য় প্রত্যক্ষ-লব্ধ জ্ঞানের উপর চরম গুরুত্ব অর্পণের অজস্র নজির আছে। এখানে তার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুতের অবকাশ নেই। কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার বিশেষ প্রলোভন হয়।

আয়ুর্বেদ-মতে অম্বষ্ঠ নামের একজাতীয় ফল আমাশয় জাতীয় রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রসূ, কেননা বহু দৃষ্টান্তেই দেখা গেছে যে তা খেলে কোষ্টবদ্ধ হয়। আয়ুর্বেদ-মতে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতেই অম্বষ্ঠ জাতীয় ফলের এই উপযোগিতা স্বীকার্য। এবং প্রত্যক্ষর উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই একই ফলের বিপরীত গুণাগুণ হাজার যুক্তিতর্ক দিয়েও প্রমাণ করা অসম্ভব। 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় তাই বলা হয়েছে,

প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাঃ চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চনঃ॥

সহস্রেনাপিহেতুনাং ন অম্বষ্ঠাদিবিরেচয়েৎ।

তস্মাত্তিষ্ঠেত্তু মতিমানাগমে ন তু হেতুষু॥ ১।৪১।২৩-২৪॥

—অর্থাৎ, সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ বিষয়কে শুধুমাত্র হেতু বা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া বিদ্বানের লক্ষণ নয়। যেমন, সহস্র হেতু প্রয়োগ করেও প্রমাণ করা যাবে না যে অম্বষ্ঠ জাতীয় ফল বিরেচন (কোষ্ঠরোধের) কারণ হতে পারে।

তার মানে অবশ্যই এই নয় যে আয়ুর্বেদে যুক্তিতর্কের—এবং সাধারণভাবে অনুমানের—গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। 'চরক-সংহিতা'য় অনুমান নিয়ে দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনা আছে; সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর মতে এমন কি ন্যায়দর্শনের উত্তম-সন্ধানে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনায় উপনীত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আয়ুর্বেদের অভিপ্রেত মত এই যে যুক্তিতর্ক এবং অনুমানের গুরুত্ব যতোই হোক না কেন, তা প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হলে বস্তুত অচল হয়ে যাবে। এই দাবিও ন্যায়দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়, কেননা 'ন্যায়-সূত্র'র ভাষ্যে বাৎস্যায়নও দেখাতে চেয়েছেন যে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের মূল্য স্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপে, ন্যায়দর্শনের মতোই আয়ুর্বেদ-মতেও প্রত্যক্ষই প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ—প্রমাণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিরক্ত হয়ে কেউ হয়তো বলবেন, ধান ভাঙতে শিবের গীত কেন? আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় তো চার্বাকমত নিয়ে। কিন্তু তা ছেড়ে রসায়ন ও আয়ুর্বেদ নিয়ে এতো কথা কেন?

কারণ আছে। চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযানের একটা বড়ো হাতিয়ার হলো তাদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা। চার্বাকমতকে একেবারে খেলো প্রতিপন্ন করবার উৎসাহে কথাটাকে বিকৃত করে বলা হয়েছে যে চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; এমনকি সাধারণ লোকব্যবহারসিদ্ধ অনুমানকেও প্রমাণের মর্যাদা দিতে চার্বাকেরা নারাজ। আমরা নানা নজির থেকে দেখাবার চেষ্টা করেছি, এই দ্বিতীয় কথাটি স্বীকার করা যায় না—চার্বাকেরা একেবারে ঐকান্তিক অর্থে অনুমান অগ্রাহ্য করেননি: প্রত্যক্ষই প্রধান; তবুও প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ বিষয়ে সাধারণ লৌকিক অনুমান মানায় তাঁদেরও আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তা স্বীকার করলেও মানতে হবে, চার্বাকেরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু চার্বাক-বিরোধীদের মন্তব্য এই যে চার্বাকদের এই প্রত্যক্ষপরায়ণতা স্বাভাবিক এবং এর থেকেই বোঝা যায় মতটা আসলে অত্যন্ত অসার। ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখভোগের প্রতিই যাদের অমন

টান—যাদের মনের মতো কথা শুধু এই যে খাও-দাও-ফুর্তি করো—তারা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছাড়া আর কীই বা মানতে পারে ?

উত্তরে আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি যে, পরলোকের কাল্পনিক সুখের আশায় ইহলোকের বাস্তব সুখের প্রতি বিরাগ চার্বাকমতে অবশ্যই বেকুবের কথা। প্রত্যক্ষলব্ধ ইহকালের কথা ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ পরকালের কল্পনাও তাইই। তবু এই নজির থেকে—চার্বাকের প্রত্যক্ষপরায়ণতা থেকে—দার্শনিক মত হিসেবে তার নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে, চার্বাকের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা একদিক থেকে দার্শনিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। কেননা, প্রত্যক্ষ-পরায়ণতাই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদের কাল থেকে মধ্যযুগের রসায়নবিদ্যা পর্যন্ত প্রকৃতিবিজ্ঞানের যতোটুকু উৎকর্ষ তার মূলেও এই প্রত্যক্ষপরায়ণতা। প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ জ্যেষ্ঠ বা প্রমাণ-শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার না-করে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। এদিক থেকে বরং বলা যায়, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অন্যান্য দার্শনিক মতের তুলনায় চার্বাকমতই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক ছিলো। অতএব, চার্বাকমতের আলোচনায় ভারতীয় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অবান্তর নয় ; পক্ষান্তরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৮। প্রত্যক্ষ-অনুগামী অনুমান

অবশ্যই নিছক প্রত্যক্ষ বা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমানের উপরও নির্ভর করা প্রয়োজন। আয়ুর্বেদের গ্রন্থেই তার ভূরিভূরি নিদর্শন আছে। অতএব অনুমানের আলোচনাও আছে। অন্বীক্ষা বা অনুমান শব্দটির অর্থ ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অনু+ঈক্ষা, অন্বীক্ষা। অনু+মান, অনুমান। সহজ কথায়, পরবর্তী জ্ঞান—অন্য কোন জ্ঞানের অনুগামী জ্ঞান। কিন্তু কিসের পরবর্তী ? প্রত্যক্ষ জ্ঞানের। সহজ কথায়, কোনো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষর উপর নির্ভরশীল আর একরকম জ্ঞান।

'চরক-সংহিতা'য় কথাটা খুবই স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে :

> প্রত্যক্ষ-পূর্বং ত্রিবিধং ত্রিকালং চ অনুমীয়তে।
> বহ্নিঃ নিগূঢ় ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ ॥

এবং ব্যবস্যান্তী অতীতং বীজাৎ ফলম্ অনাগতম্।
দৃষ্ট্বা বীজাৎ ফলং জাতম্ ইহ এব সড়দর্শং বুধৈঃ ॥ ১।১১।২১-২ ॥

অনুবাদে বলা হয়েছে : 'যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব, ত্রিবিধ এবং তিন কালেই অনুমেয় হয়, তাহাকে অনুমান বলে। অনুমান প্রত্যক্ষ-পূর্ব অর্থাৎ পূর্বে যাহার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেই অনুমান করা যায়। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান কখনই হইতে পারে না। অনুমান তিন প্রকার বলাতে কারণ-অনুমান, কার্য-অনুমান ও সামান্যদৃষ্ট-অনুমান বুঝায়। অনুমানের গতি যে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই হইয়া থাকে তৎপক্ষে দৃষ্টান্ত যথা : ধূম দ্বারা বর্তমান বহ্নির অনুমান, গর্ভ দেখিয়া অতীত মৈথুনের অনুমান হয় এবং বীজ দেখিয়া সেই বীজে একবার যেরূপ বৃক্ষ ফলিয়াছিল, এবারেও তৎসদৃশ ফল ফলিবেক, এইরূপ ভবিষ্যৎ অনুমান করা যায়।' (কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্মা কবিভূষণ)।

তাহলে 'চরক-সংহিতা'য় ত্রিবিধ অনুমানের কথা বলা হয়েছে : বর্তমান ধূম দেখে বর্তমান অগ্নির অনুমান, বর্তমান গর্ভ দেখে অতীত মৈথুনের অনুমান এবং বর্তমান বীজ দেখে ভবিষ্যৎ বৃক্ষ ও ফলের অনুমান। কিন্তু এই তিনরকম অনুমানেরই মূল সর্ত হল পূর্ব-প্রত্যক্ষ। এই কারণে অনুমান প্রসঙ্গে প্রথম কথাই হলো "প্রত্যক্ষ-পূর্বং"। প্রথমে প্রত্যক্ষ; এবং সেই প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেই অনুমান। বলাই বাহুল্য, এই মতে একান্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান জ্ঞানের কোনো স্থান নেই; অতএব আত্মা, কর্মফল, পরকাল, পরলোক প্রভৃতি প্রসঙ্গে অনুমান অবান্তর হবে, কেননা এজাতীয় বিষয়ে কোনো পূর্বপ্রত্যক্ষর সুযোগই নেই। এখানে অবশ্য একটি কথা বলে রাখা যায়। অধুনালভ্য 'চরক-সংহিতা'য় আত্মা, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চোখে পড়ে। কিন্তু তার নজির থেকে আমাদের বর্তমান যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায় না। গ্রন্থান্তরে Science and Society in Ancient India গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে আত্মা, পরলোক প্রভৃতির আলোচনার সঙ্গে আয়ুর্বেদের প্রকৃত সারাংশের কোনো বাস্তব সম্পর্ক নেই। আসলে প্রকৃত চিকিৎসাবিদ্যার সমর্থনে আয়ুর্বেদ-বিদেরা গোমাংসাদি ভক্ষণ জাতীয় এমন অনেক কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা ধর্মশাস্ত্রকারদের—অর্থাৎ সুপ্রাচীন আইন কর্তাদের-বিধান-বিরুদ্ধ। এই কারণে ধর্মশাস্ত্রকারেরা চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার তীব্র নিন্দা করেছেন। ফলে, আইনকর্তাদের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের আশায়

অধুনালভ্য 'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় এমন অনেক আলোচনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে যার সঙ্গে আয়ুর্বেদের সারাংশের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক না-থাকলেও অন্তত আপাতদৃষ্টিতে আয়ুর্বেদের উপর ধর্মশাস্ত্র-আনুগত্যের একরকম যেন মুখোস পরানো যায়। কে বা কারা এই আয়োজন করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই; শুধু এইটুকু জানা আছে যে দীর্ঘ যুগ ধরে অনেকের হাত ঘুরে—অনেক অবান্তর কথা সংযোজিত হয়ে—'চরক-সংহিতা' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা'র বর্তমান সংস্করণ আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অতএব, পরবর্তী সংস্কারক ও সম্পাদকদের পক্ষে আত্মাদি বিষয়ে আলোচনা সংযোজনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোট কথা, অনুমানের লক্ষণ ও ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে যে-উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই উক্তি অনুসারে আয়ুর্বেদ মতে একান্ত অপ্রত্যক্ষ আত্মা, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে আয়ুর্বেদ-মতে অনুমানের সুযোগ নেই।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, বহু প্রাসঙ্গিক নজির থেকে মনে করা যেতে পারে যে অনুমান প্রসঙ্গে চার্বাকদের আসল বক্তব্য মোটের উপর একই রকম। প্রত্যক্ষ-অনুগামী লৌকিক বিষয়ে অনুমান চার্বাকেরাও অগ্রাহ্য করেন নি। অতএব, এদিক থেকেও বলা যায়, বহু বিরূপ প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও চার্বাকমতকে একেবারে খেলো মনে করার কারণ নেই। পক্ষান্তরে ভারতীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানের মূল ভিত্তির সঙ্গে চার্বাকমতের অন্তত অনেকাংশে আত্মীয়তা চোখে পড়ে।

এখানে আরো চিত্তাকর্ষক একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তর মতে ন্যায়-দর্শনের উৎস সন্ধানে আমাদের পক্ষে 'চরক-সংহিতা'য় ফিরে যাবার সম্ভাবনা; অর্থাৎ আয়ুর্বেদ-এর আকর গ্রন্থে প্রমাণ প্রসঙ্গে যে-আলোচনা আছে তাই কালক্রমে ন্যায়দর্শনের রূপ গ্রহণ করেছিলো। দাশগুপ্তর এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কি না—বর্তমানে আমাদের পক্ষে সে-আলোচনা তোলার দরকার নেই। কিন্তু এখানে একটি কথা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। 'ন্যায়সূত্র'-তে অনুমান প্রসঙ্গে প্রায় হুবহু একই কথা বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষর আলোচনার পরেই 'ন্যায়-সূত্র'কার বলছেন, 'অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঃ চ'।—অনন্তর, অর্থাৎ প্রত্যক্ষনিরূপণের অনন্তর (অনুমান নিরূপণ করিতেছি)। তৎপূর্বক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞান অনুমান-প্রমাণ ত্রিবিধঃ পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট।'

ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় যাঁরা অনভ্যস্থ তাঁদের কাছে এই সূত্রের

ব্যাখ্যা অল্পবিস্তর কঠিন মনে হতে পারে। যদিও ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সূত্রটির যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা তাঁর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করবো। তারই ভিত্তিতে চার্বাকদর্শনের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের একরকম আত্মীয়তা দেখা যাবে। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের কাছে পুরো উদ্ধৃতিটি অবশ্য পাঠ্য নয়; তাঁরা এই অংশ বাদ দিয়েও বর্তমান আলোচনা অনুসরণ করতে পারেন। পরে এই উদ্ধৃতির সারাংশ অবলম্বন করেই আমরা সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করবো, কেন চার্বাকদর্শনের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের কোনো একরকম আত্মীয়তা—বা অন্তত মৌলিক সাদৃশ্য—স্বীকার করার কারণ আছে, যদিও অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও অবজ্ঞা করা যায় না। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ফণিভূষণ বলছেন,

'পূর্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই এই সূত্রের প্রথমোক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। তাহা হইলে "তৎপূর্বক" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—প্রত্যক্ষপূর্বক। কিন্তু যে-কোনো প্রত্যক্ষ-পূর্বক জ্ঞানকে অনুমান বলিলে শব্দশ্রবণরূপ প্রত্যক্ষ-পূর্বক শব্দ বোধও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। সুতরাং উক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ বিশেষই মহর্ষির (অর্থাৎ 'ন্যায়সূত্র'-কারের) বিবক্ষিত ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ কী? ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ।" যে স্থলে অনুমানের যাহা প্রকৃত হেতু, তাহাকে বলে "লিঙ্গ"। এবং তাহা যে পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক, সেই অনুমেয় পদার্থকে বলে "লিঙ্গী"। যে যে স্থানে সেই লিঙ্গ পদার্থ থাকে সেই সমস্ত স্থানেই সেই লিঙ্গী পদার্থ অবশ্য থাকে। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থটি ব্যাপ্য এবং লিঙ্গী পদার্থ তাহার ব্যাপক। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থের এবং লিঙ্গী পদার্থের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব ভাব সম্বন্ধ থাকে। পূর্বে কোন স্থানে সেই সম্বন্ধের তাহাই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। যেমন ধূম লিঙ্গ এবং বহ্নি লিঙ্গী। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ধূম ও বহ্নির কার্যকারণভাব সম্বন্ধবশতঃ ধূমের উৎপত্তিস্থান মাত্রেই অবশ্যই বহ্নির সত্তা স্বীকার্য। সুতরাং ধূম রূপে ধূম ব্যাপ্য, এবং বহ্নিরূপে বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ হওয়ায় ঐ উভয়ের ব্যাপ্য ব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থকেই ব্যাপ্য বলে। ...প্রথমে উক্ত ব্যাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয় ব্যতীত কোন স্থানে ধূম দর্শন করিলেও তৎ দ্বারা সেখানে বহ্নির অনুমিতি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ বলিয়া, সেই ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়াছেন।... এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা যে প্রত্যক্ষবিশেষ মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তাহা ভাষ্যকারের মতে প্রথমোৎপন্ন লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের

প্রত্যক্ষ এবং পরে উৎপন্ন লিঙ্গের প্রত্যক্ষ। পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথমে যে ধূমদর্শন, তাহাই প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে ধূমদর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। ভাষ্যকার পরে "লিঙ্গদর্শনঞ্চ" এই বাক্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমত্বরূপে ধূমের এবং বহ্নিত্বরূপে বহ্নির যে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই উক্ত স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। সেই প্রত্যক্ষজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এই সংস্কার জন্মে। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ ধূম দর্শন করিলে তৎজন্য সেই (পূর্বোৎপন্ন) সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তৎজন্য "ধূম বহ্নির ব্যাপ্য" এইরূপ স্মৃতি জন্মে। উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি না হইলে সেখানে অনুমিতি জন্মে না।...কিন্তু উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি হইলেও উহার পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে না। সেই লিঙ্গস্মৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অনুমিতি জন্মে। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন—"স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন অপ্রত্যক্ষঃ অর্থ অনুমীয়তে।" ভাষ্য-কারের ঐ শেষোক্ত ঐ লিঙ্গদর্শন অনুমেয় ধর্মের "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান" এবং উহারই নাম "তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ"। যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথম ধূমদর্শনের পরে পর্বতে ধূমদর্শন হওয়ার পরে "বহ্নিব্যাপ্য ধূম" এইরূপে বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট স্মরণ হইলে পরক্ষণে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত" এইরূপে পর্বতে আবার যে ধূমদর্শন হয়, তাহাই শেষোক্ত তৃতীয় লিঙ্গ দর্শন। তাই উহা "তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ" কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরক্ষণেই "পর্বতো বহ্নিমান্" এইরূপে সেই পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। পূর্বোক্ত তৃতীয় পরামর্শের পূর্বে লিঙ্গ ও লিঙ্গির সম্বন্ধদর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন ও পূর্বদৃষ্ট সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ উৎপন্ন হওয়ায় অনুমিতির চরম কারণ সেই লিঙ্গপরামর্শরূপ জ্ঞান "তৎপূর্বক জ্ঞান"। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উহা অনুমানপ্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হয়।'

ফণিভূষণের ব্যাখ্যা আরো বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করার প্রলোভন নয়। কিন্তু এখানে তার সুযোগ নেই। হয়তো প্রয়োজনও নেই। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন তোলার দরকার আছে। 'ন্যায়সূত্র'র আলোচ্য সূত্রটির সরল অর্থ শুধু এই যে অনুমান বলতে বোঝায় "প্রত্যক্ষ-পূর্বক" অর্থাৎ আগেকার কোন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল প্রমাণ; তা তিন রকম: পূর্ববৎ (সোজা কথায় বর্তমান কারণের প্রত্যক্ষ থেকে ভাবী কার্যের অনুমান: যেমন মেঘ দেখে

অনুমান হয় বৃষ্টি হবে); (সোজা কথায়, কার্য থেকে কারণ অনুমান : যেমন নদীর জলস্ফীতি প্রভৃতি দেখে অনুমান হয় অতীতে বৃষ্টি হয়েছিলো); এবং সামান্যতোদৃষ্ট (যেমন কোনো বস্তুর স্থানান্তরপ্রাপ্তি থেকে তার গতি অনুমান সূর্যের গতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, কিন্তু আকাশে সূর্যের স্থানান্তর প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করে অনুমান হয় তার গতি আছে। অবশ্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই তিনরকম অনুমানের প্রত্যেকটির দুরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু বর্তমান আলোচনার পক্ষে তার জটিলতায় প্রবেশ করার দরকার নেই।

এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন তোলা হয়তো অসঙ্গত হবে না। 'ন্যায়-সূত্র'টির সরলার্থের তুলনায় যে-বিস্তৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছি তা মূলতই বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই ফণিভূষণ একাধিকবার বলেছেন, কথাগুলি ভাষ্য থেকে গৃহীত হলেও সেগুলি সূত্রকারের "বুদ্ধিস্থ"। অর্থাৎ কথাগুলি আসলে সূত্রকারেরই মাথায় ছিলো; ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তারই তুলনায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একথা না বলে অবশ্য উপায় নেই; কেননা তা না-হলে সমগ্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যই অবান্তর বলে বিবেচিত হবার আশঙ্কা। কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে অন্য একটি প্রশ্ন থেকে যায়। অবশ্যই 'ন্যায়সূত্র' এবং "বাৎস্যায়ন ভাষ্য'র সুনিশ্চিত রচনাকাল আমাদের জানা নেই; তবুও দু'ইএর মধ্যে অন্তত কয়েক শতকের ব্যবধান মানতেই হবে। এই কয়েক শতকের মধ্যে সূত্রকারের তুলনায় সরল বক্তব্যর সমর্থনে অল্পবিস্তর জটিল দার্শনিক বিচার নৈয়ায়িকদের মধ্যেই পল্লবিত হওয় অসম্ভব নয়। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে ভাষ্যকারের পুরো আলোচনা এবং 'ন্যায়সূত্র'র অপেক্ষাকৃত সরল বক্তব্য সম্পূর্ণ অভিন্ন না হতেও পারে। অবশ্যই বিদ্বান্‌রা এজাতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করবেন না, কেননা বাৎস্যায়নভাষ্য বাদ দিয়ে বা অবজ্ঞা করে 'ন্যায়-সূত্র'র মর্মার্থ বোঝবার কোনো প্রথা নেই এবং হয়তো তা সম্ভবও নয়। তবুও এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উত্তরকালে 'ন্যায়-সূত্র'র ভাষ্যকার এবং টীকাকারেরা নানা নতুন দার্শনিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বলেই 'ন্যায়সূত্র'র সমর্থনে অনেকরকম নতুন নতুন দার্শনিক বিচার উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন; বাৎস্যায়নের পর উদ্দ্যোতকর তাঁর 'ন্যায়বার্তিক' গ্রন্থে, এবং উদ্দ্যোতকরের পর বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য-টীকা'য়—তাছাড়া জয়ন্তভট্ট, উদয়ন থেকে গঙ্গেশ পর্যন্ত সকলেই 'ন্যায়সূত্র'র প্রামাণ্য অনুসরণ করে যতো কথা বলেছেন তা সবই 'ন্যায়সূত্রে' অস্ফুটভাবে বর্তমান—একথা কল্পনা করায় বাধা আছে, কেননা এঁদের মধ্যেও পারস্পরিক মতভেদ বর্তমান।

আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে এই কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'ন্যায়-সূত্র'র সরল অর্থ অনুসারে অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ-নির্ভর। অর্থাৎ, আগে প্রত্যক্ষ এবং সেই প্রত্যক্ষর উপর নির্ভর করেই অনুমান। সোজা কথায় ফণিভূষণ যেমন বলেছেন, 'প্রত্যক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঐ জ্ঞানদ্বয়েরও কার্য-কারণ ভাব আছে।' (ন্যায়দর্শন ১।১৩১)।

অনুমান প্রসঙ্গে এই কথাই যদি ন্যায়দর্শনের সারাংশ হয় তাহলে চার্বাক মতের সারাংশর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় এবং কতোখানি? চার্বাক কোনো অর্থেই অনুমান জানতেন না—একথা চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক। বরং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, প্রত্যক্ষ গোচর ইহলৌকিক বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করা চার্বাকমত সম্মত হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ চার্বাকমতেও অনুমান প্রত্যক্ষ-পূর্বক—যদিও কথাটি "লিঙ্গপরামর্শ" প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করে প্রকাশ করার দার্শনিক কৌশল চার্বাকদের জানা ছিলো, এমন কোন ইংগিত কোথাও পাওয়া যায় না।

অবশ্যই ন্যায়দর্শনের গ্রন্থাবলীতে চার্বাকমত খণ্ডনের ভূরিভূরি নজির আছে। তাছাড়া অনুমানকে "প্রত্যক্ষপূর্বক" বলে স্বীকার করলেও ন্যায়দর্শনে আত্মা, প্রেত্যভাব (বা পুনর্জন্ম) প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমানও বিরল নয়। কিন্তু এ-সবের সঙ্গে ন্যায়দর্শনের সারাংশের কতোখানি মিল হয়, সে-বিষয়েও স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। আপাতত আমাদের মন্তব্য শুধু এই যে অনুমানকে প্রত্যক্ষ-পূর্বক বলে গ্রহণ করে নৈয়ায়িকেরা যে-মতের উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে অনুমান-প্রসঙ্গে প্রকৃত চার্বাকমতের খুব একটা পার্থক্য থাকে না।

৮ ॥ উপসংহার

চার্বাকমতকে একেবারে খেলো প্রতিপন্ন করার উৎসাহে অনেকে বলেছেন এই মতে নিছক প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছুর প্রামাণ্য নেই। অতএব চার্বাকেরা অনুমান মানেন না। কিন্তু বহু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেও প্রত্যক্ষগোচর—বা প্রত্যক্ষ-অনুগামী-লৌকিক অনুমান স্বীকার করায় চার্বাকদের আপত্তি ছিলো না। শুধু তাই নয়। চার্বাকদের প্রত্যক্ষপরায়ণতা—এবং প্রত্যক্ষ-অনুগামী অনুমানের স্বীকৃতি—ভারতীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তি এবং এমনকি ন্যায়দর্শনের সারাংশর সঙ্গে এরকম আত্মীয়তার আভাস পাওয়া যায়। অতএব মতটি একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মতো খেলো নয়।

লেবু-বাগিচায়

আলেক্স লা গু মা

ভাষান্তর : ছবি বসু

[আলেক্স লা গু মা—কালো মানুষদের আত্মাধিককার দাবির লড়াইয়ে প্রথম সারির লেখক আলেক্স লা গু মার জন্ম হয় ১৯২৫ সালে। বেশ কম বয়সেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। আর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কেপটাউন জেলা কমিটি যতদিন না নিষিদ্ধ হয় ততদিন খোলাখুলি ভাবে সেখানে কাজ করেছেন। ১৯৫৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 'স্বাধীনতার ক্রোড়পত্র' রচনা করার অপরাধে ১৫৬ জনের সঙ্গে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক রূপে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সালে প্রগতিবাদ পত্রিকা নিউএজ-এ লেখার জন্য তিনি অভিযুক্ত হন। ক্রমান্বয়ে জেল ও গৃহ—অন্তরীণ অবস্থায় বেশ কয়েক বছর কাটে। শেষ দিনগুলি কিউবায় কাটান। ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'কেপটাউনের পথে'—এই সাতটি গল্পের সংকলন থেকে 'লেবুর বাগিচায়' গল্পটি নেওয়া]

তখনও শীত বিদায় নেয়নি। বাতাসে ঠাণ্ডার কনকনানি। সার সার দীর্ঘ দুই সারি গাছের মধ্য দিয়ে লোকগুলি নিচের দিকে নেমে আসে। কখন থেকে ত চাঁদ আড়ালেই রয়েছে। আকাশে ছোপ ছোপ মেঘ নোংরা তুলোর দলার মত ইতি উতি ঝুলছে। শুধু একজনই বাদ—বাকি সবার পরণে শীতে পরবার মত ভারী গরম জামা। রাত আর পৃথিবী স্যাঁতস্যাঁতে আর জমাট ঠাণ্ডা। লোকগুলির পায়ের জুতো মাটিতে গেঁথে গিয়ে ছাপ পড়ছিল। সে সব এই এত আঁধারে মোটেই নজরে পড়ছিল না।

এদের মধ্যে একজন ছিল এগিয়ে। তার হাতে ঝোলান লণ্ঠনটি ব্যাটারি পরিচালিত। গাছের সারির মধ্য দিয়ে সে পথ দেখিয়ে চলেছে। বাকিরা চলেছে আঁধায় পায়ে মাড়িয়ে। রাত এখন স্তব্ধ। আশপাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা অবধি নির্বাক। তবে দূরে যেখানে তারা মানুষের সাড়া পাচ্ছে না সেখানে একঘেয়ে ডেকেই চলেছে—ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ······আরও কোথায় দূরে কুকুর ডেকে উঠে হঠাৎই থেমে গেল। লেবুর বাগিচার মাঝ দিয়ে তারা

হেঁটে চলছিল। তীব্র টক মিষ্টি গন্ধ রাতের হাওয়ার গায়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আলতোভাবে।

দলের শেষ লোকটি আলো হাতের লোকটিকে হাঁক পাড়ল—ওহে অত তাড়াতাড়ি যেও না। দেখছ না পেছনটা যা অন্ধকার—ঠিক কাফেরের আত্মার মত।

হাঁকটা আস্তেই ছেড়েছিল, যেন আঁধার নিস্তব্ধতাই চায়। বেশ গায়ে গতরে লোকটি। পরণে খাকি প্যান্ট আর ফাঁস দেওয়া বুট জুতো। ঘোড়ায় চড়বার মত। গায়ের শুটিং জ্যাকেটটির ডান বুক ও কনুয়ের কাছে চামড়ার তাপ্পি আঁটা।

তার হাতের বন্দুকটি টোটাভরা। মুখটা আঁধার ছায়া ছায়া ভাব। আবছা আলো পথের ভাঙাচোরা গর্ত আর উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ে রাস্তায়। সব শেষে হাঁটলেও সেই আসলে দলের নেতা। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে লণ্ঠনওলা গতি মন্থর করে।

একজন বলে—জব্বর শীত হে।

বন্দুকওলা ব্যঙ্গ করে বলে—এই হারামজাদাটার চাইতেও তোমার বেশি ঠাণ্ডা লাগছে নাকি হে! বন্দুকের গুঁতো যাকে মারছিল শুধু তার পরণেই ছিল না কোন গরম জামা। সে হোঁচট খায়। তার পরণে শুধু প্যান্ট আর বর্ষাতি। ঐটুকু তাকে ধরবার সময় পরতে দিয়েছিল। শীতে বেজায় কাঁপছিল লোকটি। দাঁত চেপে ছিল পাছে ঠকঠকানি এরা শুনতে পায়। এমন সময় শুদ্ধ দেয়নি যাতে জুতোর ফিতের ফাঁস লাগাতে পারে। তাই ওর চলবার সময় ফিতের শেষে ধাতুটুকুর ঠনঠনে আওয়াজটি কানে আসছিল। লণ্ঠনওলা এবার মস্করা করে—কীরে শালা শীত লাগছে বুঝি! কালো মানুষটি কোন জবাব দেয় না। ভয় পেয়েছে তবে ভয়ের সঙ্গে মিশেছিল একটা বেপরোয়া ভাব। জবাব দেবার ওর প্রবৃত্তিও ছিল না।

পঞ্চম লোকটি বলে—আর শীত নয়, ব্যাটা ভয়ে কাঁপছে। তাই না রে হারামজাদা?

কালো মানুষটি নির্বাক। শুধু সামনের দিকে চেয়ে থাকে। লণ্ঠনের এক ফোঁটকা আলোয় এক আলো আঁধারি বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে। যে লোকটি আলো হাতে চলছিল তার ছায়া ছায়া অস্পষ্ট চেহারাটি ও আন্দাজ করতে পারছিল কিন্তু যে দুজন শীত আর ভয়ের কথা নিয়ে ঠাট্টা করছিল তাদের দিকে ওর

চাইবার প্রবৃত্তি হলনা। তাদের হাতে অস্ত্র আর তারা থেকে থেকে ওকে পা দিয়ে লাথি কষাচ্ছিল।

শেষের জন চুক চুক করে—ব্যাটা বোবা।

বন্দুক হাতে লোকটি বাধা দেয়—মোটেই তা নয় এ্যান্ডি। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি।

সবাই গাছের মাঝে সার বেঁধে দাঁড়ায়। আলোহাতে লোকটি এগিয়ে এসে আলো ফেলে। নেতাটি জোর গলাটা স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে—

—মোটেই বোবা নয়। আসলে হারামজাদা। ঐ লেখাপড়া জানা হারামজাদাদের মধ্যে একজন। ঘুরে ফিরে দৃষ্টি পড়ল তার কালো মানুষটির মুখে—মনিব কথা বলছে। তা শালা জবাব দিবি ত! না কী শুনতে পাসনি!

ওর হাতের কবজি জোড়া জোট করে পেছনে বাঁধা। সেখানে বন্দুক ঠেকিয়ে গুঁতো মারে—

—হতভাগা শুনতে পাচ্ছিস না! বলছি জবাব দে নইলে এক্ষুণই গুলি করব। মেরুদণ্ড ঝাঁঝরা করে দেব।

বন্দুকের গোড়ার ইস্পাতের স্পর্শ ওর বর্ষাতি ভেদ করে পিঠে এসে লাগে। ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লাগার জোগাড়—প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলায়। ওরা যদি ভাবে কাঁপুনি তার ভয়ের কাঁপুনি তাহলে? কানে ঠেকল একটা ধাতব আওয়াজ। নেতা তার বন্দুকটা যথাস্থানে রাখল। কী প্রচণ্ড শীত তবু এরই মধ্যে ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

হ্যারিকেন হাতে লোকটি সন্ত্রস্ত হয়ে হাসে—

—ওহে ভগবানের দোহাই, গুলিটুলি কোরনা, এখন আর খুন জখমের গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে চাইনে।

—বলছ কী হে?

নেতা বলে।

ব্যাটারির আলো নেতার লাল কাদার মত মুখে পড়লে ফুটে ওঠে অসংখ্য বলি রেখা ঠিক যেন মানচিত্রের গায়ে ছোট বড় নদী রেখা, পথ ঘাট, রেল পাথর আঁকিবুকি। তারপর গালের উঁচু ঢিবির ওপর দিয়ে পরিক্রমা সেরে নাক পেরিয়ে চোয়ালের উন্নত হাড় ঠেলে এসে থেমেছে এক জোড়া চোখে। আর সে চোখ জমাট তুহিন লেকের মত নীল।

আবার সে বলে—এটা একেবারে হারামজাদা। স্কুলের মাষ্টার ত কী!

আমাদের দেওয়া মাইনেতে খায় না? রোজগার করতে আমাদের ঘাম ঝরে না? শালার কী আস্পর্ধা বলত! গীর্জার পাদ্রির মুখের ওপর হম্বিতম্বি করা। ছোটলোক নয়ত কী? আমার জীবন থাকতে কালোটুলো লোক সাদালোকের মুখোমুখি করবে এ কোনমতেই বরদাস্ত করব না।

লণ্ঠনধারী বলে—যা বলেছ বিলকুল ঠিক। ওর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তবে এক্ষুণই গুলি করা ঠিক নয়। ওসব হাঙ্গামায় না জড়ানই ভাল।

—যে কোন হারামজাদা কিংবা কাফেরকে ইচ্ছে মত গুলি করে মারব সে হাঙ্গামায় পড়ি আর না পড়ি। শালারা খাতির করবে না সেটা কী আর একটা কথা? জিজ্ঞেস করলে আলবৎ জবাব চাই।

হঠাৎ দুম করে বন্দুকের বাঁট দিয়ে লোকটার পাছায় মারে আর ভার ঠিক রাখতে গিয়ে সে হোঁচট খায়।

—এই শালা কানে যাচ্ছে না কী বলছি। যে লোকটি বন্দীর ভয় পাওয়া নিয়ে মস্করা করছিল সে এগিয়ে এসে ওর গালে চড় কষায়। লোকটার অবাধ্যতায় ও আর বরদাস্ত করতে পারছিল না। এগোতে হবে ত? তবে?

চেঁচিয়ে বলে—ওরে ও বেজন্মা জবাব দিস্‌ না যে বড়?

লোকটা আবার হোঁচট খেল। কোনমতে সামলাল, লেবু গাছগুলির আবর্তিত ছায়ার নিচে দাঁড়ায়। আলো এসে ওর মুখের ওপর পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। ভয় হয় নেতাটি হয়ত এক্ষুণই গুলি করে বসবে। না, এখন তার মরবার বিশেষ ইচ্ছে নেই। সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টি তার এদের পেরিয়ে অনেক দূরে······।

যে লোকটা মেরেছিল সে বলে—কী?

বন্দী বলে—হ্যাঁ হুজুর।

ওর গলায় ঘৃণা ও আত্মমর্যাদা মেশামেশি, সে সুর ওরা ধরতে পারে না।

আলোহাতে লোকটি বলে—এইত বহুত আচ্ছা বেঁচে গেলি যে। পরের বার মনে থাকে যেন। এখন এগোও হে······

লণ্ঠন দুলতে দুলতে আবার এগিয়ে চলে। আর সে সবার সামনে চলে। নেতা আবার বন্দুকের বাঁটের গুঁতো দিলে সে আলোর বৃত্তের মাঝে লোক-গুলোর গায়ে হোঁচট খেয়ে ফের চলতে শুরু করে।

—সব থেকে আশ্চর্যের কথা কী জান প্রিন্সিপ্যাল আর পাদ্রী সাহেবকে এই শালা কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে হয়ত খেসারত দাবি

করতে পারত। কেননা ওরা ওকে লুকোবার ঠাঁই দিয়েছিল। উল্টে শালা হম্বিতম্বি করল। জীবনে এরকম বদ্‌মাস ত আর দেখিনি।

এণ্ডিজ বলে লোকটা বলে—ভাল। ওর লুকোবার মত জব্বর আস্তানা আমরা খুঁজে দেব। ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। বাছাধন কার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে দেখা যাবে।

—আরে এ তল্লাটে ওর মুখই আর কেউ দেখতে পাবে না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে শহরে ডেরা বাঁধুক। সেখানে মানুষের মর্যাদা এসব বড় বড় বুলি নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়! শালা শুনছিস নাকি?

নেতা বলে চলে—আমাদের শহরে বাপু ঐ লেখাপড়া জানা লোক-গুলোকে আসতেই দেব না।

একজন বল্লে—কালো ইংরেজগুলোকেও নয়……

খামারে কুকুর আবার ডাকতে থাকে। পাহাড়ের একপ্রান্তে অন্ধকার পেরিয়ে উপত্যকায় সেই খামার।

লণ্ঠনধারী বলে—আর ঐ তো জাগটার নামে কুকুরটা। কী করছে ওটা বলত। বেশ চমৎকার পাহারাদার কুত্তা। মিনির মারাইকে কুকুরটার জন্যে পাঁচ পাউণ্ড পর্যন্ত দেব বল্লাম। কিছুতেই বেচল না, ওরকম একটা কুকুর আমার দারুণ পছন্দ। ওটাকে কী যত্নই না করতাম……

ক্রমশই লেবুর বাগিচার গায়ে রাতের আঁধার গাঢ় হয়ে নামে। পাতায় পাতায় তীব্র ফিসফিসানি লেবুর মিঠে কড়া গন্ধর সঙ্গে বেমানান লাগে। বাতাসে, কনকনানি আরও বাড়ে। অদূরে ঝিঁঝিঁ পোকা সরবে ডেকে চলেছে।

মেঘের ওপারে থেকে চাঁদ উঠল। তার শুভ্র রশ্মি পাতায় পাতায় চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। আর লেবুর ঝাঁঝাল গন্ধ বাড়ে আর বাড়ে যেন তার সমস্ত রস নিংড়ে উজাড় করে দিচ্ছে।

ম্লান জোছনার পথ বেয়ে ওরা আরও একটু এগোয়। লণ্ঠনধারী বলে—

—এ জায়গাটা যে কোন জায়গার চাইতে ভাল।

লেবুর বাগিচার একটি খোলা চত্বরে এসে তারা দাঁড়ায়। যেন একটি রঙ্গমঞ্চের চারিদিক ঘিরে গন্ধের আবহাওয়া লুটোপাটি খাচ্ছে। সবাই সেখানে থাকে। গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় চাঁদের আলো লেগে থাকে। রুপোলি আলো পাতার ডগা বেয়ে ঝরছে আর ঝরছে টুপটুপ করে।

মৌলবাদ প্রসঙ্গে দু'চার কথা

বাসব সরকার

ধর্মের প্রতিষ্ঠানিক দাপট আমাদের এই সনাতন ধর্মের দেশে বহু পুরনো। ধর্মের মহত্ব যতো কমেছে, বলা যায়, তার প্রতিষ্ঠানগত জোর ততোই বেড়েছে। আচার সর্বস্বতার বেড়াজালে, অন্তহীন বিশ্বাসের সম্বলটুকু নিয়ে ভারতের সমাজ ধর্মের নামে মানুষকে শাসন করে এসেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভাবা গিয়েছিল আধুনিক জীবনধারার অনিবার্যটানে এর রূপান্তর ঘটবে। কিন্তু ভারতীয় মানসিকতা তার স্বভাব বদলাতে পারেনি, কিম্বা বলা যায় স্বভাব বদলাবার সুযোগ পায়নি।

সত্তরের দশকে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে নানা অভ্যন্তরীণ কারণে যখন ইসলামীয় মৌলবাদ মাথা চাড়া দেয়, তখন ভারতেও তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। হিন্দুত্বকে দেশগত পরিচিতির বদলে ধর্মগত বিশেষস্বরূপে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা এদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনাকাল থেকে চলে আসছিল। হিন্দু ও মুসলমান কেবল নয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও নানা তাগিদ থেকে বিভিন্ন সময়ে এই মনোভাবে মদৎ দিয়েছেন। খৃষ্টান মিশনারীরা আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের সুরু থেকে এদেশে যখন ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন ভারতীয় বর্ণসমাজের নীচুতলার মানুষদের দিকে তাঁদের নজর পড়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে বলা যায় এইসব মানুষদের অধিকাংশই ছিল না-হিন্দু পর্যায়ের, কারণ প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম তাদের কোনদিন কোল দেয়নি। মুসলমান শাসকদের আমলে দেশের বিভিন্ন অংশে এবং বিশেষতঃ বাংলা ও বিহারে তারাই বর্ণসমাজের মুখিয়াদের অত্যাচার এড়াতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু যারা ধর্মান্তর করে এবং যারা ধর্মান্তরিত হয় তাদের উভয়েরই সচেতন প্রচেষ্টা থাকে ছেড়ে আসা ধর্মের থেকে নিজেদের পার্থক্য সব সময়ে

জোরের সঙ্গে জাহির করার। ফলে যে ধর্ম থেকে এইভাবে সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে তাদের চেষ্টা হয় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে নানা সংকীর্ণতার আড়ালে বিশুদ্ধতার গণ্ডিটাকে বজায় রাখার। তার অনিবার্য ফল হলো উভয় পক্ষেই মৌলবাদের আশ্রয় নেওয়া। এদেশে মৌলবাদের ইতিহাস খুঁজতে গেলে সমাজ জীবনে এই ঘটনা চোখে না পড়ে পারে না। বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্ম যখন আমাদের সমাজ জীবনে প্রথম আলোড়ন তুলেছিল, তখন আঘাতে আবৃত হিন্দু সমাজ মৌলবাদকেই আশ্রয় করেছিল। ধর্মের এই ধরণের টানা পোড়েনে সবচেয়ে জর্জরিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। কারণ ভাঙন উন্মুখ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মৌলবাদ ছাড়া আর কিছু আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। উনিশ শতক পর্যন্ত আমাদের সমাজ ইতিহাসে সমস্ত ধর্মীয় পরিবর্তন কালে এটাই ছিল যুগ লক্ষণ।

ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে একথাই প্রমাণিত হবে। কোন দেশে কোন কালে কোন ধর্মই তাত্ত্বিক উৎকর্ষের দাবীতে, দার্শনিকতার জোরে সাধারণ মানুষকে দলে ভেড়াতে কিম্বা অনুগত রাখতে পারেনি। খৃস্ট, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্ম রাজশক্তির প্রশ্রয়েই পুষ্ট হয়েছিল। এমন কি যে হিন্দুত্বকে ধর্মের এক সামাজিক রূপ বলা হয়, তার সূচনা পর্বের ইতিহাসও তাই। বেদের যুগে এবং পরবর্তীকালে যে সব যাগ যজ্ঞ ও ধর্ম অনুষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যায় সেখানে গণশক্তি নয় রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল তাদের মূল ভিত্তি। এইভাবেই রাজশক্তি ও ধর্মশক্তির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরস্পর নির্ভর হয়ে বেড়ে উঠেছে। একথা ভারতের ক্ষেত্রে যেমন ইউরোপের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। স্থান বিশেষে কিছু হেরফের ঘটে থাকতে পারে, তাকে ব্যতিক্রম বলা বেশি সঙ্গত।

সমাজতত্ত্বে বলা হয় ধর্মের ইতিহাস সমাজের ইতিহাসের চেয়ে অনেক অর্বাচীন। এই অর্বাচীনত্ব প্রমাণ করে সমাজ জীবনে চিরকাল অপরিহার্য ছিল না। ধর্মের সর্বশক্তিমান রূপ না জেনে, না বুঝে মানুষের সমাজ গড়তে কোন অসুবিধা হয়নি। এই দিক থেকে দেখলে মৌলবাদের অকিঞ্চিৎকরতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে এবং বুঝতে অসুবিধা হয় না নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই তাকে গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন কোন ধর্মের প্রচার দিকটা লক্ষ্য করলেই এই সত্যটুকু ধরা পড়বে। অন্যভাবে বলা যায় ধর্মকে চলতি সমাজ কাঠামোকে জীইয়ে রাখার স্বার্থে ব্যবহার করা হলে, তার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ পর্বে এই ধরণের সংকীর্ণতা ও একপেশে মনোভাব দেখা দেবেই।

ধর্মকে নিয়ে তত্ত্ব খাড়া করতে মানুষ চেষ্টা সুরু করেছে আরো পরে। ধর্মের এই তাত্ত্বিক কাঠামো গঠনে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, চলতি সমাজের কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখায় তাদের স্বার্থ ছিল। পুরোহিত, মহান্ত, মোল্লা মৌলবী ও পাদ্রীরা যখন থেকে ধর্মের তত্ত্ব আলোচনা সুরু করেছিলেন তখন চলতি সমাজকে সমর্থন করাটাই তাদের সব কথার উপজীব্য ছিল। এমন কি যাদের প্রতিবাদী ধর্ম বলা হয় তারাত চলতি ব্যবস্থার নির্যাস বাতিল করতে চায় না। যেমন মধ্যযুগের শেষপর্বে ইউরোপে পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ খৃষ্ট ধর্মের কাঠামোর মধ্যে জন্ম নের তা পোপের স্বৈরী ক্ষমতার অবসান দাবী করলেও সামাজিক শোষণ ব্যবস্থাকে ভাঙতে চায় নি। তাই সামন্ত ব্যবস্থাকে নড়বড়ে করে ভেঙে সেই প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম পুঁজিবাদকে কায়েম করেছে, কিন্তু সামাজিক শোষণকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। স্বভাবতই নতুন ধর্ম ধর্ম মতের তত্ত্বচিন্তা অনেক ভালো ভালো, এমন কি দরকারী কথা বললেও সমাজের বাস্তবতাকে আড়াল করতে চেয়েছে।

অন্যভাবে বলা যায় মৌলবাদকে সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে কিম্বা ভাঙতে চায় কিনা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একবার মানতেই হবে মৌলবাদ আর যাই হোক সমাজের মৌল পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি হিসাবে কোনদিন ছিল না, এবং সম্ভবতঃ থাকবেও না। এদেশে চলতি মৌলবাদী বিতর্কেও একথা স্মরণীয়।

কোন এক প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে সমাজে শিথিল হয়ে বন্ধনগুলি জোরদার করে তোলার জন্য ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। ধর্মের অর্থই হলো তাই ধারণ করা, আলগা। দলছুট উপাদানগুলিকে একত্রিত করে রাখা। সেটা হলো ধর্মের সংহতি বিধায়ক রূপ। তখন নানা ধর্ম, নানা পথ ও মতের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। তখন ধর্ম ছিল লোকধর্ম। ধর্মের এই সংহতি রক্ষার ক্ষমতা যতোই প্রকট হতে থাকে ততোই ধর্মে বিশ্বাস বাড়ে। কালক্রমে এই বিশ্বাস বা যৌথ, ধর্ম বা রিলিজিয়নের জায়গা দখল করে। লোক ধর্মের কাঠামোয় মানুষের সুখ, দুঃখ হাসি কান্না মুখ্য ছিল। তাই মানুষের বস্তুকেন্দ্রিক জীবনচর্যার সঙ্গে ছিল তার নাড়ীর টান। সেই ধর্ম ছিল সরল, অনাড়ম্বর। কিন্তু জীবন যতো জটিল হতে থাকে, মানবিক সম্পর্কগুলি স্বার্থের দ্বন্দ্বের সঙ্গে যতোই নিবিড় ভাবে জড়িয়ে যায় তখন রিলিজিয়ন তার মানবিক আবেদন হারাতে হারাতে অতীন্দ্রিয় কল্পনাশ্রয়ী হয়ে পড়ে। তাতে হয়তো ধর্মের দার্শনিকতা বেড়েছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি তর্কে মানুষের মননশীলতার পরাকাষ্ঠা

দেখা গেছে, কিন্তু একই সঙ্গে তেল নুন লকড়ির সমস্যার চাপে ক্লিষ্ট মজুর পুরুকুল ধর্মের থেকে দূরে সরে গেছে। এটাই ছিল ফেথ-এর বিকাশ পর্ব। সব ধর্মের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। ফলে ধর্ম তখন থেকেই 'ফেথ্ এ্যাবাউট ফ্যাক্টস অব্ লাইফ' হওয়ার বদলে নিছক 'ফেথ্ এ্যাবাউট ফেথ্'-এ পরিণত হয়েছে।

সমস্ত মৌলবাদ হলো এই 'ফেথ্ এ্যাবউট ফেথ্'-এর কাহিনী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হরিজন নিধন, রাম-জন্মভূমি বনাম বাব্রি মসজিদ্ থেকে হালফিল দেওরালায় রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনা হলো এই ফেথ্ এ্যাবউট ফেথ-এর নারকীয় প্রকাশ। পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যখন 'আফ্রিকা' কবিতায় বলেছিলেন কালো মানুষগুলির জীবন যখন খড় কুটোর মত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে ধ্বংস করা হয় ঠিক তখনই সাগর পারে হয়ত গীর্জায়, মন্দিরে পূত পবিত্র পরিবেশে সামগান আর ঘণ্টা ধ্বনি হয়। সেটাও ছিল এক ধরনের মৌলবাদ যা সাদা চামড়ার মানুষদের ঈশ্বরকে জগৎত্রাতার আসনে বসাতে না পারা পর্যন্ত নিরস্ত হতে চায় নি। তাদের 'গড সেভ্ দি কিং' প্রার্থনার মধ্যে যা অনুক্ত ছিল তা হল "গড সেভ্ দি কিং এ্যাণ্ড হিজ্ এম্পায়ার।" এই দ্বিতীয় কাজটা ঠিক মতো করার জন্যই ঈশ্বরের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রত্যাশার লোলুপতাকে চাঙ্গা করে তোলা দরকার ছিল। তাতে ঘরে-বাইরে সুদে-আসলে প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা দ্বিগুণ ছিল।

আমাদের দেশে মৌলবাদ তার থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। দেশটা অনুন্নত বলে তার প্রকাশের ভঙ্গিটা আলাদা। রাজস্থানে যারা সতীদাহের জন্য কাঠ, ঘি, তেল যোগায়, খোলা তরোয়াল হাতে চিতা নামক বধ্যভূমি পাহারা দেয়, তাদেরই আপনজনরা পশ্চিমবাংলায় বধূহত্যা করে। রাজস্থানে বধূকে সতী বানানো হয় যাতে বিধবা নারী তার নায্য সম্পত্তি নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরতে না পারে, সতীমন্দিরের প্রণামী তার সঙ্গে যোগ হয় উপরি আয়ের সূত্র রূপে। আর পশ্চিমবাংলায় বধূ পোড়ানো হয় কেন বাপের বাড়ি থেকে পনের টাকা যোল আনা উসুল করতে পারে নি বলে। সতীদাহ কিংবা বধূহত্যা, দুটোই মানসিকতার একই বিন্দু থেকে উৎসারিত যেখানে লোভের রাজত্ব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এসব হল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানসিক কাঠামোর গভীরে সঞ্জাত মৌলবাদ।

মনে হতে পারে সংখ্যালঘুর মৌলবাদ হল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। কারণ সেখানে ধর্মীয় পার্থক্য আচার বা বিশ্বাসের মোড়কে না এসে একেবারে

সরাসরি হাজির হয়। এটা হল ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সব দুঃখ দুর্দশা ও যন্ত্রণার সঙ্গে উপরি পাওনা। ধর্ম ও রাজনীতিকে একাকার করে দেখার সূচনা গত শতকেই হয়েছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে। নেতারা পরস্পর থেকে দূরে থেকেই নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী, মালব্য, সাভারকর ব্যক্তিগত জীবনে সংকীর্ণতাকে কোনো প্রশ্রয় না দিলেও রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তায় হিন্দুর ধর্মগত বিশ্বাসের উপরে উঠতে পারেন নি। হয়ত তাঁদের চোখে এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। স্যার সৈয়দ আহমদ কিংবা মহম্মদ আলি জিন্না, কিংবা ইকবাল সম্পর্কেও তো একই কথা প্রযোজ্য। তাঁরাও স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে ঘটনার চাপে মুসলমানত্বকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে ভারতের সংবিধানের অন্যতম প্রধান রূপকার আম্বেদকর তাঁর প্রস্তাবনায় আধুনিক গণতন্ত্রের সব ভালো কথা বলেও গান্ধীপ্রদত্ত "হরিজন" নামের ধর্মীয় কালিমা মোছার জন্য শেষ বয়সে সদলে বৌদ্ধ হয়েছিলেন। সিটিজেন-ম্যান রূপে পরিচয় দিতে কোনো প্রচ্ছন্ন অপারগতা কি তাঁকে বৌদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

বস্তুত, ভারতে যে সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বর্তমান, যে আর্থনীতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সমস্ত উপায় ও উপকরণ এখানে শাসক শ্রেণীর দখলে রয়েছে, সেখানে সমাজব্যবস্থার ঘনায়মান সংকটে মৌলবাদ দেখা দেবেই। ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানে কিংবা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা ভেঙে সৃষ্টি হওয়া বাংলাদেশেও আজ মৌলবাদ দেখা দিয়েছে। তাকে নিছক ইসলামী মানসিকতার প্রকাশ মনে করা ভুল হবে। ভারতে হিন্দু মৌলবাদী চিন্তার বিপরীতে ইসলামী মৌলবাদকে স্থাপন করে, একটিকে অন্যটির প্রতিক্রিয়া বলে বসে থাকা হবে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার নামান্তর। কারণ এই যুক্তি দিয়ে পাকিস্থান কিংবা বাংলাদেশের মৌলবাদকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

ভারতীয় উপমহাদেশে মৌলবাদ হল শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার তার দেশগত রূপ ভেদ যাই থাক না কেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, আদিবাসী কিংবা মুসলমানে মুসলমানে যে বিরোধ এই উপমহাদেশের দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে, তার রাজনৈতিক চেহারায় পার্থক্য থাকলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক চেহারাটা একই। এই উপমহাদেশের সব দেশে এই সত্যটুকু মেনে মৌলবাদ বিরোধী অবস্থান নেওয়া তাই আজ জরুরী।

অশান্ত নহুষ

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

[কনসার্ট বেজে ওঠে। সুর : পুরিয়া ধানেশ্রী। বাজনা-শেষে নেপথ্য ঘোষণা : নমস্কার! ভুবনেশ্বরী তরুণ দল নাট্য সংস্থার তৃতীয় নিবেদন—অ-শা-ন্ত ন-হু-ষ! রচনা ও পরিচালনা—অধিকারী হালদার। সহকারী পরিচালনা ও গ্রন্থিক—নিধান মণ্ডল। নহুষ চরিত্রে রূপদান করছেন বিখ্যাত নট গৌরাঙ্গ মেজ। নারদ—শ্রীবাস পুরকাইত। অগস্ত্য—ভীমচন্দ্র দাস। অশোকসুন্দরী—মালতী মেজ। শচী—সরস্বতী খাটুয়া। আস্তে আস্তে ঘোষণা অস্পষ্ট হতে থাকে। মাইকের গোলযোগ। চারপাশ থেকে চীৎকার ওঠে—মাইক! মাইক! মাইক! হঠাৎ কনসার্ট শুরু হয়। দ্রুত লয়ে বাজতে থাকে। চারপাশের গোলমাল শান্ত হয়।]

নান্দী

একদন্ত মহাকায় গজশুণ্ড লম্বোদর
সিদ্ধিদাত্রে গণেশায় নমোনমঃ।
নারায়ণং নমস্কৃতং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
হস্তস্থিতং শঙ্খচক্র গদাপদ্মায় নমোনমঃ।
ওঁ নমঃ নারায়ণায় নমঃ।
[গান] জয় জয় মাগো জয় বনবিবি
এই আসরে এসো তুমি
গাহে গান গুণহীন কবি।
কিবা আমি জানি মাগো
যা বলাবে তুমি
সর্বজনে রক্ষা করো
তুমি মাগো বনবিবি।
[নান্দ্যন্তে সূত্রধার]

সূত্রধার

শুন শুন শুন সবে শুন দিয়া মন।
রাজা নহুষের কাহিনী এবে করিব বর্ণন ॥
আয়ু রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র নহুষ যাহার নাম।
ছড়িয়ে পড়ে সেই নাম স্বর্গ-মর্ত ধাম ॥
নহুষ রাজা পৃথিবীর আশ্চর্য বিস্ময়।
নরশ্রেষ্ঠ দেব-সদৃশ দৈত্যগণের ভয় ॥
দিব্যকান্তি গৌরবর্ণ সুঠাম ঋজু দেহ।
জিতেন্দ্রিয় মুক্তপুরুষ সর্বজনে স্নেহ ॥

এহেন রাজা নহুষ একদা এক পাপ করে বসেন। যদিও তিনি জ্ঞাতসারে পাপাচার করবার ব্যক্তিই নন। কিন্তু দৈবক্রমে পাপও তো পাপ। শত্রুনিধন করতে গিয়ে একবার রাজা নহুষ ভুলক্রমে এক গাভীকে বধ করে ফেললেন। রাজা মৃত গাভীর সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে স্তবস্তুতি করতে থাকেন। ঋষিগণ ধ্যানবলে সবই জানতে পারেন। তাঁরা এগিয়ে এলেন। তপস্যাবলে রাজা নহুষের এক পাপকে শতধা বিভক্ত করে বণ্টন করে নিলেন নিজেদের মধ্যে। ফলে পাপমুক্ত হলেন রাজা। এমনি জনপ্রিয় বা লোকপ্রিয় ছিলেন আমাদের এই নহুষ রাজা।...কিন্তু চিরদিন মানুষের সমান যায় না। কত কিই না ঘটে যায়।

প্রথম দৃশ্য

[কনসার্ট : সুর ইমন কল্যাণ। নহুষের রাজদরবার। স্বর্গদূতের প্রবেশ।]

মহামন্ত্রী : আসুন স্বর্গদূত! আসুন! অহো! আমাদের কি সৌভাগ্য!

কোরাস : আমাদের কি সৌভাগ্য! আমাদের কি সৌভাগ্য! আমাদের কি সৌভাগ্য!

মহামাত্য : দয়া করে আসন গ্রহণ করুন স্বর্গদূত।

স্বর্গদূত : রাজা নহুষের জয় হোক! [বসে পড়ে]

কোরাস : রাজা নহুষের জয় হোক! রাজা নহুষের জয় হোক! রাজা নহুষের জয় হোক!

নহুষ : স্বর্গের সমাচার বলুন, স্বর্গদূত। বন্ধু দেবরাজ ইন্দ্র স্বপত্নী কুশল তো ?

স্বর্গদূত : স্বর্গের সমাচার খুবই উদ্বেগজনক, রাজা।

নহুষ : সেকি ! কি হয়েছে ?

স্বর্গদূত : দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে নেই।

নহুষ : তিনি কোথায় গেলেন ?

স্বর্গদূত : সেটাই তো হচ্ছে এখন ভাবনার বিষয়। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সর্বত্র তাঁকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। স্বর্গবাসীগণ সকলেই গভীর চিন্তামগ্ন।

নহুষ : তাহলে এখন স্বর্গরাজ্য কে চালাচ্ছেন ?

স্বর্গদূত : কেউ না। দেবতারা দারুন মুস্কিলে পড়েছেন। এখনও খবরটি বাইরে জানাজানি হয়নি। অসুরগণ যদি কোনক্রমে জানতে পারে, বলা যায় না, হয়ত তারা যে কোনো মুহূর্তে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে বসতে পারে।

নহুষ : কিন্তু দেবরাজ হঠাৎ স্বর্গরাজ্য ছেড়ে পালালেন কেন ?

স্বর্গদূত : সে এক মর্মান্তিক কাহিনী, রাজা। কিছুদিন আগে দেবরাজ ইন্দ্র রথে চেপে মৃগয়া করতে এসেছিলেন হিমালয় অঞ্চলে। মনের আনন্দে জন্তু-জানোয়ার নিকেশ করছেন। এর মধ্যে দু'চারজন অরণ্যবাসীও যে বেঘোরে প্রাণ দেন নি, এমন কথা বলতে পারব না। হঠাৎ দেবরাজের বাম চোখ নেচে উঠল। বাম অঙ্গ কেঁপে উঠল। একটা কাক শুকনো ডালে বসে কা-কা করে ডেকে ওঠে। দিনের বেলাতে শিবাকুল সমস্বরে ডেকে উঠল। তিনি বিচলিত হলেন এতগুলো অমঙ্গল চিহ্ন একসঙ্গে দেখে। [একটু থেমে গেলেন]

মহামাত্য : তারপর ? তারপর কি হল বলুন।

স্বর্গদূত : দেবরাজ সারথিকে রথ থামাতে বলে নিচে নেমে এলেন। সামনেই চোখে পড়ল মৃত মানুষ। হঠাৎ নজরে পড়ল ওরই মধ্যে এক উপবীতধারী তীরবিদ্ধ হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। তাই দেখে মুহূর্তের মধ্যে দেবরাজ অদৃশ্য হলেন।

কোরাস : ব্রহ্মবধ! ব্রহ্মবধ! অহো! অহো! কি পাপ! কি পাপ! কি পাপ!

নহুষ : কিন্তু দেবরাজ কি পালিয়ে গিয়ে ব্রহ্মবধের পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন?

স্বর্গদূত : সেটাই তো সমস্যা। পরশু থেকে ব্রহ্মলোকে বিষ্ণু ও মহেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে পড়ে আছেন।

মহামন্ত্রী : স্বর্গসভা হচ্ছে নিশ্চয়ই।

স্বর্গদূত : হ্যাঁ মহামন্ত্রী। তবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে। আমরা কোন খবরই রাখিনে।

মহামন্ত্রী : তাহলে এখনও পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই হয়নি?

স্বর্গদূত : না মহামন্ত্রী। তবে কিছুক্ষণ আগে রুদ্ধদ্বার ক্ষণিকের জন্য খুলে শ্রীবিষ্ণু আমার হাতে একখানা লিপি দিয়ে আদেশ করলেন, তুমি এক্ষুনি মর্তে চলে যাও। রাজা নহুষের কাছে এই লিপিখানি দিও! [কোমর থেকে লিপি বের করেন]

কোরাস : সাধু! সাধু! সাধু!

নহুষ : [উত্তেজিত] স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু আমার কাছে স্বর্গলিপি পাঠিয়েছেন। একি সৌভাগ্য আমার! হে স্বর্গদূত। আপনি স্বর্গলিপিখানি পাঠ করুন। রাজসভার সকলেই ধন্য হোক।

কোরাস : ধন্য! ধন্য! ধন্য!

স্বর্গদূত : তথাস্তু। [লিপি পাঠ] ভো মহারাজধিরাজ নহুষ! নরশ্রেষ্ঠ ভবান্। ভাতঃ সর্বপুণ্যকাহিনীং বয়ংস্বর্গবাসিনঃ জানীমঃ।

মহামন্ত্রী : [কৃতাঞ্জলি] মার্জনা করবেন স্বর্গদূত। আপনার বিঘ্ন সৃষ্টি করলাম। এই রাজসভার সকলেই দেবভাষা জানেন না। কাজেই যদি দয়া করে স্বর্গলিপিখানি বঙ্গানুবাদ করে পাঠ করেন তবে বিশেষ উপকৃত হব।

স্বর্গদূত : তথাস্তু! দেবভাষা থেকে অনুবাদ করেই লিপিপাঠ করছি। [পুনরায় পাঠ] হে মহারাজ! তুমি শুণ্ড নামক দৈত্য বধ করে ত্রিভুবনের অপার কল্যাণসাধন করেছ। স্বর্গমর্তের পথঘাট পথিকের কাছে নিরাপদ করেছ। নিশ্চিন্ত করেছ অরণ্যবাসী মুনি ঋষিদের। তারা এখন পরম শান্তিতে আমাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করতে পারছে। তোমায়

বিচক্ষণতা, সুবিবেচনা ও স্থিতধী প্রজ্ঞা রাজ্য পরিচালনারই উপযুক্ত। দেবগণের এই দুঃসময়ে আমরা তোমার কথা স্মরণ করছি। ইন্দ্রের অনুপস্থিত কাল তুমি দেবভূমি স্বর্গরাজ্য পরিচালনা কর, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

কোরাস: সাধু! সাধু! সাধু!

স্বর্গদূত: রাজা নহুষ, এবার তোমার মতামত জ্ঞাপন কর।

নহুষ: অতি উত্তম প্রস্তাব। দেবগণ আমার মত একজন সামান্য মানুষকে স্বর্গরাজ্য পরিচালনার ভার দেবেন, একথা আমি ভাবতে পারছি না। আমার সমস্ত শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। আমি ধন্য।

মহামাত্য: এই রাজসভা ধন্য!

মহামন্ত্রী: এই মর্তভূমি ধন্য! যে দেশে রাজা নহুষের মত সর্বগুণান্বিত রাজচক্রবর্তী সম্রাট রাজত্ব করেন সে দেশও ধন্য!

স্বর্গদূত: বেশ। আপনাদের কথা শুনে আমিও পরম তৃপ্তি লাভ করছি। আমি আপনার সম্মতি পিতামহ ব্রহ্মাকে জানাব। তাঁরই নির্দেশ পেয়ে অবিলম্বে পুষ্পক রথও পাঠাব। তাহলে আমি এখন যাচ্ছি। রাজা নহুষ তোমার মঙ্গল হোক। [উঠে দাঁড়ায়]

কোরাস: সাধু! সাধু! সাধু। [সভার সকলেই স্বর্গদূতকে প্রণাম জানায়।]

স্বর্গদূত: [আশীর্বাদের ভঙ্গীতে] কল্যাণং ভবতু ভবতঃ রাজ্যস্য। [সকলে বেরিয়ে যায়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কনসার্ট: সুর—ঝিঁঝিঁট। স্থান—প্রমোদ-উদ্যান। অশোকসুন্দরী বেদীতে বসে আছে। নেপথ্যে নহুষের ডাক—মহারাণী অশোক! অশোকসুন্দরী! কোথায় তুমি?]

অশোক: মহারাজ! এই যে আমি, চন্দনবেদীর ওপর বসে আছি। [নহুষ প্রবেশ করে]

নহুষ: বাহ্! কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! অশোকসুন্দরীই বটে!

অশোক : [সলজ্জ হাসি] প্রিয়তম ! এতক্ষণে আমাকে মনে পড়ল ? [মাথা নিচু করে]

নহুষ : মহারাণী অশোকের অভিমান হয়েছে ? [চিবুক ধরে] তুমি জান না, সারাদিন আমাকে রাজকার্যে কত ব্যস্ত থাকতে হয় ?

অশোক : অভিমান ? আমার অভিমানে মহারাজাধিরাজের কি কিছু যায় আসে ?

নহুষ : একথা কেন বলছ অশোক ? সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তোমার কাছে আমি একটু বিশ্রাম, একটু শান্তির আশায় থাকি তা কি তুমি জান না ?

অশোক : এসব কথা শুনতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু ইদানীং আমি লক্ষ্য করছি দিন দিন আমার প্রতি তোমার আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। নইলে— [থেমে যায়]

নহুষ : থামলে কেন প্রিয়তমে ? বল—কি বলতে চাইছ ? কি অভিযোগ তোমার ?

অশোক : তুমি আমাকে আগের মত ভালবাস না। বল, ঠিক বলি নি ?

নহুষ : হঠাৎ আজ তোমার মুখে এমন কথা কেন বুঝতে পারছি না। কি এমন করেছি যাতে—

অশোক : যে-কথা রাজপুরীর সবাই জানে, তাই তুমি আমার কাছে গোপন করেছ।

নহুষ : সে কি ! কি এমন কথা ? এতো বড় ধাঁধায় ফেললে মহারাণী ! [একটু ভেবে] ও হ্যাঁ ! মনে পড়েছে। [হেসে] স্বর্গরাজ্যে রাজা হওয়ার খবর তো ?

অশোক : এটা কি কম খবর হল, মহারাজ ? অথচ—অথচ এই খবরটি আজ আমাকে দাস-দাসীদের মুখ থেকে শুনতে হল ! [অভিমানে চোখে জল]

নহুষ : [মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে] অশোক, আমার অশোক-সুন্দরী, ছিঃ ! তুমি অকারণ আমার উপর রাগ করছ ! আজ সকালেই তো ব্যাপারটি স্থির হল। তারপর অন্দরমহলে —তোমার কাছে আসবার সময় পেলুম কোথায় ? খবর ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। দূর-দূরান্ত থেকে মুনি—

ঋষিরা আসছেন, আশীর্বাদ করছেন। দলে দলে প্রজারা আসছে, প্রণাম জানাচ্ছে। প্রচণ্ড ভীড় সামলাতে আমরা সবাই ব্যস্ত।

অশোক : থাক! থাক! হয়েছে! আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমি তো জানি আমার স্বামী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজা। সেজন্য আমার গর্ব কি কম?

নহুষ : আগে বল, অশোক, এ খবরে তুমি সন্তুষ্ট হও নি?

অশোক : সেকি কথা গো? এত খবর একটা সুসংবাদে আমি সন্তুষ্ট হব না?—কিন্তু, রাজামশাই, আমি একা একা কি করে থাকব, সে কথাটি ভেবেছ?

নহুষ : একা? তুমি?—ছয়টি সন্তানের জননী হয়ে তুমি একা? একথা ভাবছ কি করে?

অশোক : [নিঃশ্বাস ফেলে] সবই বুঝলাম; কিন্তু আমাকে অশোক-সুন্দরী বলে কে ডাকবে?

নহুষ : তাহলে তো আমার যাওয়া বন্ধ করতে হয়।—মুস্কিল হল, আমি যে স্বর্গদূতকে কথা দিয়েছি।

অশোক : না—না। কথা দিয়েছ যখন, নিশ্চয়ই যেতে হবে। ও-কথা আমি অমনি রহস্য করে বললাম।—আচ্ছা এ রাজ্য এখন কে চালাবে? যযাতি?

নহুষ : যযাতি এখনও এত বড় হয়নি যে এত বড় রাজ্য চালাতে পারবে। তবে তাকে আমি যুবরাজ করে যাচ্ছি। তাছাড়া মহামন্ত্রী, মহামাত্য—এঁরা সব আছেন। তুমি কিছু ভেব না। সব ঠিকমত চলবে। স্বর্গে আমাকে তো আর বেশীদিন থাকতে হবে না।

অশোক : যেখানে যাচ্ছো সেখানেও তো বিপদ ঘটতে পারে।

নহুষ : বিপদ? স্বর্গরাজ্যে? বলছ কি?

অশোক : কেন? ওখানে মেনকা, রম্ভার মত উর্বশীরা রয়েছেন না? তাঁদের দেখে আমাকে ভুলে যাবে না তো?

নহুষ : স্বর্গের আকাশ-গঙ্গা আমি দেখি নি ঠিকই। কিন্তু হিমালয় দুহিতা মন্দাকিনীকে আমি দেখেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দরী নদী এখনও কল্পনা করতে শিখিনি। ভাবিও না।

অশোক : দেখব ! দেখব !—এসবই তো স্বর্গে যাওয়ার আগের কথা।

নহুষ : [তদ্গত ভাবে] এই পৃথিবীর মাটি-জল-গাছপালা, এখানকার মনোরম দৃশ্য, বাড়িঘর, তপোবন চিরদিন প্রাণভরে ভালবেসেছি। স্বর্গে কি এমন সৌন্দর্য আছে যা দেখে এসবই তুচ্ছ মনে হবে ? জানি না।

অশোক : আচ্ছা শোনো, তোমার সঙ্গে যদি আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে ?

নহুষ : আমাদের এই চন্দনবেদীতে এসে বসবে। মনে মনে আমাকে ডাকবে। আমি যেখানেই থাকি না কেন, ঠিক শুনতে পাব। তোমার সব কথা শুনব।

অশোক : তোমার কথাও আমি শুনতে পাবো তো ?

[জনান্তিকে ডাক : মহারাজের জয় হোক !]

নহুষ : [বিরক্ত] কে ? কে ওখানে ?

[জনান্তিকে : মহারাজ ! আমি মহামাত্য।]

নহুষ : এসো ! [মহামাত্যের প্রবেশ] কি ব্যাপার ? এখানে ? অসময়ে ?

মহামাত্য : [প্রণাম করে] মার্জনা করবেন মহারাজ। জরুরী প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

নহুষ : বল, কি হয়েছে ?

মহামাত্য : স্বর্গ থেকে পুষ্পক-রথ এসে গেছে। সারথি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এদিকে শত শত মুনিঋষি ও প্রজাগণও এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই মিলে পুষ্পক রথকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আপনার বন্দনা গান করছেন।

নহুষ : [স্বগতোক্তি] এত দ্রুত ? [প্রকাশ্যে] ঠিক আছে। তুমি যাও ! আমি যাচ্ছি।

[মহামাত্য নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে যায়]

অশোক : এত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যাবে, রাজা ? আজ রাতটুকু অন্তত: তোমাকে একান্ত আপনার করে পাবো না ? একি বিড়ম্বনা ? কি দুর্ভাগ্য !

নহুষ : দুর্ভাগ্য বলছ, রাণী ?

অশোক : না—না। ছিঃ—ছিঃ ! একি বললাম ! কেন বললাম ? বিশ্বাস

করো, একথা আমি বলতে চাইনি। এ যে আমার পরম সৌভাগ্য! তোমার যশ, তোমার গৌরব—সে যে আমারও। তবু একথা আমি কেন বললাম?

নহুষ : তুমি অত উতলা হয়ো না, রাণী। প্রিয়জন-বিচ্ছেদের মুহূর্তে হয়ত মানুষ—

অশোক : [কান্নার আবেগ সংযত করেন] মনের গভীর থেকে এক অজানা ভয়, আশংকা,—একটা ব্যথা ঠেলে উঠছে কেন। কেন এমন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, রাজা! আমার কান্না পাচ্ছে। [কান্না]

নহুষ : [মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে] নিজেকে সংযত কর, অশোক। কেঁদ না। তুমি তো শুধু আমার প্রিয়তমা নও, আমার সন্তানের জননী। এত অধীর হয়ো না। আমার যাত্রাপথ কণ্টকিত করো না। হাসিমুখে বিদায় দাও! আমি চিরদিন তোমার। তোমারই থাকব।

[অশোক প্রণাম করে। জনান্তিকে জয়ধ্বনি। নহুষ ধীরে ধীরে বিদায় নেয়]

তৃতীয় দৃশ্য

[কনসার্ট : সুর—গৌরী কেদারা। স্বর্গসভা। নহুষ ধীরে ধীরে ঢুকবে]

কোরাস : জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়! জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়! [নহুষ সিংহাসনে বসে] জয় নহুষের জয়! জয় নহুষের জয়!

কার্তিকেয় : রাজা নহুষ! তুমি বয়সে নবীন হলেও বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় প্রবীণ। তোমার রাজ্য পরিচালনায় আমরা যথার্থই প্রীত।

কোরাস : সাধু! সাধু! সাধু!

নহুষ : দেবসেনাপতি কার্তিকেয়! আপনাদের উপদেশ, সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এই গুরুদায়িত্ব বহন করা কখনই আমার পক্ষে সম্ভব হত না। আমি সামান্য মানুষ। দেবরাজ ইন্দ্রের এই সিংহাসনে বসা আমার কাছে এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

বৃহস্পতি : রাজা নহুষ! তোমার বিষয়ে আমরা মুগ্ধ। কিন্তু মনে

রেখো তুমি দিব্যদেহ পেয়েছ। নতুবা কোনো মানুষের সাধ্য কি এই সিংহাসনে উপবেশন করে।

নহুষ : প্রণতি জানাই দেবগুরু বৃহস্পতি! আপনি যথার্থ বলেছেন। আমার দেহের পরিবর্তন হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু আমি তো মৃত নই। আমার বিবেক, বুদ্ধি, অনুভূতি সবই আমারই মানবদেহের।

নারদ : তোমার যোগ্য কথাই বলেছ রাজা নহুষ। মনুষ্যজন্মের প্রতি তোমার এই প্রীতিও প্রশংসনীয়।

নহুষ : আশীর্বাদ করুন, হে দেবর্ষি নারদ, এ প্রীতি যেন আমার কোনদিন এতটুকু অমলিন না হয়।

নারদ : তথাস্তু!

কোরাস : সাধু! সাধু! সাধু!

বৃহস্পতি : তাহলে রাজসভার কাজ শুরু হোক।

কার্তিকেয় : রাজা নহুষ! দেবরাজ ইন্দ্রের সন্ধানে পৃথিবীতে তুমি যে দেবতাদের একটি ক্ষুদ্র দল পাঠিয়েছিলে তাঁরা ফিরে এসেছেন।

নহুষ : তাঁদের বক্তব্য কি কিছু জানিয়েছেন?

বৃহস্পতি : ওদের বক্তব্য পরে শুনছি। আগে বল, ওদের ফিরে আসতে এত দেরী হল কেন?

কার্তিকেয় : স্পষ্ট করে ওরা কিছু জানায় নি। তবে ওদের কথাবার্তা থেকে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে, ওরা পৃথিবীর গাছ, মাটি, জল, ফুল, পাখি—এইসব দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে ওখান থেকে আসতেই নাকি ইচ্ছে হচ্ছিল না।

নারদ : একথা সত্য। আমিও বহুবার পৃথিবী পরিক্রমা করেছি। আমারও এমনি মনে হয়েছে।

বৃহস্পতি : কিন্তু ওদের এই হৃদয় পরিবর্তনের হেতু কি? ওরা কি জানে না পৃথিবীর সব কিছুই নশ্বর?

নহুষ : হে বুধমণ্ডলী! আমার কিছু ভিন্ন চিন্তা আছে। যে সমস্ত দেবতা পৃথিবীতে গিয়েছিলেন তাঁরা পৃথিবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সঠিক অনুসন্ধান করতে পারেন নি। সুতরাং আর বিলম্ব না করে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের নেতৃত্বে এক বাহিনী

পাঠান হোক। আমার বিশ্বাস ওরা নিশ্চয়ই সফলকাম হবেন।

কোরাস : সাধু! সাধু! সাধু!

বৃহস্পতি : প্রস্তাবটি মন্দ নয়। কি হে দেবসেনাপতি পার্বতী-নন্দন? তুমি রাজী?

কার্তিকেয় : তথাস্তু! [সমবেত হর্ষধ্বনি]

কোরাস : সাধু! সাধু! সাধু!

নহুষ : দেবগুরু! এবারে পরবর্তী কর্তব্যে নির্দেশ দিন!

বৃহস্পতি : কর্তব্য-অকর্তব্য সবই যার নির্দেশে নির্ধারিত হয় সেই পরম পূজনীয় পিতামহ ব্রহ্মা এখন ব্যস্ত।—কিহে, তোমাদের কারুর কোন বক্তব্য আছে?

কার্তিকেয় : রাজা নহুষ। তোমার এই সিংহাসনে উপবেশনের সমাচার আজ আর কারুর অজানা নেই। যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব এমনকি রাক্ষস বা দৈত্যরা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ। স্বর্গরাজ্য দখলের কল্পনাও কেউ করছে না।

বৃহস্পতি : তাহলে আজ এই স্বর্গরাজ্যের রাজসভারও কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই।

নহুষ : [স্বগতোক্তি] উফ্ফ্! আর একটি ক্লান্তিকর দিনের অবসান।

নারদ : কি বললে রাজা? ক্লান্তি? [চারিদিকে তাকায়]

কোরাস : রাজা নহুষ ক্লান্ত! রাজা নহুষ ক্লান্ত! রাজা নহুষ ক্লান্ত!

অশ্বিনীকুমার : রাজা নহুষ তোমার এই ক্লান্তি তোমার দেহেরই এক ব্যাধি।

নহুষ : ব্যাধি হবে কেন রাজবৈদ্য? এতো দেহেরই স্বাভাবিক অবস্থা। অদেহীদের অজ্ঞাত এক অনুভূতি।

অশ্বিনীকুমার : রাজা, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। এও মনে রেখ, তোমার এই উত্তেজনা—এও দেহজ ব্যাধি।

নহুষ : কখ্খনো নয়। এ উত্তেজনা কখনও ব্যাধি নয়, হতে পারে না। এ হল দেহের সুখ, দেহের আরাম—নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। আপনারা উত্তেজিত হন না এও আপনাদের দুর্ভাগ্য। ভাবতেও পারেন না, এই উত্তেজনা মানুষকে কি দেয়।

অশ্বিনীকুমার : বায়ু কুপিত হলেই দেহে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। জান সে খবর ?

নহুষ : যে দেশে বায়ু প্রবাহিত হয় না, প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে দেহযন্ত্রে ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে না সে দেশে বায়ু কুপিত হয় কেমন করে ?

অশ্বিনীকুমার : রাজা নহুষ তুমি সতর্ক হও। তোমার সমস্ত লক্ষণ দেখে আমি বুঝতে পারছি, তোমার দেহগত বায়ু যথার্থই কুপিত হয়েছে। এর ফল অত্যন্ত খারাপ।

নহুষ : অসহ্য। [দ্রুত বেরিয়ে যায়। অন্য সকলে বিমূঢ়।]

চতুর্থ দৃশ্য

[কনসার্ট : সুর—গৌরী। নন্দনকানন। নহুষ একা পায়চারী করছে।]

নহুষ : [স্বগতোক্তি] দেবতাদের সৃষ্টি কি অপূর্ব এই নন্দনকানন! চিরবসন্ত বিরাজ করছে এখানে। সৌন্দর্যের শেষটুকু পর্যন্ত যেন ঢেলে দেয়া হয়েছে। এত মনোরম স্থান কি করে সম্ভব? গাছে গাছ ফল-ফুল-পাখির ঝাঁক বিপুল সমারোহ! আমার মনে হচ্ছে—শোক, ব্যথা, দুঃখ, ক্লান্তি সবই যেন কোথায় ফেলে এসেছি। আমার কোন অতীত ছিল না, ভবিষ্যতও কিছু নেই—শুধু আছে এই অনাবিল আনন্দ। আহ্। কি আরাম! কি মধুময়। [পিছনে কখন শচী এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পায়নি। শচীও নিজেকে প্রকাশ না করে নহুষের কথাগুলো শুনছে] কিন্তু এখানেও তো মৃত্যু প্রবেশ করে নি। এ অমৃতলোকে জন্ম আছে, আছে বৃদ্ধি, কিন্তু তারপর ?—মৃত্যু নেই। স্থির—অচঞ্চল হয়ে গেল সব! হে বৃক্ষ তোমার বয়স কত? [জনান্তিকে—কোটি কোটি বৎসর] হে পক্ষি! তুমি—তুমি? [জনান্তিকে—কোটি কোটি বৎসর] হে পত্র-পুষ্প-ফল তোমরা? তোমরা? [জনান্তিকে—কোটি-কোটি-কোটি-কোটি—নহুষ ভয়ে কানে দুহাত চাপ দেয়] না—না! আমি আর শুনতে চাই না। এ কি ভয়ঙ্কর শ্বাসরোধকারী পরিবেশ! উফ্। অসহ্য।

এখানে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি নেই, দাবদাহে জ্বলন্ত বৃক্ষের নিশ্বাস নেই, মন্দাকিনীর দুকূল-ভাসানো বন্যা নেই! এখানে সৃষ্টি স্থির, সৌন্দর্য স্থির, অনুভূতি স্থির। এখানে ভয় নেই, ভাবনা নেই, এখানে তো কেউ কাঁদে না। অসহ্য —একি নিদারুণ! হে নন্দনকানন, আমায় একটু কাঁদতে দাও! হে স্বর্গ! আমায় আঘাত করো! দুঃখ দাও!

শচী : [হাসিমুখে এগিয়ে এসে] একেই বলে মানুষ! সত্যি রাজা, তোমাকে যত দেখছি তত বিস্মিত হচ্ছি। অফুরন্ত সুখ আর আনন্দের মাঝখানে বসে দুঃখ আর কান্নাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ। মনোরম নন্দনকাননে বসে তোমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে?

নহুষ : এসো ইন্দ্রাণী, এসো!

শচী : আচ্ছা রাজা, শুনলাম তুমি ক্লান্ত। অথচ উর্বশীর নাচের আসরে তুমি গেলে না। এর কারণ কি? উর্বশীকে তোমার ভাল লাগে না? তুমি কি অসুস্থ?

নহুষ : এখানে কি কেউ অসুস্থ হয়? মানুষ হয়েও আমিও কি তোমারই মত দিব্য দেহ পাই নি?

শচী : তবু তুমি মানুষ॥ অস্তিত্বে এবং অনুভূতিতে। এই সীমানা তুমি টপকাতে পারনি।

নহুষ : জানি। তাই এখনও মনে প্রশ্নের ভীড় জমে।—আচ্ছা রাণী, আমি এখানে কতকাল এসেছি বলতে পার?

শচী : অত দিন-ক্ষণের হিশেব তো আমি রাখিনে। তবু মনে হয় দিন কয়েক বৈ তো নয়।

নহুষ : এ কিন্তু এক-একটি দিন এত দীর্ঘ মনে হয় কেন?

শচী : হয়ত তোমার প্রিয়জন, পরিজন, পরিচিত পরিবেশ বহু পিছনে ফেলে এসেছ বলে।

নহুষ : [যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠে] উফ্‌ফ্‌। আমার প্রিয়জন! ও-হো হো-হো! আমার পরিজন! এই কয়দিনের মধ্যে আমি যে একবারও তাদের কথা ভাবি নি। রাণী! শচীরাণী! কেন? কেন অমন হল? তারা কোথায়? কোথায় তারা? ও-হো-হো-হো।

শচী : শান্ত হও রাজা! তুমি কি আত্মবিস্মৃত হয়ে যাচ্ছ?

নহুষ : হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি আত্মবিস্মৃত! নইলে আমি কেমন করে ওদের কথা ভুলে ছিলাম? শচীরাণী, তুমি আমার মনের সব অস্থিরতা, সব প্রশ্ন কেড়ে নিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ প্রেম এ অনাবিল শান্তির মাঝে ডুবিয়ে রাখো! আমি যে সব কিছু ভুলে থাকতে চাই। [জনান্তিকে ধ্বনি : দেবরাজ ইন্দ্রের জয় হোক!]

শচী : কে? কে ওখানে?

দৌবারিক : আমি দৌবারিক, রাণীমা।

শচী : ও! এসো! [দৌবারিক ঢুকবে] কি সমাচার দৌবারিক?

দৌবারিক : দেবরাজ ইন্দ্রের জয় হোক! দারুণ সুখবর রাণীমা! দেবরাজ ইন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

শচী : [ব্যস্তভাবে] কোথায় তিনি?

দৌবারিক : পিতামহ ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানতে পেরেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্তলোকেরই নৈমিষারণ্যে এত যজ্ঞডুমুর গাছের ফলের মধ্যে লুকিয়ে আছেন। লক্ষ লক্ষ ফলের মধ্যে কোনটিতে তিনি লুকিয়ে আছেন কেউ জানেন না।

শচী : তাহলে এখন কি হবে?

দৌবারিক : সবাই মহামায়ার শরণাপন্ন হয়েছেন। ভরসা, একমাত্র তিনিই পারবেন মায়াবলে তাঁকে খুঁজে বের করতে। তাই কিছুক্ষণ আগে রণশ্রেষ্ঠ কার্তিকেয় মহামায়াকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্তলোকের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন।

নহুষ : এত কঠিন পরিশ্রম আমি কাউকেই করতে দেব না। আমিই যাবো বন্ধু দেবরাজের খোঁজে।

শচী : তুমি যাবে? বলছ কি? তাহলে এ স্বর্গরাজ্য পরিচালনা করবে কি?—ঠিক আছে দৌবারিক, তুমি এখন যাও। পরে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

দৌবারিক : যে আজ্ঞে রাণীমা। দেবরাজ ইন্দ্রের জয় হোক। [বেরিয়ে যায়]

নহুষ : [আবেগে শচীরাণীর হাত দুটো ধরে] শচীরাণী, আমার রাণী, দয়া করে আমার একটি মিনতি রাখো। আমরা

দুজনেই পুষ্পক রথে করে হিমালয়ে চলে যাবো। সেখানে তপোবনে তুমি বিশ্রাম নেবে। আমি অগ্নি-সাধনা করে সখা ইন্দ্রের মুক্তি জয় করে আনব।

শচী : এও কি সম্ভব?

নহুষ : কেন সম্ভব নয়? আমরা মানব-মানবী হব। নির্জন পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার ধারে সুন্দর পাতার কুটিরে থাকব। তুমি জান না সে যে কত শান্তি, কত আনন্দ! কি অসামান্য তৃপ্তি! একবারটি চল। স্বর্গের এই পরিবর্তনহীন থেমে থাকা অচল জীবনের বাইরে একবারটি পা ফেলে দেখ, প্রবহমান এক নতুন জীবনের স্বাদ তুমি পাবে। যদি তোমার ভাল লাগে, তুমি চলে আসবে। আমি এতটুকু নিষেধ করব না।

শচী : কিন্তু কোথায় ফিরে আসব? কার কাছে? সেকথা ভেবেছ কখনও?

নহুষ : তাহলে তুমি সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে চিরদিনের জন্য মানুষেরই মাঝে থেকে যাবে?

শচী : [চটুল দৃষ্টিভঙ্গী] আচ্ছা রাজা, তুমি আমাকে এই মর্ত-ভূমিতে নিয়ে যেতে চাইছ? [ডান হাত প্রসারিত করে বেদীর বিপরীত দিকে দেখায়। সেখানে মলিন বসনা অশোকসুন্দরী দাঁড়িয়ে। এরা অশোকসুন্দরীর কথা শুনতে পাবে। কিন্তু অশোকসুন্দরী এদের কথা শুনতে পাবে না। দেখতেও পাবে না। নহুষ চমকে ওঠে]

অশোক : রাজা! তুমি কথা দিয়েছিলে এই চন্দন গাছের নিচে বসে তোমায় ডাকলে তুমি আমার ডাক শুনতে পাবে। রাজা! রাজা! রাজা! আমি তোমার অশোক! তোমায় ডাকছি। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না! রাজা! সাড়া দাও! আমি অশোক। রাজা! [কান্নায় কথা বন্ধ হয়ে আসে]

নহুষ : [অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে] বল অশোক, আমার অশোকসুন্দরী! আমি তোমার সব কথা শুনতে পাচ্ছি।

অশোক : [কান্না জড়ানো গলায়] আমি জানি রাজা তুমি আমাকে ভুলে গেছ। স্বর্গের সুখ, স্বর্গের আনন্দে তুমি মাতোয়ারা

হয়ে আছো। আমাকে তুমি ভুলে গেছ রাজা। [কান্না]

নহুষ : [বেদনার্ত] না, অশোক, না।

অশোক : আমি বেশ বুঝতে পারছি স্বর্গের মোহিনী মায়ায় তুমি আবদ্ধ হয়ে আছো। তোমাকে কেউ আমার কাছ থেকে দূরে—বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নহুষ : এ তোমার মিথ্যা আশঙ্কা। বিশ্বাস কর, অশোক, একথা সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না।

শচী : [তির্যক হাসি] সত্যি নয় নহুষ রাজা ? একথা সত্যি নয় ?

নহুষ : [যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে] উফ্, ভগবান ! একি নিদারুণ প্রশ্ন ! একি যন্ত্রণা ?

অশোক : এত বছর হয়ে গেল, রাজা, তবু তুমি একবারটি এলে না ?

নহুষ : বছর ! 'এত বছর' ? অশোক, এ তুমি কি বলছ ? [আবেগে শচীর হাত ধরে] রাণী, শচীরাণী, বল না, অশোক 'এত বছর' বলছে কেন ? [শচী নিরুত্তর]

অশোক : আমাদের ছেলে যযাতি, কত বড়টি হয়েছে। ঠিক তোমারই মত সুন্দর হয়ে উঠেছে। তেমনি বলশালী। ওকে দেখতেও কি তোমার ইচ্ছে করে না ?

নহুষ : [মিনতি] একি রহস্য ? বল না শচীরাণী। আমার ছেলে যযাতি এরই মধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে ? কি করে সম্ভব ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

শচী : তুমি কি জান না, রাজা, স্বর্গে সবই ব্রহ্মার অনুশাসনে চলে ? ব্রহ্মার এক দিন তোমাদের মর্তের কয়েক বছর।

অশোক : কত বছর হয়ে গেল, রাজা, তুমি আমার নাম ধরে ডাকোনি। সোহাগ করবে বলে কাছে আসতে বল নি। তুমি কি বুঝতে পার না এই বিশাল রাজপুরী, লক্ষ লক্ষ প্রজাদের মধ্যেও আমি কত একা ?

নহুষ : [মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়ে] না—না ! এ অসম্ভব ! ইন্দ্রানী ! এসবই তোমার রচিত মায়া। আমাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ ?

অশোক : [কাঁদতে কাঁদতে] আমি যে আর তোমার বিরহ সহ্য করতে পারছি না, রাজা। আকাশপথে চেয়ে চেয়ে দিন

কেটে যায়, রাত আসে। আবার তেমনি করে রাত শেষ হয়ে যায় সূর্যের রথ দেখতে পাই। কিন্তু তোমার রথ তো আজও এল না।

নহুষ : তোমার এ ছলনা দূর কর, শচী! এসবই তোমার সৃষ্টি। আমাকে তুমি পরীক্ষা করছ। তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ কর।

শচী : [হেসে] বেশ, আমি না হয় স্বীকার করে নিলুম এসবই আমার খেলা। কিন্তু দেবরাজ যখন তাঁর দাবী নিয়ে তোমার সামনে এসে হাজির হবেন, তখন ? তাঁকে তুমি কি বলবে ?

নহুষ : তাই যদি হয়, তাহলে ঐ ব্রহ্মঘাতক দেবরাজকে আমি যুদ্ধে পরাস্ত করব !

শচী : এত শক্তি তুমি ধারণ কর, নহুষ ?

নহুষ : আমি মানুষ। আমার বিশ্বাসের শক্তি অমোঘ। অপরাজেয়। পৃথিবীর অপৃথিবীর যে কোন শক্তিকে এই বিশ্বাসের বলে আমি চূর্ণ করতে পারি। কিন্তু তুমি তো জান, আমার বিশ্বাস, আমার শক্তি—সবই তুমি। প্রেরণাও তুমি।

শচী : তুমি আমাকে এত ভালবাস, রাজা !

নহুষ : আমার সম্পূর্ণ মন তুমি কেড়ে নিয়েছ, শচী। আমি যে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণ হতে চাই।

শচী : তোমার প্রেমের পরীক্ষা দিতে পারবে, নহুষ ?

নহুষ : পরীক্ষা ?—এখনও দ্বিধা ? সন্দেহ ? বেশ, আমি রাজী। বল তুমি কি পরীক্ষা নিতে চাও ?

শচী : [হাসি মুখে] শোনো রাজা, তোমাকে একটি ছোট্ট কাজ করতে হবে। কাল শুভ লগ্নে মন্দাকিনীতে চান করে মুনি-ঋষিদের দোলায় চেপে আমার কাছে আসবে। আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব। পিতামহকে প্রণাম করে স্বর্গ থেকে বিদায় নেব। যেখানে যেতে বলবে, যাবো।

যযাতি : আমাদের জন্য তুমি এতটুকু উতলা হয়ো না মা। চলো, আমরা মন্দিরে যাই। বাবাকে তো প্রায়ই আমি ধ্যানে দেখতে পাই ? তিনি আমাকে কত উপদেশ দেন। ওঠ মা। চলো। [দুজনে বেরিয়ে যায়]

শচী : রাজা, কথা বলছ না কেন ?

নহুষ : [মুহূর্তে জড়তা কাটিয়ে] তাই হবে রাণী। তোমার শর্তে আমি রাজী। [শচীর হাত ধরে]

শচী : তাহলে আমি এখন চলি, নহুষ। মনে রেখো, কাল ব্রাহ্ম মুহূর্তে— [বেরিয়ে যায়]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কনসার্ট : সুর—বেহাগ। সূত্রধার প্রবেশ করবে। একটা গোটানো কাগজ খুলে পড়তে থাকবে।]

সূত্রধার : জয় প্রভু নারায়ণ। আদি যত দেবগণ। জয় জয় প্রভু নারায়ণ। [নমস্কার করে] নৈমিষারণ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে আবিষ্কার করেছেন কার্তিকেয়। হে প্রভু ইন্দ্র, আর কি আত্মগোপন হবে হে বিধেয় ? স্তব-স্তুতি মন্ত্রপাঠ অপ্সরাদের নানাবিধ ক্রন্দন। দেবরাজ ইন্দ্র ফিরে পান সম্বিত, ফিরে যান নন্দনকাননে। দীর্ঘ অদর্শনে কাতর হয়েছেন সফলে বিশুর। দৌবারিক করেছে গমন মর্ত্যভূমে হিমালয় কন্দর। একের কৃত পাপে অন্যের তপস্যা সাধন। বিধান দিলেন ব্রহ্মা, শিব আর নারায়ণ। ঊষাকালে নহুষ রাজা করেছেন গমন মন্দাকিনী স্থানে। শচীরাণী, কি মহিমা কে জানে, প্রস্তুত তাহারই বরণে। নহুষের তরে প্রস্তুত দোলাবাহক দুইজন। তাঁদের মধ্যে আছেন মহামুনি অগস্ত্য একজন। [নমস্কার] বিধির কি বিধিলিপি কিবা জানি বলিব কাহারে ? কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে জানিব কি প্রকারে ? জয় প্রভু নারায়ণ ? আদি যত দেবগণ। জয় জয় প্রভু নারায়ণ ! প্রণাম করে সূত্রধার চলে যায়। মৃদু কনসার্ট। দোলা কাঁধে দুই মুনির প্রবেশ। [দোলা নামিয়ে রেখে আলোচনা শুরু করে।]

বশিষ্ঠ : তুমি বৃথা ভাবনা করছ অগস্ত্য। নহুষ নরকুল শ্রেষ্ঠ রাজা।

অগস্ত্য : বিলক্ষণ, মহামুনি বশিষ্ঠ। কিন্তু আমার যে তপস্যা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।

বশিষ্ঠ : তপস্যা তো জীবনভরই করেছ। লোকহিতায় না হয় এক-আধটু কাজ করলে। নহুষের কাতর প্রার্থনায় আমরা কি মুগ্ধ হই নি ?

অগস্ত্য : হাঁ। তা হয়েছি।

বশিষ্ঠ : আমরা কি তাকে বর দিই নি ? তার দোলাবাহক হতে রাজী হই নি ?

অগস্ত্য : বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! ব্রাহ্ম মুহূর্ত তো শুরু হয়ে গেছে। তার এত বিলম্ব হচ্ছে কেন ? আর কিছু বিলম্ব হলেই আমার ক্রোধের সঞ্চার হবে। আর ক্রোধ মানেই অভিশাপ।

বশিষ্ঠ : না। না। ক্রোধই চণ্ডাল। ব্রাহ্মণের ক্রোধ তার গৌরব বাড়ায় না।

অগস্ত্য : কিন্তু, মহামুনি, দেহে ঘাম নির্গত হলে যেমন শুষে নেয়া যায় না; তেমনি ক্রোধের সঞ্চার হলে তাকে শুষে নেব কেমন করে ? তখন অভিশাপ অনিবার্য। নইলে নিজের শরীরই বিনষ্ট হবে।

বশিষ্ঠ : তার আর দরকার হবে না। ঐ যে নহুষ রাজা স্নান শেষ করে ব্যস্তভাবে এদিকেই আসছে।

[ব্যস্তভাবে নহুষের প্রবেশ। দুজনকে প্রণাম করে]

নহুষ : বেলা বেড়ে যাচ্ছে। চলুন মহামুনিদ্বয়। সর্পোসর্প!

[দোলায় উঠতে গিয়ে অগস্ত্যের গায়ে দৈবাৎ পা লেগে যায়]

অগস্ত্য : [হিংস্র গর্জন] হুউউম্! কি! এত বড় স্পর্ধা ? আমি ব্রাহ্মণ আর আমার গায়ে পদাঘাত! সর্পোভব ? যাও! তুমি অজগর সাপ হয়ে মর্তে ফিরে যাও! গভীর অরণ্য দ্বৈতবনে গিয়ে পড়ে থাকো!

নহুষ : ক্ষমা করুন, মহামুনি অগস্ত্য! ক্ষমা করুন!

অগস্ত্য : [অট্টহাসি] হাঃ! হাঃ! হাঃ ক্ষমা ? অপরাধ করে, শাস্তি না পেয়ে পাবে ক্ষমা ?

নহুষ : [কাঁপতে কাঁপতে] বিশ্বাস করুন, মহামুনি, দোলায় উঠবার সময় কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমার এই পা অন্য কোন শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে আপনার দেহ স্পর্শ করেছে। বিশ্বাস করুন, মহামুনি, এ আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়।

অগস্ত্য : কামোন্মত্ত হলে পুরুষের এই দশাই হয়।

নহুষ : কি বললেন মহামুনি, আমি কামোন্মত্ত? ক্রোধসর্বস্ব ঋষি! এই আপনার তপস্যার রূপ? এই আপনার ঋদ্ধি? আপনি না ত্রিকালজ্ঞ? হায়!—আমি ভুলে গিয়েছিলাম আসলে আজ আর আপনি মানুষ নন। দেবতা। তাই মানুষের মনের খবর কিছুই জানেন না।

অগস্ত্য : দেবত্ব লাভ করাই আমার আজীবন সাধনা। দেবতা হতে পেরে আমি ধন্য!

নহুষ : আমি গর্বিত, আমি কোনোদিনই দেবতা হব না।

বশিষ্ঠ : উত্তেজনা প্রশমন কর, রাজা নহুষ! তুমি অভিশাপগ্রস্ত হয়েছ, এ তোমাকে মেনে নিতেই হবে!

নহুষ : কেন মহামুনি বশিষ্ঠ, কেন? এক মুহূর্তের জন্যেও আমি কামোন্মত্ত হইনি তবু এ মিথ্যা অপবাদ কেন সহ্য করব? শুনুন, স্বর্গে এসে আমি জেনেছি স্বর্গের সুখ, শান্তি ও সৌন্দর্যের উৎস এই শচীরাণী। উনি লক্ষ্মী, তাই মানুষের দুঃখ দৈন্যকে চিরতরে দূর করবার জন্য, পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দকে চিরস্থায়ী করবার জন্য আমি শচীরাণীকে পৃথিবীতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। এ কি আমার অপরাধ? অন্যায়?

বশিষ্ঠ : কিন্তু অগস্ত্যকে পদাঘাত? সে তো অস্বীকার করতে পারো না?

নহুষ : বিশ্বাস করুন আপনারা। এ আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। আমি জানি না এ কেমন করে হল। কোন্ দৈবীশক্তি আমাকে জোর করে ঠেলে দিল এ পাপ-পথে, আমি বুঝতে পারছি না।

বশিষ্ঠ : কিন্তু, রাজা, তুমি দেবতাদের অজ্ঞাতে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্পদটি কেড়ে নেবে সে কাজটিই বা আমরা সমর্থন করব কিভাবে?

নহুষ : দেবতারা কি ছলনা করে মাটির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা—অমৃত কেড়ে আনেন নি? আর তারই জোরে এত বলীয়ান হয়ে সবার ওপরে কর্তৃত্ব করছেন। যুগযুগান্ত ধরে মানুষ সেই অমৃতকে পেতে সাধনা করে চলেছে।—দোহাই

মহামুনি অগস্ত্য, সমস্ত মানুষের হয়ে আমি প্রার্থনা জানাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে দিন! শচীরাণীকে মর্তে নিয়ে যেতে দিন।

[পায়ে লুটিয়ে পড়ে]

অগস্ত্য : না, রাজা নহুষ, এখন আর তা সম্ভব নয়। তবে তোমার সঙ্কল্প বুঝেছি! আর জানতে পেরেছি অন্তরাল থেকে কে তোমার এই সর্বনাশ করল। তোমাকে তাই একটি বর দিচ্ছি। তোমার বংশেরই উত্তরপুরুষ ভারতশ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও জ্ঞানী যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে তুমি শাপমুক্ত হবে। তখন তুমি আবার স্বর্গে ফিরে আসবে।

বশিষ্ঠ : তোমার সরলতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তাই তোমাকে আমিও একটি বর দিচ্ছি। তোমার চৈতন্য কোনদিনই লোপ পাবে না। [দুজনে বেরিয়ে যেতে থাকে]

নহুষ : [চীৎকার করে] না, মহামুনি না। আমাকে শাপগ্রস্ত করে রেখে যাবেন না। এখন আমার অনেক কাজ বাকী। আমার দেশের প্রজাগণ, আমার স্ত্রী-পুত্র সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। [ওরা এগিয়ে যেতেই থাকে] দয়া করুন, মহামুনি, দয়া করুন! আমাকে এই জঘন্য তির্যক-যোণিতে পাঠাবেন না। দয়া করুন! [ওরা মিলিয়ে যেতেই দুজনে সাপের খোলস নিয়ে দুপাশ থেকে এসে নহুসের সামনে দাঁড়ায়। নহুষ অসহায়ভাবে রাগে দুঃখে কাঁপতে থাকে। হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে ছিটকে দূরে সরে যায়।] না—না—না! আমি কিছুতেই সাপ হব না! বীভৎস, নোংরা সাপ আমি কিছুতেই হব না। [ওরা অবাক হয়ে যায়] ঐ কুৎসিত সাপের খোলসটা আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!

প্রথম : [চাপা গলায়] কই গৌরা, কি হচ্ছে এটা? এটা পরে ফ্যাল!

দ্বিতীয় : আরে মুখটা তো খোলাই থাকবে।

[জনান্তিকে বহু মানুষের হাসি ও বিদ্রূপ। ওরা ভয়ে ভয়ে কাছে যায়।]

নহুষ : [প্রথমকে ধাক্কা দেয়] ধ্যাৎ ! আমি মানুষ ! আমি সাপ হব কেন ? ছিঃ ! সারাজীবন কত সাপ মেরেছি, আর এখন সাপ হয়ে পড়ে থাকব ! পাগল নাকি ? যাও ! যাও ! এখান থেকে যাও ! আমি শচীরাণীর সঙ্গে দেখা করব ! [জনান্তিকে হাসি ও বিদ্রূপ] না—না ! ওকে আমি একটিমাত্র প্রশ্ন করব । কেন ? কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা করল, আমাকে জানতেই হবে । [চীৎকার] শচী ! শচী ! শচী !

[খাতা হাতে গ্রন্থিক ও ছোট একটি ছড়ি হাতে অধিকারী ছুটে আসে]

গ্রন্থিক : [চাপা গলায়] এই গৌরাঙ্গ ! একি পাগলামি শুরু করেছিস ?

নহুষ : [চেঁচিয়ে] কে গৌরাঙ্গ ?—আমি রাজা নহুষ ! [জনান্তিকে হাসির রোল]

অধিকারী : [ছড়ি উচিয়ে] বেশ ! বেশ বেশ বাবা বুঝলাম, তুই গৌরাঙ্গ জেলে নোস । তুই রাজা নহুষ । নহুষ বলেই তো এখন তোকে অজগর সাপ হতে হবে । নে এটা পরে নে । অনেক রাত হয়ে গেছে । আর জ্বালাস নে বাপ । তোর এখনও অনেক পাট আছে ।

নহুষ : না ! আমি সাপ হবো না !

গ্রন্থিক : কেন হবি না ? এই দ্যাখ খাতায় লেখা আছে । [খাতা দেখায়] মনে নেই তোর ?

নহুষ : [খাতা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়] ধ্যাত্তেরিকা ! খাতার নিকুচি করছি । [জনান্তিকে হট্টগোল]

অধিকারী : [পিঠে হাত বুলিয়ে] বেশ ! বেশ করেছি ! ও ঝামেলা ছুঁড়ে ফেলেই দে । স্বাধীন হয়ে যা !—তা, বাপ নহুষ, তবু তোকে সাপ হতে হবে ।

নহুষ : [আক্রোশে] তবু ? তবু কেন ?

অধিকারী : যেহেতু মহাভারতে তাই লেখা আছে । আমরা কি করব, বল ? আমরা তো আর [প্রণাম] মহামুনি বেদব্যাসের ওপর কলম চালাতে পারব না ।

নহুষ : বেদব্যাস ভুল করেছেন, নহুষের উপর অবিচার করেছেন,—আপনারাও তাই করবেন?

অধিকারী : অবিচারটা দেখলি কোথায়?

নহুষ : আগাগোড়া অবিচার। ব্যাসদেব মানুষদের নিয়ে উপাখ্যান রচনা করলেন আর শ্রেষ্ঠ বানালেন দেবতাদের। এই দেবতারা খেয়ালখুশিমত নিজেদের জন্য এক রকম আর মানুষদের জন্য আর একরকম আইন-কানুন করলেন,—ন্যায়-নীতি বোঝালেন আর আমরা মানুষেরা বোকার মত তাই মেনে নিচ্ছি। কেন?

গ্রন্থিক : [ধমক দিয়ে] এই গৌরা! ব্যাটা, তুই কি আবোল-তাবোল বকছিস বল তো? [জনান্তিকে : ওকে বলতে দিস! ওকে বলতে দিস!] ওরে বাবা! পাগলামি কি সবার মাথায় চেপে বসল নাকি?

গ্রন্থিক : [অধিকারীকে এক পাশে ডেকে নিয়ে] গৌরা ব্যাটা শচীকে পাওয়ার জন্যে ক্ষেপে গেছে। শচী এসে যদি একটু ধমক-ধামক দেখায় তাহলে বোধ হয় শান্ত হয়ে যাবে। কি জিগ্যেস করতে চায় করুক! [ফিরে এসে চাপা গলায়] গৌরা! শোন! তোর সত্যিকারের বউ মালতী—অশোকসুন্দরী—গ্রীণরুমে ক্ষেপে গরম হয়ে আছে।

অধিকারী : থাক! থাক! এসব আমাদের ভিতরের কথা খোলা মঞ্চে এসে বলতে নেই। ঠিক আছে, নহুষ, তোমার কথাই মানছি। শচী মানে আমাদের সরস্বতী খাটুয়াকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা জিগ্যেস করতে চাস, তাড়াতাড়ি করে আবার পাট শুরু করে দে, বাপ! [ফিরে যেতে থাকে]

গ্রন্থিক : যত্তোসব উটকো ঝামেলা! ওর মাথায় নহুষ ভর করেছে। তিথিটাও আজ ভাল নয়। হরি! হরি! [বেরিয়ে যেতে থাকে]

অধিকারী : [যেতে যেতে] এদিকে আমার ঝামেলাও কি কম? অধিকারী হওয়া যে এক মস্ত ঝক্কি। সরস্বতীর পাট নেই বলে শচীর সাজ খুলে ফেলেছে। টাকার জন্যে আমার পিছে ঘুর-ঘুর করছে।

[দুজনে বেরিয়ে যায়। নহুষের অস্থির পায়চারি। দুপাশে দুজনে সাপের খোলস হাতে নিয়ে ওকে লক্ষ্য করছে। লাস্যময়ী ভঙ্গীতে সরস্বতীর প্রবেশ]

নহুষ : একি ! কে তুমি ?

সরস্বতী : ওমা ! সেকি কথা গো ? আমি সরস্বতী খাটুয়া। শচী সেজেছিলাম। আমাকে তুমি চিনতে পারছ না, নহুষ রাজা ?

নহুষ : তুমি এখানে কেন ? আমি তোমাকে চাইনে। শচীরাণীকে চাই।

সরস্বতী : না আমি এখন আর শচীরাণী হতে পারব না। আমার আর পাট নেই।

নহুষ : তবে আমরা এখানে কেন ?

সরস্বতী : কে জানে, কেন ? অধিকারীদা বলল, তোমার নাকি খেয়াল চেপেছে শচীরানীকে কি কথা জিজ্ঞেস করবে তাই আমাকেই পাঠাল। যা বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বল। রাত ভোর হয়ে আসছে। আমার নৌকা তৈরী হয়ে আছে। জংগলে-কাঠ আনতে যেতে হবে।

নহুষ : উফ্ ! অসহ্য ! তাহলে শচীকে আর ফিরে পাব না ? তার কাছ থেকে আমি জানতে চাইতাম, কেন সে আমার এই সর্বনাশ করল ? আমার কি দোষ ছিল ?

সরস্বতী : বাজে কথা বলো না, নহুষ রাজা ! তুমি আমার দিকে কু-নজর দিয়েছিলে। আমার স্বামীর ঘর ভাঙতে চেয়েছিলে।

নহুষ : ভুল শচী। সম্পূর্ণ ভুল ! আমি কি তোমার সঙ্গে এতটুকু অশোভন আচরণ করেছি ? বরং তুমিই তো দিনের পর দিন আমার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলেছ। সে-সব কি তাহলে সবই মিথ্যে ?

সরস্বতী : অত-শত বলতে পারব না। আমাকে যা বলিয়েছে তাই বলেছি। যা করিয়েছে তাই করেছি।

নহুষ : আচ্ছা, তুমি বল, শচী কি কাজটা ঠিক করেছিল ? সেকি জানত না আমার মনের কথাগুলো কি ? সে না দেবতা ?

[বেগে মালতীর প্রবেশ]

মালতী : সরস্বতী না জানতে পারে, তবে আমি সব জানি। আসলে

শচীর কোমরের দুলুনি দেখে তুমি সব ভুলে গিয়েছিলে। স্বর্গ-মর্ত্য সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর যার ছয়-ছয়টি ছেলে, অশোকসুন্দরীর মত অমন সুন্দর সোনার প্রিতিমে বউ সে কিনা ঐ ডাইনিটাকে দেখে সব ভুলে গেল! ছিঃ! লজ্জা করে না তোমার? যাও এখন হিলহিলে সাপ হয়ে আমাদের এই সুন্দরবনের জঙ্গলেই পড়ে থাকো গে!

নহুষ : তুমি ভুল করছ মালতী, আমি তো মানুষের কল্যাণই চেয়েছিলাম। শচীই তো আসল লক্ষ্মী। আর ঐ লক্ষ্মীকে যদি একবার মর্তে আনতে—

মালতী : হ্যাঁ বুঝেছি। আর বলতে হবে না। মানুষের বউ লক্ষ্মী হয় না? হয় দেবতার বউ। দেবতাদের প্রতি এই তোমার ঘেন্নার নমুনা? এসবই তোমার অছিলা।

নহুষ : তুমি ভুল করছ মালতী।

মালতী : থাক! আমার আর ভুল ধরতে এসো না। বিহানে মাছ ধরতে যেতে হবে সে খেয়াল আছে? এখন পর্যন্ত ক কাপ চা ছাড়া আর তো কিছু পড়ে নি। সোনামনিটার সন্ধ্যা থেকে জ্বর এসেছে। দুজনে মিলে রং চং মেখে এখানে নাটক করে বেড়াচ্ছি। বাড়িতে গিয়ে ওর কি অবস্থা দেখব, কে জানে?

নহুষ : যযাতির মত অমন সুন্দর একটি ছেলের মা হতে তোমার ইচ্ছে করে না?

মালতী : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে।

নহুষ : পৃথিবী সুন্দর হোক এটা তোমার ইচ্ছে করে না?

মালতী : পৃথিবী কি জিনিস, জানি না। তবে আমাদের সুন্দরবনের গাঁ ভুবনেশ্বরী সুন্দর হোক, সবাই খেয়ে পরে থাকুক, সুখে-শান্তিতে থাকুক এটা চাই! একশবার চাই। [জনান্তিকে বিরাট উল্লাস ধ্বনি।]

নহুষ : বাহ্ মালতী। ঠিক বলেছ। অশোকসুন্দরীর মতই সুন্দর কথা বলেছ। তাহলে তুমি আমাকে সাপ হতে বলো না।

মালতী : তুমি সাপ হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কও যে শেষ হয়ে যায়। সেটা কি বোঝ না?

নহুষ : তোমার কষ্ট বুঝতে পেরেছি বলেই তো আমি—

মালতী : ওসব ভেবে কি লাভ? আমাদের কি ভাল লাগল না-লাগল তাতে কি আসে যায়? গল্প যেদিকে যাবে, আমাদেরও সেদিকে যেতে হবে। আমরাতো এখানে পার্ট করতে এসেছি। ঐ ওরা সারারাত ধরে আমাদের কথা ধৈর্য ধরে শুনছে, ওদের কথা একটু ভাবো। [জনান্তিকে উল্লাস ধ্বনি]

[নহুষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এমনি সময় দুপাশ থেকে দুজনে ঝাপটে ধরে সাপের খোলস পরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে মালতী। শচীর চোখেও জল। নহুষের মাথার উপর চাপিয়ে দেয় মস্ত সাপের মুখ।]

প্রথম : তোমাকে কে ছাড়ছে নহুষ রাজা? সাপ তোমাকে হতেই হবে। দশটাকা আগাম নিয়েছ না? [লজ্জিত নহুষ মাথা নিচু করে থাকে]

দ্বিতীয় : খুব ভুগিয়েছে যা হোক! এবারে তোমরা ছুটিতে যাও।

[সবাই বেরিয়ে যায়। নহুষ এক পাশে সরে দাঁড়ায়। বাঁশিতে করুণ সুর।]

উত্তর বাংলার লোকসমাজ ঃ 'দেশী-পলি-ক্ষত্রী'

শিশির মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

দেশী, পলি, রাজবংশী ও কোচ একই জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হলেও জলপাইগুড়ি কোচবিহারে এখন কোচদের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কোন রাজবংশীই কোচদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক স্বীকার করেন না। রাজবংশীগণ কোচদের থেকে নিজেদের অনেক উন্নত ও উচ্চশ্রেণীর বলে দাবি করেন। বিশেষভাবে অনগ্রসর কোচরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতে পারেন নি। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় দেবার মতো অনেক যুক্তি আছে। মঙ্গসাহিত্য যোগিনী তন্ত্র, হরিবংশ পুরাণ-এ রাজবংশী জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল প্রণীত রাজবংশীয় অব নর্থবেঙ্গল, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ প্রণীত 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস', পতিরাম সিংহ 'প্রণীত কামতারাজ্যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়', বিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী প্রণীত শ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি, মনোমোহন রায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর লিখিত প্রবন্ধ (J. A. S. B. VoL LXXI Part III No. 2, 1902) এবং আরো বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[১]

তবে একথা সত্য যে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ফলে বহু কোচ রাজবংশী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। জনগণনার প্রতিবেদনে কোচবিহারেই কোন কোচের সন্ধান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।[২]

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বেশ কিছু কোচের সন্ধান পাওয়া গেলেও আসলে আমার ধারণা তারাই দেশী। তদানীন্তন ইংরেজ শাসকগণ দেশীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না সংগ্রহ করে তাদের কোচ বলে উল্লেখ করে গেছেন। এই দেশীরা রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করতে চাননি। কেননা তাঁরা এই জেলায় কোচ, রাজবংশী ও পলি এই তিনশ্রেণী থেকে নিজেদের সবচেয়ে উন্নত ও উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করেন। অন্যপক্ষে, পলিদের মধ্যেও রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ায় বহু পলি যাঁরা ঠিক নিজেদের রাজবংশী (আজবংশী) বলে পরিচিত করতে চান না,

তারা নিজেদের শুধু 'ক্ষত্রি' বলে উল্লেখ করেন। কেননা, এই জেলায় সাধারণ পলিদের কাছেও, রাজবংশী জাতীভুক্ত হওয়া খুব গৌরবজনক নয়। কেননা, তাঁরাও মনে করেন রাজবংশীগণ তাঁদের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর। কিন্তু রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রচারে ধীরে ধীরে এ ধারণাটা অপসৃত হয়ে বহু পলি নিজেদের রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত করছেন। জনগণনার প্রতিবেদনের তালিকাটির দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে।[৩] দেশীদের দুর্ভাগ্য যে নানা সময়ে জনগণনার প্রতিবেদনে তাঁদের কখনো কোচ, কখনো পলিদের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় দেশী, পলি, রাজবংশী ও কোচ—এই চারশ্রেণীর স্থান দেশী ও পলিদের ধারণায় নিম্নরূপ :[৪]

(১) দেশী. (২) পলি, (৩) রাজবংশী (আজবংশী), (৪) কোচ।

এই শ্রেণীবিন্যাসও প্রমাণ করে দেশী সবার আগে অবিভক্ত দিনাজপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এসেছেন। এবং তখন এইসব অঞ্চল ছিল শস্যশ্যামলা।

দেশীদের ঘরে ঘরে ঢেঁকি, অন্যপক্ষে, পলি, রাজবংশীদের ঘরে ঘরে ছামগাহিন বা উদূখলের ব্যবহার। এই ঢেঁকিতে দেশীরা ধান, চিঁড়ে এবং বিয়ের সময় কাশাই কোটেন। পলি ও রাজবংশীরা 'ছামগাউনে' ধান চিঁড়েও বিয়ের সময় হলুদ কোটেন। এই ছাম দেখতে অনেকটা গাছের গুঁড়ির মতো। যার মধ্যস্থানটিতে একটি গোলাকার গর্ত। সেখানেই ধান, চাল, চিঁড়ে থাকে। এর নাম পলিরা বলেন খোটো। 'ছাম' অনুযায়ী গহিন অর্থাৎ মূষল দণ্ডটি। সাধারণত সাড়ে তিন হাত লম্বা। তার মাথায় লোহা আটকানো থাকে। এর নাম সামা।

ছামগহিন বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং যেখানে খুশি তার ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু বলাবাহুল্য, ঢেঁকির এরকম ব্যবহার অসম্ভব। কৃষিজীবী হিসাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেই ঢেঁকির ব্যবহার স্বাভাবিক। এর থেকেও বলা যেতে পারে দেশীরাই এই অঞ্চলে পলি রাজবংশীদের তুলনায় সর্বাগ্রে ভূম্যধিকারী হয়। দ্বিতীয়ত কোন কৃষিজাত দ্রব্যই দেশীরা হাটে বাজারে বিক্রয় করেন না। এমন কি সরষের তেলও তারা পলিদের কাছ থেকে কুটিয়ে নেন।

দেশীদের বাড়িতে বাড়িতে রয়েছে তাঁতপোই। দেশী মেয়েদের নিজস্ব তাঁত। এই তাঁতেই তারা পরিধেয় বস্ত্র 'দোসতি ছ্যাওটা', পাটের সতরঞ্চী জাতীয় 'ধোকরা', রঙিন 'ঝালং', বিছানার চাদর 'বিছান', পিঠে সন্তান বেঁধে নেওয়ার জন্য 'ফাটি' প্রভৃতি বোনেন এবং হাটে বিক্রী করেন। পলি মেয়েরা

এসব তাঁদের কাছ থেকে ক্রয় করেন। অন্যপক্ষে, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী মেয়েদের মধ্যে এই তাঁতের ব্যবহার ছিল।[৫] কিন্তু এই অঞ্চলের পলি মেয়েদের মধ্যে এর ব্যবহার নেই। বরং পলি মেয়েরা কাঁথা বোনেন।

পলি মেয়েরা মুড়ি ভেজে চিঁড়ে কুটে হাটে বিক্রি করেন। দেশীরা নিজেদের জন্য এসব কাজ করেন কিন্তু কখনোই বিক্রি করতে যান না। পলিরা কলুর তেল কোটেন এবং হাটে বিক্রি করেন।[৬] দেশীদের কাছে একাজ খুবই নিকৃষ্ট।

বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ডঃ তারাশিস মুখোপাধ্যায় একদা কালিয়াগঞ্জ থানা অঞ্চলে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষায় এসেছিলেন। তাঁর সমীক্ষার কিছু নিদর্শন রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গেজিটিয়ারে (১৯৬৫) এবং ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকার একটি সংখ্যায়।

"পলিয়া সমাজে তাঁত বোনবার রেওয়াজ না থাকায় দেশীয়া মেয়েদের তৈয়ারি কাপড় কিনতেই হয়। মূলতঃ কৃষিজীবী হলেও বংশানুক্রমে পলিয়াদের অনেকেই হাটে বাজারে দই বিক্রি করেন। চোখ ঢাকা একটি বলদের সহায়তায় কাঁঠাল কাঠের ঘানিতে সরিষার তৈল মাড়েন। মুড়ির সঙ্গে গুড় মিশিয়ে মুড়িয়া বা মোটকু তৈয়ারী করে বিক্রি করেন।...গোষ্ঠীগত ধর্ম বিশ্বাসের নিরিখে পলিয়াদের মধ্যে কেবল তাঁত বোনাই নয় চিঁড়ে বিক্রি ও ঢেঁকিতে ধান ভানাও নিষিদ্ধ। কারণ এই বৃত্তিগুলি নাকি মূলতঃ দেশীয়াদের।......পলিয়াদের মধ্যে স্বর্ণকারের বৃত্তি নেওয়ার চলন না থাকায় দেশীয়া স্বর্ণকারের উপর নির্ভর করতে হয়।"...[৭]

কালিয়াগঞ্জ থানার কুনোর হাটপাড়ায় পলিয়াদের এক অংশ কুমোরের কাজ করেন। বিশেষ ধরনের চাক ঘুরিয়ে মৃৎপাত্র তৈয়ারীতে তারা পারদর্শী। তুলসী বেদী, ধুপসি, ডুকসি, ঠেকি, পেচি, তারি, পেওলা, বয়াম চুনাতি, চোরাগবাতি এরা তৈরি করেন। ধুপসি হল ধুপদানি, ডুকসি হল দৈ-ভাণ্ড। ঠেকি, পেচি ও তারি হল তৈলভাণ্ড। একতারি তেল বিয়েতে দেশী পলি উভয়েরই বর পাত্ররা কইনার মাকে দেন। একতারি তেল হল প্রায় আধসের।

রাজবংশী পলি, দেশী মেয়েরা বুক থেকে জানু অবধি ঢাকা প্রায় একই রকম দোসতি ছ্যাওটা (দু'খণ্ড কাপড় একত্র যুক্ত) পরেন তার নাম পলিদের কাছে পাটানি বা কাপানি। কিন্তু দেশীদের কাছে বুকানি।[৮] পুরুষেরা বাড়িতে কৃষিকর্মে নেংটি পরেন এবং সেই নেংটির এক অংশের কাপড়

কোমরের সামনে ও অপরাংশ পেছনে ঝুলিয়ে দেন।[৯] বাইরে বেরোবার সময় ধুতি চাদর ব্যবহার করেন। ইদানীং আবার ব্যবহার চালু হয়েছে। মেয়েরা বুকানি বা কাপানির সঙ্গে ফাটি ব্যবহার করেন। ফাটিতে সন্তান পিঠে বেঁধে চলাফেরা করাও তাদের অভ্যাস। মেয়েদের মধ্যে বাড়ির বাইরে শাড়ির ব্যবহার চালু হয়েছে।

একদা পলিরা এবং দেশীরা নামের সঙ্গে পদবী ব্যবহার করতেন না। যেমন জোনাকু পলি বা সুন্দর দেশী ছিল পূর্ণাঙ্গ নাম। সেটেলমেণ্ট অফিসার বেল সাহেবের আমলে (১৯৪০) বংশীমারী অঞ্চলের একটি দলিলে এই রকম ব্যবহার দেখেছি। রায়গঞ্জ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কেও খোঁজ করলে আধুনিক পদবী বিহীন বহু নাম পাওয়া যাবে। সুন্দর দেশী নামে একজন শিক্ষক ইটাহার থানার সহচর হাইস্কুলে রয়েছেন, যিনি বিগত (১৯৭৮) পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন।

তবে এখন এইরকম নাম প্রায় দুর্লভ। পলিরা বর্তমানে প্রধানত রায়, বর্মন, ক্ষত্রি, রাজবংশীরা সিংহ, দাস, বর্মন, রায়। এবং দেশীরা দেবশর্মা, সরকার, প্রামানিক, চৌধুরী পদবী ব্যবহার করছেন।

দেশীরা পলিদের থেকে ভাষা ব্যবহারের দিক থেকেও পার্থক্য ঘোষণা করেন। আত্মীয় পরিজনকে সম্বোধন, ক্রিয়াপদে ও বিশেষ্যে এই পার্থক্য-রীতিমত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

দেশী পলিদের বসতিগুলো ছোট ছোট। সেগুলির নাম টোলা বা পাড়া।

চার পাশে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র বা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। তারই মাঝে একটা অংশ আটদশ ঘর মানুষের বাস। যা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীদের মতোই দেশী, পলিদের বাড়ি সাধারণত চারভিটের ঘর। ঘরগুলো সাধারণত খড়ের দোচালা। কিন্তু মাটির দেওয়াল। জলপাইগুড়িতে ছেঁচা বাঁশের বেড়া। ভিটে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু। দোচালা ঘরের নাম বাংলা। চার চালা ঘরের নাম চুয়ারী। আটচালার ঘর দেখিনি। দেশীদের একটি গানে শুনি :

ঘর মইধ্যে চুয়ারি ঘর
দালানক পুছে কে
ছেপড়া ছুপড়ি ঘর ভাই
সংসার রাখিয়াছে।

বাংলা ঘরের আরেক নাম 'ছেপড়া ছুপড়ি'। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র দেশী

পলিদের ঘরগুলো এই 'ছ্যাপড়াছুপড়ি'। তাদের সংখ্যাই বেশী। যদিও তারা জানেন চুয়ারি ঘরই শ্রেষ্ঠ ঘর।

চারভিটের ঘর ছাড়াও বাইরে বসবার ঘর থাকে। এর নাম মাওৈ ঘরা। জলপাইগুড়িতে রাজবংশী সমাজে তার নাম টারি ঘর। পশ্চিম ভিটা শোবার ঘর সকলের আগে তৈয়ারি হয়।

দেশী কিংবা পলিদের বাড়ীতে বাইরের রাস্তা থেকে প্রবেশ করতে গেলে সাধারণতঃ বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। কোন বাড়ী পথের পাশেই হয় না। একটি উদাহরণ দিই। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানার কৃষ্ণবাটী গ্রামে রবেন বর্মন (পলি) এর বাড়ীতে প্রবেশ করতে হলে বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে পথে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় ৩০ গজ হেঁটে উত্তরমুখি বাঁক নিতে হয়। উত্তরমুখি আরো প্রায় ১৫ গজ হেঁটে ফের পশ্চিমে বাঁক নিয়ে তার বাড়ীর প্রবেশ পথ পাওয়া যায়। প্রবেশ পথের ডাইনে মাটির দেয়াল বাঁয়ে শুতপা বা শোবার ঘরের দেয়াল। প্রায় বর্গায়িত একটি অঙ্গন। পূর্ব পশ্চিমে দুটি ঘর। দুটিই শুতপা ঘরা। উত্তরে গুয়াল ঘরা। দক্ষিণ পূর্ব কোণে 'আন্না ঘরা' এবং ঢেঁকি ঘর পাশাপাশি। পশ্চিমে একটি অলিগা ঘরের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব কোণের ঢেঁকিঘরা এক মাটির প্রাচীর দিয়ে যুক্ত। পূর্ব দিকে শোবার ঘরের সামনে তুলসী মঞ্চ। প্রতিটি শোবার ঘরের সামনে বারান্দাকে বলে ধাপি। চারভিটে ঘরের অঙ্গনের বাইরে উত্তরদিকে মাওৈ ঘর বা বৈঠকখানা। মাওৈঘরের পাশে পূর্বদিকে একটি কুই বা কূপ। বাড়ীর উত্তর দক্ষিণ প্রবেশ পথের পূর্বদিকে একটি দিঘি। দিঘির পূর্ব পার্শ্বে একটি বাঁশ ঝাড়।

দেশীদের বাড়ীগুলো প্রায় একই ঢঙে তৈয়ারি। ঘরগুলোর নামও একই রকম। তবে গোয়ালঘর, রান্না ঘর, ঢেঁকিঘর দক্ষিণ দিকে এবং প্রতি দেশীর বাড়ীর শুতপা ঘরের ধাপিতে তাঁত জোড়া, পলিদের বাড়ীতে কোন তাঁতই নেই।

তবে, পলি মাত্রেই যে গোয়ালঘর উত্তর দিকে থাকে তা নয়। আমি বহু পলিয়া বাড়ীতে গোয়ালঘর দক্ষিণ দিকেও দেখেছি। এ থেকে বোঝা যায় পলিদের গোয়ালঘর দক্ষিণ কিংবা উত্তর দিকে তৈয়ারি করার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই।

খুব সম্পন্ন কৃষক ছাড়া পৃথক ভাবে শস্য বা ধান রাখবার জন্য গোলাঘর

ক্যারো নেই। গোলাঘর দক্ষিণ কিংবা পূর্বে থাকে। এবং মাথৈও ঘরা ও শুতপা ঘরার মধ্যবর্তী কোন স্থানে এই গোলাঘর তৈয়ারি হয়।

অধিকাংশ বাড়ীতেই এখন বাস্তু ঠাকুর ঐ তুলসী মঞ্চ। তবে কেউ কেউ বিষহরি নিত্যানন্দের থানও তৈয়ারি করেন। বংশীহারী থানার টিকুহার গ্রামে (ডাকঘর: মালিয়ান দিঘি) বলরাম রায়ের বাড়ীতে বিষহরি থান উত্তরে, নিত্যানন্দ থান উত্তরপূর্ব কোণে বাড়ির আঙ্গিনায় দেখেছি। গোলাঘরও উত্তর দিকে। এমন কি তুলসীমঞ্চও উত্তর পার্শ্বে। এই গ্রামে মাথৈও ঘর বলে আলাদা কিছু পাই নি। 'আলনগছা' কথাটি পেয়েছি—যা জালগা ঘর বা বৈঠকখানা বোঝায়। এখানে অবশ্য এমনি 'আলনগছা' পূর্বে ও পশ্চিমে মোট তিনটি। এই বাড়ীর ঘরগুলির নামঃ ১-শুতিগাছা, ২ আন্নাগাছা—৩-মালগাছা—৪-আলনগাছা, ৫-মালগাছা, ৬-গলাগাছা, ৭-গুয়ালগাছা।

গাছাযুক্ত নাম আর পাইনি। বলরাম রায় পলি। এথেকে বোঝা যায় দেশীদের যেমন গৃহ নির্মাণে ও নামকরণে নির্দিষ্ট নিয়ম রীতি আছে, পলিদের তা নেই।

আরো একটি জিনিস লক্ষ করেছি। দেশীরা গ্রামের ঠিক অভ্যন্তরে মধ্যস্থলে বাস করেন। পলিরা, যদি সে গ্রামে দেশীরা থাকেন, তবে গ্রামের প্রান্তে বেশ দূরত্ব রেখেই বাস করেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা দেশীদের অনুসরণ করেন। এবং দেশীদের নেতৃত্ব মেনে নেন। এগুলো অবশ্য সমাজের নীচের তলার অর্থাৎ দরিদ্র, নিম্নবিত্ত পলিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আজও।

উনুনকে দেশীরা বলেন আখা বা চুলা। রান্নাঘরকে 'আন্নাঘরা' ছাড়া 'হাসিয়াল ঘরা'[১০]-ও বলা হয়। ঘরের ভেতরে বাঁশের মাচার মতো বা তক্তপোষকে বলা হয় 'ফালা'।

পলিদের দুই ভাগ। সাধু ও বাবু। বাবু পলিরা শূকর খায় বলে জানা যায়। তবে, বাবু পলিদের মতো দেশীরা কখনোই শূকর খান না। দেশীদের (এবং পলিদের) ঠাকরি কলাই, ভাত, আলুভাজি, পটলভাজি, মরিচের সানা ও পেয়াজের সানা সাধারণ খাদ্য। শাকের মধ্যে নাফা, তিলফু এবং পাট। প্রবাদই আছে, 'পাটা শাকের খাটা, নাফা শাকের প্যালকা'। খাটা অর্থে টক। প্যালকা ক্ষার জাতীয় পিছল প্রকৃতির। আরেকটি খাদ্য পলি ও রাজবংশীদের প্রিয়—তার নাম ছ্যাকা। দেশীদের কাছে তারই নাম

প্যালকা।[১১] এই ছ্যাকা একদিকে যেমন ক্ষার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন তরি তরকারিতে দেওয়া যায়। আসলে ছ্যাকা একটি জল বিশেষ ওই জলটি লবণের কাজ করে।

পলিয়া সমাজে চৈত্রসংক্রান্তিতে পোলই দিয়ে মাছ মারা হয়। শোল মাছ আর আমের মোল দিয়ে খাটা বা টক রান্না হয়। তাই কথায় আছে— 'আমের মোল আর বিলের শোল'।[১২]

এইদিন ঠাকুরী বা মাসকলাই বা যবের ছাতু খাবার নিয়ম। এইদিন ভাত রান্না হবে কিন্তু খাওয়া হবে না। ভাতে জল ঢেলে রাখতে হবে। কথায় আছে, চৈতের ভাত বোশেখে। অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে সকালে এই ভাত অর্থাৎ পান্তা খাওয়া হবে।

দেশী ও পলি উভয়েই কৃষি কাজে বেরুবার সময় পান্তা বা খকরা অর্থাৎ কড়কড়ে ভাত খেয়ে বেরোন। সম্পন্ন কৃষক চন্দনচুড়, কাঠারিভোগ, তুলাইপঞ্জা ধানের চাষ করেন। এগুলি খুবই সরু ও সুগন্ধী। কিন্তু সাধারণ কৃষক চেঙা, ঝিঙাশাল, কলম ধানের চাষ করেন। বছরের প্রধানতঃ দুটি ফসল। (১) ভাদই অর্থাৎ আউশ বা আশু। (২) হেউতি বা আমন।

ধান্য রোপনকে বলা হয় রোয়াগাড়া। বিভিন্ন ক্ষেতের নাম বাড়ী। যেমন ধানের ক্ষেত ধানবাড়ি, ডালের ক্ষেত—কালাই বাড়ি ইত্যাদি।

মাছের মধ্যে সকলের কাছেই শ্রেষ্ঠ উই বা রুই মাছ। কিন্তু ক'জনেরই বা ভাগ্যে জোটে তা? আর সকলের ভাগ্যে যা জোটে তাহ'ল 'চান্দা চচ্চুরি' মাছ। যদিও আকাঙ্খিত মাছ আরো অনেক আছে যেমন বোয়াল, শোল, কই।[১৩]

তামাককে বলা হয় তাংকু, পাটকে পাটা, সরিষাকে-তুরি। সুপারি হ'ল গুয়া। ইক্ষু হল কুশার। তুলাকে বলা হয় বাঙ্গা।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দেশী পলিদের শস্যাদি ক্ষেতের ফসলের নাম প্রায়শঃই এক। দু'একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন। তার বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এমন কি বার, মাস, পক্ষ, ঋতু, সময়, প্রভৃতির নাম প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মতোই। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক এর প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচিত।

প্রমাণপঞ্জী

১। কোচবিহারের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড (১৯৩৬) আমানাতুল্লা খাঁ চৌধুরী।

Coach-Behar State and its land revenue settlement (1903)

History of Assam (1906) E.A Gait.

Kirata-Jana-Kriti (1951) S. K. Chatterjee.

Statistical Account of Bengal W.W. Hunter. Vol X (1876) Darjeeling, Jalpaiguri & Cooch Behar.

Descriptive Ethnology of Bengal (Reprint Edition) 1974 E. T. Dalton.

২। Census 1951, W. Bengal : The tribes and castes of W, Bengal by A. Mit a

৩। 'In 1901 all subsections of Koch were recorded as Rajbansis and in 1911 and 1921 the Rajbansis were recorded as Kshattriya Rajbansi and Paliyas were recorded as Rajbansis.'

—Dr. C. C. Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, P 16.

৪। আদিবাসী জনজাতির শ্রেণীবিন্যাস প্রসঙ্গে দ্রঃ

State formation—Rajput myth in Tribal Central India. Man in India (1962) Vol. 42, No. I.

Tribe Caste Tribe :peasant continum in Central India. Jan-March Vol. 45 এবং No. I 1965. Man in India by Dr. Surajit Sinha,

৫। 'The Rajbansis of North Bengal'. P 56.

৬। 'খোপ' জাতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।' আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি গ্রন্থে বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী জানিয়েছেন 'খোপ' জাতির প্রধান জীবিকা কৃষি হইলেও সরিষার তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, মোদক (মোয়া) প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়ে তাহাদের আনুষঙ্গিক জীবিকা আছে। পৃঃ ২১৭।

* আমি দীর্ঘকাল ধরে দেশী পলি সমাজে মিশে মিশে যে অভিজ্ঞতা নিয়েছি তাতে বলতে পারি যে চিঁড়ে বিক্রি পলিয়ারাই করতে পারেন। দেশীয়াদের নিষিদ্ধ। তাই উক্তিটি ভ্রমাত্মক।—লেখক।

৭। 'পশ্চিম দিনাজপুরে পলিয়া'—ভূমিলক্ষ্মী ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ সংখ্যা।

৮। গারোদের সঙ্গে সাদৃশ্য—দ্রঃ Descriptive Ethnology of Bengal—Dalton P 278. Damant সাহেবও অনুরূপ পোষাক পলিদের মধ্যে দেখেছেন। তিনি 'Some Account of Palis of Dinajpur' নিবন্ধটিতে বলেছেন The women weave a cloth of jute called makhri. (মেখরী) which their only dress. It is about three hath in length and two in breadth and coloured with red, black and white stripe'. The Indian Antiquary Vol. I 1872. P

'মেখরা' এখন আর বোনা হয় না। এই নামটিও আর পাওয়া যায় না। ড্যামণ্ট সাহেব মেখরীর বদলে সুতোর বোনা কাপড়ে পোশাকে 'পাঠানি' চালু হতে দেখেছেন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে তারই নাম কোতো।

৯। G. H. Damant সাহেবও অনুরূপ পোষাক দেখেছেন। দ্রঃ Indian Antiquary Vol I, 1872, P

১০। 'হাসিয়াল ঘরা ভাত চড়াছু'—বঃথেলা গানের ছত্রাংশ।

১১। 'আঠিয়া কলার গোড়'টা শুকিয়ে ছাই করে একটা মাটির পাত্রে পোয়াল (খড়) দিয়ে ভর্তি করা হয়। মাটির পাত্রটির একটি ছিদ্র থাকে। মাটির পাত্রের বদলে 'ডোগা' বা নারকোলের মালাও হতে পারে। সেই ছিদ্রমুখে আরেকটি পাত্র রাখা হয়। জল ছাইয়ের উপর ঢেলে দিলে পোয়ালের মাধ্যমে পরিস্রুত হয়ে ছাকা বা প্যালিকা হয়। জলপাইগুড়ি-জেলার রাজগঞ্জ থানায় মন্থনী হাটে বসে জটিয়া রায়ের কাছে এই বর্ণনা শুনেছি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সরলা গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র সরকার (দেশী) 'ছাকা' শব্দটি জানেন না। প্যালকা বললে বুঝতে পারেন।

১২। অনুরূপ একটি তথ্য দ্রঃ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক পৃঃ ১৮।

১৩। কালিয়াগঞ্জ থানার কুনোর হাটপাড়া গাঁয়ে সাতো নাম্নী বৃদ্ধা পলিয়ার কাছে শুনেছি: 'মাছো মইধ্যে উই, ডাইলো মইধ্যে ঠাকুরী আর কুটুমোর মইধ্যে শাশুড়ী।' ১৯৭৮, মে মাস।

ওই থানার বাঘন গ্রামে ধৈর্য দেবশর্মা (দেশী)র গানে শুনি:

মাছো মইধ্যে রুহি কাতল
বোয়ালক পুছে কে
চান্দা চচ্চ্‌রি মাছো ভাই
সংসার রাইখ্যাছে।

লেনিনের সাংবাদিক জীবনের দিনপঞ্জী

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পরিচয় মার্চ ১৩৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ১৮৯৫-৯৬ দিনপঞ্জীর পরবর্তী অংশ। স. প.)

১৯১৭

৮ ও ৯ নভেম্বরের রাত্রি—শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিগুলির সোভিয়েত সমূহের দ্বিতীয় সর্ব রুশ কংগ্রেসের অধিবেশনে লেনিন অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত শান্তি এবং জমির ওপর ডিক্রী কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এবং তাঁর উত্থাপিত শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার গঠনের প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়। কংগ্রেস লেনিনের নেতৃত্বে পিপলস্ কমিশারস কাউন্সিল গঠনকেও অনুমোদন করে।

৯ নভেম্বর—সরকারের এক সভায় লেনিন সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বিভিন্ন বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তাঁর রচিত খসড়া, নিয়ম বিধি এবং সংবাদপত্রের ওপর ডিক্রী নীতিগতভাবে গৃহীত হয়।

১৭ নভেম্বর—লেনিন "Draft Resolution on Freedom of the Press" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন। সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যোগ দিয়ে তিনি সংবাদপত্র বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

২১ নভেম্বরের রাত্রি—লেনিন নোভোয়া গোলগুিয়া রেডিও স্টেশনে উপনীত হয়ে রেজিমেণ্টাল, ডিভিসনাল, কর্পস, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য কমিটিগুলির এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সমস্ত সৈনিকদের এবং বিপ্লবী নাবিকদের প্রতি তাঁর "বেতার বার্তা" প্রেরণ করেন।

১৯১৮

২৮ জানুয়ারি—লেনিন একটি সরকারী সভায় পৌরহিত্য করেন। সভায় বিপ্লবী প্রেস ট্রাইবুনাল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি—"সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্ন" শীর্ষক সরকারী ডিক্রী প্রাভদায় প্রকাশিত হয়। ডিক্রীটি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান বাহিনীর আক্রমণের পটভূমিতে লেনিন কর্তৃক রচিত।

৬-৮ মার্চ—লেনিন রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) সপ্তম কংগ্রেসের কাজ-কর্ম সম্পর্কে নির্দেশ দেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, পার্টি কর্মসূচী সংশোধন এবং পার্টির নাম পরিবর্তন সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করেন।

১০ ও ১১ মার্চ সোভিয়েত সরকারের লেনিনসহ অন্যান্য সদস্যরা পেট্রোগ্রাড থেকে মস্কোয় চলে যান।

১৮ মার্চ—পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রাভদা'র মস্কোয় স্থানান্তরিতকরণ এবং সম্পাদকমণ্ডলী গঠন-সম্পর্কিত আলোচনার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় লেনিন যোগ দেন।

মার্চের শেষে তিনি একদল যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) হাঙ্গেরীয় গ্রুপ গঠন এবং এই গ্রুপের নিজস্ব পত্রিকা 'সোশাল রেভল্যুশন' প্রকাশনা নিয়ে আলোচনা করেন।

২ মার্চ-৪ এপ্রিল—সান্ধ্য পত্রিকা 'ভেচেরনায়া বেডনোটা' ও প্রাভদার রচনা সম্বলিত 'ভেচেরনায়া প্রাভদা' প্রকাশনা এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখ্য প্রকাশনা বিভাগ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় লেনিন অংশ গ্রহণ করেন।

৩০ মে—লেনিন ইয়েলেটস ইউভডে সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি 'ইজভেস্তিয়া'র সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে দেশের আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি, বুর্জোয়াদের দমন-পীড়ন এবং উন্নত কৃষি খামারগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন।

১২ ও ১৯ জুলাই—সোভিয়েত রাশিয়ায় বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা মস্কো প্রিন্টিং শিল্পের অবস্থা এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে রেডিওর কাজ-কর্মকে কেন্দ্রীভূত করার ওপর খসড়া ডিক্রী সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে সরকারী বৈঠকে তিনি পৌরহিত্য করেন।

১৬ আগস্ট—লেনিন মস্কো পার্টি কমিটির সভায় 'প্রাভদা' এবং 'ইজভেস্তিয়া'র বিলি বণ্টন ব্যবস্থা ও ছাপাখানা নিয়ে আলোচনা করেন।

৩০ আগস্ট—লেনিন পূর্বতন জামোস্কভোরচেয়ে জেলার মাইকেলসন ওয়ার্কস-এর সভায় "দুই সরকার (সর্বহারার একনায়কত্ব এবং বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব") বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। লেনিন এই সভা থেকে বেরুনোর পর ফ্যানি ক্যাপলান নামের জনৈক সোস্যালিস্ট রেভলুশনারী তাঁকে (লেনিন) গুলি করেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—তাঁর অসুস্থতার পর তিনি (লেনিন) এই প্রথম রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগ দেন।

৭ ডিসেম্বর—পিপলস্ কমিশারস কাউন্সিলের সভায় লেনিন ভাষণ দেন।

তিনি এই সভায় কাউন্সিলের কাজ-কর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য একজন বিশেষ সংবাদদাতা নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

১৯১৮-র শেষাশেষি এবং ১৯১৯-এর স্থরু—আলেকজাণ্ডার তোদরস্কির বই 'A year with Rible and Plough' পাঠ করেন। এই বই থেকে মাল-মশলা নিয়ে লেনিন "A little Picture in Illustration of Big Problems শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন।

১৯১৯

২-৬ মার্চ—লেনিন কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

২২ মার্চ—লেনিন হাঙ্গেরীর বিপ্লব সম্পর্কে বুদাপেস্ট থেকে রেডিও বার্তা পান এবং এই ঘটনা সম্পর্কে কংগ্রেস প্রেসিডিয়ামকে অবহিত করেন। সপ্তম অধিবেশনে এই বার্তা পঠিত হবার পর কংগ্রেস থেকে লেনিনকে হাঙ্গেরীর প্রজাতন্ত্রের কাছে বেতার বার্তা পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। লেনিন ফোন করে মস্কো রেডিও স্টেশনে তাঁদের অভিনন্দন বার্তাটি শুনিয়ে দেন এবং পরে অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের পক্ষে তিনি হাঙ্গেরীয় প্রজাতন্ত্রের কাছে আরেকটি তার বার্তা পাঠান। বুদাপেস্ট রেডিওর কাছে অবিরাম যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনি নির্দেশ জারি করেন।

মার্চে লেনিন 'বেডনোটা' সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক এল এস সোসলোভস্কি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের সমালোচকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝারী কৃষকদের সম্পর্কে পার্টির সে দৃষ্টিভঙ্গি তা মুখপত্রগুলিতে গুরুত্বসহ প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেন?

৩০ এপ্রিল—সংবাদপত্র প্রকাশনা ভবন স্থাপন করা নিয়ে আলোচনা-কালে লেনিন সাময়িকীগুলির প্রচার সম্পর্কে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ করেন।

২ মে—'রোসটা'র (ROSTA) ম্যানেজার পি এম কারজেনটসেভ-এর সঙ্গে সোভিয়েত পত্র-পত্রিকার জন্য লেখক ও সাংবাদিকদের প্রচেষ্টাসমূহকে লিপিবদ্ধ করার এবং রোস্টা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির পথ নির্দেশকে আরও উন্নতি করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

১৭ মে—লেনিন পিপলস কমিশারস কাউন্সিলের সভায় পৌরহিত্য করেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ভবনের খসড়া চিঠিতে স্বাক্ষর করেন।

২৭ জুন—সমগ্র রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেরিত নৌকা 'ক্রাসনায়া জাভেজদা' (রেডস্টার)-য় ভলগা ও কামা নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নী নাদেঝদা ক্রুপসকায়া একদল প্রচারক ও শিক্ষাদাতারা নিয়ে রওনা হবার প্রাক্কালে লেনিন তাঁদের কাছে এ-সম্পর্কে বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ করেন।

২৮ জুন—লেনিন 'A Great Beginning' শীর্ষক পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ করেন।

২৪ অক্টোবর—লেনিন রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ভবনের ম্যানেজার ভি ভি ভোরোভস্কীর কাছে লেখা এক চিঠিতে "তৃতীয় আন্তর্জাতিক, ৬-৭ মার্চ, ১৯১৯" শীর্ষক পুস্তিকাটির অন্যায় প্রকাশনার জন্য তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন।

২৭ নভেম্বর—জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীকে লেনিন 'ইকনমিচেস্কায়া ঝিন' (অর্থনৈতিক জীবন)-এ দেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান বিভাগগুলির অগ্রগতি সম্পর্কিত রিপোর্ট ছাপার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য নির্দেশ দেন।

১৮ ডিসেম্বর—সংবাদপত্র 'স্মেনা'য় পেট্রোগ্রাড গুবেরনিয়ার যুবদের কাছে লেনিনের অভিনন্দন বার্তাটি প্রকাশিত হয়।

ডিসেম্বরের শেষে আর সি পির (বি) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর সভায় লেনিন "রুশ ভাষাকে নষ্ট করা থেকে বিরত হও" অর্থে একটি নোট রচনা করেন।

১৯২০

৯ জানুয়ারি—প্রতিরক্ষা পরিষদের অধিবেশনে ওমস্ক-এ রেডিও স্টেশন স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। এই অধিবেশনে লেনিন পৌরহিত্য করেন।

১৫ জানুয়ারি—শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি পিপলস কমিশনর এম এন পোকরোভস্কির কাছে লিখিত এক নোটে লেনিন শ্বেতরক্ষী বাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধটি সংবাদপত্র সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয় পাঠাগারগুলিকে নির্দেশ দানের এবং ১৯১৭ সাল থেকে প্রকাশিত সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলির সম্পূর্ণ সেট সংগৃহীত হয়েছে কি-না তা যাচাই করার জন্য প্রস্তাব করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি—লেনিন নিঝনী-নোভগোরোভ রেডিও গবেষণাগারের প্রধান এম এ বোঙ্ক ব্রুয়েভিচকে চিঠি লিখে তাঁর রেডিও আবিষ্কারের গবেষণা-মূলক কাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। এবং এ-বিষয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

২২ মার্চ—পূবের জাতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় ব্যুরোর চেয়ারম্যান এস সৈদ-গ্যালিয়েভ, ডেপুটি চেয়ারম্যান এম সুলতান গ্যালিয়েভ এবং ব্যুরোর কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'এসহে'র সম্পাদক বি মনসুরোভের সঙ্গে স্বয়ং শাসিত তাতার প্রজাতন্ত্র, কাজানের ছাপাখানা শিল্প, তাতার সাহিত্য, তাতারদের জীবনপ্রণালী এবং বাস্কাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

২৯ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল—লেনিন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) নবম কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কার্যাবলীর রিপোর্ট পেশ করেন এবং এই রিপোর্টের ওপর আলোচনার সমাপ্তি ভাষণ দেন।

৫ এপ্রিল—নবম কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধিবৃন্দ লেনিনের আসন্ন ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। লেনিন রচনাবলী প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৪ জুন—লেনিন খিরগিজের পার্টি কর্মিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ভবনের ম্যানেজার ভি ডি ভোরোভস্কির এবং জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের কাছে চিঠি লিখে খিরগিজের কমরেডদের টাইপ-ফাউণ্ড্রি, প্রিন্টিং প্রেস এবং মুদ্রাতে কাগজ দেওয়ার অনুরোধ করেন।

১৭ আগস্ট—লেনিন প্রখ্যাত আমেরিকার লেখক জন রীডের সঙ্গে আলোচনা করেন। রুশ সাহিত্য আমেরিকায় প্রচারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনার পর লেনিন সরকারের সচিবদের কাছে আমেরিকার প্রকাশক লুই ফ্রিনের জন্য রুশ সাহিত্যের অনুবাদক সংগ্রহের পরামর্শ দেন।

১৪ অক্টোবর—পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় লেনিন যোগ দেন। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও সভায় পিপলস কমিশয়রিয়েট ফর নাশানালিস্টস-এর মুখপত্র 'ঝিন নাশানালনোসতি'র কাজ-কর্ম নিয়ে আলোচনা হয়।

২৬ অক্টোবর—১৯২০ সালের ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত 'প্রাভদা'র ২৩১ নং সংখ্যাটির নিকৃষ্ট মানের কারণ জানতে চেয়ে লেনিন জাতীয় অর্থনীতির

সর্বোচ্চ পরিষদের প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং ইন্‌ডাসট্রি ডিপার্টমেন্টের কাছে চিঠি লেখেন।

৩০ অক্টোবর—লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট বুরোর সভায় যোগ দেন। সভায় সাইবেরিয়া অথবা কুবান অঞ্চলে বিক্ষোভ আন্দোলন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেনযোগে এম আই কালিনিনের আসন্ন সফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১৮ নভেম্বর—লেনিন "থিসিস অন প্রোডাকসন প্রোপাগাণ্ডা" (স্থূল খসড়া) লেখেন।

তিনি নভেম্বরের শেষে ডেপুটি পিপলস কমিশার ফর নাশানালিটিস এ জেড কামেনেস্কীর সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নের ওপর সাহিত্য প্রকাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯২১

১৩ জানুয়ারি—লেনিন 'ইজভেস্তিয়া'র প্রধান সম্পাদক ওয়াই এম স্টেকলোভকে চিঠি লিখে সম্পাদকের লেখা "ইন দ্য কান্ট্রি অব দ্য কমিউন" শীর্ষক প্রবন্ধকে অনুমোদন করেন। এই প্রবন্ধে ফরাসী সোসালিস্ট পার্টির টুরস কংগ্রেস নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি—লেনিনের উপস্থিতিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত অধিকারমূলক ব্যবস্থার জনা করের ক্ষেত্রে দ্রব্য-সামগ্রী প্রতিকল্প হিসেবে প্রবর্তনের ওপর 'প্রাভদা'য় আলোচনা সুরু করা হবে।

৮ মার্চ—'বেডনোটা' সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক ডি এ কারপিনস্কী রচিত গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি এবং কৃষকদের মনোভাব সম্পর্কিত পর্যালোচনা লেনিনের হাতে আসে।

৮-১৬ মার্চ—লেনিন পার্টির দশম কংগ্রেসের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দেন। তাছাড়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর রিপোর্ট পেশ করেন।

১৮ এপ্রিল—লেনিন রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ইঞ্জিনিয়ার এম এ বোঞ্চ-ব্রুয়েইভিচের আবিষ্কারকে আরও উন্নীত করার জন্য নিঝনী-নোভগোরোড রেডিও গবেষণাগারের ক্ষেত্রে অধিকতর সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে এন পি গোরবোনোভের কাছে চিঠি পাঠান।

২৮ এপ্রিল—লেনিন রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ভবনের চিঠি পাঠিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার ওপর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির রিপোর্ট ও বক্তব্য একত্রে সন্নিবেশিত করার জন্য প্রস্তাব করেন।

২৯ এপ্রিল—লেনিন দেশের সমস্ত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরিষদের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিবিষয়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্রগুলি শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

৪ মে—রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর সভায় লেনিন প্রেস কমিটি, রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা এবং এবং বিদেশী নিউজ-প্রিন্ট কেনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

৯ মে—ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে আর এস এফ এস আর এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে আলোচনা চলছে তা বানচাল করার জন্য শ্বেতরুশীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশান্তরী বিপক্ষ শক্তির পত্র-পত্রিকায় যে প্রচার করা হচ্ছে সেগুলি 'প্রাভদা' এবং 'ইভাভেস্তিয়ায়' নিয়মিত প্রকাশ করার জন্য লেনিন এই পত্রিকা দুটির সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে চিঠি লেখেন।

২৩ মে—লেনিন রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ভবনের ম্যানেজার এন এল মেসচেরিয়া-কোভ-এর কাছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার ওপর প্রকাশিত বই ও পুস্তিকাগুলি এবং আর সি পি (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া সিদ্ধান্ত-সমূহ বিলি করার জন্য নোট পাঠান।

৩ জুন—লেনিন শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সভায় অন্যান্য বিষয়সহ মস্কোর বেতারে সংবাদ প্রচারের খসড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেন।

৭ জুন—'ইকনমিচেসকায়া ঝিন'-এ প্রকাশিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ১৯২১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত দেশের উৎপাদনের ওপর লেনিন একটি সংক্ষিপ্ত সারণী রচনা করেন।

১ সেপ্টেম্বর—লেনিন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে কিভাবে আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে 'ইকনমিচেস্কায়া ঝিন'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে চিঠি দেন।

২ সেপ্টেম্বর—ডাক ও তার বিভাগের পিপলস কমিশার ভি এস দোভ-গালেভস্কীর কাছে চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় মস্কো রেডিও ষ্টেশনের কাজ-কর্ম এবং

রেডিও রিসিভারস্ তৈরী ও সেগুলি স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে খোঁজ-খবর জানতে চান।

১০ নভেম্বর—আর সি পি (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্বাচনকালে লেনিন্ টেলিফোন মারফত "বিদেশী পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা" প্রকাশের খসড়া সিদ্ধান্তটি পলিটবুরোর গ্রহণের পক্ষে মত দেন।

১৯২১-এর শেষে লেনিন 'ইকনমিকচেসকায়া ঝিন'-এর প্রধান সম্পাদক জি আই ক্রুমিনের কাছে নোট পাঠিয়ে বলেন, যে সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান কাজ হল স্থানীয় শিল্প সংস্থা এবং প্রশাসনিক মুখপত্রগুলির কাজ-কর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলির বিশ্লেষণ করা।

১৯২২

১২ জানুয়ারি—লেনিন আর সি পি (বি)র পলিটব্যুরোর সভায় নিঝনী নোভগোরোড রেডিও গবেষণাগারের জন্য অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাবটি পেশ করেন।

২৬ জানুয়ারি—লেনিন ভি এ কারপিনস্কীকে লিখিত এক পত্রে 'বেডনোটা' সংবাদপত্র কৃষকদের কাছ থেকে কতগুলি চিঠি পেয়েছে তা জানানোর এবং চিঠিগুলিতে যে-সব নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে সেগুলিও তাঁকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

১২ মার্চ—লেনিন "On the Significance of Militant Materialism" নামক প্রবন্ধটি শেষ করেন।

২৩ মার্চ—'বেডনোটা' সংবাদ পত্রের চতুর্থ বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে অভিনন্দন বার্তা পাঠান।

২৭ মার্চ—২ এপ্রিল—লেনিন আর সি পি (বি)-র একাদশ কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তিনি কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, এই রিপোর্টের ওপর সমাপ্তি ভাষণ এবং কংগ্রেসের সমাপ্তি অধিবেশন ভাষণ দেন।

২ এপ্রিল তিনি 'সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং প্রচারের' ওপর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত 'প্রাভদা'র বিজ্ঞাপন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২ মে—লেনিন 'প্রাভদার দশম বার্ষিকী শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন।

২৭ সেপ্টেম্বর—'প্রাভদা'র সম্পাদক এন আই বুখারিনকে ২৭ সেপ্টেম্বর 'প্রাভদায়' প্রকাশিত 'On the Ideological Front' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক ভি জি প্লেতনিয়ভ-এর মারাত্মক ভুলগুলি সম্পর্কে লেনিন নোট পাঠান।

৬ অক্টোবর—লেনিন 'পুট মোলোডেঝী' (যৌবনের পথ')র সম্পাদক-মণ্ডলীর কাছে অভিনন্দন বার্তা পাঠান। এই পত্রিকাটি রুশ ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগের বৌমন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১ নভেম্বর—অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে লেনিন 'পেত্রোগ্রাদস্কায়া প্রাভদা'কে অভিনন্দিত করেন।

১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর—লেনিন আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯২৩

জানুয়ারি—লেনিন অনুলেখকের সাহায্যে "Pages from a Diary", "On Co-Operation", "How we should reorganise the Workers' and Peasants' Inspection" and "Our Revolution" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি রচনা করেন।

২ মার্চ—লেনিন "Better fewer, But Better" শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষ করেন।

১৪ মার্চ—লেনিনের স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি 'ইজভেস্তিয়ায়' প্রকাশিত হয়। সরকার তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত মেডিকেল বুলেটিন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৫ এপ্রিল—মস্কোর কাছে গোর্কিতে লেনিনকে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৭ এপ্রিল—আর সি পি (বি)-র দ্বাদশ কংগ্রেস থেকে লেনিনকে অভিনন্দন জানানো হয়।

২৭ এপ্রিল—আর সি পি (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে লেনিনকে পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

২৪ মে—আর সি পি (বি) র পলিটব্যুরো লেনিনের দুটি প্রবন্ধ "On Co-operation" এবং "Our Revolution" দ্রুত প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জুলাই-এর দ্বিতীয়ার্ধ—লেনিনের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়।

১০ আগস্ট থেকে ২০ জানুয়ারি—লেনিন 'প্রাভদা', 'ইজভেস্তিয়া' সহ অন্যান্য সংবাদপত্র দেখতে স্বরু করেন। এন কে ক্রুপস্কায়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তাঁকে পড়ে শোনান এবং তিনি তার থেকে কিছু নোট নিতে থাকেন।

১৬ ডিসেম্বর—'ক্রাসনায়ানোভ'-এর মুখ্য সম্পাদক এ ভোরোভস্কি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এন এন ক্রেস্টিনিস্কা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

১৯২৪

১৭ ও ১৮ জানুয়ারি—ত্রয়োদশ পার্টি সম্মেলনের কার্য-বিবরণী ও 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি এন কে ক্রুপস্কায়া পাঠ করে তাঁকে শোনান।

২১ জানুয়ারি—লেনিনের স্বাস্থ্যের অকস্মাৎ দারুণ অবনতি ঘটে। সন্ধ্যা ৬টায় লেনিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

["Lenin about Press" থেকে সংকলিত।]

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক

সৌরি ঘটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই বোধ হয় সকালবেলাটা ভাল লাগে। কারণ একটাই। সারারাত ঘুমিয়ে শরীরটা তরতাজা থাকে, নতুন উদ্যম, নতুন শক্তি নিয়ে সে শুরু করে দিনের কাজ।

জেলখানাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি সকালের জন্যে সব কয়েদি উন্মুখভাবে প্রতীক্ষা করে থাকে। কিন্তু এর কারণটা একেবারেই আলাদা। জেলখানার একটি সকাল মানে বন্দীদশার একটি দিনের অবসান। মুক্তি আর একদিন নিকটবর্তী হল। এমনকি যারা যাবজ্জীবন সাজার কয়েদি তাদেরও এই এক মনোভাব।

বেশ মজা লাগে এই মনোভাব বিশ্লেষণ করতে। সবাই যে যার কাজ করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ঝগড়া করছে কিন্তু ভেতরে সবার ঐ এক চিন্তা, কতক্ষণে এই জেলখানা থেকে মুক্তি পাবে, কবে ফিরে যাবে বাইরের পৃথিবীতে। এখানে বাস করেও সবার চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খায় বাইরের জীবনকে কেন্দ্র করে। আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যাদের তারা ফেলে রেখে এসেছে তাদের কি হচ্ছে, তারা কি করছে, কেমন করে তাদের দিন চলছে দিবারাত্র এইসবই চিন্তা।

আমার সেলের উল্টোদিকে যে কয়েদিটি থাকে তার বাড়ির কথায় জ্বালায় পাগল হওয়ার উপক্রম। লোকটি ছিল পুরুলিয়া-বাঁকুড়া লাইনের বাস ড্রাইভার। একটা এ্যাক্সিডেন্ট করে, তাতে মারা যায় একজন। মামলায় ওর শাস্তি হয় আট বছর কারাবাস।

জেলখানার নিয়ম হল কোন কয়েদি যদি জেলের সব আইন-কানুন মেনে শান্তশিষ্টভাবে থাকে তাহলে বছরে তার দুমাস করে কারাবাস মকুব হবে। অর্থাৎ আট বছরে ষোল মাস, তার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রাষ্ট্রপতি কি প্রধান মন্ত্রীর জন্মদিন প্রভৃতিতে একদিন দুদিন করে কারাবাস মকুব হয়ে মোট যোগফলে যা দাঁড়িয়ে তাতে বছর ছয়েক খাটলেই সে মুক্তি পেতে পারে।

কিন্তু এই ব্যস ড্রাইভারটি একটু রগচটা ধরনের। একজন মেট একদিন তাকে একটা অশ্লীল গালাগাল দিতেই সে তাকে এক ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেয়। পরিণতিতে সে মার খায় প্রচুর, একমাস কারাবাস মকুব রদ হয় আর স্থান হয় এই অন্ধকার সেলে।

দিনরাত ওর শুধু বাড়ীর গল্প। শুনে শুনে ওর বাড়ীর লোকজনের নাম, ঘর-বাড়ীর বর্ণনা সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এমনকি সাদা গাই-গরুটা দোহাতে গেলে কি রকম চাট মারে, বাঘা কুকুরটা কত তেজী এসবও আমার জানতে বাকি নেই। ওর স্ত্রী মাছের ঝোল কি সুন্দর রাঁধে, কি চমৎকার চটের আসন তৈরী করে সে সবও বহুবার শুনেছি। একটু ফাঁক পেলেই ও শুরু করবে বাড়ীর গল্প—"এখন বেলা কটা বাজে বলতে পারেন ?"

আমি আমার সেল থেকে উত্তর দেব—"কত হবে ? দশটা সাড়ে দশটা।"

ও শুরু করে—"জল খাবারের বেলা হল। এইবার স্নান করে এসে ও আগে গাই দোহাবে। তারপর উনোনে আগুন দিয়ে ভাত চড়িয়ে মুড়ি খাবে। ছেলেমেয়েগুলো এতক্ষণ পান্তা খেয়ে স্কুলে গেছে। বাড়ীতে আর কেউ নেই। ও একা। মুড়ি খেয়ে তরকারি কুটবে, ভাত নামাবে, ডাল চড়াবে, রাখাল এসে গরুগুলো চরাতে নিয়ে যাবে—" আপন মনেই সে বাড়ীর এইসব ছবি আঁকবে আর একটানা বকবক করে যাবে।

দিনরাত ওর মুখে এসব কথা শুনে আশেপাশের সেলের অন্য বন্দীরা হাসে, ওকে ক্ষ্যাপায়। কোনদিন রাত নটার ডিউটি বদল হওয়ার পর ঠিক ওর পাশের সেলের বন্দীটি হয়ত বলে ওঠে—"কি গো ? ন'টা তো বেজে গেল। তোমার বউ এখন কি করছে ?"

সঙ্গে সঙ্গে ও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুরু করে—"কি আর করবে ? ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, নিজে খেয়ে এবার শুতে যাবে। আমি তো আর নেই যে না খেয়ে জেগে বসে থাকবে।"

—"তুমি থাকলে খেত না ?"

—"না। নাইট সিফ্‌টের লাস্ট বাস নিয়ে ফিরতে ফিরতে এক-একদিন রাত একটা হয়ে যেত। ততক্ষণ না খেয়ে বসে থাকত। এমন গুণের বৌ পাবে না। বুঝলে ?"

নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এই উচ্চ প্রশংসা কেমন যেন ছ্যাব্‌লামো মনে হয়। ওর কাণ্ডজ্ঞানবোধ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে মনে। কিন্তু আশেপাশের বন্দীরা যখন ওর এই কথায় খুক্‌খুক করে হাসে তখন আমি বুঝি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা,

ঘরবাড়ির এইসব মধুর স্বপ্নই ওর মনের ভারসাম্য ঠিক রেখে দেয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা, দীর্ঘ কারাদণ্ড। আলো বাতাসহীন এই অন্ধকার সেলে দিনের পর দিন নির্জনবাসের মানসিক যন্ত্রণাও ভুলে থাকে ফেলে আসা সাংসারিক জীবনের ছবি এঁকে। এই স্বপ্নের ঘোর যদি না থাকত তাহলে ও বোধহয় পাগল হয়ে যেত।

পাগল হয়ও। কতজন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বন্দীজীবনে এসে। কতজন হতাশায় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, ছেলেমানুষের মত কাঁদে হাউমাউ করে। কতজন আপনমনে বিড়বিড় করে, হাত নাড়ে, অদৃশ্য কারো সঙ্গে যেন কথা বলছে এমনিভাবে ঠোঁট নাড়ে। আশেপাশের মানুষ কি ভাবছে সেটা অনুভব করার শক্তিও তার থাকে না।

২

আমরা কমিউনিষ্টরাও মানুষ। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই। ঠিক এইরকম প্রতিক্রিয়া আমাদেরও হয়।

মনে পড়ে ৪৯-৫০ সালের কারাবাসের দিনগুলির কথা। দমদম জেলে বন্দী ছিলাম। ছিলেন আমার মত আরও অনেকে। খুব বেশিদিনের কথা নয়, বেঁচে আছেন সেই দিনগুলির অনেক সহবন্দী।

তখন আমরা 'সশস্ত্র সংগ্রামের পথে বিপ্লব' করছি। জেলে বসে শুনছি মুক্ত তেলেঙ্গানা, মুক্ত কাকদ্বীপ। বিশ্বাস করতাম কাকদ্বীপ থেকে সশস্ত্র ফৌজ এসে জেলের দেওয়াল ভেঙে মুক্ত করবে আমাদের। জেলখানাতেও আমরা একটা মুক্তাঞ্চল করতে গেলাম। রাতে তালাবন্ধ হতে অস্বীকার করে গুলি খেলাম। মারা গেল প্রভাত কুণ্ডু, সুমথ চক্রবর্তী আর মুকুল। সাতচল্লিশ দিন অনশন করলাম। মনে স্বপ্ন লাল ফৌজ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চলেছে। তার প্রয়োজনে আমাদের এ প্রাণদান জরুরী।

তারপর একদিন জানলাম সব ভুল। বাইরে থেকে এল আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মুখপত্র—'ফর এ লাস্টিং পিস, ফর পিপলস্ ডেমোক্রেসি'। সবাই পড়ল। আমিও পড়লাম। মনে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সেই পংক্তি ঝিলিক দিয়ে উঠল

—"নিশার স্বপ্ন সম
তোর এ বারতা-রে দূত।"

সব ভুল। দীর্ঘ তিনটি বছর—যে স্বপ্নের ঘোরে মাতাল হয়ে থেকেছি তা

মিথ্যা। যে স্বপ্ন সফল করার জন্য এত কমরেড প্রাণ দিল, পঙ্গু হল, ব্যক্তিগত জীবনকে তছনছ করে ফেলল তা অবাস্তব।

সে কি ভয়ঙ্কর সময়! কি তার মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া। এক মুহূর্তে চোখের সামনে নিভে গেল সমস্ত আলো। পায়ের নীচে দুলে উঠল পৃথিবী। নিজেকে মনে হল নিঃস্ব, রিক্ত, হৃতসর্বস্ব প্রতারিত এক মানুষ।

শুধু আমি নয়, প্রত্যেকের এক অবস্থা। দুঃস্বপ্নের স্মৃতিতে ভরা কি ভয়ঙ্কর সেই সব দিন! স্বপ্নভাঙা কমরেডের বিক্ষোভের ঝড়ে থরথর করে কাঁপছে বন্দীশিবির। কক্ষগুলিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুধু ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। ক্ষোভ, হতাশা, গ্লানিতে ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে দীর্ঘ অনশনক্লান্ত কোটরে বসা অক্ষিগোলক। নেতৃত্ব সম্বন্ধে তিক্ত, অশালীন, কটু মন্তব্য।

সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর মানসিক চাপ সহ্য করতে পারল না সকলে। সত্যি করেই পাগল হয়ে গেল কয়েকজন।

তাদের মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ে। গঙ্গা সিং। সেইসময় কলকাতায় একটা শান্তি সম্মেলন হয়েছিল। তাতে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন পাঞ্জাব থেকে তিনজন। এঁদের একজন ছিলেন তিনি;

কালো রঙ, ইয়া লম্বা চেহারা, হাতে বালা, মাথায় পাগড়ি। দেখে আকৃষ্ট হওয়ার মত চেহারা। হাওড়া ষ্টেশনেই গ্রেপ্তার করা হল ওঁদের। যেদিন জেলে এলেন তার মাত্র কদিন আগে গুলি চলেছে, তিনজন মারা গেছেন, আমাদের চলছে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট। ওঁরাও সেই ঘুর্ণিপাকে পড়ে গেলেন। জেলে ঢুকে থেকেই শুরু হল ওঁদের অনশনের পালা।

৪৭ দিন পরে সে ধর্মঘট বিনা সর্তে তুলে নিতে বাধ্য হলাম আমরা। ভুল ধরা পড়েছে তখন। এই প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গা সিং একদিন পাগল হয়ে গেলেন।

একতলার একটি সেলে গায়ে নিজের বিষ্ঠা মেখে লোহার গরাদ ধরে উগ্রমূর্তিতে চোখ লাল করে দাঁড়িয়ে থাকতেন গঙ্গা সিং। যে কাছে যেত তাকেই গালাগালি করতেন। আমি দেখতে গেলেই চিৎকার করতেন—"এ শালে সরি ঘাটে চন্দন কাউরকো লে আও।"

বাঙলা নাম সৌরি ঘটক বলতে পারতেন না। আমাকে ডাকতেন সরি ঘাটে বলে। উন্মাদ অবস্থাতেও নামটা তাঁর মনে ছিল। চন্দন কাউর হলেন তার স্ত্রী। আমাকে বলতেন স্ত্রীকে এনে দেওয়ার জন্য।

ঐ অবস্থায় হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি পরিয়ে গঙ্গা সিং-কে পাঞ্জাব পাঠান হয়। কয়েক বছর পরে মোগায় একটা কৃষক সম্মেলনে গিয়ে দেখা হয় গঙ্গা সিং-এর সঙ্গে। সেরে গেছেন তবে একটু ছটফটে আর বেশি বকবক করা স্বভাব হয়ে গেছে।

এতদিন পরেও গঙ্গা সিং-এর কথা মনে পড়লে ওর সেই বিষ্ঠা মেখে লোহার গরাদ ধরে প্রবল চিৎকার যেন আমার কানে বাজে। কি করুণ পরিণতি!

পাগল হয়েছিল নির্মাল্য। সে সময় কৃষ্ণনগরে এক আইনজীবী থাকতেন। তাঁর নাম দেবীবাবু। নির্মাল্য তার ছোট ভাই।

স্বাধীনতার আগে যখন আমাদের উকিল মোক্তার প্রায় ছিল না তখন চুরি ডাকাতির মামলায় কমরেডদের ধরলে কি অন্য ব্যাপারে আইনের পরামর্শ নিতে হলে দেবীবাবুর কাছে কতবার কৃষ্ণনগরে গিয়েছি। নির্মাল্যকে তখন চিনতাম না পরিচয় হল জেলখানায়।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর সময়ে একদিন স্নান করার সময় নির্মাল্য হাওদা থেকে মগে করে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—'আচ্ছা আপনারা উদয়শঙ্করের নাচ দেখেছেন, সাধনা বোসের নাচ দেখেছেন কিন্তু আমার নাচ দেখেছেন কি'—বলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিল।

ধরে সেলে বন্ধ করে খবর দেওয়া হল ডাক্তারকে।

পরে শুনেছি নির্মাল্য সেরে গিয়েছিল বাইরে চিকিৎসা করে।

আর একজন কমরেড। নাম মনে নেই। বিকেলবেলা। আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ নিজের সেলে ঐ কমরেডটি পকেটের রুমাল কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে গলায় জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ঘর থেকে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখে ডিউটির সিপাহি ছুটে গিয়ে তার জ্বলন্ত রুমাল কোনরকমে খুলে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে গলা, ঘাড় পুড়ে বড় বড় ফোস্কা উঠে গেছে।

আরও কয়েকজন এমনিভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় যাঁরা বন্দী ছিলেন তাঁরা হয়তো সব নামগুলো স্মরণ করতে পারবেন।

সর্বশেষ পাগল হলেন চুণীবাবু। রেলের শ্রমিক নেতা। তখন আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে বক্সা ক্যাম্পে। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা তিনি ছুটে

গিয়ে ডেপুটি কমাণ্ডান্টের পা জড়িয়ে ধরলেন—'আমাকে বাঁচান। এরা আমাকে খুন করে ফেলবে।'

সবাই 'কি হল কি হল' বলে ছুটে গেলাম। পাগল হয়ে গেছেন চুণীবাবু। সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্যঘেরা পাহাড় মৌন। মৌন আমরাও। এ কি হল?

কি হল? এইটাই তো আজ একমাত্র প্রশ্ন যা দেশের সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের চিত্তকে অবিশ্রান্ত তাড়া করে ফিরছে। বাইরে আমার ঘরে আছে ১৯২৫ সালে প্রথম কমিউনিষ্ট সম্মেলনে সভাপতির ভাষণের কিছু অংশের ফটোস্টাট কপি। এদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি কোথায় কবে গড়ে উঠেছিল, স্বদেশে না বিদেশে এটা সে সব বিতর্ক নয়। এখানে ১৯২৫ সালে যে কনফারেন্স হয়েছিল সেটাকেই বলা হচ্ছে প্রথম সম্মেলন। আর তাতে সভাপতির ভাষণের শুরুটি এইরকম "সমস্ত মানুষের জন্য এই বিশ্বকে সুখী ও আনন্দদায়ক করার আমাদের আন্দোলনকে কমিউনিজমের বিরোধীরা চূর্ণ করার চেষ্টা করছে…।"

তারপর গোটা শতাব্দী শেষ হতে চলল। বিশ্বের একতৃতীয়াংশ আজ সুখী। সেখানে বয়ে যাচ্ছে আনন্দের বন্যা। কিন্তু আমাদের দেশে? শোষিত মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

কিন্তু কেন?

অথচ জ্ঞানের অন্য যে কোন শাখায় তো আমরা পিছিয়ে নেই। বিজ্ঞান, কারিগরী জ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই আমাদের এমন কিছু মানুষ অতীতে জন্মেছেন ও এখনও বেঁচে আছেন যাঁরা বিশ্বমানের উপযুক্ত। কিন্তু মার্কসবাদকে আয়ত্ত করা ও তাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমাদের এ পশ্চাদপদতা কেন? কেন প্রায় একটা দীর্ঘ শতাব্দী ধরে মার্কসবাদ এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারল না? কেন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার ঘটল না? কেন তারা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে এল না? কেন গ্রামের পর গ্রাম কোটি কোটি কৃষক আজও অন্ধ কুসংস্কার আর পশ্চাৎপদ চিন্তার বেড়াজালে বন্দী!

আজকের যুগে সকলকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সবচেয়ে বিব্রত করে তুলেছে এই প্রশ্ন। আর এর অনেকরকম ব্যাখ্যা আজকাল ছড়িয়ে পড়ছে

বাজারে। কেউ বলছেন এর জন্য দায়ী কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভুলভ্রান্তি। কেউ বলছেন আন্দোলন নয় নেতৃত্বের ভুলভ্রান্তি। কেউ বলছেন মার্কসবাদ সংশোধন করা দরকার। কেউ বলছেন মার্কসবাদ এদেশে অচল। আবার এক দল বলছেন অতীতের সব ভুল। আমরা যেদিন থেকে শুরু করেছি সেদিন থেকেই প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলনের শুরু।

তার মানে জীবনটা শুধুই ভুলে ভরা? এত সহজ সরলীকরণের মধ্যে এর উত্তর নিহিত?

অনেক পুরোনো কমরেডকেই এ প্রশ্ন করি। বেশ মজার মজার উত্তর পাই।

একজন প্রাক্তন কমরেডকে জানি, যিনি এক সময় ছিলেন সারাক্ষণের কর্মী, এখন সব ছেড়ে দিয়ে ইনসিওরেন্স এজেন্সির দালাল হয়ে অ্যারিসটোক্র্যাট হয়েছেন। সুন্দর ঝকঝকে বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ, টিভি। মেয়েরা পড়ে কনভেন্টে, ছেলেরা ইংলিশ মিডিয়মে। এককালে দরিদ্র মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, বোধহয় তার প্রায়শ্চিত্ত করতে এখন তাদের ঘৃণা করেন। সাধারণ রেস্টুরেন্টে চা খেতে পারেন না, গা ঘিন ঘিন করে। চুল ছাটতে যান লিণ্ডসে স্ট্রীটে কুড়ি, পঁচিশ টাকা চার্জ দিয়ে।

পথে দেখা হলে আগে মাঝে মাঝে তিনি আমায় তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতেন, বোধ হয় ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য এবং কত সভ্য হয়েছেন সেটার প্রমাণ দেওয়ার জন্য। বাড়ি গেলে তাঁর স্ত্রী একটা শুকনো নমস্কার করতেন, এক কাপ কফি, দুটো টোস্ট আর ক্রীজের সন্দেশ আসত। সেগুলো সামনে নামিয়ে তিনি শুরু করতেন এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের খিস্তি।

প্রথম প্রথম মজা লাগত। নিজে যে দলত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন সেই অপরাধবোধ ঢাকার জন্য বকছেন মনে করতাম। তারপর একদিন বাড়াবাড়ি হতে চেপে ধরলাম—'আপনি অতীতে একদিন এ আন্দোলনে এসেছিলেন কেন?'

উনি হঠাৎ থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বললেন—'তার মানে?'

বললাম—'আগে না বুঝিয়ে মন না রাঙায়ে বসন রাঙালে যোগী।' ভেবেছিলেন গায়ের জামায় একটু লাল রঙের ছোপ লাগিয়ে প্রগতিশীল হয়ে ঘুরে বেড়াবো। পয়সা রোজগার করার জন্য তো কমিউনিস্ট আন্দোলনে আসার কোন দরকার ছিল না। আমাদের পাড়ার কেরোসিন তেলের ডিলার গলায় সোনার হার পরে বসে থাকে। তেল ব্ল্যাক করেই সে হাজার হাজার টাকা কামায়।"

মুখখানা আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হতে লাগল প্রাক্তন কমরেডটির;

বললাম: সেই সাধুর গল্প জানেন? দীর্ঘদিন তপস্যা করে ফিরে এল সাধু। লোকে জিজ্ঞেস করল এতদিন তপস্যা করে তুমি কি পেলে? 'সাধু হাত ঝাড়ল। সুগন্ধে ভরে গেল বাতাস। একজন লোক বলল—'সেন্ট। এতো বাজারে দুচার টাকা দিলে কিনতে পাওয়া যায়। এর জন্য তপস্যা করার দরকার কি? তেমনি আপনার এই গাড়ি-বাড়ি তো পয়সা দিলেই কিনতে পাওয়া যায়। এর জন্যে কাউকে কমিউনিস্ট হতে হয় না। কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় না কমিউনিস্ট জীবন। সেটা গড়ে তুলতে হয় দীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে।" আরও খানিকটা তিক্ত বিতর্ক হল। কফি সন্দেশ পড়ে রইল। শেষ হল সম্পর্ক।

আর একজন প্রাক্তন কমিউনিস্ট একদিন বললেন—'এখনও এ সব করে বেড়াচ্ছেন? বুড়ো বয়সে কেউ দেখবে না। পার্টিও না, কেউ না। ছেড়ে দিয়ে একটু নিজের কথা ভাবুন।"

মজা করবার জন্যে একটু বোকার মত বললাম—"ছেড়ে দেব বলছেন?"

—"না হলে কি করবেন? এদেশে বিপ্লব হবে ভাবছেন?"

—"হবে না?"

—"কোন দিন না।"

—"কি রকম?"

—"খোদ ইংল্যাণ্ডে কোন কমিউনিস্ট পার্টি আছে?"

—"প্রায় না থাকার মত।"

—"কেন, ভেবেছেন কোনদিন? মনে আছে ইংরেজ আমলের সেই লাল ম্যাপ। যাতে পৃথিবী জুড়ে ইংরেজের কলোনীগুলো লাল রঙে আঁকা থাকত।"

বললাম—"তা মনে থাকবে না কেন?"

উনি বললেন—"বৃটিশের কোন কলোনিতে কোন শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি আছে?"

চুপ করে রইলাম। উনি বলে চলছেন—"ফ্রান্স আলজেরিয়া করেছে, আমেরিকা ভিয়েৎনাম করেছে, পর্তুগাল এ্যাঙ্গোলা করেছে, হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া করেছে কিন্তু বৃটেন তার কোন কলোনিতে এ জিনিস ঘটতে দিয়েছে? বিশ্বের সবচেয়ে সুচতুর সুকৌশলী, বুদ্ধিমান হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আগে থেকেই আটঘাট এমন করে বেঁধে রেখেছে যে কমিউনিস্ট আন্দোলন কোনদিন

দানা বাঁধতে পারবে না তার দেশে বা তার উপনিবেশগুলিতে। তবে এতবড় দেশে কি দু দশটা এম. এল. এ, এম. পি. হবে না? তবে বিপ্লব? ও গুড়ে বালি।"

ব্যাখ্যাটা শুনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কথাটার মধ্যে আপাতদৃষ্টে কিছু সত্য আছে। সত্যিই কোন বৃটিশ কলোনিতে বা বৃটেনে এত দীর্ঘদিনেও কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা বাঁধে নি। এর কারণ কি? গেলাম ছোটকুদার কাছে। আর তাঁর কাছে একথা বলতেই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—"কে বলেছে এ সব? মার্কসবাদের এ. বি. সি. ডি.-ও সে জানে না।"

ছোটকুদার কাছে আমি মাঝে মাঝে যাই। একটি শ্রমিক বস্তিতে একখানা ঘরে থাকেন। সারা জীবন শ্রমিক আন্দোলন করছেন। একই ধরনের পোষাক, সাদা পাজামা রঙিন পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল। সে চপ্পল কেনার পয় আর কালি করেন না। রঙ চটে চটে সেটা পিজবোর্ডের মত হয়ে যায়। মাথায় একমাথা চুল। এখন সেগুলো পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। সারা জীবন সস্তা পাইস হোটেলে খান। কাঁধের ঝোলার মধ্যে থাকে নানা ধরনের বই, লুঙ্গি গামছা আর বিভিন্ন রকম ওষুধের ট্যাবলেট। সেগুলোও তাঁর খাদ্য।

জেলখানায় আলাপ হয়েছিল। তারপর সম্পর্ক রেখেছি। কারণ এই এক ধরনের কমরেড আছেন যারা বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তাই করেন না। ওঁর ডেরায় গেলাম, কি পথে ঘাটে দেখা হওয়া মাত্র বলবেন—আরে আপনি নিউ টাইমস্-এর গত সংখ্যাটা পড়েছেন?. কলোনিয়াল মুভমেন্টের ওপর লেখাটা? পড়ে নেবেন। দারুণ ইনটারেস্টিং পয়েন্ট আছে। কিম্বা বলবেন: এ্যাঙ্গেলসের এ্যান্টি ডুরিং আবার পড়ছি। আগে যখন পড়েছিলাম কিছুই বুঝি নি। একদিন যাবেন পড়ে শোনাব কতকগুলো জায়গা। কিম্বা হয়ত জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের দেশের শূদ্রদের কি ক্রীতদাস বলা যায়? অর্থাৎ রোমের ক্রীতদাসদের মত? আপনার কি মনে হয়?

একদিন বললেন—আমাদের কলকাতার শ্রমিক শ্রেণী কি ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার মত সর্বহারা, যাদের শ্রম ছাড়া বিক্রি করার কিছু নেই। আমার মনে হয় ঠিক তা নয়। এদের বার আনার মধ্যে রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক ঝোঁক।

ওদের লক্ষ্য এখানে অতি দীনভাবে জীবন কাটিয়ে কিছু টাকা জমিয়ে দেশে গিয়ে জমি কেনার। গ্রামে এরা থাকে অচ্ছুত। এখানে এসে পায় নাগরিক অধিকার। ফলে এরা বিপ্লবকে আশু কাজ বলে কোনদিন মনে করে না।

এইসব নানান ধরনের চিন্তা আর সমস্যায় ভরা থাকে ছোটকুদার চ্যাপ্টা মাথাটা। কোনদিন ওঁর কাছে শুনিনি ব্যক্তিগত সমস্যার কথা, কি রোগ-ভোগের কথা, কি কত কষ্টে জীবন যাপন করছেন তার বর্ণনা।

সেই ছোটকুদাকে যখন বললাম বৃটিশ কলোনীগুলোতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে না ওঠার গল্প তখন ছোটকুদা হেসে বললেন—"আসলে ও হল খবরের কাগজ পড়া কমিউনিস্ট। ডায়লেকটিক্যাল মেটিয়ারিলিজম পড়েই নি, জানেও না। আসল কথা কি জানেন? সমাজে যখন শোষক আর শোষিত দুটো শ্রেণী আছে তখন তারা লড়বে এবং ফয়সাল্লা করবে। সে আজ হোক আর কাল হোক। কারো সাধ্য নেই তাকে রোখে। তবে সে লড়াই কবে চূড়ান্ত রূপ নেবে সেটা কে বলবে হাত গুণে? আমাদের জীবনেও হতে পারে আবার নাও পারে। মার্কসের জীবনে কোন বিপ্লব হয় নি বলে কি মার্কসবাদ মিথ্যা?"

তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বললেন—"কোন চিন্তা করবেন না। 'ইয়া আজাদি ঝুট হ্যায়' বলতে বলতে তো আমরা স্বাধীনতাটা পেয়ে গেলাম। তেমনি এত তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যেও হয়ত একদিন সমাজতন্ত্র পেয়ে যাব।"

বেশ মানুষ। এঁর অভিধানে হতাশা বলে কোন শব্দ নেই।

আবার যতীনদার অন্য মেজাজ। কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে এম. এ. পাশ করেছেন, অধ্যাপনা করেন, বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন, সন্তানাদি হয় নি, বৌদিও স্কুল শিক্ষিকা। ঘরে প্রাচুর্য আছে, আছে আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণগুলি। ওঁর বাড়ী মাঝে মাঝে যাই, অনেক সময় উনি ডাকেন, কিন্তু বলেন—"তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কেননা তুমি সরে আসো নি। আমি সরে এসেছি। নিজেকে ছোট মনে হয় এ জন্যে। তবে এসব পালঙ্ক, টি. ভি. ফ্রিজ দেখে আমাকে ভুল বুঝো না। যদি কোনদিন ডাক আসে এসব ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ব আন্দোলনে। কোন মায়া নেই এ সবের ওপর। তবে কথা কি জান? মন থেকে তেমন সাড়া পাই না। প্রথম যৌবনে যে

ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম আজ সে রকম ডাকার মত ডাক যেন দেওয়া হয় না।"

ভ্রু দুটো কুঁচকে যায় যতীনদার। চিন্তান্বিত মুখখানা একটু ঝুঁকে পড়ে সামনে। ডান হাতটা তুলে মাথাটা চুলকোন আস্তে আস্তে। সামনের আয়নায় ফুটে ওটে একটা ভেঙ্গেপড়া মানুষের প্রতিবিম্ব। আপনমনে বিড় বিড় করে বলেন—"একবারও তাকাব না পিছন ফিরে। কোন পিছুটান নেই। কিন্তু……।"

তারপর একটু থেমে ফিরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—"মানুষ চায় প্রথম যৌবনে যে স্বপ্ন দেখেছে শেষ জীবনে সে স্বপ্ন সার্থক হোক। যে চাকরী করে সে চায় শেষজীবনে বিরাট উন্নতি হোক চাকরিতে, যে ব্যবসা করে সে চায় ধনী হয়ে উঠুক, যে চাষ করে সে চায় তার আরও জমি হোক। কিন্তু আমরা? কি ট্র্যাজিক আমাদের জীবন। যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে প্রথম যৌবনে ঘর ছেড়েছিলাম সেই বিপ্লবটাই হল না। কি জ্বালা! নরম বিছানায় শুলাম, ভাল সাবান মেখে স্নান করলাম, মাছ-মাংস দিয়ে ভাতও খেলাম, কিন্তু এতো চাই নি। থুঃ। থুঃ। এরচেয়ে সেই শ্রমিক বস্তিতে থাকা, সেই নোংরা অন্ধকার ঘরে আরশুলা আর ইঁদুরের সঙ্গে ঘর করা আর ডাল রুটি খাওয়া, খাটা পায়খানায় লাইন দিয়ে দাঁড়ানো, গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং করার সেসব দিনগুলো ছিল সত্যিকারের প্রাণবন্ত।"

আবার সামনে ঝুঁকে পড়েন যতীনদা। নৈঃশব্দে ভারি হয়ে ওঠে ঘরের পরিবেশ। বৌদি রান্নাঘরে কাজ করেন, তার খুটখাট আওয়াজ ভেসে আসে কানে। পাশের বাড়ীতে গান বাজে রেডিওতে। দুজনেই হারিয়ে যাই অতীত স্মৃতির সমুদ্রে। সেই উন্মাদনা, সেই আদর্শনিষ্ঠা, সেই আশাবাদ, কমরেডদের প্রতি সেই ভালবাসা, কৃচ্ছ্র সাধনে সেই আনন্দ—সেসব আজ আমাদের মন থেকে হারিয়ে গেল কেন? আমরা কি এত বুড়ো হয়েছি যে মনের সজীবতা, নতুনকে গ্রহণ শক্তি মরে গেছে? না কোথাও কোন ফাঁকি আছে যার ফলে মনের তন্ত্রীতে সে সুর বাজছে না।

বিকাশদা কথাটা বললেন আর একভাবে। এককালে ছিলেন আংশিক সময়ের সম্পর্ক। অংশ নিয়েছেন অনেক জঙ্গী আন্দোলনে। ফর্সা, লম্বা চেহারা, চোখ দুটো শাণিত, মুখে অটুট গাম্ভীর্য, কথা বলেন ধীরে ধীরে, তাঁর সমস্ত আচরণে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনেকদিন আগে সভ্যপদ ছেড়েছেন। সক্রিয় আন্দোলন থেকে সরে এসেছেন। এখন শিক্ষকতা করেন এক স্কুলে। পড়াশুনা করেন প্রচুর। এইসব কথা উঠলে বলেন—"কোন কাজ তো আমরা করি নি। শুধু শুধু আশা করব কেন যে আমরা বিপ্লব করব।"

তারপর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে বলেন—"কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হয়েছে ১৯৫১ সালে। সে আজ ৩৫ বছর আগেকার কথা। এই দীর্ঘ সময়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলন শুধু ইংরাজিতে যাকে বলা হয় এজিটেশানাল ওয়ার্ক তাই করেছে। অথচ কিছুই করতে হতো না। শুধু যদি গোটা কয়েক কমিশন করে কিছু মৌলিক কাজ করত তাহলে বিপ্লবী আন্দোলনে গুণগত পার্থক্য এসে যেত।"

মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করি। বিকাশদা বলে যান—"ধর ভূমি ব্যবস্থার ওপর যদি একটা কমিশন করত, অর্থাৎ কোন প্রদেশে ভূমি ব্যবস্থা কি রকম, সেখানে ধনী চাষী, মধ্য চাষী, গরীব চাষীর হাতে কত শতাংশ জমি আছে, ভূমিহীনদের সংখ্যা কত—এইসব তথ্য নিয়ে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটা করে হ্যাণ্ডবুক বের করত সেটা হত একটা মৌলিক কাজ। সেটা হত যারা কৃষক ফ্রণ্টে কাজ করে তাদের গাইড বুক। আজ আসামের কোন কৃষককর্মী জানে পাঞ্জাবের ভূমি ব্যবস্থা? কর্ণাটকের কর্মী জানে হিমাচল প্রদেশের কৃষি সমস্যা? সবাই নিজের অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, সীমিত জ্ঞান নিয়ে কাজ করে আর মনে করে তার সমস্যাটাই বুঝি সর্বভারতীয়।"

—"ধরুন জাতি সমস্যা নিয়ে যদি একটা কমিশন হত, যা ভারতবর্ষে কত জাতি আছে, কত উপজাতি আছে, তাদের ভাষা কি, জীবিকা কি, অন্য জাতির কাছে তারা কিভাবে শোষিত হয় এইসব তথ্য যদি সংগৃহীত হত তাহলে কমরেডদের হাতে সেগুলো হত বিভেদপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র। আজ একজন কমিউনিষ্ট বলতে পারে ভারতে কতগুলি জাতি আছে? উপজাতিদের সংখ্যা কত? কমরেড ষ্টালিন কতদিন আগে বলে গেছেন ভারতে দু'শতের বেশি জাতি আছে। কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্টরা এ নিয়ে কোন গবেষণা করেছে কি? কেন করে নি?

তেমনি ধরুন ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে কোন সার্বিক গবেষণা আছে? লেনিন তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন 'ডেভোলাপমেণ্ট অফ্ ক্যাপিট্যালিজম ইন রাশিয়া' বই লিখে। আমাদের দেশে? কেউ বলে মনোপলি বুর্জোয়া, কেউ বলে ন্যাশানাল বুর্জোয়া, কেউ বলে এটা এই

তুশ্রেণীরই রাজত্ব। কত রকমের কথা। অথচ একটা কমিশন করে ভারতে কতগুলো পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের কটাকে মনোপলি বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কার কিরকম গাঁটছড়া বাঁধা, এগুলো কি জানা যেত না? হাতের কাছে এরকম একটা বই থাকলে কমরেডদের জ্ঞান কত সমৃদ্ধ হত।"

তারপর ভেতরে ভেতরে যেন একটু উত্তেজিত হয়ে বলে লঠলেন—"দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ বছর বৈধ হয়ে থাকা একটা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে কম কথা নয়। অনেক মৌলিক কাজ এসময় করা যেত। কিন্তু হল না। আজ আক্ষেপ করে কি হবে? বীজ বোনেন নি তো ফসল পাবেন কি করে? আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আপনি যখন চালিয়ে যাচ্ছেন তখন লেনিনের ঐ উক্তি মৃত্যু পর্যন্ত আউড়িয়ে যান "জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শ্রমিক শ্রেণীর সেবায় ব্যয় করেছি। এটাই একমাত্র সান্ত্বনা।"

বাইরে বোধহয় হাওয়া দিচ্ছে। ঝিরঝির করে একটা শব্দ ভেসে আসছে। পাতার মর্মর। একটা পাপিয়া রাতের নীরবতাকে সচকিত করে মিষ্টি স্বরে গান গাইছে। কি মধুর আমেজ। গোটা জেলখানায় আর কোন শব্দ নেই। সব ঘুমুচ্ছে। এমনকি জেলখানার সিপাহিগুলোও বোধহয় ঝিমোচ্ছে বসে বসে।

লেখা বন্ধ করে আনমনে বসে বসে ভাবছি—'কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, কত তিক্ততা, কত আশাহতের বেদনায় ভরা আমাদের যুগ। কত ক্ষত, দুঃখ বুকের ভেতর বয়ে বেড়াচ্ছে সব। যারা সরে গেছে কি যারা আছে সেইসব বয়স্ক প্রবীণদের কথা না হয় বাদ দিলাম। একালের তরুণ প্রজন্ম! তাদেরও কি কম যন্ত্রণা! তারাও কি কম হতাশ!

একদিন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভাল ছেলেরা আসত এই আন্দোলনে। এমনি দুর্বার ছিল এই আদর্শের আকর্ষণ। কিন্তু আজ? ভাল ছেলেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে এই আন্দোলন থেকে। নিজেদের ক্যারিয়ার তৈরি করতে ব্যস্ত তারা। আর যারা আসছে তারা—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা ঠুকে।" কেউ হটকারিতার পথে যাচ্ছে, কেউ বিভ্রান্তকারীদের ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিচ্ছে। অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে, জুয়া খেলছে জীবন নিয়ে। হয়ত তাদের পথ ভুল,

হয়ত তাদের মত ভুল, হয়ত তাদের কৌশল ভুল, কিন্তু তাদের প্রাণদান তো ভুল নয়। সেটা যে বড় নির্মম সত্য।

কেন তারা এভাবে জীবনের অপচয় ঘটাচ্ছে? যন্ত্রণায়। তারা নিজেরা মুক্তি চায়, দেশকে মুক্ত করতে চায়। কিন্তু? পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

বসে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে এই কান্নার প্রতিধ্বনি শুধু দূরের লোকের কাছেই শুনি নি। শুনেছিলাম এমন তিনজন মানুষের কাছে যাঁরা আমাদের সংস্কৃতি রেনেশাঁসের অগ্রদূত। সে তিনজন হলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, আর দেবব্রত বিশ্বাস।

এঁরা তিনজনেই আজ মৃত। আর মৃত মানুষ সম্পর্কে কোন কিছু বলতে হলে দরকার সততা। ব্যক্তিগত আলাপন হিসাবে আমি যদি ঝুটো বানিয়ে মিথ্যা বলি তাহলে তাঁরা তো প্রতিবাদ করতে আসবেন না। সেজন্য ষোলআনা সততা নিয়েই তাঁদের কথা বলছি।

সিনেমার ছবির মত মনে পড়ছে তাঁদের সঙ্গে আলাপনের দুএকটা খণ্ডচিত্র।

সোনারপুরে একটা সাংস্কৃতিক সভা সেরে ফিরছি—আমি আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। যতদূর মনে পড়ছে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। একটু যেন ঠাণ্ডার আমেজ রয়েছে ভিজে হাওয়ায়। ট্রেনে উঠে আলাপ শুরু হল। বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) বলে চললেন মনের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা যৌবনের সেই দিনগুলির কথা। সেই সারারাত জেগে মধুবংশীর গলি আবৃত্তি, সেই গণনাট্য আন্দোলনের বিশাল পরিধিতে উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্করকে টেনে আনার গল্প, পি. সি. যোশীর আমলে বোম্বেতে আই. পি. টি. এ'র কেন্দ্রীয় স্কোয়াডে থাকার অনবদ্য স্মৃতি আরও কত কথা। বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি গড়িয়াহাটের মোড়ে। অনেক রাত হয়েছে। বাদল পরিবেশে লোকজন কম, দু একখানা ট্রাম বাস যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বলতে বলতে বটুকদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন— 'কিছু একটা কর। চোখের সামনে লোকে সব ভুলে যাচ্ছে এ আর সহ্য হয় না।"

আস্তে আস্তে আরও অনেক কথা হল। আমি চলে এলাম পার্কসার্কাসের দিকে, উনি চলে গেলেন বাড়ি। পরদিন একজনের মারফৎ একটা চিরকুট পেলাম। তাতে একটা কবিতা। তার শুরুটা এইরকম:

'কমরেড সৌরি ঘটক
এবার দেখব তোমার চটক।
পার্টির এখন বিপদ ভারি
যা করবার কর তাড়াতাড়ি।

পড়ে চিরকুটটা বুক পকেটে রেখে দিলাম। এরপরে যেদিন দেখা হল বললেন—"তুমি আমার চিঠির কোন উত্তর দিলে না?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—'চিঠি?'

—'কেন কবিতার চিঠি। সে যুগে আমি বিজন সব কবিতায় এই রকম চিঠি লিখতাম।"

আমি জোড়হাত করে বললাম—'বটুকদা এ চিঠির জবাব দেওয়ার শক্তি আমার নেই। আমি একজন অতি সাধারণ কমরেড। একেবারে সাধারণ। গোটা পার্টি সম্পর্কে আমি কি বলব? আর কিইবা করব। আপনি আমায় অন্য চিঠি দেবেন, চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে কি অন্য কোন বিষয়ে আমি তার উত্তর কবিতাতেই দেব।"

বটুকদা একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—'তা ঠিক। তুমি আর কি বলবে? সবই কি রকম গোলমাল হয়ে গেল।"

•

বিজনদার বাড়ি গিয়েছি ভর দুপুরে। দরজা খুলে ঘরে ডেকে বললেন—"আসেন। ভবানীবাবু থাকতে মাঝে মাঝে আসতেন, আর কেউ আসে না।"

তারপর শুরু হল কথাবার্তা। নানা প্রসঙ্গ। আমি শ্রোতা, উনি বক্তা। তন্ময় হয়ে শুনছি অতীত দিনের নানা স্মৃতি। তারপর বলতে বলতে এক সময় অল্প উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—'বারটা ডেডিকেটেড ছেলে দিতে পারেন? বেশি নয় বারটা। তারপর দেখেন কি করি।'

আমি বললাম—'আমি ছেলে পাব? আর ডেডিকেশনের কথা বলছেন, আমি নিজেও সেরকম ডেডিকেটেড কমিউনিষ্ট নই। ৪৬-৪৭ সালে আমি যে কমিউনিষ্ট ছিলাম আজ আর তা নেই। অনেক অধঃপতন হয়েছে।'

বিজনদা চুপ করে রইলেন। নির্জনে দুপুরের শান্ত পাড়া। খাটের ওপর কাগজপত্রের স্তূপ। আনমনে কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিজনদা বলে উঠলেন—'লোকে কয় নবান্নের নাট্যকার বিজন ভটচায্। পেটের দায়ে এই

বয়সে শ্যামবাজারে অভিনয় করতে যাই। কে দেখে? কে বোঝে? সব ফাঁকি।"

জানতাম দেবব্রত বিশ্বাস কোন সভা সমিতিতে যান না। তবু গোর্কি সদনে একটা সভার জন্য তাঁকে ডাকতে গেলাম। হাঁক দিলাম—"জর্জদা।"

সাড়া এল—"কে? জর্জদা বলে যখন ডাকছেন তখন পুরোনো লোক। আসেন।"

গেলাম ঘরে। বললাম। বললেন—"বলেন কি দরকার।"

বললাম সভার কথা। দপ করে জ্বলে উঠলেন। 'যাব না। কোন পার্টির সভায় যাব না। ঐ গণ সঙ্গীত কইরা জীবনের পনের বিশটা বছর বরবাদ হইয়া গেছে। না হয়েছে গান না হইছে সঙ্গীত। লোকে কয় দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। কিন্তু আমি গণনাট্য আন্দোলনের কত গানে সুর দিছি সেটা তো কেউ কয় না। আমি শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী? আর কিছু না? সব বরবাদ হইয়া গেছে। বুঝলেন? আর যাব না।"

তারপর বোধহয় নিজের এই ক্ষোভে নিজেই লজ্জিত হয়ে শান্তভাবে বললেন—"বসেন। আমার প্রথম সে গানটা রেকর্ড হইছিল সেটারে উদ্ধার করছি। শোনেন।" অনেকক্ষণ বসে কয়েকখানা রেকর্ড শুনে উঠে এলাম।

এই নির্জন কারাকক্ষে নিশীথ রাতে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ঐ তিনটি কথা কানে বাজছে: 'সব গোলমাল হয়ে গেল। সব ফাঁকি।' 'সব বরবাদ হইয়া গেছে।"

মনে হচ্ছে এগুলো তো কথা নয়, এর প্রতিটি শব্দ হল বুক নিঙরানো এক এক ফোঁটা চোখের জল। কত দুঃখে মুখ দিয়ে যে এসব কথা বেরোয় সে যারা বুঝবার তারা বোঝে, যারা বোঝে না তাদের বোঝাবার সাধ্য কারোর নেই!

অথচ প্রথম যৌবনে এঁরা তিনজনই ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তোলার অগ্রদূতদের অন্যতম। আর জীবনের শেষ প্রান্তে এসেই তিনজনই যেন এক অন্ধ গলিতে ঢুকে চিৎকার করলেন—'কোথায় এলাম।' সামনে পথ কোথায়? কোথায় পথ?

মনে পড়ে যায় একটি গানের কলি—'পথ কোথায়, পথ কোথায় পথের শেষে।'

'পথ কোথায়'—এই আর্তনাদে আজ মুখরিত সারা দেশ। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছাঁটাই, লকআপে কর্মচ্যুত শ্রমিক কেউ বা গলায় দড়ি দিচ্ছে আর বাকিরা চিৎকার করছে 'পথ কোথায় ?'

খরায়, বন্যায়, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গ্রাম্য জীবন। কৃষক চিৎকার করছে—'এ থেকে মুক্তির পথ কোথায় ?'

'প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। অভাব অনটনের চাকা ভেঙ্গে যাচ্ছে মধ্যবিত্তের জীবনবোধ। বুর্জোয়া প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বিপথগামী হচ্ছে সন্তানরা। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক জীবন। তাঁদেরও জিজ্ঞাসা 'পথ কোথায় ?—পথ কি ?'

আর এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া শ্রেণী হাঁক দিচ্ছে—'পথ হল মাদক সেবনে, পথ হল ব্যাভিচারে, পথ হল দুর্নীতিতে, পথ হল সমস্ত সামাজিক দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে, সমস্ত সুন্দর মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনে।

আমাদের প্রচারের গর্জন দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই প্রচারকে স্তব্ধ করে দিতে পারি নি আমরা।

এইখানেই আমাদের সাময়িক পরাজয়।

(চলবে)

বৈশাখের শান্তিনিকেতন

রণজিৎ সিংহ

১

উঁকি দিয়ে সরে যায় মেঘ, হাওয়া করে মাঝে মাঝে
খুনসুটি। অন্যথায় সারাক্ষণ এই জনপদ,
আমাদের প্রিয় ভূমি, রোদের মুকুটে জ্যোতিষ্মান,
রোদের উঠোনে খেলা করে, মাতে রোদের গাথায়।
পথিক কি পর্যটকে নিস্পৃহ, একাগ্রচিত্ত কাজে,
মাটি ফুঁড়ে গাছ তোলে। চাঁপা বকুল বট অশ্বত্থ।
গাছ দেয় পাতা ফুল আর ছায়া। সূর্যের কৃপাণ
রুখে ছায়া স্নিগ্ধতার হাত রাখে আর্তের মাথায়।

গাছের ছায়ায় নামে সদাসতর্ক কাঠবেড়ালি,
কিছু খুঁটে নেয়, ঠোকরায়, চাখে, ফের ভুরতুর
উঠে যায় মগডালে। আসে ওধারে কাঠঠোকরা
বুলবুলি ফিঙে। আরো যে কত পাখির চতুরালি
পদ্মদিঘি ছুটি ঘিরে। কুরচির গন্ধে ভুরভুর
বৈশাখের এ ভূমিতে দিব্যি নাচে প্রাণের ভোমরা।

২

নতুন বাড়িতে দেখি, দ্বারে আচার্য আলাউদ্দিন।
ঢুকতেই ডানদিকে মল্লারের জলদ আলাপে
ওস্তাদ বড়ে গোলাম মগ্ন। আরো একটু এগিয়ে

দেখি, সিদ্ধেশ্বরী দেবী শিল্পিত যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে
বেহাগের তানে স্থির। তাঁর বাঁয়ে, সৌম্য উদাসীন
আলি আকবর তাঁর রাগমালার চারু কলাপে
আমাদের দিনরাত্রি রমণীয় করেন। সে নিয়ে
দায় নেই, ফৈয়াজ খাঁ মজেছেন ধ্রুপদের ভুকে।

মশাই শর্বরী রায়চৌধুরী, এই কী আপনার
বাড়ি! এঁরা আপনার পরিবার পরিজন নাকি!
দেখাবেন বলে বাড়ি, দেখালেন এ কোন সম্ভার!
ক লাখের ইমারত? সে বৃত্তান্তে রয়ে গেল ফাঁকি।
অজন্তার উপাদেয় শিল্প ইতিমধ্যে উদরস্থ,
বুয়ার বেলের পানা খেয়ে ফিরি সাব্যস্ত গৃহস্থ।

৩

ঘটনার বিবরণে মেনে নিতে হয়, বাস্তবিক,
সুন্দরের নিকেতন আজ ক্ষুদ্র স্বার্থে ঝগড়ায়
হয়ে পড়ে খিন্ন, ম্লান। কত রকমের স্নায়বিক
প্যাঁচে একে অন্যে বাঁধে। সুযোগে আচ্ছাসে রগড়ায়।
অথচ এখানে সূর্য ওঠে। আলো ছড়ায় আকাশে।
গাছেরা দিগন্ত জুড়ে মেলে দেয় সবুজ চাদর।
কত যে ফুলের শোভা। কত গন্ধ ছড়ায় বাতাসে।
এখানে মানুষ পায় অভ্যর্থনা সানন্দ সাদর।

উদার আহ্বান শুনি এর পথে পথে মাঠে মাঠে।
আঁচল-ওড়ানো ওই সুন্দরীর সঙ্গে তো উদ্দাম
জীবনের ছন্দে ছোটা যায়। সুজাতার সুধাদৃষ্টি
ক্ষুধা আর ক্ষয় দূর করে। ভাবি, শিশুদের পাঠে
ফের যদি ভেড়া যেত, তাহলে নিশ্চিত বুঝতাম
আবাদের খুঁটিনাটি। দাবদাহে নামাতাম বৃষ্টি।

৪

বাঁধের ওপর দিয়ে ডানদিকে কেয়াঝোপ ছেড়ে
হেঁটে গেলে সোমনাথ হোরের নিভৃত ছোট্ট বাড়ি।

বাঁধের সঞ্চিত জলে কাচাকুচি মাজাঘষা সেরে
চলেছেন গৃহবধূ, ফরফর শব্দ করে শাড়ি।
দূরের অভয়ারণ্য থেকে লাফ দিয়ে, তারপর
মাঠের কাঁকর ধুলো উড়িয়ে দুরন্ত ঘূর্ণি এক
ডুব দিল সেই জলে। কোত্থেকে কে জানে কার স্বর
শুনে ডানা ঝেড়ে সাড়া দিল তিন সখী, প্যাঁক প্যাঁক।

বৈশাখের অপরাহ্নে মগ্ন সমাহিত শিল্পযাত্রা,
একে একে হয়ে যায় অনুপম পেন্টিঙের ফ্রেম।
তাই বুঝি! নাকি ভিন্ন কোনো শর্তে প্রেক্ষণের মাত্রা
বেড়ে যায়! সৃষ্টিমগ্ন শিল্পীর সন্ধান দিল প্রেম।
কদিনের ঘোরাঘুরি, আড্ডা, এই শান্তিনিকেতনে
বাঁচার পরিপূর্ণতা আর হর্ষ আনে প্রাণে মনে।

৫

কোথাও না পাও যদি পেয়ে যাবে সুবর্ণরেখায়।
ওলটাব বইয়ের পাতা সদ্যপ্রকাশিত, কিংবা
গাদা থেকে খুঁজে নেব অধুনা দুষ্প্রাপ্য বস্তু কোনো,
কিংবা এ তাকে ও তাকে ঘুরে ঘুরে দেখব সেজান
লোত্রেক তিন্তোরেত্তোর অ্যালবাম। কিংবা আসে যায়
কে কে, কোন বই চায়, দেখা যায়। আমল দিন বা
না দিন, চালচলনে হাবেভাবে বুঝে নেব, শোনো,
কোন গুণে গুণী কেবা। স্থানমাহাত্ম্য পাব সে জ্ঞান।

আর যদি ইন্দ্রনাথ মজুমদার আছেন দেখি,
তাহলে তো কেয়াবাত! জমে যাবে আড্ডা ধুন্ধুমার।
আঁতলেমি চলবে না। থেমে যাবে বোলচাল সেকি।
তখন প্রসঙ্গ ওঠে ঔদরিক, সর্বশাস্ত্রসার।
কচুশাকে নারকোল চিংড়ি ভেদে কী রকম স্বাদ!
বাদুড়ের মাংস শ্রেষ্ঠ—এ সত্য তখন নির্বিবাদ।

শস্যফলন

বিশ্বজিৎ পণ্ডা

১.

এই যে দেখছো, মন্ত্রোপম মৌজা, এর চারদিকে কোথাও বিদ্যুৎ নেই,
এমনই চাতুর্য
আজ, বাকবিদ্যুতের হেঁচকিতে চমকে উঠছে গোটা গ্রাম, গঙ্গাবিধৌত
রাঢ় ভূমণ্ডল
ভূমণ্ডল মানে শুধুমাত্র আমাদের এই গ্রাম জগুদাসবাড়, পোস্টাপিস
মারিশদা
জেলা মেদনীপুর
কলকাতার সমস্ত চায়ের দোকানে এই জেলার সুবোধ বালকেরা
কাজ করছে
কলকাতার সমস্ত বাড়িতে এই জেলার স্কুল পালানো ছেলেরা
ফাইফরমাস খাটছে
কলকাতার সমস্ত কলেজে এই মহাশ্চর্য জেলার ছেলেমেয়েরা
মন দিয়ে পড়ছে
পড়ে যাচ্ছে, শুধু পড়াশুনোই করে যাচ্ছে
আর আমি, এমনই হতভাগ্য, আমি এক কীটনাশক শীতলাখানের
সেবাইৎ হয়ে জন্মেছি
আমার বাড়িতে সারাদিন খিটিরমিটির লেগে আছে সারাবছর
কুচুকুরে কুটুমেরা আসছে, যাচ্ছে, তাদের কথায় নেচেকুঁদে
আমাকে অস্থির করে তুলছে আমার বৌ, সারাটাদিন, কাজ নেই,
কর্ম নেই
চারদিকে হ্যা হ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়ার দামড়া দামড়া মেয়েরা
এইসব মেয়েরা সংসারের সৃষ্টি স্থিতি আর বিনাশের রহস্য বোঝে না
তাই এতো লম্ফঝম্প, ভগবান করুন, এদের দু'ভুরুর মাঝখানে
একদিন সূর্য উঠুক
এদের কোলে প্যাক্‌প্যাক্ করে উঠুক লালাধোলা নানা রঙের পাতিহাঁস
এদের ধানিজমিতে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে জল নামুক, গরুবাছুর, চাষবাস,
হাঁড়িকড়া ঠেলতে ঠেলতে হাজায় হেদিয়ে যাক হাত পা, তখন দেখবো

কোথায় যায় এতো সিনেমাযাত্রা, এতো ওষ্ঠরঞ্জকের লীলাখেলা
যদি বেঁচে থাকি, তখন দেখবো কোথায় যায় এইসব মেয়েদের

এতোসব কলকলানি, এতোসব হ্যাকোপ্যাকোর
এতো রকমের ফাজলামি ইয়ার্কি, হ্যাকোরপ্যাকোরের মধ্যেও,
হ্যাজাক জালিয়ে
পঞ্চায়েতের মিটিং, কতো কথা, কতো বাকচাতুর্য, কতো সুর
ছেলেরা সুর করে নামতা পড়ছে, বড়ো রাস্তার ওপরে হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছে
গাড়িঘোড়া, কলকাতার লোকজন এই গ্রামের দিকে মুখ করে
সন্দেহজনকভাবে পেচ্ছাপ করছে, রাত নামছে, অন্ধকারের কেশর থেকে
ফুলে ফুলে ছুটে আসছে পিণ্ডপিণ্ড ভয়, অলৌকিক তাঁতকলের হেঁচকি,
বাক্‌বিদ্যুতের হাসিতে মাঝেমাঝে চমকে উঠছে গোটা গ্রাম, গ্রাম নয়—
তোমরা আমার বন্ধুরা, কলকাতার বন্ধুরা তোমরা একে বলবে পবিত্র
সংকট
আমি সামান্য মাষ্টারের ছেলে, আমি একে বলবো শুধু হাসি, ওগো
এই সেই শষ্যফলনের হাসি।

২.

মাথার ওপর থেকে কালাগুচ ডাঁই হয়ে নেমে আসছে একেবারে
মাথার ওপরে
চাপে ঠেকে তলপেট ঢেকে দিচ্ছে, সন্ত্রাসজড়িত আনন্দে, ফুর্তিতে ফেটে
লাফ মেরে উঠছে দেবতার দাপনা ; এইভাবে একেকটা বমন
লাফিয়ে লাফিয়ে উপচে পড়ছে জিভে, একেকটা অম্লজীর্ণ জিভ
তলপেটের আতঙ্কে বোধরহিত, সামান্য জল চাইতে পারছে না, আর
একেকটা আতঙ্ক ভয়ানক সূর্যাস্তের লীলা ঝরাতে ঝরাতে
হয়ে উঠছে জমিজমার দাবিদার ; আমি তো সামান্য মাষ্টারের ছেলে
শালগ্রাম শিলার ওপরে আজ গঙ্গাজল ছেটাচ্ছি, গোমুত্র ছেটাচ্ছি
বেল, তুলসীপাতা জড়িয়ে দিতে দিতে বলছি, ওগো ঠাকুর, জ্ঞান দাও,
বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও আর দাও দু-দশটা হরলিক্সের শিশি
এদিকে তিনি, মনসাপাতার কাজলের ভেতর কোমরের লাল ঘুনসি
শেকড়বাকড়ের ভেতর ছুৎঘরের আঁচউনুন কাঁথাবালিশের ভেতর

কাঁইকুঁই করে উঠছেন ; এই এক ত্রিকালজ্ঞ ছুৎঘর, যার ত্রিসীমানায়
কোনও ছেলেদের যেতে নেই, তাই বড়ো দুর্ভাগার মতো,
এখানে বসে আছি
বোঝো, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন খিড়কীপুকুরের ঘাটে দুর্ভাগার মতো
বসে আছি
দেশলাইকাঠি দিয়ে একবার কান খোঁচাচ্ছি আরেকবার খোচাচ্ছি দাঁত
কখনোবা হৃষ্টপুষ্ট, বাঁজা পেঁপে গাছটাকে প্রণাম করে বলছি, মাগো,
আমাকে জ্ঞান দাও, বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, আর গোটা গ্রামের
মুখ কালো করে
দাও দশ-বিশটা ছানাপোনা ; সামনে, এখন আমাদের পুকুরে
দুইচোখো, তিনচোখো সমস্ত ছোটবড় মাছ তুলকালাম ঘাই মারছে
ভেঙে ভেঙে ছোট হয়ে যাচ্ছে ঝাঁঝিদের একান্নবর্তী সংসার, দাবি উঠছে
শাস্ত্রসম্মত দাবি উঠছে ভাগচাষের দাবি, এইসব দাবি,
এতো রকমের দাবি, জয়ধ্বনি
সব ছাপিয়ে একসময় আমার কানের ভেতর কুরকুর করে উঠল
একটা অন্যরকম একেবারে অন্যরকম ছিঁচকাঁদুনে মাছের কলকলানি—
আমার পায়ের তল শিরশির করে উঠছে তলপেট শিরশির করে উঠছে
ওরে কে কোথায় আছিস, শাঁখ বাজা, আজ মঙ্গলবার, অমৃতযোগ,
মঘা নক্ষত্রের শেষ দিন, আমাদের ঘরে লক্ষ্মী এসেছেন
আজ আমার কোনও রাগ নেই, অভিমান নেই, আমাদের ঘরে এসেছেন
তাঁর সেই ছোটবোন, বড়দির হাতে গরম দুধের বাটি তুলে
দিতে দিতে বলছেন,
'ওমা, এ যে বড়দির মুখটা পেয়েছে'—এই বড়দিরও এখন কোনও
রাগ নেই
অভিমান নেই, তোমরা আমার বন্ধুরা কলকাতার বন্ধুরা, দ্যাখো
কী দারুণ দেখাচ্ছে বড়দির মুখমণ্ডল, তাঁর গুয়াথুপি মাংসের মালভূমি,
আর
পাত্যবাহারীর মতো চিক্কন চর্মদেশ চুঁইয়ে চুঁইয়ে
ঝরছে, ঝরেই চলেছে শুধু হাসি, ওগো, আমি তোমাদের বলেছিলাম
এই সেই শষ্যফলনের হাসি।

ফেরা

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

এক বুড়ি ছিল, তার ছিল একটি চুনের ভাঁড়, লেখা ছিল পানের, আর ছিল যখের ধন। একদিন গভীর রাতে বুড়ি কি করল জানো—সটান চলে এলো পুকুর পাড়ে। গভীর জলের দিকে তাকিয়ে গড়িয়ে দিল তার সখের ভাঁড়টি। গড়াতে গড়াতে মাঝপুকুরে গিয়ে সেই চুনের ডিব্‌বা তো ধনজাগা হয়ে গেল। আর সেই বুড়ি মহাসুখে নাচতে নাচতে মরে একেবারে কেঠিয়ে গেল। আসলে কিন্তু ধোঁকা—বুড়ি মরতে যাবে কেন? চুনের টানে তেনার বসবাস। গভীর জলে চুনের ভাঁড়টি জীবদান পেল মানুষের প্রাণটি খেয়ে। বুড়ি ঈশ্বর হয়ে গেল……

কচি বলল, গভীর জল নামতে পারবি তো—

বাপ বলল, তুইও শিখে লে বাপ, পেট সে এক ভয়ঙ্কর জন্তু—

কচি বলল, আমি তো পারি, কিন্তু ই যে একেবারে সাগর—

কোমরে মরা বামুনের দড়ি আছে, আমাকে খাবে কুন শালা—

ইঃ, বাপরে বাপ! কেমন বুড় বুড় শব্দ—

বুড়ো রজনী তার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতাটি জরিপ করে জলের দিকে তাকায়। বুড়িজান পুকুরের গহীন থেকে উঠে আসা শব্দটি যেন তাকেও ধমকে দেয়। নিশুতি রাতে ঝুঝকা-আঁধার। বাপবেটায় কানা হয়ে যায়। শুধু কান এক ভয়ানক তৎপরতায় জেগে গিয়ে বুড়িজানের উগরে দেওয়া জলের শব্দটি হজম করে নেয়।

সেদিন রাতে চাঁদ ছিল আসকে পিঠার মত ভাপ ওঠা। লোকে বলল, চাঁদে সভা বসেছে, হপ্তাখানেকের ভেতরে জল নামবে ভূমিতে। মাঘ মাস তাই জ্যোৎস্না ছুটছে বকের মতো। ক্ষিরকুল মাঠে লাঙল দিচ্ছে কে? হরি ঘোষ। এখন উগাল-সামাল। পরে বর্ষায় তেউড় পড়বে। বাপ তখন ছেলের কথা ভাবে। বলে ওঠে, মাঠে মাঠে চরে বেড়ায়, উ ব্যাটা তো গরু হয়ে বসে আছে—

কেনে লিখাপড়া শিখবে। খোকা আমার বিদ্যালয়ে যাবে—

কিসে কি কাজ, পুকুরে ডুবতে পারলে নাই নাই করেও পেটটি ঠাণ্ডা থাকবে—

ব্যাটার আমার অমন সর্বনাশ নাইবা হল, বাপের মতো ডুবারী হবে—

আজ এই পুকুরের পাড়ে তেমন জ্যোৎস্নাটি আর নেই। তাই বচসাও নেই। সব কিছু মরে গেছে পৃথিবীর। কয়েকটি স্বার্থপর মানুষের হিংস্র পেট জেগে আছে, আর কালকের কথা ভাবছে।

ঘুমিয়ে গেল কচি, নরম বয়স তার। চারদিকে অন্ধকার প্রেতাত্মার মতো লম্বা হচ্ছে। শুধু মহাকাশের বুকে জ্বলন্ত আঙরার মতো অসম্ভব পরিষ্কার নক্ষত্র একচোখে পৃথিবীকে দেখছে।

একদল লোক জালের বিছানায় শুয়ে গায়ে জড়িয়েছে জাল। জেলে নয়, বর্ষায় যারা লাঙল ধরে, আঘুনে কাস্তে তারই কামাই, মরশুমে নিদেন পেলে মাছের কারবার করে। নদী নালা মাঠ ডিঙিয়ে জীবগুলো প্রথম রাতে এসে ঘুমিয়ে পড়ে বিজন গাঁয়ের অচিন গাঙে, মাটিতে। মাঝরাতে ঝাড়াপাড়া দিয়ে উঠে তোড়জোড়।

জেগেছিল একমাত্র হালদার। তার চোখের ঘুম উড়ে গেছে দক্ষিণে। বিড়ির ধোঁয়ায় ভেতরটা কুয়াশাময়, রজনী জানে তাই কোন বিপত্তি নেই। অন্য কোন প্রাণী বুড়োর মুখটি দেখলে নির্ঘাৎ গর্ত বলে ভুল করত। হালদার বলে, এই জাড়ে মড়ার মতন ঘুমায় কি করে মোরগুলান—

রজনীর শরীরেরও অনেক জায়গা শীতে ছোট হয়ে গেছে। বলল, কি আর বয়েস, এখন না ঘুমালে আর ঘুমাবে কখন—

রাতটি এলেই জীবন শুরু হয়ে যায় রজনীর। সারাদিনে কাজ বলতে হাঁটো, খাও, মনের সুখে নিদ্রা যাও। বিকেলবেলায় দল থেকে ডাক আসে। এক একটি দল এক এক রকম রেটে ডাক দেয়। জাল টানবে পার্টি। তাকে শুধু মাঝপুকুরে আটকে যাওয়া জালটি একডুবে সাঁ করে গিয়ে পাটাতন মুক্ত করতে হবে। তল্লাটে আর কে আছে এমন ডাকাবুকো—।

রাত এগোচ্ছে গরুর গাড়ির মতো ধিকিধিকি। এছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। দক্ষিণে ডাকাত গড়ের মাঠ। উত্তরে পতিত জমি, বাঁশঝাড় ঘোষেদের টিনের কোঠাবাড়ি, গদাই পালের আলু বিল। বামে সরকারী ডিসপেনসারী অন্ধকারে সব কিছু পর হয়ে গেছে। যেন পরিশ্রান্ত পৃথিবী রাতের খাওয়াটি পর্যন্ত খেতে ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি ঘুম মারে।

রজনী কিন্তু অবাক হয় না। সেই যৌবনের দিনগুলি থেকে রাতই তার

জীবিকার দরজা খুলে দিয়েছে। সেই দিনগুলি——, জাল নিয়ে মাছ ধরতে যেত——, বাঁশগাছ মাটির সঙ্গে পেতে রেখে শাকচুন্নি পেত্নি চাইত, 'মাছ, মাছ দে—নাইত মরে যাব, মাছ দে—নাইত মরে যাব—।' গুরুজনেরা বলে, সাড়া দিলেই বাঁশটি ঘপাৎ করে উঠে যাবে আকাশে আর তোমার সুখের শরীরটি মহাকাশ থেকে একেবারে—ফ্যাতরাফাঁই। কে বাঁচাবে তাকে, যম যাকে ডাকবে। তারপর, তারাপদ কাসন্দির কাছে গুরু কবচটি ধারণ করা। কোমরে যদি থাকে বামুনপোয়াতির, গলায় দড়ির দড়িটি তবে জাল ভরে উঠে আসবে মাছ। ভূত ভৌতিক, লোকলৌকিক, অলৌকিক———থাক, থাক, সেসব কথা থাক এখন। এমন যম রাতে মনে পড়লেই ভয়. কি গো হালদার খুড়ো, ঘুমি গেলে নাকি? কত রাত হল, জাল নামাবে যে—

কচি বড় হচ্ছে। এখন আর বুড়ির গল্পে বিশ্বাস করে না। বলে, ডাহা গালগল্প। অথচ ছোটকালে কি ভয়ই না করত। কান্নাকাটি করলে টিয়া বলত, পুকুর পাড়ে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে। খ্যাক করে ধরবে আর অমনি তুই ঈশ্বর হয়ে যাবি। সেই কচি খোকা বড় হল, বিয়ে হল গত মাঘ মাসের একত্রিশ। বউমা রাতারাতি পোয়াতিও হয়েছে, ছেলের আমার কত ভয়।

এমন সময় শুক উঠল আকাশে। মেয়েমানুষের নাকছাবির মত সে কি এক তীব্র দাউদাউ তার তেজ। জাল নামল পুকুরে। কচি ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখল, বাপ লুঙ্গিতে গিরা দিচ্ছে। কোছা গুঁজছে পিছনে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে, খাটো লুঙ্গির নিচে পা দুটি তার দুটি দেশলাইকাঠির মতো বারুদ ধরে রেখেছে।

বড় সুখের সংসার তার। বুড়ো মা বাপ নেই, ঝামেলা নেই। বউ, একমাত্র খোকা কচি আর সে। তাই সুখের গল্প হয় রোজই। বাপের শরীরে এখনও তাগত আছে, যে দিন চলে যাবে দেখবে তো কচি বাপ আমার। দুটো পায়রা পুষেছে টিয়া, রোজ তাকে চাল ছোলা দেয়। ঘরের চালের মটকায় মৌচাক। মধুমাস এসে গেল। সময় ভালো হলে এইসব আসে সংসারে। আসছে গাজনে মাথার চুল ফেলে দেবে রজনী, এটা তার জন্য মানত।

কচির চোখ এখন বাপের দিকে। বাপ জল কেটে তীক্ষ্ণ করাতের মতো ঢুকে যাচ্ছে গহীনে। অন্ধকারে জলের মধ্যে কেমন ডুপ ডুপ শব্দ হয়। বুঝি কোন মাছ ঘাই মারে। দু দিক থেকে যারা জাল টানছিল—বরদা আড়ি, লুলা বাটুল, ঘুঘু, খগেন, পারনা চামার সবাই এখন স্থির, জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে গেছে ঠায়। কারণ, মাঝপুকুরে জাল আটকেছে পাটাতনে।

অল্পবয়স হলে বলত, কে জানে বাবা, সেই বুড়িটা ধরেছে কিনা। কিন্তু তেমন কথা বলার লোক এখন নেই। বরং দুর্দান্ত ভালুকের মত কালো অন্ধকার নখের থাবায় চেপে রেখেছে পৃথিবীকে।

এইবার রজনীর পৃথিবীটি আলাদা। ওপরে রয়েছে যে জগৎ সেখানে বউ, ছেলে, ঘরসংসার। ক' বিঘা জমিও রয়েছে। বাপের ভিটাটি ছোট হতে হতে ইস্কুলের বাগানটি বেড়েছে। জলের নিচে এলেই সেই বুড়ির কথা মনে পড়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে, কোথায় বুড়ি, কোথায় সেই মানুষটা—? পৃথিবীর মতো এখানে কিন্তু তেমন অন্ধকার নেই। বরং রুই মাছের রুপালী আঁশ দেখলে যৌবন চলে আসে শরীরে। তখন অসম্ভব ধারালো নাক, হাতটি বাড়িয়ে পাঞ্জা লড়তে ইচ্ছে করে।

বাইরের সেই সংসারটিতে কি হচ্ছে কে জানে! হয়ত জেলেগুলি বচসা করে, ভাবছে কখন পাটাতন কাটবে রজনী আর জাল উঠবে পরপারে। তারা জানে কাঠ পার করে দিলেই জাল উঠবে পরপারে। মাছ লাট করে তুলবে ডাঙায়। কিন্তু আসল রহস্যটি যদি জানতো—জানলে তাজ্জব বনে যাবে।— এই গভীর রাতের ঘুমন্ত মাছদের একে একে জাগিয়ে জালের দিকে পাঠিয়ে দেয় রজনী। তবেই না জাল ভরে ওঠে—।

এক একটি মাছকে আলাদা আলাদা আদরে জাগাচ্ছিল রজনী। এমন সময় ঈশান কোণে সাদা মত একটা কি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সাদা শাড়ি জড়িয়ে সেই বুড়িটা নয়ত—। কাছাকাছি নাগালের মধ্যে পেয়ে বুড়ি বলে উঠল, 'কি রজনী, কখন এলে গো বাছা—'

খানিকটা ভড়কে গেল, খানিকটা অবাক হল রজনী। হয়ত কানের লতিতে, ঘাড়ের ঢালে ঘামও দিল তরতর শব্দে। কান খাড়া করে শুনলো। কিন্তু যা শুনছে তা সব ঠিক তো—। নাকি ভ্রম দেখছে, ভয়ে ভীমরতি হয়েছে। কিন্তু এত কথা ভাববার সময় দিল না বুড়ি, পান সেজে চুনের ভাঁড় থেকে চুন লাগিয়ে এগিয়ে দিল রজনীর দিকে। রজনী খেল কিন্তু কোন স্বাদ বুঝতে পারল না। কারণ সেই মুহূর্তেই বেশ কিছু নানা জাতের মাছ ছলবল করে সাঁতার কেটে বিশ্বসংসার লাবডুব করে দিল। বুড়ি বলল, 'এদিক ওদিক ঘুরে দেখ বাছা, ভালো লাগবে। তখন আর যেতে চাইবে না।'

কথা শেষ করে বুড়ি খপ করে রজনীর হাতটি ধরল,—এবং এগোতে লাগল। হাঁটছিল না, বরং উবু হয়ে এক বিশেষ কায়দায় এগোচ্ছে। চারদিক অন্যরকম। কখনো ভয়ঙ্কর, কখনো সুন্দর। এই বুড়ির কথা রজনী কেন তার

বাপও শুনেছে গল্পছলে। কতকাল আগে চুনের ভাঁড়ের টানে বুড়ি ঈশ্বর হয়ে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে এই জলেই থাকার দরুন তেনার পাজোড়া নষ্ট হয়ে গেল। তাপহীন, তীব্র স্ফটিকের মতো আলোয় আচ্ছন্ন জলের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে রজনীর মন বলল, বাহ্, বেশ জায়গা তো—

মাছগুলি একে একে জেগে গেল। হুড় হুড় করে ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল একেবারে জন্ত মারা ফাঁদটিতে। রজনী মনে মনে ভাবল, এইবার পাটাতনের কাঠটি উটকে দেওয়া দরকার। কি এক মোহাচ্ছন্নতা সত্ত্বেও জালের খুঁটে ধরে কাঠটি পার করে দেয় সে। অমনি সর সর করে মেঘের মতো ভেসে যায় মাছ। এবার ঘরে ফেরার পালা।

বুড়ি জিজ্ঞেস করল, কি গো বাছা—কেমন লাগে ?

রজনী বলল, আহা কি সুন্দর—

বুড়ি হাসল মৃদু, একমুখ জল নিয়ে বুড় বুড় শব্দ করে বলল, তুমি তো বাছা ঈশ্বর হয়ে গেলে। আর ওপরে উঠতে পারবে না—

চমকে উঠল রজনী, এইবার যেন তার হাত, পা, তলপেট, কলজে সব কিছু ঠাণ্ডা মেরে গেল। কোমরে হাত দিয়ে দেখার চেষ্টা করে বামুনকন্যার দড়িটা ঠিক আছে তো—। একি, এখন কি হবে, অমনযোগিতায় বাঁধনটি কখন ঢিলে হয়ে খুলে গেছে। সর্বনাশ! বাঁধতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেন জানি পারল না। চিৎকার করে উঠল, কচি বাপ আমার, বাঁচারে বাপ, বাঁচা— মরে গেলাম—। জলের নিচে পাতলা, পিচ্ছিল, কালচে শ্যাওলারা ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। এতদিনে মাছগুলি লোকটিকে বাগে পেয়েছে, ছাড়বে কেন ? যত তেড়ে ফুঁড়ে ওপরে উঠতে চায় ততই কে যেন পিছনে টানতে থাকে। অমনি তার বউ-সংসার, পুত্র-সম্পত্তির কথা মনে পড়ে যায়। পরিষ্কার শুনতে পায়, পৃথিবী থেকে কে যেন ডাকছে, বাপ রে উঠে আয়, এত বছর ধরে নিচে তুই কি করচিস্—। এই নির্বান্ধব জগৎটিতেও মানুষের হাঁক অন্ধকার কেটে সাঁ করে তীরের মতো এসে বিদ্ধ হয় বুড়ো রজনীর বুকের একেবারে মধ্যিখানে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়, প্রথম রাতের আলুসেদ্ধ ভাত, আবেগ, অপরাধ, আর পেটে ভূত হয়ে থাকা বিড়ির ধোঁয়াটি পর্যন্ত ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

ঈশ্বর হয়ে যাচ্ছে রজনী। হতে হতে তার মনে পড়ে যায় অন্ধকার আকাশের কথা। সজনে গাছের সাদা ফুলটিতে পর্যন্ত এই রাতে কালি পড়েছে। জল ঠেলে ওপরে উঠে আসতে আসতে কোথা থেকে যেন পায়ে উড়ে এসে পড়ল একটা সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং। ভাগ্যিস চেনে রজনী,

কার্তিকের মাঠে দেখেছে নইলে এই জলের মধ্যে অবিশ্বাস্য পতঙ্গটা কি বলে তার পরিচয় দিত!

কিন্তু ঈশ্বর হওয়া কি আর মুখের কথা। হবে বললেই হওয়া যায়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের বিশ্বাস, ইতিহাস সঙ্গে না নিয়ে এমনি এমনি একা একা কে কবে ঈশ্বর হয়েছে! পেট থেকে জলের বুড় বুড় আওয়াজটি শুনে রজনী বুঝতে পেরে যায় সে আসলে মানুষই রয়ে গেছে।

চোখ খুলে হসপিটালটি দেখেই জীবন-সম্পর্কে তার শেষ আশাটিও যেন মরে গেল। শূন্যে ঝুলছে একটি বোতল, পাইপে পাইপে জল নামছে তার শরীরে। রজনী বুঝতে পারে সেলাইন দেওয়া হচ্ছে তাকে। বুঝতেই হবে, মানুষের পৃথিবীতে থাকাত হলে তাদের মত করে বাঁচতে হবে বৈকি। নার্স এসে বলে গেল, একদম কথা না, কোনকিছু ভাবনা নয়, চুপচাপ থাকুন। বাধ্য হয়ে বাসি মড়ার মত নেতিয়ে গেল রজনী। তার হাত পা বুক পিঠের লোমগুলি পর্যন্ত শান্ত বালকের মতই ঘুমিয়ে গেল।

অবসরে, এক চটকা চোখ লাগলে স্বপ্নের চোরা পথ বেয়ে রজনী গিয়ে উপস্থিত হয় জলের গহীনে। আবার জল, আবার গাছপালা অন্যরকম, আবার মাছের রূপালী রঙ রজনীর যৌবনের ব্যথা মনে করিয়ে দেয়, কখনোবা গল্পছলে বলে কত কথা।

ডাবের জল খায় রজনী, নোনা মুড়ি খেলে প্রেসার বাড়ে তাই বালিভাজা চিঁড়ে খায়। সকাল বিকাল টিয়া আসে। কচি তুই কুথায় রে বাপ—

এই তো তোমার মাথার সিথানে—

তোর মা—

তবে কার হাতে গ্লুকোজ খেলে—

দিন তিনেক পরের একটি বিকেল রজনীর চোখে মায়া ধরিয়ে দিল। আহা কি অপূর্ব হাওয়া ফর ফর শব্দে বয়ে যাচ্ছে। জানালার বাইরে চেনা দেশটা শুধু যা কেঁপে কেঁপে ওঠে, এই হাওয়ায় পুলক জাগে। তবু যেন মনে হয়, কোমরে ব্যথা, টাটায় সর্বশরীর। যেখানে দড়িটি ছিল সেখানে এখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কোমরে চাপ পড়েছিল খুব।

দেখতে এসেছিল লক্ষ্মী সামন্ত। এককালে এদের গেরস্থে অনেক উপকার দিয়েছিল রজনী। মধ্যবিত্ত লোক, টিনের কোঠা বাড়ি তাই বিপদের দিনে একগণ্ডা কমলালেবু হাতে নিয়ে এসেছে। মানুষটা খুশী হবে।

ঘরে এসে বউ-বেটাকে রজনী সবকিছু খুলে বলল। পুকুরের নিচে বুড়ির সঙ্গে দেখা তার দেখা হয়েছিল। জলের নিচে আঁধার নেই। পানের স্বাদ কিছুতেই বুঝতে দেয়নি সেটা আসলে কি। জলের ভেতর একটা গঙ্গাফড়িং গিয়ে ঢুকল কি করে! নারে, ইসব মিথ্যা নয়—সব সত্যি, নিজের চোখে দেখা।

ঈশ্বর হতে পারেনি বটে, কিন্তু পথঘাট সে জেনে এসেছে, দেখে এসেছে। দিন দিন পালটে যায় রজনী। কে যেন ডাকে, শিরায় ধরে টান দেয়। নেশা লাগে. নিশি নয় তো? ডাকতে থাকে। হজরবজর বকতে থাকে,—তুই আর ফিরে যেতে পারবি না, এই তো ঈশ্বর হয়ে গেছিস। আপাদ-মস্তক তাকাতে গেলে রজনী শুধু একটা জাল দেখতে পায়। ভয় আর আহ্লাদ, তারপর জলের তলায় তলিয়ে যায়। তাই বলে সে মরে যায় তানেয়, বরং বেঁচে থাকে। জ্যান্ত মানুষটা দ্যাখো কি রকম হয়ে গেল! ভাত খায় বউয়ের হাতে আর তাকিয়ে থাকে ঘাটের দিকে।

•

বেয়নেটের আড়ালে মুন্সী প্রেমচাঁদের রঙ্গশালা

নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমি ও বিহার সরকারের যৌথ উদ্যোগে এ বছরের পূর্বাঞ্চলীয় নাট্যোৎসব গত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাটনায় অনুষ্ঠিত হলো। মণিপুর, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মোট ৬টি দল এই নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহণ করে। ত্রিপুরাসহ অন্যান্য রাজ্যের কোন প্রতিনিধিদল কেন যোগ দেয়নি সে বিষয়ে উদ্যোক্তারা কিছু জানাননি। ১৯৮৪ সাল থেকে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি সারা ভারতে যুবনাট্যকর্মীদের লোকধারা ভিত্তিক নাটক করার জন্য প্রায় ১২ হাজার টাকা করে প্রতিটি দলকে অনুদান দিয়ে থাকেন। এবং ৪টি আঞ্চলিক নাট্যোৎসবের মাধ্যমে এই প্রয়াসকে উৎসাহিত করা হয়। নাট্যোৎসব চলাকালীন প্রতিদিন নাট্য বিষয়ক আলোচনা সভাও পরিচালিত হয়। এই নাট্যোৎসব উপলক্ষে নভেম্বরে পাটনায় রতন থিয়াম, বি. ভি. করন্থ, প্রেমচাঁদ জৈন, মনোরঞ্জন দাস, বি. আর. ভার্গব, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব কোঠারী প্রমুখ নাট্যব্যক্তিদের সমাবেশ হয়েছিল। এ ছাড়া সারা পূর্বাঞ্চলের বহু পর্যবেক্ষক এসেছিলেন। নাট্যোৎসব শুরু হওয়ার আগেও তাঁরা জানতেন না যে বিহার সরকার এই নাট্যোৎসবের উদ্যোক্তা, সেই সরকার গত ১৩ বছর ধরে মুন্সী প্রেমচাঁদ নামাঙ্কিত রঙ্গালয়ে সি. আর. পি শিবির করে সমস্ত নাট্যকর্ম স্তব্ধ করে দিয়েছেন। উৎসব-উদ্বোধক হিশেবে নাম ছিল বিহারের সংস্কৃতি মন্ত্রী কৃষ্ণা শাহীর। কিন্তু তিনি যে আসতে পারবেন না তা সংস্কৃতি সচিব, সংস্কৃতি অধিকর্তাসহ বিহার সরকারের কোন পদস্থ আমলাও জানতে পারেননি। উৎসব শুরু হওয়ার কথা সাড়ে পাঁচটায়, কিন্তু মন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হল বিশিষ্ট দর্শকদের। অগত্যা মন্ত্রী ছাড়াই উৎসবের উদ্বোধনে এগিয়ে এলেন সঙ্গীত নাটক আকাদেমি ও বিহার সরকারের সংস্কৃতি সচিবদ্বয়। সেই সময় বিহারের ২৪টি নাট্যসংস্থা সমন্বয়ে গঠিত বিহার কলাকার সমিতির ১০০ জন

প্রতিনিধি মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকজন মঞ্চের উপর এলেন। তাঁদের একজন প্রতিনিধি অপূর্বানন্দ শর্মা জানালেন: বিহার সরকার কালিদাস রঙ্গালয়ে ৭ দিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। এ জন্য আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু যখনই দেখি এই সরকার ১৩ বছর ধরে মুন্সী প্রেমচাঁদ রঙ্গালয়ে সি. আর. পি. শিবির করে রাখে। তার বিরুদ্ধে রঙ্গকর্মীরা আন্দোলনে নামলে পুলিশের আঘাত নেমে আসে, তখন কি মনে হয় না এই নাট্যোৎসবের আয়োজনের উদ্দেশ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা না অন্য কিছু? সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ 'শেম' 'শেম' করে ওঠে।

বি. ভি. করন্থের বক্তব্য সম্বলিত একটি ফেস্টুন মেলে ধরেন দুজন নাট্যকর্মী। সেখানে লেখা রয়েছে: আমি এমন একটি দেশে বাস করে লজ্জিত, যেখানে নাট্যালয় সি. আর. পি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে।

সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ শান্ত বিক্ষোভে থম থম। কলাকার সংঘর্ষ সমিতি আবেদন রাখে: এই লড়াইয়ে সামিল হতে। দাবী তোলে: বিহার সরকার সি. আর. পি. হঠাও।

এরপর কি আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জমে! কিন্তু পাটনার সতীশ আনন্দের পরিচালনায় ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'ময়লা আঁচল'* জমিয়ে তোলেন সেখানকার নাট্যকর্মীরা।

নাট্যোৎসবের প্রতিদিনই কলাকার সংঘর্ষ সমিতি কালো ব্যাজ পরে থাকেন। এরই মধ্যে একদিন সমিতি পটেনায় সমবেত কলাকুশলীদের নিয়ে গিয়ে প্রেমচাঁদের মূর্তির পাদদেশ থেকে সি. আর. পি. হঠানোর দাবীতে মিছিল করে যান রঙ্গালয় পর্যন্ত। সভা করেন। স্বয়ং বি. ভি করন্থ, ক্ষেমিচাঁদ জৈন, কুমার রায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব থাকেন মিছিল ও সভার পুরোভাগে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয় মুখ্যমন্ত্রী বিন্ধ্যেশ্বরী দুবের কাছে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, রতন থিয়াম, জে. প্যাটেল, এমন কি সঙ্গীত নাটক আকাদেমির বি. আর. ভার্গবও এই প্রতিবাদে মুখর। ফলে পাটনার নাট্যোৎসব পরিণত হয় বিহার সরকারের সংস্কৃতি-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলনে।

বলাবাহুল্য, এই আন্দোলনের নেতৃত্বে কলাকার সংঘর্ষ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ভারতীয় জন ও গণনাট্য সংঘ।

পূর্ণচন্দ্র তালুকদার

কলরোল থেকে দূরে

পূর্ণেন্দু মৈত্র সাড়ে তিন দশক ধরে কবিতা লিখছেন। 'প্লাবিত নিসর্গে নিষাদ' কাব্যগ্রন্থে তাঁর বিষয়চেতনার বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। নিসর্গ, প্রেম, মানুষ, সমাজনীতি, রাজনীতি—সবকিছুতেই কবির আগ্রহ প্রবল। নিছক শুদ্ধ কবিতায় তিনি বিশ্বাসী নন, বরং 'প্রার্থিত দায়িত্ব' বা দায়বদ্ধতাকে কবিতায় রূপ দিতে চেয়েছেন।

আঙ্গিকের দিক থেকে পূর্ণেন্দু মৈত্রের কবিতা চল্লিশের কাব্যরীতিরই অনুসারী। তিনি যখন লেখেন, "এ মায়াপ্রপঞ্চ বিশ্বে আমি এক আদিম পুরুষ : / আমার লীলায় তুমি সঞ্চারিনী পল্লবিনী বিভা" (অঙ্গীকার) অথবা "চুপচাপ শুয়ে থাকো অবিনাশী সময়ের ছাদে / ঝরুক তোমাকে ঘিরে চৈত্রের বাসন্তী বিলাস" (সহজিয়া)—তখন হয়তো ওপরের মন্তব্যটিই খানিকটা জোর পেয়ে যায়।

কোনো সহজসাধনে বিশ্বাসী না হয়ে কবি জীবনের আলো-অন্ধকার উভয়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছেন। কাব্যগ্রন্থটির প্রতিটি রচনায় সেই অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ক'রে 'রক্তের যন্ত্রণা' ও 'চিতার দর্পণে' কবিতাদুটির কথা উল্লেখ করা যায়।

বাংলা কাব্যনাট্যের ধারাটি স্ফীত নয়। ভালো লাগল গ্রন্থের শেষে 'এখন অন্ধকার এবং আমি' কাব্যনাটিকা পাঠ ক'রে। বেশ কিছু নাটকীয় মুহূর্ত এই রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে।

প্রশান্ত ভবাই অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি। 'প্রেম ঘৃণা দুই সহোদর' তাঁর তৃতীয় এবং শেষতম কাব্যগ্রন্থ। কোনো মারপ্যাচের মধ্যে না গিয়ে শান্তিপুর-নিবাসী এই কবি সরল সহজ ভাষায় ও রীতিতে কবিতা লেখেন। ছোট ছোট কবিতা লেখায় তিনি বেশী আগ্রহী।

প্রশান্ত-র রচনায় মানবতার উৎসার বেশ জোরালো। সাবলীল ভাবে তিনি বলতে পারেন, "রাত্রি কাঁদে, নবজন্ম, হয়ে ওঠো লাল গোলাপের চারা আকাশের নীচে" (কয়েকটি টুকরো কবিতা)। আশা করি, গোলাপের এই কাঙ্ক্ষিত শোণিত দীপ্তি তাঁর কবিতাকে মর্যাদাবান করে তুলবে।

অমল সেনগুপ্ত

প্লাবিত নিসর্গে নিষাদ। পূর্ণেন্দু মৈত্র। টাইমস ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯

প্রেমে ঘৃণা দুই সহোদর। প্রশান্ত ভবাই। নলিনী প্রকাশনী, কলকাতা-৯

২১ ডিসেম্বর ১৯১২—২২ নভেম্বর ১৯৮৭

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

মায়াকভস্কির 'How beautifully ill' কবিতার লাইনটি আপাত রুগ্ন রোগা লম্বা যে মানুষটি জীবনের তানমন্ত্রে বেঁধেছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, চরম অসুস্থতা নিয়েও চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম ভেঙে যে মানুষটি গলার স্বরে মাধুর্য ছোঁয়াতেন, যা একালের নব প্রজন্মের কাছে ঈর্ষণীয়, সেই শঙ্খচিলের স্রষ্টা গণনাট্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ শরিক হেমাঙ্গ বিশ্বাস আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গান করতে গিয়ে ঘরোয়া কথা বলার ভঙ্গীতে বক্তৃতা করতে করতে এই মানুষটিকে কদিন আগেও আবেগে থর থর করে কাঁপতে দেখেছি শিয়ালদহের রাজনৈতিক নির্বাচনী মঞ্চে, হায়দ্রাবাদে ইপ্টার মহাসম্মেলনে। বলতে দ্বিধা নেই, গলার উদারাতে যে স্বরটি বেজে উঠত, শ্রোতারা যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলতেন, মনে ও মননের আদর্শে, মেধাতে, শ্রবণের বিশ্লেষণে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার মিরাশী গ্রামে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম। বাবা হরকুমার বিশ্বাস ছিলেন জমিদার পরিবারের কড়া মানুষ। মা সুগায়িকা। পারিবারিক নিয়মেই দীক্ষাগুরু স্বামী মুক্তানন্দের ডিব্রুগড় আশ্রমে তাঁর শিক্ষার শুরু। আশ্রমের নিয়ম শৃঙ্খলা তাঁকে বাঁধতে পারে নি কোন দিন। ফলে জে. কে ইনষ্টিটিউশনে পড়ার ব্যবস্থা হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ারে এই সময় মারা যান তাঁর বড় ভাই হিমাংশু বিশ্বাস। মুক্তি আন্দোলনের দুর্নিবার স্রোত তাঁর মনকেও রাঙিয়ে যায় গোপনে গোপনে। ম্যাট্রিক পাশ করেই তাই তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কারারুদ্ধ হন। তখন তিনি শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র। জেল থেকে ছাড়া পেলেন টি. বি. রোগাক্রান্ত অবস্থায়। রাজাগোপালাচারি মন্ত্রীসভার উদ্যোগে মাদ্রাজের

ভেলোরে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনি রোগমুক্ত হন। এরপর জেলাতে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি পেলে ঐ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

তাঁর শিল্পী জীবনের বিকাশ ঘটে সম্পূর্ণভাবে গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে তাঁরই স্বীকারোক্তি—"চল্লিশ দশকে গণনাট্য আন্দোলন যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই একজন সংগঠক হিসাবে তখন এই শ্রমজীবী মানুষ ও তার সৃষ্ট সুরসম্পদকে আরও গভীরভাবে জানবার সুযোগ ঘটল। সুরমা উপত্যকায় পার্টির নেতৃত্বে ও আমার পরিচালনায় নির্মলেন্দু চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী, গোপাল নন্দী, হেমন্ত দাস প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে যে স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিল, তাঁরা গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে লোক সঙ্গীত সংগ্রহ করে আনতেন। গ্রামের লোক শিল্পীদের অনুসরণ করে নিজেও গীতিকার হওয়ার চেষ্টা করলাম।"

জীবনের ব্যাপ্তি ও সামগ্রিক চেতনাবোধ দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন লোকের কাছে পৌঁছতে হলে গোষ্ঠীচেতনাকে রূপ দিতে হবে সমসাময়িক কথায়—চিরন্তন পল্লী সুরে। আজীবন কঠিন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে তিনি এই সুর ও কথার লোকায়ত মিশ্রণে পৌঁছতে পেরেছিলেন বলেই এই 'পাথর কঠিন' শহরের মধ্যে থেকেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন সার্থকভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। লোককথা, লোকমানস এবং তার আধুনিক ভাবনা চিন্তার বিশিষ্ট উদারভঙ্গীর সঙ্গে পুরনো ঐতিহ্যের এক মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে এক সাবলীল সেতু রচনা করতে দেখেছি এই স্রষ্টাকে। সুরের-লয়ের দ্রুত তরঙ্গে গণজীবনের ঢেউ-এ সব কিছু ভাসিয়ে দিতে সব সময় প্রস্তুত ছিলেন তিনি। তিনি বুঝতেন, বোঝাতে চাইতেন, অসুস্থ-হলেও তিনি হতাশ নন। একদিকে সর্বহারার শ্রেণীদর্শনকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তাঁর উদ্যোগের উৎসমূলে আর মনের সুরে বাজিয়ে চলেছিলেন তাঁর কাব্যমাধুরীকে। তাই জীবনের শেষ দিকেও গণনাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা তাঁকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম নতুনভাবে। আমাদের উদ্যোগের কাছে তিনি ধরাও দিয়েছিলেন সাবলীল ভঙ্গীতেই। কারণ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জীবনবোধ ছিল সংযত, ভাববাদ বা নৈরাশ্যবাদে আচ্ছন্ন নয়। বরং তা সংকল্পে কঠিন আর সত্যের আলোকে উজ্জ্বল। আমাদের চেতনায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাই অবিনশ্বর।

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

প্রসঙ্গ : চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষাৎকার

মাননীয় সম্পাদক,

"পরিচয়," সমীপেষু

'পরিচয়' শারদীয় (১৩৯৪) সংখ্যায় প্রকাশিত সন্ধ্যা দে গৃহীত শ্রী চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষাৎকারটি পড়লাম। শ্রী সেহানবীশের শেষ সাক্ষাৎকার রূপে এর গুরুত্ব অসাধারণ। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারটিতে দুটি গুরুতর ভুলের দিকে (মুদ্রণ-প্রমাদ কি ?) দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করছি।

শ্রীমতী দে-র প্রথম প্রশ্নটিতে তিনি বলেছেন '১৯৮৬-এ প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠার পর্বে...' ইত্যাদি। সালটা হবে '১৯৩৬'। তবে, এটা মনে হয়, মুদ্রণ প্রমাদ।

দ্বিতীয় প্রমাদ শ্রী সেহানবীশের Y-C-I সংক্রান্ত উত্তরে (পৃঃ ১২০)। তিনি বলছেন : "গোপন কোন তথ্য লিখে পাঠানো যেত না, কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে গান বেঁধে সুর করে গিয়ে তা জানিয়ে দিয়ে আসা হত। এখনকার যে মস্ত বড় প্রফেসর সেই সুশোভন সরকার এ ব্যাপারে খুবই জড়িত ছিল। অবশ্য তখন সে একেবারেই বালক।..." ইত্যাদি।

খুব সম্ভব 'সুশোভনের' স্থলে ওটি হবে অধ্যাপক সরকারের বালক পুত্র 'সুমিত'।

সুস্নাত দাশ

প্রফুল্লকানন, কলকাতা-৫৯

প্রসঙ্গ : পরিচয়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু;

তোমার কবিত্ব-শক্তির সঙ্গে কিছুকাল ধরে দেখছি সম্পাদকীয় দক্ষতা সমান তালে সঙ্গৎ করে চলেছে, যা দুর্লভ। 'পরিচয়'-এ পুরনো দিনের সর্বজন-গ্রাহ্যতার চরিত্র ফিরে এসেছে। সেটা সম্পাদক হিসাবে তোমার দূরদর্শিতা, উদারতা এবং পরিকল্পনার গুণেই ঘটেছে, কিছু বছর সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা থাকায় তা আমি ক্রমেই বেশি করে টের পাচ্ছি। গত বছর শারদ সংখ্যায় রাধারমণ মিত্র এবং এ বছর খ্যাতিবান মৃত ব্যক্তিদের অপ্রকাশিত রচনাগুচ্ছ উপহার দিয়ে খুবই অবাক করেছ। এককথায় বলা যায়, 'পরিচয়' এখন একটি প্রধান কাগজ হয়ে উঠেছে—শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষকে ধরলে পরিচয়ের দ্বিতীয় প্রাচীনতম লেখক হিসাবে আমি জোরের সঙ্গেই তা বলতে পারি।

শারদ সংখ্যায় আমার 'অন্ধসপ্তক' সনেটগুচ্ছ খুবই ভালোবাসার সঙ্গে ছেপেছ, এজন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রীতিকে খাটো করব না। কিন্তু ভাই, কবিতাগুলোতে অজস্র ছাপার ভুল দেখে বড্ড দমে গেছি। তুমি নিজে কবি, তাই জানো, শব্দই কবিতার প্রাণ—সেখানে ত্রুটি দেখা দিলে, কবিতার হার্ট-অ্যাটাক হয়।

মুদ্রিত কবিতাগুচ্ছে প্রধান ত্রুটিগুলো জানাচ্ছি। 'ধৃতরাষ্ট্র' সনেটে 'বৈতুরণী' হবে 'বৈতরণী'। 'রাজা'-এ মুদ্রিত 'কোকনদ' হবে 'খোসামোদ'। তাছাড়া অন্যত্র 'আতস্কিত' হবে 'আতঙ্কিত, 'আসে' হবে 'আশে'। শেষ সনেটের নাম 'দেখা' নয় 'দেগা', (Degas) শিল্পী, যিনি শেষজীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। 'দেগা' নামটি পরে কবিতার মধ্যেও 'দেখা' ছাপা হয়েছে। ঐ সনেটেই 'পুনর্জন্ম' হয়েছে 'পুর্ণজন্ম'।

প্রিয় সম্পাদক, তুমি জানো আমি সেরিব্রাল স্ট্রোকের রোগী, তাছাড়া চোখেও একটা থ্রম্বসিস হয়ে আমাকে অর্ধ-অন্ধ করে ফেলেছে। এসব কারণে

রাবরের দুষ্পাঠনীয় হাতের লেখা কিছুকাল ধরে প্রায় মহেঞ্জোদারোর লিপির তে অ-পঠনীয় হয়ে উঠছে। আমি শেষ প্রুফটি একবার আমাকে দেখাতে নুরোধ করেছিলাম, হয়তো সময়াভাবে তা হয়ে ওঠেনি। পরিণামে, যে নেটগুচ্ছ বিষাদ এবং তাকে অতিক্রম করার সংকল্প হিসাবে হাজির করতে চয়েছিলাম, অজস্র ভুলের ব্যাসকূটের জটায় আবদ্ধ হয়ে তা পাঠক-হৃদয়ের মুদ্রাভিসার থেকে হয়তো-বা বঞ্চিতই হ'য়ে রইল। অলমতিবিস্তারেণ।

তোমাদের

মণীন্দ্র রায়